Cuk-Ha5080-10-0303258 (10) 4

অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত

ত্রয়ারেন

অমর ঘোষ নির্দেশিত

সপ্তর্ষি

প্রধান ভূমিকায় শম্ভু সিনহা

বলাই হালদার (গান)

বোষ্ট পাল / কৃষ্ণা ভট্টাচার্য

দুর্গাদাস ব্যানার্জী

বলাই রায় • প্রদীপ চক্র • অরূপ

দিলীপ • বেবী • কল্যাণী চক্রবর্তী

কৃষ্ণা • বাঈ কর

মঞ্জুশ্রী

ও হাস্যরসিক

তারা ভট্টাচার্য

কবিতা চক্রবর্তী

নির্মল মুখার্জী রচিত ও নির্দেশনায়

মিলনপলনা ফিরে

র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরকার পঞ্চানন মিত্র

ফোন : ৫৪২৩৬৬

ভোলানাথ অপেরা

প্রধান শিল্পী : শুক্লি চ্যাটার্জী

উপদেষ্টা : তিলকচন্দ্র সরকার

কার্যালয় : ১১৩ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা ৬ ম্যানেজার : দীনেশ সরকার / বৈদ্যনাথ পোদ্দার সহঃ ম্যানেজার : চির

গোলিতা চ্যাটার্জী

পাহাড়ী ভট্টাচার্য শ্যামল ঘোষ

মানিক রায়চৌধুরী দীপিকা দাস

শেকস্‌পীয়ার রচিত

নির্দেশনা
অমর ঘোষ

হ্যামলেট

সংগীত
ভি বালসারা

নীহাররঞ্জন
গুপ্তের

বহ্নিশিখা

পালারূপ
সত্যপ্রকাশ দত্ত

নির্দেশনা / শ্যামল ঘোষ সংগীত / আলমবাংকর

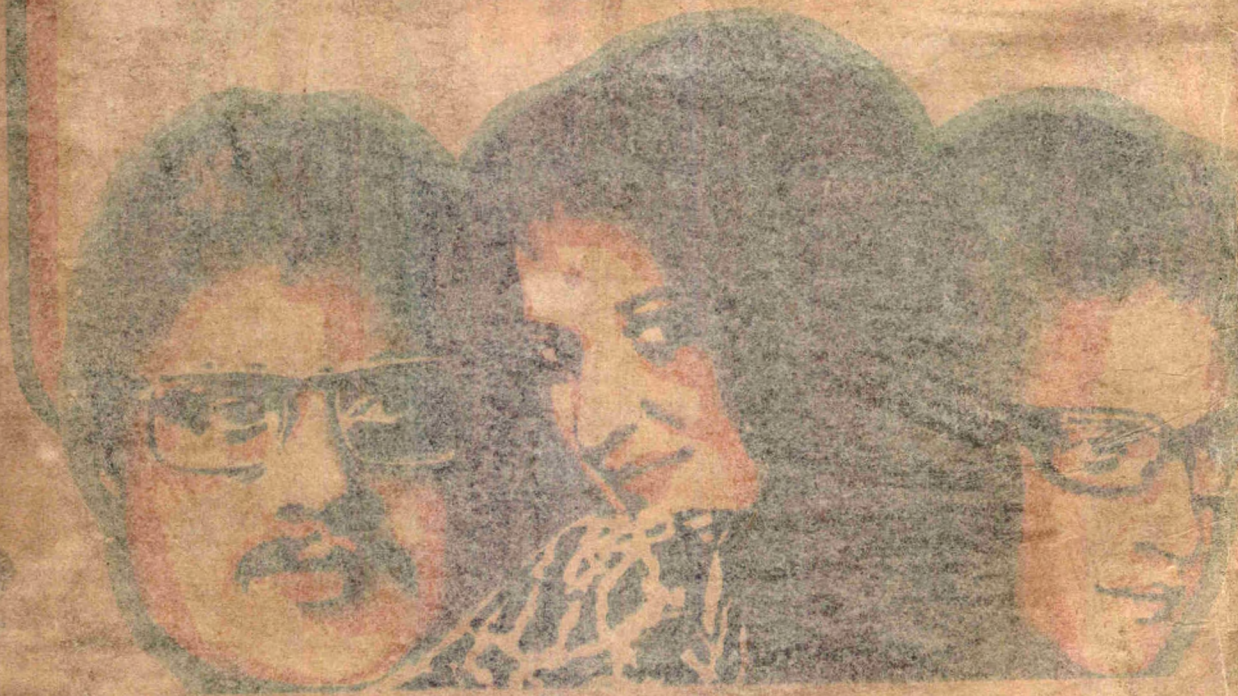

কলিকাতা যাত্রা সমাজ

কার্যালয়—১১৭/১ রবীন্দ্র সরণী ফোন—৫৫-২৮-৫২ কলিকাতা-৬

...Printed at The Indian Press (Publications) Ltd., Calcutta-13.

জ্ঞানভাণ্ডারের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা প্রকাশনের সাহসী উদ্যম

বিশ্বকোষ

২৬ খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ১০ টাকা ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১৫ টাকা জমা দিতে হবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

আদ্যোপান্ত পরাশর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সৃষ্ট চরিত্র পরাশরকে নিয়ে লেখা উপন্যাস ও গল্পের একটি সংকলন। ১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম ১৫ টাকা। প্রকাশিত।

মূল ছন্দে ও মূল শ্লোকবদ্ধ আকারে

শ্রীভগবদ্গীতা

বাংলা পদ্যানুবাদ ও তৎসহ আনুষঙ্গিক ভূমিকা শ্রীপ্রমথনাথ বিশী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম ৫ টাকা। ২ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

উপেন্দ্রকিশোর রচনাসংগ্রহ

দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০ টাকা। দু খণ্ডে সম্পূর্ণ।

বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ

১৬ খণ্ডে সমাপ্য। মূল্য ৩৫ টাকা। উপন্যাস খণ্ড প্রায় নিঃশেষিত। প্রবন্ধ খণ্ড ছাপার কাজ চলছে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

সুকুমার রচনাসংগ্রহ

দু খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ২০ টাকা। দুটি খণ্ডই প্রকাশিত।

শেষ সংস্করণের গ্রাহক করা শুরু হয়েছে

বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম ৩০ টাকা।

মহাভারত

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত এই ভারতগ্রন্থের দ্বিতীয় তথা শেষ সংস্করণের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৭০ টাকা।

শিবনাথ রচনাসংগ্রহ

এই নির্বাচিত রচনা সংকলনটির দাম ১৮ টাকা। দুটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে।

কবি কাশীরাম দাস বিরচিত

মহাভারত

দু খণ্ডে সম্পূর্ণ দাম ২৫ টাকা। দুটি খণ্ডই প্রকাশিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

পনেরোই আগস্ট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর থেকে স্বাধীনতা লাভের সু-প্রভাত পর্যন্ত দেশের বিচিত্র, জটিল ও অত্যুজ্জ্বল জীবনযাত্রা উপন্যাস রূপে তি লাভ করেছে এই বিশাল গ্রন্থে। গ্রাহক মূল্য—১৫ টাকা। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

বলে গেছেন উপনিষদ—আয়াস নাহি অল্পে।
বাড়িসুদ্ধ সবার আমোদ শিবরামের গল্পে॥

শিব্রাম্-রচনাবলী

শিব্রাম্ চবর্‌বর্‌তির বইয়ের দোকান-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কিশোরদের উপযোগী সুলভ সংস্করণ—পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য। ১০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। প্রতি খণ্ড নেওয়ার সময় ৮ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৬০নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

পঞ্চানন মিত্র • আনন্দময় রচিত

কলকে ফুলরা

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

লক্ষ্মী এলো ঘরে

আনন্দময় রচিত

সাত তালের কায়দা

সুর • প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)

প্রযোজনা ও নির্দেশনা

মোহন চ্যাটার্জী

যৌবনের অগ্রদূত / ফোন ৫৫-৫৪১৩

মোহন অপেরা

মোহন চ্যাটার্জী ও মিতা চ্যাটার্জী ৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
উপন্যাস ঃ		
নৌকোয় পরাশর বর্মা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২০
পুরের নকীব	শক্তিপদ রাজগুরু	৭২
মানা	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২
ব্রহ্মচারী	তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	২৬৪
বড় গল্প ঃ		
দুখে থাকা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১১০
গল্প ঃ		
লোহকপাটের বাইরে	জরাসন্ধ	১১
বাবু কলকাতার		
লীলাবিলাসিনী	সুভাষ সমাজদার	১০৫
উড়ো চিঠি	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৪৬
কুশল সংবাদ	বারীন্দ্রনাথ দাশ	১৫১
বটোহী	বাণী রায়	১৭৩
লাল ত্রিকোণ	ডাঃ বিশ্বনাথ রায়	১৮৭
আমার বাবা	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯২
মহিলামহল	কণা বসুমিশ্র	১৯৮
সাঁকো পেরিয়ে	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২০২
মনে নেই	রমানাথ রায়	২০৬
সিনেমা	বলরাম বসাক	২০৯
চলো বালিগঞ্জ প্লেস	সুমথনাথ ঘোষ	২১৩
একটি ভ্রমণকাহিনী	রণজিৎকুমার সেন	২১৯
শালিনীবিক্রম-কথা	নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়	২৮১
অসমাপ্ত চিত্রনাট্য	অসিত গুপ্ত	২৮৫
পিছারু মাঝি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩২২
হাসির গল্প ঃ		
শাড়ি বদল	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১১৮
রহস্য কাহিনী ঃ		
ছোট্ট পাখী চন্দনা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৪১
কেমিক্যাল ডিটেকটিভ	অদ্রীশ বর্ধন	১২৮

জনগণবন্দিত যুবজন নন্দিত সমকাল শোভিত

চুরাশির সিংহ সংবাদ

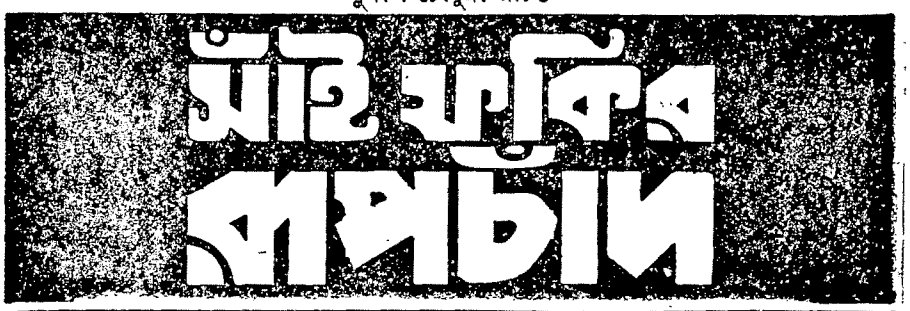

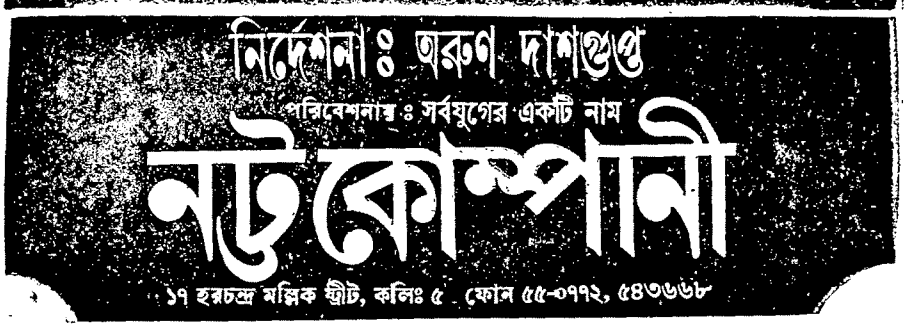

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
ভৌতিক কাহিনী ঃ		
ঘটন ঘ.ট	অনিলকুমার ভট্টাচার্য	১৮১
ভ্রমণ কাহিনী ঃ		
ডিকোলম থেকে রূপকথা	কমল দাশ	৪৯
নাটিকা ঃ		
সত্যমেব জয়তে	মন্মথ রায়	১৫৬
বিবিধ বিষয়ক ঃ		
সুমতীর প্রণতি ও প্রতিশ্রুতি	দেবেশ দাশ	১
দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী	ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
বাংলার লৌকিক রামায়ণ	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	৬০
সাক্ষাৎকার	প্রমথনাথ বিশী	৬৫
আমার বাবার ছবি আঁকা	নীলা মুখোপাধ্যায়	৬৭
নজরুল সৃষ্টিবীক্ষণ :		
লৌকিক দিক	ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত	১২৩
জঞ্জাল	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৫৮
মায়াবিনী মাতাহারি	বিশু মুখোপাধ্যায়	২৬০
সুনীতিকুমার ও শিশিরকুমার	অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩২
এবং		
রবীন্দ্রনাথের চিঠি —গগনেন্দ্রনাথকে লেখা		৯
সুকান্তের পাণ্ডুলিপি		৪০
কবিতা ঃ		
পাঁচটি পাঁপড়ি	বনফুল	১৮
সাগর দ্বীপে	দিনেশ দাস	৯৮
আমাদের এই মেতে ওঠা	সুভাষ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ)	৯৯
গাঙ্গেয় ক্ষোভ	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৯৯
বোঝা	গোপাল ভৌমিক	৯৯
ডানা	হরপ্রসাদ মিত্র	১০০
পরস্পরের জন্য	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	১০০
চিঠির ফাইল	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
বৃহন্নলা	সুশীল রায়	১০০
আজীবন	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	১০০
দু'তরফা	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১০১

Gram : Mandako ফোন ঃ ৩৩-৬২২১

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

মহালক্ষ্মী ষ্টোর্স

রপ্তানীকারক ও গভর্ণমেণ্ট সাপ্লায়ার

পাইকারী ও খুচরা সকল প্রকার

মশারি ও মশারির থান বিক্রেতা।

২১১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৭।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
যাবো	কবিতা সিংহ	১০১
রুমাল	কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	১০১
উচ্চগ্রামে	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	১০২
এবং আপনি	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০২
ভৌতিক	পরমানন্দ সরস্বতী	১০২
আকাশ-সুন্দরী	রামেন্দ্র দেশমুখ্য	১০২
সে পথ তখন তীর্থ	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১০২
আমি এই পৃথিবীতে	নচিকেতা ভরদ্বাজ	১০৩
বেঁচে আছে	বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩
পণ্ডিতমশাই	দক্ষিণারঞ্জন বসু	১০৪
উত্তরবঙ্গের বৈতালিক	আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন	২২৫
খাঁটি	কুমারেশ ঘোষ	২২৫
লেখক কে?	চিত্রিতা দেবী	২২৬
টর্চ জ্বলে আর নেভে	গোবিন্দ চক্রবর্তী	২২৬
ঋণ	বাসুদেব দেব	২২৬
সিক্ত হই, রিক্ত হই	দিলীপ দাশগুপ্ত	২২৬
যাযাবর—নামগোত্রহীন	শিবদাস চক্রবর্তী	২২৭
বল গেল বটে	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২২৭
নীরব দর্শক	বংশীধারী দাস	২২৭
জিজ্ঞাসা	পলাশ মিত্র	২২৭
আসবে না তবুও	শান্তশীল দাশ	২২৭
অশ্বারোহী পদাতিক সেনা	মাধুরী সিংহ	২২৮
দূরের ভাবনা	জীবন সরকার	২২৮
পাপপুণ্য	সামসুল হক	২২৮
বৃষ্টি	মলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	২২৮
পুনরুদ্ধার	কাজী মুরশিদুল আরেফিন	২২৮
নদী ও নারী	কার্তিক মোদক	২২৮
মোনালিসা	অমিয় দত্ত	২২৯
একদিনও যাইনি সেখানে	আইভি রাহা	২২৯
মাটি : সোনা	সলিল মিত্র	২২৯
অসংগতি	প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৯
অঙ্গীকার	বরুণ মজুমদার	২২৯

ছড়া :

জরুরী জারি গান	অন্নদাশঙ্কর রায়	১৯

"ডাব্লউ-বি-আই-ডি-সি"র সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে মাঝারী বা বড় শিল্প গড়ে তুলুন !

যন্ত্রপাতি বাবদ স্থায়ী মূলধন যদি ১০ লাখ টাকার ওপর হয় এবং মোট বিনিয়োগের ২০ শতাংশ যদি আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন তবে WBIDC আপনাকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারবে।

এ পর্যন্ত WBIDC-র সাহায্যপ্রাপ্ত মোট
শিল্পের সংখ্যা — ১৩৩
মোট বিনিয়োগ — ২৩০ কোটি টাকা
এদের মধ্যে ৪০-টির উৎপাদন সুরু হয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

জনসংযোগ অফিসার
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভালপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিমিটেড
২৩-এ, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২২-২৪৪৮ : ৩-১৬১৫ : ২৩-১৬২৮

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
রঙ্গজগৎ ঃ		
সে যুগের কিন্নরকণ্ঠীরা	মধুসূদন মজুমদার	২৯০
নন্দনবাসিনী উর্বশী---		
নীহারবালা	কালীশ মুখোপাধ্যায়	২৯৪
উত্তমকুমার চিরকালের	আরতি ভট্টাচার্য	
"উত্তম" এবং "কুমার"	সাক্ষাৎকার ঃ সীতা সরকার	২৯৯
শিল্পীর কোন জাত নেই---	রঞ্জিত মল্লিক	
রঙ নেই	সাক্ষাৎকার ঃ সীতা সরকার	৩০১
প্রথম লগ্ন---সোনালী গুপ্ত	সাক্ষাৎকার ঃ কল্যাণ সেন	৩০৪
বঙ্গ সংস্কৃতির সেবায়	রণজিতমল কাঁকারিয়া	৩০৬
অবাঙালীর ভূমিকা প্রসঙ্গে	অনুলেখক :	
	অরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৬
খেলাধুলা ঃ		
বাঙালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধে		
প্রথম জয়	উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়	৩০৮
ঘটি-বাঙালের প্রথম লড়াই---		
হারাণ সাহা-উমাপতি কুমার	তাপস বসু	৩০৯
ফুটবলের অতীত অ্যালবাম	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১১
রেণী রিচার্ডস রাণী হলেন	জানকী বসু	৩১৩
রেসকোর্সে পক্ষীরাজের		
পিঠে কোটালপুত্র	দীপালীকুমার ঘোষ	৩১৪
কেরী প্যাকার যে বার্তা		
নিয়ে এলেন	দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	৩১৫
ছোটদের পাতা ঃ		
আগমনীর গান	বিষ্ণুশর্মা	২৩০
বাবুই বাঁধে বাসা	স্বপনবুড়ো	২৩১
তিন দেহরক্ষী	লীলা রায়	২৩১
সাহিত্যিকের পিতৃভক্তি	বিমল দত্ত	২৩১
মাছরাঙার দুঃখ	অমিতাভ চক্রবর্তী	২৩২
প্রশ্ন কিহু	বীরু চট্টোপাধ্যায়	২৩২
ব্যারী	মীরা রায়	২৩৩
মতুা দিনের ছড়া	অনিলেন্দু চক্রবর্তী	২৩৪
ভাগ্য ছিল আকাশধান	মনোজিৎ বসু	২৩৪
ভীম পালোয়ান	রাণা বসু	২৩৪
কয়েকটা বাদাম মাত্র	বীরেন্দ্রলাল ধর	২৩৫
শব্দ শব্দ খেলা	অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	২৩৬
রাজা কে?	নির্মল সরকার	২৩৭
দেওঘরের নবদুর্গা	শান্তিকুমার দাস	২৩৭
বর্ষারাতের ছানাবেড়াল	সুবীর করণ	২৩৮
ঘরে এসো মা-ভবানী	শেখ সরফউদ্দীন	২৩৯
গাধা চড়ে যাবো খাসা	সমর মজুমদার	২৪০
পক্ষী-বিচিত্রা	মঙ্গলময় দত্ত	২৪১
দ্বীপের নাম সার্তসে	শৈলেশ ভড়	২৪২
দাসপ্রথা ও সেই বিখ্যাত বইটি	মুকুল বাগচী	২৪২
সত্যি কিন্তু তা নয়	নন্দীগোপাল চক্রবর্তী	২৪২
আমার কলেজ-কথা	অমিয় চক্রবর্তী	২৪৩
শ্যামবাজারের শশিবাবু	আশুতোষ সান্যাল	২৪৩
নাকে ও চোখে	পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩
গ্রাম্যচিত্র	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩
মহাকাশ অভিযানে লালুধুড়ো	অমিয়কুমার হাটি	২৪৩
খেঁদুবাবুকে অভিনন্দন	প্রিয়ম্বদা দেবী	২৪৪
রাম-তাড়া	আশা দেবী	২৪৪
ছড়া	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	২৪৪
আগমনীর চিঠি	গাজী বিশ্বজিৎ	২৪৪
ছড়া	কালিদাস ভট্টাচার্য	২৪৪
তারা	প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৪৪
পুজোর সাজে টুকুন	ভোলানাথ ঘোষ	২৪৪
গুণের কদর	অবনীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৪৪
সূর্যশিশু জাগলে	প্রবীর বিশ্বাস	২৪৪

সুলভ সাহিত্য প্রচারে..... বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি.....

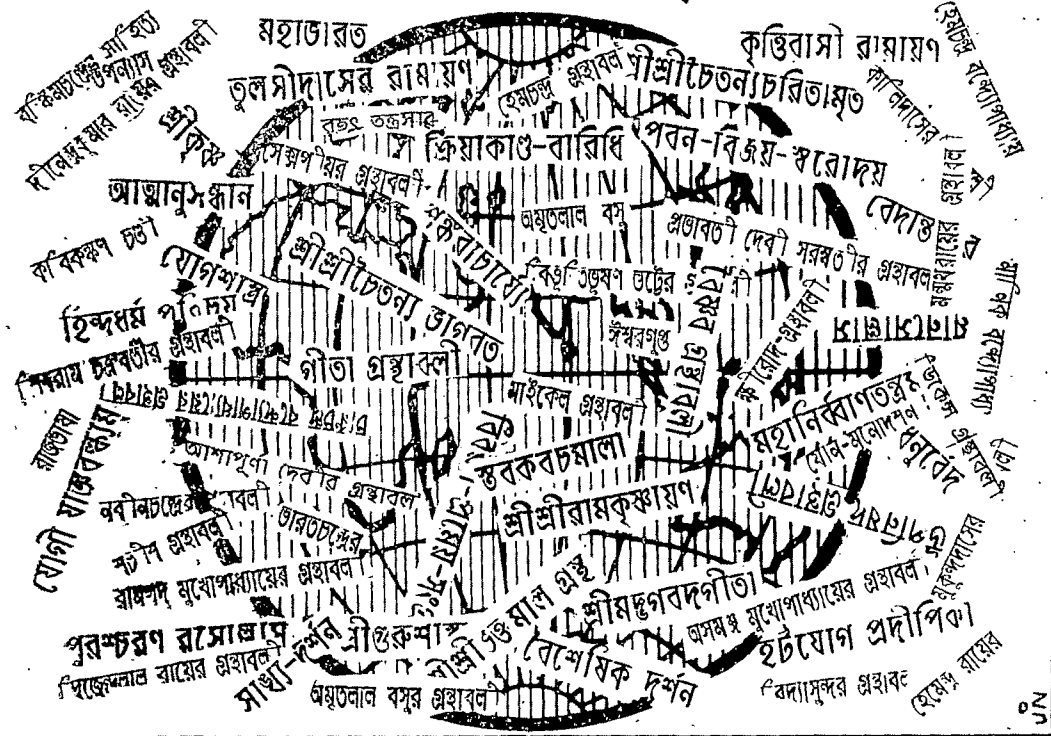

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

(বসুমতী সাহিত্য মন্দির)

১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী
(১৩৮৪)

হরপার্বতী
—স্বর্গতঃ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ১৩৮৪

বসুমতীর প্রণতি ও প্রতিশ্রুতি

॥ দেবেশ দাশ ॥

(চেয়ারম্যান, বসুমতী)

ফরাসী করপল্লবগুলি সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলির ভঙ্গিতে লীলায়িত হয়ে উঠল।

আমি ততক্ষণে প্রায় নিমীলিত নয়নে শ্রীশ্রীচণ্ডীর অর্গলা স্তোত্র আবৃত্তি করে চলেছি। আমার নিমন্ত্রণকর্তা ও তাঁর অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে সেই উপাসনায় অংশ নিচ্ছেন।

বিশ্বমায়ের বিশ্বময়ীর পূজা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাতে অংশ নিতে পারেন। দুর্গতিনাশিনী দেবীর চরণে সবাই প্রণতি জানাতে পারেন। আমার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা।

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।

সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ভিনদেশী। সুধী ও সুন্দরীরা মুগ্ধ অন্তরে শুনে যাচ্ছেন। আমার দেখাদেখি তাঁরাও হাতগুলি পুষ্পাঞ্জলির ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

প্রাত্যহিক জীবনের একটি সাদামাঠা ঘটনা। কোন সাজানো-গোছানো ফুলে ফুটলাইটে উজ্জ্বল সভা-সমিতি নয়। সেখানে ত লোকে উচ্ছ্বাসের বশে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যা ভাবে অনেক সময় তার চেয়ে বাড়িয়েই বলে। সম্ভবত সভার আহ্বানকর্তা বা নিমন্ত্রিত অতিথির মন রক্ষার্থেও বলে। পশ্চিম পৃথিবীতে আবার লোকে মন রেখে কথা বলার বিদ্যায় ওস্তাদ। মনে যা ওঠে মুখে তা ফোটে না। মুখে যা ফুটতে চায় সুখোশে তা-ও ঢেকে যায়।

আজকাল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বাহির বিশ্বের আকর্ষণ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। অস্বীকার করার পথ নেই যে আমাদের নিজেদের উদাসীনতাই এজন্য অনেকখানি দায়ী। তবুও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কথা ওদের অবচেতন মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

শারদীয়া অকালবোধনের সময় বিশেষ করে অনুভব করি যে আমার মন চিরকালই পথিক। দেহ যখন দিল্লীতে বা অন্য কোথাও ডেস্কে বাঁধা মনে তখনো বন্ধন নেই। কিন্তু সেই মুক্তি সশরীরে অনুভব করার সুযোগও এসে পড়ে মাঝে মাঝে।

দেবীর পূজার জন্য একশোটি শতদল

আহরণের অভিযানের মতই সেই সরকারী কাজে বা মনের টানে বিদেশ ভ্রমণগুলিকে কাজে লাগাতে চাই। সাহিত্যের মন্ত্রে আমার পূজা। শ্রীশ্রীচন্ডীর স্তোত্র মনে মনে আবৃত্তি করি তখন।

দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়ে-হম্বিকে—হে দেবি, ভক্তজনের হৃদয়ে অপার আনন্দদায়িনী হে অম্বিকে।

সেই অম্বিকার চরণেই আমরা প্রণতি জানাচ্ছি এখন। কয়েকজন বিদগ্ধ, প্রদস্থ রসিক ফরাসী সজ্জনের সঙ্গে। ভক্তির ত জাতিভেদ নেই। মনীষার নেই সীমান্ত।

কাজেই যে পূজার বর্ণনা এখন করছি তার আসর প্যারিস্ শুনে কেউ অসন্তুষ্ট হবেন না।

এই ত সেই প্যারিস্ যার সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন যে প্যারিস্ একটি মহাসমুদ্র—ইয়োরোপীয় সভ্যতা গঙ্গার গোমুখ—মর্ত্যের অমরাবতী। যেখানে প্যারিস কংগ্রেসে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেবার সময় তিনি লিখেছিলেন যে "চারিদিক থেকে নিজের দেশের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে মানুষ এখানে এসেছে, অথচ এই মহামিলন কেন্দ্রে বাংলা তুমি কই? কে তোমার নাম নেয়? সমবেত সেই প্রতিভামন্ডলীর মধ্য থেকে বীর বঙ্গভূমির একটি সন্তান তবু মাতৃনাম উচ্চারণ করলেন—তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। আপন প্রতিভা দিয়ে মুগ্ধ করলেন বৈজ্ঞানিকমন্ডলীকে। ধন্য বীর তিনি।"

এই ত সেই প্যারিস যেখানে প্রায় দেড়শ' বছর আগে পরাধীন ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহনের আন্তর্জাতিক ভাব ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের বাণী ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীর পর এটিই সম্ভবত মহামানবতার উদ্দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

সেই প্যারিস যেখানে অর্ধ শতাব্দীরও আগে রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তিহরা প্রশান্তি ও মাধুর্যের চিত্র রম্যাঁ রলাঁ প্রমুখ মহামনীষীদের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংবেদনশীলতায় একজন বাঙ্গালী-শ্রেষ্ঠ বহু ফরাসীশ্রেষ্ঠ ও বিশ্ববরেণ্যকে সম্মোহিত করেছিলেন। যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্ তার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। যেখানে তার বিদায় বেলার নমস্কারকে ফরাসীরা প্রার্থনার আবাহন বলে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন।

সেই প্যারিস যেখান থেকে এসে এক আইনজীবী ও সাংবাদিক পল রিশারের সংসার জীবনের স্ত্রী উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে অতিমানসের সাধনায় শ্রীশ্রীমাদার হয়েছিলেন।

এসেই আমি মনে মনে বাঙ্গালীকে ভারতের ফরাসী বলে মনে করেছি। সাহিত্য সাধনায়, মননশীলতায়, মানসিক সংবেদনে আর সাংসারিক সামাগ্রিক উচ্ছ্বাসে উল্লাসে। এবং পল রিশারের মতই ভয়াবহ অন্তরসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির সাগরতরঙ্গভঙ্গের মত সাজানো শিখরে শিখরে, বিপুল ও মহিমান্বিত শূন্যতার মধ্যে দিব্য সম্ভাবনার সন্ধান করতে পারে এই বাঙ্গালী।

সেই ফরাসীদের প্রাণকেন্দ্র এফেল টায়ার দেখে রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—ওটা একটা বিস্ময়ের চিহ্ন।

সেই বিস্ময়ের চিহ্ন বিপুল প্রশ্নের ঘূর্ণি ও ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর দুর্গা পূজাকে জড়িয়ে ফেলেছিল এই প্যারিসে। এই সামান্য একজন বাঙ্গালীর জন্য আহূত একটি মধ্যাহ্নভোজে।

ফরাসী বৈদেশিক দপ্তরের যে প্রতিভাদীপ্ত তরুণ আন্ডার সেক্রেটারী আমার সারথি হয়ে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন তিনি প্রথমেই তাঁর নিজের বাড়ীতে আমায় নিয়ে গেলেন। এক পেয়ালা কফি দিয়ে বিদেশী সাহিত্যিককে সরস অভ্যর্থনা জানানই না-কি তাঁর ইচ্ছা। পুলকে কন্টকিত হয়েছিলাম শুনে যে দিল্লী থেকে ফরাসী এম্বাসী ওঁদের পররাষ্ট্র দপ্তরে আগাম খবর পাঠিয়েছিলেন যে আমি শুধু ভারত সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা হয়েই ইয়োরোপে যাচ্ছি না, ভারতীয় সাহিত্যেরও একজন সেবক আমি।

এই পরিচয় যে দর্পের পরিবর্তে দীপ্তিতে মন ভরে দেয়।

এই গুণী তরুণের সহধর্মিণীকে দেখলাম আমারই সহধর্মী—সাহিত্যের রস সন্ধানে। সারথি তাঁকে বললেন,—মা শেরী, প্রেয়সী আমার, ইনি একজন বাঙ্গালী সাহিত্যিক। তাগোরের সাহিত্য পড়ে তুমি এত বিচলিত অভিভূত হয়েছিলে। তাই এঁর আসার খবর শুনে আমি নিজে থেকে এঁর দেখাশোনার ভার চেয়ে নিয়েছি। আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সোজা বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

এই সময়ে আমার দেশে শরতের স্বপ্ন জেগে উঠেছে। এখন যেন আগমনীর সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল এই ফরাসী রমণীর সুরেলা কণ্ঠে।

হ্যাঁ। হৃদয়ের স্পন্দন আরো দ্রুত হয়ে উঠল যখন বিদায় নেবার সময় এই সদ্য পরিচিতা বাংলা সাহিত্য অনুরাগিণী মৃদু আভভূত স্বরে বললেন—আমাদের নোবেল প্রাইজম্যান আঁদ্রে জিদ নিজে তাগোরের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মত আমিও মনে করি যে মরণের মাধুরীর মধ্যে জীবনের মহিমাকে এমন করে প্রকাশ তাগোর ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি।

বলতে বলতে তিনি জানালার পাশে কাঠের বাক্সে সাজানো টকটকে সিঁদুরে রঙের জিরানিয়াম ফুলের একটি গুচ্ছ আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন—বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার এই সামান্য অর্ঘ্য।

সরকারী কাজের ফাঁকে দুপুরে খেতে এলাম কয়েক বছর আগে পরিচিত একজন বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপকের বাড়ীতে। যেমন তাঁর পান্ডিত্য, তেমনি তাঁর রসজ্ঞান। আর তেমনি সম্মান।

ফরাসী সরকার দিয়েছে তাঁকে স্বীকৃতি। ইউনেস্কো দিয়েছে প্রতিনিধির সম্মান। একবার নিখিল ভারত সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমরা দেখিয়েছিলাম রসসিক্ত অনুরাগ। আগ্রায় আমাদের সম্মেলনের ইউনেস্কো অধিবেশনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বেশ কয়েকজন ফরাসী গুণীজনকে তিনি আমার সঙ্গে আলাপের জন্য এখন আমন্ত্রণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রটোকল অনুসারে ফরাসী সরকারের কয়েকজন অধিকারীও উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকজন গুণী ও রসবিদগ্ধ ফরাসীর সঙ্গে একত্র হওয়া মানেই একটি মানস ভোজ, সাংস্কৃতিক উৎসব।

তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় অধ্যাপক বার বার বাংলা সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত উল্লেখ করতে লাগলেন। মন ভরে উঠল। অসহ আনন্দে কন্ঠরোধ হয়ে যায় যায়। তবুও মনে মনে যাচাই করতে লাগলাম ঃ এর মধ্যে কতটা দরদ আর কতটা ভদ্রতা? কতটা সম্মান, আর কতটা সৌজন্য?

কথায় কথায় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল।

ফ্রান্সের রসিক মহলে সে বছর সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়বস্তু পিকাসো। সেই বছরই পিকাসোর ছবির বিশেষ বিশ্ব প্রদর্শনী হবে আমেরিকাতে। আর আমার নিমন্ত্রণকর্তারই সম্ভবত পিকাসো চিত্রের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

ইয়োরোপের নবজাগরণ রিনায়সেন্সের পাঁচশ বছরের মধ্যে পশ্চিমের

চিত্রকলার সবচেয়ে বিস্ময়কর স্রষ্টা হচ্ছেন পিকাসো।

বহু বিতর্কিত যদিও বিশ্ববন্দিত।

খেতে খেতে খুব গম্ভীরভাবে অধ্যাপক হঠাৎ বলে বসলেন যে পিকাসোর কথায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের কথা মনে পড়ে।

শুনেই মনে যেন একটা হোঁচট খেলাম। উনি ত আগ্রায় ভাষণে বলেছিলেন যে, ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই কবির বিশ্বমুখীনতা যে বঙ্গ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব তা উপলব্ধি করেছেন এবং এই সাহিত্যের মানবতার ইতিহাস তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করেছে।

এখন তা'হলে পিকাসো ও বাংলা সাহিত্যকে এক আসরে তুলে উনি কি বলতে চান? বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরে এত ভাল কথা—সে সবই কি পোশাকী ভদ্রতা? মামুলী বাঁধা বুলি?

অন্ততপক্ষে পিকাসোর শিল্পকলা নিয়ে যত তর্ক ও বিরূপ মতের ঝড় উঠেছে বাংলা সাহিত্যও কি এঁর মতে সেই দরের বস্তু?

আমার জন্য বিশেষ যত্ন করে যোগাড় করে রাঁধা হয়েছিল স্পেনের ওবরজিন অর্থাৎ বাংলা বেগুন। তার রঙ কি আমার মুখে এসে উঠেছে এখন? তার ফ্যাইয়ের মত খটখটে হয়ে উঠেছে কি আমার মন?

তবু বাংলা সাহিত্য ও পিকাসোর চিত্রকলাকে একই আসরে আলোচনার বিষয় বলে সহনীয় মনে করে নিলাম এটুকু স্মরণ করে যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের প্রথম বিশ্বপ্রদর্শনী ও প্রথম আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল এই প্যারিসেই।

নিমন্ত্রণকর্তা এদিকে ছাড়বার পাত্র নন। গলার স্বরে নিজেকে একটুও ধরা না দিয়ে তিনি বললেন,—মঁ শের, প্রিয় বন্ধু মোর, বোধ হয় তুমি পিকাসোর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এই তুলনায় শকড্ হয়ে গেছ। কিন্তু আমরা ফরাসীরা শক্‌ড্ হইনা কিছুতেই। চোখে আগুন আর হাতে তুলি নিয়ে যখন বানে ভেসে আসা পিকাসো প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন আর সামান্য সামান্য বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকতেন তখনো আশ্চর্য হই নি।

স্মরণ করলাম যে ১০০ বছরেরও আগে মাইকেল মধুসূদনও নিঃস্ব অবস্থায় প্যারিসে এসেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষায় প্রথম সনেট সৃষ্টি করেছিলেন। নিজেও বাংলাকে আবিষ্কার করেছিলেন—'মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে' আর পেয়েছিলেন ফরাসী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর প্রতিনমস্কার।

খুব নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে অধ্যাপকের প্রজাপতি ধাঁচের গোঁফজোড়ার দিকে নজর নিক্ষেপ করলাম। প্রজাপতি, না বোলতা কে এখন আত্মপ্রকাশ করবে কে জানে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তার প্রেয়সী আমার ডান পাশে বসেছিলেন। তাঁর দেহ থেকে ভেসে আসা অনুপম ফরাসী সৌরভ আর আমায় আকুল করে তুলছে না।

টেবিলে থরে থরে সাজানো নানা রকমের বেলজিয়ান স্ফটিকের সুরাধার। তাতে ভরা নানা রঙের ওয়াইন। তার কোন্‌টার সঙ্গে রঙে মিলবে আমার রক্তাক্ত হৃদয়?

ব্যাকুল ব্যথিত চিত্তে বার বার নিজেকে বোঝাচ্ছি—

ত্বিষো জহি, ত্বিষো জহি,
হে চন্ডি, হে দুর্গতিনাশিনী,
তুমি হংসাসনা সরস্বতীরূপে সব প্রতিকূল মন্তব্য আর অনুভব দূর করে দাও। ত্বিষো জহি।

এদিকে অধ্যাপক বলে চলেছেন—বিশ্বের বিস্ময় এই প্রতিভা। কিন্তু আঁকবে কাকে? মডেল ভাড়া করবার পয়সা ছিল না। ছিল না হরেক রঙের তুলির ডালা রঙ-বেরঙের ভেল্‌কি দেখাবার জন্য। শুধু মনের টানে তুলির টান বেরিয়ে পড়ত।

গণ্যমান্য সভ্যরা সবাই বিচলিত, সবাই বাক্যহীন। ফরাসী একাডেমির যে সম্মানিত সভ্যটি টেবিলের মাথায় বসেছিলেন তাঁর মুখ ডুবে গেছে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইউনেস্কো অধিবেশনে পঠিত আমার সভাপতির উদ্বোধন ভাষণে। আর আমার বুকে ভূমধ্য সাগরের নীল নিদ্রা করুণতা।

অধ্যাপক বলে চললেন—পিকাসোর তখন রঙ ছিল না, কিন্তু রস ছিল। ষাট বছর আগে তিনি পাঁচ জন সিঁদুরে রঙের সুন্দরীর ছবি আঁকলেন। তার মডেল ছিল না। তাই পেটে ভাত নেই আর মুখে নেই পাউডার এমন মেয়েদের কল্পনা করে নিয়ে ছবি আঁকলেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করে ফেললাম—কি ছবি দাঁড়ালো?

—উত্তর শুনলাম—তার উত্তর দিয়েছেন বিশ্বের চিত্রশিল্প সমঝদাররা। তাঁরা নতুন আবিষ্কার করেছেন পিকাসোর প্রথম সৃষ্টিকে। ঠিক যেমন—যেমন—

আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বন্দুকের গুলীর মত নির্মম পরিহাস

বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে—যেমন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি।

ওটা কি? কোন্ সুরা টলমল করছে অধ্যাপকের হাতের সুরাধারে? সম্রাট নেপোলিয়নের প্রিয় মদিরা ফাইন শ্যাম্পেন ক্যানিয়াক নাকি?

ওই আধারে যাই টলমল করতে থাকুক স্বাচ্ছ ভাষায় তরল সরলতায় তিনি উত্তর দিলেন। আমার প্রচ্ছন্ন, সত্য কথা বলতে কি, প্রায় প্রকাশ্য পরিহাসকে উপেক্ষা করেই উত্তর দিলেন—মর্ম শের ঠিকই ধরতে পেরেছেন। বাংলা সাহিত্যের **যখন প্রথম সৃষ্টি হল তখন** বাঙ্গালী জীবনেও কোন ভাড়াটে মডেল ছিল না। ছিল না কোন চোখ-ধাঁধানো সম্পদ। ছিল শুধু কবির মন আর চোখ। অন্তরের মূলধন। সেটুকু সম্বল নিয়েই রচিত হল সম্ভবত ১২০০-১৩০০ বছর আগেকার প্রথম বাংলা কবিতা।

সোনে ভরতী করুণা নাবি—করুণায় ভরা বাংলা সাহিত্যের সোনার নৌকা। ফরাসী কণ্ঠস্বরে বাংলা আরো মধুর শোনাল।

ততক্ষণে আমার মনে এসেছে সাহস। প্রথম পূজা নিবেদনে সাড়া পেলে যে সাহস আসে তার পরশ। বললাম—পিকাসোর এক কঠোর সমালোচক লিখেছিলেন যে শিল্পী আমাদের পেটল খেতে বলেছেন যাতে আমরা মুখ থেকে থুথুর বদলে আগুন বের করতে পারি।

অধ্যাপকের ঠোঁটের উপর প্রজাপতি যেন রঙীন ডানা মেলে তুলল হাসির মধ্য দিয়ে। তিনি বললেন,—প্রতিভাই হচ্ছে পেটলে ধরানো সেই আগুন।

বলতে বলতে তিনি চোখ বুজে ফেললেন। তারপর পরম স্নেহভরে বললেন—তাগোর ঠিকই বলেছেন ঃ তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে। আহা সে কি আগুন জ্বালা। তাতে যত পুড়ি তত সুখ। ততই ধূপের সৌরভ। আমি ত দুর্গাপূজার পুষ্পাঞ্জলি দেখেছি।

আবেশে নিমীলিত আঁখি কিন্তু প্রস্ফুরিত ভাষায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ আবৃত্তি করে গেলেন—

Tu as allume dans mon coeur
Le feu de la musique

আহা ফরাসী ভাষা যে কত মধুতে ভরা, কত সঙ্গীতে গড়া, কত যাদুতে মোড়া তা কি আগে কখনো জানতাম?

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নিজের মনে আউড়ে গেলাম।

তু য়্যাজালুমে দ্যা মঁ কার
লে ফ্যু দ লা ম্যুজিক্।

তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

আহা!

এদিকে অধ্যাপক অন্য নিমন্ত্রিতদের বোঝাচ্ছেন—বাংলা কবিতা গড়ে তুলবার জন্য মাজাঘষা অভিজাত সফিস্টিকেটেড সুন্দরীদের দরকার হয় নি। ইয়োরোপে আমাদের নাইটর ছিল নায়ক, রাজরাণীরা ছিল নায়িকা। বাংলা সাহিত্যে সাধারণ নর-নারীই ছিল নায়ক-নায়িকা। হাটে বাটে গ্রামে মন্দিরে পাবে তার পরিচয়। আমাদের মত রাজদরবারের প্রতিষ্ঠা বা অস্ত্রশস্ত্রের সজ্জা প্রয়োজন হয় নি।

ফরাসীর মত রসিক দুনিয়াতে হয় না। একজন জিজ্ঞেস করলেন—যা সভ্যতার শ্রীবর্জিত তাকে বিশ্রী বলা যায় না কি? বাংলা সাহিত্যের কি সে সমালোচনা করা যায়?

সঙ্গে সঙ্গে উনি উত্তর দিলেন—অবশ্য নয়। সভ্যতার সফিস্টিকেশন অর্থাৎ ভেজাল যাতে নেই তাকে আমরা এ-যুগে সহজেই বিশ্রী বা মামুলি মনে করি। বাংলা কবিতায় ফুল্লরা বলে একটি মেয়ে আছে। তার মুখে নেই মেক-আপ, মনে নেই ভেজাল। তাকে অনেকে সুন্দর মনে করবে না। কিন্তু আমি বলি যে প্রথমে সব সৃষ্টিই মনে হয় অসুন্দর। রসই তাকে সুন্দর করে তোলে।

এতক্ষণে এই বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মনেও আবার ভোয়ার এসে গেছে। সে আর করে না ভয়, করে না সংশয়।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—আপনার সব কথা বোঝা শক্ত। হয়ত এর পর বলে বসবেন যে এই নবীন সাহিত্য সৃষ্টির পর্যায়ে আপনারা বাঙ্গালীরা তা হলে সাহিত্য সৃষ্টি না করলেই ভাল হয়।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন অন্য অতিথিরা। তাঁরা সমস্বরে বললেন—আমরা ত জানি বাংলা দেশে জন্মায় শুধু কবি আর বিপ্লবী। আপনাদের হাত থেকে বোমা সরিয়ে ফেলা যদি বা সম্ভব, কলম সরাবে এমন সাহস কার?

তাঁর হাতের সুরাধারটি নাচাতে নাচাতে গৃহকর্তা গভীর ভাবে বললেন—সত্যিই ত' সে সাহস হবে কার? এক-কালে পিকাসোকে ওই সব দুর্বোধ্য নয়া ধাঁচের আঁকাবাঁকির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ওঁকে জেলে পুরে রাখা উচিত এমন কথা সমালোচকরা বলেছিল। হাসির সঙ্গে স্মরণে এল যে মাইকেল মধুসূদনও ধারের তাড়ায় ফরাসী জেলে প্রায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হাসির লহরা থেমে গেল। সবারই চোখে উৎসুক জিজ্ঞাসা।

উনি বললেন—পিকাসো উত্তর দিয়েছিলেন, যদি তোমরা আমার তুলি কেড়ে নাও তাহলে নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে ছবি আঁকব। যদি রঙ কেড়ে নাও তাহলে থুথু দিয়ে জেলের দেওয়ালকে শোভিত করে তুলব। শিল্পই যে আমার জীবন।

উৎসুক দৃষ্টিতে আমরা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি ধীরে ধীরে বললেন—আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য সভায় গিয়েছি। পূজামন্ডপে গিয়েছি। বাংলা দেশে রাস্তায় অলিতে গলিতে ঘুরেছি। বুঝেছি যে সবই যদি কেড়ে নেওয়া হয় তবু বাঙ্গালী সাহিত্য সাধনা করবে। পূজা করবে। পূজাও তাদের মানসের একটা প্রকাশ। পরম জীবন। সে জীবন শেষ হবে না কখনো।

আমার সারথি বন্ধু এতক্ষণে মুখ খুললেন—আধুনিক সাহিত্য দেখে মাঝে মাঝে তাকে অসমাপ্ত মনে হয়। যেন শেষ করা হয় নি।

অধ্যাপক উত্তর দিলেন—সত্যিই ত'। শেষ হয়ে যাওয়া ত' ভয়ের কথা। কিন্তু সত্যিকারের শিল্প বা সাহিত্য ত' শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যু হচ্ছে চরম শেষ—কিন্তু পরম পরিণতি নয়। যা সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যায় নি তা-ই ত' জীবন। বাংলা সাহিত্যও শেষ হয়ে যাবে না।

আমি শ্রদ্ধাভরে যোগ দিলাম—যদিও তাগোর নেই।

আমার ডান পাশে বসা মহিলার মনের সৌরভ তার শ্যানেল নং ফাইভের সুরভি-স্রোতকে ছাপিয়ে উঠল। একটি মধুর অনুরোধ তার ডালিম দানার মত সুন্দর দন্তরাজি কৌমুদীর মধ্য দিয়ে রূপ নিল—আমাদের একটি বাংলা কবিতা শোনাও, ডার্লিং।

ডার্লিং, সত্যিই এত ডার্লিং, এত আদরণীয় মনে হচ্ছে এখন আমার অধ্যাপক বন্ধুকে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রকাশ করলেন যে তাঁর হাতের স্ফটিকাধারে টলমল করছে সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রিয় ফাইন শ্যাম্পেন নয়, ফলের রস। সম্ভবত কবিসম্রাট তাগোরের প্রিয় কমলার রস—সূক্ষ্ম নিষ্কাষণের পর। কেন, সেটা আপনারা সবাই বুঝবেন। বাংলা দেশে এখন পূজার ঋতু।

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সবারই হাতে তাঁদের উচ্ছল হৃদয়ের ঝলমল প্রতিফলন। রুদ্ধশ্বাসে এক সঙ্গে ওঁরা তা তুলে

নিলেন। ঘোষণা করলেন—এ টোস্ট টু বেঙ্গলী লিটারেচার।

হ্যাঁ। কয়েকটি সোনার মুহূর্ত পরে ওঁরা পান করলেন বাংলা সাহিত্যের জয়গান। তার আগে অধ্যাপক আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের তিনটি লাইন :

হে অশেষ,
তব হাতে শেষ
ধরে কি অপূর্ব বেশ।

বাংলায় নয়। বাংলারই মত মধুর, মদির ফরাসীতে।

Oh. Infini,
Dans te mains
La fin prend une marvi-
ueuse apparence.
ওহ্ অাঁফিনি
দাঁ তে মাঁ
লা ফাঁ প্রাঁ উন্ মার্ভেয়ুস
য়্যাপারাস।

অপরাহ্ণের সোনালী মায়া আসন্ন মেঘমালায় মিশে অপরূপ একটি চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছে। আমার কল্পনা-বিহ্বল দৃষ্টিকে ঘিরে ঘিরে মেঘমায়া একটু একটু করে দেবীর প্রতিমার রূপ ফুটাতে লাগল। কেমন করে কি যেন হয়ে গেল। আমার স্বপ্ন, আমার চৈতন্য, আমার অবচেতন মনের সাধ।

সেই সোনালী সিঁদুরে জিরানিয়ামের গুচ্ছ এখনো আমার কোটের বাটনহোলে। কমলা নির্যাস হাতে তুলে নিলাম। বিল্বপত্র ত নেই। কিন্তু জিরানিয়াম ফুল আছে। ওই দুটি আমার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে নিয়ে পুষ্পাঞ্জলির মত করে চন্ডীর শ্লোক আবৃত্তি করলাম। মন প্রস্তুত থাকলে প্রার্থনার ত' সময়-অসময় নেই। নেই স্থান-অস্থান।

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং
মাং কুরু,
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো
দেহি, দ্বিষো জহি।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে উঠলেন সকল অতিথি। প্রত্যেকেরই হাতের মুঠি পুষ্পাঞ্জলির ভঙ্গিতে স্তোত্র সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় লীলায়িত হয়ে উঠল।

সেই প্রণতি এতকাল পরেও আমার প্রণতি, আপনার প্রণতি, বসুমতীর প্রণতি।

স্মৃতির উজান বেয়ে দেখলাম যে শুধু ত তাই নয়। সেই প্রণতির সূত্র ত হয়েছিল কৈশোরে। তখন গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথম উপন্যাস পাঠের সূত্র। আমার জীবনে প্রথম পড়া উপন্যাস—আনন্দমঠ। বসুমতীর সুলভ সংস্করণের কল্যাণে।

সেই আনন্দমঠের মাতৃমূর্তি। সেই সময়কার পরাধীন দেশের স্বপনে প্রার্থিতা, গোপনে পূজিতা দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ-ধারিণী শত্রুবিমর্দিনী দুর্গার মূর্তি "মা যা হইবেন।"

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রসাদে আনন্দমঠের এই মাতৃমূর্তির বর্ণনা পড়ে নয়ন খুলে গিয়েছিল। তার ফলেই ত সেই কৈশোরেই মনে মনে গুণগুণ করেছি।

ওগো মা তোমায় দেখে দেখে
আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।

এই মাতৃস্তোত্রের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের রচনাও ত' আমি প্রথম পেয়েছি বসুমতীর সুলভ সংস্করণে।

অন্তরের অসীমতায় মানুষের মূর্তির যে সৃষ্টি, সাহিত্যের স্বর্গলোকে তার যে রূপায়ণ তার নীরব সেবা করেছে বসুমতী, সহজলভ্য করে দিয়েছে তার প্রসাদ।

কিন্তু বসুমতী যা করেছে মূল্য দিয়ে তার হিসাব করা যায় না, মাপ দিয়ে তার পরিমাণ কষা যায় না। শুধু সাহিত্যে নয়, সংবাদ পরিবেশনেও। ভারতের সব দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বসুমতীই সর্বপ্রথম বিশ্ব সংবাদ সংস্থা রয়টার ও য়্যাসোসিয়েটেড প্রেসের গ্রাহক হয়। বহু পত্রিকার আগে রোটারী মুদ্রণযন্ত্র জার্মানী থেকে আমদানী করে।

এবং স্বাধীনতার নীতি ও মতবাদ প্রচার করার জন্য বার বার রাজরোষে পতিত ও নির্যাতিত হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের কার্যকরী মন্ত্রিসভা অর্থাৎ এক-জিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য থাকা সত্ত্বেও আইনমন্ত্রী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ব্রিটিশ গভর্ণর স্যার জন এন্ডারসনকে জানিয়ে দেন যে, "বসুমতীর মত মর্যাদার পত্রিকাকে আপনি বন্ধ করে দিতে পারেন না।"

হ্যাঁ, নতমস্তকে স্বীকার করতে হবে যে তবুও বসুমতী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে সব কারণেই হোক, সুখের বিষয় সে-গুলি এখন অতীতের কথা। বিস্মৃতির গর্ভে তাদের সমাধি হোক।

একদিন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রধান অবদান সৎসাহিত্য প্রকাশের পথে অনটন আর আয়োজনের অভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতাকে আশীর্বাদ করে-ছিলেন—

"তোর দরজা বড় হবে।"

সেই দরজা সাময়িকভাবে মাত্র বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুরের আশীর্বাদ ত' ব্যর্থ হতে পারে না। তাই আবার খুলেছে। শারদীয়া এই সংখ্যাও তারই জয়যাত্রা।

সেই সময় বিশ্ববিজেতা বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বসুমতীর মূলমন্ত্র রচনা করে দিয়েছিলেন—"নমো নারায়ণায়"। সেই মন্ত্র ত' অমর, অনির্বাণ। নবপর্যায়ে সৃষ্ট বসুমতীতে আমরা সেই অভয় মন্ত্রকেই ফিরে পেয়েছি।

এখনো আমাদের অর্থ সামর্থ্য সীমিত, কর্মসূচীও পরিমিত। তবু আমাদের আছে বুকে বল, মুখে হাসি, মনে সাহস। যে আলো বসুমতী জ্বালিয়েছে সেই আলোক-বর্তিকা নিয়ে আমরা অবিচলভাবে এগিয়ে যাব।

সেই লক্ষ্যপথে আমরা সাহিত্যের আসরে, সংবাদের বাসরে, পাঠকের দরবারে পূজারতির জন্য উপস্থিত হয়েছি। সুলভে দুর্লভ সৎসাহিত্য ও সত্য সংবাদ উপহার হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। সেই সাধনাই আজ আমাদের প্রণতি ও প্রতিশ্রুতি।

দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী

ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গোৎসবের যে চিত্র এঁকেছেন, তারপর কিছু লেখা বিড়ম্বনা। তবু বহু যুগের ওপার হতে স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরাল মন্থন করে একটি দীপান্বিতা রাত্রির কথা মনে আসছে—মহাষ্টমী-মহানবমীর সন্ধিক্ষণ—দেবীর পূজা হচ্ছে, সন্ধিপূজা মধ্যরাত্রে—মা, মা, শব্দে আকাশ-বাতাস কম্পিত—কাঁসর-ঘণ্টা, কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল বাজছে, নাচছে চুলির দল—মন্ত্রপাঠ হচ্ছে একটানা—

দেবি, প্রপন্নার্তিহরে, প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ কৃৎস্নমেতদ্ধারয়ে
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া
দেবি ত্বমাদ্যাং অহং বৃণুতে—

ধূপধুনা গন্ধ, নৈবেদ্যের সম্ভার—আমরা বালকের দল ষাট-সত্তর বছর আগের কথা—কে যেন বলেছিল, সত্যিই দেবীর আবির্ভাব হয় ঐ সন্ধিক্ষণে—বাজাও ডংক, দূর হোক্ শংকা—আকাশপথ বেয়ে মহাশক্তি, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি নামুন এই ক্লান্তশ্রান্ত ধরণীর এক অচেনা কোণে, রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে—উমা আমার ঘরে এলো—এই আগমনীর গান যে শুনিয়েছে সেদিন—হিমবৎকন্যা আসছেন সপরিবারে, সালঙ্কারে সগৌরবে—তিনটি মহাদিন তিনি অতিবাহিত করবেন পিতৃগৃহে ভক্তদের সাথে, আচণ্ডাল সকলের পূজা উপচার গ্রহণ করে সার্থক করবেন সকলকে।

এই আশায় তখন আশ্বাস ছিল, বিশ্বাস ছিল, গভীরতা ছিল, মমতা ছিল, তন্ময়তা ছিল—আমাদের পূজো—বাঙ্গালীর পূজো—শারদোৎসব—শুধু পূজা নয়, উৎসব—সর্বজনীন, সর্বকালীন, সমকালীন। বিশ্বরমার স্পর্শ পড়েছে—

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে
দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া
কাঙালিনী মেয়ে

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব দুটি লাইন আজকে মনে করিয়ে দেবে 'হ্যাভস আর হ্যাভ-নটস'দের—যাদের আছে, যাদের নেই, স্মরণে আনিয়ে দেবে "ক্লাশ-কনসাসনেস"কে জাত্যাভিমান না হোক, ধনাভিমানকে—

কে বলবে—এবার ফিরাও মোরে—

অন্নপূর্ণা—অন্ন চাই যে এই নিরন্ন দেশে, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই স্বাস্থ্য, চাই বল, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু—সাহসবিস্তৃতবক্ষপট, কোথায় সেই বিশ্বাসের ছবি—শুধুই মুখস্থ করা পাখী-পড়ার মত বলবো সপ্তশতী থেকে যে মা তুমি—

যচ্চ কিঞ্চিৎ-ক্বচিদ্ বস্তু সদাসদ্বাখিলাত্মিকে
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ, সা ত্বম্ কিং
স্তূয়সে তদা?

জগতে যা কিছু আছে সবই তুমি—সৎ-ই হোক, অসৎ-ই হোক—সকলেরই শক্তি তুমি, প্রাইমরডিয়াল এনার্জি—প্রাইমারাল ক্রিয়েটিভিটি—তুমিই বড়, তুমিই ছোট, ব্রহ্মময়ী তারা তুমি—বৃহত্ত্বাৎ বৃহনত্বাচ্চ—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপ্ত যে শক্তি তাকেই ত বলি ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ও কালী তাই ত অভেদ করেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—বিজ্ঞান ও ধর্মের চরম চূড়ান্তে গিয়ে নিজের উপলব্ধি-স্নিগ্ধ সিদ্ধান্তে। শ্রীঅরবিন্দও এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন—তাঁর "ভবানীমন্দির" পুস্তিকায় লিখলেন—চেয়ে দেখ সর্বভূতে শক্তিরূপেই তিনি অবস্থিতা.....ভক্তি ইজ দ্য লিপিং ফ্লেম, শক্তি ইজ দ্য ফুয়েল—ভক্তি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা, শক্তি হচ্ছে তার ইন্ধন। সেই জন্যই তিনি চেয়েছিলেন ভারতের নবজাগৃতি, সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য। মায়ের মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন তিনি, তবে তা শুধু বাইরে নয়, শুধু সাহিত্যের মন্ত্রগুঞ্জ স্তরে নয়, অন্তরাত্মার পরম প্রকাশরূপে ও পূর্ণযোগের মাধ্যমে। সৃষ্টির পরিণাম এই চৈতন্যের মূর্ত্তির অভিব্যক্তিতে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই শারদীয়া আগমনী প্রকৃতি, আনন্দ সৌন্দর্যকে ঘনীভূত করে দেশের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 'মা' করে দিয়েছে—

আজকে তোমার মধুর মূরতি হেরিনু
শারদ প্রভাতে

বাংলার মাটি, বাংলার জল ধন্য হয়েছে, পুণ্য হয়েছে এই স্পর্শে—মা মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, সিংহস্থা মরকতবর্ণা অতসীপুষ্প-বর্ণাভা, দশভূজা হয়ে হয়তো কবিকে দর্শন দেন নি, তিনি এসেছেন বাক্‌রূপে, আদর্শরূপে, কল্পনারূপে, ছন্দে, গানে, রসে, গাথায়, কথায়, কাহিনীতে—

মাতৃহারা যদি মা না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব? মনে পড়ছে নিজেদের পরিবার, বাৎসরিক শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা যা বাংলার নিজস্ব। পূজোর উৎসব প্রাঙ্গণ জাঁকিয়ে বসে থাকতেন আমার পিতামহ, শুভ্রকেশ, বর্ষীয়ান, গলায় দুলতো সাদা ধপধপে পৈতে। অতিথি-অভ্যাগতকে ডেকে নাতির আবৃত্তি শোনানো তাঁর ছিল এক প্রশ্রয় দান। সেবার কিন্তু গড়গড়িয়ে আবৃত্তি করলাম—আনন্দময়ীর আগমনে....। দেখলাম প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল ঠাকুর্দা মহাশয় পর্যন্ত বেশ বিচলিত হলেন—ভারী চমৎকার, কার লেখা?.....কাছেই ছিলেন আমার পিতা, স্বদেশীযুগের ইয়ং বেঙ্গল, আমিই তাঁর প্রথমজাত। তাঁরা তখন দ্বিজেন্দ্রগীতি ও

রবাইট নিয়ে ব্যস্ত, বললেন—রবি ঠাকুরের লেখা.....

ও, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে—

মহর্ষি কিন্তু তখন প্রয়াত।

তখন স্বদেশী যুগ পেরিয়েছে। সারা ভারতবর্ষ না হোক, সারা বাংলাদেশ জুড়ে—রবীন্দ্রনাথের নাম ঘরে ঘরে। কে না শুনেছে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে"। তবুও তখনো তাঁর কাছে তিনি পিতৃনামে মধ্যম। রাখিবন্ধন, অরন্ধন, বন্দেমাতরম তখন তুঙ্গী।

সেই আলো-আঁধারির আবরণের চেতনায় আমার বালকমন শুধু সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথায় অভিমানিনী কঙ্কাবতীর ব্যথায় কল্পনায় উধাও হতো না, হাতে পড়েছিল কথা ও কাহিনী, অন্য কিছু বই। শুধু গানেই শুনতাম না "আয় ভুবনমনমোহিনী" "জনকজননী জননী"। কাশীর মহিষী করুণা স্নানে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা বরুণায় —কী কৌতুকই কৌতুকময়ী করলেন, কতটুকু ক্ষতি হোল তাঁর প্রজাদের। অনাথাপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগিতেছেন, মহাভিক্ষুকের সাধ কে পুরাইবে। মৈত্রমশাই সাগরসংগমে তীর্থস্নানে যাবেন মোক্ষলাভের আশায়। মোক্ষদা হোল সঙ্গী, সঙ্গ নিলো মাসীর আদরে মানুষ রাখাল, মায়ের রেগে বলা "চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে" যখন সত্যি হোল তখন দেবতার গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য "ফিরায়ে আনিব তোরে" বলে মৈত্র মশায়ের জলে ঝাঁপ বালকের স্বপ্নে ধ্যানের টুকরায় আঁকা রইলো চিরকালের জন্য। আবার ওদিকে হোরী খেলছে হাজার মজপুতানী, পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে জেগে উঠছে শিখ, বান্দা বন্দী হচ্ছে তুরাণী সেনার করে "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"। আর এদিকে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীর তলেতে একদা ছিলেন সুপ্ত, নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদমত্তা, অঙ্গে আঁচল সুনীলবরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ; সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা। সন্ন্যাসী তখন তাঁকে বলেছিলেন, যে অভিসারে যাচ্ছ, যাও, — সময় যখন হইবে তখন যাইব তোমার কুঞ্জে। সে সময় এসেছিল, যখন মারীগুটিকায় ভরে গেছে অঙ্গ—সন্ন্যাসী চলেছেন অভিসারে—

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে
চৈত্রসন্ধ্যা
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা

আর মনে পড়ছে কবির উপাধিত্যাগের পত্র—সে কী উত্তেজনা ছাত্রমহলে, আজও গা শির্‌শির্ করে ওঠে—দ্য টাইম হ্যাজ কাম হোয়েন ব্যাজেস অফ অনার মেক আওয়ার শেম গ্লেয়ারিং ইন দেয়ার হনকনক্লাস কনটেক্সট অফ হিউমিলিয়েশান। ভানুসিংহের পত্রাবলীতে সেই কথাই লিখেছিলেন তিনি—বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই ভারের উপর আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি না, তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

দুর্গাপূজার কথা লিখতে গিয়ে কেন ধান ভানতে শিবের গীত তার একটা সুষ্ঠু কৈফিয়ৎ না দিলে সাহিত্যিকমহলে ধিক্কার উঠবে যে কী লিখতে কি লিখলো—কোথায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর শ্লোক, শিবাত্মভূতা মহাশক্তির কথা, চিৎ ও আচিৎ শক্তির সম্মেলনে তা নয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য নিয়ে ছেলেমানুষের মত নাড়াচাড়া, যিনি প্রতিমা-পূজক ছিলেন না। তাঁর কথাতেই উপমাতেই উত্তর দিই "আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মেলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দের কাব্য রচনা করে। ছেলেদের যে আনন্দ সেইটাই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব করে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড় বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে সেই তো ভাবুক। তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয় কিন্তু ভাবগোচর, তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতে পারে না, কিন্তু এইরকম উৎসবের সময় ভাবাভ্রান্ত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে।"

এই তো কবির পূজার তাৎপর্য।

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা
বাজি
পূজার সময় এল কাছে
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই
আনন্দে দু-হাত তুলে নাচে।

আজ আর সেই আনন্দ নেই—বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সংসারে ভাদ্রনদীর ভরা স্রোত কোনদিনই ছিল না, তবু এতো অভাব-অনটন নিরানন্দের একটানা ঢল নামেনি, দুঃখকষ্ট তিক্ততা রিক্ততার মধ্যেও আসতো উৎসব, উদ্দীপনা, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস। সাধ্যমত দীয়তাং ভুজ্যতাং, একের কাজ পাঁচজনে করতো, পাঁচজনকে নিয়েই ছিল গৃহস্থের সংসার। সমাজজীবনে বাঁধন ছিল, নিষ্ঠা ছিল, সংযম ছিল, সংহতি ছিল, যদিও দলাদলির অন্ত ছিল না, হলাহলও ফুটতো, তবু এতটা মুখ বেঁকিয়ে নয়, এতটা ট্যাঁক খালি করে নয়, একটা অনুদার আত্মসর্বস্ব মনোভঙ্গী নিয়ে নয়। আজ শুধু সমাজ ভাঙেনি, ঘর ভাঙেনি, মনও ভেঙেছে, যে মন গড়তো, যে মন নড়তো, যে মন আশ্রয় দিত নিরাশ্রয় আত্মীয়দের, পক্ষপুটে রাখতো অসহায়দের শুনতো সন্ধ্যেবেলায় স্তিমিত প্রদীপের নীচে কথকঠাকুরের কাছে ধ্রুব প্রহ্লাদের কাহিনী, কর্ণের মদায়ত্ত পৌরুষের গল্প, ভক্তিগদগদ নম্রনতচিত্তে।

আজ মহামেধা মহাস্মৃতির বদলে পাচ্ছি মহাবিস্মৃতিকে

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা—

সেই 'তনহা' দেবীকে—অন্নরিক্তা তিনি ভীষণা—কোথায় সেই অন্নপূর্ণা সদাপূর্ণা, হয়নি মহালক্ষ্মীর অভিষেক, ভাণ্ডার হয়েছে শূন্য, হয়নি মহাসরস্বতীর আবির্ভাব, কোথায় সেই "তনয়ে তার তারিণী" যিনি তারা নীল সরস্বতী একজটা—কোথায় আমার বলবীর্য শৌর্য—কার্তিকেয় কই, যিনি ষড়মাতৃকার দ্বারা পুষ্ট সুব্রহ্মণ্য মুরুগেশন —কোথায় সেই গণদেবতা—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে
প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে

সবান্ধব সবাহন সপরিবার উমা হৈমবতী আসেন নি। আসেন নি অলক্ষ্যে সেই বোমভোলা পঞ্চানন, নবমীর রাত্রি গত হলেই যিনি নিয়ে যাবেন দেবীকে কৈলাসে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি আমরা—মন্ত্রপাঠ শুধু—উচ্চারণেই ব্যর্থ—প্রাণের সম্ভাতে জাগে নি, বিজয়োৎসব করবো কার? খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, আচ্ছাদন নেই, আশ্রয় নেই, ঔষধ নেই, মূল্যহীন প্রাণ, দুর্মূল্য দ্রব্য-সম্ভার, মজুতদার, কালোবাজারী, ঘুষখোরের ভৈরব আরাবে স্বয়ং ভৈরবই শক্তিহীন, ভিক্ষুক ভোলানাথ.....

শঙ্কর কহেন, শুন, শুনহ শঙ্করি
ক্ষুধায় কাঁপহে অঙ্গ বল কি করি
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই—

উৎসবের অর্থই সকলকে নিয়ে আনন্দ করা, সকলকে স্মরণ করা। আশ্চর্য এই মাতৃপূজার লগ্নটি বাংলাদেশে যখন আসে —ব্রতপক্ষ, অপর পক্ষ পেরিয়ে মহালয়ার দিনে তর্পণ সেরে তবে আমরা দেবীপক্ষে পৌঁছই, যার শেষ মহালক্ষ্মীর পূজায়, শারদ চান্দ্রমার পূর্ণ পূর্ণিমার লগ্নে। ব্রতপক্ষ আমাদের তৈয়ারী করে, মনকে মন্ত্রের দিকে টানে, দানে, ধ্যানে, ব্রাহ্মণ ভোজনে —কোথায় দুর্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্ত-চতুর্দশী—প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ। তারপর আসে পিতৃপক্ষ, শুধু পূর্বপুরুষদের স্মরণ নয়, শুধু ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্র প্রজাপতিকে মনন নয়, সনক, সনন্দ সনাতন কপিলো

আসুরী পঞ্চশিখকে নয়, মারীচ অত্রি পুলস্ত্য ভৃগু নারদ প্রচেতাকে নয়, যমকে নয়, ভীষ্মকে নয়, রামলক্ষ্মণকে নয়—অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসীনাং যাঁরা তাঁদেরও স্মরণ করি—

আব্রহ্মস্তম্ভপর্যন্ত তং জগৎ তৃপ্ত হোক আমার স্মরণে মননে তোয়তর্পণে—এ আমার কর্তব্য—শুধু কি তাই—চেতনা কোন বিশাল রাজ্যে পৌঁছেছে—কৃমিরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ পশুপক্ষী গাছ তাদেরও যেন আমার এই বিশ্বচেতনার বৃহৎ দর্পণ ও তর্পণ থেকে বাদ না যায়, আরো বড় কথা নিরাহারাশ্চ যে জীবা পাপেধর্মে রতাশ্চ যে তাঁদেরও—মানুষের মনকে প্রসারিত করে দেবার এই এক অদ্ভুত উপায় বের করেছিলেন আমাদেরই পিতৃপুরুষেরা—শুধু অং রং খং, "ম্যাজিক, রিচুয়াল, মিস্ট্রী" নয়—জীব আর শিব যে অপর নয়—এই চেতনায় স্নাত না হলে, এই গঙ্গোত্রীধারায় অভিষিক্ত না হলে, বিশ্বজননীর পূজার অধিকার আমার জন্মায় না—যা দেবী সর্বভূতেষু—আমরা পড়ি—দ্য গ্রেটনেস অফ এ ম্যান ইজ দ্য গ্রেটনেস অফ হিজ গ্রেটেস্ট মোমেন্ট (নর্মাল এঞ্জেল—পাবলিক মাইন্ড)। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাত্রা হচ্ছে মানুষের মনের অলিগলির মধ্য দিয়ে নয়—চেতনার পাকা বড় রাস্তা দিয়েও—মায়ের রথযাত্রা তো জগন্নাথেরই রথযাত্রা

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগযুগ ধাবিত যাত্রী
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা.....

সেই ভারতভাগ্যবিধাতা বা বিধাত্রীরই জয়গান যেন আমরা শারদীয়া উৎসবে গাইতে পারি—চরৈবেতি যার মন্ত্র—প্রাচীনকে বাদ দিয়ে নয়, সঙ্গে নিয়ে যুগযুগান্ত ধরে যে ক্রমাভিব্যক্তির ধারা চলেছে তাকে শুধু "ক্লাইসিস" "রভলিউশান"ই বলা যায় না, "কোয়ান্টিটেটিভ" ও "কোয়ালিটেটিভ"ও নয়, এবং সব কিছুই অস্তিবাদীর "এ্যালিনেশান" বা বিচ্ছিন্নতাবোধপ্রসূত নয়।

কবি সুকান্তের কথাতেই বলবো
বন্ধু, আজকে আঘাত দিয়ো না তোমাদের দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ কর শুধু সূর্যোদয়ের পথে।
এখনও যে বিশ্বমানবের পানীয়শালা এক হয়নি, অন্নভাগ সমান হয়নি
সমানী প্রপা সহ বোহান্নভাগঃ

কোন্ অতীতকালে কত হাজার বৎসর পূর্বে রাবণ বধকে কেন্দ্র করে কোন্ ত্রেতাযুগে কোন্ পুরাণপুরুষ প্রাণাত্মা রাম দেবীর, মহাশক্তির, মহামায়ার অর্চনা করে বলেছিলেন, আয়াহি বরদে দেবি—আমরাও সেই ঐতিহ্যকে, কাহিনীকে (লিজেন্ড) প্রতীক (সিম্বল) করে নিয়ে করজোড়ে বলছি, শ্রদ্ধায় হোক, অশ্রদ্ধায় হোক, বিশ্বাসে হোক, অবিশ্বাসে হোক (তারও মূল্য আছে)—দাও দাও, আমি রিক্ত, আমি তপ্ত, আমি তপ্ত; আমি ধূর্ত, আমি ভণ্ড, আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, দেশ, সমাজ, পরিবার-গোষ্ঠী, রাষ্ট্রের উত্তেজনায় উত্তেজিত, উদ্বেলিত, উচ্চকিত, যদিও আমি আসলে রুগ্ন ও ভগ্ন, আমি দুরাচারী, কামাচারী, ব্যভিচারী, অনাচারী, অত্যাচারী, তবু বলবো—মা তুমি পরমা, সেই শক্তি, যার ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ দেখেছ আমরা সুপ্রাকসামিক এনার্জি কল্পনায় ল্যাবোরেটরীতে ধ্যানে বসি, জ্ঞানে জানি, চেতনায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করি—আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি মে, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি—শত্রুবিনাশিনী—শত্রু বিনাশ করো—সবচেয়ে বড়ো শত্রু যে আমার ভিতরে, অন্তরের অন্তঃপুরে। রাজা সুরথকে, বৈশ্য সমাধিকে মেধস ঋষি আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে প্রতীকরূপে মহিষাসুরমর্দিনী ত তুমিই, শুম্ভনিশুম্ভ বিনাশ করেছো তুমি—কেবলই বলবো দেহি-দেহি—এমন কি—ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীং সেটাও কি তোমার কাজ? —কেবলি চাওয়া আর পাওয়া—"হওয়া"টা হবে কবে? এই প্রশ্নই আজ তোমার কাছে—

মহাসম্পদ তোমারে লভিব, সব সম্পদ খোয়ায়ে
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে

কেন বলব না সমবেত কণ্ঠে সেই মাতৃরূপা সংঘশক্তির কাছে, —আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোল শ্রী, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় দেবত্বের বিভূতি, বিবেকানন্দের কথায়—মানুষ কর মা—আমরা যে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত—চাই "ম্যানমেকিং রিলিজিয়ান" "ম্যানমেকিং এডুকেশান"। উৎসারণের প্রতিরূপ উৎশিখ হোক তপোবীর্য—বিঘ্নবিদীর্ণ হোক সব আবরণ—জড় তো প্রাণেরই কঞ্চুক, প্রাণ—চেতনার—মৃৎশক্তির মধ্যেই চিৎশক্তি সংবৃত—মৃন্ময়ীই তাই চিন্ময়ী, সর্বভূতা সনাতনী। তিনি যে অতি সৌম্যা, আবার অতি রৌদ্রা—

দুর্গায়ৈ দুর্গপরায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেবৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শুধু বিষ্ণু (অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে প্রবিষ্ট) মায়াই নন, সর্বরূপেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতাও বটে—

ত্বম স্বাহা, ত্বম স্বধা ত্বম্ হি বষট্কার স্বরাত্মিকা—তত্ত্বকথা থাক, শুধু এইটুকু কামনা সেই মহাশক্তির কাছে—আমাদের প্রণাম সত্য হোক—শুধু নিজের জীবনে নয়, পারিবারিক জীবনে নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রিক জীবনে, পৃথিবী ধন্য হোক, পুণ্য হোক—শ্রদ্ধায়, শান্তিতে, ভালবাসায়, প্রেমে, অহিংসায়। ব্যক্তগত জীবনে বড়জোর বলতে পারি—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি
ভুঙ্‌তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণং

দেবে আর নেবে, গোপন কথাটি বলবে, শুনবে, খাওয়াবে—এই তো প্রীতির লক্ষণ

Laugh and the world laughs with you
Weep and you weep alone
For the sad old earth borrows its mirth
But has troubles enough for its own

বৃহদারণ্যকের ঋষির কথাতেই শেষ করি

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তৎ
পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহতেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি

দেখা দাও, দেখা দাও, এই তো মানুষের চিরন্তনী কান্না। শুধু দেখা নয়, সত্যিকারের বুঝতে দাও, বুঝিয়ে দাও তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, উন্মুক্ত করো সেই আবরণ

সরিয়ে দাও এই দেহ, এই আচ্ছাদন

তোমার তেজোময় অংগের সূক্ষ্ম অগ্নিকণার পেছনে যে কল্যাণতম রূপ তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।

সমস্ত হোক মধুময়, আনন্দময়, দীপ্তিময়—আকাশ-বাতাস, ভুবন, মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতংগ সবই মধুময়—পৃথিবী পাক শান্তি, অন্তরীক্ষ পাক শান্তি আর আমি যেন—

ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি—সত্যকথা বলবো আমি, তবেই ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

রবীন্দ্রনাথের তিনখানি অমূল্য পত্র ঃ গগনেন্দ্রনাথকে লেখা

গগনেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে শ্রীযুক্তা সুজাতা (হাসি) মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া

Vasanthamahal
Mysore

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র আজ পাওয়া গেল। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করেছ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করতে পারলুম না। সেইজন্যে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হবার জন্যে চেষ্টাও করিনি। কিন্তু আশীর্ব্বাদের গতিবিধির পথে বাধা নেই। তাই আমার আশীর্ব্বাদ ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁচেছে তার কোনো ভুল নেই। হাসির জন্যে একখণ্ড মৈসুরী সাড়ী পাঠিয়েছিলুম সেটা কি ঠিক সময়ে পেয়েচ? জিনিসটা মন্দ নয়—যতগুলো কাপড় এনেছিল ঐটেই সব চেয়ে ভাল।

মৈসুর জায়গাটা বড় চমৎকার লাগছে। ভারতবর্ষে যত দেশ ঘুরেচি এমন গভীর তৃপ্তি কোথাও পাইনি। এখানকার লোকেরা আমাকে নিয়ে কি যে করবে ভেবে পাচ্চে না। মালা যা পেয়েছি যদি পাঠাতে পারতুম তাহলে হাসির ফুল-শয্যায় ফুলের পর্ব্বত তৈরী হতে পারত। একটা আমার মস্ত আনন্দ এই যে এখানে কিছু কাজ করে যেতে পারব।

ফিরে গিয়ে সব কথাবার্ত্তা হবে।

তোমাদের ত কোথাও নড়ানো যায় না —এ অঞ্চলে যদি আসতে তাহলে খুসি হয়ে যেতে পারতে। ইতি

৯ মাঘ ১৩২৫
রবিকাকা

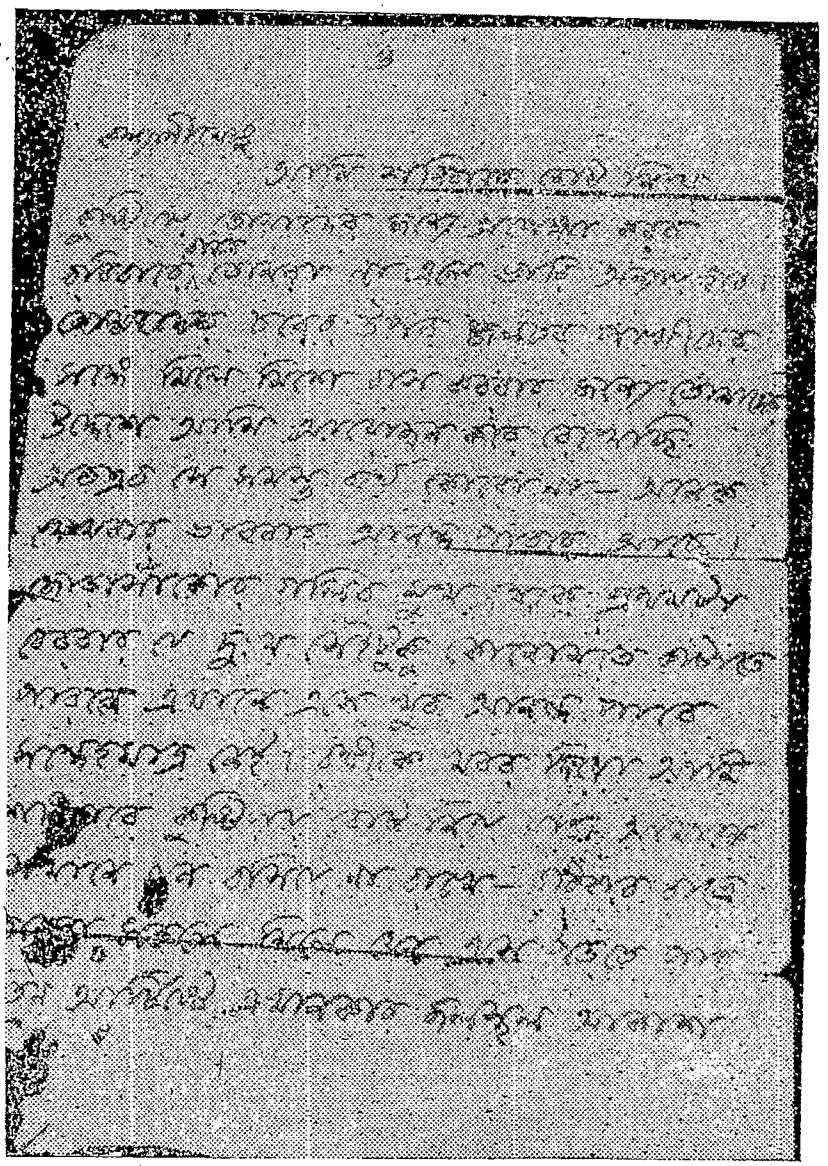

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

গগন—Thackerদের ওখানে সেই A Modern Humanist বইটার সন্ধান নিয়েছ?

যদি ওটা থাকে ত আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বোলো। From the Bottom Up নামক বইটি পড়ে ভারি উপকার বোধ করেছি—ওটা দেখেছ কি?

তোমার এবারকার নাটকগুলো যা সঙ্গে এনেছিলুম তেমন সুবিধা ঠেকল না। বিশ্রী বাদলা পড়েছে। এসে অবধি একদিনো শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তিটি দেখতে পাইনি। এই মেঘ বাদলাটা কেটে গেলে বোধহয় যবনিকা উঠে যাবে।

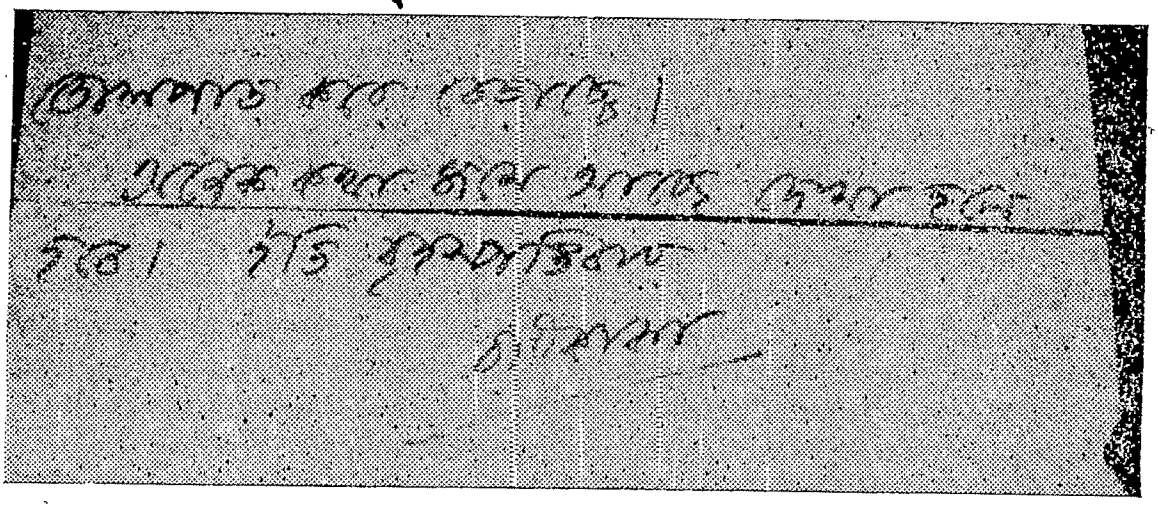

তোমাদের ওখানেও কি এইরকম চল্‌চে? টেলিফোনযোগে থ্যাকরদের আমার নতুন ঠিকানাটা দিয়ো—কোনো আমার পূর্ব্বেকার অর্ডার দেওয়া কোনো বই যদি এসে থাকে তাহলে মাসখানেক পর্য্যন্ত বোলপুরে না পাঠিয়ে এইখানেই যেন পাঠিয়ে দেয়।

এখানকার ঠিকানাটা হচ্চে—

Shilida,
Nadia)

নদিয়াটা Important—কারণ নদিয়ার বাইরে অন্য শিলাইদা আছে।

সঙ্গে দু চারটে বই যা ছিল ফুরিয়ে গেছে—ভালই হয়েছে এখন নিজের ভিতরকার resource-এই দিন চালাতে হবে। সময় হাতে থাকলেই বই পড়ে সেটা নষ্ট করবার অভ্যাসটা ছাড়াতে হচ্চে।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি

২৯শে আশ্বিন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমি শনিবারে বোট নিয়ে কুষ্টিয়ায় তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব রবিবারে রাত্রে তোমরা না এলে ভারি অন্যায় হবে। চরের উপর জলচর পাখীদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করবার জন্যে তোমাদের উদ্দেশে আমি আয়োজন করে রেখেছি অতএব সে সমস্ত ব্যর্থ কোরো না—অনেক দেখবার ভাববার আনন্দ পাবার আছে। জোড়াসাঁকোর গলির মুখ থেকে প্রথমটা বেরবার যে দুঃখ সেইটুকু কোনো-মতে কাটাতে পারলে এখানে এসে খুব আনন্দ পাবে সন্দেহমাত্র নেই। রথীকে খবর দিয়ো আমি শনিবারে কুষ্টিয়ায় বোট নিয়ে যাব আমাকে সেখানে যেন বসিয়ে না রাখে রবিবার রাত্রে তোমরা সকলে মিলে যেন এসে পড়তে পার। তিন আর্টিস্টে এখানকার জলস্থল আকাশ তোলপাড় করে বেড়াচ্চে।

অনেক কথা জমে আছে দেখা হলে হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

রবিকাকা

লৌহকপাটের বাইরে

আর মাত্র মাসখানেক বাকী। তার পরেই আমার 'মসনদের' মেয়াদ শেষ। সেন্ট্রাল জেলের বিশাল লৌহতোরণ খুলে ধরে শেষবারের মত বুটে বুট ঠুকে সেলাম জানাবে গেট-সেন্ট্রী। তারপর সেই ভারী পাল্লা দুটো আমার পিছনে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

লাইফ সেণ্টেন্স্ অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে যারা আসে তাদের চেয়ে অনেক বেশী দীর্ঘ আমার এই কারাবাস। তাদের মত আমিও বন্দী। তাদের চারদিক ঘিরে ইঁটের বা পাথরের পাঁচিল, আমার আইন ও শৃঙ্খলার। তার সঙ্গে চাকরি নামক বন্ধন। স্বাধীন সত্তা বা বিবেক নামক বস্তু মাথা তুলতে চাইলেই সেই ভারী শিকলে টান পড়েছে। সে যন্ত্রণা নিঃশব্দে সয়ে গেছি।

সেদিন কাগজপত্র সই করিয়ে নেবার পরেও দাঁড়িয়ে আছেন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন?

—আপনার বাড়ি তো স্যর, শেষ হয়ে এল। এখনই একটা ফোনের দরখাস্ত করে দিলে ভাল হয়।

একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, ফোন কী হবে?

—ফোন আপনার দাগবে স্যর। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবই তো প্রায় কোলকাতায়। তাছাড়া চাকরি থেকে না হয় রিটায়ার করছেন, লেখা তো ছাড়তে পারবেন না। বরং ওদিকেই এবার বেশী নজর দেবার সময় হবে। দশ জায়গায় ডাক পড়বে। কাগজওয়ালারা আছে, পাব্লিশার আছে। ফোন না হলে চলে?

ঐ পাঁচ হাজারও বাড়তে থাকবে।

আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই বড়বাবু ক্যাশবুক ইত্যাদি নিয়ে রওনা দিলেন এবং যেতে যেতে বললেন, আমি এখনই একটা ড্রাফ্ট করে নিয়ে আসছি।

—ড্রাফ্ট কেন, একেবারে টাইপ করিয়ে দিয়ে আসুন।

—কিন্তু আমি কি স্যর সব পয়েন্টগুলো গুছিয়ে লিখতে পারবো? আপনি একবার দেখে দিলে—

—কিছু দরকার নেই।

হেডক্লার্ক বুঝলেন, কথাটা মিথ্যাও নয়, আমি এটাকে নেহাত পণ্ডশ্রম বলে মনে করছি। উনি না জানলেও আমি জানি, অনেক বৃহৎ ব্যক্তি বছরের পর বছর অপেক্ষমাণ তালিকায় পড়ে আছেন তদ্বিরের জোর থাকা সত্ত্বেও। আমার তো সে গুড়েও বালি।

কিন্তু সংসারে অত্যাশ্চর্য অসম্ভব ঘটনা কি ঘটে না, অন্তত আমার বেলায় ঘটল। কেমন করে—নিছক দৈবানুগ্রহে, না কোন সদাশয় ব্যক্তির দাক্ষিণ্যে, আনুকূল্যে কিংবা বিশেষ বিবেচনায়, আমি আজও জানি না। মাস দেড়েকের মধ্যেই চিঠি এল, একটি আউট-অফ-টার্ণ টেলিফোন আমার জন্যে মঞ্জুর করেছেন কর্তৃপক্ষ।

এ গেল একটা দিক। জীবিকার প্রয়োজনে বোধহয় সব চাকরিজীবীকেই এমনি অনেক কিছু সইতে হয়, অনেক কিছু হারাতে হয়। সেজন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, বিশেষ করে যখন আর একটা দিকের কথা ভাবি। পাওয়ার দিক। তাকেও ছোট করে দেখা চলে না। সমাজ-জীবনের যে অংশটা কালো, যে মানুষগুলোকে বলা হয় অন্ধকারের জীব, এখানে এসেছিলাম বলেই না তাদের দেখা পেলাম, জানতে পেলাম কত বিচিত্র গহন মনের অলিগলির খবর।

সে কথা আজ থাক। যা বলতে এসেছি তাই বরং শুরু করে দিই।

আমার হেডক্লার্ক, যেমন সাধারণত অন্য পাঁচটা অফিসেও দেখা যায়, বেশ চৌকস লোক। বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় পাকা। অফিস-সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও মাঝে মাঝে আমাকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো আমার কাজে লাগে।

একটু থেমে বললেন, আরো একটা বড় কারণ আছে।

আমি চোখ তুললাম। বড়বাবু যোগ করলেন, চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাস নিয়ে কাটাতে হয়েছে এতদিন। চাকরির খাতিরে কখনো কখনো বেশ শক্ত হাতে 'ডিল' করতে হয়েছে। ফাঁকা জায়গায় বাড়ি। সিকিউরিটির দিকটা ভাবতে হয় বৈকি। একটা ফোন থাকলে তবু—

বাকীটা অনুক্ত রাখলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হল না। হয়তো ওঁর আশঙ্কাটা অমূলক নয়। হেসে বললাম, ফোন যাঁরা দেন এসব তাঁদের ভাববার বিষয় নয়। ভাবলে চলেও না। এরকম কেস তো আরো অনেক আছে। তাছাড়া কত দরখাস্ত জমে আছে জানেন? সেগুলো সাফ করতেই বছর-পাঁচেক লেগে যাবে।

হেডক্লার্ক দমবার পাত্র নন। বললেন, সেই জন্যেই তো যত শীগগির হোক দরখাস্তটা করে রাখা দরকার। দেরি করলে ঐ পাঁচ হাজারও বাড়তে থাকবে।

নতুন বাড়িতে এসে বুঝলাম যা ভেবেই দিয়ে থাকুন তাঁরা আমার কাছে এটা বর, ইংরেজিতে যাকে বলে বুন। (এখন হলে হয়তো ভাবতাম এ যন্ত্রণা না এলেই ভাল ছিল) আমার ভূতপূর্ব হেডক্লার্কের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। তবে যে 'বড় কারণটার' উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন ভাগ্যক্রমে তেমন কিছু আজও দেখা

দেয়নি। আমার কারারাজ্যের কোন কোন অতিথি আমার নতুন আবাসে এসে দেখা করেছেন। সেগুলো 'সৌন্দর্যমূলক বা সৌহার্দ্যমূলক সাক্ষাৎকার।' সে সম্পর্ক যাদের সঙ্গে ছিল না, অর্থাৎ বড়বাবুর ভাষায় যাদের কঠোর হাতে ডিল করতে হয়েছে (তাদের সংখ্যা কম নয়) তারা কেউ হানা দেয়নি।

ক্রমশঃ যখন পেছনে ফেলে-আসা গোটা রাজ্যটা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে এসেছে, একদিন একটা ফোন এল। অচেনা গলা। নাম জানতে চাইলাম। উত্তর—"নাম শুনলে কি চিনতে পারবেন? দয়া করে যদি অনুমতি দেন আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতাম।"

—কোনো সভা-সমিতির ব্যাপার কি?

—আজ্ঞে না, সে-সব কিছু নয়। এমনিই।

—বেশ তো, আসুন।

মুখটা চেনা চেনা। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলাম না। চল্লিশ পেরিয়েছে কি পেরোয় নি। চেহারাটা মন্দ নয়। বেশ খানিকটা সঙ্কোচের সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে সোফার কোণ-ঘেঁষে বসলেন। বললেন, আমার কোন পরিচয় নেই। আপনার একজন প্রিজনার ছিলাম। তাও অনেক বছর আগে। আপনার মনে থাকবার কথা নয়। এমনি কত লোকই তো ছিল। বেরিয়ে গিয়ে তারাও বোধ হয় জেলের কথা মনে রাখে না। আমি রেখেছি।.....বিশেষ কারণ আছে বলেই।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম। আগন্তুক একটু থেমে আবার শুরু করলেন, "একটা খুব বিশ্রী কেস-এ জেল হয়েছিল। মামলা যখন চলে তখনই ফলাও করে ছাপা হয়েছিল কাগজে। ঘটনার সঙ্গে রটনা মিশিয়ে ব্যাপারটা যতখানি মুখরোচক করে তোলা যায়, রিপোর্টাররা সে-দিক দিয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছিল। আমি দিন গুণছিলাম কবে ট্রায়াল শেষ হবে, জেলে গিয়ে বাঁচবো। তখন তো জানি না ব্যাপারটা সেখানেও ধাওয়া করবে।

"ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে যা একখানা রিসেপশান পেলাম, তার চেহারাটা আপনাকে বোঝাতে পারবো না, স্যর। শুধু আমার কয়েদী ভাইদের কাছ থেকে নয়, জেলের স্টাফও কম গেলেন না। তাঁদের দোষ নেই। মেয়েমানুষঘটিত ব্যাপার। শেষটা ট্রাজিক কিন্তু গোড়াতে খানিকটা রোমান্সের গন্ধ ছিল। লোভ হওয়া স্বাভাবিক। সেখানে বড় ছোট উঁচু নীচুর বিশেষ তফাৎ নেই। আমাকে যেন ভাঙ্গা কাঁঠাল পেয়ে গেল সবাই। কেড়ে কুড়ে নিংড়ে যে যতটা রস বের করে নিতে পারে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত-রকমের প্রশ্ন: শুধু "কুৎসিত" বললে তার সামান্যটুকুও বোঝানো যাবে না।

"প্রথমটা যদ্দুর সম্ভব চুপ করে ছিলাম। কিন্তু কত আর সইতে পারে মানুষ। জেলের বাবুরা যখন বড় বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করলেন, আমিও রুখে দাঁড়ালাম। কয়েদীর মুখে কড়া জবাব! শুরু হল রিপোর্ট—শায়িং টেম্পার, ইনসোলেন্ট কণ্ডাক্ট, ইটজিং ফাউল ল্যাংগুয়েজ, ডুইং নো ওয়ার্ক—এমনি আরো অনেক। তখন আপনি আসেন নি। সুপার যিনি ছিলেন আমার কাছে বিশেষ কিছু জানতে চাইলেন না। সাজার পর সাজা দিয়ে গেলেন। হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি, মাড়ভাত, সেল। আমিও মরিয়া হয়ে উঠলাম। শুধু মুখ নয়, হাত পা চালাতে শুরু করলাম।

যে মেয়েটাকে নিয়ে কেস, একদিন একটা কয়েদী—(সে আবার আমার চেয়েও নরেস, রেপ করে এসেছিল) তার সম্বন্ধে এমন কয়েকটা উক্তি করেছিল যা বরদাস্ত করা যায় না। ঘুষি মারলাম তার মুখে। দুটো দাঁত উপড়ে বেরিয়ে এল।

"তার তিন-চার দিন আগে আপনি চার্জ নিয়েছেন। আপনার সামনে আমাকে হাজির করা হল কেস টেবিলে। লম্বা রিপোর্ট। অভিযোগের বর্ণনা দিলেন জেলার সাহেব। মনে আছে আপনি আমার সেই নানা অপরাধে ভরা মোটা হিস্ট্রি টিকিট-খানা কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, এই সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?

আমি চমকে উঠলাম....."

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। আমি আমার অতিথিকে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করে উঠে পড়লাম।

খবরটা গোলমেলে। আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কঠিন রোগে ভুগছিলেন। তাঁর অবস্থা হঠাৎ গুরুতর আকার নিয়েছে। আমার তখনই যাওয়া দরকার। বাইরের ঘরে এসে কথাটা জানাতেই অতিথি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন, —"আমি তাহলে চলি স্যর। উনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপরে একদিন ফোন করে আসবো।"

লোকটিকে আমি চিনতে পেরেছি, যদিও তাকে তা বুঝতে দিইনি। সে কেস-এ সাজা হয়েছিল তাও মনে পড়ছে। কাগজে বেরিয়েছিল। নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। ধরা যাক শীতল বিশ্বাস। ভবানীপুরে একটি পনের ষোল বছরের মেয়েকে পড়াত। কোনো একটা স্কুলেও চাকরি করত বোধহয়। মেয়েটির বাবা বোধহয় সরকারী চাকরি করতেন। কয়েক বছর আগে রিটায়ার করেছেন।

স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলে ছিল না। আর কোন মেয়ে থাকলেও আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একটি ঝি আর ঐ মেয়ে নিয়ে সংসার। টিউটরটির খোঁজ পেয়েছিলেন জানাশুনো কারো কাছ থেকে। কথাবার্তা বলে ভালোই লেগেছিল। ঝিটি অনেক দিনের। ছোকরা মাষ্টার বলে একটু আপত্তি করেছিল। কিন্তু ভদ্রলোক সেটা আমল দেননি।

মেয়েটি বেশ মেধাবী। স্কুলের পড়াশুনোর বাইরেও নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল। তার বাবা যদ্দিন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারতেন, তিনিই সঙ্গে করে মেয়েকে নানা জায়গায় নিয়ে যেতেন—জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি। ইদানীং প্রায়ই হাই ব্লাডপ্রেসারে ভুগতেন বলে বেরোতে পারতেন না। মেয়েকে বেড়িয়ে আনার ভার পড়েছিল শীতলের উপর। ছুটির দিনে মীনা প্রায়ই মাষ্টার মশাই-এর সঙ্গে বেরোত। মাঝে মাঝে ফিরতে একটু রাতও হত। কিন্তু ভদ্রলোক কিছু মনে করতেন না।

তারপর একদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ির সামনে হৈ-চৈ। ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে দেখলেন কয়েক জন যুবক শীতলকে দুদিক থেকে ধরে রেখেছে। জামা ছেঁড়া, চুল উসকো-খুসকো, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পিছনে মীনা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।

লোকগুলো খুব উত্তেজিত। একসঙ্গে সবাই কথা বলার চেষ্টা করছিল। তার থেকে মোটামুটি ঘটনাটা জানা গেল।

ইডেন গার্ডেনে একটা ঝোপের মধ্যে এদের বেঞ্চের উপর বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। আশে-পাশের কেউ কিছু মনে করেনি। ওরকম পেয়ার তো হামেসাই দেখা যায়। হঠাৎ মেয়ে গলার চাপা আওয়াজ শোনা গেল—না; সরে যান; ছেড়ে দিন। তখন কয়েক জন ঢুকে পড়ল। মহিলাটি তখন নিজেকে ঐ লোকটার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জামাকাপড় ঠিক করছেন। আর একটু দেরি হলে সিরিয়াস ব্যাপার ঘটে যেত।

ততক্ষণে পাড়ার ছেলেরাও এসে পড়েছে। স্বাভাবিক কারণেই মাষ্টারের উপর তারা মনে মনে প্রসন্ন ছিল না। একবাক্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তাকে পুলিশে দেওয়া হোক। শ্লীলতাহানির অভিযোগে কোর্টে মামলা দায়ের হল। শীতল জামিন পেয়ে গেল। মীনার প্রথম দিনের জবানবন্দির পর তার কোন এক আত্মীয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এসে যখন ট্রাম বা বাস-এর জন্যে অপেক্ষা করছে, শীতল এসে

দাঁড়াল সামনে এবং মীনা তার দিকে তাকাতেই পকেট থেকে শিশি বের করে কী একটা তরল জিনিস ছুঁড়ে দিল ওর মুখের উপর। মীনা চিৎকার করে উঠল। শীতল পালাতে যাচ্ছিল। লোকজনে ধরে ফেলল। মীনাকে তখনই নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। গালের একটা দিক জ্বলে গেছে, কপালেও লেগেছে কিছুটা। ডাক্তার বললেন, এ্যাসিড ছুঁড়েছে।

বাবা গেলেন দেখতে। মেয়ের দিকে একবার তাকিয়েই অ্যাঁ বলে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আগে একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে, এটা দ্বিতীয়। ঐ হাসপাতালেই অন্য ওয়ার্ডে ভর্তি হলেন। মেয়ে আস্তে আস্তে সেরে উঠল কিন্তু বাপ আর উঠলেন না।

দায়রা আদালতে শীতল বিশ্বাসের বেশ কয়েক বছর জেল হয়ে গেল।

কোন একটা কাগজে কেস রিপোর্ট এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলো আরো বিস্তৃত আকারে বেরিয়েছিল। সবটা আজ আর মনে নেই।

শীতল ছিল তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী, জেলের ভাষায় ডিভিশন থ্রী। তাদের ব্যারাকে খবরের কাগজ যেত না। কিন্তু দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর বন্দীরা সে সুযোগ পেয়ে থাকেন। জেলস্টাফ তো পড়েনই। সেই সব সূত্র থেকেই সারা জেলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে থাকবে। এ হেন চাঞ্চল্যকর নাটকের নায়ক যখন সশরীরে উপস্থিত তখন তাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে সহজেই অনুমেয়। বাড়াবাড়িটাও অস্বাভাবিক নয়। মরিয়া হয়েই সে পাল্টা আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে শাস্তি থেকে সে অব্যাহতি পেতে পারে না। যদ্দুর মনে পড়ে আমিও তাকে কোনো একটা কঠিন শাস্তিই দিয়েছিলাম।

যাই হোক, সে তো চুকে গেছে কত বছর! এতকাল পরে আমার কাছে শীতলের কী দরকার পড়তে পারে, ভেবে পেলাম না। কী চায় সে, কী বলতে এসেছিল? বিশেষ করে তার শেষ কথাটা আমাকে আরো কৌতূহলী করে তুলেছিল। "আমি চমকে উঠলাম—"। চমকাবার মত কিছু তো আমি বলি নি। সবাইকে যেমন জিজ্ঞাসা করি, তাকেও তেমনি করেছিলাম—কিছু বলবার আছে?

শীতল বিশ্বাসের মত একটা দুর্বৃত্ত—তাছাড়া আর কী বলবো তাকে—আমাকে যেন পেয়ে বসল। ফোন এলেই মনে হয়, এই বুঝি ডাকছে। না, সে নয়। একটু নিরাশ হই।

আস্তে আস্তে ঐ ভাবটা কাটিয়ে উঠলাম। প্রায় ভুলে গেছি বলা যেতে পারে, এমন সময় এল একটা চিঠি। মোটা লম্বা সাইজের খাম। দু-তিন লাইন পড়েই বুঝলাম, শীতল বিশ্বাস। যদিও লেখকের নাম আলাদা, তার নিজের নাম। তাহলেও আমার কাছে সে "শীতল" হয়েই থাক।

মুখবন্ধের পর লিখেছে, "আপনার কাছে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলব বলেই গিয়েছিলাম, কাগজওয়ালারা যা জানে না,—জানতে পারে নি। সাফাই গেয়ে বা কৈফিয়ত

খাড়া করে এতবড় অপরাধকে হালকা করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং সব কথা বলে নিজেকে খানিকটা হালকা করার জন্যে। কিন্তু গিয়ে বুঝলাম আপনার মুখোমুখি বসে এই লজ্জার কাহিনী বলে যাবার মত বুকের পাটা এত বছর জেল খেটেও আয়ত্ত করতে পারিনি। বরং লিখে বলা যায়। মুখে যা বাধে কলমের মুখে তা অনেকটা সহজ।

আপনার সময় ও সুযোগমত চিঠিটা পড়বেন—এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

"সেদিন বলেছি হয় তো আপনার মনে আছে, কেস টেবিলে আপনার কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলেন "আপনার কিছু বলবার আছে?" তার আগে "আপনি" কথাটা কারো কাছেই শুনি নি। থার্ডক্লাশ কয়েদীদের জেলের অফিসাররা এবং কেরাণীবাবুরা সবাই বলেন "তুমি"। সেটাই তো দস্তুর। সিপাইরা বলত "তুম বা তু"। বিশেষ করে আমার মত একটা ঘৃণ্য অপরাধী, তার তো ওটাই প্রাপ্য। সেখানে স্বয়ং সুপার তাকে এতটা সম্মান দেবেন! এ কখনও সম্ভব! সন্দেহ হয়েছিল ঠাট্টা করে বলছেন বোধ হয় কিন্তু আপনার কথার সুরে বা চোখের দৃষ্টিতে তার কোন লক্ষণ খুঁজে পাইনি।

"মনে মনে ঠিক করে গিয়েছিলাম, কেস টেবিলে আমি কোনো কথাই বলবো না। বলে তো কোনো লাভ নেই। সুপার কিছু শোনেন না। শুনলেও শাস্তি যা দেবার ঠিকই দেবেন। আমার কথায় কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু ঐ "আপনি" এবং তার সঙ্গে আরো কিছু ছিল যা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না, আমাকে যেন এক মুহূর্তে বদলে দিয়ে গেল। আমি বলে গেলাম জেলে যাবার পর থেকে যে ক্ষোভ ও যন্ত্রণা আমার মধ্যে জমা হয়েছিল, সে

কারণে আমি দিন দিন নীচে থেকে আরো নীচে নেমে যাচ্ছিলাম, হারিয়ে ফেলছিলাম আমার ভেতরে মনুষ্যত্বের যেটুকু তখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

"আপনি আমার সেই আবোল-তাবোল মন দিয়ে ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন। তারপর তিন মাসের জন্যে আমাকে সেল-এ রাখার হুকুম দিয়েছিলেন। সলিটারি কনফাইনমেণ্ট। পরে বুঝেছিলাম পানিশমেণ্টের দিক দিয়ে যতই কঠোর হোক, আমার পক্ষে ওটা বর। বোধ হয় আমার মুখ চেয়েই ঐরকম সাজা দিয়েছিলেন। সেল-এ গিয়ে আমি বেঁচে গেলাম। যারা আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। যখন বেরিয়ে এলাম আমি একেবারে অন্য মানুষ।

"তার কিছুদিন পরেই আমাকে মফস্বলে এক ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলি করা হ'ল। তাঁরা একজন 'কনভিক্ট রাইটার' চেয়েছিলেন কয়েদীদের চিঠি-পত্তর, আপিল দরখাস্ত লিখে দেবার জন্যে। জেলের রেকর্ড যাদের ভাল অর্থাৎ 'গুড কণ্ডাক্ট' কথাটা যাদের বেলায় লেখা চলে তাদেরই ঐ কাজে পাঠানো যায়। আমার মত 'ব্যাড ক্যারেক্টার', টিকিট ভর্তি যাদের পানিশমেণ্টের কালো দাগ, তারা ও কাজের অযোগ্য। ঐ যুক্তি দেখিয়ে জেলার সাহেব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আপনি তো শোনেন নি। অফিস থেকেই কথাটা আমার কানে গিয়েছিল।

"কারণটা তখন ধরতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম ঐ আবহাওয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে আপনি আমাকে নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

আপনার একটা কথা আমার কোনো দিন ভুলবার নয়। সেলব্রক ইন্সপেক্সনের সময় হঠাৎ আমার সেল-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আপনি তো স্কুল টীচার ছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—ক'দ্দুর লেখাপড়া শিখেছেন?

—বি-এ পাশ করেছি।

—মানুষ যখন যে অবস্থায় পড়ে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। এই সোজা কথাটা শেখেননি কেন?

বজেই চলে গিয়েছিলেন।"

শীতলের চিঠির এই অংশটা আমার পক্ষে রীতিমত embarrassing (বাংলা প্রতিশব্দ বোধহয় 'অস্বস্তিকর'। কিন্তু তা দিয়ে পুরো মানেটা বোঝানো যাবে না)। উপরে যেটুকু দিলাম তার মধ্যে এবং তার পরে আরো বিস্তৃতভাবে রয়েছে আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গুণকীর্তন। আমি তার জন্যে কী করেছি—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে—তারই সকৃতজ্ঞ বর্ণনা। সেগুলো আর বাড়াতে চাই না।

চতুর পাঠকদের বক্রহাসি লক্ষ্য করছি। অর্থাৎ এটা যে বকলমে আত্মস্তুতি অর্থাৎ অন্যের কাটি দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটানো এটা তাঁরা ধরে ফেলেছেন।

এবার চিঠির অন্য অংশে আসা যাক। নিজের অপরাধের কথা বলতে গিয়ে লৌহকপাটের বাইরে যে-জীবন সে ফেলে এসেছিল তারই কিছু তথ্য এখানে পাওয়া যাবে দীর্ঘ কাহিনী। পাঠকের ধৈর্যের দিকে চেয়ে আমি তার একটা summary বা সংক্ষিপ্তসার দেবার চেষ্টা করেছি।

কোনো সূত্রে খবর পেয়ে টুইশানির উমেদার হয়ে শীতল সেদিন মীনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি ওকে নানা দিক থেকে বাজিয়ে নিতে ছাড়েননি। তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝেছিল, তিনি খুশী হয়েছেন। বয়সের দিক দিয়েও তেমন আপত্তি নেই, তবে মাষ্টারটি বিবাহিত হলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। উঠতি বয়সের মেয়ে, মা নেই.....।

শীতল চান্সটা হাতছাড়া করতে চাইল না। বলল, স্যার একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। দিন দশেকের আগে কিন্তু আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। একটু বাড়ি যেতে হবে।

—বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?

—মা-বাবা আছেন, আর—

একটু থেকে সলজ্জভাবে বলল, স্ত্রী আছে।

—ও, তুমি বিয়ে করেছ?

শীতল হাসি মুখে নীরব রইল।

তার বক্তব্য—কথাটা মিথ্যা কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যা নয়। এক রকম ছেলেবেলা থেকেই সে 'বাগদত্ত'। বারো-তেরো বছর বয়সে মা-বাপ হারিয়ে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। সেটা তিনি বিনা স্বার্থে দেননি। তাঁর ছোট মেয়েটি শীতলের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। দেখতে ভাল নয়, তার উপরে একটি পা খোঁড়া। অত্যন্ত মুখরা। অতিরিক্ত আদর দিয়ে মা তার মাথাটি আগেই খেয়ে রেখেছেন। তারই ভাবী বর হিসাবে শীতলকে স্থান দেওয়া হ'ল পরিবারে। গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া কিছুটা শিখেছিল। জেলা শহরে বড় স্কুলে এসে ভর্তি হ'ল। অনেক জমা-জমি ছিল ভদ্রলোকের। মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকত। ছেলেকে উকিল করতে চেয়েছিলেন। সেটা সম্ভব হয়নি। ভাবী জামাতার বেলায় সে ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয় সেদিকে নজর দিলেন। সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। আপাতত শীতলের কাজ হ'ল নানা জনের ফাইফরমাস খাটা। সবাই তার মনিব, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মনিব ভবিষ্যতে একদিন যার সঙ্গে সে পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। কিন্তু বর্তমানের বন্ধনটা তার কাছে গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ মেয়েকে পড়াবার ভার ছিল ওর অসংখ্য কাজের মধ্যে একটি। সে শুধু নামে। আসল কাজ ছিল তার হাজার রকম খেয়াল, আব্দার আর বায়না মেটানো আর উৎপীড়ন ঘাড় পেতে নেওয়া।

শীতলের বাস্তব বুদ্ধি তাকে শিখিয়েছিল যেমন করে হোক সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে তাকে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে এই কুম্ভীপাক থেকে তার মুক্তি নেই।

মুক্তি এল বি-এ পাশ করার পর। কিছু টাকা নিয়ে কলকাতায় গেল ল' কলেজে ভর্তি হতে। আর ফিরল না। কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর স্কুলের চাকরিটা জুটে গেল। ল' পড়বার ইচ্ছাটা তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সে জন্যে কিছু বাড়তি টাকা চাই। টুইশানির প্রয়োজন সেইখানে।

কিন্তু যখন শুনল যাকে পড়াতে হবে সে ছাত্র নয়, ছাত্রী এবং তার বয়স ষোল,, তখন প্রয়োজনের তাগিদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। সামান্য একটা মিথ্যা দিয়ে যদি সেখানে কিছু সুবিধা হয় তাতে দোষ কী?

মীনাকে যেদিন প্রথম দেখল শীতলের মনে হ'ল, এই বয়স্কী একটি 'মেয়ে' সম্বন্ধে তার স্বপ্নের ভিতরে যে ছবিটি ছিল—শান্ত, ধীর, নম্র, লাজুক, কোমল—(ভাগ্য বিড়ম্বনায় যার উল্টোটাই জুটেছিল তার জীবনে) এর মধ্যে সবটাই মূর্তি পেয়েছে। এ যেন তার গোপন মনের অনেক দিনের কামনা, অথচ পাবে বলে কখনো আশা করেনি।

ব্যবহারের দিক দিয়েও কত ভদ্র, বিনীত, মধুর! সেই ছেলেবেলা থেকে এত দিন যাকে দেখে এসেছে, পেয়ে এসেছে তার একেবারে বিপরীত। তাকে দেখলে সারা মনে বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ত, একে দেখলে আনন্দের ঢেউ ওঠে। তার কণ্ঠে বিধাতা বিষ ছাড়া আর কিছু দেননি, কথায় কথায় উপচে পড়ত। এর কণ্ঠ যেন সুধায় ভরা। কম কথা বলে, কিন্তু তার সবটাই দু' কান ভরে শুনতে ইচ্ছা করে।

পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে অন্য কথাও পাড়ত শীতল। গল্প বলত, অনেক মজার গল্প। শুনে সে কী হাসি মীনার! তার ভিতরে এমন একটা ঝঙ্কার ছিল যার রেশ অনেকক্ষণ জেগে থাকত ওর মনের কোণে। অন্য গল্প যখন বলত—দেশ-বিদেশের কথা, বিজ্ঞানের কথা, মনীষীদের জীবনকথা—মীনা তার মুগ্ধ চোখ দুটির একাগ্র দৃষ্টি ওর মুখের উপর ফেলে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনত।

একটা টেবিলের দু'ধারে দু'জন বসত।

ধরা-ছোঁয়ার সুযোগ ছিল না। প্রৌঢ়া বি এই মাষ্টারটিকে গোড়া থেকেই পছন্দ করে নি। আড়াল থেকেও কড়া নজর রাখত এদের উপর। শীতল সেটা বুঝতে পেরেছিল। সাবধানে চলত। মাঝে মাঝে একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত ঐ সুঠাম সুন্দর প্রথমযৌবনপুষ্ট দেহখানার উপর। ইচ্ছা করত এই টেবিলের ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দিয়ে ওকে কাছে টেনে নেয়, দু'হাত দিয়ে সজোরে পিষে ফেলে বুকের সঙ্গে। সে যে কী উন্মাদনা!

নিজেকে মনে মনে কশাঘাত করত শীতল। না, এ অত্যন্ত গর্হিত। ঐ সরল নিষ্পাপ মেয়েটির প্রতি তার এই কলুষ-কামনা তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

কখনো কখনো মনে হ'ত এই আকর্ষণ শুধু একদিকের নয়, ওখানেও যেন তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ওকেও মনে হচ্ছে ধরা দিতে প্রস্তুত। মুখে না বলুক, ঐ বিশেষ চাহনি দিয়ে বলছে। ঐ হাসির মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। হাবভাবে ফুটে উঠছে। এসব তো তার অজানা নয়। আরেক জনের মধ্যেই দেখেছে অনেকদিন। তার ভাবী স্ত্রীর ভাবিত্ব শেষের দিকে অনেকখানি ঘুচে গিয়েছিল। যতই মুখরা হোক, মুখের সে যৌবনলাবণ্য কোথায় যাবে? হোক বিকলাঙ্গ, তবু বিশেষ বয়সে তার বিশেষ বিশেষ অঙ্গে প্রকৃতি যে পরিপূর্ণতা এনে দিলেন শীতল তাকে উপেক্ষা করেনি। উপভোগেরও কোন বাধা ছিল না।

তখনো মীনাকে নিয়ে বাইরে বেরোবার ব্যবস্থা হয়নি। শীতলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল প্রস্তাবটা। মীনার বাবা অনুমতি দিলেন। ততদিনে মাষ্টারের উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা জন্মেছে।

শীতলের এতদিনের আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি পূর্ণ হ'ল। মীনাও যে খুশী, স্পষ্ট করেই বোঝা গেল। প্রথমে বাস-এ ট্রামে ঘুরত তারা। তারপর ফিরতে দেরী হবে এই কারণ দেখিয়ে মাঝে মাঝে ট্যাক্সিও ধরত শীতল। ঘন সান্নিধ্যের সুযোগ এল। ক্রমশ ঘনতর। তার সদ্ব্যবহারও চলত মাঝে মাঝে।

মীনা প্রথমে বাধা দিত। পাশ থেকে একটা হাত নিষেধের সীমা ছাড়িয়ে যেতে চাইলেই ঠেলে সরিয়ে দিত। ক্রমে ক্রমে যেন তার জোর কমে আসতে লাগল। প্রতিবাদ যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে বেশ কিছুটা সলজ্জ প্রশ্রয়।

সে দিন কী যে হ'ল! ইডেন গার্ডেনের ঝোপটা তো ট্যাক্সির চেয়েও নিরাপদ। একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হবার সাধ ছিল শীতলের, কিন্তু গোড়া থেকেই প্রবল বাধা। তারও কেমন জিদ চেপে গেল। ভেবেছিল একটু জোর করলেই বশ মানবে। ঠিক উল্টো হ'ল। মেয়েদের দৃষ্টি সব সময়েই বেশী সতর্ক। ছেলেগুলো যে গাছপালার আড়ালে ওঁত পেতে বসে আছে, সেটা বোধহয় টের পেয়েছিল। একটা কাণ্ড করে বসল। ব্যাপারটা যে অত দূর গড়াবে সে-ও বোধহয় বুঝতে পারেনি।

কোর্ট থেকে জামিন পাবার পর শীতল লুকিয়ে দেখা করবার চেষ্টা করেছিল মীনার সঙ্গে। একবার নয়, তিনবার। এমন সময়ে গিয়েছিল, যখন ওদের সেই ঝিটা থাকে না। মীনা ওকে দেখতে পেয়েও একবারটি জানলায় এসে দাঁড়ায়নি। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও শীতল নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, হয়তো নিষেধ আছে। পাড়ার ছেলেগুলোর শাসানির ভয়ও থাকতে পারে।

কিন্তু কোর্টে যা বলল, শীতল স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। উকিলের প্রশ্নের উত্তরে অসঙ্কোচে বলে গেল—মাষ্টার তাকে অনেক

দিন থেকেই খারাপ করবার চেষ্টা করে আসছে। সে লজ্জায় বাবাকে বলেনি। সেদিন ইডেন গার্ডেনে জোর করে তাকে বেঞ্চির উপর ফেলে দিয়েছিল। ভদ্রলোকেরা না এসে পড়লে চরম সর্বনাশ না করে ছাড়ত না।

শীতল লিখছে, "আপনাকে অকপটে বলছি, মীনাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম। আমার সেদিনকার আচরণ অবশ্যই অশালীন ছিল। নিজেকে ধরে রাখতে পারি নি। তাই বলে তার 'চরম সর্বনাশ' করবার মত পশুস্তরে নেমে গেছি একথা সে ভাবল কেমন করে?

"আরো অনেক কথা বলেছিল যা নির্জলা মিথ্যা। সব আপনাকে বলা যায় না। শুনে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। কী করছি, তার ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সব জ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল। একটা কথা শুধু মাথার মধ্যে ঘুরছিল : এর শোধ নেবো। ও বোধহয় মনে করছে ওর দেহটা বড় সুন্দর আর আমি একটা হ্যাংলা কুকুরের মত তার লোভে ঘুরছি। সেই ধারণাটা ভেঙে দেবো।

"একটা চেনা ওষুধের দোকান থেকে কিছুটা অ্যাসিড সংগ্রহ করতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি।"

চিঠির শেষের দিকে লিখছে শীতল—

"অন্য জেলে গিয়ে নতুন পরিবেশে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। বিশেষ করে মীনার বাবার কথা। তিনি আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন। আমিও তাঁকে বাবার মতই দেখেছি। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। আমিই তাঁকে খুন করলাম।

"মীনার যে ক্ষতি করেছি তার জন্যেও দুঃখ হত। কিন্তু তারপরেই নিজের মধ্যে একটা সমর্থন খুঁজে পেতাম। আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে সে যে কতগুলো মিথ্যা অভিযোগ করে গেল আমার নামে, তার কি কোনো কৈফিয়ত আছে? তার দেহের ওপর আমার লোভ ছিল। কিন্তু সে কি ইচ্ছা করে আমাকে প্রলুব্ধ করেনি? আমি যে অন্যায় করেছি, তার মূলে কি তার সায় ছিল না?

"নতুন জেলে একটি বন্ধু পেয়েছিলাম। সমর কুণ্ডু। বড় ঘরের ছেলে। প্রথম বয়সেই কয়েকটা কুসঙ্গী জুটেছিল। মদ ধরেছিল। তাদের নিয়ে খারাপ জায়গাতেও যেত। তারপর একদিন কী নিয়ে ঝগড়াঝাটি, যেমন হয়ে থাকে। পকেটে রিভলবার ছিল। মদের ঝোঁকে খুন করে বসল। যাবজ্জীবন জেল।

"আমরা পাশাপাশি সেল-এ থাকতাম। সেলটা আমি জেলারবাবুকে বলে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলাম। একা থাকার অনেক সুবিধা। আর ওকে থাকতে হত ভারী মেয়াদী বলে। বিকেলে কাজ-কর্মের পর যতক্ষণ না লক-আপ্-এর সময় হত আমরা বসে বসে গল্প করতাম। ও যেমন ওর সব কথা আমাকে বলেছিল, আমিও তেমনি তার কাছে কিছু গোপন করিনি।

"একদিন বলেছিল, তুমি একটা বুদ্ধু। মীনা যা কিছু বলেছিল সব তার নিজের কথা কে বললে তোমাকে?, মেয়ে-মানুষ জাতটা কত অসহায় তা জান না। সারাজীবন পরের মুখ চেয়ে চলতে হয়। তাদের দিয়ে যা বলানো হয় তাই বলতে তারা বাধ্য। বিশেষ করে ঐ বয়সী একটা মেয়ে। মাথার ওপর কেউ নেই। এক-গাদা লোক মুরুব্বি সেজে বসে আছে। যেদিকে ঘোরাবে সেই দিকেই ওকে ঘুরতে হবে।

"আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে টের পাচ্ছিলাম, মীনার সম্বন্ধে আমার মনে যেন একটা নতুন দিক খুলে যাচ্ছে।

এই বন্ধুর একটা ছোট বাড়ি আছে মেমারীতে। সেখানে কেউ থাকে না। ভাগের ভাগ কিছু জমি-জমা ও বাগান আছে। সে-সব আমি আগে জানতাম না। আমার মেয়াদ শেষ হবার আগের দিন আমার হাতদুটি ধরে বলেছিল, তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে ভাই।

আমি তো অবাক। আমি তার কী উপকার করতে পারি? বললাম, কী করতে হবে বল

—আগে কথা দাও।

—বেশ দিলাম।

—আমার তো বেরোতে অনেক দেরি। তদ্দিন অন্তত আমার বাড়িটা আর জমি-টমিগুলো দেখাশুনোর ভার তোমাকে নিতে হবে।

"আমি চুপ করে আছি দেখে বলল, আমাকে ভুল বুঝো না। এসব তোমাকে এমনি দিচ্ছি না। বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কেউ থাকলে আমারই সুবিধে। আর জমি-জমা দেখাশুনোর জন্যে ফসলের একটা শেয়ার তোমার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। সেটা নেবে। বাকীটা আমারই থাকবে। এতে আর আপত্তি কী?

"আমি 'না' বলতে পারিনি, যদিও বুঝতে পারছিলাম, এ শুধু আমার একটা আশ্রয় ও দুটো অন্নের সংস্থান করে দেওয়া। 'দান' করলে পাছে আমার সম্মানে বাধে, তাই এই কৌশল।

"পরদিন সকালেই আমাকে যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। কিন্তু আমাদের গল্প আর ফুরোতে চায় না। অফিস থেকে খালাস-দপ্তরের মেট নিজে এসে তাগিদ দিয়ে গেল। এতদিন পরে মুক্তি পাচ্ছি, কিন্তু আমার ভিতরে কোন তাগিদ ছিল না। যেতে মন সরছিল না। কোথায় যাবো?, কে আছে আমার?, কেউ পথ চেয়ে বসে থাকবে সে কপাল তো করে আসিনি।

"সেল ইয়ার্ডের গেট পর্যন্ত সমর এল আমার সঙ্গে। তার বেশী তার যাবার হুকুম নেই। হঠাৎ অন্য কি একটা কথার মধ্যে খাপছাড়াভাবে বলে উঠল, মীনা তোমাকে ভালবাসে তোমার চেয়েও বেশী সেটা মনে রেখো।"

অনেক চিঠি আসে আমার কাছে। নানা ধরনের চিঠি। কোনোটাকেই বেশী দিন মনে ধরে রাখা সম্ভব নয়, রাখলে চলেও না। নিত্য নতুন চিন্তা, ভাবনা, ঘটনা, সমস্যার উদয় হচ্ছে। তাদের ভারে পুরনো চাপা পড়ে যায়।

মাঝে মাঝে নানা জায়গা থেকে সভা-সমিতির ডাক পড়ে। যথাসাধ্য এড়াবার চেষ্টা করি। কোনো কোনোটায় সাড়া দিতে হয়। কলকাতার বাইরে, অথচ খুব বেশী দূরে নয়—এ রকম যদি হয় বড় একটা আপত্তি করি না। ঐ উপলক্ষে এই ইঁট-কাঠের নাগ-পাশ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি মেলে। খোলা মাঠ, তার কোণে গাছপালা ঘেরা গ্রাম, মাঝে মাঝে দু'একটা পুকুর, রেল লাইনের ধার ঘেঁষে এক পাল গরু, পেছনে পাঁচনবাড়ি হাতে একটা ছোট ছেলে—এমনি ধারা বহুবার দেখা অতি তুচ্ছ দৃশ্যগুলোও কেমন যেন লোভনীয় বলে মনে হয়।

একদিন দুটি ছেলে এল মেমারী থেকে। একটা কোন ক্লাবের 'ফাংশান'। আমাকে প্রধান অতিথির আসন 'অলঙ্কৃত' করতে হবে। তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু শুধু অলঙ্কৃত করে রেহাই নেই। ঐ আসনের বিনিময়ে আমাকে একটি ভাষণ ছাড়তে হবে। আমার মুশকিল সেইখানে। ভাষণ-টাষণ বড় একটা আসে না।

ছেলে দুটি অবশ্য আশ্বাস দিল, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না স্যার। একবার গিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তাতেই আমরা খুশী।'

চারটায় সভা। আমি তার উপরে অন্তত ঘণ্টাদেড়েক মার্জিন ধরে রেখে-ছিলাম। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। কিন্তু

ওরা আমাকে সত্যিই অবাক করে দিল। চারটা দশ পনেরতেই সভার কাজ শুরু হ'ল। ঠাসবুনানী প্রোগ্রাম। কিন্তু আমাকে সেজন্যে আটকা থাকতে হ'ল না। পঁচটার একটু পরেই ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম।

মঞ্চ থেকে নামতেই দেখি শীতল দাঁড়িয়ে আছে। তখন মনে পড়ল এই মেমারীতে থাকে বলেই তো লিখেছিল চিঠিতে। এ সভার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। রাস্তার পোষ্টার দেখে এসেছে এবং উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বন্দোবস্তও হয়ে গেছে সভার শেষে আমাকে একবার নিয়ে যাবে ওর বাড়ীতে। সেই অনুরোধই করল, একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে স্যার। এই কাছেই।

দেরি হয়ে যাবে যে—আপত্তি তুলতে গেলাম।

—কিছু দেরি হবে না। আপনাকে আমি সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো।

বাড়িটি ছোট। কিন্তু চারধারে অনেকখানি জায়গা। নানা রকম তরিতরকারি ফলছে সেখানে। সামনে কিছু ফুলও আছে। সবটাতেই যত্ন, রুচি ও পরিশ্রমের চিহ্ন স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল—বাঃ।

—চারদিকটা জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছিল। খেটেখুটে এইটুকু দাঁড় করিয়েছি। সময় এসে দেখে যদি খুশী হয় তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

বাইরে ঘরে নিয়ে বসাল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কয়েকখানা বেতের চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোষ। তার উপরে বিছানা, সদ্য পাট-ভাঙ্গা ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। এক ধারে একটি ছোট তাকিয়া, ওয়াড়ে সূচের কাজ।

আমাকে বসিয়ে শীতল ভিতরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরদা সরিয়ে একটি মহিলা এসে ঢুকলেন। আনত মুখ। কপালের নীচে পর্যন্ত ঘোমটা টানা। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। মাথা তুলতেই মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম। বাঁ গালের অনেকটা জুড়ে পোড়া দাগ। কিছুটা কপালেও।

সময়োচিত কিছু বলা দরকার। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মুখ দিয়ে কথা সরল না। শীতলও নির্বাক। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করল মেয়েটি। সহজ সপ্রতিভ সুরে বলল, আপনি এখানে এসে পা তুলে ভালো করে বসুন। একটানা অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে থাকতে হয়েছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল শীতল, আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম আপনার কষ্ট হচ্ছে। একটু বরং গড়িয়ে নিন স্যার। তুমি চায়ের জল চড়িয়ে দাও।

শেষ নির্দেশ মেয়েটির উদ্দেশে। সে ভিতরে চলে গেল। আমি জুতো খুলে তাকিয়ায় ভর দিয়ে আরাম করে বসলাম।

তারপর হাসিমুখে তাকালাম শীতলের মুখের পানে। চোখে বোধহয় কোন জিজ্ঞাসা ছিল। সে বলল, বেশ কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম দু'জনে গিয়ে আপনাকে প্রণাম করে আসবো। নানা কাজের ভিড়ে হয়ে ওঠেনি। ভগবান বোধহয় আমাদের মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তাই এখানেই আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।

'রূপা'র বই

ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত
মনস্পাত শ্রীঅরবিন্দ ১২.০০
সৎ চিৎ আনন্দময় [শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য] ৫.০০
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
স্বদেশীয় ভারত বিদ্যা-পথিক ৬.০০
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বাঙালী ৭.৫০
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য ১০.০০
মৈত্রেয়ী দেবী
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১০.০০
সরলা দেবী চৌধুরানী
জীবনের ঝরাপাতা ১৬.০০
প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
রাস্তা ৮.০০
ডঃ সুকুমার সেন
বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ১৫.০০
কালীপদ সরকার
কৃষ্ণকথা চিরন্তনী ১২.০০
গৌরী ধর্মপাল
মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র ১৫.০০

[পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন]

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলকাতা ৭০০.০৭৩
শাখা—এলাহাবাদ : বোম্বাই : দিল্লী

পাঁচটি পাঁপড়ি/বনফুল

(১)

তোমাকে যখন সাথী ভেবেছিলাম
ইচ্ছা হয়েছিল খাঁচা হই,
তোমাকে যখন নদী ব'লে মনে হ'ল
সাধ হয়েছিল নৌকো হবার,
তারপর যখন মনে হ'ল তুমি ফুল
বাসনা হ'ল ফুলদানী হই।
এখন বুঝেছি তোমাকে
আয়ত্তে আনা যায় না।
তুমি বাতাসের মতো স্বাধীন।
এখন আকাশ হবার চেষ্টা করছি,
পারছি না।

(২)

সব অসুখের, সব যন্ত্রণার, সব কষ্টের
উপশম করতে পারেন
এমন ডাক্তার একটিই আছেন।
তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য
তাঁকে ডাকতে হয় না,
ফি দিতে হয় না,
তাঁর নাম মৃত্যু।

(৩)

অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষর নিষ্প্রয়োজন।
চাহনির ভাষার
অক্ষর তৈরি হয় নি আজও।
তবু প্রেমিকরা
তা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে।

(৪)

বাষ্প, জল, বরফ,
আকুলতা, মিলন, ঔদাসীন্য,
সবই হয়েছিল নিয়ম-মতো।
কিন্তু সবটা যখন
প্রজাপতি হ'য়ে উড়ে গেল
হকচকিয়ে গেলাম।

(৫)

আমার মনের অপরূপ ছবিটি
তোমাদের দেখাতে পারি না।
তাকে আঁকবার মতো সূক্ষ্ম তুলি
বাজারে নেই,
রংও মাত্র কয়েকটি।
সে ছবি অনংকনীয়।
তার দর্শক দুজন
আমি আর ভগবান,
ভগবানও আমার চোখ দিয়ে দেখেন।

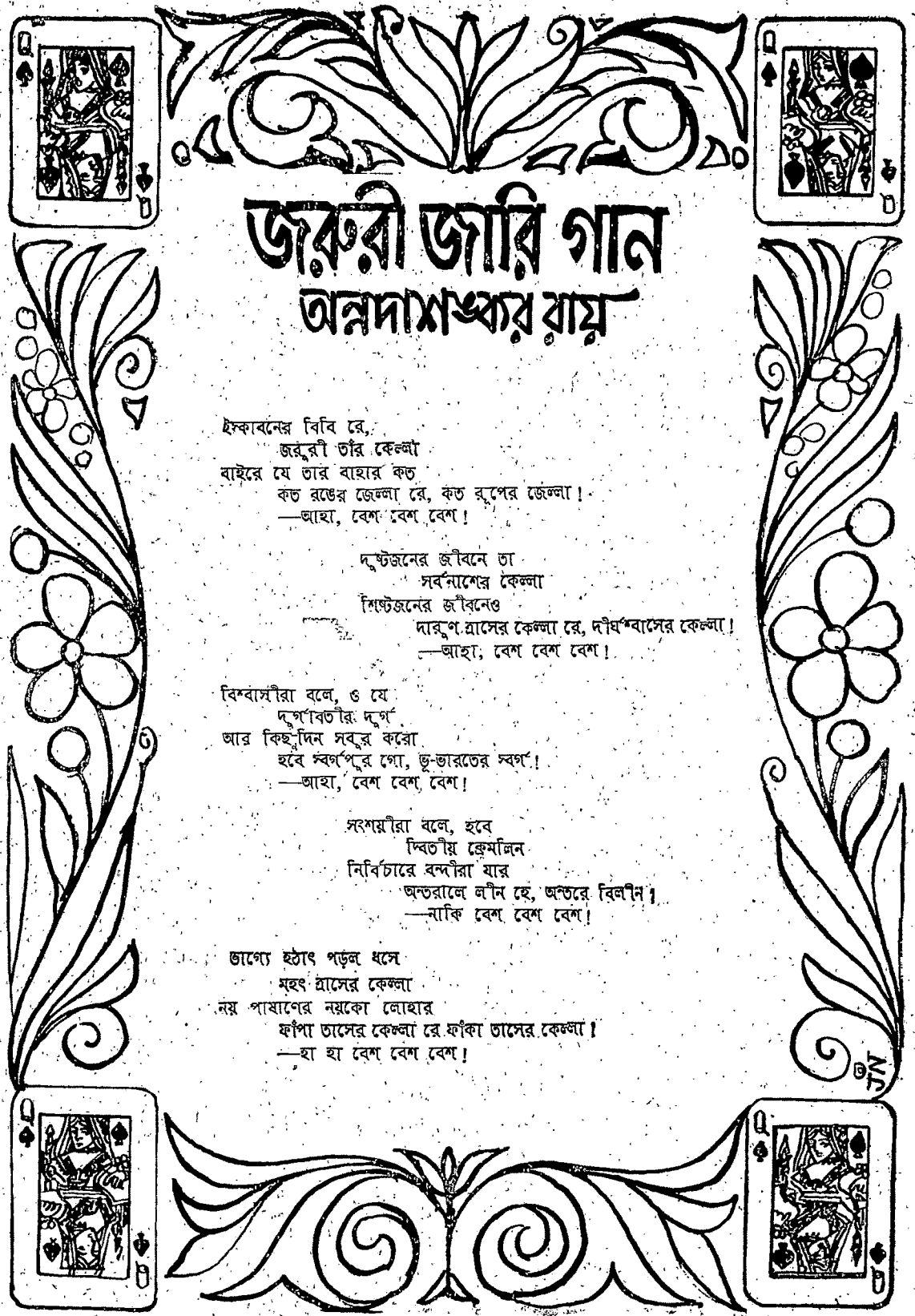

জরুরী জারি গান

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইস্কাবনের বিবি রে,
জরুরী তাঁর কেল্লা
বাইরে যে তার বাহার কত
কত রঙের জেল্লা রে, কত রূপের জেল্লা!
—আহা, বেশ বেশ বেশ!

দুষ্টজনের জীবনে তা
সর্বনাশের কেল্লা
শিষ্টজনের জীবনেও
দারুণ ত্রাসের কেল্লা রে, দীর্ঘশ্বাসের কেল্লা!
—আহা, বেশ বেশ বেশ!

বিশ্বাসীরা বলে, ও যে
দুর্গাবতীর দুর্গ
আর কিছুদিন সবুর করো
হবে স্বর্গপুর গো, ভূ-ভারতের স্বর্গ!
—আহা, বেশ বেশ বেশ!

সংশয়ীরা বলে, হবে
দ্বিতীয় ক্রেমলিন
নির্বিচারে বন্দীরা যার
অন্তরালে লীন হে, অন্তরে বিলীন!
—নাকি বেশ বেশ বেশ!

ভাগ্যে হঠাৎ পড়ল ধসে
মহৎ ত্রাসের কেল্লা
নয় পাষাণের নয়কো লোহার
ফাঁপা তাসের কেল্লা রে ফাঁকা তাসের কেল্লা!
—হা হা বেশ বেশ বেশ!

দু'নৌকোয় পরাশর শর্মা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সমুদ্র একেবারে কবি-সাহিত্যিকেরা ভুল করে যাকে বলে মরকত-নীল।

তীরের বালুকাবিস্তারে যেন একটু পুরোন সোনার বনেদী ঝিলিক।

আর নীল আকাশে শরতের সাদা মেঘগুলো যেন সত্যিই কোন পরীর দেশ থেকে হাওয়ায় উড়িয়ে আনা তাদের ওড়না।

এত কবিতা আমার মধ্যে ছিল দেখে যদি কেউ অবাক হ'ন তাঁকে অকপটে জানিয়ে দিচ্ছি, ওই তিন লাইনের কবিতা করতে আমার গলদঘর্ম হয়ে অন্ততঃ দু'টো কবিতার বই আর দু'টো অভিধান ঘাঁটতে হয়েছে।

তাতেই ত' জানতে পারলাম যে, মরকত-নীল বলে উচ্ছ্বাসটা স্রেফ মূর্খতা। মরকত মণিটি আসলে হ'ল পান্না, আর তার রং সবুজ।

তা গলদঘর্ম হয়ে কবিতের এ চেষ্টা আমার কেন, এই প্রশ্নই তারপরে অবশ্য আসে।

এ কবিতা যার সত্যিই সাজে তাকেই চিঠিতে সব খবর বিস্তারিত করে দেবার জন্যে এই কবিতা ভূমিকাটুকু।

আমি হলাম কৃত্তিবাস এটা যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা আমার বিবরণ-লিপি কার উদ্দেশে লেখা হচ্ছে তাও বোধহয় অনুমান করতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে কোথা থেকে আমি এ বিবরণ পাঠাতে যাচ্ছি তা অন্ততঃ প্রথম তিন লাইন থেকেই নিশ্চয় বুঝেছেন।

হ্যাঁ, ভুল আপনাদের কারুর হয় নি। আমার চিঠি পরাশরের উদ্দেশেই লেখা হচ্ছে, আর স্থানটা হ'ল পুরী।

প্রথমে পরাশরের প্রস্তাবটা শুনে উৎসাহিত হয়েছিলাম অবশ্য। যেমন উৎসাহিত হয়েছি তেমনি পরাশরের এ ধরনের একটা পরিকল্পনার আহাম্মকিতে কৌতুকবোধও করেছি যথেষ্ট।

পরাশরের পরিকল্পনাটা শুনলে বাইরের কেউ শুধু কৌতুক বোধই করবেন না, বুদ্ধিশুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধেও সন্দিহান হবেন হয়ত।

আমি অবশ্য তা হইনি। পরাশরকে ভালো করেই জানি বলে এটা তার কবি-মনের একটা খেয়াল বলেই প্রশ্রয়ের চোখে দেখেছি।

পরাশরের পরিকল্পনাটা এবার বলি। দিন সাতেক আগে হঠাৎ সে আমার অফিস-কাম-বাসায় এসে হাজির।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি তখন আমার অফিস ঘরেরই একটা ডেক-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় একটা নামকরা বিদেশী বিশ্ব-পর্যটনের ভৌগোলিক মাসিকের পাতা উল্টোচ্ছি।

পরাশরকে দেখে একটু অবাক হয়ে

মাসিকপত্রটা মুড়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, —হঠাৎ এমন সময়ে ?

অসময় কোথায় ?—পরাশর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বললে,—ধীরে-সুস্থে কথা বলার এই ত' ঠিক সময়। তোমার আজকের কাজকর্ম সব সারা, এমন কি বছরের দায়টাও শেষ হয়ে গেছে।

একটু জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে চাইতে পরাশর নিজের বক্তব্যটা বিস্তারিত করলে,—কি বলছি তা ত' বুঝতেই পারছ। তোমার পত্রিকায় পূজাসংখ্যা বার করবার সব হ্যাঙ্গামা ত' কাটিয়ে উঠেছ। এখন সামনে অবাধ ছুটি।

তা না হয় মানলাম!—তার কথায় একটু হেসে বললাম।—কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলো ত'। এত সব ভনিতা কিসের জন্যে ?

ভাবনা করবার মত কিছুর জন্যে নয়।—পরাশর সরলভাবে মাথা নাড়লে, —তোমার সামনের ছুটিটা আরো একটু উপভোগ্য করবার জন্যে।

এবার সন্দিগ্ধ না হয়ে পারলাম না। বললাম,—তোমার এসব প্যাঁচালো কথা ছাড়ো ত'। কি বলতে এমন সময়ে হঠাৎ উদয় হয়েছ তা স্পষ্ট করে বলো।

স্পষ্ট করে পরাশর যা বলেছে তাতে অবশ্য অবাকই হয়েছি। সত্যিই প্যাঁচালো-ঘোরালো কিছু নয়। বরং প্রস্তাব হিসেবে লোভনীয়ই বলা উচিত। শুধু এরকম প্রস্তাব যে করতে পারে তার কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে একটু কৌতুক মেশানো সন্দেহ হয়ত জাগে। তা, কাণ্ডজ্ঞানের জন্যে পরাশরকে কবে আর আমি ফুল মার্কস দিতে পেরেছি!

পরাশরের প্রস্তাবটা হল এই যে, সামনে আমার যখন কাজের অবকাশ আছে তখন আমি যেন কিছুদিনের জন্যে পুরীর সমুদ্রের তীরে গিয়ে কাটিয়ে আসি। সমুদ্রের ধারের একটা ভালো হোটেলের দোতলায় একটি সাগরমুখো বড় ডবলবেডের কামরা আগে থাকতে বুকই করা হয়েছে। আমার শুধু গিয়ে উঠলেই হ'ল।

পরাশরের সব কথা শুনে হাল্কা কৌতুকের সুরেই বলেছিলাম,—যা বললে তা ত' শুনতে ভালই লাগল। কিন্তু এর ভেতর ইংরেজিতে যাকে বলে 'ক্যাচ' সেই লুকোনো প্যাঁচ কি কিছু নেই!

কিচ্ছু না। কিচ্ছু না!—পরাশর আমায় আশ্বস্ত করেছে,—খরচ-খরচাও তোমার কিছু করতে হবে না।

উঁহুঃ—এবার একটু গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে বলেছি,—এবার ত' সরল বিশ্বাসে তোমার প্রস্তাবটা আর নিতে পারছি না! আমার খরচ-খরচা দিয়েও পুরী ঘুরিয়ে আনার এত গরজ হঠাৎ তোমার কেন!

আহা, গরজটা আমার হতে পারে, —পরাশর ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছে,—কিন্তু খরচ-খরচা কি আমি পকেট থেকে দিচ্ছি!

ও,—ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করে বলেছি,—খরচটা শেষ পর্যন্ত তোমার মক্কেলদের কাছ থেকেই আসবে। কিন্তু

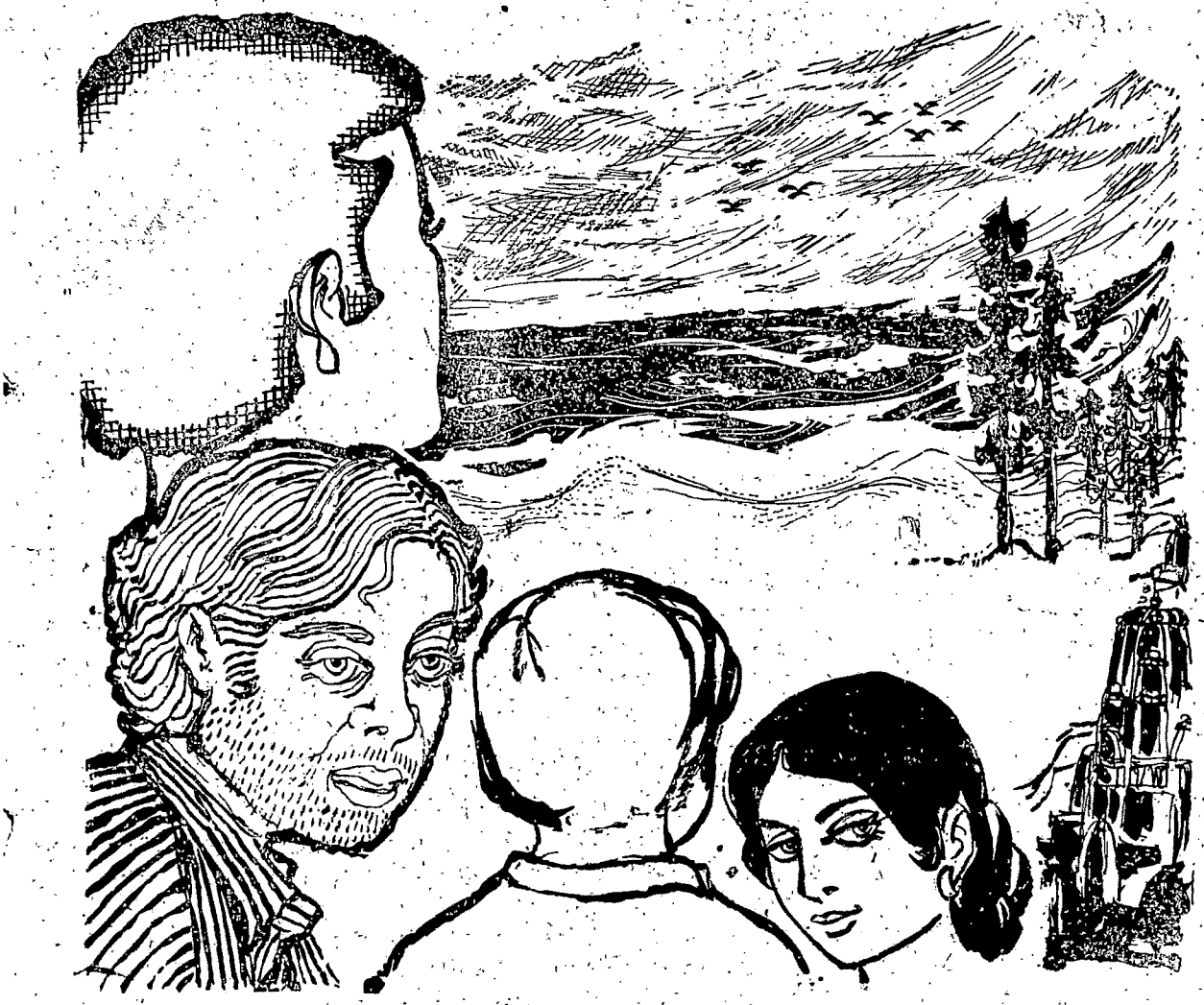

আমার জন্যে এ খরচা করে লাভ কি হবে তাদের ?

লাভ আর কারুর ত' নয়, আমার হবে!—পরাশর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছে এবার।—ক'দিন বাদে আমিও যাচ্ছি ত'। তখন তোমায় সঙ্গী হিসেবে পাব, এই আমার লাভ। ডবল-বেডের বড় কামরা এই জন্যেই নেওয়া।

এবার সত্যিই একটু বিমূঢ়ভাবে তার দিকে চেয়ে বলেছি,—ঠিক বলছ, তোমায় সঙ্গ দেওয়া ছাড়া আমার কোন দায় নেই ? যে ক'দিন তুমি যেতে না পারো সেখানে আমার ওপর কোনো ফরমাস তোমার থাকছে না ?

ফরমাস আবার কি ?—পরাশর যেন অবাক হয়েছে।—তোমার যদি ইচ্ছে করে, তোমার হোটেলের অন্য বোর্ডারদের কথা আমায় একটু-আধটু লিখতে পারো।

হোটেলের অন্য বোর্ডারদের কথা লিখব!— হেসে উঠে বলেছি—যে বড় হোটেলের কথা বলছ সেখানে বোর্ডার কি একটা নাকি! কম সে কম শ'খানেক ত' হবেই।

আরে সব বোর্ডারের কথা কে বলছে ?—পরাশরও হেসে বলেছে—তোমার কামরা যেখানে সেই দোতলার বোর্ডারদের কথা যদি লেখবার মত কিছু মনে হয় তাহলে লিখো। এটা তোমার কড়ার-করা কোনো দায় নয়।

মন চাইলে ওই ক'জন বোর্ডারের কথা তোমায় একটু-আধটু লিখে জানাতে বলছ শুধু! আর কিছু ত' নয়?—এবার খুশি মুখেই বলেছি,—বেশ রাজী হ'লাম তোমার প্রস্তাবে।

সেই ব্যবস্থা মত এ হোটেলে এসে উঠেছি আজ দিন সাতেক। সত্যি কথা বলতে গেলে রীতিমত উপভোগই করছি দিনগুলো। এখন আবহাওয়া যাকে বলে একেবারে আদর্শ। শীতের দিন কিন্তু সমুদ্রের ধারে তার হাওয়ায় কোনো কামড় নেই। মোলায়েম মধুর একটু ঠাণ্ডার ছোঁয়া শরীর, মন সব তাজা করে রাখে। আর শীতের রোদে আর হাওয়ায় সমুদ্র ত' দিগন্তছোঁয়া রুপোলী ঝিলিক দেওয়া নীল আনন্দের তরঙ্গ।

আমার মত নীরস মানুষের কলম দিয়েও যে এসব কবিত্বের ছিটে-ফোঁটা বার হচ্ছে তাতেই বোঝা যায় জায়গাটা কি ভালোই লাগছে।

আমার বোর্ডার সঙ্গীদের কথা লিখতেও প্রথমে খুব মজা পেয়েছি। মানুষকে একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলে আগ্রহ জাগাবার মত কত কিছুই যে চোখে পড়ে।

হোটেলে আমার দিকের দোতলার হাতায় আপাতত আমি ছাড়া আর মাত্র তিন ঘর বোর্ডার আছেন। এ দিকের সব-ক'টি কামরাই ডবল বেড। তার মধ্যে পুবে কোণের একটিমাত্র কামরাই এখনো খালি।

আমার কামরার নম্বর দুই। আমার ডান দিকে ডবল বেড কামরাটির নম্বর এক। সেই কামরাটিতেই এখন কোনো বোর্ডার নেই। আমার বাঁ দিকের কামরাটি সে অভাব পূরণ করে দিয়েছে। চ্যাঁ ভ্যাঁ করা বাচ্চা-টচ্চা থেকে পাকাচুল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে হাঁটা বুড়ো পর্যন্ত অন্তত গুটি আষ্টেক জনের একটি পরিবার তা কামরাটিতে আছে।

কামরাটি অবশ্য এই হাতার মধ্যে সবচেয়ে বড়। এইরকম পরিবারের কুলোবার জন্যেই কামরাটি ডবল বেডের বদলে চার বেডের। বাড়তি দুটি খাট আনিয়ে এ পরিবার তাঁদের সাবালকদের থাকার সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছেন। বাকি নাবালক দু'জনের মধ্যে একজন একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু। অন্যটিও বছর আট-নয়ের একটি খুব চটপটে চালাক-চতুর ছেলে। শিশুটি তার মায়ের কাছেই থাকে। আর ছেলেটি নিশ্চয় বড়দের কারুর না কারুর বিছানায় সঙ্গী হচ্ছে নিশ্চয়।

কামরার খাট-বিছানার এত খবর আমার জানবার নয়, কিন্তু তা জানতে হয়েছে বুবুর উৎসাহে। বুবু ও পরিবারের সেই ছোট্ট ছেলেটি। এ হাতার সমস্ত বোর্ডারের মধ্যে তার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে আমার প্রথম। আলাপ অবশ্য আমার চেষ্টা করে করতে হয়নি। সে-ই নিজে থেকে আমার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে।

বুবুর কথা পরে সবিস্তারে বলতে হবে। তার সঙ্গে অন্য দুটি কামরার বোর্ডারদের কথা সেরে নেওয়া দরকার।

আমার পাশের তিন নম্বর কেবিনের পর আমাদের সকলের এজমালি সামনের করিডর থেকে একটি ফ্যাকড়া সমুদ্রের দিকের বারান্দায় পৌঁছে দিয়েছে। নীচেরতলার ঝোলানো বারান্দাটি বেশ প্রশস্ত। এ হাতায় বোর্ডাররা নীচে না নেমে দোতলা থেকেই যাতে সমুদ্রের হাওয়া আর দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন তার জন্যে নানা আকারের কয়েকটি আরামকেদারা আর সোফা সেখানে সমুদ্রের দিকে মুখ করে পাতা।

এই ঝোলানো বারান্দায় আসবার শাখা করিডরের পরেই চার নম্বর ডবল বেড কেবিন। একজন বর্ষিয়সী মহিলা আর চেহারা, বয়স দেখে মনে হয় তাঁর ছেলেই সে কামরাটিতে আছেন।

তার পরের পাঁচ নম্বর কামরার বোর্ডারদেরই প্রথম দিন থেকেই কেমন একটু সহজ সাধারণ মনে হয় নি।

প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক আর একটি তরুণী মহিলা সে কামরার বোর্ডার।

তরুণীকে প্রথমে ভদ্রলোকের মেয়েই মনে হয়েছিল। তারপর জেনেছি, মেয়ে নয়, তিনি প্রৌঢ়ের স্ত্রী। প্রৌঢ় যাঁকে বলছি মাথার পাকা চুল আর মুখের চামড়ার কিছু কুঞ্চনে ছাড়া বয়সের ভারের কোনো চিহ্ন তাঁর মধ্যে নেই। পোশাকে-প্রসাধনে রীতিমত সৌখিন মানুষ। চুল পাকলেও মাথায় টাক পড়ে নি, চুল বেশ ঘনই আছে। সে চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। পায়ের জুতোজোড়া থেকে পরনের ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর পর্যন্ত সব কিছুতে একটা সমৃদ্ধ আভিজাত্যের ছাপ।

ভদ্রলোক তার ওপর বেশ একটু অহঙ্কারী বলেই মনে হয়। প্রথম কয়েক-দিনের মধ্যে বাইরে সমুদ্রের ধারে ও হোটেলের দোতলায় যেতে-আসতে দু'-দশবার যে দেখা হয়েছে তাতে উনি কোন-রকম সম্ভাষণ দূরে থাক আমাকে যেন লক্ষ্য করবার উপযুক্তও মনে করেন নি।

প্রথমে তরুণীটিকে তাঁর মেয়ে ভাবলেও ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর শুধু বয়সের নয়, আরো কিছু তফাৎ লক্ষ্য করে আমি কিন্তু অবাক হয়েছি।

মেয়েটিকে ঠিক সুন্দরী যদি নাও বলি, সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারায় সে যে রীতিমত আকর্ষণীয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মেয়েটি পোশাক-আশাকে, প্রসাধন সম্বন্ধে কিন্তু একেবারে উদাসীন।

যিনি নিজে অমন সুবেশ, সৌখিন, মেয়ের সাজ-সজ্জায় এই অবহেলা তাঁর কেন চোখে পড়ে না ভেবে প্রথমে অবাক হয়েছি। মেয়েটি তাঁর স্ত্রী জানবার পর সে বিস্ময় আরো বেড়েছে।

প্রৌঢ়ের তরুণী স্ত্রী হবার দুর্ভাগ্যেই মেয়েটির সবরকম সৌখিনতায় এমন বিরাগ যে ভাবব তারও উপায় নেই। তরুণীটি শুধু অনুগত স্ত্রী নয়, স্বামীর যেন মুগ্ধ সেবিকা। স্বামীকে ছায়ার মত অনুসরণ সে ত' করেই, স্বামীর সামান্য একটু প্রসন্নতার জন্যে সে যে কতখানি ব্যাকুল তার ছোটখাট নিদর্শন আমাদের দু'-চারবারের ক্ষণিক দেখা-শোনাতেই লক্ষ্য-গোচর হয়েছে।

এ হাতার কামরাগুলি সামঞ্জস্য

রাখবার জন্যে পাঁচ নম্বর কামরার পর ছ' নম্বর আরো একটি কামরা আছে। তবে সেটি হোটেলের একটা বাড়তি স্টোর-রুম। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ-টিনিষেরও নয়; কারণ সারাক্ষণ তালাবন্ধই থাকতে দেখি।

এ হোটেলে এসে ওঠবার পর প্রথম চিঠিতে পরাশরকে আমার প্রতিবেশী বাসিন্দাদের এই সব পরিচয়ের বেশী আর কিছু জানাতে পারি নি।

এর চেয়ে অনেক রসালো চিঠি লেখার সুযোগ হয়েছে পরের বার।

সুযোগটা হয়েছে বুবুর জন্যেই।

তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার হোটেলে থাকাটাই মনোরম হয়ে উঠেছে।

আলাপটা তার সঙ্গে অবশ্য আমি করতামই। তবে সে নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে আসায় ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়েছে।

হোটেলে এসে ওঠবার পর সেটা দ্বিতীয় দিন। দুপুরের খাওয়ার পর দিবানিদ্রাটা বাদ দেবার জন্যে আমাদের এজমালি খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের তখনকার চেহারাটা দেখছিলাম।

সমুদ্রতীর এখন একেবারে নির্জন বললেই হয়। সমুদ্রস্নানে উৎসাহীরা অনেক আগেই ঢেউ-এর বাহিনীর সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে গেছে। লুলিয়া বা জেলেদের কাউকেও সেখানে দেখা যাচ্ছে না। এখন সমুদ্রতীরটা যেন একপাল কাক আর ক'টা বেওয়ারিশ কুকুরেরই দখলে।

কাকগুলো নির্জন তীরের বালিতে জমায়েত হয়ে কি খুঁজছে। দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে পাশেই মিহি সরু অথচ বেশ সপ্রতিভ গলার প্রশ্নে চমকে উঠেছি।

গলার আওয়াজে যেমন চমক লেগেছে, প্রশ্নটিতে তেমনি কৌতুক বোধ করেছি।

প্রশ্নটা হ'ল,—আপনি সাঁতার জানেন?

পাশের দিকে চেয়ে প্রশ্নকর্তাকে এবার দেখতে পেয়েছি। আমার পাশের কামরার সেই ছোট্ট ছেলেটিকে ওপরে-নীচে ও সমুদ্রের ধারে এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার দেখলেও যার পরিচয় তখনও জানি না।

সাঁতার!—ছেলেটির প্রশ্নটা বেশ গভীরভাবে বিবেচনা করে জবাব দিয়েছি,—তা একটু জানি বইকি!

জানেন!—ছেলেটি এবার উৎসাহিত হলেও সন্দিগ্ধ,—আজ তাহলে স্নান করতে যান নি কেন?

সাঁতার জানা সত্ত্বেও সমুদ্রে স্নান করতে না যাওয়ার একটা ভালো কৈফিয়ৎ চটপট দিতে পেরেছি।—এই প্রথম দু'দিন এসেছি কি না সমুদ্রের হাল-চাল তাই আগে একটু ওপর থেকে বুঝে নিচ্ছি বলে স্নান করতে যাই নি।

এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হয়ে ছেলেটি বলেছে,—তাই এখন এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রটা দেখে নিচ্ছেন, না! আচ্ছা দাঁড়ান, আরো ভালো করে দেখবেন এবার। আমার দূরবীন আছে। আনছি।

কথা বলতে বলতেই ছেলেটিকে দৌড়ে ভেতরের দিকে যেতে দেখে ব্যস্ত দাঁড়ান, আরো ভালো করে দেখবেন খোকা শোনো! শুনে যাও। দূরবীন আনতে হবে না এখন।

ছেলেটি যাওয়া থামিয়ে ফিরে এসেছে, কিন্তু রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে। সেই অপমানিত ক্ষুব্ধ স্বরেই বলেছে,—বেশ দূরবীন আনব না, কিন্তু আমায় এই খোকা বলে ডাকবেন না। আমার নাম বুবু।

এরকম একটা নাম না জানবার জন্যে লজ্জিতভাবে অপরাধ স্বীকার করে বলেছি,—না, আমার খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে জানো! এ সময়ে দূরবীন এনে কোনো লাভ হ'ত না।

কেন?—বুবু আবার একটু সন্দিগ্ধ।

মানে,—একটু আমতা আমতা করেই কারণটা উদ্ভাবন করতে হয়েছে,—দুপুরবেলার আলোয় দূরবীনে দেখার মাপ-টাপ একটু বদলে যায় কিনা।

বুবু কি বুঝেছে ঠিক জানি না; কিন্তু এ প্রশ্ন ছেড়ে নতুন প্রশ্নে চলে গেছে।

—আপনি সমুদ্রটা পার হতে পারেন?

কিসে পার হবার কথা বলছ!—আমাকে একটু ভাবনায় পড়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে,—জাহাজে?

না, না, জাহাজে নয়।—বুবু আমার বুদ্ধির অভাবে অবাক হয়েছে,—জাহাজে ত' সবাই পারে। সাঁতরে এ সমুদ্র পার হতে পারেন?

সাঁতরে?—আমায় গভীরভাবে বিবেচনা করে উত্তর দিতে হয়েছে, তা বোধহয় পারি না।

আমার অক্ষমতায় তেমন হতাশ না হয়ে বুবু বলেছে,—আমি বড় হয়ে সাঁতার শিখে ঠিক সমুদ্র পার হব দেখবেন।

বুবুর এ কীর্তি দেখবার আশায় উৎফুল্ল হয়ে এবার বলেছি,—তাহলে এখন থেকে সাঁতারটা শিখতে আরম্ভ করো।

তাই ত' শিখতে চাই।—বুবু বেশ দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছে,—কিন্তু মেজ-মামা ন'মামা কিছুতেই শেখাতে চায় না। আর লুলিয়াদের হাত ধরে একটু বেশী-ক্ষণ ঢেউ খাব তাও মা কেবলি ওঠ ওঠ করে তুলে দেয়।

শাসন বিভাগের এ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বুবুকে একটু সহানুভূতি দেখাতেই বুবুর কাছ থেকে সেত্রতের তোড়ে আরও বহু নালিশ আর সেই সঙ্গে তাদের পরিবারের বিবরণ বেরিয়ে এসেছে।

বুবুর দুই মামাই ভালো সাঁতারু। মেজমামা ত' ক'বছর আগে সাঁতারের মেডেল পেয়েছে। তার মা-ও বিয়ের আগে কাশীর গঙ্গায় সাঁতার কেটে এপার-ওপার করতেন বলে দিদার কাছে গল্প শুনেছে। তার ছোটমাসীই শুধু কাশীর মেয়ে হয়েও সাঁতার-টাতার কিছু জানে না। ছোটমাসী ত' সত্যিই বুবুর নিজের মাসী নয়, দাদু তাকে কাশীর ঘাট থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি বুবুর কাছে তাদের পরিবারের ইতিহাস, ভূগোল অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছি।

শুধু নিজেদের পরিচয় কেন, বুবু আমাদের দোতলায় এ হাতার সব বোর্ডারদের খবরই কিছু না কিছু রখে।

সাঁতার শেখবার প্রতিবন্ধক থেকে নিজেদের পরিবারের কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ বলেছে,—আপনার একটা চিঠি এসেছে যে। এখনো নেন নি!

আমার চিঠি!—সত্যি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, আমার চিঠি এসেছে কি করে জানলে!

বাঃ আমি যে চিঠিটা দেখলাম! খামের ভেতর বেশ মোটা চিঠি।—বুবু আমায় বিশদ সংবাদ দিয়েছে।

তুমি আমার চিঠি দেখলে!—আমি সত্যিই বিমূঢ়।—কোথায় দেখলে? আর আমার চিঠি বুঝলে কি করে?

বোঝা আবার শক্ত কি?—বুবু বলেছে,—আপনার নামই ত' লেখা রয়েছে খামের ওপর।

বুবুকে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধির দৌড় সম্বন্ধে হতাশ করবার ঝুঁকি নিয়েও জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে সবিস্ময়ে,—আমার নাম তুমি জানো! কেমন করে জানলে!

জানা ত' খুব সোজা—বুবু এটা তার বাহাদুরীই মনে করে নি কিন্তু পরাশরকেও অবাক করবার মত যুক্তি-শৃঙ্খল দিয়ে বলেছে, ওপরের আর

সকলের নাম ত' জানি। তাদের কারুর চিঠি যখন নয় তখন আপনার ছাড়া আর কার চিঠি ওপরের ডাকবাক্সে থাকবে!

ওপরের ডাকবাক্স! ওপরে তাহলে দোতলায় বোর্ডারদের জন্যে আলাদা একটা ডাকবাক্স আছে যা আমি এখনো লক্ষ্য করিনি।

আমার এ কথাগুলো মনে মনে ভেবে নেবার আগেই বুবু উৎসাহভরে বলেছে,—আনব আপনার চিঠিটা?

আমার সম্মতির জন্যে সে যে আর অপেক্ষা করে নি তা বলাই বাহুল্য। মিনিটখানেকের মধ্যে চিঠিটা এনে আমার হাতে দিয়ে গর্বভরে বলেছে,—কেমন ঠিক বলেছিলাম কি না।

ঠিকই বলেছে বুবু। চিঠিটা আমারই এবং পরাশরের লেখা।

এই দু'দিন না যেতে যেতে হঠাৎ এত মোটা চিঠি লিখে জানাবার মত কি লিখল আমায় পরাশর!

বুবুর সঙ্গে আলাপটায় ওইখানে সাময়িক দাঁড়ি টেনে চিঠিটা নিয়ে নিজের কামরায় গিয়েছি।

খামটা খুলে কিন্তু অবাক। চিঠিটা লেখা কাগজের জন্যে অত মোটা হয় নি। খামের মধ্যে ভালো করে দু'ভাঁজ কাগজে মোড়া একটি ফটো।

তারই সঙ্গে নেহাত চার লাইনের একটি চিঠির চিরকুট। তাতে লেখা,—তোমার চিঠি পেলাম, তোমার পাশের এক নম্বর কামরায় বোর্ডার এলে আমায় জানিও। একটা ফটো পাঠালাম। দেখো ত' বোর্ডারদের কারুর সঙ্গে চেহারাটা মেলে কি না। ইতি পরাশর।

ফটো বেশ সুপুরুষ ছিপছিপে অ্যাথলেট গোছের চেহারার একজন তরুণের।

ওপরের বোর্ডার যাদের এ পর্যন্ত দেখেছি তাদের কারুর সঙ্গেই এ ফটোর মিল নেই।

এক নম্বরে যদি কেউ আসে তাদের কারুর সঙ্গে মিলবে কি না জানি না।

এক নম্বর কামরা তার পরের দিনই ভর্তি হয়ে গেল। বোর্ডার তিনটি তরুণ ছেলেই বটে। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গেই ফটোর চেহারার কোনো মিল নেই।

ফটোর চেহারায় বা তরুণ বোর্ডারদের কারুর মুখে দাড়ি-গোঁফ থাকলেও তার আড়ালে চেহারার মিল লুকোনো আছে ভাবা যেত। কিন্তু ফটোতে যেমন তরুণ পুরুষ বোর্ডারদের সকলেরই মুখ একেবারে চাঁচা-ছোলা পরিষ্কার।

ওদিক দিয়ে ভুল করবার কোনো সম্ভাবনাই তাই নেই।

কিন্তু পরাশর ত' আমায় নির্দোষ নির্ঝঞ্ঝাট একটু সমুদ্রতীরে ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়েছে।

তার মন্তব্য আবার এ সব চেহারার মিল খোঁজার রহস্য কেন?

চেহারার মিল খুঁজে বার করতে না পারলেও পরাশরকে এর পরের সব চিঠিতে বোর্ডারদের সম্বন্ধে নতুন নতুন অনেক খবর কিন্তু যোগাতে পারলাম।

বেশীর ভাগ এসব খবর অবশ্য আমাদের বুবুর দৌলতে পাওয়া।

বুবু এখন আমার প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। দোতলায় ঝোলা বারান্দায় গিয়ে তাকে ধরতে হয় না। সময়ে-অসময়ে সে আমার কামরাতেই নিজে থেকে আসে।

সকাল বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াবার সময়ও বেশীর ভাগ সে আমার সঙ্গী হয়।

কারণটা বোধহয় এই যে, আমার মত মুগ্ধ উৎগ্রীব শ্রোতা তার কাছে বেশ দুর্লভ। বড় বেশী কথা বলে বলে বাড়ির লোক ত' বটেই, বোর্ডারদের অন্য কেউ তাকে বিশেষ আমল দিতে চায় না।

আমি কিন্তু তাকে কথা বলাতেই চাই আর এ ঔৎসুক্যের পূর্ণ সুযোগ বুবু নেয়।

তার কাছে খবর সংগ্রহের জন্যে তাকে কথা বলানতে আমার স্বার্থ আছে ঠিকই, কিন্তু সে স্বার্থ না থাকলেও তার বকবকানিতে আমি অন্তত বিরক্ত হতাম না।

কত কিছুই সে জানে! আর কত কি লক্ষ্য করে শুনলে মজা যেমন লাগে তেমনি অবাক হ'তে হয়।

তার কাছেই অন্য বোর্ডারদের নাম-ধাম ইত্যাদি অনেক পরিচয় আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

পাঁচ নম্বর কামরায় সৌখিন ও অহঙ্কারী প্রেফের নাম দীননাথ রাহা। তাঁর নাকি প্রায় প্রত্যেক দিন চার-পাঁচটা করে চিঠি আসে।

সে দিক দিয়ে চার নম্বরের মা ও ছেলের নামে চিঠি আসে না বললেই হয়। দিন কয়েক আগে ছেলের নামে একটা মনি-অর্ডার এসেছিল শুধু। মনি-অর্ডারে নামের ভুল ছিল বলে পিওন টাকা দিতে একটু গড়িমসি করেছিল। তারপর হোটেলের ম্যানেজার গ্যারান্টি দেওয়ায় পিওন আর আপত্তি করে নি।

এ পর্যন্ত শুনে বুবুর লক্ষ্য করার ক্ষমতায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কত টাকার মনি-অর্ডার জানো?

হ্যাঁ জানি।—বুবু মুরুব্বির মত বলেছিল,—মোটে পঞ্চাশ টাকা। দাদুরও সেদিন মনি-অর্ডার এসেছিল কিনা। দাদু তাই পিওনকে ওই সামান্য টাকার জন্যে গোলমাল করতে বারণ করেছিল।

বুবুর মনি-অর্ডারের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞানটা দাদুর কাছ থেকেই শোনা তা বুঝেছিলাম। কিন্তু তার খুঁটিয়ে দেখবার-শোনবার ক্ষমতাটা আর একটু যাচাই করবার জন্যে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—মনি-অর্ডারে নামের কি তফাৎ হয়েছিল?

তফাৎ কিছুই এমন হয়নি।—বুবু এবারও বোধহয় দাদুর কাছে শোনা কথাটা আউড়ে দিল,—ভদ্রলোকের নাম অমল গুপ্ত। মনি-অর্ডারে লেখা ছিল অমলের জায়গায় অনল। এম-এর জায়গায় এন এটা কি এমন ভুল?

প্রশ্নটা বুবু আমাকেই করেছিল বলে চটপট তাকে সমর্থন করে বলতে হয়েছিল,—না, এ তো বলতে গেলে ভুলই নয়।

বুবু খুশি হয়ে আর একটা নতুন বিশেষ সংবাদ দিয়েছিল এবার—জানেন অমলবাবু কিন্তু খারাপ লোক।

খারাপ লোক!—আমি উৎসুক হয়ে বুবুর দিকে চেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, খুব খারাপ!—বুবু রীতিমত গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—মাকে একদিনও মন্দিরে ঠাকুর-টাকুর দেখাতে নিয়ে যায় না। ওর মা কত করে সাধেন তবু তাঁর কথা না শুনে যা তা বলে বকাবকি করে।

সত্যি?—আমি কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বুবু তাতে জোর গলায় আমায় বলেছিল,—হ্যাঁ সত্যি, আমি নিজের কানে শুনেছি। দিদা সেদিন জগন্নাথের পুজো দিয়ে এসে অমলবাবুর মা'র কাছে প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম কি না! দরজা বন্ধ দেখে ধাক্কা দিতে গিয়ে শুনতে পেলাম অমলবাবু খুব জোরে জোরে মাকে যা তা বলছে আর ওর মা কাঁদছেন। আমি দরজায় ধাক্কা না দিয়ে চলে এসেছি। কেমন ঠিক করি নি?

নিশ্চয়ই!—বুবুকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, জিজ্ঞাসা করেছি,—ফিরে গিয়ে দিদার কাছে এসব কথা বলেছ নাকি?

বুবু সজোরে মাথা নেড়ে বলেছিল,—তা কখনো বলি! তাহলে দিদাই ত' শুধু নয় মেজমামা, নমামা সবাই বলবে, পাকা ছেলে, তোর অত আড়ি পাতার দরকার কি! তোকে প্রসাদ দিতে

পাঠিয়েছি প্রসাদ দিয়ে চলে আসিস নি কেন? তাই শুধু বলেছি, ওদের দরজা বন্ধ, ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে চলে এসেছি।

কেন যে সঙ্গী হিসেবে বুবুর কাছে আমার এত কদর তা আরো ভালো করে বুঝে বলেছিলাম,—তাহলে তুমি বলছ অমলবাবু ভালো লোক নয়!

তা ত' নয়ই।—বুবু আমার বুদ্ধির জড়তায় বেশ আশ্চর্য হয়ে বলেছিল,—নিজের মাকে যে গালমন্দ করে সে কখনো ভালো লোক হতে পারে।

এ অকাট্য যুক্তি মানতে বাধ্য হয়ে বলেছিলাম,—ঠিক! ঠিক। তুমি একেবারে খাঁটি কথা বলেছ।

আমার প্রশংসায় অত্যন্ত খুশি হয়ে বুবু আরো অনেক খবর আমায় দিয়েছিল।

এক নম্বর কামরায় নতুন যে তিনজন বোর্ডার এসেছে তাদের নামও বুবুর জানা হয়ে গেছে। ঠিক পুরো নাম নয় তার প্রথম নামের আদ্যাক্ষর আর পদবীগুলো সে জেনে ফেলেছে।

কেমন করে?—আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করেছি।

তাদের তিনজনের নামে তিনটে নেমন্তন্নের কার্ড ওদের আসবার পরেই যে এসেছে!—বুবু বেশ উচ্ছ্বসিত হয়েছে কার্ডগুলোর বর্ণনায়,—কি চমৎকার ছবি-আঁকা সোনার জলে ছাপা কার্ড। তিনটেই একই বিয়ের নেমন্তন্নের। একটার ওপর এস লাহিড়ী, আর একটায় এল মজুমদার, আর বাকিটায় পি বিশ্বাস লেখা।

তুমি এ বিয়ের নেমন্তন্নের কার্ড দেখলে কোথায়?—গলাটা খুব খুশি রাখতে পারিনি,—ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি এরই মধ্যে! ওদের ঘরে গিয়েছিলে?

ওদের সঙ্গে আলাপও হয়নি। ওদের ঘরেও যাইনি।—বুবু অম্লানবদনে সহজভাবে বলেছে,—ওগুলো ত' আমি লেটার-বক্সে দেখেছি।

তুমি তাহলে রোজ লেটার-বক্স ঘেঁটে সকলের চিঠি দেখো!—এবার অপ্রসন্নতাটা আর অস্পষ্ট রাখিনি।

বুবু কিন্তু তার নীতিবোধের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েই আমায় চুপ করিয়ে দিয়েছে। বলেছে,—হ্যাঁ দেখি নি ত'। তাতে কি হয়েছে! আমি কি চিঠি পড়ি নাকি? আমি ত' শুধু নাম-ঠিকানা কি লেখা আছে দেখি।

নীতিবোধের এই ব্যাখ্যার ওপরে আমি আর বলবার কিছু পাইনি।

শুধু পরের দিন তার এই নির্দোষ কৌতূহলের ফলে যে খবরটি সে আমায় দিয়েছে তাতে বেশ একটু বিচলিত না হয়ে পারিনি।

সকালে মন্দিরের দিকে একটু দেবদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরবার পরে সিঁড়িতে ওঠবার মুখে বুবু বেশ ব্যস্ত ও উত্তেজিত হয়ে আমায় খবর দিলে—আপনার নামে একটা পোস্টকার্ড এসেছে যে! কে লিখেছে জানেন?

কি করে জানব—কৌতুকের স্বরেই বললাম—কোনো রাজা মহারাজা নিশ্চয়।

আমায় পোস্টকার্ডে কে চিঠি লিখতে পারে ভেবে মনে মনে তখন অবশ্য একটু অবাকই হচ্ছি। অফিসের কোন চিঠি আসবারই কথা নয়, আর সেখান থেকে চিঠি যদি কেউ দেয়ও ত' পোস্টকার্ডে দেবে না।

আমায় সংশয়ের মধ্যে অবশ্য কয়েক সেকেন্ডের বেশী থাকতে হল না। বুবু নিজেই তার সংবাদটা জানাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, বললে—সেই যিনি আপনাকে সব চিঠি দেন তিনিই লিখেছেন।

তিনিই লিখেছেন! পরাশরের চিঠি—আমি সত্যিই অবাক হয়ে প্রথমেই ওপরে লেটার-বক্স থেকে পোস্টকার্ডটা বার করে নিলাম। চিঠিটা পরাশরের লেখা ঠিকই, কিন্তু তা পড়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম পরাশরের আহাম্মকিতে।

এ পরাশর করেছে কি, সত্যিই কি তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্রথমত পোস্টকার্ডে চিঠি লেখাই তার পক্ষে অস্বাভাবিক, তার ওপর চিঠিতে যে বক্তব্য সে জানিয়েছে তা কেউ কখনো পোস্টকার্ডে লেখে!

পোস্টকার্ডটা লেটার-বক্সের কাছে দাঁড়িয়েই পড়ে ফেলে সেটা পকেটে রেখে নিজের কামরার দিকে যেতে গিয়ে বুবুর দিকে চোখ পড়ল।

সে উৎসুক হয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে চমকে উঠলাম। যে ভাবে পোস্টকার্ডটার খবর বুবু খানিক আগে আমায় দিয়েছে আর এখন তার মুখ চোখে যা ফুটে উঠেছে সেটা ত' শুধু ঔৎসুক্য নয়, তার মধ্যে উত্তেজনার আভাসও দেখা যাচ্ছে কেন?

বুবু কি তাহলে পোস্টকার্ডটা পড়ে দেখেছে! শুধু নাম ঠিকানা নয়, সুবোধ থাকলে লেটার-বক্সের চিঠিও পড়ে-টরে নাকি!

তখন আর তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। আমার দ্বিধাটা কাটিয়ে ওঠবার আগে সে হঠাৎ চলেও গিয়েছিল সেখান থেকে।

নিজের কামরায় গিয়ে পোস্টকার্ডটা আর একবার পড়ে আমার বিস্ময়-বিমূঢ়তা আরো বেড়েছে বই কমে নি।

প্রথমত পরাশর যা লিখেছে তা-ই নেহাত ছেলেমানুষী কথা।

হোট্ট ক'লাইনের চিঠি, পরাশর তাতে মামুলী সম্বোধনের পর লিখেছে—তোমার

—আপনি কি বাঙ্গালী?

—অসহায় অবক্ষয়ের উপরে উঠতে চান?

—থোড় বড়ি খাড়ায় ঘেরা বাঙ্গালী জীবনের চেয়ে বড় কিছুর স্বপ্ন দেখেন? সন্ধান করেন?

—তাহলে পড়ুন দেবেশ দাশের এই অসামান্য উপন্যাস

জীবনের চেয়ে বড়

নিজেই বিচার করুন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আরেকটি এমন উপন্যাস পড়েছেন কি না।

এ, মুখার্জী য়্যাণ্ড কোং (মূল্য ১৫৲)
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

চিঠিতে সব বিবরণ বর্ণনা পড়ে খুশি হচ্ছি।

এখন একটা জরুরী কথা জানাচ্ছি, একজন বা দু'জন কেউ তোমাদের দোতলায় খুন হতে যাচ্ছে। কে বা কারা খুন হতে পারে, আর কার খুনী হওয়া সম্ভব ভালো করে সব দিকে লক্ষ্য রেখে বার করবার চেষ্টা করো। ইতি পরাশর।

হাতের কাছে খাম-টাম না পেয়ে পরাশরের পোষ্টকার্ডেই একটা চিঠি লেখার মানে না হয় বুঝতে পারি। কিন্তু তাই বলে যত আজগুবী ছেলেমানুষী বক্তব্যই হোক এ কথা কি কেউ খোলা পোষ্টকার্ডে লেখে!

পরাশরের ওপর যতই খাপ্পা হই, তার চিঠির নির্দেশটা মন থেকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না।

কে বা কারা খুন হতে পারে, আর খুনী হওয়া কার পক্ষে সম্ভব, সকলের ওপর লক্ষ্য রেখে পরাশর বোঝবার চেষ্টা করতে বলেছে।

ওপরে আমার লক্ষ্য করবার ত' এই ক'টি মাত্র কামরার লোক। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ খুন হতে যাচ্ছে, আর কেউ তা করবার মতলব ভাঁজছে এ কি কখনো ভাবা যায়! এ ত' নেহাত আজগুবী কল্পনা।

এক এক করে কামরাগুলোর বাসিন্দাদের কথা আবার ভালো করে ভেবে দেখি।

এক নম্বর কামরা এখন আর খালি নয়। তাতে যে তিনজন ছোকরা এসেছে তাদের কেউই খুন হবে বা খুন করবে এমন হতে পারে?

নেহাত সাধারণ আজকালকার স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ গোছের ছেলে। সিনেমা আর খেলাধুলো ছাড়া মাথায় কোনো চিন্তা আছে বলেও ত' মনে হয় না। একজন না একজনের মুখে চলতি হিন্দী বই-এর গান থেকে থেকে উথলে উঠছে। তর্কাতর্কিও মাঝে মাঝে হচ্ছে শুধু খেলাধুলো নিয়ে। এ মরশুমে ইন্ডিয়ার ক্রিকেট টিমে কার যাওয়া উচিত তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি।

এসে অবধি সকাল থেকে দুপুর অবধি ত' সমুদ্রেই কাটায়, তারপর ফিরে এসে একটা লম্বা ঘুম। বিকেলে তিনজনেই খুব সাজগোজ করে বেড়াতে বেরোয়। শুধু বেড়ানো নয়, তার মধ্যেও সিনেমা দেখার প্রোগ্রামও বোধহয় বাদ থাকে না। এখানে এলেও হিন্দী ছবির আলোচনা ত' তাদের মুখে হরদমই শোনা যায়।

এদের এসব কাজকর্ম আর চালচলন কি সব অভিনয়!

কিন্তু ওই বাইশ-চব্বিশ বছরের ছেলেদের মধ্যে সত্যিকারের শয়তানি কি তাহলে লুকোনো আছে!

সামনে যা দেখছি আর বুবুর কাছে যা শুনছি তার বেশী অবশ্য এদের সম্বন্ধে কিছুই আর জানি না।

একটা খবরই শুধু এদের সম্বন্ধে পেয়েছি। তিনজনের নামেই একটা করে খুব বাহারে বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি এসেছে।

সেই চিঠির সূত্র ধরে এদের পরিচয়-রহস্য কি কিছু খোঁজ করা যেতে পারে!

ব্যাপারটা এমন আজগুবী যে, ভাবতে গেলে হাসিই পায়। পরাশর মাথার মধ্যে ওই একটা ধোঁকা না ঢুকিয়ে দিলে এ ধরনের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।

তিনটে বাহারে বিয়ের নেমন্তন্নের কার্ড থেকে কতদূর কি-ই বা আন্দাজ করতে পারি!

তিনজনের পদবী ত' লাহিড়ী, মজুমদার আর বিশ্বাস। পরস্পরের সম্পর্ক সুতরাং বন্ধুতেরই শুধু। তিনজনকেই বিয়ের নিমন্ত্রণ যে পাঠিয়েছে সে কি ওদের সকলের চতুর্থ বন্ধু?

তিনজনকে চিঠি পাঠানটা কি নেহাত সাধারণ বন্ধুতেরই নিমন্ত্রণ, না তার মধ্যে বিজয়োল্লাসের একটা আস্ফালন আছে?

এমনও ত' হতে পারে যে, চারজনেই যার প্রেমিক ছিল সে মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত জয় করেছে চতুর্থ বন্ধু। তাই তার ঘটা করে এই চিঠিটা পাঠানো।

বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে বুবুর বিবরণে অস্বাভাবিকতার কিছু ইঙ্গিত আছে কিনা স্মরণ করবার চেষ্টা করি।

ইঙ্গিত ত' একটু আছে বলেই মনে পড়ে। বুবু শুধু তিনজনের নামে বাহারে বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি আসার কথাই বলে নি। সে চিঠিক'টা লেটার-বক্স থেকে নেবার সময় ওদের প্রতিক্রিয়ার কথাও কি যেন বলেছিল!

হ্যাঁ, মনে পড়েছে বুবুর বিবরণটা। বুবু যেন একটু অবাক আর অখুশি হয়েই বলেছিল,—বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি ক'টা বাক্স থেকে বার করে ওরা অত হাসছিল কেন? নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে হাসবার কি আছে?

বুবুর এই বিবরণের মধ্যেই কোনো একটা কাহিনী লুকোনো আছে নাকি!

কিংবা এমনও ত' হতে পারে যে, চিঠিটা কোনো বন্ধুর নয়। যে মেয়েটির ওরা প্রেমিক সে-ই ওদের তিনজনকে নিজে থেকে চিঠিগুলো পাঠিয়েছে!

চিঠিগুলো যে কোনো ছেলেরই পাঠানো এমন কোনো সঠিক তথ্য ত' বুবুর কাছে পাওয়া যায় নি। ছেলে-বন্ধুর বদলে মেয়ে-প্রেমিকাই চিঠিগুলি পাঠিয়েছে ভাবতে বাধা কিছু নেই।

কেন চিঠিগুলি পাঠিয়েছে?, যদি উপহাস কি অপমান করার জন্য হয়?

তাহলে ব্যাপারটা আরো জটিল হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু পেছনের কাহিনীটা সেরকম যাই হোক না কেন, তার মধ্যে খুনোখুনির কোনো কিছু কোথাও আছে কি?

বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারটা যখন আর কোথাও হয়েছে বা হবে, আর খুনোখুনির ঘটনা নিয়ে আশঙ্কা এখানে এই হোটেলে।

এক নম্বরের বোর্ডারদের কথা ঠেলে রেখে এবার আমার অন্য পাশের তিন নম্বর কামরায় বুবুর নিজের পরিবারের কথা ভাবতে সুরু করেছি।

সাধারণ বেশ একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পরিবার যেমন হয় তাই। এঁদের দু' বেলা চোখের সামনে ত' দেখছি-ই, তার ওপর বুবুর কাছে কথায় কথায় অনেক খুঁটিনাটি বিবরণও পেয়েছি।

তাতে পরাশর যার ইঙ্গিত দিয়েছে সেরকম কিছু ভয়ঙ্কর রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে বলে ত' কল্পনাই করা যায় না।

খুন হওয়া বা খুন করার ব্যাপারে জড়িত হতে পারে বলে কার কথা ভাবব?

পাকাচুল, কোঁচকান মুখ, লাঠি ঠুকঠুকিয়ে হাঁটা প্রায় অথর্ব ও পরিবারের কর্তা রামরতন মল্লিক মশাই-এর কথা নিশ্চয় নয়।

তিনি ছাড়া আর দুটি জোয়ান পুরুষ ও পরিবার আছে। বুবুর মেজ-মামা আর ছোটমামা দু'জনের বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দু'জনেই ভালো সাঁতারু জেনেছি বুবুর কথায়। কিন্তু সুগঠিত দেহ যাকে বলে তা দু'জনের কারুরই নয়। দু'জনেই একটু বেঁটে-সেঁটে মোটাসোটা ধরনের। মুখ-চোখের গড়ন অবশ্য খারাপ নয়। কিন্তু চেহারায় খুব ধারালো বুদ্ধির ছাপ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্য আরামে মানুষ বড়লোকের ঘরের আয়েসী নির্ভাবনা ছেলে বলে দেখলেই চেনা যায়।

এদের কাউকে কি পরাশরের ইঙ্গিত-করা সন্দেহভাজনদের মধ্যে ফেলা যায়?

সেটা ভাবতেই ত' নেহাত হাস্যকর লাগে।

পরাশর এর আগে যে ফটোটা পাঠিয়েছে তার সঙ্গে ত' এ দুই ভাই-এর চেহারায় বিন্দুমাত্র মিল নেই।

তবে,.....তবে.....

ভেজা মিশ্রি-মেশা পলকে রান্না!

কোর্মা-কালিয়া,
কিংবা কোফ্‌তা আর রোগন-জোস,
রেজালা-জাহাঙ্গীরী অথবা
মুসল্লম, বাদশাহী খানা কিংবা
বিশুদ্ধ দিশী—ছ্যাঁচড়া আর
দৈ, মাছ, মায় সর্ষে চচ্চড়ি অথবা
গুজরাটী হিং আলুদম
—যাই চান না, পাবেন মাত্র
পনের মিনিটে।

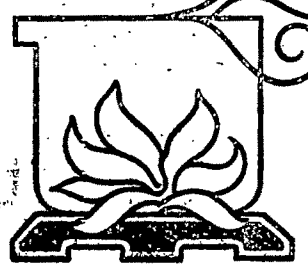

INSTANT COOKING RECIPE

হ্যাঁ, তবে বুবুর কাছে যা বিবরণ পেয়েছি তা ছাড়া আমার নিজের চোখেই দু'-একটা এমন ব্যাপার পড়েছে যা খুনোখুনির ইঙ্গিতময় একেবারেই না হলেও একটু যে অদ্ভুত একথা স্বীকার করতেই হয়।

বুবুর ছোটমাসীর সঙ্গে জড়িত একটা ঘটনা একদিন আমায় বেশ অবাক করেছে।

আমার এ হোটেলে এসে ওঠার পর সেটা বোধহয় চতুর্থ দিন। সন্ধ্যেবেলা জগন্নাথ মন্দিরের চারদিকে একটু পরিক্রমা করছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় একটি মেয়েকে একটা সিঁড়ির ধাপে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়েছি।

সন্ধ্যে হলেও মন্দিরের চারিধারে তখন তেমন অন্ধকার নেই বললেই হয়। মেয়েটি একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে যেখানে বসে আছে সে জায়গাটিতে আলোর একটু অভাব হলেও মেয়েটির মুখ আমার কাছে খুব অস্পষ্ট লাগে নি এবং সে মুখ আমার অচেনা নয় মনে হওয়াতেই বিস্মিত হয়েছি আরো।

মেয়েটিকে দেখেই বুবুর ছোটমাসী বলে আমার মনে হয়েছে। আমাদের দোতলার হাতায় বুবুর ছোটমাসীকে আসা-যাওয়ার পথে এবেলা-ওবেলা প্রায়ই দেখে থাকি। সুতরাং জায়গাটায় আলোর খুব জোর না থাকলেও তাকে দেখতে ভুল করার আমার কথা নয়।

কিন্তু বুবুর ছোটমাসীর এখানে এমন করে বসে থাকাও ত' অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়েটি যেখানে বসে আছে তার কাছাকাছি নানা বয়সের কয়েকজন মহিলা সিঁড়িটিরই নানা ধাপে এধারে-ওধারে বসে আছেন তা ঠিক। কিন্তু সে যে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাই বসে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বুবুর ছোটমাসী কি তাহলে হারিয়ে গেছে? কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার ভঙ্গী ত' তার বসে থাকার মধ্যে নেই।

তাহলে আমারই কি সম্পূর্ণ ভুল হল? সেটা পরীক্ষা করবার জন্যে কাছে গিয়ে ভালো করে আর একবার লক্ষ্য করতে হয়।

কিন্তু অত্যন্ত অশোভন দেখাতে পারে বলে দ্বিধা-সঙ্কোচে তা আর পারলাম না।

হোটেলে ফিরে কিন্তু ব্যাপার যা জানলাম ও দেখলাম তাতে আরো বিমূঢ় হতে হল।

বুবুর ছোটমাসী সত্যিই হারিয়ে গেছে, আর বুবুর মেজমামা তাই নিয়ে নমামাকে যা নয় তাই বলে বকুনি দিচ্ছে।

দোষটা নাকি সম্পূর্ণ সমীরের মানে বুবুর নমামার। সে-ই তার মা, দিদি আর ছবি মানে বুবুর ছোটমাসীকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিল। সেখানে কিছুক্ষণ বাদে বাড়ির মেয়েদের এক জায়গায় একটু দাঁড় করিয়ে সে কি কাজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরব বলে সেই যে গিয়েছিল আধ ঘন্টার মধ্যেও আর ফেরে নি: তার অপেক্ষায় যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের ইতিমধ্যে দারুণ এক বিপদ হয়েছে। তিনজনে তাঁরা একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে কাছাকাছি একটু-আধটু ঘুরে দেখার মধ্যে বুবুর ছোটমাসী মানে ছবিকে হঠাৎ আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কাছাকাছি ছাড়া আর কোথায় সে যেতে পারে ভেবে তাঁরা নিজেরা সামান্য একটু খোঁজ করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। সমীর এলে পাছে দেখতে না পায় বলে যে জায়গায় সে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেখান থেকে বেশীদূর যেতেও ভরসা করেন নি। তাছাড়া সমীর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছে জেনে তাঁরা কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিটি করে আধ ঘন্টার মধ্যেও সমীর না ফেরায় তাঁরা দুর্ভাবনায় একেবারে দিশাহারা হয়ে গেছেন। সন্ধ্যারাত্রে মন্দিরের ওই চত্বরের মধ্যে কোথায় কার সাহায্য চাইবেন কিছুই ভেবে না পেয়ে একটি টানা রিকসা করে ফিরে এসেছেন সোজা হোটেলে।

সেখানে তাঁরা যখন ব্যাকুল উদ্ভ্রান্ত-ভাবে নিজেদের কথা জানাচ্ছেন ঠিক সেই সময়েই সমীরও হন্তদন্ত হয়ে হোটেলে ফিরেছে। মন্দিরের যেখানে বাড়ির মেয়েদের সে দাঁড় করিয়ে গিয়েছিল সেখানে ফিরতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় একটু দেরী মানে প্রায় দশ মিনিট হয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে তখন ওদের কাউকে দেখতে না পেয়ে সে অবাক হয়ে গেছে। প্রথমটা অবশ্য এমন কিছু দুশ্চিন্তা তার হয় নি। তাই একটু দেরী দেখে দাঁড়িয়ে থাকার বদলে কাছাকাছি কোথাও তাঁরা বসেছেন ভেবে সে এদিক-ওদিক একটু খোঁজ করেছে। কিন্তু তাতেও কাউকে না পেয়ে আর আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেলেও নির্দিষ্ট জায়গায় কেউ না ফেরায় সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে বেশ ভাবনায় পড়েছে। নিজে যা খোঁজবার সে ত' খুঁজেছেই, এর পর পুলিশেই ব্যাপারটা কি সে জানাবে! না কোন কারণে মেয়েরা হোটেলেই ফিরে যেতে পারেন অনুমান করে সেখানেই আগে একবার খোঁজ করে নেবে?

শেষ পর্যন্ত হোটেলেই আগে একবার খোঁজ নেওয়া উচিত মনে করে সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে।

সমীরের এ কৈফিয়তে তার দাদা সমর মানে বুবুর মেজমামা আরো বেশী ক্ষেপে গেছে। নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যে এসব সমীরের বানানো গল্প বলে তাকে যা নয় তাই গালাগাল-বকুনি দিয়ে শুধু মারতেই বাকি রেখেছে বুবুর মেজমামা।

আমি যখন হোটেলে গিয়ে পৌঁছেছি তখন এ নাটক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মারমূর্তি দাদার গালাগাল শুনে পাল্টা জবাব না দিলেও গোঁজ হয়ে ছবিরই খোঁজে বেরিয়ে যাচ্ছে সমীর।

আগে যা যা হয়েছে তার বিবরণ আমি কিছুটা বুবু আর কিছুটা বাড়ির বুড়োকর্তা মল্লিক মশাই-এর কাছেই পেয়েছি।

সমীর থমথমে মুখে চলে যাবার সময় মন্দিরে আমি যা চোখে দেখে এসেছি সে কথাটা বলব কি না ভেবেছিলাম। কিন্তু দ্বিধাভরে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংবরণ করেছি।

আমি যাকে দেখেছি সে সত্যিই এ-বাড়ির হারানো মেয়ে ছবি কিনা সে বিষয়ে আমিই তখন নিঃসন্দেহ নই। ছবির হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার সময়েই আমি তার মত চেহারার একজনকে মন্দিরের এক জায়গায় দেখেছি ঠিকই। কিন্তু তার বসে থাকবার ভঙ্গী আর চেহারা হারিয়ে যাওয়া অসহায় কোনো মেয়ের সঙ্গে একেবারেই যে মেলে না।

আমার দেখার ভুলে এ পরিবারের এই অস্থির উদ্বিগ্ন উত্তেজনার ওপর উপরি বিভ্রান্তি চাপাবার দায় তাই আর নিতে চাই নি।

তা না নিয়ে ভালোই করেছিলাম অবশ্য। কারণ একটু দেরী হলেও সমীরই শেষ পর্যন্ত ছবিকে খুঁজে নিয়ে হোটেলে ফিরেছে।

প্রথমে বাড়ির কাউকে দেখতে না পেয়ে বেশ ভয় পেলেও ছবি সম্পূর্ণ দিশাহারা হয় নি। মন্দির চত্বরের নির্দিষ্ট জায়গাটা আর ঠিক খুঁজে বার করতে না পেরে সে বুদ্ধি করে একেবারে মন্দিরে ঢোকবার মুখে ফুল-টুল যেখানে বিক্রী হয় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মন্দিরে ঢুকতে বা সেখান থেকে বার হতে হলে যাতে তার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা হয়।

সেখানে অপেক্ষা করতে করতে বেশী রাত হয়ে গেলে সে মন্দিরের বাইরের রাস্তার মোড়ের পুলিশকে নিজেই সব জানাবে ঠিক করেছিল।

তাকে খুঁজে পাওয়ার শেষ গোলমালটা অবশ্য তাই করতে গিয়েই হয়েছিল। ক্রমশই রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে দেখে মোড়ের পুলিশ কনস্টেবলকে নিজের কথা জানাতে গিয়েও দ্বিধায়, সঙ্কোচে ছবি মাঝপথে থেমে গিয়ে আবার ফুলের দোকানগুলির কাছেই ফিরে এসেছে। সমীর সেই সময়ের ফাঁকটুকুর

মধ্যেই ভেতরে তাকে খুঁজতে ঢুকেছিল বলে তাদের দেখা হতে দেরী হয়েছে।

সমীর ভেতরটা খুঁজে হতাশ হয়ে ফিরে আসবার সময় দেখতে পেয়েছে ছবিকে।

ছবিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে আনার জন্যে আর সকলের কাছে সমীরের সব দোষ অনেকটা কেটে গেলেও তার দাদা সমরের রাগ যে একটুও পড়ে নি তা অবশ্য আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

আর পাঁচ নম্বরে সৌখিন দাম্ভিক প্রৌঢ় আর তাঁর বয়সে বেমানান স্ত্রী।

পরাশরের ইঙ্গিতটা কি এঁদের দু' কামরার কারুর বেলায় খাটে?

কার বেলা? চার নম্বর কামরায় মাকে নিয়ে যে ছেলেটি থাকে সেই অমল কিংবা অনল গুপ্তকেই কি সন্দেহের যোগ্য মনে করা যায়!

অমল গুপ্ত তার মাকে কটু কথা বলে, তার চিঠিপত্র আসেই না বললে

তাকে যেটুকু দেখেছি আর তার সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তাতে মাতৃভক্তি আর সম্ভবত আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অভাব ছাড়া আর কিছু তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার নেই।

তার বিষয়ে বলতে গেলে একটা ছোট ঘটনার কথা মনে করা যায় অবশ্য।

একদিন ফ্ল্যাগস্টাফের দিক থেকে সকালে বেড়িয়ে আসবার সময় সমুদ্র-তীরের ওপরেই এক জায়গায় পাঁচ

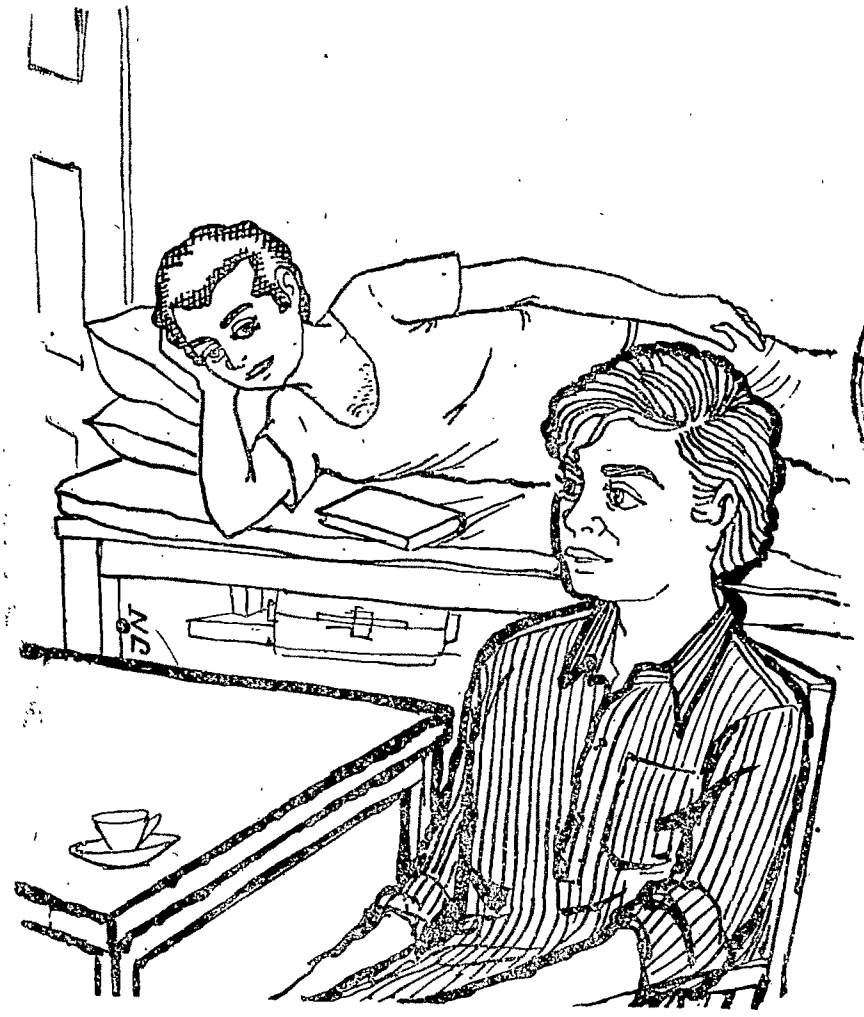

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বুবুর ছোটমাসীর হারিয়ে যাওয়া, মন্দিরে সেইদিনই আমার একটা দেখার ভুল। আর মেয়েটির হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তাদের পরিবারের উদ্বেগ, অস্থিরতা, রাগারাগি সব মিলিয়ে ব্যাপারটাকে যে-ভাবেই দেখি তার মধ্যে পরাশরের পোস্ট-কার্ডের চিঠির নির্দেশ অনুসরণ করবার কোনো অবকাশ আছে একথা পাগলেও বোধহয় বলবে না।

মল্লিক পরিবারের কথা এখানেই চুকিয়ে দিলে বাকি থাকে আর দু'টি কামরার বোর্ডার মাত্র।

চার নম্বর কামরার মা ও ছেলে

হয়, একবার তার নামে একটা মনি-অর্ডার যা এসেছে তাও মাত্র পঞ্চাশ টাকার। কিন্তু এসব কিছুই ত' অমন ভয়ানক সন্দেহ জাগাবার বস্তু নয়। অমল গুপ্ত বয়সে তরুণ, এই পর্যন্ত। কিন্তু তার চেহারা পরাশরের পাঠানো ছবির সঙ্গে ত' একেবারেই মেলে না।

ছবির চেহারা লম্বা, ছিপছিপে, দৌড়বাজগোছের অ্যাথলেটের। আর অমল গুপ্তকে অ্যাথলেট ভাবলে ওয়েট লিফ্‌টার ভাবা হয়। লম্বাও নয় বেঁটেও নয়— মাঝারি মাপের শালপ্রাংশু না হলেও রীতিমত বৃষস্কন্ধ চেহারা।

নম্বরের প্রৌঢ় সৌখিন দাম্ভিক রাহার স্ত্রীকে একা দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম।

রাহার স্ত্রী ত' স্বামীকে সব সময়ে ছায়ার মত অনুসরণ করেন। তাঁকে একলাই সী-বীচে দেখাটা তাই অস্বাভাবিক লেগেছিল।

আমার দিকেই মিসেস রাহার মুখটা ঘোরানো ছিল বলে যাবার পথে তাঁকেই আগে চোখে পড়েছে। পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন লক্ষ্য করে প্রথমটা একটু চমকে উঠেছিলাম।

মিসেস রাহা কথা বলছেন অমল গুপ্তের সঙ্গে।

প্রথম চমকের পরই অবশ্য নিজের নির্বিচার ধারণার জন্যে লজ্জা বোধ করেছি।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের স্ত্রী-পুরুষ কাউকে কোথাও দাঁড়িয়ে কথা বলতেই একটি মাত্র কথা ভাবা, যে ভাবে তারই মনের অপরিচ্ছন্নতার লক্ষণ।

কথা ত' এরা বলছে উজ্জ্বল দিবালোকে খোলা সমুদ্রতীরের ওপর। পরস্পরের এমন কাছাকাছিও তারা দাঁড়ায় নি যাতে কোনোরকম ঘনিষ্ঠতার আভাস পাওয়া যায়।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হলে আলাপ করলে যেরকম সহজ স্বাভাবিক ব্যবধান থাকে তাই তাদের মধ্যে রয়েছে।

কথা একটু ব্যস্ত ভাবে মিসেস রাহা'ই বলছেন। অমল গুপ্ত নীরবে দাঁড়িয়ে শুনছে মাত্র।

আলাপটা যে কোনো অন্তরঙ্গ বিষয়ের নয়, তা কথা বলার ধরনেই বোঝা যায়।

কথাবার্তাটা যে কি নিয়ে তাও খানিক বাদে জানতে পেরেছি। পেছনে বালির ওপর পায়ের শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে অমল গুপ্তকেই আসতে দেখলাম।

এমনিতে অমল গুপ্ত খুব মিশুক যাকে বলে তা নয়। আমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলেও দু'-চারটের বেশী বাক্য বিনিময় এ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে হয় নি।

সেদিন কিন্তু মনের মধ্যে তার একটা বিক্ষোভ ছিল বলেই দ্রুততর পায়ে আমায় ছাড়িয়ে সে চলে যায় নি। পেছন থেকে এসে আমায় ধরে ফেলে তারপর খানিকটা পা মিলিয়ে চলতে চলতে বলেছে,—মানুষ যে কি আত্ম-সর্বস্ব নীচ হতে পারে, শুধু চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না।

মুখে কিছু না বলে আমি জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তার দিকে মুখটা ফেরাতে অমল গুপ্ত আপনা থেকে আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নটার জবাবে একটু বিশদ হয়ে বলেছে,—ওই রাহা মশাইকে ত' দেখেছেন কি রকম সৌম্য-সম্ভ্রান্ত চেহারা। সারাক্ষণ ফিটফাট—যেন রাজবাড়ির দেওয়ানটি সেজে থাকেন।

অমল গুপ্তের এ উপমা প্রয়োগটা একটু অদ্ভুত লাগলেও সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে নিজের চোখের জিজ্ঞাসাটা আগের মতই প্রখর রেখেছি।

অমল গুপ্ত বলে গেছে,—ও'র স্ত্রী মিসেস রাহা আমায় কি জিজ্ঞাসা করছিল জানেন! শহরের এদিকে স্টেশনের কাছের একটা বড় ওষুধের দোকানে কোথা দিয়ে গেলে সুবিধে হয়। রাহামশাই এই ওষুধটা নিজে আনতে যেতে পারেন নি। স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন সেই কতদূরের দোকান খুঁজে সেখান থেকে ওষুধটা আনতে।

দীননাথবাবু,— আমি মিঃ রাহার হয়ে একটু ওকালতি করবার চেষ্টা করেছি,—হয়ত ঠিক সুস্থ নয়।

সুস্থ নয়!—তীব্র হয়ে উঠেছে অমল গুপ্তের গলা,—আজ সকালে তিনি টুরিস্ট বাসে কোনারক দেখতে গেছেন তা জানেন!

কোনারক দেখতে!—আমি সত্যিই অবাক হয়েছি।—স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়েই!

সঙ্গে নিয়েছেন কি না, তা ত' দেখতেই পেলেন!—অমল গুপ্ত যেন আমাকেই অভিযুক্ত করেছে,—স্ত্রী তাঁর অশিক্ষিত মূর্খ, কোনারকের শিল্প-ভাস্কর্যের মর্ম কিছু বুঝবে না। তাই তিনি তাঁকে হোটেলে রেখে ক'টা কাজের ভার দিয়ে গেছেন। সে কাজের মধ্যে একটা হল এই ওষুধ আনা।

অমল গুপ্ত নিজের রাগের বাষ্প-বেগেই এবার আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

সে চলে যাবার পর রাহামশাই স্ত্রীর ওপর যা আনবার ভার দিয়ে গেছেন, সে ওষুধটা কি জিজ্ঞাসা করবার কথা আমার মনে হয়েছে।

কিন্তু অমল গুপ্ত অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। শুধু ওই কথাটা জিজ্ঞাসা করার জন্যে তাকে পিছন থেকে ডেকে থামানো যায় না।

ঘটনাটা সত্যিই সামান্যই, যদিও এটাতে অমল গুপ্ত ও দীননাথ রাহা দু'জনের ওপরেই কিছুটা আলোকপাত হয়।

না হয় তাতে কিন্তু অমল গুপ্ত বা দীননাথ কাউকে কোনো দিক দিয়ে সন্দেহ-ভাজনদের গণ্ডিতে কি ফেলা যায়?

প্রৌঢ় দীননাথ রাহা সৌখিন, স্বার্থ-পর, অহঙ্কারী। স্ত্রীর সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারেন কিন্তু এগুলোকে সাংঘাতিক অপরাধীর লক্ষণ বলে নিশ্চয় ধরা যায় না।

না, পরাশরের পাঠানো ছবিটার যেমন আমাদের হাতার দোতলার বোর্ডার-দের কারুর সঙ্গেই সামান্য মিলও পাই নি, পোস্টকার্ডে পাঠানো তার নির্দেশটাও তেমনি কারুর ওপরেই প্রয়োগ করবার নয়।

পরের দিন সকাল থেকেই কিন্তু সব কিছু ভিন্ন চোখে যে দেখা যায় তা মানতে হ'ল।

মানতে হ'ল পরাশরেরই জন্যে অবশ্য। আগে থাকতে কোনো খবর-টবর না দিয়ে সকাল বেলাতেই সে হঠাৎ এসে হাজির হবে তা ভাবতে পারি নি।

যে চেহারা, পোশাকে সে এসেছে তাও একেবারে হতভম্ব করে দেবার মত।

মুখে অন্তত দু'-তিন দিন দাড়ি-গোঁফ কামান হয় নি, মাথায় রুক্ষ উস্কো-খুস্কো চুল। আধময়লা প্যাণ্ট, জামা-কাপড় দেখলে মনে হয় প্ল্যাটফর্মে শুয়েই বোধহয় তার কয়েক রাত কেটেছে।

সঙ্গে সুটকেস, হোল্ডঅল-টল কিছু নেই। একটা ফোলিও ব্যাগও নয়। একটা সতরঞ্চি জড়ানো পুঁটলিতে মাত্র যা কিছু আনবার এনেছে।

হোটেলটা আমাদের আজে-বাজে নয়, রীতিমত খানদানি।

সাইক্ল-রিক্সা থেকে ওই পুঁটলি নিয়ে সে যখন নামল তখন আমি দৈবাৎ হোটেল থেকে একটু বেরিয়ে আসবার মুখে তাকে ওই দশায় দেখতে না পেলে, হোটেলের বেয়ারারা তাকে প্রায় ঢুকতে মানা করতেই যাচ্ছিল।

আমি সামনে এসে পড়ায় সে অপমানটা পরাশরকে আর হতে হ'ল না।

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পরাশর নিজের পুঁটলিটা নিজেই বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তুলতে যাচ্ছিল। আমার ইঙ্গিতে যে বেয়ারা সেটা বয়ে নিয়ে ওপরে আমাদের কামরায় পৌঁছে দিল তার চোখ-মুখে স্পষ্ট যে বিরক্তি আর অবজ্ঞার ভাব তাতে মনে হল, সে যেন অশুচি কিছু নিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে এখুনি গিয়ে স্নান করে শুদ্ধ হবে।

লজ্জা, অস্বস্তি আমারও তখন কিছু কম হচ্ছে না। এ হোটেলে এরকম মোট নিয়ে কোনো বোর্ডার এ পর্যন্ত নিশ্চয় আসে নি। হোটেলের সমস্ত ইতি-হাসে এমন করে যে কালি লাগাল সে কি না আমারই কামরার সঙ্গী আর বন্ধু!

ওপরে আমাদের কামরায় পরাশরের পুঁটলিটা নামিয়ে দেবার পর সেটা বয়ে-আনা বেয়ারার মুখের চেহারা কিন্তু যা হ'ল তা ক্যামেরায় তুলে রাখবার মত।

পুঁটলিটা নামিয়ে মুখ তুলেই সে

দেখে পরাশর তার নোংরা জামার পকেট থেকে তার জন্যে বখশিশটা বার করে হাত বাড়িয়ে ধরে আছে।

প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও সে মুখের অবজ্ঞাটা বজায় রেখেই বলেছে, —এ তো পাঁচ টাকার নোট। এখন কোথায় ভাঙাব।

ভাঙাতে হবে কেন!—বাদশাহী মেজাজে বলেছে পরাশর।—এটা পুরোটাই তোমার।

হোটেলের বেয়ারা যে রীতিমত হতভম্ব হয়ে চলে গেছে তা বলাই বাহুল্য।

সেই থেকেই হোটেলের বেয়ারা মহলে পরাশরের নাম হয়েছে পাগলাবাবু বলে।

সে নাম চালু রাখবার জন্যে যা যা দরকার পরাশরের চাল-চলন, ব্যবহারে তার কিছু অভাব হয় নি।

পরাশরের পোশাক-আশাক অমনি ঢিলে-ঢালা, আধময়লা। চেহারা ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন রাখার কোনো চেষ্টাই নেই। যে দাড়ি-গোঁফ নিয়ে প্রথম দিন হোটেলে এসে উঠেছে তাই এখনো বাড়ছে মুখের ওপর।

শুধু চেহারা, পোশাকেই নয়, চাল-চলনেও সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া। হোটেলের খাবার সে খায় না বললেই হয়। সময়ে-অসময়ে শুধু সারাদিন রাত্রে প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি চাই। ভোর পাঁচটা থেকে রাত অন্তত বারোটা পর্যন্ত তার এ ফরমাস চলতেই থাকে।

এরকম ফরমাস তামিল করতে বেয়ারাদের বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ করার কথা। কিন্তু তা তারা করে না, বরং পরাশরের কফি নিয়ে আসবার জন্যে 'কিচেন'-এ তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

কারণ কফি নিয়ে এলেই প্রতিবার একটি পুরো টাকা বখশিশ। শুধু বখশিশই দেয় না পরাশর তাদের সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে আলাপ-টালাপও করে।

পরাশরের বেয়াড়াপনা শুধু এই ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফির বায়নাতেই নয়, আরো অনেক কিছুতেই আছে।

এসে অবধি একবার সমুদ্রস্নানে যাবার উৎসাহ তার হয়নি। কিন্তু দোতলার ঝোলা বারান্দায় বসে সারাক্ষণ সে সমুদ্র দেখেই কাটায়। শুধু খোলা-চোখেই নয়, সঙ্গে আবার দূরবীণও থাকে।

পরাশরের এসব কাণ্ড-কারখানায় অস্বস্তি বোধ করলেও আশ্চর্য বিশেষ হই না তাকে ভালো করেই চিনি বলে।

এসব পাগলামির পেছনে কোনো মতলব তার যে আছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু মতলব যাই হোক, যা ভেবে তা সে খাটাবার চেষ্টা করছে তার সেই ধারণাটাই যে ভুল সেইটে তাকে দ্বিতীয় দিন রাত্রে না বলে পারলাম না।

রাত তখন প্রায় বারোটা। খানিক আগে তার শেষবারের কফির বায়না মিটিয়ে বেয়ারা বখশিশ নিয়ে চলে গেছে।

নিজের বিছানায় বেডল্যাম্প জ্বালিয়ে এতক্ষণ একটা বই পড়বার চেষ্টা করছিলাম। বেয়ারা চলে যেতে বেডল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েই বললাম,—অনেকরকম প্যাঁচই ত' খেলছ দেখছি এ দু'দিন। কিন্তু এসবের সত্যি কিছু মানে হয়?

তোমার কথাটারই ত' মানে বুঝতে

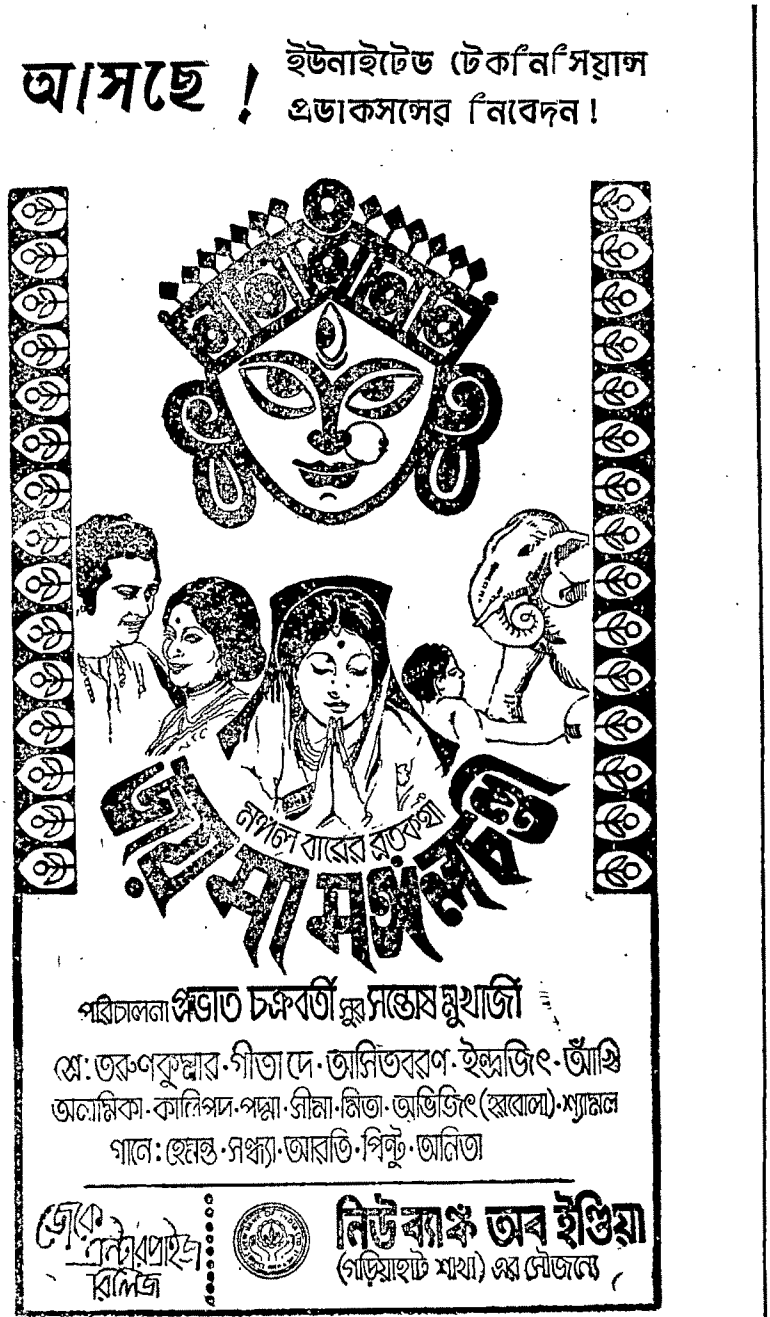

পারছি না!—পরাশর কফির পেয়ালাটা যথারীতি টেবিলের এক ধারে সারিয়ে রেখে বোকা সেজে বললে,—প্যাঁচ আবার কোথায় কি দেখছ!

কোথায় কি দেখছি তা তুমি ভালো করেই জানো।—আমি বিছানায় আবার উঠে বসলাম,—সুতরাং মিছে কথা বাড়িয়ে লাভ কি! কিন্তু যা ভাবছ তা যে একেবারে ভুল তা তুমি এখনো বুঝতে পারছ না!

ভুল বলছ!—পরাশরের গলার স্বর যেন বেশ ক্ষুণ্ণ।

ভুল নয়?—আমি ঘরের আলোর সুইচটাই টিপে আলো জ্বালিয়ে একটু জোর দিয়ে বললাম,—প্রথমে তোমার পাঠানো সেই ফটোটার কথা ধরো। সে ফটোর সঙ্গে আমাদের হাতার ক'টা কামরার কোনো বোর্ডারের ত' মিল নেই।

মিল কি সত্যি একেবারে নেই!—পরাশর যেন এখনো একেবারে হতাশ হতে চায় না।

মিল থাকলে অদৃশ্য কারুর সঙ্গে আছে!—ঠাট্টা করে হেসে বললাম,—তারপর তোমার ওই খুনোখুনির সন্দেহের কথা। খুন হতে পারে বা খুন করতে পারে এমন কারুর মধ্যে কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় কি না লক্ষ্য করবার জন্যে তুমি সজাগ থাকতে বলেছ। কিন্তু তোমার নির্দেশটা নেহাত আজগুবী নয়? ও কথাগুলো কি এখানকার কোনো কামরার বোর্ডারদের সম্বন্ধে খাটে?

আমার ত' মনে হয়, সব কামরার বোর্ডারদেরই লক্ষ্য করবার মত বলে ধরা যায়!—পরাশর এবার যেন একটু জোরের সঙ্গেই বলতে পারল।

সব ঘরের বোর্ডারদের সম্বন্ধে কথাটা খাটে তুমি বলতে চাও?—আমি কিন্তু অধৈর্যের সঙ্গেই বললাম,—একটু বুঝিয়ে দাও দেখি।

বুঝিয়ে দেব!—দ্বিধাভরে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেও আমার চ্যালেঞ্জটা না নিয়ে পারলে না। বললে,—আচ্ছা তোমার এক নম্বর কামরার কথাই ধরো। লাহিড়ী, মজুমদার আর বিশ্বাস তিন ছোকরা আজ ক'দিন হ'ল ও কামরায় এসে উঠেছে। বয়স তিনজনেরই নেহাত অল্প। তিনজনেই যেন ক'দিনের জন্যে ফুর্তি করে এখানে বেড়াতে এসেছে। ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এখনো কারুর জানা নেই।

শুধু ওই বিয়ের নিমন্ত্রণের বাহারে চিঠির ব্যাপারটা ছাড়া।—আমি পরাশরের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললাম,—তিনজনের নামেই এক বিয়ের চিঠি এসেছিল। আর তিনজনেই চিঠি পাবার পর কেন বলা যায় না খুব হাসাহাসি করেছিল চিঠি নিয়ে। এছাড়া ওদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

না, তা যায়।—পরাশর আমার সংশোধন করে বললে,—ওদের সঙ্গের লাগেজগুলো লক্ষ্য করেছ?

লাগেজগুলো লক্ষ্য করব?—আমি হতভম্ব হয়ে বসলাম,—তুমি করেছ নাকি?

হ্যাঁ,—পরাশর জানালে,—কাল সকালে ভুল ক'রে ঢুকে পড়েছিলাম কিনা!

পরাশরের ভুলটা যে কিরকম তা বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম,—ভুল করে ঢুকে ওদের লাগেজ দেখলে?

আহা! ঢুকে পড়ে কি আর লাগেজ দেখতে চাইলাম!—পরাশর তার পদ্ধতিটা বুঝিয়ে দিলে,—ঢুকে পড়ার পর মাপ চাইতে একটু আলাপ ত' হল। তখন কথাবার্তার মধ্যে ওদের আর ওদের মালপত্র দেখার সুযোগ হয়ে গেল।

তা লাগেজ কি দেখলে?

দেখলাম,—পরাশর এবার বিস্তারিতভাবে জানালে—ওদের সুটকেশ, হোল্ডঅল সব একেবারে নতুন আর সব এক মাপের, এক কোম্পানীর তৈরী। আমি যে পুঁটলি নিয়ে হোটেলে উঠেছি সে কথা সবাই জানে। ওদের সুটকেশ, হোল্ডঅল আমার কেনার জন্যে খুব পছন্দ হয়েছে বলে একটু নেড়ে দেখতেও কেউ কিছু মনে করলে না। সুটকেশগুলো নেড়ে দেখলাম। সব কটাই একেবারে হাল্কা। ভেতরে মাল-টাল কিছু নেই। তার মানে ওগুলো শুধু লোকদেখানো লাগেজ হিসাবে আনা। কিন্তু তার কারণ কি হ'তে পারে?

কি হ'তে পারে তুমি বুঝেছ?—আমি পরাশরের ব্যাখ্যায় খুব সন্তুষ্ট না হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

তা এখনো ঠিক বুঝিনি!—পরাশর স্বীকার করলে,—কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক স্বাভাবিক নয় এটুকু স্পষ্টই বোঝা যায়। ওদের অবস্থা যে এ হোটেলে ওঠবার মত নয় তাও জানতে পেরেছি। এ হোটেলে থাকার কামরা-ভাড়া আর খাবার চার্জ আলাদা করে ধরা হয়। ওরা হোটেলের খাবার খায় না বললেই হয়। লজিং-এর বেড এ্যাণ্ড ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ধরা সকালের চা, টোস্ট, ডিম ছাড়া এক কাপ চা'ও কখনো আনিয়ে খায় না। কোনো বেয়ারাকে এখনো এক পয়সা বখশিশও দেয় নি।

এবার হেসে বাধা দিয়ে বললাম,—তুমি কি এসব তোমার কফি আনার বেয়ারাদের সঙ্গে ভাব করে জেনেছ?

তা ভাব হ'লে ওদের কাছে অমন কত কথা জানা যায়!—পরাশর কথাটার জবাবে আরো উদাহরণ দিলে,—এই যেমন ওরা নতুন হোটেলের খোঁজ করছে এ খবর জানো?

না জানি না!—পরাশরের বাহাদুরি মেনে নিয়ে বললাম,—নতুন হোটেল খোঁজ করছে উঠে যাবার জন্যে? সস্তা হোটেল নিশ্চয়?

না। পরাশর বললে,—এই হোটেলের মত বা এর চেয়ে ভালো হোটেলের খোঁজ-টোঁজ নিচ্ছে।

এখানকার খরচই যোগাবার ক্ষমতা নেই!—অবাক হয়ে বললাম,—এর চেয়ে দামী হোটেলের খোঁজ করছে?

তাহলেই সমস্ত ব্যাপারটা একবার নতুন করে ভেবে দেখো!—পরাশর যেন অঙ্ক মিলিয়ে বললে,—ক্ষমতা না থাকলেও নতুন সুটকেশ বেডিং কিনে ওদের তিনজনের একসঙ্গে এ হোটেলে এসে ওঠা, ওদের তিনজনের নামেই এক সঙ্গে বাহারে বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি, তার ওপর ওদের আরো দামী হোটেলের খোঁজ-খবর নেওয়া.....

পরাশরকে বাধা দিয়ে বললাম,—এগুলো সবই অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলো একসঙ্গে মেলালে আমরা পাচ্ছিটা কি?

স্পষ্ট এখনো কিছু না পাওয়া গেলেও রহস্যটার ইঙ্গিত কোন্ দিকে তা একটু বোঝা যাচ্ছে না কি?—পরাশর রহস্যটা আমার কাছে বাড়িয়ে দিয়েই বললে,—একটা অনুমান ত' আপনা থেকেই সব ক'টা ব্যাপার থেকে সাজানো যায়।

কি অনুমান?

এই ধরো, তিনজনেই ওরা প্রেমের ব্যাপারে একই জায়গায় প্রবঞ্চিত।—পরাশর তার অনুমানটাকে স্পষ্ট করলে।—চতুর্থ যেজন ওদের ওপর টেক্কা দিয়ে জিতেছে সেই ওদের তিনজনের কাছে বিয়ের চিঠি পাঠিয়েছিল ওদের উপহাস করবার জন্যে।

ওরা তিনজনে এই হোটেলে এসে উঠবে আগে থাকতে জেনেই সে চিঠি-গুলো এই ঠিকানায় পাঠালে?—পরাশরের অনুমানটায় বাধা দিয়ে বললাম।

পুজো বছরে একবারই আসে

এমন সুযোগও আসে একবার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

১৪২ তম খেলা (উৎসবের উপহার) ৫.১১.৭৭

প্রথম পুরস্কার : একটি :
২,৫০,০০০ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার : একটি : ২৫,০০০ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার : ছ'টি : প্রতিটি ১০,০০০ টাকা
(প্রতি সিরিজে একটি)

পঞ্চম পুরস্কার : প্রতিটি ১০০ টাকা
(১,০০০ টিকিটে একটি)

চতুর্থ পুরস্কার : প্রতিটি ১০০০ টাকা
(১০,০০০ টিকিটে একটি)

ষষ্ঠ পুরস্কার : প্রতিটি ৫০ টাকা
(১,০০০ টিকিটে একটি)

লাকি ড্রিপ (বিক্রেতাদের জন্য) : প্রতিটি ৫০ টাকা (১০,০০০ টিকিটে দু'টি)

না, সে যেই হোক, এ ঠিকানায় ত' কোনো চিঠি পাঠায় নি।—পরাশর ব্যাখ্যা করলে,—সে প্রত্যেকের বাড়ি বা বাসায় আলাদা আলাদা ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিল। সেগুলো রি-ডাইরেকটেড হয়ে এখানে একই ঠিকানায় এসেছে।

আমার সন্দিগ্ধ বিস্ময় দেখে পরাশর আবার ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিলে,—এ খবরও বুবুর কাছ থেকেই পাওয়া। তিনটে বাহারে বিয়ের চিঠি এসেছে এদের

তিনজনের নামে, এইটুকুই ওর কাছে তুমি জেনেছ। আমি আর একটু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ও মনে করে বলেছে যে, প্রত্যেকটা চিঠির ঠিকানায় কাটাকুটি ছিল। তার মানে ওরা যে এই হোটেলে পুরীতে আসছে একথা চিঠি যে পাঠিয়েছে সে জানে না। ওদের এ হোটেলে থাকার মর্ত অবস্থা নয়। তবু ওরা এখানে কোনরকমে কষ্ট করে আছে। কেন? ওরা নিশ্চয় এইটুকু খবর রাখে যে, বিয়ের পর নবদম্পতি এই পুরীতেই কোনো হোটেলে আসছে। এলে কোনো বড় হোটেলেই আসবে বলে ওরা এখানেই এসে আগে থাকতে উঠেছে। সেই সঙ্গে অন্য এই দরের হোটেলেও খোঁজ-খবর নিচ্ছে ওদের শিকার সেখানে এসেছে বা আসছে কি না!

তাহলে তুমি এদেরই তোমার লক্ষ্য রাখবার আসল লোক মনে করো?—সোজাসুজিই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তা কেন করব?—আমায় একেবারে ধরাশায়ী করে পরাশর হেসে বললে,—সন্দেহের গণ্ডীর মধ্যে অনেককেই যে ফেলা যায় সেইটুকুই তোমায় শুধু দেখালাম।

এই রাত বারোটার পর তোমার থিওরি প্রমাণ করতে আমায় মিথ্যে জাগিয়ে রাখলে শুধু এই জন্যে?

সত্যি রেগে উঠে ঘরের আলো নেভাবার সুইচ টিপে কম্বল টেনে নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে পরাশরকে কিন্তু রেহাই দিলাম না। তার নিত্য-নৈমিত্তিক ঝোলা বারান্দায় গিয়ে বসা বন্ধ করে বললাম,—কাল ত' এক নম্বর কামরার বোর্ডারদের নিয়ে বেশ একটু রহস্য ঘনিয়ে তুলেছিলে, এখন অন্য সব কামরার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহটা কোথায় খাটে দেখাতে পারো?

তা, পরাশর সত্যিই কিছুটা যে দেখিয়ে দিলে তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

আমার পাশের তিন নম্বর কামরার মল্লিক পরিবারের ওপর সন্দেহের ছায়াটা তার মতে বুবুর মেজ ও ন'মামাকে জড়িয়ে অনায়াসে ফেলা যায়। সেদিন ছোট ভাই সমীরের ওপর সমুরের রাগটা বেশ একটু মাত্রাছাড়া বলেই পরাশরের ধারণা। এ রাগের মূলে কেঁচো মনে করে খুঁড়তে গেলে রীতিমত বিষধর সাপই বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয় বলেই সে মনে করে। তাছাড়া.....

তাছাড়া.....বলে পরাশরের কেমন একটু রহস্যময়ভাবে থামবার ধরনে উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,— তা ছাড়া কি? থামলে কেন। বলো।

হ্যাঁ, বলে দেওয়াই উচিত।—পরাশর নিজের মনে একটা মীমাংসায় পৌঁছে বললে,—তাছাড়া, শীগ্‌গিরই ওদের পরিবারে একটা বড় রকম ব্যাপার কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

বড় রকম ব্যাপার? ব্যাপারটা কি তাই বলো না।—জিজ্ঞাসা করলাম।

একটু ধৈর্যই ধরো না।—পরাশর উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললে, আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তা'হলে বেশী অপেক্ষা করতেও হবে না।

তার কথাই মেনে নিয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এ-দুটো কামরা ত' হল, এখন চার আর পাঁচ নম্বর সম্বন্ধে তোমার গণনাগুলো শুনি।

গণনাগুলো কেন?—পরাশর একটু হেসে বললে—দুটো কামরাকে ত' এক সঙ্গেও জড়ানো যায়।

একসঙ্গে ওই দুটো কামরাকে—আমি অবাক হয়েই বললাম—ওই এক ঘরের মা ও ছেলে আর অন্য ঘরের প্রৌঢ় স্বামী আর তার কিছুটা বেমানান বয়সের বৌ এই দুই পরিবারের মধ্যে সম্বন্ধ আছে তুমি বলছ?

আছেই যে তা বলছি না,—পরাশর একটু ধাঁধার মত করেই জবাব দিলে,—কিন্তু থাকতেও ত পারে। সেদিন তুমি সী-বিচে মিঃ রাহার স্ত্রী আর চার নম্বরের ছেলেটিকে কথা বলতেই ত' নিজের চোখেই দেখেছ।

এবার হেসে ফেলে বললাম—সে ত' তাদের নেহাত দৈবাৎ দেখা। মিসেস রাহা অমল গুপ্তকে একটা ডিসপেনসারির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

অমল গুপ্ত তাই তোমায় বলেছে। পরাশর তার উল্টো ব্যাখ্যাটা আমায় শোনালে,—কিন্তু সেটা ত' সাজানো কথা হতে পারে। আসলে ওরা দু'জন হয়ত খুব বুদ্ধি করে ওইভাবেই খোলা জায়গায় পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করেছে। সমুদ্রের ধারে বেড়ে বেড়ে

হঠাৎ দেখা। খানিক দাঁড়িয়ে কথা বলবার একটা ছুতোও আছে। মিসেস রাহাকে জবরদস্ত স্বামীর অসহায় দাসীর মত যেন ফায়-ফরমাস খাটতে হয়। সমুদ্রের ধারে দু'জনে দেখা করবার সময় চেনা কারুর চোখে পড়ে গেলে তাই বেশ জুৎসই একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করা আছে যে মিসেস রাহা যেন নেহাত অসহায় অনভিজ্ঞ বলে অমল গুপ্তের কাছে কোনো দরকারী কিছু জেনে নিচ্ছিলেন।

তোমার কল্পনাটার তারিফ করছি। হেসে বললাম,—গল্পটা সাজিয়েছ ভালো। কিন্তু বৃদ্ধ না হোক এক প্রৌঢ়ের প্রায় তরুণী ভার্যা আর একজন জোয়ান ছেলের অমন প্রেমই যদি হয়ে থাকে তা হলে দেখা-শোনার এত হাঙ্গামা না করে তারা ত' অনায়াসে দু'জনে সরে পড়তেই পারে। মিঃ রাহা তাতে খুব ভেঙ্গে পড়বেন বলেও ত' মনে হয় না।

ঠিকই বলেছ!—পরাশর আমার সমর্থন করে তার পর উল্টো যুক্তি হাজির করলে,—শুধু প্রেমই হলে সেই সমাধানই সবচেয়ে সোজা হত। কিন্তু তার চেয়ে গভীর আর ঘোরালো কোনো উদ্দেশ্য যদি থাকে।

গভীর আর ঘোরালো উদ্দেশ্য, সেটা আবার কি?

তোমার কাছেই যা শুনেছি তাতে অমল গুপ্তের অবস্থা কিছুটা "অদ্য ভক্ষ" বলেই ত' মনে হয়। পরাশর তার ব্যাখ্যাটা শোনালে,—স্বভাব আর মেজাজটাও একটু বেয়াড়া। তীর্থে এলেও মাকে ঠাকুর দেবতা দেখাতে নিয়ে যায় না, যখন তখন বেশ কটু কথা শোনায়। এ হেন পাত্রের প্রেমের সঙ্গে আরো কিছু উপরি পাওনার লোভ থাকা আশ্চর্য নয়। সৌখিন অহঙ্কারী মিঃ রাহাকে দেখলে বয়সে যেমন প্রৌঢ় পয়সাকড়ির দিক দিয়ে তেমনি বেশ শাঁসালো মনে হয় না কি? জোয়ান অমল গুপ্ত তাঁর ঘরণীটিকে সরাবার সঙ্গে তাঁর যা কিছু সম্ভব হাতাবার জন্যে তাঁকেও দুনিয়া থেকে সরাবার মতলব হয়ত ভাঁজছে।

সত্যিই শিউরে উঠে বললাম—অমল গুপ্ত মিসেস রাহার সঙ্গে প্রেম করে তাকে নিয়ে পালাবার সঙ্গে পয়সার জন্যে ওই মিঃ রাহাকেও শেষ করে যাবার মতলব ভাঁজছে। কি যা তা আজগুবী কথা সব বলছ!

আজগুবী ঠিকই!—পরাশর স্বীকার করতে বাধ্য হল এবার, কিন্তু যা যা বললাম তার কোনটাই একেবারে অসম্ভব নয়। দুনিয়ায় কত কি যে হয়!

হ্যাঁ, হয়—এবার বিদ্রূপই করলাম,—হয় শুধু তোমাদের মত গোয়েন্দাদের প্যাঁচালো মাথায়।

পরাশরের একটা গণনা লাগতে কিন্তু একেবারেই দেরী হল না। সেই দিনই দুপুর বেলা মল্লিক মশাই-এর পরিবারে একটি অদ্ভুত ব্যাপারে একেবারে হুলস্থুল লেগে গেল।

তাঁদের পরিবারের দু'জন একেবারে আশ্চর্যভাবে নিখোঁজ। বেলা একটা হয়ে দুটো বাজতে চলেছে, তাদের দুজনের কারুর কোন পাত্তা নেই।

একসঙ্গে নয়, সম্পূর্ণ আলাদা আলাদাভাবে তারা নিখোঁজ হয়েছে, এইটেই আশ্চর্য ব্যাপার।

সমীর সকালে স্টেশনে গিয়েছে ক'দিন বাদে মল্লিক পরিবারের ফেরার টিকিট আর বার্থ রিজার্ভ করার জন্যে। খুব দেরী হলে বারোটার চেয়ে বেশী দেরী হওয়ার তার কথা নয়। সে তো ফেরেই নি। স্টেশনে খোঁজ করতে গিয়েও সমর তাকে সেখানে পায় নি।

ছবির নিখোঁজ হওয়াটা আরো অদ্ভুত। বেলা দশটা নাগাদ বাড়ির অনেকের সঙ্গে সমুদ্র স্নানে গিয়ে সে আর বুবু ঝিনুক কুড়োবার জন্যে সমুদ্রের ধারে থেকে গেছে। তারপর হোটেলের প্রায় সামনের সমুদ্রের বালিতে বেশ কিছু ঝিনুক কুড়োবার পর ছবি বুবুকে হোটেলের কামরা থেকে আরো ঝিনুক কুড়িয়ে রাখবার জন্যে একটা থলে আনতে পাঠিয়েছে।

হোটেলের কামরা থেকে থলে নিয়ে ফিরে গিয়ে বুবু তার ছোটমাসীকে আর দেখতে পায় নি। ছোটমাসী হয়ত ঝিনুক কুড়োতে আরো দূরে চলে গেছে মনে করে সে নিজে বেশ খানিকক্ষণ খুঁজে হয়রানি হয়ে তারপর হোটেলে এসে ব্যাপারটা জানিয়েছে।

হুলস্থুল লেগে গেছে তার পরেই।

মল্লিক পরিবার ত' বটেই, সমস্ত হোটেলই অস্থির হয়ে সমুদ্রের ধারে যত-দূর সম্ভব খোঁজাখুঁজি করেছে। পুলিশেও খবরটা দিতে ভুল হয় নি। সেই সঙ্গে লুলিয়াদের কাছেও কোনও হদিস মেলে কি-না চেষ্টা করে দেখা হয়েছে।

হদিস কিছুই কোথাও মেলে নি। সমস্ত ব্যাপারই শুধু আরো করুণ হয়ে উঠেছে ছবির নিজের বিছানায় তার বালিশের

তলায় রাখা একটা চিঠি আবিষ্কারের দরুন।

এ চিঠি আবিষ্কার করেছে আর কেউ নয়, সমীর। দেরী করে হলেও সে তখন ফিরে এসে ছবির নিখোঁজ হওয়ার খবরে পাগলের মত চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।

ছবি যা লিখে গেছে তা খুব ছোট্ট চিঠি, ছবি তাতে কোনো সম্বোধন না দিয়ে লিখে গেছে—পিতৃ-পরিচয়হীন এ-জীবনের গ্লানি শুধু আপনাদের স্নেহে করুণায় মুছে যাবার নয়। সমুদ্রেই আমি তাই নিজেকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছি।

এ চিঠি পাওয়ার পর সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেও সমুদ্রের তীরে যতদূর সম্ভব নতুন করে সন্ধান সুরু হয়েছে। জীবিত অবস্থায় ছবিকে ফিরে পাওয়ার আশা আর নেই। শুধু তার মৃতদেহটা সমুদ্র কখন ফিরিয়ে দেয়—তারই প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া আর কিছু তখন করবার নেই।

হোটেলময় এই অস্থিরতা আর উত্তেজনার মধ্যে পরাশর সেদিন আর খোলা বারান্দায় যে বসেনি তা বলাই বাহুল্য।

নিজেদের কামরায় গিয়ে তাকে কেমন একটু গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলেছি—তোমার গণনাটা এমন উল্টোভাবে খাটবে তা সত্যিই ভাবতে পারি নি। তুমি হত্যার কথা ভাবছিলে। তার বদলে হল আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা!—পরাশর যেন চমকে উঠে বলেছে,—ও হ্যাঁ! কিন্তু আমি ভাবছি আর একটা আরো গুরুতর ব্যাপার বোধহয় ঠেকাতে আমি পারলাম না।

কি গুরুতর ব্যাপার?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছি।

গুরুতর ব্যাপার?—পরাশর যেন নিজের মনে বলেছে, গুরুতর ব্যাপার হল একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া।

লোপাট হয়ে যাওয়া, কার লোপাট হয়ে যাবার কথা ভাবছ?

পরাশর আমার প্রশ্নের জবাব দেয় নি।

কিন্তু পরাশরের এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে অক্ষরে অক্ষরেই। আর ফলেছে সেই দিন সন্ধ্যের মধ্যেই।

ছবির আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে সবাই যখন অস্থির তখনই এই লোপাট হওয়ার কথাটা জানা গেছে।

আর লোপাট হয়েছে আর কেউ নয়—বুবু!

প্রথমে ব্যাপারটা গুরুতর বলে কেউ ধরে-ই নি। ছবির মৃতদেহ সমুদ্র থেকে উদ্ধার হয় নি বটে কিন্তু একটা যা জিনিষ বালিতে মাখামাখি অবস্থায় সমুদ্রের ধারে দূরে এক জায়গায় পাওয়া গেছে তা ছবির পরিণামের নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে নিদারুণ।

ছবির পরনের শাড়িটিই সমুদ্রের ঢেউ তীরের কাছে আছড়ে এনে ফেলেছে।

এরপর ছবির দেহটাকে পাবার জন্যে যখন অক্লান্ত চেষ্টা হচ্ছে, তখন কে যেন বুবুকে কি কাজে পাঠাবার জন্যে ডাকাডাকি করে পায় নি। বুবুর পক্ষে এই সব উত্তেজনার মধ্যে কিছুক্ষণ নিখোঁজ থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয় বলে কেউ আর এ-বিষয়ে গা করে নি।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে বুবুর মা'রই খেয়াল হয়েছে যে বুবু তখনও পর্যন্ত বিকেলের জলখাবারও খায় নি। যা কিছু উত্তেজনার মধ্যেই থাক পেটের ক্ষিদের ডাক অগ্রাহ্য করবার ছেলে ত' বুবু নয়!

বুবুর মা এদিক ওদিকে নিজেই প্রথম তার খোঁজ করে বিফল হয়ে বড় ভাই সমরকে তখন কথাটা জানিয়েছে। সমরের সঙ্গে আর যারা কথাটা শুনেছে তাদের অনেকেরই তখন মনে পড়েছে যে বুবুকে বহুক্ষণ থেকেই কেউ এদিকে দেখেনি। যেখানে এত বড় কান্ড নিয়ে এত ব্যস্ততা আর উত্তেজনা বুবুর ত' সেখানেই থাকবার কথা।

সেখানে না থেকে সে তা'হলে গেছে কোথায়?

একে ছবির আত্মহত্যার ব্যাপার তার ওপর বুবুর এইভাবে হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে সারা হোটেলের অস্থির উদ্বেগ উত্তেজনার মধ্যে পরাশরকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে এ-ধারে ও-ধারে কিছুক্ষণ খোঁজার পর নিজেদের কামরায় গিয়ে অবশেষে তাকে পেয়েছি।

সে একা নয়, তার সঙ্গে সেখানে বুবুর মেজমামা সমরও আছে।

সমর এর আগে কখন থেকে পরাশরকে কি বলেছে তা না জানলেও আমার সামনে তীব্র ব্যাকুল উত্তেজনায় শেষ যা সে বলেছে তাতেই তার মূল বক্তব্যটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

পরাশরের গোয়েন্দা হিসেবে পরিচয়টা সমরের অজানা নয়। সে তাই ব্যাকুলভাবে পরাশরকে ছবি ও বুবু দু'জনের সঙ্গে জড়ানো রহস্যের মীমাংসা করবার জন্যে মিনতি করছে। পরাশর এ-কাজের জন্যে যা চায় তা সে অকাতরে দিতে প্রস্তুত। পরাশরকে শুধু এ রহস্য ভেদ করে আসল শয়তানকে চিনিয়ে দিতে হবে। সমরের দৃঢ় বিশ্বাস ছবি আর বুবু দু'জনের দুটো ব্যাপার আলাদা আলাদা ঘটনা নয়। দুটো সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। ছবির আত্মহত্যা বলে যা মনে হচ্ছে.....

পরাশর সমরকে এ-কথার মাঝখানে একটু বাধা দিয়ে বলেছে,—আত্মহত্যা বলে যা মনে হচ্ছে তা অন্য কিছু বলে আপনার ধারণা? কিন্তু ছবির নিজের হাতে লেখা চিঠিটা।

রেখে দিন ও নিজের হাতে লেখা চিঠি!—সমর হঠাৎ রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছে,—ওটা ছবির হাতের লেখা কি-না তার জন্যে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট ডাকা দরকার।

তার মানে ছবির সমুদ্রে ডুবে যাওয়া আর তার পরেই বুবুর নিখোঁজ হওয়ার মধ্যে কারুর শয়তানী আছে বলে আপনি সন্দেহ করেন? পরাশর তেমন কোনো বিস্ময় প্রকাশ না করেই সমরকে জিজ্ঞাসা করেছে—সন্দেহটা কাকে হয় একটু বলবেন?

সমর যেন বলতে উন্মুখ হয়েই পরাশরের দিকে ফিরেছে। তারপর কি ভেবে কে জানে নিজেকে সংবরণ করে বেশ একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলেছে,—আমার বলবার দরকার কি? সাক্ষ্য-প্রমাণ সব দেখে বিচার করে আপনিই তা খুঁজে বার করুন। আগেই ত' বলেছি তার জন্যে যা আপনি চান সব আমি দিতে প্রস্তুত।

এ-কথাগুলো বলার পর সমর মল্লিক আর সেখানে দাঁড়ায় নি। পরাশরের বিরুদ্ধেই যেন কি অভিযোগ নিয়ে ঝড়ের মত কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে।

সে চলে যাবার পর বেশ অবাক হয়েই পরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছি,—এ আবার কি আবোল-তাবোল বকে গেল? একসঙ্গে দু-দুটো দারুণ দুর্ঘটনায় মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়।

তা ত হতেই পারে—পরাশর সমর মল্লিককে সমর্থন না করুক একটু সহানুভূতি জানিয়ে তারপর যা বলেছে তাতেই আমি বেশ বিমূঢ়!

পরাশর বলেছে, তাছাড়া ছবির আত্মহত্যার চিঠিটা সত্যিই একটু বিবেচনা করবার মত।

তার মানে চিঠিটা জাল বলছ?—আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—লেখাটা ছবির নিজের হাতের নয়?

পরাশর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেছে, তাও বা বলতে পারছি কই?

হোটেলের অস্থির উত্তেজনাটা তুমুল হয়ে উঠেছে সন্ধ্যের পর। হোটেলের ম্যানেজার প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করার কোনো ত্রুটি করেন নি। পুরীর খোদ পুলিশ কর্তাকে ফোন করে সব যেমন জানিয়েছেন লুলিয়াদের সর্দারকে ডাকিয়ে তার সমস্ত দলবল নিয়ে সমুদ্রে সন্ধান চালানোর জন্যে হোটেলের তরফ থেকে মোটা বখশিশও ঘোষণা করেছেন তেমনি।

উৎপল দত্তের

মুক্তদীক্ষা

সুর ● প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)

সমীর মজুমদারের

তলোয়ার

সুর ● প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)

কুণাল মুখার্জীর

পেরিনেল

সুর ● চণ্ডীদাস বসু

অনাদি চক্রবর্তী

বর্ণালী ব্যানার্জী

শিবদাস মুখার্জী

নির্মল অধিকারী নিরঞ্জন ঘোষ
অনুপকুমার গৌতম সাধুখাঁ
রাজা ঘোষ স্বরূপকুমার শ্রীকান্ত বিশ্বাস
মধুসূদন ভট্টাচার্য বঙ্কিম গোস্বামী দুলাল ভট্ট
সমীরকুমার অনন্ত পাল (সংগীতে)
মণিমালা বোস ছবি তালুকদার মায়া বোস
মলয় মুখার্জী কাবেরী বিশ্বাস

দল পরিচালক ম্যানেজার সহঃ ম্যানেজার
রণজিৎ রায় ● দিলীপ কুণ্ডু ● দুলাল পাল

পরিবেশনায়
লাকতাড়
৩৬৩৩ বি রবীন্দ্র সরণী-কলি-৬
ফোন ২৫৩৫৩২

সন্ধ্যের পর আমাদের দোতলার হাতায় খবরাখবর দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে মল্লিক পরিবারে একটু সান্ত্বনা-সহানুভূতি জানাতে এসে তিনি কিন্তু দারুণ আক্রমণের মুখে পড়েছেন।

আক্রমণটা মল্লিক পরিবারের কারুর কাছ থেকে নয়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রৌঢ় মিঃ রাহার কাছ থেকে।

ম্যানেজার তখনও মল্লিকদের কামরার ভেতর পর্যন্ত যান নি। বারান্দার ওপরই তাঁকে ধরে ফেলে দীননাথ রাহা উত্তেজিতভাবে বলেছেন—আপনি এখানে কি করতে এসেছেন? চলুন আপনার অফিসে চলুন।

এরকম অহেতুক আক্রমণে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেও ম্যানেজার পেশাদারী ভদ্রতার মুখোশ বজায় রেখেই বলেছেন—এতক্ষণ ত' সেখানেই ছিলাম। আপনার কিছু দরকার থাকে ত' চলে যান। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেখানে আছেন।

ও সব অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে হবে না।—মিঃ রাহা চড়া মেজাজে বলেছেন—আপনাকেই আমার দরকার। আর এখনই। আমি এখুনি এ হোটেল ছেড়ে চলে যেতে চাই, এখুনি।

—বেশ ত'! তাই যান না। বলে ম্যানেজার আরো যা বলতে যাচ্ছিলেন, মিঃ রাহার কথার তোড়ে তা বলবার সুযোগ আর তাঁর মেলে নি।

দীননাথ রাহা ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় নিজের কথাই এক নাগাড়ে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে বলে গেছেন—এ হোটেলে কোনো ডিসেন্ট ভদ্রলোক থাকে! হোটেল না একটা মানুষ লোপাটের কারবার! একদিনে দু' দু'জন এখান থেকে নিপাত্তা!

দীননাথ রাহার উত্তেজিত চিৎকারে আমরা অনেকেই তখন বারান্দায় না এসে পারি নি।

ম্যানেজার মশাই এবার আমাদের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে আবেদন জানিয়েছেন—দেখুন, এ রকম দুটো দুর্ঘটনা এমন হঠাৎ হওয়ায় সবাই আমরা স্তম্ভিত, সবাই মর্মাহত। কিন্তু এ হোটেলের তাতে কোন হাত আছে কি?

আলবৎ আছে! একশবার আছে!—মিঃ রাহা জ্বলন্ত গলায় বলেছেন—কেন এ হোটেলে সারাক্ষণ সমুদ্রের ধারে লুলিয়াদের কাউকে পাহারায় রাখার ব্যবস্থা নেই? কেন হোটেলের ভেতর বোর্ডারদের সেফ্‌টির দিকে নজর রাখা হয় না?

নজর রাখা মানে কি বলতে চাইছেন? এবার অমল গুপ্ত ছেলেটি ম্যানেজারের হয়েই একটু হেসে বলেছে—হোটেলের ভেতর আমাদের সকলের ওপর সব সময়ে পাহারা থাকবে? সে রকম পাহারাদার থাকলে আপনিই কি খুশি হতেন, না হোটেলটা জেলখানা মনে করতেন?

আর দেখুন—ম্যানেজার এটুকু সমর্থনে একটু জোর পেয়ে বলেছেন—বোর্ডারদের স্নান করাবার জন্যে একজন নয়, তিন তিন জন লুলিয়া আমাদের হোটেলের মাইনেতে রাখা আছে। সকাল থেকে সমস্ত স্নানের সময়টায় তারা সমুদ্রের ধারে থাকে, কিন্তু কে কখন অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাবে তার জন্যে সারাক্ষণ সমস্ত সমুদ্রতীর পাহারা দেবার ব্যবস্থা কি করা যায়?

এ সব যুক্তিতে হার মানবার মানুষ মিঃ রাহা নন তিনি অটলভাবে নিজের কোট বজায় রেখে বলেছেন,—ও সব যাই বলুন, দু' দুটো এরকম ভয়ানক কাণ্ড যেখানে একদিনে ঘটে, সে হোটেল অত্যন্ত অপয়া এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন? এই জন্যেই আপনাদের লাইসেন্স ক্যানসেল হওয়া উচিত। আমি অন্ততঃ আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না। চলুন আপনি।

মিঃ রাহা একরকম জোর করেই ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে নিয়ে গেছেন। আর খানিক বাদে তল্পি-তল্পা বেঁধে সত্যিই সাইকেল রিক্সা ডাকিয়েছেন হোটেল ছেড়ে চলে যাবার জন্যে।

কিন্তু যাওয়া তাঁর হয় নি।

দুটি দুর্ঘটনার পর এ হোটেলে একই দিনে তৃতীয় অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ঠিক দীননাথ রাহার হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়টিতে তাঁর স্ত্রী মনোরমা দেবীকে কোথাও পাওয়া যায় নি।

মিঃ রাহার অস্থির হয়ে খোঁজা-খুঁজিতে তখনই জানা গেল যে, তাঁর স্ত্রীর নাম মনোরমা দেবী। মনোরমা দেবী কোথায় তা কিন্তু জানা যায় নি।

সন্ধ্যে হবার পরও তাঁকে এই হোটেলেই দেখেছে বলে অনেকের মনে পড়েছে। এরই মধ্যে কেমন করে কোথায় তিনি উধাও হলেন ভেবে সবাই অবাক।

মিঃ রাহা ত উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির হয়ে স্ত্রীকে ছেড়েই তখন যেন একলা চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত।

পরাশরই তাঁকে বাধা দিয়ে ওপরে এনে বসায়। স্ত্রীকে ফেলে চলে যাবেন কি মশাই! সান্ত্বনার সুরেই তাঁকে বলে, ব্যাপার এখন কি রকম গুরুতর দাঁড়িয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। এখানকার পুলিশের খোদ বড় কর্তা নিজে আসছেন তদন্তটার ভার নিতে। এ সময়ে আপনাকে না পেলে ভাববেন কি?

পুলিশের কথায় দীননাথ রাহা আরো যেন চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠে বলেন, যা খুশি তিনি ভাবুন গিয়ে যান, তাতে আমার কি?

এরপর তাঁর চেহারা চালচলনের আভিজাত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান একটা বস্তিসুলভ গালাগাল স্ত্রীকে দিয়ে বলেন,—ভাবুন না কেন, ওটা হতচ্ছাড়ী... আমি ত্যাগ করেছি ডিভোর্স করব বলে।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রাহা অস্থির হয়ে উঠে পড়ে ছুটেই বেরিয়ে যেতে চান।

পরাশরই তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে বসিয়ে বলে, অত অস্থির হবেন না মিঃ রাহা। আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটার মীমাংসা পুলিশের আগে আমিই বোধ হয় করে দিতে পারব।

আপনি পারবেন!—পরাশরের এ স্পর্ধার কথাতেই নিশ্চয় রীতিমত হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মিঃ রাহা জিজ্ঞাসা করেন—তার মানে সে কোথায় আছে আপনি জানেন?

সবই এখুনি জানতে পারবেন।—পরাশর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলে,—এখন আপনি কষ্ট করে একটু সহযোগিতা শুধু যদি করেন।

সহযোগিতা চাইছেন আমার কাছে!—রাগের জ্বালায় দীননাথ রাহার গলা দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বার হয়।

তখন আমাদের দোতলার বারান্দায় উপস্থিত সমস্ত বোর্ডারই বোধ হয় জড় হয়েছেন। আমি বা তাঁরা কেউই মিঃ রাহাকে খুব দোষ সত্যিই দিতে পারেন না বোধ হয়। সদ্য সদ্য স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে যিনি দিশাহারা পরাশরের তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ধরনটা আমাদের অন্তত মনঃপূত নয়।

পরাশরের গলায় কোন রকম রূঢ়তা অবশ্য নেই। অত্যন্ত শান্তস্বরেই সে বলে,—হ্যাঁ, আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে চাইব? আপনি একটা ছবি দেখে শুধু যদি একটু সনাক্ত করে দেন।

ছবি সনাক্ত করে দেব। কি ছবি? মিঃ রাহার মুখে যে বিমূঢ় প্রশ্নটা শোনা যায় সেটা আমাদেরও।

পরাশর এ প্রশ্নের উত্তরে আমার কাছে কিছুদিন আগে তারই পাঠানো ছবিটা নিয়ে আসতে বলে। কিছুই না বুঝে কামরা থেকে সে ছবিটা বার করে এনে পরাশরের হাতে দেবার পর সে সেটা দু'বার নেড়েচেড়ে দেখে মিঃ রাহাকেই দিয়ে বলে,—দেখুন দিকি এ ছবিটা দেখে চিনতে পারেন কি না।

মনের এই অবস্থায় এরকম আজগুবী আবদারে ধৈর্য হারানো খুবই স্বাভাবিক। তবু নিজেকে যতদূর সম্ভব সামলে মিঃ

রাহা দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করেন,—এ ছবিতে কি আমায় চিনতে বলছেন? এ কার ছবি?

হ্যাঁ, এ কার ছবি সেটা অবশ্য আমার আগেই জানানো দরকার।—পরাশর নিজেই স্বীকার করে বলে,—এ ছবি যাঁর তিনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এই চারটি রাজ্যে অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে খুন আর টাকা তছরুপের কেস্ আছে কিন্তু কোথাও তিনি এখনো ধরা পড়েন নি। ওঁর এ সব শয়তানির পদ্ধতি ওঁর নিজস্ব। ছদ্মবেশে চেহারা চরিত্র বদলে দেবার ব্যাপারে ওঁর জুড়ি নেই। যেমন তিন চারটি ভাষা একেবারে নিখুঁতভাবে বলতে পারেন, অভিনয়েও তেমনি তিনি পাকা। এঁর শেষ কীর্তি বোম্বাই-এ। সেখানে সিন্ধী ধনকুবের সেজে এক প্রৌঢ় গুজরাটী ধনী দম্পতির সঙ্গে ভাব জমিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের ধনে-প্রাণে মেরে সরে পড়েন। প্রৌঢ়া স্বামী-স্ত্রীকে একদিন তাঁদের ফ্ল্যাটে এক সঙ্গে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহায় ও বন্ধু সিন্ধী ধনকুবেরের বোম্বাই শহরে কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। গুজরাটী প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়া স্বামী-স্ত্রী খাবারে বিষের ক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন বলে পোস্টমর্টেমে জানা যায়। ছদ্মবেশ নানান হলেও খাবারে বিষ মিশিয়ে মারার পদ্ধতিটা এঁর সব জায়গায় এক। ইনি....

দাঁড়ান। তীক্ষ্ণস্বরে পরাশরকে বাধা দিয়ে মিঃ রাহা বলেন—এই ছবি দেখিয়ে এ সব বৃত্তান্ত শোনাবার এই কি সময়? এতে আমাদের লাভ কি?

লাভ একটু আছে বই কি মিঃ রাহা—পরাশর তাঁকে আশ্বাস দেয়—নইলে মিছি মিছি এমন করে সময় নষ্ট করব কেন? এ ছবিটা আমি আমার বন্ধু এই ভদ্রলোককে কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলাম আমাদের দোতলার এই হাতার কোনো বোর্ডারের সঙ্গে মিল পায় কি না দেখবার জন্যে। ভদ্র তা পায় নি। এখন আপনি ছবিটা দেখে যদি চিনতে পারেন তাহলে আমাদের খুব সুবিধে হয়।

না, না, এ ছবি আমি চিনি না।—মিঃ রাহা ছবিটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেই যান।

কোনো রকমে হাতটা ধরে ফেলে তাঁকে নিরস্ত করে পরাশর তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে,—অত সহজে ধৈর্য হারাবেন না, মিঃ রাহা। ছবিটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন ঠিক মনে করতে পারবেন। চেহারাটা অনেকদিন দেখেননি বলে হয়ত প্রথমটা চিনতে অসুবিধা হচ্ছে।

না! না!—অসহায় রাগের জ্বালায় মিঃ রাহা এবার চিৎকার করে ওঠেন,—এ কি অন্যায় জুলুম আমার ওপর! বলছি এ ছবি কার আমি চিনি না।

তাহলে আপনাকে স্মরণশক্তি বাড়াতে একটু সাহায্য করতে হবে।

হঠাৎ গলার স্বরের অত্যন্ত রূঢ় কাঠিন্যে আমাদের সকলকেই পরাশরের দিকে ফিরে তাকাতে হয়েছে এবার।

পরাশরের মুখও তাঁর গলার স্বরের মত অত্যন্ত রূঢ় আর কঠিন। সেই মুখ আর সেই গলা নিয়ে সে বলে গেছে,—প্রথমত আপনার মাথায় চুলের সাদা কলপ ধুয়ে ফেলে মুখের ওপর আর হাতে চামড়া একটু কুঁচকে বেরঙ্গা করবার জন্যে হরতুকির কষের ছোপ মুছে নিতে হবে। তারপর আপনার ওই বাহারী সাদা গোঁফ জোড়া একটা টান মেরে উপড়ে দিয়ে একটা আয়না আপনার সামনে ধরলেই আপনি নিজেকে নিশ্চয় চিনতে পারবেন। আপনি এ-হোটেলের এই হাতাতেই আস্তানা গেড়েছেন জেনে আপনাকে চিনে নেবার জন্যে আপনার আসল ছবি একটি আমার বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। পাতলা ছিপছিপে লম্বা ইত্যাদি সব কিছুর মিল থাকা সত্ত্বেও শুধু আপনার নিখুঁত বুড়োটে পাকা চুল টাকের মেক-আপ-এর জন্যে সে আপনাকে চিনতে পারে নি। আপনাকে চেনা সহজও নয়। থামুন! থামুন! আপনার ও-সব প্যাঁচের জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি।

চমকে অবাক হয়ে দেখেছি মিঃ রাহা পরাশরের শেষ কথাগুলো বলার সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করতেই পেছন থেকে আমাদের অপরিচিত একজন জোয়ান ভদ্রলোক তাকে পিঠমোড়া করে ধরে ফেলেছেন। এ-ভদ্রলোক কখন এসে মিঃ রাহা পিছনে বসেছেন লক্ষ্যই করি নি।

পরাশর তখন বলে চলেছে—আপনাকে যিনি ধরে রেখেছেন তিনি এখানকার পুলিশের একজন বড়কর্তা শ্রীযুক্ত মহাপাত্র। সাদা পোষাকে আরো অনেকেই আমাদের সঙ্গে এখানে আছেন। অন্য সব জায়গার পর এই উড়িষ্যাতেই আপনার মত মহাপুরুষের লীলা-খেলা যে শেষ করা যাচ্ছে তা এঁদের সাহায্যেই। আপনার সব কীর্তি ক্রমশঃ ফাঁস হবে। আপাততঃ বুবুকে উদ্ধার করা প্রথমে দরকার।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হোটেলের ম্যানেজারকে একটা চাবি দিয়ে পরাশর বলেছে, আপনাদের ছ নম্বর কামরাটা ত আজে-বাজে আসবাবপত্রের স্টোর রুম হিসেবে তালা-বন্ধ করা থাকে। ওটার তালা যে ইতিমধ্যে বদল হয়েছে তা কেউই আপনারা লক্ষ্য করেন নি। যান, এই চাবিটা দিয়ে নতুন তালাটা খুলে বুবুকে বার করে আনুন গিয়ে।

হোটেলের ম্যানেজার হতভম্ব হয়ে চলে যাবার পর, অমল গুপ্তই প্রথম জিজ্ঞাসা করেছে,—আচ্ছা মিঃ রাহার আসল পরিচয় ত পেলাম। কিন্তু উনি এখানে এসে আস্তানা পেতেছিলেন কেন?

আস্তানা পেতেছিলেন,—পরাশর গলায় একটু কৌতুকের ছোঁয়া রেখেই বলেছে,—আপনারই একটু উপকার করবার জন্যে।

আমার উপকার!—অমল গুপ্ত একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলেছে,—আমি কারো উপকার-টুপকার চাই না।

আপনি না চাইলে কি হবে,—পরাশর

৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৪-র নির্ভুল নিঃসংশয় ঘোষণা
যাত্রায় সর্বপ্রথম শিশু-দের
উপভোগ্য পালা
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর
লালুভুলু
পালারূপ : নির্মল মুখার্জী
সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য
নির্মল মুখার্জী রচিত পরিচালিত
মানুষ চায়না
মানুষ
ও
মায়ের অশ্রু
মোচন
শ্রেষ্ঠাংশে
নির্মল মুখার্জী
সংযোজক : সন্তোষ বসু
পরিবেশনায় :
সুশীল নাট্য কোং
৫৫-৫৮৩১
১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ ৬

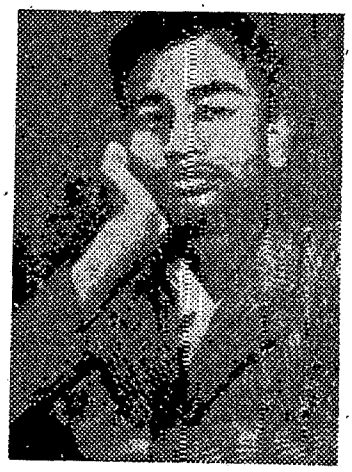

অমর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কালজয়ী কবিতাগুলির মধ্যে "মৃত পৃথিবী" একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সেই কবিতার অমূল্য পাণ্ডুলিপিটি এখানে প্রকাশ করা হল।

মৃত পৃথিবী

পৃথিবী কী আজ মেতে ছিল !
প্রাণের ঢেউ সারা ভরিয়া,
চারিদিকে হেথা-সেথা রক্ত,
জীবন সাজাতে উদ্যত।
সাজাবে সিঁদুরে কপোল
শরীরে সাজ সন্ধ্যের
চুপি চুপি সিঁদুরে এসেছে,
জীবনে যৌবন-দুই ও।

[redacted]

সেইতো জীবন আজ হারিয়ে,
হলদে হাসির মেঘদিগন্তে
সাজাবে প্রাচীর রাঙা ভিড়ে
পৃথিবী হয়েছে প্রেতাত্মা,
সবাই তারে দিয়েছে ত্যাগ,
কোথায় সাজাবে, ঘর নেই তার ?
[redacted]
জীবন যদিও চঞ্চল,
তবুও [redacted]
কবিরা সাজাবে কবিতায়,
যেমে যাবে একদা, একদা ॥

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

পাণ্ডুলিপিটি কবির অনুজ শ্রীমুকুল ভট্টাচার্যের সৌজন্যে পাওয়া।

আমি জানি, এই চিঠিটা পেয়ে তুমি খুবই আশ্চর্য হবে। কে লিখছে এই চিঠি। তা অবিশ্যি হবারই কথা, কারণ এই চিঠিতে কোন সম্বোধন যেমন নেই তেমনি ইতির পরে কারও কোন নামোল্লেখও নেই। তবু কেন যেন আমার স্থির বিশ্বাস এ চিঠি কে লিখছে সেটা তোমার বুঝতে অসুবিধা বা কষ্ট হবে না। পত্র প্রেরককে তুমি ঠিকই চিনে নিতে পারবে।

চিঠির ঐটুকু পড়েই বিস্মিত দীপঙ্কর আবার একবার ভাঁজ করে উল্টে-পাল্টে চিঠিটা দেখে নিল। ফরেন থেকে আসছে এয়ার লেটারটা। এইটুকু মাত্র ডাকঘরের ছাপ দেখে বুঝতে পারে ও চিঠিটা আসছে ক্যানাডা---মণ্টিরিয়ল থেকে। তার নামটা ইংরাজীতে উপরে টাইপ করা---দীপঙ্কর বোস। তারপর তার কলকাতার ঠিকানা।

গতকালই এসেছে চিঠিটা---তার বসবার টেবিলের 'পরেই অন্যান্য কয়েকটা চিঠির মধ্যে ঐ চিঠিটাও ছিল। অফিস থেকে ফিরতে আজকাল বেশ দেরি হয়---গতকালও একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। কোনমতে স্নান সেরে এক বাটি স্যুপ ও একটা হার্ড টোষ্ট খেয়ে শুয়ে পড়েছিল---অন্য খাবার স্পর্শও করে নি।

মীনাক্ষী বলেছিল, কি হলো, আর কিছু খাবে না?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল দীপঙ্কর, না---ক্ষিদে নেই---

ক্লাবে খেয়ে এসেছো বুঝি?

না। আজ ক্লাবেই যাই নি--- ফরেন থেকে একটা পার্টি এসেছে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই রাত হয়ে গেল।

দেখ, একটা কথা বলছিলাম---

কি?

বেণুকে কোন একটা ভাল কনভেণ্টে দিলে হয়।

কেন?

যে স্কুলে পড়ছে ও সেখানে ভাল লেখাপড়া হচ্ছে না বলেই আমার মনে হয়।

বেশ ত'---তাই হবে। বেণু মা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

হ্যাঁ---ওদের স্কুলে কি একটা ফাংশন ছিল---স্কুল থেকে এসেই খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

তারপরই দীপঙ্কর বলেছিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে মীনু---আমি শুতে চললাম।

বিছানায় গিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপঙ্কর।

আজ সকাল বেলা উঠে চা পান করতে করতে চিঠিগুলোর 'পরে নজর পড়ায়, চিঠিগুলো উল্টে-পাল্টে ঐ ফরেন এয়ার লেটারটাই সর্বপ্রথম তুলে নিয়ে খুলেছে।

আবার চিঠিতে মন দিল দীপঙ্কর।

জানি, এই চিঠির প্রেরককে তুমি চিনতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারবে না---কারণ দীর্ঘ পনের বছর আগে যে লোকটা আকস্মিক (?) একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে---যার সৎকার পর্যন্ত তোমরা করেছো, তারই কাছ থেকে যদি আজ এমন একটা চিঠি আসে সেটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য, না ভাবা সম্ভব?

না, দীপঙ্কর---সে রাত্রে মোটর একসিডেণ্টে আমি মরি নি। মারা গিয়েছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নিরীহ ভদ্রলোক---যাকে সেই ঝড়-জলের রাত্রে পথের মাঝখানে অসহায় দেখে গাড়ীতে আমার তুলে নিয়েছিলাম দয়াপরবশ হয়ে একটা লিফট্ দেবার জন্য। যার নামটা পর্যন্ত আমি আজো জানি না।

সে রাত্রে অমন করে হঠাৎ তোমার ব্যারাক-

পুরের বাড়ি থেকে কেন চলে এসেছিলাম জান? এসেছিলাম এইজন্য যে, তোমার আর মীনাক্ষীর পথ থেকে চিরদিনের মত সরে আসবো বলে। যে মুহূর্তে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল মীনাক্ষী আসলে তোমাকেই চায় আমাকে চায়, না---সেই মুহূর্তেই যেন আমার সব কিছু মিথ্যা হয়ে গেল। চারপাশের এতদিনকার চেনা-জানা জগৎটা যেন মিথ্যা হয়ে গেল---মনে হলো এ জীবনটা মিথ্যা। সব---সব কিছু মিথ্যা। অর্থ হীন।

মীনাক্ষী শেষ পর্যন্ত তোমার অর্থকেই গ্রহণ করলো---আমার এতদিনকার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করলো। অর্থই ভালবাসার কাছে শ্রেয়ঃ ও নিশ্চয়ই ভেবেছিল। বুঝতে পারি নি সেদিন ভালবাসা কি এতই দরিদ্র। তার কোন সম্মান নেই, প্রতিশ্রুতি নেই অর্থের কাছে।

সত্যি আমি বোকা ছিলাম---নচেৎ মীনাক্ষীকে বুঝতে পারি নি কেন? দীর্ঘ চার বৎসর ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে, তোমার প্রচুর অর্থ, তুমি তাই কিনে নিলে মীনাক্ষীর ভালবাসাকে। আমি হেরে গেলাম। তোমার ওখান থেকে বের হয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলাম---প্রকৃতি জুড়ে তখন তাণ্ডব চলেছে, গাড়ি চালাচ্ছি শূন্য এক হতাশার মধ্যে।

আচ্ছা দীপঙ্কর, আমাকে কি তুমি সেদিন বিশ্বাস করতে পারনি---আমি যে মীনাক্ষীকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি সেটুকুও বিশ্বাস করতে পার নি? কেন পারলে না দীপঙ্কর? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমন একটা জঘন্য কাজ করলে কেন? অমন নীচতার পরিচয় দিলে কেন, আমার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়েছিলে কেন?-----

আমাকে একেবারে শেষ করে দেবে, তাই কি?

ভদ্রলোকটিকে পথের মাঝে তুলে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ সামনে পড়লো একটা বাঁক। বিরাট একটা গাছ, ব্রেক কষলাম---ব্রেক ফেল করলো, প্রচণ্ড একটা ঘুরপাক খেয়ে গাড়িটা উল্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন ফিরে এলো, দেখলাম একপাশে একটা নালার মধ্যে পড়ে আছি---আর কয়েক হাত দূরে নালার মধ্যে গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, বাঁ হাতটা নাড়তেও পারছি না, একটা কোণ দিয়ে রক্ত পড়ছে---যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, নির্জন পথ---অন্ধকার---বৃষ্টি তখনো টিপটিপ করে পড়ছে।

কি ভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারপর কলকাতায় পৌঁছেছিলাম জানি না, তারপর সেখান থেকে একটা হাসপাতালে। তোমরা ত' জানতেই আমার কি দশা হবে---তাই তোমরা পরের দিন এসে পোড়া ঝাঁজরা গাড়িটার মধ্যে থেকে সেই ভদ্রলোকের পোড়া দেহটা যখন দেখতে পেলে--- ধরে নিলে সে তার কেউ নয়---আমিই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছো সে রাত্রে আমি মরি নি---তোমার সমস্ত হীন চক্রান্ত ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

হ্যাঁ, দীপঙ্কর---আমি মরি নি। আমি আজো বেঁচে আছি।

তোমরা মহাসমারোহে চোখের জল মুছতে মুছতে যে দেহটা পরের দিন সন্ধ্যায় নিমতলা শ্মশানে পুড়িয়েছো---সে আমি নই---সে সেই হতভাগ্য ভদ্রলোকটি। যার পরিচয় সত্যিই আজো জান, আমার জানতে ইচ্ছা করে, তোমরা নিশ্চিত জান আমি মরেছি।---নিমতলা শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছি।

কিন্তু মরলাম না আমি।

আমি বেঁচেই রইলাম।

কিন্তু সে বাঁচার মধ্যে আমার যে কি যন্ত্রণা ছিল তুমি জানতেও পার নি। দু' মাস পরে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে চোরের মত এক হোটেলে এক মাস নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়ে রইলাম। তারপর একদিন আমার যথাসর্বস্ব বিক্রী করে জাহাজে উঠে বসলাম।

ইংলণ্ডগামী এক জাহাজে।

সেখান থেকে দুই বৎসর বাদে এখানে।

আমার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে বাঁচার পথ বাতলে দিল।

চাকরী থেকে ব্যবসা---

আজ আমার ফার্ম এদেশে বিরাট এক ফার্ম। অবিশ্যি আমি একা নই, আমার এক এদেশীয় পার্টনার আছেন। আমাদের ফার্মের তৈরী মাল দেশে দেশে চালান যায়। লক্ষ লক্ষ ডলারের কারবার।

হ্যাঁ, দীপঙ্কর---আজ আমার অনেক টাকা।

অনেক ডলার আমার ব্যাঙ্কে, যার পরিমাণ শুনলে তুমি আর মীনাক্ষী হয়ত চমকে উঠবে। তোমাদের বিচারেও তাই আজ আমি ধনী।

একটা কথা জানাই---তোমার কারবারে যে ঘুণ ধরেছে গত কয়েক বৎসর ধরে সে আমার অজ্ঞাত নয়---এবং গত বৎসর ডিসেম্বরে তুমি যে চিমনভাই প্যাটেলের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন নিয়েছো---সেও আমারই টাকা। আমিই দিয়েছি সে টাকা। আমারই পরামর্শে সে টাকা তোমায় সে লোন দিয়েছে। এবং সে টাকা তুমি কোনদিনই আর শোধ করতে যে পারবে না তাও আমি জানি---কারণ কারবারের তোমার শ্বাস উঠেছে।

ভাবছো বোধ হয় কেন আমি টাকা দিলাম তোমার কারবারকে বাঁচাতে, কারণ বিশ্বাস হয়ত করবে না জানি, তবু বলছি, তুমি যেমন আমাকে পনের বছর আগে একদিন শেষ করে দিতে চেয়েছিলে---আমি তা করতে পারলাম না।

অবিশ্যি সেটা তোমার জন্য নয়---মীনাক্ষীর জন্যই তোমাকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমাকে বাঁচানো আমার সাধ্য নয়। যে নৌকায় ফাটল ধরেছে তার জল কত ছেঁচে ফেলবো?

তাছাড়া, তোমার চিরাচরিত অসাধুতা---সেই যে তোমার শনিগ্রহ।

তবু---তবু--সব জেনে এবং বুঝেও আবার তোমাকে আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত কিন্তু একটা শর্তে।

ঐ কারবারে তোমার চিমনভাইকে পার্টনার করে নিতে হবে।

যদি তাতে তুমি সম্মত থাক ত আগামী ১৬ই এপ্রিল---তার সঙ্গে বেলা দুইটায় তার অফিসে দেখা করো।

ইতি।

ইতির পরে কোন নাম বা স্বাক্ষর নেই।

কিন্তু স্বাক্ষর কোন কিছু না থাকলেও দীপঙ্করের বুঝতে কষ্ট হয় না পত্র প্রেরক কে---কি তার পরিচয়।

মীনাক্ষী ঐ সময় এসে সামনে দাঁড়াল। বললে, কি গো, তখন থেকে দেখছি একটা চিঠি হাতে করে বসে আছো---কার চিঠি---অফিসে বেরুবে না?

মীনু---

কি?

কয়দিন থেকেই একটা কথা ভাবছি---

কি কথা?

কারবারটা বেচে দেবো।

বেচে দেবে---সে কি,

হ্যাঁ---

কারবার বেচে দিয়ে করবে কি? আমাদের চলবে কি করে?

অনেক দেনা জমা হয়েছে---

দেনা?

হ্যাঁ---এতদিন তোমাকে কিছু বলিনি---বহু টাকা দেনা হয়ে গিয়েছে।

দেনা করেছো তুমি---ওকথা ত আমাকে কখনো বলোনি!

না বলিনি---

কেন?

ভেবেছিলাম সব সামলে নেবো---কিন্তু পারলাম না---দেনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে---তাই ভাবছি---কারবার বেচে দেবো।

শুধু কারবার নয়---এই বাড়িও---

বাড়িও?

হ্যাঁ---বেচে দিয়ে দেনা শোধ করে যা থাকবে তাই নিয়ে এ শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবো---সম্ভব হলে ছোট্ট একটা বাড়ি কিনে---

না, না---কি সব আজেবাজে মতলব

করছো ? ও মতলব ছেড়ে দাও ---আমার ত অনেক টাকার গহনা আছে---সেগুলো বেচে---

দেনা আজ কতয় দাড়িয়েছে জান ?

শুনতে চাই না। মোদ্দা কথা কারবার বেচা চলবে না। সে আমি তোমাকে কিছুতেই করতে দোব না।

দীপঙ্কর মৃদু হাসলো।

তারপর উঠে দাঁড়াল। বললে, বেণু মাকে দেখছি না যে।

বেণু ত' সেই কোন্ সকালেই বের হয়ে গিয়েছে ---

বের হয়ে গিয়েছে। কোথায় ?

তার আংকেলের বাড়িতে।

আংকল ---আংকল আবার কে এলো বেণুর ?

বেণু বলছিল চমৎকার নাকি ভদ্রলোক---মনে আছে তোমার দিন পনের আগে বেণুরা স্কুল থেকে বোটানিকস্‌য়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল, সেখানেই ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে নাকি বেণুর আলাপ।

বিরাট বড়লোক---বেণু বলছিল---

তাই নাকি ?

হ্যাঁ---সাদার্ণ য়্যাভিন্যুতে একটা বিরাট বাড়ি ---গোটা দুই গাড়ি---ফরেনে কি সব বিজনেস আছে---বেণুকে ভীষণ ভালবাসেন।

নাম কি ভদ্রলোকের জান ?

মৃত্যুঞ্জয় রায় না কি যেন বলছিল বেণু---মীনাক্ষী বললে।

মৃত্যুঞ্জয় রায় ?

হ্যাঁ---তাঁর ওখানে ত রোজই যায় স্কুলের পর---তারপর সন্ধ্যায় তাঁর ড্রাইভার গাড়ি করে এখানে পৌঁছে দেয়।

এসব কথা ত' এতদিন তুমি আমাকে বলনি।

তুমি আজকাল বাড়িতে কতক্ষণ থাকো---কেবল ত' কারবার কারবার করেই ব্যস্ত।

দীপঙ্কর আর কথা বললো না---মাথার মধ্যে তখন তার চিঠির কথাগুলো কেবলই ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে---সৌগত---সৌগত রায়---সে আজো বেঁচে আছে ? সৌগত রায় মরে নি, চিঠিটা হাতে নিয়ে দীপঙ্কর তার শয়নঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

॥ দুই ॥

অফিসে বেরুবার সময় কিছুটা তাড়া-হুড়ায় এবং কিছুটা অন্যমনস্কতার দরুন দীপঙ্কর সৌগতের চিঠিটার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

চিঠিটা যে ঘরের আলমারীর খোলা ড্রয়ের মধ্যেই রেখে গেছে তার মনেও ছিল না।

চিঠিটার কথা ভুলেও গিয়েছিল।

ইচ্ছা ছিল চিঠিটা যেন মীনাক্ষীর হাতে না পড়ে।

কিন্তু তা হলো না।

দুপুরে আলমারীর ড্রয় খুলে কি একটা খুঁজতে গিয়ে মীনাক্ষীর হাতে চিঠিটা পড়ে গেল।

ফরেন এয়ার লেটার---

ফরেন থেকে চিঠি আসে বটে দীপঙ্করের কাছে, সে সব কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারের চিঠি এবং সে সব চিঠি আসে অফিসের ঠিকানাতেই---বাড়ির ঠিকানায় নয়।

বাড়ির ঠিকানায় তার স্বামীর কাছে কে লিখলো চিঠি ?

একটা অলস কৌতূহলের সঙ্গেই চিঠিটা খুলে সামনে ধরেছিল মীনাক্ষী---কিন্তু প্রথম কয়টা লাইন পড়েই সে যেন চমকে উঠলো। চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়ে গেল।

অনেকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো চিঠিটা হাতে ধরে মীনাক্ষী আলমারীর সামনে, তারপর এক সময় এসে শয্যার উপরে বসে পড়লো।

আবার পড়লো চিঠিটা আগাগোড়া।

কোথাও কোন অস্পষ্টতাই নেই।

সবই জলের মত স্পষ্ট।

চিঠিটা যে তার স্বামীকে কে লিখেছে তাও তার বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু সব কিছু আজ মীনাক্ষীর কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হিসাব করে দেখলো মীনাক্ষী---সত্যি দীর্ঘ পনের বছর কেটে গেছে এবং এই দীর্ঘ পনের বছর ধরে যা সে জেনে এসেছে সেটা সত্য নয়---মিথ্যা।

সৌগত মরেনি।

সৌগত আজও বেঁচে আছে।

যে মৃতদেহটার সৎকার তারা করেছিল সেটা সৌগতের মতদেহ নয়। সম্পূর্ণ অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তি।

পড়ে ঝলসে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল সত্যিই দেহটা। এমনভাবে বিকৃত হয়েছিল যে তখন কাউকে চেনা সম্ভব নয়। সৌগত সে রাত্রে দীপঙ্করের বাড়ি থেকে বের হয়ে ঝড়-জলের মধ্যে গাড়ি চালাতে চালাতে পথিমধ্যে এ্যাক-সিডেণ্ট করেছে---সংবাদটা পরের দিন দীপঙ্করই তাকে ফোনে জানিয়েছিল এবং জানিয়েছিল এ্যাকসিডেণ্টে সৌগতের মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদটা এত অপ্রত্যাশিত, এমন আকস্মিক যে সংবাদটা টেলিফোনে পেয়ে কয়েকটা মুহূর্ত মীনাক্ষী যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সৌগত নেই, সৌগত মারা গিয়েছে---

দীপঙ্কর অবিশ্যি পরের দিন আবার তাকে ফোনে বলেছিল, সৌগতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

তারা করছে সন্ধ্যায় নিমতলা শ্মশানে---মীনাক্ষীকে যাবার জন্য অনুরোধও জানিয়েছিল দীপঙ্কর কিন্তু মীনাক্ষী যায় নি।

সৌগত আর নেই---কথাটা যেন ভাবতেই পারছিল না মীনাক্ষী। কেমন যেন একটা অসহায় শূন্যতা তাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল।

সৌগত নেই। সৌগত নেই।

সৌগতকেই বিয়ে করবে বলে মীনাক্ষী তার বাবা অচিন্ত্য সেনকে জানিয়ে দিয়েছিল---কিন্তু অচিন্ত্য সেন রাজী হননি। সৌগত তখন ত' মাত্র বছর দুই হবে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে একটা অফিসে মাত্র চারশত টাকা মাইনায় চাকরি করছিল---অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

ছোটবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে কাকার কাছে মানুষ।

আর দীপঙ্কর বিরাট বোস এণ্ড কোম্পানীর ভবিষ্যৎ মালিক---তার ধনী বাপের একমাত্র সন্তান। দীপঙ্কর অচিন্ত্য সেনকে যখন বলেছিল যে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে চায় অচিন্ত্য সেন খুশিই হয়েছিলেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মতিও দিয়েছিলেন।

কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসল---সে অবিশ্যি বলেনি সৌগতকেই সে বিবাহ করতে চায়---কিন্তু পরে পীড়াপীড়িতে বলেছিল সে সৌগতকে বিবাহ করতে চায়।

সৌগত অচিন্ত্য সেনের অফিসেই কাজ করতো, সেই সূত্রেই আসা-যাওয়া অচিন্ত্য সেনের বাড়ীতে ও মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপ।

ক্রমে ঘনিষ্ঠতা---যে সংবাদটা অচিন্ত্য সেন পান নি।

আজ বুঝতে পারছে মীনাক্ষী---হীন চক্রান্ত করেছিল দীপঙ্কর তাকে সেদিন পাবার জন্য---তার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে তাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

আরো হয়ত বানিয়ে বানিয়ে সৌগতকে সেদিন অনেক কিছু বলেছিল দীপঙ্কর---যাতে তার ধারণা হয় মীনাক্ষী দীপঙ্করকেই ভালবাসে।

আশ্চর্য, ব্যাপারটা সৌগত বিশ্বাস করলো কি করে?

একটি বারও তাকে জিজ্ঞাসা করলো না কেন?

হয়ত করতো এখন মনে হচ্ছে---কিন্তু এ্যাকসিডেণ্ট ঘটায় সময় পায়নি।

অনেকগুলো বছর---দীর্ঘ পনেরটা বছর।

মীনাক্ষী মনের মধ্যে হাতড়ায়---সৌগতকে কি সত্যিই সে ভুলে গিয়েছে, সৌগত তার মন থেকে সত্যিই কি একেবারে মুছে গিয়েছে?

তাই যদি মুছে গিয়ে থাকবে---বুকের মধ্যে কিসের এ যন্ত্রণা সে বোধ করে। একটা বোবা যন্ত্রণা যেন বুকটা চেপে রয়েছে, আর সে ত আজ নয়---দীপঙ্করকে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করবার পর থেকেই।

সৌগতের চিঠির মধ্যে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে বিশ্বাস করেছে---সে আর দীপঙ্করই কৌশলে তাদের পথ থেকে তাকে চিরতরে সরাবার চেষ্টা করেছিল। সেদিনকার সেই হীন চক্রান্তের অংশীদার সেও। ভাগীদার সেও।

সারাটা দিন মীনাক্ষী যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই শয্যার উপরে একইভাবে বসে রইলো। স্নান করলো না, খেল না---দাসী এসে বার বার তাগাদা দিল। সে কেবল বলেছে, যা আমার কাছ থেকে, বিরক্ত করিস না।

মায়ের এমন রুক্ষ ভাব কখনো দেখেনি আগে দাসী নারাণী।

অনেক দিনের পুরনো দাসী নারাণী।

বাপের বাড়ি থেকে, তার সঙ্গে এখানে এসেছে।

অফিসে নিজের ঘরে বসে দীপঙ্কর সকালের সেই চিঠিটার কথাই ভাবছিল।

কথাটা এতটুকু মিথ্যা বা অত্যুক্তি নয়।

তার এতবড় কারবার বাপ যেটা তৈরী করে গিয়েছিলেন এবং তারপরও সে তার নিজের চেষ্টায় আরো বিস্তৃত করেছিল, সত্যিই সেই কারবারের মূলে ঘুণ ধরেছে।

এবং সেটার শুরু আজ নয়---বছর পাঁচেক আগে বহু লক্ষ টাকার একটা কনসাইনমেণ্ট হঠাৎ এক বিদেশী কোম্পানীর দ্বারা রিজেক্টেড হবার পরই।

সেই টাকার খেসারত দিতে গিয়েই দীপঙ্করের এই সাধের কারবারে ঘুণ ধরলো। তৈরী মালগুলো গুদামের মধ্যে পড়ে থাকল।

আজো যা পড়ে আছে গুদামের মধ্যে।

চিমনভাই প্যাটেলের দেওয়া লোন পেয়েও সে সামলাতে পারেনি। ক্ষতির পরিমাণ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। যে কারণে সে ভাবছিল গত কয়েক মাস ধরেই কারবারটা বেচে দেবে---শুধু কারবার নয়, বাড়িটাও---সব বেচে দেনা শোধ করে ভারমুক্ত হবে।

মীনাক্ষী তাতে সম্মত নয়---কারণ মীনাক্ষীর বাবাও তার এই কারবারে কিছু মোটা টাকা তিনি বেঁচে থাকতেই ঢেলেছিলেন।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল দীপঙ্করের সেই চিঠিটার কথা। তাড়াতাড়ি ফোলিও ব্যাগটা খুলে চিঠিটা খুঁজতে লাগল।

চিঠিটা নেই।

কোথায় গেল চিঠিটা।

চিঠিটা কি তবে সে সঙ্গে করে আনোন---কি কাজে যেন আলমারী খুলেছিল---ড্রয়ের মধ্যেই কি তবে সে চিঠিটা ফেলে এসেছে?

সর্বনাশ---যদি চিঠিটা মীনাক্ষীর হাতে পড়ে।

সে যদি চিঠিটা পড়ে।

রীতিমত অসোয়াস্তি বোধ করে দীপঙ্কর।

উঠে পড়লো দীপঙ্কর চেয়ার থেকে, নীচে এসে গাড়িতেই উঠে বসল। ড্রাইভার রামলগন গাড়ির মধ্যেই ছিল। সে গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে বললে, কিধার যায়গা সাব্---কারখানা।

নেহি---কোঠি। কোঠি চল।

কোঠি---রামলগন একটু যেন অবাকই হয়, এসময় ত' সাহেব কখনো বাড়ি ফেরে না, কিন্তু সে আর কোন প্রশ্ন করলো না। গাড়িতেই ষ্টার্ট দিল।

বেলা তখন সোয়া দুটো।

বাড়ি পৌঁছে নিজেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো---টপাটপ সিঁড়িগুলো টপকে সোজা এসে নিজের শয়নকক্ষে ঢুকলো---কোন দিকে তাকালও না---তাকালে দেখতে পেত অদূরে শয্যার উপর বসে আছে মীনাক্ষী।

এবং মীনাক্ষী তারই দিকে তাকিয়ে আছে বোবা দৃষ্টিতে।

আলমারীর ড্রয়টা খুলে পাগলের মত হাতড়াতে লাগল দীপঙ্কর। চিঠিটা---চিঠিটা---না---চিঠিটা ত নেই ড্রয়ের মধ্যে। পাশের ড্রয়টা খুলেও সব কিছু ওলট-পালট করল দীপঙ্কর---না, সে ড্রয়েও চিঠিটা নেই।

কি খুঁজছো?

চমকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকাল এতক্ষণে পশ্চাতে দীপঙ্কর।

স্থিরদৃষ্টিতে মীনাক্ষী তখন তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দীপঙ্কর কি বলবে বুঝতে পারে না।

মীনাক্ষীর পাশেই শয্যার উপর পড়ে ছিল চিঠিটা---সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে শান্ত গলায় বললে, এই চিঠিটা খুঁজছো?

দীপঙ্কর চেয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে---বোবা অসহায় দৃষ্টি।

এই চিঠিটাই বোধ হয়, নাও---

দীপঙ্কর যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে।

পরস্পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের দৃষ্টি যেন একে অন্যকে ধারালো তীক্ষ্ণ একজোড়া ছুরির মত সর্বাঙ্গে চিরে চিরে যাচ্ছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো দীপঙ্কর স্ত্রীর সামনে---স্ত্রীর প্রসারিত হাত থেকে চিঠিটা নিল।

শান্ত গলায় মীনাক্ষী বললে, চিঠিটা আমি পড়েছি।

দীপঙ্করের মুখে কোন শব্দ পর্যন্ত নেই।

মীনাক্ষী আবার বললে, সৌগত চিঠিতে যা লিখেছে তা কি সত্যি?

দীপঙ্কর বোবা---

বল না---জবাব দিচ্ছ না কেন আমার প্রশ্নের---সব সত্য কিনা?

মীনু---

আমি শুধু জানতে চাই---ঐ জঘন্য অভিযোগ সৌগতের সত্য কিনা, সত্যিই তুমি সেদিন তার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়েছিলে?

আমি---

তুমি এত নীচে নেমে গিয়েছিলে---

বিশ্বাস করো মীনা---

কি বিশ্বাস করবো---তুমি যা বলবে---তুমি তা করোনি সেই জঘন্য মিথ্যাটা। কেন---কেন এখনো স্বীকার করছ না---সব সত্য---ঐ চিঠির কথাটা মিথ্যা নয়, কি---কি বলেছিলে তাকে তুমি সেদিন আমার সম্পর্কে?

আমি---

হ্যাঁ তুমি। কি বলেছিলে। আমি তোমাকেই ভালবাসি। তোমাকেই চাই---

আমি---আমি সেদিন তোমাকে হারাবার ভয়ে---

কি বলেছিলে তাকে?

তোমার হাতের লেখা জাল করা একটা মিথ্যা চিঠি।

চিঠি!

হ্যাঁ---চিঠি---তুমি যে সব চিঠি লিখতে সৌগতকে তারই একটা তার ড্রর থেকে চুরি করে দিনের পর দিন তোমার হাতের লেখা মক্স করে---

তাতেও তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো নি---তাকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্য তার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়েছিলে।

আমি---আমার ড্রাইভারকে---

গর্জন সিং---

হ্যাঁ---

তাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দাও---পাছে ঐ সত্য কোন দিন প্রকাশ পায় বলে---

দীপঙ্কর মাথাটা নীচু করে।

কিন্তু আজ বলছি---কোনদিন এ জীবনে যেটা আমার মুখ থেকে প্রকাশ পেতো না হয়ত সেই সত্যটাই বলছি---

মীনা---

তুমি আমার এই দেহটাই পেয়েছো শুধু---আমার---আমার মন কোনদিনই তোমাকে গ্রহণ করতে পারে নি। সৌগতের স্মৃতি একটা লৌহ কঠিন প্রাচীরের মতো আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজো থেকে গিয়েছে।

মীনাক্ষী একটু থামল। তার বুকের মধ্যে যন্ত্রণাটা যেন তার তখন অসহ্য মনে হচ্ছে। একটু থেমে মীনাক্ষী আবার বললে, এতকাল আমার মৃতদেহটাই কেবল তোমার লালসা পরিতৃপ্ত করেছে---বলতে বলতে মীনাক্ষীর সমস্ত বুকটা কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো।

দু'জনে অতঃপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে---একজন দাঁড়িয়ে একজন বসে শয্যার উপর।

॥ তিন ॥

মীনা।

দীপঙ্করের ডাকে মীনাক্ষী ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

তুমি কি চলে যাবে?

চলে যাবো---কোথায়, না দীপঙ্কর---অপরাধ ত আমারও কম নয়। আমিও ত সেদিন তোমার কথাটাই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। না---বাকী জীবনটা আমার এই তোমার লোহার খাঁচার মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। কোথায় আমি যাবো---কোথায় যাবো---বলতে বলতে মীনাক্ষীর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো---বুজে এলো---দু'চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা হয়ে এলো।

মীনাক্ষী উদ্‌গত অশ্রুকে কোনমতে রোধ করে বললে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে বৈ কি।

আমি কারবার---বাড়ি সব কিছু বেচে দিয়ে---

সৌগতের ঋণ শোধ করবে। মীনাক্ষী বললে।

হ্যাঁ---কারণ আমি বুঝতে পারছি---সে এবার এখানে আসবে।

কে?

সৌগত---

সে যদি আজ তোমাকে খুঁজে-পেতে মুখোমুখি তোমার দাঁড়াতে চায়ই---তুমি পালাতে পারবে?

কিন্তু---

না---সে চেষ্টা করো না----

করবো না।

না---আমাদের দু'জনকেই যে তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ঐ সময় বাইরের সিঁড়িতে বেণুর চিৎকার শোনা গেল, মা---মামণি---ডাকতে ডাকতে বেণু এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, বাপী---

দীপঙ্কর মেয়ের মুখের দিকে তাকাল।

তুমি---অফিসে যাওনি?

না মামণি---গিয়েছিলাম, এই ত' আসছি।

জান মামণি, আমি আঙ্কলকে সামনের বুধবার আমার বার্থডে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে এসেছি---কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না আঙ্কল---শেষটায় আমি কেঁদে ফেলায় বলেছে আসবে---

দীপঙ্কর ও মীনাক্ষী দু'জনাই নীরব।

দু'জনেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

দারুণভাবে সেলিব্রেট করবো এবারে আমার বার্থডে পার্টি, কি বলো বাপী---বেণু বললে।

নিশ্চয়ই---নিশ্চয়ই সেলিব্রেট করবো---তুমিই বলো মামণি, কি ভাবে তুমি তোমার বার্থডে পার্টি এবারে সেলিব্রেট করতে চাও---

নীচের হলঘরটা খুব সুন্দরভাবে তাজা ফুল এনে মার্কেট থেকে সাজাতে হবে---

বেশ। আর---

একটাও কাগজের ফুল বা মালা থাকবে না, সব সত্যিকারের টাটকা ফুল---আর---

আর কি থাকবে মামণি। ভগ্নকণ্ঠে শুধালে দীপঙ্কর।

আলো---লাল---নীল---সবুজ।

বেশ---

বেশ নয়---তুমি রাজলক্ষ্মী ডেকরেটারকে বলে দাও---

জান মামণি---আঙ্কল বড় দুঃখী---

দীপঙ্করই প্রশ্ন করলো---কেন?

তার একটা হাতই যে নেই---

হাত নেই!

না---আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি---তার বাঁ হাতটা কনুই থেকে ফলস---রবারের হাত---আর একটা চোখ পাথরের---

তাই বুঝি---

হ্যাঁ---অনেক দিন আগে ঐ হাতটা আর চোখটা তার নষ্ট হয়ে যায়---

কি করে?

একটা মোটর এ্যাকসিডেণ্টে।

মোটর এ্যাকসিডেণ্ট! একটা অস্ফুট আর্ত শব্দ যেন বের হয়ে এলো দীপঙ্করের মুখ থেকে---তারপরই সে তাকালো মীনাক্ষীর মুখের দিকে।

মীনাক্ষীও তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

দু'জনার মনের মধ্যেই তখন একটি প্রশ্ন---কে---কে বেণুর আঙ্কল---সৌগতই নয় ত?

বেণু আবার বললে, আরত দেরি নেই---আজ শুক্রবার---মাঝখানে আর মাত্র চারটে দিন আছে---

সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে মামণি---তুমি কিছু ভেবো না। কথাগুলো বলে দীপঙ্কর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বেণু এসে উপবিষ্ট মীনাক্ষীর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো, আঙ্কল যে কি ভাল দেখবে তোমরা---আমাকে কি বলে ডাকে আঙ্কল জান মামণি, বলে, আমার ছোট্ট পাখী চন্দনা,

চঞ্চল পাখী দেখতে কেমন মামণি—দেখেছো তুমি ?

মীনাক্ষীর দু'চোখের কোণ বেয়ে তখন অবিরল অশ্রু ঝরে ঝরে তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

কাদছো কেন মামণি ?

একটা কি যেন চোখে পড়লো, মামণি—মীনাক্ষী বললে ?

দেখি—আমি বের করে দিচ্ছি—

না, না—আমি বাথরুমে গিয়ে জলের ঝাপটা চোখে দিলেই চলে যাবে—মীনাক্ষী উঠে দাঁড়াল।

ঐ দিনই রাত্রে।

অনেক রাত্রে মীনাক্ষী যখন শয়নকক্ষে এসে ঢুকলো—দেখলো দীপঙ্কর তখনও ঘুমায়নি। ঘরের আলো নিভানো—অন্ধকার—সেই অন্ধকারে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর পাইপ টানছে।

পদশব্দে স্ত্রীর দিকে ফিরে বললে দীপঙ্কর, আমার মনে হচ্ছে মীনা—বেণুর আঙ্কল আর কেউ নয়—সৌগতই—সে নিশ্চয়ই কলকাতায় এসেছে—

মীনাক্ষী কোন জবাব দিল না স্বামীর কথার—অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমার সন্দেহ যদি সত্যিই হয়—এক কাজ করবে মীনা—

কি ?

চল—কালই আমরা বেণুকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাই—তারপর সেখান থেকে আমার সলিসিটার কর সাহেবকে ইনস্ট্রাকশন দেবো—সব কিছু বিক্রী করে দেবার—

না—

মীনাক্ষী—

না। তার সামনে আমাদের দু'জনকেই দাঁড়াতে হবে আজ—

কিন্তু—

কোথায় পালাবো—কোথায় পালাবো আমরা, কত দূরে পালাবো।

মীনাক্ষী।

করুক। করুক সে বিচার আমাদের দু'জনার। যাও, শুয়ে পড়গে, অনেক রাত হয়েছে—আমি বেণুর ঘরে শোব।

কথাগুলো বলে মীনাক্ষী আর দাঁড়ালো না—ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আর অন্ধকারে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো একা ঘরের মধ্যে দীপঙ্কর।

পালানো হলো না দীপঙ্করের।

কোথায় যাবে সে—যেখানে যত দূরেই সে যাক না কেন—সৌগতের দৃষ্টিকে কি সে এড়াতে পারবে ? সৌগতকে ত' সে খুব ভাল করেই চেনে। এখন মনে হচ্ছে সৌগতকে সেদিন সে বললেই পারত মীনাক্ষীকে সে ভালবাসে—মীনাক্ষীকে না পেলে তার জীবনটাই মিথ্যা হয়ে যাবে। সৌগত তার প্রস্তাবে রাজী হোক বা না হোক, তার নিজের দিক থেকে অন্ততঃ সে পরিষ্কার থাকতে পারত।

বেণুর আঙ্কল সৌগত নাও ত হতে পারে। মিথ্যেই সে দুঃস্বপ্ন দেখছে।

একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছে না দীপঙ্কর—এত কাণ্ডর পরও দীপঙ্করকে কেন অর্থ সাহায্য করতে গেল সৌগত—কেন তার ভরাডুবি কারবারে টাকা ধার দিল।

পাশের ঘরে ঐসময় ফোনটা বেজে উঠলো।

এত রাত্রে আবার কে ফোন করছে—দীপঙ্কর পাশের ঘরে ঢুকে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো, কে—দীপঙ্কর—আমি রমেন দত্ত।

রমেন—কি ব্যাপার—এত রাত্রে—

একটা পার্টি যোগাড় করেছি—

পার্টি—

হ্যাঁ—সে লাখ দুয়েক টাকা ঢালতে রাজী আছে—আমাদের লায়াবিলিটিজও সে নিয়ে নেবে—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ—আমাদের কারবারের যা অবস্থা—আমার ত' মনে হয়—ওর প্রস্তাবে আমাদের রাজী হয়ে যাওয়াটাই ভাল।

তার মানে কারবারটা তার হাতে তুলে দিতে হবে।

নচেৎ সে অত টাকা দেবে কেন ?

কাল অফিসে কথা হবে—বলে দীপঙ্কর রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বেজে উঠলো—দীপঙ্কর রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই শুনতে পেল আবার রমেন দত্তর গলা, হ্যালো—দীপঙ্কর—দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর কিন্তু কোন সাড়া দিল না। নিঃশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

বছর পাঁচেক আগে কারবারটাকে বড় আকারে করবার জন্য দীপঙ্কর ঐ রমেন দত্তকে ১/৩ অংশের পার্টনার করে নিয়েছিল।

আর তার বৎসরখানেকের মধ্যেই তার কারবারে ঘুণ ধরেছে—মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা রমেন দত্ত দেখতো—বিশ্বাস করে তার হাতে দায়িত্বটা তুলে দিয়েছিল—সেকেণ্ড ক্লাশ মাল সাপ্লাই করতে শুরু করল রমেন—যে ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও প্রথম প্রথম জানতে পারেনি দীপঙ্কর, যখন জানতে পারল, তার কোম্পানীর রেপুটেশন অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল—কিন্তু তবু সামাল দিতে পারল না, কেবল লস্ আর লস্—তারপর সেই পাঁচ লক্ষ টাকা বিদেশের সাপ্লাইটা রিজেকটেড্ হলো—কোটেশন মত মাল সাপ্লাই হয়নি—

দীপঙ্কর অগাধ জলে পড়লো—আর ঠিক সেই সময়ই চিমনভাই প্যাটেল এগিয়ে এলো টাকা নিয়ে—এখন বুঝতে পারল চিমনভাই এসেছিল সৌগতেরই পরামর্শে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দূরে থাকলেও সৌগত তার কারবারের সমস্ত খবর রাখত।

ঐ রমেন দত্তও সৌগত রায়ের লোক নয়ত।

রমেন দত্তর সাহায্যেই আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে সৌগত তাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে না ত।

দীপঙ্করের সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে থাকে।

মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়।

অসহ্য যন্ত্রণা—ক্রমশঃ যন্ত্রণাটা বাড়ছে। ইদানীং কিছুদিন ধরে রাত্রে ঘুম আসে না—ঘুমের পিল না খেলে ঘুমই আসে না। শয়নঘরে ঢুকে ড্রয় থেকে শিশিটা বের করল দীপঙ্কর। গোটা দুই পিল নিল—ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে পিল দুটো খেয়ে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ল।

রমেন দত্ত। রমেন দত্ত যেন তার পক্ষে সাপে ছুঁচো গেলার মত হয়েছে। গিলতেও পারছে না—উগড়াতেও পারছে না। অথচ বেশ বুঝতে পারছে ঐ রমেন দত্তই তার সর্বনাশ করে করে আজ এই চরম বিপর্যয়ের মুখে এনে তাকে দাঁড় করিয়েছে।

মীনাক্ষী অনেকবার বলেছিল, কারবারে কোন পার্টনার নিও না।

কিন্তু মীনাক্ষীর কথা সে শোনে নি।

দীপঙ্কর মেয়ে যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনি করেই তার বার্থডে পার্টির আয়োজন করেছিল। সারা ইলঘরটাই ফুলে ফুলে সাজাতে হয়েছে—আর ছোট ছোট মিনি বাল্বের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে—বেণুর বন্ধুরা সেই বিকেল থেকেই এসে জড়ো হয়েছে।

হলের মাঝখানে টেবিল। বিরাট একটা কেক—তার উপর দশটি মোমবাতি—বেণুর আঙ্কল কিন্তু এখনো আসে নি।

রাতও ত প্রায় সোয়া আটটা হ'লে।

দীপঙ্কর বলছিল মেয়েকে,, মামণি তোমার আঙ্কল বোধহয় আর আসবেন না—তুমি কেক কাট।

বেণু রাজী হয়নি। বলেছে, না—আঙ্কল না আসা পর্যন্ত কেক কাটা বে হনা—আঙ্কল আসবে বলেছে, ঠিকই আসবে—

ছুটে ছুটে বাইরে গিয়ে দেখে আসছে বেণু---পোর্টিকোতে।

রাত ঠিক সাড়ে আটটায় সেই চেনা গাড়ির হর্ণ বেজে উঠলো---বেণু ছুটে গেল---ঐ আঙ্কল এসেছে---

কৌতূহলী দীপঙ্করও এগিয়ে যায় পোর্টিকোর সামনে।

মীনাক্ষীও এগিয়ে যায়।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল---দামী স্যুট পরিহিত এক ভদ্রলোক নামল।

বাঁ হাতটা অসহায়ভাবে ঝুলছে--ডান হাতে বিরাট একটা বাক্স।

ছুটে গিয়ে বেণু ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরে, এত দেরি করলে কেন আঙ্কল--

খুব কি দেরি হয়ে গিয়েছে মামণি?

হ্যাঁ---দেরি হয়েছে---এসো।

আঙ্কলকে নিয়ে বেণু এসে হলঘরে ঢুকলো, মামণি---বাপী----এসো, দেখো আঙ্কল এসেছে---

মীনাক্ষী চেয়ে ছিল মানুষটার দিকে।

বাঁ হাতটা অসহায় হয়ে ঝুলছে। একটা চোখ পাথরের স্থির হয়ে আছে। অন্য চোখে দৃষ্টি সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কপালে ডান দিকে ভ্রূ পর্যন্ত লম্বা একটা কাটা দাগ ইঞ্চি দুই হবে।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে চেহারার কিন্তু তবু চিনতে কষ্ট হয় না মীনাক্ষীর সৌগতকে। তাহলে মানুষটা সৌগতই---তার অনুমান মিথ্যা নয়।

এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল দীপঙ্কর। সেও চিনতে পেরেছে সৌগতকে।

দীপঙ্কর এগিয়ে এলো পায়ে পায়ে---

আমার বাপী---বেণু বললে।

গুড্ ইভনিং মিঃ বোস।

ঐ আমার মামণি--মীনাক্ষীকে দেখাল বেণু।

গুড্ ইভনিং---

বাক্সটার মধ্যে ছিল একটা প্রকাণ্ড ডল---বাক্স থেকে খুলে সেটা টেবিলের 'পরে রাখতেই টুংটাং পিয়ানোর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পুতুলটা ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করে দিল।

বেণু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

How sweet you uncle।

॥ চার ॥

হৈ চৈ করে কেক কাটা হলো। বাচ্চারা হৈ চৈ করে গান শুরু করে দিল, হ্যাপি বার্থ-ডে---টু ইউ---সঞ্চিতা।

সঞ্চিতা বেণুর ভাল নাম।

তারপরই বেণু সৌগতের ডান হাতটা ধরে আবদার জানাল, আঙ্কল give us a song.

না, না মামণি, আজ তুমি গাও, সৌগত বললে। ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী আর দীপঙ্কর।

না---তুমি। বেণু বললে, You give us a song.

বেণুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাচ্চারা চেঁচিয়ে উঠলো, আঙ্কল গান---গান শুনবো আমরা তোমার। ঘরের কোণে একটা বিরাট কাউজ পিয়ানো ছিল। সৌগত বললে, তাহলে মামণি তুমি পিয়ানো বাজাও আমি, গান গাই।

আমি তোমার সঙ্গে বাজাতে পারবো না। আমি সবে শিখছি---মামণি, তুমি বাজাও আঙ্কলের সঙ্গে। মীনাক্ষী রীতিমত বিব্রত বোধ করে নিজেকে।

মামণি---বাজাও না তুমি। আঙ্কল গাইবে, বেণু আবার আব্দার জানায় মায়ের সামনে ছুটে এসে তার একটা হাত ধরে, কই চল মামণি।

অগত্যা মীনাক্ষীকে এসে পিয়ানোর সামনে বসতেই হলো।

সৌগত গান ধরলো :---

"কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া নেই মানা মনে মনে
মেলে দিলাম গানের সুরে এই ডানা মনে মনে
তেপান্তরের পাখায় পেরোই রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ কথার---
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে ॥"

সকলেই সৌগতের গলার সঙ্গে গলা মেলায়।

এক সময় গান শেষ হলো। এবারে সব খেতে বসবে---বেণু এসে সৌগতের হাতটা ধরলো, চল আঙ্কল---

কোথায়---

খেতে।

না, মামণি, আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে, সৌগত বললে।

বাঃ, চলে যাবে মানে? চল---

না---সোনা---রাত সাড়ে দশটায় আমার প্লেন----এখুনি না রওনা হলে যে প্লেন ধরতে পারব না।

দীপঙ্করও বললে, কিন্তু সৌগত বিনীত ক্ষমা চেয়ে নিল, তারপর ঘর থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল সৌগত।

অনেক রাত হয়েছে---সেই সাজানো হ'লঘরের মধ্যে একটি সোফায় একাকী বসে ছিল তখনও মীনাক্ষী।

দীপঙ্কর সামনে এসে দাঁড়াল, মীনু---

কে?

উপরে যাবেনা?

মীনাক্ষী স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, তাহলে সত্যিই ও মরে নি।

দীপঙ্কর স্ত্রীর কথার কোন জবাব দিল না।

আমার একটা কথা শুনবে?

কি। তাকাল দীপঙ্কর স্ত্রীর মুখের দিকে।

ওর টাকা শোধ করে দাও সব বিক্রী করে---

তাই দেবো। দীপঙ্কর মৃদু গলায় বললে, আমি কালই চিমনভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবো, সব ব্যবস্থা করবো।

সেই রাত্রে সৌগতের ফ্ল্যাটে অন্য এক নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

সৌগত ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে---

সামনে একটা চেয়ারে বসে রমেন দত্ত। সামনের টেবিলে পড়ে আছে একটা টাইপ করা দলিল।

সৌগত বলছিল, চিমনভাই ত' সবই আপনাকে বলেছেন মিঃ দত্ত। আপনাদের কারবারের মধ্যে আপনার যাবতীয় অংশ আমি কিনে নিতে চাই---

কিন্তু---

আপনি যে টাকা দিয়েছেন ঐ কারবারে সব আপনি ফিরে পাবেন---অবশ্যই।

কিন্তু আমি দীপঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না করে ত' কোন সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাতে পারছি না।

তার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে।

সে সম্মত হয়েছে?

হ্যাঁ---এখন বলুন, আপনাকে কি দিতে হবে আপনার অংশের জন্য।

আমি যদি আমার অংশ বিক্রী করতে না রাজী হই---মানে আমিই যদি দীপঙ্করের অংশটাও কিনে নিই।

মিঃ দত্ত---আমি যখন স্থির করেছি কারবারটা কিনে নেবো ত নেবই---

আমার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও?

হ্যাঁ----আমার ইচ্ছাকেই আপনার মেনে নিতে হবে---

আর তা যদি না নিই মেনে।

আপনাকে আমি এক পাটি ছেঁড়া জুতোর মত রাস্তায় টেনে ফেলে দেবো---তারপর---

তারপর----

কোর্টে টেনে নিয়ে যাবো---আপনার সব কুকীর্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই আমার হাতে আছে।

ভয় দেখাচ্ছেন?

ভয় না---আপনাকে আমি যা করবো তাই বলছি মাত্র, বাঁচতে চান ত' ঐ টেবিলের 'পরে দলিলটায় সই করে দিন---আপনাকে যদিও একটি কপর্দকও আমার দেওয়া উচিত ছিল না--তবু কিছু দেবো---

কত দেবেন?

পঞ্চাশ হাজার টাকা।

মাত্র?

হ্যাঁ----দশ বছর ধরে জেলের ঘানি টানার চাইতে সেটাই কি আপনার পক্ষে কাম্য নয়?

কি যেন ভাবল রমেন দত্ত। তারপর বললে,

ঠিক আছে, দিন টাকা---সই করে দিচ্ছি---

আগে সই---তারপর টাকা---

শেষ পর্যন্ত রমেন দত্ত সই করে দিল---আর সৌগত হাজার টাকার নোটের পাঁচটা বাণ্ডিল ফেলে দিল রমেন দত্তর সামনে।

Now you get out; কারখানার ত্রিসীমানায়ও যেন আর আপনাকে কেউ না দেখতে পায়।

রমেন দত্ত চলে গেল।

ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বললে সৌগত, স্কাউনড্রেল---

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে।

সৌগত আবার ফিরে যাবে---আগামী কাল রাত্রের প্লেনে---দীপঙ্করের বাড়িতে ফোন করে দিল মীনাক্ষীকে, বেণুকে একবার তার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য এবং বেণুর জন্যই অপেক্ষা করছিল সৌগত।

মীনাক্ষী একা এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন---আসুন মিসেস বোস---কই আমার মামণি কই---তাকে আনেন নি?

না।

কিন্তু আমি যে আপনাকে request করেছিলাম----একটিবার তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য---কালকের প্লেনেই আমি চলে যাচ্ছি---

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল সৌগত।

ভুল করছেন আপনি। আমি---

ভুল আমি করিনি। আর মীনাক্ষী যে ভুল করবে না তা তুমি ভাল করেই জান সৌগত।

একটা কথার জবাব দেবে?

বলুন।

আমাদের হঠাৎ এভাবে দয়া দেখাচ্ছ কেন?

দয়া!

নয়! ভেবে দেখ, তুমি যা করেছো সেটা আমাদের প্রতি দয়া দেখানো ছাড়া আর কি হতে পারে।

তুমি ভাবলে কি করে যে তোমার দয়ার দান আমরা হাত পেতে নেবো।

না মিসেস বোস, দয়া আমি দেখাইনি।

দেখাও নি, তবে এই দলিলটার অর্থ কি? বলতে বলতে একটা টাইপ করা স্ট্যাম্প কাগজের দলিল মীনাক্ষী তার হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে বের করে সৌগতের সামনের টেবিলে রাখল, বলল, এটা দয়া ছাড়া আর কি হতে পারে---আমার স্বামীর সমস্ত কারবারের লায়াবিলিটিজ শোধ করে রমেন দত্তকেও বিজনেস থেকে বিতাড়িত করে---

হ্যাঁ, রমেন দত্তকে তাড়িয়েছি, কারণ দীপঙ্কর জানে না---তার শনি হয়েই কারবারে ঢুকেছিল রমেন দত্ত, কারবারকে বর্তমান দুর্দৈবের মধ্যে সেই টেনে এনেছিল---যাতে করে বেনামে সমস্ত কারবারটা সে গ্রাস করতে পারে---ব্যাপারটা আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি---কিন্তু বোঝবার পর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

কেন?

আজ আর অস্বীকার করবো না---আমি মাস কয়েক আগে এখানে এসেছিলাম---দীপঙ্করকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্য---কিন্তু হঠাৎ কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার মামণির সঙ্গে দৈবক্রমে দু'মাস আগে বটানিকসের একটা পার্টিতে পরিচয় হবার পর---

বেণু---

হ্যাঁ আমার মামণি, আপনার নিশ্চয়ই আর মনে থাকবার কথাও নয়---কিন্তু পনের বছর আগে মীনাক্ষী নামে যে মেয়েটি আমাকে জানত---তাকে আমি অনেক দিন একটা গল্প করেছি।

গল্প?

হ্যাঁ---সৌগতর মা সৌগতকে তার ছোট বেলায় রথের মেলা থেকে একটা ছোট্ট বাচ্চা চন্দনা পাখী কিনে দিয়েছিলেন। পাখীটা ক্রমে সৌগতের হয়ে উঠেছিল প্রাণ---চমৎকার শিস দিত---সৌগতের ডাকনাম 'পল্টু' বলে ডাকত। তারপর হঠাৎ কি হলো একদিন জানেন? পাখীটা কেমন করে যেন একটা বিড়ালের হাতে প্রাণ দিল। পাখীটা মরে গেল বটে কিন্তু সৌগত তাকে ভুলতে পারল না---ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতো পাখীটা যেন তার ঘরের জানালায় এসে বসেছে আর ডাকছে---পল্টু---পল্টু, অনেক বছর পরে সেই স্বপ্ন যেন সত্যি হয়ে উঠলো আপনার আমার মামণির মধ্যে---তাই আমি যা করেছি আমার সেই ছোট্ট চন্দনা পাখিটাকে একটা শয়তান বেড়ালের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই করেছি---

মীনাক্ষীর মুখে কোন কথা সরে না।

মিসেস বোস, সৌগত আবার বলল, দয়া কাউকে দেখাবার মত কোন মহৎ ব্যক্তি আমি নই---আমি যা করছি সে আমার চন্দনার জন্যই ---দয়া বলে ওটা ভুল করবেন না---নিন ওটা তুলে---

মীনাক্ষী নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দলিলটা আবার তুলে নিল।

আমার এ সংসারে আজ আর কেউ নেই ---আমার চন্দনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না।

সৌগত---

সৌগত অনেকদিন আগে মরে গেছে---আজ যা দেখছেন সেটা তার প্রেত মাত্র। তুমি চাও বেণুকে।

না, না---আমার নিঃশ্বাসে অভিশাপ আছে ---আমার শুধু একটা প্রার্থনা---তুমি যদি---বল।

---বছরে একবার করে এক মাসের জন্য যদি আমার মামণিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ---আমিই টিকিট পাঠাবো---নেবার ও ফিরে আসবার সব ব্যবস্থা করবো---দেবে ঐ ভিক্ষাটা!

তোমার চন্দনাকে তোমার কাছে এক মাসের জন্য নিতে চাও---নিশ্চয়ই সে যাবে।

সত্যি বলছো?

সত্যিই বলছি। একটা কথা তুমি জান না, পনের বছর আগে সেই ঝড়জলের রাত্রে যা ঘটে গিয়েছিল বিশ্বাস করো তার মধ্যে আমার কোনো হাত ছিল না, ঘুণাক্ষরেও কিছু আমি জানতাম না।

সৌগতের একটা মাত্র চোখের দৃষ্টি মীনাক্ষীর মুখের 'পরে স্থির আছে তখন।

তুমি ভেবেছিলে---

অতীত যা তা অতীতের অন্ধকারেই চাপা থাক। আমার আজ আর তোমার 'পরে কোন ক্ষোভ নেই মীনাক্ষী।

তোমার প্লেন কখন---আজই কি যাচ্ছো?

হ্যাঁ, রাত সাড়ে দশটায়। এরপর আমি রওনা হবো---সৌগত বললে।

আর এ দেশে আসবে না?

না। তোমাদের জীবনের মধ্যে কোন অশুভ ছায়া পড়ুক আমি চাই না।

তুমি যাও---আমি বাড়িতে গিয়েই বেণুকে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি---আমি তাহলে আসি---

এসো।

মীনাক্ষী নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছাদের উপর অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল মীনাক্ষী, সে এসেই গাড়িতে করে বেণুকে এয়ার পোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নিঃশব্দে দীপঙ্কর এসে স্ত্রীর পাশটিতে দাঁড়াল।

দীপঙ্কর মৃদুকণ্ঠে বললে, একটু পরেই এখান দিয়ে আকাশপথে সৌগতের প্লেনটা উড়ে যাবে।

মীনাক্ষী স্বামীর কথার কোন জবাব দিল না।

সে চেয়ে থাকল রাতের অন্ধকার আকাশের দিকে।

একটা ক্ষীণ গর্জন দূর থেকে ভেসে আসছে।

ক্রমে শব্দটা স্পষ্ট হয়---

তারপরই দেখা গেল লাল নীল আলো জ্বলছে---নিভছে---দূর আকাশে।

বি ও এ সি'র জেট প্লেনটা চলে গেল লণ্ডনের পথে।

সৌগতের কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো না মীনাক্ষী, দীপঙ্কর বলল।

মীনাক্ষীর দিক থেকে কোন সাড়া এলো না।

শব্দ মিলিয়ে গিয়েছে, প্লেনের লাল নীল আলোও অন্ধকারে মিশে গেছে।

মীনাক্ষী তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

বেণুর হাত দিয়ে সৌগত একটা চিঠি পাঠিয়েছিল---এয়ার পোর্ট থেকে ফিরে সেটা দীপঙ্করের হাতে দিল বেণু।

কি মামণি---

আঙ্কল এ চিঠিটা তোমাকে দিয়েছে---

চিঠিটা খুললে দীপঙ্কর।

সামান্য দুটি কথা লেখা চিঠিতে,

দীপঙ্কর, মীনাক্ষী---

তোমাদের হাতে যখন এই চিঠি পৌঁছবে আমি তখন বেরুটের পথে---আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রেখে গেলাম তোমাদের জন্য।

তোমরা সুখে থাক।

সৌগত॥

ভ্রমণ কাহিনী

অডিকোলন থেকে রূপকথা

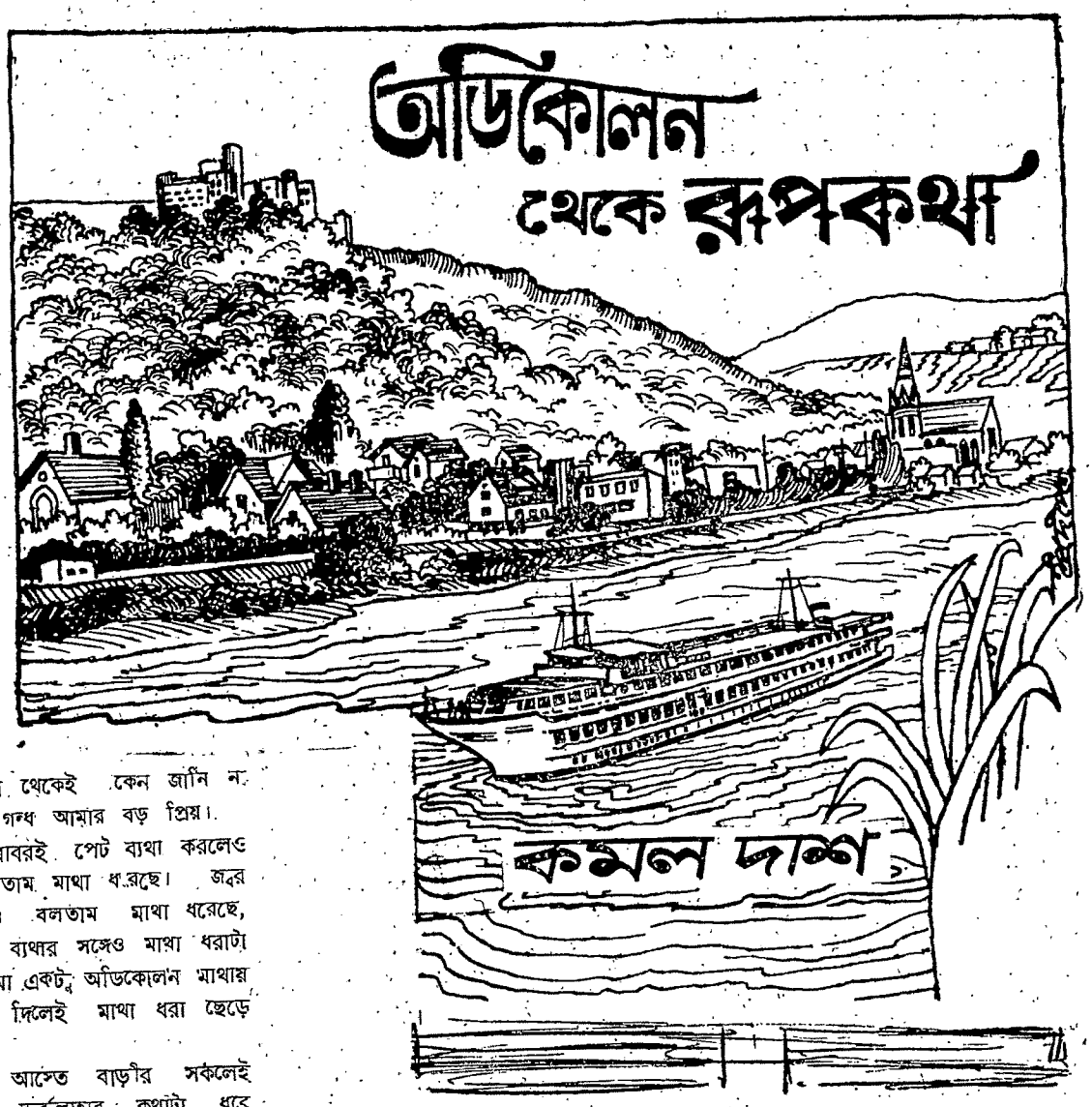

কমল দাশ

ছোটবেলা থেকেই কেন জানি না অডিকোলনের গন্ধ আমার বড় প্রিয়।

তাই বরাবরই পেট ব্যথা করলেও তার সঙ্গে বলতাম মাথা ধরছে। জ্বর জ্বর করলেও বলতাম মাথা ধরেছে, এমন কি গা ব্যথার সঙ্গেও মাথা ধরাটা জুড়ে যেত। মা একটু অডিকোলন মাথায় মুখে বুলিয়ে দিলেই মাথা ধরা ছেড়ে যেত।

আস্তে আস্তে বাড়ীর সকলেই আমার এই দুর্বলতার কথাটা ধরে ফেলেছিল, তাই মাথা ধরার অজুহাত আর দিতে হাত না—এমনিতেই মাথায়, মুখে, বিছানায় বেশ কয়েক ছিটে অডিকোলন ছড়িয়ে দিত।

যাই হোক, বড় হয়ে অডিকোলনের একটা শিশি আমার সব সময়ের সঙ্গী হয়ে আছে।

এত যার ভক্ত, সেই জিনিষের উৎপত্তি কোথায় তা আগে থেকেই বই পড়ে জেনে নিয়েছিলাম। তাই লণ্ডন থেকে যেদিন আমরা "কোলনের" দিকে রওনা হলাম, কি যে ভাল লাগছিল।

রাইনল্যাণ্ড, মানে জারমানীর চতুর্থ বড় সহর হচ্ছে এইটা। বার্লিন, হ্যামবার্গ ও মিউনিখের পরেই এর স্থান।

আঠার শতকে অডিকোলন এই সহরেই প্রথমে বানান হয়। সেই থেকেই এর নাম হয় কোলন। জারমানীতে বলে Koln, এই সহরের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে। রোমানরা ফ্রান্স পর্যন্ত যত সহজে জয় করতে পেরেছিল, রাইনল্যাণ্ডকে তত সহজে পারেনি। এখানকার ট্রাইবরা বড় দুর্ধর্ষ ছিল। তাই রোমানদের রাজত্ব-কালে দক্ষিণ ফ্রান্সকে ওরা বলত প্রভিন্স। কিন্তু রাইনল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে না পারায় পঞ্চাশ এ ডি তে সম্রাজ্ঞী আগ্রিপিনা এই সহরকে দিয়ে দিলেন সিটি চারটার, অর্থাৎ নগরের সম্পদ।

দিল্লীর এক বন্ধু কাজের খাতিরে কয়েক বৎসর কোলনে কাটিয়েছিলেন। ওখানে একটা জারমান পরিবারের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তাদের একটা চিঠি নিয়ে আমাদের হাতে দিয়েছিলেন, লণ্ডন থেকে যাবার আগে যেন সেটা আমরা সময়ে পোষ্ট করে দিই।

তাই ট্রেন থেকে নেমেই সেই জারমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে ফোন করা হলো। মেয়ে ফোন ধরল। "তোমাদের চিঠি সময় মত পেয়েছি আর আমাদের বন্ধুর চিঠি তার সঙ্গে। সব ঠিক করে রেখেছি। সোজা আমাদের বাড়ীতে চলে এসো, আমরা তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।"

ব্যাস, আর চাই কি। মেয়েটার নির্দেশ মত তিন মূর্তি তো গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়ীতে। বাবা, মা ও মেয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

বাবা, মা ইংরেজী বলতে পারে না। তবে কিছু কিছু বুঝতে পারে। মেয়ে

ইংরেজী জানে। ওখানে আজকাল ইংরেজী কম্পালসারী করে দিয়েছে। আগে ছিল না। সবই আমেরিকানদের কল্যাণে।

বুড়ো-বুড়ীর বাড়ী। তাদের একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ে, জামাই ও নাতনী ওখানেই থাকে। জামাই ইঞ্জিনীয়ার।

ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। মেয়েটা সব দিকে লক্ষ্মী। বাড়ীর সব ওই চালায়। তাই ওর মাকে বললাম, "তুমি ভাগ্যবতী"। স্বাভাবিক, শুনে মা খুব খুশী।

আমাদের মেয়েকে ওদের বাড়ীতেই রেখে দিল। আমাদের দুজনের জন্য কাছেই একটা হোটেলে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বেড ও ব্রেকফাস্টের। রাতে ওখানে খেয়ে আমরা দুজনে চলে এলাম হোটেলে।

সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই মেয়ে ওখান থেকে খেয়ে চলে এলো।

ওরা কত বন্ধুবৎসল, জানেন? বলেছিল, "তোমরা আমাদের বন্ধুর বন্ধু। তোমাদের তো আমাদের কাছেই রাখা উচিত ছিল। জায়গার অভাবে যে পারলাম না তার জন্য খুব খারাপ লাগছে। তবে রাতে রোজ কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে খাবে। তাছাড়া, তোমাদের মেয়ে তো আমাদের কাছে থাকবে।"

ইংরেজদের মধ্যে এমনটা কখনও পাওয়া যায় না।

ওখানে তো দেখলাম নিজের মেয়ে জামাই বা ছেলে বৌ এলে কাছাকাছি কোন হোটেলে বন্দোবস্ত করে দেয়। অবশ্য খেতে নেমন্তন্ন করে। দুটি শোবার ঘর থাকলেও নয়। কারণ একটা কর্তার, একটা গিন্নির। অবশ্য তৃতীয়টা থাকলে স্বতন্ত্র।

বিলেতের এই সব ধরন-ধারণ দেখে একেবারে চমকে গিয়েছিলাম।

দিল্লীতে মনে পড়ে, অতিথির অভাব ছিল না। এক এক সময় এমন অবস্থা হোত যে, তিনটি শোবার ঘর থাকা সত্ত্বেও বসবার ঘর, খাবার ঘর সবই সাময়িকভাবে রাতে শোবার ঘরে পরিণত হোত।

সকালের খাওয়া শেষ করে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। গত মহাযুদ্ধে এই সহর বলতে গেলে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। তবে পুরোন ইতিহাসের চিহ্ন একেবারে মুছে দিতে পারেনি।

দেখলাম তৃতীয় শতাব্দীর রোমান টাওয়ার আর সেই যুগের মোজেইক কাজ করা মেঝে। এই কারুকার্যের নাম ডাইওমিসাস মোজেইক। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন বোমার হাত থেকে রাঁচবার জন্য শেল্টার তৈরীর জন্য চারিদিকে খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছিল সেই সময় এই অতি মূল্যবান জিনিষটা বেরিয়ে আসে।

অমঙ্গলের ভেতর থেকেও যে অনেক সময় মঙ্গলের আভাস পাওয়া যায় এটা বোধহয় তার একটা দৃষ্টান্ত।

বিশেষ অবাক হয়ে দেখছিলাম অতি আগের যুগের সভ্য মানুষরা কত কিছু বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। এর কারুকার্য দেখলে অবাক হতে হয়।

তাছাড়া মাটির নিচে তখনকার লাটসাহেবের বাড়ীর কিছু অংশ অক্ষুণ্ণ-ভাবে রয়েছে।

মধ্যযুগের ক্যাথিড্রাল সত্যিই অপরূপ। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে এটা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই গথিক চার্চটা পৃথিবী বিখ্যাত। এর দুটি মিনার হচ্ছে পাঁচশ' পনের ফুট উঁচু। এর সূক্ষ্ম কারুকার্যের যেন কোন তুলনা নেই।

তাকিয়ে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের পৃথিবী বিখ্যাত তাজ-মহলের কথা। মানুষ যদি এই রকম স্বর্গীয় সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে তবে সে দেবতা থেকে আর কত দূরে?

তাই তো আমাদের সাধুরা বলেছেন, ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই অংশ থেকে। তাই বারে বারেই ঋষিরা মনে করিয়ে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, "সোঽহং"—"তুমিই আমি আমিই তুমি"।

আরও কিছু পুরাকালের মানে রোমান রাজত্বের সময়কার জিনিষ বোমা শেষ করতে পারেনি। যেমন সম্রাট অটোর ভাইসেন্ট বুণোর কবরস্থান সেন্ট পেন্টানিয়ন গীর্জা, সম্রাট দ্বিতীয় অটোর মা বাইজানটাইন রাজকুমারী থিওফানোর

নাচতে গাইতে ফুর্তি করতে

সোনার ঘর। তার মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিষ আছে।

এতে একটা হাতির দাঁতের বাক্সে খোদাই করা দৃশ্য আছে যে একজন নাইট অর্থাৎ সামন্ত তার বান্ধবীর সঙ্গে দাবা খেলছে।

সব যুগেই মানুষ শত দুঃখের মধ্যেও আনন্দ করতে চায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও চায় সব ভুলে থাকতে। তাই সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে—"স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা"—রূঢ় বাস্তব থেকে একটু সময়ের জন্য সে চায় ছুটি। তাই তো সংসারে সে পাগল না হয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

সেই জন্যই রোমানদের রাজত্বকালে বড় দার্শনিক বলেছিলেন, লোকেদের পেট ভরে খেতে দাও আর দাও বিনা পয়সায় আনন্দ করবার ব্যবস্থা।

দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে সেই কথাটাই বারে বারে মনে হয়েছে।

কোলনে দেখলাম পনের শতকের বিনোদন কেন্দ্র গুরজেনিক। এই জায়গা বানানো হয়েছিল নাচ, গান, আনন্দ করবার জন্য। মধ্যযুগে সকলে এসে এখানে নাচত, গাইত, আনন্দ করত।

এখানকার সব চাইতে আনন্দের সময় হচ্ছে কারনিভ্যালের সময়। সেই সময় বয়স নির্বিশেষে সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে।

পাঁচশ' বৎসর আগে মানুষ যে রকম সব কিছু ভুলে এই সময় আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিত, সেই রকম এখনো কারনিভ্যালের সময় কবির ভাষায় সেই দেশে "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"র অবস্থা দাঁড়ায়।

বড় ছোট সব নাচঘরে তখন আনন্দের ফোয়ারা ছোটে ঠিক যেমন পাঁচশ' বৎসর আগে এই সময়টাতে হোত।

নাচঘরে যাদের জায়গা না হয় তারা আসে গুরজেনিকে নাচতে, গাইতে, স্ফূর্তি করতে।

কোলন সহরে ঘুরতে ঘুরতে কখনও মন চলে যাচ্ছিল অতীতে, কখনও বর্তমানে। তখনই মনে হয় আত্মা শরীরের কত ঊর্ধ্বে। আত্মা অবিনশ্বর, শরীর নশ্বর। সেই আত্মারই নিকটতম সহচরী হচ্ছে মন। তাই তো শরীরটাকে বর্তমানে ফেলে রেখে মন যুগ যুগ পিছে চলে যায়।

আবার যে মনের শক্তি আছে সে যুগ যুগ পরের ঘটনাও দেখতে পায়। আমরা সাধারণ লোক অতীতে যেমন ফিরে যেতে পারি, ভবিষ্যৎ কি দেখতে পাই?

মনে পড়ল ফ্রান্সের রাজা হেনরী দি ফোর্থের নির্বাসিতা অভিশপ্ত রাণী মারিয়াদি মেডিচির এইখানে মৃত্যু হয়। তবে এটা ঠিক, অন্য অনেক রাণীর চাইতে এঁর ভাগ্য মন্দের ভাল ছিল। মাথাটা ঘাড়ের উপর রেখেই চলে আসতে পেরেছিলেন। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীর রাণীদের বেশীর ভাগের ভাগ্যে তাও সম্ভব হয়নি।

সত্যিই মনে হয় রাজা-রাণীর যুগটা চলে গিয়ে বোধহয় শুধু সাধারণ লোকেদের জন্য কেন, রাজা-রাণীদেরও ভাল হয়েছে। কখন যে কার কি হবে ঠিক থাকত না।

এই সহরের প্রায় অর্ধেকটাই বোমায় শেষ হয়ে গিয়েছিল গত মহাযুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্য এই এক জারমান জাত। ভাঙলেও মচকায় না। আবার খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই সহরই দেখুন না Typography ও Photography-তে ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। শুধু কি তাই? টেক্সটাইল ও ফ্যাসান সৃষ্টিতে এদের খুব নাম।

এদের নূতন সহর দেখলে সত্যিই চোখ ঝলসে যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে মনে হয় পরীর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পলকে সব বিরাট বিরাট আকাশ ছোঁয়া বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে।

এখানকার দি গারলিং স্কাইস্ক্যাপার, আলট্রা মডার্ণ অপেরা হাউস, চেম্বার অব কমার্স বিল্ডিং, সবই অপূর্ব, অভিনব।

এখানকার ওয়ালরাফ রিচার্টজ মিউজিয়াম সত্যি দেখবার জিনিষ। এমনি আমাদের কপাল ভাল যে সেই মিউজিয়ামে চেনা হয়ে গেল এক জারমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এত সুন্দর করে পুরোন ডাচ ও ফ্লেমিশ পেইনটিংস এবং জারমান পেইনটিংসগুলোর বিষয় বলছিলেন যে ইচ্ছা করছিল দিনের পর দিন শুধু ওঁর কাছ থেকে সব শুনি। এর চাইতে আনন্দ বোধহয় আর কোন কিছু দিতে পারে না।

পরে জানলাম উনি ওখানকার একজন আর্ট স্টুডেণ্ট। আমার আগ্রহ ও তন্ময়তা দেখে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি আর্টিষ্ট? তুমি কি আঁক?"

বাংলা সাহিত্যে নারীবর্ষের আবিষ্কার

কমল দাশের

জানা অজানা ৯

পশ্চিম পৃথিবীর নরনারীর অন্তরঙ্গ কাহিনী। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের পার্টি থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রাম্য বাউলের মেলা পর্যন্ত যে রসসিক্ত মানব মনের লীলা তারই অজানা কাহিনী।

"বিস্ময় জাগে এ কথা ভেবে যে এমন পাকা হাত নিয়ে এত শক্তিমতী একজন লেখিকা কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতদিন?" —প্রেমেন্দ্র মিত্র

"বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি বাংলা সাহিত্যে একটি দুর্লভ নাম **কমল দাশ।**"

—অন্নদাশঙ্কর রায়

শঙ্খ প্রকাশন

৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৯

বলেছিলাম, "ঠিক উল্টো, সোজা করে—একটা লাইনও বোধহয় টানতে পারব না।"

"তুমি তো হিন্দু, তাই না?"

"অবশ্য।"

ঝলমলে সহরের ভেতর দিয়ে

"তবে তো জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস কর?"

"শুধু বিশ্বাস বললে কম বলা হবে, মনেপ্রাণে উপলব্ধি করি।"

"তবে বলব—গত জন্মে তুমি নামী আর্টিস্ট ছিলে। যে কারণেই হোক এ জন্মে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তবে মনটা রয়ে গেছে। পরজন্মে হবে।"

ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি বিশ্বাস কর?"

"আমরা বৈজ্ঞানিকের জাত, আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু এত চেষ্টার পরও অনেক কিছুর উত্তর এখনও আমরা পাইনি। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। তবে কি জান? নানা দিকের টানাপোড়নে ঠিক তোমার মত শক্তভাবে ধরতে পারি না।"

ওর কাছেই জানলাম, পিটার পল রুবেন্সের কৈশোর এখানেই কেটেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর শরীর চলে না। আস্তে আস্তে ঝলমলে সহরের ভেতর দিয়ে ওদের মানে রাস্তার সকলের সঙ্গে চলে চলে গিয়ে ঢুকলাম একটা মাঝারী মত রেস্টুরেন্টে রাতের খাবারের জন্য।

এখানে দেখলাম, যেমন এরা খাটতে পারে, তেমনি খেতে পারে, তেমনি আনন্দ করতে পারে।

এদের কাজের মেয়াদ হচ্ছে বার ঘণ্টা। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। সময় ওদের আলাদা আলাদা। কোন অফিস সাতটায় আরম্ভ হচ্ছে, কোনটা সাড়ে সাতটায়। এই জন্য রাস্তায় ভিড়ের চাপ কম। লোকেদেরও উঠতে-নামতে কষ্ট নেই। বেশ লাগল।

কলকাতাতেও এরকম 'স্টেগারিং আওয়ারস' হলে মানুষের কষ্ট বোধ হয় অনেক কমে। দিল্লীতে অবশ্য কিছুটা করেছে।

পরের দিন ভোরবেলা উঠে আগেই ঠিক করেছিলাম এদের বাগান, পার্ক আর এগ্‌জিবিসন গ্রাউণ্ড দেখতে যাব। সহরের মধ্যে কাঠ, পাথর, সুরকি ইত্যাদির ব্যবহার, মানে বিশাল বিশাল বাড়ী ত অনেক দেখলাম।

এখন যাব চোখ জুড়োতে সবুজের সন্ধানে।

প্রথমেই গেলাম এগ্‌জিবিসন গ্রাউন্ড দেখতে। সেইখানে দেখলাম এক বিরাট অডিটোরিয়াম। চার হাজার লোক এক সঙ্গে বসতে পারে। তা ছাড়াও আরও তিনটি ছোট ছোট অডিটোরিয়াম আছে যেমন, বারশ' নয়শ', চারশ' এত সংখ্যক লোক বসতে পারে।

তাছাড়া সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং রয়েছে। বেশ অনেক ক'টা অতি সুন্দরভাবে তৈরী। সাময়িকভাবে তৈরী করা যেমন তেমনভাবে—সে ধরনটা ওদের নেই। তাতে অযথা পয়সা নষ্ট ও পরিশ্রম নষ্ট হয়। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে—দু'দিন পরে ভেঙ্গে ফেলা হবে বলে স্বভাবতই ভালভাবে তৈরী হয় না।

এই ধরনটা কলকাতাতে অহরহ হচ্ছে। সহর থেকে দূরে অনেকখানি জমিতে সত্যি সত্যি এইভাবে এগ্‌জিবিসন গ্রাউন্ড তৈরী যদি করা হয়, কত ভাল হয় না?

এগ্‌জিবিসন গ্রাউন্ডের কাছেই হচ্ছে রাইন পার্ক। এ এত বড় যে তার ভেতরে ঘুরে বেড়াবার জন্য পুতুলের রেলের গাড়ীর মত রেলগাড়ী আছে। তাতে চড়ে তুমি সারা পার্ক দেখে নিতে পার। তার কিছু দূরেই হরিণদের পার্ক। মানে সেখানে শুধু হরিণ আর হরিণ। মনে হয় যেন সেটা ওদেরই রাজত্ব।

কে এলো, কে গেলো ওরা বড় একটা ভ্রুক্ষেপও করে না। যেমন আমাদের দেশে কত দেশের লোক আসে যায়: সাধারণ মানুষ তা চেয়ে দেখেও না।

তবে সরকার চার চোখ দিয়ে রয়েছে। হতে পারে হরিণদের মধ্যেও সেই রকম কোন সিষ্টেম রয়েছে। যাদের নজর রাখার কথা তারা ঠিকই বোধ হয় নজর রাখে।

কেন আমাদের এই কথাটা ষ্ট্রাইক করল জানেন? আমরা ঢোকার পর থেকেই দুটা তিনটা বয়স্ক হরিণ বিরাট বিরাট শিং নিয়ে, একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল যতক্ষণ না বেরিয়ে এলাম।

একে বললাম, "মনে হয় এরাই নজর রাখার ডিপার্টমেন্টের হেড।"

উনি বল্লেন, "বয়ে গেছে হেডদের

আমাদের মতন চুনো পুঁটিদের দিকে নজর রাখতে। তারা নজর রাখবে সাত আট ফুট লম্বা আমেরিকান বা আফ্রিকানদের ওপর। এরা ঐ লাইনেরই, তবে চুনো পুঁটির দল।"

বেরিয়ে এসে এই নিয়ে খুব একচোট হাসা হোল।

সন্ধ্যার দিকে সহরের মাঝখানে দোকানে দোকানে ঘুরে একটা জিনিষ দেখলাম যা ইউরোপের আর কোন দেশে বোধ হয় দেখিনি। খেলনা, কত রকমের, কত ভাবের, কত ধরনের। আমার ভাষায় তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।

শুধু মনে হচ্ছিল, ছোটবেলায় যদি বাপ-মার সংগে আসতাম তবে নিশ্চয়ই শুধু এই চাইতাম।

মেয়েকে বল্লাম, "কিরে মেয়ে, নিবি নাকি কিছু?"

"কি যে বল, তুমি মনে মনে কিন্তু বেশ ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।"

"বোধ হয় তাই। তোরা অন্য দোকান-গুলো ঘুরে আয়। আমি শুধু এই দেখি।" তারপর বল্লাম, "আমার মনে কি হচ্ছে জানিস? আবার জন্মালে যেন আমি সব সময় ছোট থাকি। আর ততদিনে আমাদের দেশেও এই রকম সব খেলনা বানান হবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রোজ সকাল-সন্ধ্যা তাই দেখব।"

সে বল্লো, "তোমার ছেলেমানুষী আর যাবে না। এখন চল পা চালিয়ে। জিনিষপত্র নিয়ে ডুসেলডর্ফের দিকে রওনা হতে হবে। কোলোনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।"

তাই তো তাড়াহুড়ো করে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে জিনিষ নিয়ে আমাদের বন্ধুর বন্ধুদের সংগে বিদায় নিয়ে রওনা হতে হবে।

সময় যে আর নেই।

॥ দুই॥

কোলন থেকে সন্ধ্যেবেলা বের হবার সময় সত্যিই এক মজার ব্যাপার হোল। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে মজার, তখন কিন্তু মোটেই তা মনে হয় নি।

কখনও যা করা হয় নি ঠিক তাই করা হয়েছে। মানে, কোচের টিকিট কেনা হয় নি। ব্যাস, বোঝ ঠেলা।

এদিকে বিদায়ের পালা শেষ করে নেওয়া হয়েছে সকলের সঙ্গে। কোন্ মুখে এখন আবার ফিরে যাই?

ঠিক আছে; হিসেব কষে চলার পথে যখন কাঁটা পড়ল, তখন ঃ

"ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভোল
পথ ভোল, পথ ভুলে মর ফিরে
ওরে সাবধানী পথিক"।

আমাদের সেই অবস্থা। চোখ, কান বুজে যে কোচটাতে জায়গা আছে তাতে উঠে পড়লাম। কোথায় যাবে ও কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করাতে কন্ডাক্টার মনে হোল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বল্ল, "বন"।

"তার টিকিট দাও।"

দুটি সিট একসংগে। মেয়ে সব সময় ধারের সিটে বসতে ভালবাসে। তাই তাকে ধারের সিটে বসিয়ে ওর বাবা ওর পাশে বসল।

ঠিক তার পেছনেতেই আমার সিট পড়েছিল। ধারে বসেছিলেন একটা জার-মান মহিলা বা মেয়ে যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

ওসব দেশে মহিলা বলাটা কেউ একটা খুব পছন্দ করে না। পুরুষদের বেলাতেও তাই।

ওরা মনে যেমন কচি থাকতে চায়, বাইরের ঠাটে-ঠমকেও সেই ভাবেই চলতে চায়।

ওদেশ যে যৌবনের দেশ, বৃদ্ধের স্থানের অভাব। তাই সবাই ঠেলাঠেলি করে সে রকম অবস্থাতেই থাকবার চেষ্টা করে।

এই ভাবটা একদিক দিয়ে আমার যেমন ভাল লেগেছে, আবার মনে হয়েছে—সৃষ্টির নিয়ম কি মানুষ পুরোপুরি পাল্টাতে পারবে বা পাল্টালে ভাল হবে?

তবে মনে হয় মন যদি সজীব থাকে তবেই সে সবুজ। দেহাতীত যে মন তাই বোধ হয় আস্তে আস্তে এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধানের দাঁড়ি টানবে ভবিষ্যতে।

বসে বসে ভাবছিলাম "বন।" আচ্ছা বন নামটা কেন হোল? বিথোভেন, পৃথিবী বিখ্যাত সংগীতবিদ্ সত্তেরশ' সত্তরে ওখানে জন্মেছিলেন। সেই জন্য কি তাঁর নামের সংগে মিলিয়ে সহরের নাম "বন" রাখা হয়েছিল?

যেন আমি সব সময়ই ছোট্ট থাকি

ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হাসি পেল। বিথোভেনের-ত' জন্ম সেদিন, আর বনের জন্ম ইতিহাসের পাতায় দু'হাজার বছর আগে। যখন তার নাম ছিল কাসট্রা বনেনসিয়া। কোলনের বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান শাসক অর্থাৎ প্রিন্স ইলেকটররা এই সহরে বাস করতে আরম্ভ করেন ও একে এইদিকের রাজধানীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন।

সে অনেককালের কথা। তের শতকের কথা। তারপরে কত বৎসর কেটে গেছে। পৃথিবী পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছে।

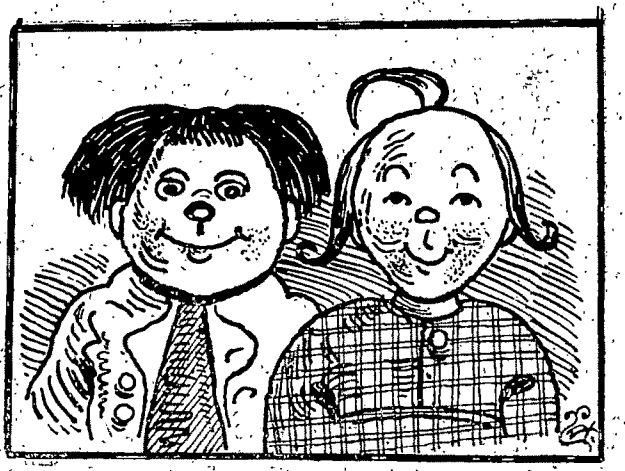

যত্তো সব আদিখ্যেতা

বন সহর তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই বিখ্যাত ছিল। কেউ কি কোন দিন ভাবতে পেরেছিল "বন" হবে ওয়েষ্ট জারমানীর রাজধানী?

আজ চলেছি সেই সহরে যেখানে পৃথিবী বিখ্যাত বিথোভেন জন্মেছিলেন। আমাদের যেমন তানসেনের কথা মনে হলে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে, ওদের কাছেও বিথোভেন তাই। কত দুঃখের মধ্যে উনি জন্মেছিলেন। ওঁর বাবা গরীব তো ছিলেনই, আর ছিলেন মাতাল। উনি জন্মে-ছিলেন প্রতিভা নিয়ে যাকে বলে প্রডিজি। এই সুযোগ নিয়ে ওঁর বাবা ওঁকে দিয়ে বাজিয়ে বাজিয়ে খুব টাকা রোজগার কর-তেন আর বাচ্ছাটার স্বাস্থ্যের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। উনি অল্প বয়সে মারা যান।

ইংল্যান্ড ও জারমানীতে যখনি ঘুরেছি নিজে থেকেই চট্ করে কখনও কথা বলতে আরম্ভ করিনি। ওদের এই দুই জাতের মধ্যে কতকগুলো ব্যবহারে বেশ মিল আছে। সহজে কারও সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে না। তবে যদি চান সে ভাব হয় তবে মাঝে মধ্যে দেখেছি বেশ জমেও যায়।

গিয়েছি এই স্বনামধন্য লোকের বাড়ীটা দেখতে যার এই চিন্তাটাও যেমন মনের মধ্যে হচ্ছিল আবার আর একদিকে বেশ একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

বন এক্সপেন্সিভ জায়গা। একটা রাত কাটাতে গেলেই তো টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ। দেখবার ওখানে বিশেষ কিছু নেই। ছোট্ট সহর। ঝপ করে তো পৌঁছে যাব।

যখন এই সব ভাবছি, হঠাৎ পাশের মেয়েটা সময় জিজ্ঞাসা করল। ইংরেজীতে অবশ্য। ওর ঘড়িটা আমার ভাগ্যের জোরে বন্ধ হয়ে গেছে। একেই বলে জোর কপাল। না হলে বোধ হয় কথাই হোত না।

সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি আগ বাড়িয়ে সময়টা বললাম আর বললাম, "আমরা ভারত মানে ইণ্ডিয়া থেকে আসছি। বন-এ যাচ্ছি। বিথোভেনের জন্মস্থান বলে।"

মেয়ে বলল যদিও কিন্তু আমাদের দেশ হোলে বলত যত্তো সব আদিখ্যেতা, বয়স ত' চল্লিশের নীচে হবে না, চুলে ত' পাক ধরেছে। মেয়ে, না হাতি, বুড়ি।

আমার মনটা কিন্তু ওদের দেশে থেকে ও ঘুরে বেশ পাল্টে গেছে। এখনও মেয়ে বলতেই ইচ্ছে করল।

কোঁকড়ান দু'চারটি রুপোলী চুল মুখের উপর এসে পড়েছে। বয়সের, বুদ্ধির, অভিজ্ঞতার ছাপ মুখটিতে এক অন্য ধরনের কমনীয়তা এনে দিয়েছে। সুন্দর আমার পছন্দের রং মানে কমলা রং-এর গাউন পরা। বেশ লাগছিল।

আমার কথা শুনে খুব খুশী হয়ে উঠল, "কি আশ্চর্য! তুমি, মানে তোমরা বিথোভেনের মিউজিক ভালবাস? আর আমি কিছু জানতে পারিনি। আমি ওর সুরের ভক্ত। আমি সারা জীবন বাজনা নিয়েই আছি। শুনি, শিখি আর বাজাই। কন্সার্টে বাজিয়ে অবশ্য বেশ রোজগার করি। বাবা আগে মারা গেছেন, মা অল্প দিন আগে মারা গেছেন। এখন আমি আর আমার মিউজিক"।

"বিয়ে করনি"?

সময় পেলাম কখন? ছোটবেলা থেকেই আমি মিউজিক ভালবাসি, পাগলের মত ভালবাসি যদিও নাম তেমন করিনি। তাতে কি হয়েছে? তাই আমার মনকে ভরে রাখে।

"যদি কখনও একা বোধ কর?"

"তখন ভেবে দেখব। অনেক মেয়ে আছে, তারা সংসার চায়, স্বামী চায়, ছেলে-মেয়ে চায়। মনে আমি স্বতন্ত্র। এই সব চিন্তা এখনও আমার মনে আসে না। তুমি বুঝি খুব মিউজিক ভালবাস?"

"আমি মিউজিক ভালবাসি, আমি পড়তে ভালবাসি, আমি প্রকৃতিকে দেখতে ভালবাসি। তোমাদের দেশে জন্মালে কি হোত জানি না। কি করতাম জানি না। আমাদের দেশ আমাদের সময়ত' অন্য রকম ছিল। মেয়েদের বিয়ে করতে হোত, সংসার করতে হোত। সেটাই ছিল তাদের একমাত্র করণীয়। তবে মেয়ে স্বামী নিয়ে ভালই আছি।"

আবার বললাম, "তাছাড়া এখন কিছু ভাবি না। আজকাল আমাদের দেশ তোমাদের দেশের মত অনেকটা, মেয়েদের ব্যাপারে। থাক্, এখন আমি অনেক বকে যাচ্ছি; তুমি বোধ হয় থকে গেলে"।

"মোটেই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ লাগছে। আমাদের দেশের কোন জায়গা দেখেছ?"

"বিশেষ নয়। ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, কোলন, তারপর যাবার কথা ছিল ডুসেলডর্ফে। আগে টিকিট না কাটায় এসে যাচ্ছি বনে। বনে রাত কাটাবার ইচ্ছে ছিল না; কারণ বড় এক্সপেনসিভ। কি আর করা যায়।"

"জানি, ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝামেলা। এক কাজ কর। প্রথমেই বিথোভেনের মিউজিয়ামটা দেখবার চেষ্টা কোর। তাছাড়া সহরটা ঘুরে বেড়িও যেখানে আসল সরকারের অফি-সাররা বা ডিপ্লোম্যাটরা থাকে। রাইন নদীর ধারটা সুন্দর ও দেখবার। আর এই যে যাচ্ছ যে পথ দিয়ে সেটাই ত' বন-এর সবচাইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গা।"

"অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার এই সাহায্যের জন্য"।

"আরে, আসল কথাটাই ত' বলিনি। আমার ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। থাকি কোচ ষ্টেশনের বেশী দূরে নয়। কোচ ষ্টেশনেই রেখে দিও তোমাদের জিনিষ। কাছেই থাকি। ছোট ফ্ল্যাট। বসার ও খাবার ঘর কম্বাইন্ড। কিচেনেট একটা, বেড্রুম, বাথরুম। আমার বাড়ী এসে হাত মুখ ধুতে পার"।

"অনেক ধন্যবাদ। আমরা নেমেই দৌড়াব মিউজিয়ামের দিকে"।

"তাই ঠিক হবে। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ডিনার

খেয়ে আমার ওখানে চলে এসো। আজ আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাজাব। কাল সন্ধ্যাবেলা বড় কন্‌সার্ট আছে। তোমরা এসে আমার বসবার ঘরে বিশ্রাম নিতে পারবে। মেয়ে দরকার হলে ডিভানটা ব্যবহার করতে পারবে। আর কফি পাবে আমার কাছে। মিছেমিছি হোটলে যাবে কেন, ভোর চারটাতে ত' কোচ ছাড়বে"।

কোচ বনে পেঁছে গিয়েছিল। সবাই যে যার নেমে পড়ছে।

"একটু পরেই ত' দেখা হবে", বলে মেয়েটা নেমে গেল।

ওসব দেশে, মানে, ইউরোপে সর্বত্রই একটা জিনিষ শিখবার মত। এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে ষ্টেশন বা কোচ ষ্টেশন, সর্বত্রই লকার, মানে অনেকটা আমাদের ব্যাঙ্কে যেমন লকার আছে সেই ধরনের বড় বড় লকার আছে। তাতে টুরিষ্টদের খুব সুবিধে জিনিষ রাখার। পয়সা অবশ্যই লাগে, কিন্তু হোটেলের ঘর নেবার চাইতে লক্ষ গুণে কম।

আমরা কোচ ষ্টেশনেই হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে লকারে তিনটা ব্যাগ ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বনগাসে মিউজিয়ামে।

বিথোভেনের নামে ওরা কত কি যে করেছে। একটা বিরাট বিথোভেনের হল করেছে যেখানে তাঁর সম্মানে প্রতি বৎসর সংগীত সম্মেলন হয়। পৃথিবীর সব দেশের নামী মিউজিসিয়ানরা আমন্ত্রিত হয়। অবশ্য বিশেষ করে বিথোভেনের মিউজিকই বাজান হয়।

ওখানকার রাস্তাঘাট দোকান সবই বেশ লাগছিল দেখতে। তবে যা অন্য জায়গাতে, মানে কোলন বা ফ্র্যাংকফুর্টে দেখেছি আমার চোখে সে রকম চোখ ঝলসানো লাগেনি।

অবশ্য কথাটা আছে না—"আপ রুচি খানা"? তাই লিখলাম আমার চোখে। আর কারও লাগতে পারে।

আর একটা জিনিষ নজরে পড়ল—আত্মরক্ষার্থে বানানো পুরাকালের প্রাচীর। নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা পৃথিবীর সুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে। মানুষের সব চাইতে বড় চেষ্টা। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না।

এখানকার বিরাট পারলিয়ামেন্ট দেখলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল, এই ত' সেদিন সব ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছিল। আবার এরা সব গড়ে নিয়েছে। আবার তাদের ধনের অন্ত নেই। কিন্তু এই যে ঐশ্বর্য, এও কি রক্ষা পাবে?

মনে কি এদের হচ্ছে না, কবে, কখন চোর সিঁদ কেটে ঢুকবে বা ডাকাত সিংহ-দরজা দিয়ে ঢুকবে?

কিন্তু যে ধনে ধনী হলে কেউ কেড়ে নিতে পারে না সেই চিন্তা কি এখনও করছে?

রাইন নদীর ধারে ধারে কিছুক্ষণ বেড়ালাম। বড় ভাল লাগছিল। রাজধানীর যা কিছু প্রয়োজন থাকার, সবই আছে। ঘুরে ঘুরে সবই দেখলাম।

স্বাধীন দেশ আমাদেরও। তাই কি থাকে বা প্রয়োজনীয় সে সবের নাম না বললেও আমরা সবাই তা জানি। তাই তা আর করলাম না।

তখনই বুকটা উঁচু হয়ে উঠল। আমিও স্বাধীন দেশের নাগরিক। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, পরাধীনতার লজ্জা মাথায় করে আমার আসতে হয়নি।

আরও একটা কথা মনে এসে আত্মসম্মানবোধ করলাম। তোমাদের দেশ থেকে টাকা নিতে আসিনি। অতি সামান্য হলেও দিয়েই যাব। কারণ আমি টুরিষ্ট। সেইখানে আমি দাতা।

অনেক কিছু দেখে ও জেনে গিয়ে ঢুকলাম অতি মাঝারী ধরনের খাবার জায়গাতে যেখানে পেটও ভরাবো, পকেটও বেশী হালকা হবে না।

সারাটা সময় আমাদের এত ভাল লাগছিল মনেই হচ্ছিল না যে বিদেশে এসেছি, আর এসেছি মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে। হঠাৎ ঐ মেয়েটার সংগে আলাপ হয়ে যাওয়াতে দেশটাই যেন চেনাজানার দলে ভিড়ে গেল।

খেতে খেতে ও তিনজনে গল্প করতে করতে মনে হচ্ছিল—তাই ত' কেউ একজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রায় রাত সাড়ে এগারটা বারটার সময় গুটি গুটি গিয়ে হাজির হলাম মেয়েটার ফ্ল্যাটে। বেল টিপবার আগেই অতি ক্ষীণ বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়ে, হেসে এসে দাঁড়াল।

"কি কেমন কাটল?"

"খুব ভাল কিন্তু তোমাকে ত' ডিস্‌টার্ব করলাম"।

"না, এসে খেয়েই বাজাতে আরম্ভ করেছিলাম। তবেই বুঝতে পারছ কতক্ষণ ধরে বাজাচ্ছি। এই একটুক্ষণ থেকেই হয়রাণ লাগছিল। আমি তোমাদের কথাই ভাবছিলাম তোমরা এলেই কফি আর রোল খাব। ঠিক সময়ে এসে গেছ। বোস, আমি কফি বানিয়ে আন্‌ছি"।

"অন কনডিশন, বাসন ধোবে সব আমার মেয়ে"।

"বেশ, তাই হবে"।

আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম ওকে আমার দেশের একটা চিহ্ন দিয়ে যাব। তাই কোচ ষ্টেশনের লকারে বাক্স ঢোকাবার আগেই একটা সুন্দর মুর্শিদাবাদী রুমাল হ্যান্ডব্যাগে নিয়ে এসেছিলাম।

অনু দিভানের ওপর এলিয়ে পড়েছিল। পায়ের ওপরই ত' বেশীরভাগ সময় আমরা থাকি। সবারই প্রায় এক অবস্থা। সে জারমান বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে সুন্দর ছোট্ট ঘরখানা দেখছিলাম।

আর্টিস্টের ঘরই বটে। সব কিছুর মধ্যেই সে ছোঁয়া যেন লেগে রয়েছে।

কফি খেতে খেতে কত কথা হচ্ছিল। ও রাজি হোল আমাদের ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাবে। আমি ওকে রুমালটা দিতে ভীষণ খুশী হয়ে গেল।

ওদের এই ছেলেমানুষীটা আমার খুব ভাল লাগে। তখনি গলায় কি সুন্দরভাবে সে জড়িয়ে নিল।

"আমি তোমাদের বাজিয়ে শোনাব, আর তোমরা কিছু করবে না"?

মেয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, "ঠিক কথা, সবাইকে কিছু না কিছু করতে হবে। বাবা, তুমি প্লেট কাপগুলো ধুয়ে ফেলো। মা, তুমি একটা রবীন্দ্র সংগীত কর আর তার সংগে আমি একটু নাচি। আমার অনেকদিন পরে নাচতে ইচ্ছে করছে"।

"ঠিক বলেছে তোমার মেয়ে। ফিউচার ব্যারিষ্টার ত"।

সে গিয়ে প্লেটগুলো ধুয়ে রেখে আসল।

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে,
ওগো বিদেশিনী"।

* * * *

আমি অতিথি তোমারি দ্বারে,
ওগো বিদেশিনী"।

গানটা গাইলাম। মানেটা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। ও সংগে সংগে একটু গিটারে ঝঙ্কার তুলছিল। মেয়েরও নাচ শেষ হোল। ও আমাদের দু' জনকেই জড়িয়ে ধরল।

"তোমরা সত্যিই টেগোরের দেশের লোক। কোন সন্দেহ নেই"।

ESTD. 1926 Phone : 34-1093
S.C. Acharyya & Co.
Everything Electrical
55, Ezra Street, Calcutta-1

সেই রাত আমাদের সকলের কাছেই চিরদিনের সঙ্গে মিশে রইল।

॥ তিন ॥

ডুসেলডর্ফের কোচে গিয়ে উঠলাম।

চারিদিকে নূতন দিনের ক্ষীণ আভাস বলাটাও বোধ হয় ঠিক হবে না। রাতের অন্ধকার তখনও রয়েছে। ইলেক্ট্রীকের আলো তখনও ঝলমল করছে।

তবুও কোচে উঠে বসবার আগে আকাশের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম, নূতনের আভাস যত ক্ষীণই হোক, তাও আছে। তারাগুলো সব আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'চারটা তখনও চোখ কচলিয়ে আগের দিনের রেশ টেনে রাখার চেষ্টা করছে।

আমারও প্রায় সেই অবস্থা। অত সুন্দর রাতটাকে আর টেনে রাখতে ইচ্ছা করছিল না। ভেবেছিলাম এই অপূর্ব রাতের কথা ভাবতে ভাবতে যাব পৌঁছে ডুসেলডর্ফে।

কোচে উঠেই কখন যে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। ডুসেলডর্ফে পৌঁছে কন্ডাক্টারের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। চেয়ে দেখলাম বাকি দু'জনেরও সেই একই অবস্থা।

এখানে আসার সময় মনে একটা কিন্তু কিন্তু হচ্ছিল, একবার বাধা পড়েছিল ত'। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোচ থেকে নেমে মনটা আনন্দে ভরে গেল।

মেঘলা নয়, বৃষ্টি নয়। বুঝলাম দেশটা আমাদের ভুলটাকে মাফি দিয়ে দিয়েছে।

রেল স্টেশনে লকারে মাল রেখেছিলাম। ওখানেই রিফ্রেশমেন্ট রুমে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে সারা দিনের জন্য তৈরী হয়ে পড়লাম। ব্রেকফাস্ট ওখানেই পেটভরে নিলাম সেরে।

আর কি চাই? হোটেলের কথাই ভাবব যদি সারাদিন এই দেশটা দেখে শেষ না করতে পারি তবেই।

মাথার উপর এখনও রয়েছে বিরাট সহর মিডনিক দেখা। তা'ছাড়া হামবুর্গ আর সম্ভব হলে বার্লিন।

দিন হাতে গোনা; পয়সাও তাই।

তখনই মনে হোল বই আমাদের কত বড় বন্ধু, কত বড় সহায়ক। বইয়ে পড়া অনেক কিছু আছে বলেই কম সময়ে বেশী বুঝতে পারছি। চোখে দেখে বেশী উপলব্ধি করতে পারছি। আসল জিনিষগুলো বেছে নিতে পারছি।

জারমানির মধ্যে এই সহর একটা বড় সহর হিসাবে গণ্য। বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রীর জন্য। একে বলে "দি ডেস্ক অব দি রুর ডিসট্রিক্ট"।

এই জায়গাটা সাংস্কৃতিকদের জন্যও খুব নামী। পৃথিবীবিখ্যাত আর্টিষ্ট পিটার কর্নেলিয়াস আর কাব হেনরিক হাইনে এখানে জন্মেছিলেন। গোয়েটেও কিছুকাল এখানে বাস করে গেছেন। এখানকার একাডেমি অব ফাইন আর্টসের দেশ-জোড়া নাম। তাই নানা দিক থেকে আর্টিষ্টরা আসে এখান থেকে নিতে ও দিতে।

আমরা প্রথমেই চলে গেলাম সহরের মাঝখানে। সহরের মাঝখানটার নাম হচ্ছে "কনিগস্ আলী"। আদর করে এখানকার লোকেরা একে বলে "কো"। এবং ডাক নাম দিয়েছে "কো"।

এই কথাটা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল অক্সফোর্ডের কথা। ওখানেও লোকেরা রাস্তার নামগুলোকে আদর করে ছোট করে বলে।

আমার মনে পড়ে গেল দেশের কথা। মানুষকে আমরা আদর করে ছোট নামে ডাকি। কিন্তু প্রাণহীন কোন জিনিষকে কি এই আদরটা করি? আমাদের আদর তবে কি সীমাবদ্ধ? তা কি করে হবে? যে-দেশের কবি বলেছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর"

সেখানে মন, চিন্তা, ভালবাসা, কিছুরই কোন রকম সীমারেখা থাকতে পারে না।

আমারই স্মৃতিশক্তির অভাব, মনে আসছে না।

উনি বল্লেন, "এই রয়েছে তুমি আবার কোন্ চিন্তায় ডুব দিলে? মনের দরজায় তালা দিয়ে, চোখ দুটো খুলে পা দুটো লম্বা করে চল ত এখন।"

"ঠিক আছে। গডরেজের তালা লাগালাম।"

এ জায়গাটাতে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল সহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নদীজলের ধারা। তার দু'ধারে পার্ক। সেই পার্কের ধার দিয়ে রাস্তা। কি সুন্দর পরিকল্পনা করে বানান! চোখ জুড়িয়ে গেল।

সেই সব রাস্তার ধারে রয়েছে বিরাট বিরাট দোকান আর সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্ট।

সেদিক থেকে এগিয়ে আমরা গেলাম "জাগেরহফ" দুর্গে। সেটা এখন হচ্ছে আর্টিষ্টদের পীঠস্থান। স্থানীয় চিত্রশিল্পীরা ওখানে জমা হয়ে নিজেদের চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করে। অনেকে শেখে, অনেকে শেখায়।

"সেন্টিপেডে" নামে একটা অপূর্ব মোটর চলার রাস্তা। রাস্তাটা সব কিছুর উপর দিয়ে চলে গেছে, কেন না স্তম্ভগুলোর ওপরে রয়েছে রাস্তা। আজকাল কলকাতাতেও ফ্লাইওভার বানাতে আরম্ভ করেছে। কেমন সুন্দর হবে। কাউকে দেশ ছেড়ে যেতে হবে না এই আধুনিক সুন্দর সুবিধাজনক জিনিষটা দেখতে।

ছাব্বিশতলা "থাইসেন" বিল্ডিং দেখলাম। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাতে ঘাড়ে বেশ ব্যথা হয়েছিল। তাই সেটা কোন দিন ভুলবার নয়। এখানে সারা বছর ধরেই কোন না কোন কিছুর এগজিবিশন চলছে। "ডুপা" ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং এবং পেপারের। তা শেষ হতে না হতেই "কুনস্টফে" ইন্টারন্যাশনাল প্লাস্টিকের। তা যদি বা শেষ হোল তবে "ইন্টার প্যাক", মানে নানা জিনিষ প্যাক করার ধারা ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কত জিনিষের যে এগ্‌জিবিশন তার শেষ নেই।

এই সব কিছুর মধ্যে সবচাইতে মনে রাখবার মত হচ্ছে "ট্রেড এগ্‌জিবিশন"। এইটা প্রথম হয় ১৮১১তে। সেই প্রথম বৎসর সবচাইতে নামী অতিথি ছিলেন নেপোলিয়ান।

এই কথাটা জেনেই কেমন যেন মনটা উদাস হয়ে গেল। আমার কয়েকজন হিরোর মধ্যে নেপোলিয়ান হচ্ছেন একজন। কত দিকে কত প্রতিভা। এইটুকু জীবনের মধ্যে কত কিছু দিয়ে গেছেন বিশ্বকে। তাঁর শেষজীবন কেন এত দুঃখের হবে? তাঁর কপালে কেন এই পরাজয়ের কালিমা লেপে দেওয়া হবে? কেন? দেবতারাও কি মানুষদের মত হিংসুটে? কারো সম্পূর্ণ ভাল কি তারাও সহ্য করতে পারে না?

নিশ্চয়ই তাই।

বেশীর ভাগ মানুষের জীবনেই ত' শত শান্তির মধ্যে, শত সুখের মধ্যে ঠিক একটু খুঁত দেখা যায়।

ওখান থেকে চলে গেলাম আমরা পুরোনো সহরে। প্রথমেই গিয়ে ঢুকলাম মিউনিসিপ্যাল আর্ট মিউজিয়ামে। এখানকার সংকলন সত্যিই মনে রাখার মত। ষোল শতক থেকে বিশ শতকের নামকরা পেইন্টিংস সব ওখানে রয়েছে। রুবেনসের 'ভিনাস এন্ড এডোনিস'ও তার মধ্যে রয়েছে।

এখানে যে কত মিউজিয়াম আছে তার কোন সীমাসংখ্যা নেই। গোয়েটে মিউজিয়াম, সিটি মিউজিয়াম। এই রকম আরও অনেক অনেক। আমরা একটাতেই

ঢুকেছিলাম। সব ক'টা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এই দেশেই জন্ম নিতে হবে।

এই কথাটা মনে আসতেই আঁতকে উঠলাম। নিজের দেশের বাইরে কোথাও জন্মাতে পারি ভাবলেই তো মনে হয় এর চাইতে বড় অভিশাপ বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না।

এখানকার সেন্ট ল্যামবারটাস চার্চ আর রাউন্ড ক্যাসল দুর্গ পুরোনো কালের স্মৃতি ধরে রেখেছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ জিনিষই তো গত মহাযুদ্ধে বোমার চোটে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

শুধু কাঁচ ও ষ্টীলে তৈরী ২৪ তলা বাড়ী দেখলাম ওখানে। এরকমটা আর কোথাও দেখিনি।

এই অপূর্ব বাড়ীটা রাইন নদীর ধারে। তাই নদীর জলে তার ছায়া সাতাই দেখবার মত। এত ভাল লাগছিল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। ঝিরঝিরে হাওয়াতে নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীর তলাগুলো এ ওর গায়ে পড়ে কেমন এলোমেলো দেখাচ্ছিল। যেন একতলাটা তিনতলায় উঠে তিনতলাকে একতলায় নামিয়ে দিল।

ঠিক যেমন মানুষের জীবনের কোন ঠিক ধারা নেই। যে আরম্ভ করে যেভাবে, শেষ হয় বোধ হয় ঠিক উল্টোভাবে। আরম্ভের সময় সে জানে না কোথায় তার শেষ। নদী যেমন পাহাড় ভেঙ্গে উদ্দাম ছন্দে বেরিয়ে আসে। উদ্দেশ্য সমুদ্রে পৌঁছান। কিন্তু সবাই কি পারে তা পৌঁছাতে? কোথা দিয়ে কি করে যাবে কোথায় তার শেষ তা সে কিছুই জানে না।

একটা বেশ মজার ব্যাপার দেখলাম কনিগসে আসী রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। বাচ্চা ছেলেরা চাকাওয়ালা গাড়ী নিয়ে ঠেলে ঠেলে বেড়াচ্ছে।

এই সব চাকাওয়ালা বাচ্চাদের ঠেলা গাড়ীগুলোকে বলে "বাডস্নাগার"। এই বাচ্চাগুলো কিন্তু পথচারীদের কাছ থেকে কিছু পয়সা আশা করবে। এটা ওদের একটা ট্রাডিশনে দাঁড়িয়েছে। সতের শতকে তাদের বড় ভালবাসার রাজা দ্বিতীয় যোহান উইলহেম বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন। স্বাভাবিক, রাজা যাচ্ছেন বিয়ে করতে। সে এক বিরাট মিছিল, কাতারে কাতারে লোক। চোখ-ঝলসানো জাঁকজমক।

যে গাড়ীতে করে রাজা যাচ্ছেন সে তো এক স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রের রথের মত সাজে-সজ্জায়। হবে নাই বা কেন? ডুসেলডর্ফের ইন্দ্র তো রাজা যোহান উইলহেমই বটে।

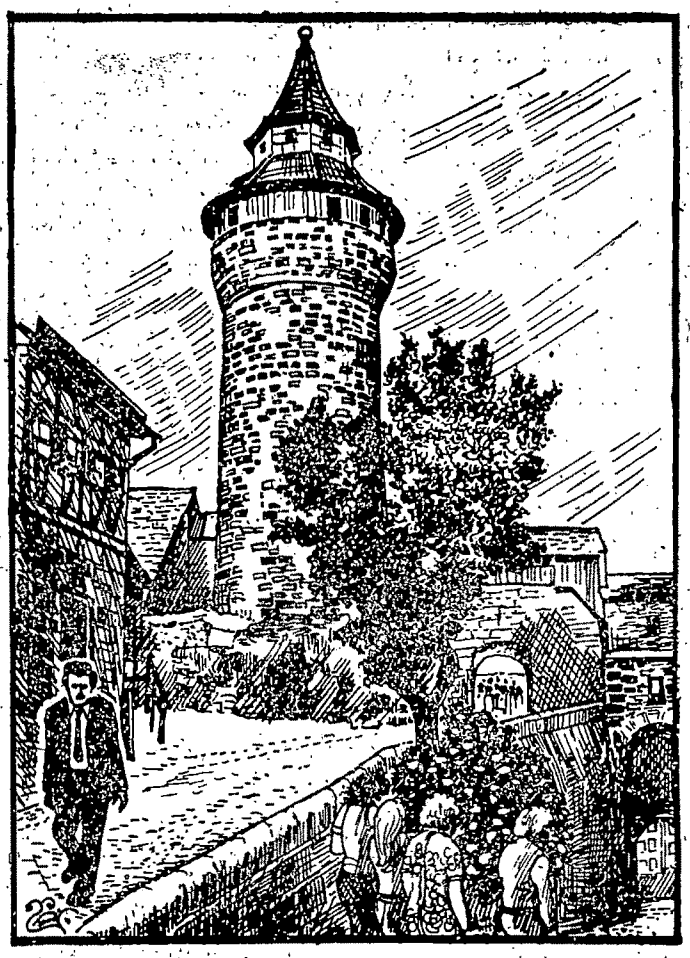

সেকালের দুর্গ একালের আর্টিষ্টদের পীঠস্থান

প্রজারা যেন আর আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। ঠিক সেই সময় ঘটল এক অঘটন। বরের রথের একটা চাকা ঢিলে হয়ে পড়ল। একটা দশ বৎসরের ছেলে তার সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধির জোড়ে সাংঘাতিক অঘটনকে রুখে দিল। নিজে সে চাকার অংশ হয়ে গেল আর চাকার কেন্দ্রস্থলকে চেপে ধরে রেখে চাকার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সারা শোভাযাত্রাটা সে গিয়েছিল।

নিজের জীবনের সে মায়া করেনি। এই শুভযাত্রায় যেন কোন বাধা না হয় তাই ছিল তার মনে।

ভগবান সব ভাল যার শেষ ভালই করেছিলেন। ছেলেটিরও কোন ক্ষতি হয়নি। রাজার ত নয়ই। এমন কি সেই বিরাট জনতার বেশীর ভাগই অনেক পরে ঘটনাটা জানতে পারে যখন রাজা ছেলেটাকে একটা সোনার মোহর উপহার দিয়েছিলেন।

আজকাল ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে প্রতি বৎসর প্রত্যেক ষ্টেট থেকে যেসব সাহসী ছেলে বা মেয়ে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে কোন সৎকাজ করে তাদের সম্মান দেখান হয় ও পুরস্কৃত করা হয়।

ডুসেলডর্ফের এই রাজাকেই ওখানকার লোকেরা এত ভালবাসত যে "য়্যান ওয়েলেম" বলে আদর করে ডাকত। এই রাজা তাঁর প্রজা ও রাজ্যের জন্য কত কিছু যে করেছিলেন তার সীমা-পরিসীমা নেই।

দেশবাসীরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর আগে ১৭১১তে তাঁর নামে একটা অপূর্ব স্মৃতিস্তম্ভ বানায়। তাঁর সেই বিরাট মূর্তিটা দেখতে দেখতে একটি পথচারীর কাছ থেকে এই কাহিনী শুনলাম।

সারা দিনের এই ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে মুখ ঠিকই চলছিল। এটাই ত মানুষের সবচাইতে অসুবিধে। মন যখন আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে হঠাৎ পেট জানান দিয়ে বুঝিয়ে দেয়—আহা কর কি, কর কি, তুমি যে মাটির লোক। ফিরে এসো মাটিতে।

ওখানে ত কোন অসুবিধা নেই। "ভোজনং যত্র তত্র" এই প্রবাদটা বোধ হয় যিনি লিখেছিলেন তিনি পশ্চিমে এসেই লিখেছিলেন। এখানে তুমি যে-কোন

জায়গাতে যেতে পার। সবই ঝাঁঝালো, গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

—না তা ত' হতেই পারে না। আসলে সেই যুগে আমাদের দেশটা ত' তাই ছিল। মানুষও ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাই মনে হয়, যা ছিলাম, নিশ্চয়ই আবার সেই আশা আমরা করতে পারি।

একটা দিনেই ত' সব শেষ করে ফেললাম। তাই ঠিক হোল রাতের ট্রেনে হামবুর্গের দিকে পাড়ি দেব। তাতে এখানে হোটেলে থাকার খরচটা বেঁচে গেল। শেষ করে আমরা গিয়ে বসলাম রাইন নদীর ধারে।

আমাদের দেশে যেমন গঙ্গা, রাশিয়াতে যেমন ভল্গা, তেমনি জারমানীতে হচ্ছে রাইন নদী। এদের বড় আদরের নদী।

একে কেন্দ্র করেই এই দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় হয়ে উঠেছে। কালচার, ঐতিহ্যে বিশ্বজোড়া নাম কিনেছে।

এই নদীর ধারে বসে ছত্তমনঝোলার কথা মনে এলো। গঙ্গোত্রী, গঙ্গা যেখান থেকে নেমে আসছেন। ভারতব্যসীরা এই গঙ্গা থেকে অনেক কিছু পেয়েছে বলেই কত ভাবে, কত রবমে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

নদীর পাড়ে বসে বসে বেশ সময় কাটছিল। বেশ রাতে ট্রেন। সময়ে ষ্টেশনে গেলেই চলবে।

একটি বৃদ্ধা জারমান মহিলা এসে পাশে বসলেন। একাই এসেছিলেন। এই বয়সে এদেশে অনেকেই একা হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নদীর দিকে আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম।

মহিলা নিজের চিন্তায় এতই ডুবে-ছিলেন যে, মনে হোল পাশে যে বসে আছি তাও যেন খেয়াল নেই। এমন কি নদীরও বোধহয় আমার অবস্থাই হয়েছে।

ওর কাছে দু'জনেই অস্তিত্বহীন।

তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বোধহয় সারা-জীবনের কত কথাই ভাবছেন—সুখের-দুঃখের, পাওয়ার, না পাওয়ার। হিসাব মেলাতে চেষ্টা করে করে বোধহয় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছেন। জীবনের হিসাব কষা বোধহয় খুব বড় একাউন্ট্যান্টের পক্ষেও সম্ভব নয়।

যাই হোক, হঠাৎ যেন উনি বর্তমানে ফিরে এলেন।

পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন, "তোমরা ইন্ডিয়া থেকে আসছ ?"

"ঠিকই বলেছ, কি করে বুঝলে ? আর বেশ ভাল ইংরেজী বলছ ত ?"

"অনেক কালের কথা। কিছুদিন ইন্ডিয়াতে ছিলাম। তাছাড়া লন্ডনে স্বামীর কাজের খাতিরে অনেকদিন ছিলাম। তাও হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন, কবে যাচ্ছ ?"

"আজকেই রাতে হামবুর্গ যাচ্ছি।"

"রাইনল্যান্ডের উপকথা 'সেভেন প্রাউড বোনের কথা' শোন নি ?"

"না ত।"

'তবে তাই এখন শোন। হামবুর্গে ত' এই নদী যাবে না। এ এক অপূর্ব কাহিনী, কবেকার কেউ জানে না। তবে যতদিন এই নদী থাকবে ততদিন এই কিংবদন্তী থাকবে।"

শোন বলি। শোনবার্গ (সুন্দরনগর) নামে একটা দুর্গ ছিল এই নদীর পাড়ে। সেই দুর্গে বাস করত এক কাউন্ট তার সাতটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে নিয়ে।

সেই মেয়েরা ভীষণ অহংকারী ছিল। তারা মনে করত তাদের উপযুক্ত স্বামী এই পৃথিবীতে জন্মায়নি। এমন কি রাজারাও তাদের অনুপযুক্ত।

একটা খুব মস্ত দোষ ছিল এই মেয়েদের। যারা তাদের ভালবেসে বিয়ে করতে চাইত তাদের সোজাসুজি বিদায় না দিয়ে কিছুদিন ওদের আশায় ঝুলিয়ে রাখত। পছন্দ হতেও পারে, এই রকম ভাবটা আর কি। যাই হোক, পরে তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিত। ওদের মনের কষ্ট দেখে ওরা খুব আনন্দ পেতো।

সাতজন সৎ নামী জমিদার এসে-ছিলেন। তাঁদের ভালবাসা জানিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

বড় বোন বলল, 'আপনাদের বিয়ে করে আমরা কি নিজেদের ছোট ও খাট করতে পারি ?'

অপমানিত হয়ে তাঁরা চলে যান।

তার পর আসে সাতজন ধনী ব্যবসায়ী সেই একই আর্জি নিয়ে। দ্বিতীয় বোন তখন বলেছিল, 'তোমরা তোমাদের ধনের লোভ দেখিয়ে এসেছ কাউন্টের মেয়েদের বিয়ে করতে ? বামন হয়ে চাঁদে হাত !' বণিকরা মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে গেল,—তাদের ধারণা ভুল, তারা ধনী নয়।

তারপর এল সাতজন বড় বংশের ও

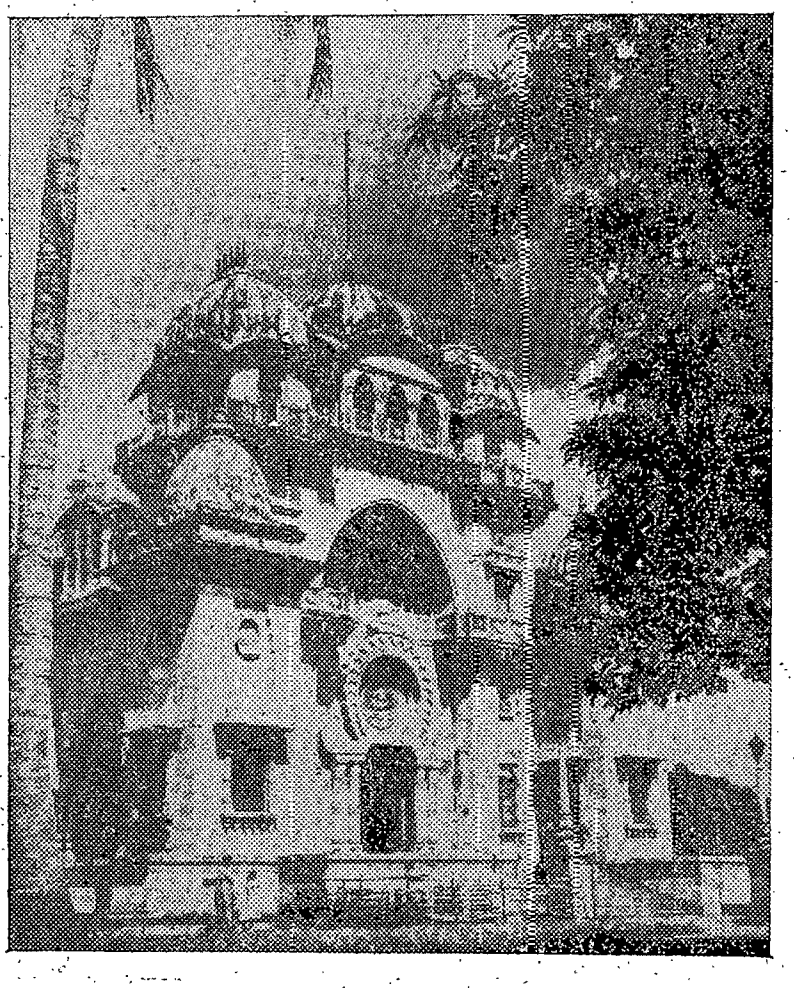

বেলুড় মঠ

ছবি : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বয়েস অল্প, চেহারা সুন্দর। যৌবনের প্রতীক। তারাও নিরানন্দ চেহারা নিয়ে মাথা হেঁট করে গেল ফিরে। মনে হোল, কত বৎসর যেন গেছে ওদের-বেড়ে।

সাতজন বীর, সাতজন ব্যারণ, সাতজন কাউন্ট, একের পর এক এল তাদের ঐশ্বর্যের, সম্মানের জাঁকজমক নিয়ে। এমনই সেই সাত বোনের রূপের খ্যাতি, এমনই রূপের মোহ। ষষ্ঠ বোন বলল, 'আমরা কি তোমাদের চাইতে ভাল কিছু পাবার যোগ্য নই? তোমাদের ঐশ্বর্য, জমিজমা আমাদের কাছে কিছুই নয়'। একে একে সকলেই অসহায়ভাবে গেল ফিরে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই এল সাতজন ডিউক। সেই একই কথা, সেই একই আবেদন ঃ

'তোমারেই ভালবাসিয়াছি আমি'
কত রূপে কত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার'।

একই উত্তর, 'উপযুক্ত নও, উপযুক্ত নও' বলে উঠল ছোট বোন।

এইভাবেই বোনেরা বিয়ে না করে ছিল। কিন্তু তাদের সৌন্দর্যের এত খ্যাতি ছিল বা তারা ছিল এক-একটি ডানাকাটা পরী যে তাদের বিয়ে করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লোকে আসতই। পাণিপ্রার্থীর অভাব ওদের কোনদিন হোত না। রূপের মোহ এমনি জিনিষ।

শেষে এলো এক কবি। কবি নিজের কবিতা গান করত। মানে সে সুরেলা গলা নিয়ে জন্মেছিল। সে ছিল একাধারে কবি ও গায়ক। সে প্রেমে পড়ল ছোট বোনটির।

বোনেরা সবাই মিলে করল এক শলাপরামর্শ। মেয়েটি বাইরে বাইরে অভিনয় করে গেল। বেচারা কবি কিছুই বুঝল না। এমন কি একদিন মেয়েটি কবিকে একটা গোলাপ ফুলও উপহার দিল। কবি এতই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল যে পাগলের মত মেয়েটিকে উপলক্ষ করে কবিতা লিখে সুর দিয়ে গান করে দিন কাটাতে থাকে।

একদিন ছোট মেয়েটি কবিকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। কবিও আত্মহারা। যথাসময়ে সে তার ভালবাসার পাত্রীর কাছে যায় ও তাকে গানের ভেতর দিয়ে প্রাণঢালা সুরে প্রেম নিবেদন করে।

বোনেদের আগের পরামর্শমত মেয়েটি হাসতে আরম্ভ করে ও অন্য বোনেরা লুকোন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে টিট্‌কারী দেয়।

কবি প্রাণে এত ব্যথা পায় যে ছুটে রাইন নদীর পাড়ে এসে নদীর কাছে প্রার্থনা জানায়, যেন রাইন এর প্রতিশোধ নেয়। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর বুকে।

এই কথা জানতে পেরে সাত বোন একচোট হেসে বলেছিল, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। এর কবিতা শুনে শুনে আমরা হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। ভালই হোল, রাইন নদী এখন কবির কবিতা উপভোগ করুক।'

একদিন সাত বোন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। তারপর আর তাদের দেখা যায়নি। কেউ বলে রাইন নদী প্রতিশোধ নেয়। জল হঠাৎ বেড়ে উঠে সাত বোনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আরও একটা কথা শোনা যায় যে জল-দেবতার সাতটি রাজপুত্র প্রেমহীন হৃদয়ে সাত বোনকে ধরে জলের তলে চলে যায়।

একটা আশ্চর্য কথা কি জান?

নদীর জল যখন কমে যায়, দেখা যায় সাতটি পাহাড়। শুধু পাথর দিয়ে তৈরী। দেখে মনে হয় সেই সাত বোনের মতই পাথুরে মন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের সৌন্দর্যের মত্ততায়।

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এই রকম অপূর্ব কাহিনী না শুনে চলে গেলে ডুসেলডর্ফকে চেনাই হোত না। বিদায় বন্ধু।"

ক্ষণিকের বন্ধুর কথা ফুরোল, কিন্তু নটে গাছটি ত' মুড়োল না।

রূপকথার রাণী রাইনের কাহিনী যে অফুরান।

বাংলার লৌকিক রামায়ণ

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ দুইটি ধারায় প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রথমতঃ লিখিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে তাহার একটি ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই ধারা অনুযায়ীই কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও বিভিন্ন পুরাণ অনুবাদকের আবির্ভাব হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই ধারাটি সৃষ্টি হইবার আগে হইতেই ইহার একটি মৌখিক ধারাও সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকেই লৌকিক ধারা বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহা বাল্মীকি রামায়ণের লিখিত ধারাটি আনুপূর্বিক অনুসরণ করে নাই। বরং তাহার সঙ্গে নানা লৌকিক উপকরণ সংমিশ্রণ করিয়া লইয়া তাহা নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল। দেশে নিরক্ষরের সংখ্যাই অধিক ছিল এবং এখনও আছে, সুতরাং এই ধারাটি জন্মলাভ করিবার পর হইতেই ক্রমে পুষ্টি লাভ করিয়া কেবলমাত্র মুখে মুখেই বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। তাহার ধারা আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আজ যে বাল্মীকিকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইহাই কারণ। কারণ, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই এই ধারাটি সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কৃত্তিবাসও তাঁহার অনুবাদ রচনায় বাল্মীকিকেই একান্তভাবে গ্রহণ না করিয়া মুখে মুখে প্রচারিত বা লৌকিক রামায়ণের বহু উপকরণ, তাঁহার অনুবাদ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া বাল্মীকির রামায়ণকে বাঙ্গালীর রামায়ণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের মধ্যে আনুপূর্বিক বাল্মীকিকে অনুসন্ধান করা বৃথা।

রামায়ণ প্রচারের লৌকিক ধারাটি বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ দেখা যায় যে, কবি বাল্মীকি স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা পুঁথিতে লিখিত হইয়া তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাঁহার কাব্যের কিংবা রামচরিতের প্রচার হইবে না, সেই জন্য তিনি লবকুশকে রামায়ণ গান মুখে মুখে শিখাইয়াছিলেন। বরং তিনি লিখিয়াছেন যে, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজসভায় তাহাদের মাধ্যমে তাহা নিজেই মৌখিক প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই জনশ্রুতি এই যে, লবকুশই রামায়ণ গানের প্রথম গায়ক এবং সেই সূত্রেই প্রথম প্রচারক। তখন হইতেই রামায়ণ নানাভাবে যত মৌখিক প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, লিখিত হইয়া পুঁথির আকারে তত প্রচারিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য রামায়ণের মৌখিক ঐতিহ্যই অধিকতর শক্তিশালী। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদগুলি মূল বাল্মীকির রামায়ণ যতখানি অনুসরণ করিয়াছে তাহার মৌখিক ঐতিহ্যও তেমনই অনুসরণ করিয়াছে। সেইজন্য ইহার বিভিন্ন পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, প্রাদেশিক ভাষার অনুবাদগুলিতে এত বাংলাদেশেও যাঁহারা রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিষয়গত অনেক অনৈক্য দেখা যায়। সুতরাং কৃত্তিবাস সম্পর্কে গবেষণা করিতে গিয়া যাঁহারা তাঁহার মধ্যে বাল্মীকিকে খুঁটিনাটি করিয়া অন্বেষণ করেন, তাঁহারা কৃত্তিবাসের অনুবাদের চরিত্র সম্পর্কেই একটি মৌলিক ভুল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে কৃত্তিবাস কখনই বাল্মীকির রামায়ণটিকে আগাগোড়া সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার রামায়ণ অনুবাদ করিতে যান নাই, তাহা হইলে তাহা বাল্মীকির রামায়ণ হইতে পারিত, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অমর কাব্যের স্থান লাভ করিতে পারিত না।

বাংলাদেশে বাল্মীকি রামায়ণের মৌখিক ধারাটির কবে সৃষ্টি হইয়াছিল এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে এই দেশে রামায়ণ প্রচারের ইতিহাসই আলোচনা করিতে হয়, কারণ, যেইদিন এই দেশে কথকতা কিংবা অন্য যে কোনও সূত্রেই হউক প্রথম রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই তাহার লৌকিক ধারাটির সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, দেখা যায় যে, নিরক্ষরতা আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রচারে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এমন কি, সূক্ষ্মতম দার্শনিক তত্ত্বও আমাদের দেশের নিরক্ষর সমাজে সহজেই একদিন প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই দেশে তাহা প্রচারের একটি নিজস্ব পদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই পদ্ধতিটি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, তাহা আমাদের জনসাধারণকে আকর্ষণ করিতে পারিত; তাহার প্রভাব জীবনে কেবল মাত্র দীর্ঘস্থায়ীই হইত তাহা নহে, জীবনে সক্রিয় থাকিত।

বাল্মীকির কাল হইতেই যে ধারায় আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণ প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ ভারতবর্ষের সর্বত্রই কোন না কোনওভাবে প্রচলিত আছে। ইহার ঐতিহ্যের ধারার মধ্যে কোন দিন কোনও ছেদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উত্তরবঙ্গে কুশানে নামে রামায়ণ গানের একটি পদ্ধতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। কুশানে শব্দের অর্থ লবকুশের গান বা রামায়ণ গান। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ লবকুশরূপী দুইটি বালকের মাধ্যমে সমগ্র রামায়ণ গানের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। একজন যিনি মূল গায়েন থাকেন, তিনি বাল্মীকি বা গীত পরিচালকের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এক জাতি এক প্রাণ একতা

এঁরা মিলেমিশে
এক হয়ে গিয়েছেন

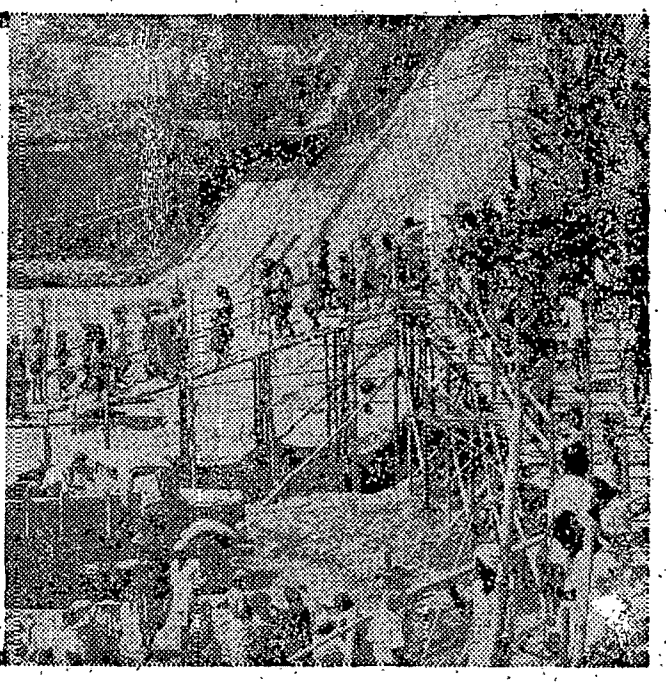

নির্মাণের কাজে...

ছাজ্জু একটা সেতু তৈরীর কাজে মজুর খাটছে . . . সঙ্গে ছেলে বউও আছে। শুধু ছাজ্জু কেন . . . আরও কত জন মজুর খাটছে তার মতো। তাছাড়া আছে ওভারশীয়ার, কনট্র্যাক্টার, ট্রাক ড্রাইভার।

এরা সব এসেছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে . . . কেউ রাজস্থান, কেউ হরিয়াণা, কেউ বাংলা আবার কেউ বা অন্ধ্র থেকেও। এরা যে যার ঘরে নিজেদের ভাষায় কথা বলে, নিজেদের মতো থাকে কিন্তু কাজের জায়গায় তাদের সকলের ভাষা এক আর তা হল কাজের ভাষা।

নির্মাণের প্রয়াসে অন্তরায় কোথায় ?

অলস মনই বাধার প্রাচীর। আমরা তা ভাঙতে পারি

davp 77/47 Ben.

বেণা নামক খুব প্রাচীন অথচ দেশজ একটি তারযন্ত্রই গীতি অনুষ্ঠানে একদিন একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ছিল, এখন অবশ্য অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ গানের এই ধারাটি অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে এই ধারাটি নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এই অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকি প্রবর্তিত ভঙ্গীটি ইহার মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও বাল্মীকির মূল রামায়ণ ইহাতে আদৌ অনুসরণ করা হয় না, রামায়ণ সম্পর্কিত যে সকল জনশ্রুতি উত্তর বাংলায় নানা সূত্র হইতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই প্রকার গায়কের মাধ্যমে পুরাণ কাহিনী প্রচার ব্যতীতও কথকতার মাধ্যমে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের যে একটি পদ্ধতি আছে, তাহাও ভারতের একটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন পদ্ধতি। বৈদিক যুগ হইতেই তাহার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। কথকতা এক হিসাবে সঙ্গীত, অভিনয়, সংলাপ এবং সরল ও সহজ ব্যাখ্যা। সকল কিছু প্রকাশভঙ্গীই ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকে বলিয়া ইহা একজনের পরিবেশনা সত্ত্বেও একঘেয়ে হইয়া উঠিতে পারে না। বাল্মীকি রামায়ণের বাংলাদেশে প্রচলিত হইবার প্রথম দিনটি হইতেই তাহা যে কথকতা কিংবা গানের মাধ্যমে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ, নিরক্ষরের সংখ্যা তখন আরও বেশী ছিল, সুতরাং লিখিত পুঁথির প্রচলন অপেক্ষা মৌখিক প্রচারই তাহার বেশী লক্ষ্য হইয়াছিল। কিন্তু কবে হইতে বাংলাদেশে রামায়ণের এই মৌখিক প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে এই দেশে বাল্মীকি রামায়ণ কবে হইতে পাঠান্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা বুঝিতে পারিলে বাংলাদেশে প্রচলিত সমস্ত বাংলা প্রাচীন পুঁথির মধ্যে রামায়ণ পুঁথিরই যে পাঠান্তর কেন এত বেশি তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে বাংলাদেশে প্রথম সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ করে। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে তাহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। কারণ, তখন হইতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে যে এই দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা আরম্ভ হয় নাই, তাহাও বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। প্রকৃত পক্ষে সপ্তম খৃষ্টাব্দে পাল রাজত্বের সময় হইতেই দেশে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়, তাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে পাঠান এবং মোঘল শাসনেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন সত্য, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহারা হিন্দুধর্মের এবং সংস্কৃত চর্চার উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম-বিষয়ে কোনও গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা ছিল না, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, তাঁহাদের শেষ কয়জন রাজা শৈবধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ পাল সম্রাটগণের রাজদরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত, মহারাজ অশোকের মত পালি ভাষা নহে। সেই সূত্রেই তাঁহারা পালিভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহাদের সমস্ত তাম্রশাসন এবং শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে, রাজকীয় ঘোষণা মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করা হইত। সেই সূত্রেই দেশে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হইতে থাকে। পাল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, বাহির হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত আনিয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি দান করিয়া মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়া তাঁহাদিগকে হিন্দু শাস্ত্র চর্চার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন। সেই সময়ই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে বাল্মীকি রামায়ণেরও চর্চা এবং জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রচারের সূচনা দেখা যায়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ নামক একজন বাঙ্গালী কবি, বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া 'রামচরিত' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। অভিনন্দ হরবর্ষ নামক একজন পাল-রাজের সভাকবি ছিলেন। অনেকে মনে করেন, হরবর্ষ এবং দেবপাল অভিন্ন ব্যক্তি, দেবপাল পাল-সম্রাট ধর্মপালের পুত্র। দেবপালের সমসাময়িক কালেই, মধ্য-যুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলের কবিই উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনব গুপ্তের 'রামচরিত'ই বাংলাদেশে রচিত রামায়ণ বিষয়ক প্রথম কাব্য, আনুপূর্বিক বাল্মীকি রামায়ণের ঘটনা অনুসরণ করিয়া ইহা রচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে ইহা রচনা করিবার কোনও সার্থকতা থাকিত না। দুই শতাব্দী পূর্বেই দেশে যে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে নানা সূত্র হইতে সেই সম্পর্কে রামায়ণ বিষয়ে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ ইতিপূর্বে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের যে ব্যাপক প্রভাব সমাজের উপর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া 'রামচরিত' রচিত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই শিল্প-সাহিত্যে বাংলাদেশে বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীর ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও যে তাহা আরও পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে; কারণ, রামায়ণ রচিত হইবার পর ভারতের দুইটি প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম সমগ্র দেশে বিশেষতঃ পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতের সকল প্রদেশেই তখন হইতেই বাল্মীকির কাহিনীর মধ্যে নানা সমসাময়িক বিষয়ের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ জাতকের রামায়ণ কাহিনী কিংবা জৈন রামায়ণ ইত্যাদির প্রভাব হইতে বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম পরবর্তী রামায়ণ কিছুতেই সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারে নাই। বাংলাদেশে পাল রাজগণ তখন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার উৎসাহদাতা হইলেও দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও যে অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়াঙ চুয়াঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায়।

অভিনন্দ বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু এই তিনদিক হইতেই প্রভাবিত সমাজ-মানসের উপরই তাঁহার 'রামচরিত' রচনা করিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র বাল্মীকি রামায়ণের অন্ধ অনুকরণ করিয়া কাব্য রচনার কোনও প্রেরণা থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায়, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পাঁচশত বছর আগে হইতেই বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীতে এই দেশে ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমাগত এই বিবর্তনের ধারা চলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ অনুবাদ করিতে গেলেন, তখন পর্যন্ত বাল্মীকির রামায়ণের অতিরিক্ত রামায়ণের এক বিপুল দেশজ উপাদান নিজের হাতের মধ্যে পাইলেন, তাহা তখন এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই কথা সত্য, অভিনন্দ যখন তাঁহার 'রামচরিত' রচনা করেন, তখনও বাংলা ভাষা নিজস্ব রূপ লাভ করে নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জীবন, সমাজ এবং জাতীয় শিল্প সম্পর্কে বাঙ্গালী মানস বা বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। অভিনন্দের 'রামচরিতে' তাহারই প্রথম

প্রকাশ ঘটিয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনী এইখানেই প্রথম বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কৃত্তিবাস সেই পথেই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। এইখানেই বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রকে দিয়া কৃত্তিবাসের শক্তি বা চণ্ডী পূজার প্রথম বীজ রোপণ করা হইয়াছিল কৃত্তিবাসে তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে মাত্র।

কৃত্তিবাসের পূর্বে অভিনন্দের 'রাম-চরিত'ই এই দেশে রামায়ণ বিষয়ক একমাত্র সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল না। অভিনন্দ অপেক্ষাও এই বিষয়ক আরও একটি সংস্কৃত কাব্যের কবি অধিকতর জন-প্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যও 'রামচরিত' নামে প্রচলিত। ইহার রচয়িতার নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। ইহা একটি দ্ব্যর্থক কাব্য। পাল সম্রাট রামপাল ও রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র একসঙ্গে এই দুইটি চরিত্রের গুণ বর্ণনাই এই কাব্যের লক্ষ্য, ইহাতে এক একটি শ্লোকের রামপালের পক্ষে এক অর্থ এবং রামচন্দ্রের পক্ষে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। ইহার মধ্যে কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের উপরই বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যও এমন নিপুণভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে কাব্যখানি পাল রাজত্বের একটি প্রামাণিক ঐতিহাসিক দলিলরূপে গৃহীত হয়। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে রামায়ণের প্রচার যে অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে, তাহা কাব্যখানির উদ্দেশ্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ পালরাজা রামপালকে এখানে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

পাল-রাজত্বের পতনের পর সেন-রাজত্বে যে রামায়ণের প্রচার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, সেনরাজগণ সংস্কৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সেনরাজদিগের একজন সভাকবির নাম ছিল ধোয়ী। তিনি তাঁহার 'পবন-দূতম্' নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে রামচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, রামোপাসনা এই যুগে বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তার অর্থই এই যে তাহা সাধারণের রুচির অনুগামী করিয়া রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং তখন হইতেই রামায়ণ কাহিনী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রয়াস অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। যদি রামায়ণ কাব্য সেদিনকার ক্ষুদ্র একটি সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত, তবে বাল্মীকির রচনাটি অকৃত্রিম থাকিবার সুযোগ পাইত কিন্তু বৃহত্তর সমাজের সমতল স্তরে তাহা প্রচার লাভ করিবার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তাহা লৌকিক উপাদানে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পূর্বে এই কাজের সূচনা হইয়া তাহা কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে তিনিও তাহার কোনো ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিতে পারিলেন না। সেইজন্য কৃত্তিবাস বাল্মীকির নিকট আত্ম বিক্রয় না করিয়া জাতীয় জীবনের ধারায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের সময় পর্যন্তই বাংলাদেশে রামোপাসনার ধারা সক্রিয় থাকিলেও দেখা যায়, ইহার পর হইতেই তাহা কৃষ্ণোপাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবই যে তাহার কারণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। তারপর হইতে রামায়ণ কাব্য বৈষ্ণব প্রভাব দ্বারা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে চিহ্নিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই নানা লৌকিক উপকরণের প্রভাব ইহার উপর গিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তখন হইতে বৈষ্ণব প্রভাব ইহার উপর অনিবার্য এবং অব্যাহত হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে রামোপাসনা কৃষ্ণোপাসনার স্থান গ্রহণ করিল। একদিকে শাক্ত প্রভাব আর একদিকে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে বাল্মীকির রামায়ণ বাংলাদেশে

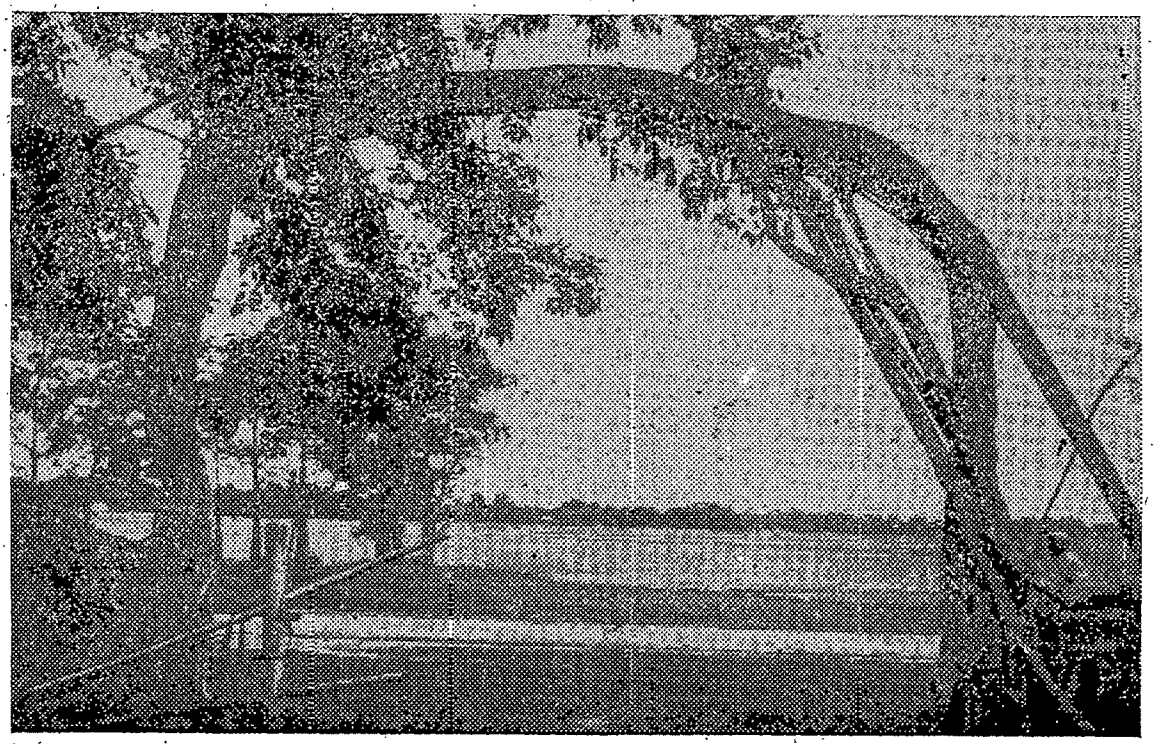

স্বনির্মিত তোরণ : মানুষের প্রচেষ্টায় নয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেজপুর ও চৌকিয়াজুলির মাঝপথে একটি বট-গাছের ডাল আপনা থেকেই এইভাবে এক বৃহৎ তোরণের রূপ নিয়েছে। ছবি : আলোছায়া স্টুডিও

বাল্মীকিকে পুনরায় বাল্মীকের আবরনে গোপন করিয়া দিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে হিন্দু রাজত্বের আকস্মিকভাবে অবসান ঘটিয়া গেলে দেশ তুর্কীদের দখলে চলিয়া গেল, সংস্কৃত ভাষার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতারও সমাপ্তি ঘটিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দ্বারাই বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ হইল। বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার প্রেরণা দেখা দিল। বাংলা ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করিল, সুতরাং এই বিষয়ে আর কোনও অসুবিধার কারণ রহিল না। কৃত্তিবাস এই পরিবেশের মধ্যেই সহজ বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করিলেন। তখন হইতে নিরক্ষর সমাজের মধ্যে রামায়ণের প্রচার কর্ম আরও সহজ হইল। পূর্বে যাঁহারা রামায়ণের কথকতা করিতেন, তাঁহারা সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, মূল সংস্কৃত হইতে রামায়ণের কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের পর হইতে রামায়ণ কাহিনী প্রচার করিবার জন্য কোনও পণ্ডিতের প্রয়োজন রহিল না। সাধারণ অল্পশিক্ষিত এমন কি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত কোনও গ্রাম্য গায়েনও রামায়ণের কাহিনী মুখে মুখে শিখিয়া লইয়াও আসরে দাঁড়াইয়া পরিবেশন করিতে পারিত।

বাল্মীকির মূল কাহিনীর প্রতি ইহাদের কোনও আনুগত্য রহিল না; এই বিষয়ে পল্লীর গায়েনরা সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য এবং নিরঙ্কুশ হইয়া বাল্মীকির নামে বাঙ্গালীর সেবা করিতে লাগিলেন। কথক ঠাকুরেরা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের সামনে একটি পুঁথি থাকিত, পুঁথি হইতে তাঁহারা মূলতঃ ভ্রষ্ট হইতেন না; কিন্তু প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য গায়েনগণ তাঁহাদের পরিবর্তে নিজেরা আসরে দাঁড়াইয়া কেবল মাত্র একটি চামর দুলাইয়া, কখনও কখনও পায়ে বাঁধা নূপুরের একটু গুঞ্জন তুলিয়া বাল্মীকি ত বটেই কৃত্তিবাসকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মৃদু মৃদু নৃত্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে বাল্মীকির রামায়ণের চরিত্রের নামগুলি থাকিত, কিন্তু তাহাদের আচরণগুলি থাকিত না, আচরণগুলি বাঙ্গালী জীবনের ঘরের মধ্যে তাঁহারা উঁকি দিয়া দেখিয়া লইয়া তাহাই বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের নামে চালাইতেন। এইভাবে একদিন ছিল যাহা একান্ত দূরের তাহা বাঙ্গালীর ঘরের হইয়া উঠিল; সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদয় তাহাতে সাড়া দিতে আর কোনো আপত্তি করিত না।

মূলতঃ বাঙ্গালী শক্তিসাধক, তাহাকে মাতৃসাধকও বলা যায়। শাক্তসাধনা ও মাতৃসাধনা পুরাপুরি এক বিষয় নয়। শক্তিসাধনার মধ্যে শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও প্রকৃত পক্ষে অন্ধ। কিন্তু মাতৃসাধনার মধ্যে শক্তির মধ্যে করুণাও যুক্ত। শক্তিসাধনা তান্ত্রিকের, কিন্তু মাতৃসাধনা গৃহীর। বিশ্বজননীর মধ্যে বিশ্বশক্তির উপলব্ধিই মাতৃসাধনা। বাল্মীকি রামায়ণের সীতা চরিত্র উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বাল্মীকি সেই দৃষ্টি দিয়া সীতা চরিত্র প্রত্যক্ষও করিতে পারেন নাই। কিন্তু মাতৃসাধক বাঙ্গালী সীতা চরিত্রের মধ্যে নূতন মর্যাদা আরোপ করিয়াছে। ভাগবত পুরাণের মধ্য হইতে যেভাবে বাঙ্গালী রাধা চরিত্রের সন্ধান করিয়া লইয়াছিল, অদ্বৈত সাধনার মধ্যেও যেমন ব্রহ্মময়ী কালিকার সন্ধান পাইয়াছিল, তেমনি সীতা চরিত্রের মধ্যে বাঙ্গালী এক মহাশক্তির রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস হইতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত সীতা চরিত্র যে এতখানি সহানুভূতি দিয়া বাঙ্গালী কবি কল্পনা করিয়াছিল, তাহার কারণ ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। সীতা চরিত্রের এই আদর্শ লৌকিক রামায়ণের স্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মাতৃভাবে পূজা করিবার জন্য রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া অশোক বনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাংলার এক পল্লীকবি এই কথা বলিয়াছেন। সীতার চরিত্র পল্লীকবি কিংবা নাগরিক কবি সকলের পরিকল্পনাতেই মহত্তর হইয়াছে। সুতরাং বাংলার লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি যে সর্বদাই নিম্নগামী হইয়াছে, তাহাই নহে, তাহা অনেক সময় ঊর্ধ্বগামী হইয়া আকাশ স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণের কাহিনী প্রচারের যে কত পদ্ধতি আজও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। জমিদারী প্রথা লোপ পাইবার পর কথকতার মধ্যে দিয়া রামায়ণ প্রচার লোপ পাইয়া গেলেও নিরক্ষর গায়েনেরা চামর দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া এখনও গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান গাহিয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোকসঙ্গীতে এখনও রামকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, বিশেষত মেয়েলী বিবাহের গানে রামচন্দ্রই সর্বত্র এখনও নায়ক, সীতা নায়িকা। প্রেম-সঙ্গীতে রাধা কৃষ্ণের নাম থাকিলেও আচার মূলক বিবাহ সঙ্গীতে এখনও রাম-সীতারই পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়। পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশ রাঢ় অঞ্চলের রামলীলা ঝুমুর গানে রামায়ণের কাহিনী বাঙ্গালীর পল্লী জীবনের আদর্শ অনুযায়ী রচিত হইয়া এখনও হাজার হাজার কণ্ঠে গীত হয়। পটুয়ার গানে রামায়ণের কাহিনী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়, কাহারও গৃহে বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এখনও রামায়ণ গান করানো পল্লী জীবনের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, পল্লীর রামপাঁচালী, রামযাত্রায় রামায়ণ কাহিনীর একটি প্রত্যক্ষ রূপ ফুটিয়া উঠে, পুরুলিয়া জেলার মুখোস-পরা ছৌনৃত্যে রামায়ণ নৃত্যনাট্যেরই অনুষ্ঠান হয়। নিম্নবঙ্গের পুতুল নাচেও রামায়ণ কাহিনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, উত্তরবঙ্গের কুশান নৃত্যনাট্যও রামায়ণ কাহিনীভিত্তিক পূর্ব বাংলার চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সেই অঞ্চলের গৃহস্থবধূদিগের আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে এখনও মুখে মুখে প্রচলিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া রামকাহিনী বাংলাদেশে যে আজ কি বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সাক্ষাৎকার

সৃষ্টিধর ভট্টাচার্যের ডায়ারী থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
কর্তৃক

॥ আশু মুখুজ্জে ॥

বাল্যকালে আমার পিতা পুরুলিয়া অঞ্চলের কানুনগো ছিলেন। তখন এই জেলা সবে ইংরাজ সরকারের অধীনে এসেছে, কাজেই জরিপের কাজটা জরুরি ছিল। তাঁবু গাঁয়ে চলে পাহাড়ে ঘুরে আর দশ বারোজন আমিনের সঙ্গে তিনি জরিপ করে বেড়াতেন, সঙ্গে থাকতো পাইক আর জন দুই বন্দুকধারী বরকন্দাজ। বাঘ, ভালুকের ভয়, খুনো মানুষের ভয়। তাঁরা চলাচল করতেন ঘোড়ায়, আর তাঁবু ও লটবহর খচ্চর বা গরুর পিঠে। কাশিপুর বলে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে ছিল আমাদের বাসা। সেখানে অনেক অসুবিধার মধ্যে মস্ত সুবিধা এই যে, দশ বিশ মাইলের মধ্যে কোন স্কুল ছিল না, একটন পাঠশালা পর্যন্ত না। কাজেই আমার চিরন্তন অনধ্যায়। মা নিজেই লেখাপড়া জানতেন না আমাকে শেখাবেন কি। মাসখানেক পরে পরে বাবা কাশিপুরে আসতেন, থাকতেন ৭/৮ দিন। কঠিন পরিশ্রমের ফলে তখন তাঁর শরীর এমন ক্লান্ত থাকতো যে পড়াবার বদলে আমাকে দিয়ে তিনি গা হাত পা টিপিয়ে নিতেন। মা পড়াতে বললে উত্তর পেতেন গুরুর সেবাতেই যথার্থ জ্ঞান হয়, কেন ঐ ভক্ত আরুণীর উপাখ্যান জানো না। মা ওসব নাম এই প্রথম শুনলেন, আসিও। গুরুবাক্য একেবারে মিথ্যা হয়নি। শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে বি-এ পাশ করেছিলাম। তবে তা কতটা গুরুর আশীর্বাদের কতটা অভাবের তাড়নায়, মানসাঙ্ক কষে স্থির করতে পারিনি। বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মা দুঃখ করতেন তবে কি ছেলেটা মুখ্কো হয়েই থাকবে? ছেলে তো ঐ একটা মাত্র।

দুটো ছেলে থাকলে দুটোই মুখ্কো হ'তো সেটা কি ভালো হতো।

তোমার যেমন কথা—বলে মা হেসে গৃহকার্যে যেতেন, অনেকক্ষণ রাগ করে থাকতে তিনি পারতেন না।

তুই সারাদিন কি করিস?

আমি উত্তর দেবার আগেই মা গৃহান্তর থেকে এসে বললেন, করবে আর কি, সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘোরে পলাশ গাছ আর কুল গাছ থেকে খুঁজে খুঁজে গুটিপোকা নিয়ে আসে। কাজের মধ্যে তো এই।

মস্ত কাজ গিন্নি, মস্ত কাজ। খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করবার মতো জিনিষ বের করা এ কি কাজ নয়?

কি করে গুটিপোকা দিয়ে?

গুটিপোকা দিয়ে নয়, এই অভ্যাসটা যদি থেকে যায় তবে এরপরে খুঁজে খুঁজে মানুষ বের করবে যারা মানুষের মতো মানুষ।

তারা কি ওকে খাওয়াবে পরাবে?

কে বলতে পারে।

সেদিন বাবার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এখন গুটিপোকার বদলে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন অনেক লোককে দেখলাম যাঁদের একবার দেখলে ভুলতে পারা যায় না। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, মহর্ষি, পরমহংস, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, তিলক, আশুতোষ, অরবিন্দ, গান্ধী। বিধাতাপুরুষ আমাকে জ্ঞানগম্যি তেমন দেননি, তার বদলে দিয়েছিলেন দীর্ঘ পরমায়ু, ১৮৪০ সালে জন্মে এখনো মোটামুটি স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছি—আজ ১৯১৫ সাল। আশু মুখুজ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আশায় এসেছি কলকাতায়। কেন এলাম আগে বলে নিই।

সংসারে সবচেয়ে কঠিন কাজ সংসারকে চিনতে পারা। আমি তো সারা জীবনে পারলাম না। এর জন্যে হয়তো জন্মান্তরের প্রয়োজন হবে কিন্তু ইতিমধ্যে এমন সব নূতন সূত্র এসে পড়বে যে আবার জন্মান্তরের প্রয়োজন হবে! আচ্ছা। তত্ত্ব ছেড়ে তথ্যে আসা যাক। কোন লোক দারপরিগ্রহ না করে সংসারের দায় এড়াতে গেলে তার ঘাড়ে এসে পড়ে বহুল-যোগ্যাতীত দায়। সবাই বলে আরে তোমার তো ছাড়া হাত পা, মুক্তপুরুষ বললেই চলে। এই বাপ-মা মারা ছেলেটার ভার নাও তো। সংসারে বাপ-মা মারা ছেলের সংখ্যা অসংখ্য এখন তাদের জনকয়েক তোমার ঘরে এসে উপস্থিত হ'লে মনে পড়ে যায় এর চেয়ে বিয়ে করা ভালো ছিল। তখন বিয়ের বয়স গিয়েছে, মায়নি পরের ছেলে লালন করবার বয়স। তাছাড়া গাঁয়ের যত ফালতু কাজের ভার এসে পড়ে, তেমনি একটি কাজের ঠেলায় আসতে হয়েছে কলকাতায়।

আরও একটা কথা। যদি জানতে পারে, এ সব তথ্য প্রায়ই অজানা থাকে না, যে তুমি পেন্সন পাও, তবে আর্থিক দাবীও এসে পড়ে। ঐ ছেলেটার বাপের বড় দুরবস্থা, ছেলেটার স্কুলের বেতনটা চালাও। পাছে ছেলেটা সশরীরে আমার সংসারহীন সংসারে এসে ভর্তি হয় তাই রাজি হতে হয়। তুমি কত পেন্সন পাও কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। সকলেরই ধারণা বড়লাটের বেতনের মতো পেন্সন অফুরন্ত উৎস। পেন্সন তো পাই কুল্লে একান্ন টাকা। তাতে কোন রকমে একের অন্ন চলে তবে যেহেতু আমার পরিবারটি দাঁড়িয়েছে একান্নবর্তী তাই অচল।

কিছুকাল আগে ঐ একান্নটা এক শতে দাঁড়িয়েছে রবিবাবুমশায়ের দয়ায়। একদিন তিনি ডেকে বললেন, ওহে সৃষ্টিধর, দেশের কাজে অনেক দুঃখবরণ তুমি করেছ, বরিশালে লাঠির আঘাত শিরোধার্য করেছ, সুরাটে করেছ চেয়ারের আঘাত বাহুধার্য, আর মজঃফরপুরে পায়ে খোঁড়া হতে বসেছিলে লাঠির ঘায়ে। এ সমস্তই দেশের জন্যে। এখন এজন্যে পুরস্কার দানের ভার যদি দেশের লোকের হাতে থাকতো তবে তুমি নিশ্চয় পুরস্কৃত হতে। যাই হোক আশু যখন সে সম্ভাবনা নেই আমিই তোমার মাঝপথে থেমে থাকা পেন্সনটাকে শতক পূরণ করে দিলাম।

রবিবাবুমশায়ের কথা বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। আমি আর কি বলবো—মাথা নীচু করে থাকলাম, ভয় হচ্ছিল পাছে চোখের জল ধরা পড়ে যায়। চোখের জল বড় অবাধ্য।

তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে

বললেন, এবারে তুমি নিশ্চিন্ত মনে লিখতে পারবে, অর্থ চিন্তা পরমার্থ চিন্তার বিঘ্ন। লেখকের পক্ষে লেখাটাই পরমার্থ। বুঝি হে বুঝি, তুমিও লেখক, আমিও লেখক।

এতক্ষণ নীরবে শুনছিলাম, এবারে আর কথা না বলে পারলাম না, বললাম, আমার কি এসব লেখা, যত সব হিজিবিজি।

ওহে আমার লেখাকেও অনেকে হিজিবিজি বলে, বলে কিচ্ছু বুঝবার উপায় নেই।

বললাম, অন্য রকম বলে এ রকম লোকের সংখ্যাও অগণ্য।

ওহে তারা মোটেই গণ্য নয় বলে রবি-বিরোধী রাহুর দল।

ভেবেছিলাম পেন্সনের শতকিয়া পূরণ ব্যাপারটা গোপন থাকবে। কিন্তু গ্রাম্য ডাকঘরে কিছু কি গোপন থাকতে পারে, অবিলম্বে শতমুখে প্রচারিত হল শতকিয়া সংবাদ—যার ফলে অচিরকাল মধ্যে আমার সংসারে পোষ্য ছাত্রের সংখ্যা পৌঁছালো দশকিয়ায়।

এবারে আসল কথায় আসা যাক। একদিন সুপ্রভাতে আমাদের গ্রামের হাই স্কুলের হেড-মাষ্টারমশায় আমার গৃহে এসে দেখা দিলেন। বললেন, প্রাতঃপ্রণাম খুড়ো, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে, সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত তোমাকে ছাড়া তো আর লোক দেখিনে।

বুঝলাম দশটি অনাত্মীয় পোষ্য পোষণ কোন কাজ নয়।

দ্যাখো খুড়ো, গ্রামের সকলের ইচ্ছা এখানে একটা কলেজ স্থাপিত হোক।

ভাবলাম সকলের মধ্যে আমি পড়ি না, কারণ মুখে বা মনে এসব ইচ্ছা কখনো প্রকাশ করিনি; উচ্চশিক্ষার আমি বিরোধী নই, কিন্তু সেই অজুহাতে পোষ্য ছাত্রের সংখ্যা উচ্চতর হবে আর তা হবে আমার ঘরেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

এ বিষয়ে একবার কলকাতায় গিয়ে আশু মুখুজ্জেকে ধরতে হবে।

আবার ভাবলাম বাঘের মুখে গিয়ে প্রাণ হারালে অনাথ ছাত্র দশটি পুনরায় অনাথ হবে।

আর দ্যাখো খুড়ো যাকেই পাঠাবো খরচ দিতে হবে, মায় ষ্টার থিয়েটারের খরচ। তোমাকে পাঠালে সে ভাবনা নেই—তুমি তো এখন ডবল পেন্সন ভোগ করচ বলে হো হো করে হেসে উঠলো।

সংসারে 'ভালো মানুষের' অসাধ্য কিছু নেই, কলকাতায় এসেছি 'বাংলার বাঘের' মুখ থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যে।

কলকাতায় এসে উঠলাম শেয়ালদা ষ্টেশনের নিকটবর্তী আর্য নিবাস হোটেলে। এখানেই উঠে থাকি। হোটেলের হেড চাকর সদা অর্থাৎ সদানন্দ আমার মুরুব্বি, হোটেলে যারা ওঠে সকলেরই। সে শোনালো বাবু আপনার ৩ নম্বর ঘর ঠিক আছে। সে তো ঠিক আছে কিন্তু আসল আজের কি করা যায়। আশু মুখুজ্জেকে ধরি কি উপায়ে। হেজিপেজি লোক নয়, হাইকোর্টের জজ, তার উপর আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। কোথায় কি ভাবে ধরা যায় লোকটিকে? হাইকোর্টে গিয়ে ধরা সম্ভব নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে দেখা পাওয়া যেতে পারে—শব্দটা যত বড়ই হোক ওর মধ্যে বিদ্যালয় শব্দটা যুক্ত থাকায় কিছু ভরসা পেলাম। দুপুরের দিকে সিনেট হাউসে গিয়ে শুনতে পেলাম বিকালের দিকে আসেন। বিকালের দিকে একদিন শুনলাম লাটসাহেবের বাড়ীতে গিয়েছেন, আর একদিন শুনলাম সিণ্ডিকেটের মিটিঙে আছেন। মিটিঙ কখন ভাঙবে? স্বাভাবিক নিয়মে তো ভাঙে না তবে হঠাৎ লৈব দুর্বিপাক হলে আজকার মধ্যে অবশ্যই ভাঙবে। বেকায়দায় পথে ঘুরে ঘুরে রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম একটু জলপান করলে ভালো হতো। বউবাজার দিয়ে যাচ্ছি চোখে পড়লো একটি সন্দেশের দোকান, মালিকের নাম ভীমচন্দ্র নাগ। দোকানে ঢুকে এক গেলাস জল চাইলাম, একটি ছোকরা চাকর চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল বসুন। তারপরে বলল আর কি দেবো। দেখলাম যে কলকাতার মিষ্টান্ন বিক্রেতারা অতিশয় সজ্জন, শুধু জল দেন না; সঙ্গে মিষ্টান্ন দেন, অবশ্য মূল্যের বিনিময়ে। পেন্সনার্জিত অর্থের বিনিময়ে ক্রীত সন্দেশটির ধীরে ধীরে স্বাদ গ্রহণ করছি এমন সময় দোকানের মধ্যে একটি চঞ্চলতা অনুভব করলাম। মালিক এসে স্বস্থানে দাঁড়ালেন, ছোকরা চাকরের দল আচারে ও আচরণে সংযত হয়ে পড়লো, ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই সন্ত্রস্তভাব—চাপা গলায় ফিসফিস শব্দ, সেই শব্দসমূহ থেকে চোলাই হয়ে একটা শব্দ কানে প্রবেশ করলো: জজসাহেব। এমন সময় একখানা জুড়ি গাড়ী এসে দাঁড়ালো, অমনি হাতজোড় করে, বিনীত হাসি হেসে মালিক গাড়ীর দরজায় গিয়ে নমস্কার করলো, একজন সুবেশ ছোকরা ছোট এক চাঙাড় সন্দেশ তুলে দিল ভিতরে, আর একটি ছোকরা একটি বড় রূপোর গ্লাস ভর্তি জল দিল গাড়ীর ভিতরে। কে এই লোকটি? সমস্ত দোকানের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই লোকটি কে? জজসাহেব তো কতই আছে। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারলাম। ও বাব্বা। কি চোখ। দু'খণ্ড জলন্ত অঙ্গার, গাড়ীর ঢাকনার অন্ধকারে অধিকতর উজ্জ্বল। গাড়ী চলে গেল। ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে কথোপকথনের ভগ্নাংশ কানে আসছিল, বেঙ্গল টাইগার, বাংলার বাঘ, সাহেবদের যম, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। একজনের প্রশ্নের উত্তরে মালিক জানালো এক নম্বর কাঁচাগোল্লা এক সের মাপো। এ যে খেতে দিনভর লাগবে। তবেই চিনেছেন, আশু মুখুজ্জেকে—সিনেট হাউসে পৌঁছতে পৌঁছতে চাঙাড়ি শেষ। আর নেমেই এক গেলাস জল—সে রূপোর গেলাস-টাও আমরা তৈরি করে দিয়েছি। এ গেলাসটাও বুঝি আপনারা তৈরী করে রেখেছেন? রাখবো না। জজসাহেবকে কি মাটির গেলাসে জল দেওয়া যায়। আমি স্তব্ধ। ঐ চোখজোড়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। এখনো দোকানে কথোপকথনের ভগ্নাংশ চলছিল—হাঁ দু'জন মানুষ জন্মেছেন বাংলা দেশে বিদ্যাসাগর আর আশু মুখুজ্জে। চোখে এই আগুন জলছে, এই জল ঝরছে, ছাত্র আর শিক্ষকদের মা-বাপ।

মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা নিয়ে গাড়ী ঘোড়া ও হোঁচট বাঁচিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। মুরুব্বি সদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওহে আশু মুখুজ্জের বাড়ী যাওয়া যায় কেমন করে?

সে নির্বিকারভাবে বলল, কেন, চৌরঙ্গিতে গিয়ে ভবানীপুরের ট্রামে চাপুন, নেমে পড়ুন চাউলপটি রোডের ষ্টপে—ব্যস, জিজ্ঞাসা করুন যাকে প্রথম চোখে পড়ে, দেখিয়ে দেবে আশু মুখুজ্জের বাড়ী। এর জন্যে ভাবনা কি বাবু। মনে মনে ভাবলাম হায় সদানন্দ পুরুষ, তুমি কেমন করে বুঝবে আমার কি ভাবনা।

সে রাতে ভালো ঘুম হ'ল না, বারে বারে ঘুম ভেঙে যায় ঐ চোখজোড়ার জলন্ত স্মৃতিতে। আবার জেগে থাকলে ঘরের মধ্যে ঐ চোখ জোড়া ভেসে বেড়ায়। দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রাত কেটে গেল। ভোরবেলা সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিয়ে মা ভবানীকে স্মরণ করে রওনা হলাম ভবানীপুরের দিকে।

(পরবর্তী অংশ ছিন্ন। সম্পাদক)

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের অঙ্কনচর্চা সম্পর্কে কন্যার রচনা

আমার বাবার ছবি আঁকা

॥ নীলা মুখোপাধ্যায় ॥

ভাষাতাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক, মানব-প্রেমিক এমন কি ভোজন-রসিক প্রভৃতি বিশেষণগুলোর সঙ্গে আমার বাবা আচার্য সুনীতিকুমারের যোগ অনেকেই জানেন। শিল্পরসিক শিল্পী-দরদী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। কিন্তু শিল্পী সুনীতিকুমার বোধহয় অনেকের কাছেই অপরিচিত। বাবার শিল্পসাধনা বা ছবি আঁকার ব্যাপারটা তাঁর একান্ত নিজস্ব ছিল, এর প্রচার কোথাও করেছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর কোন রচনায় এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে বলেও জানি না।

ভাষাতত্ত্বের সাধক আমার বাবা ভাষার নিছক নীরস বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে প্রাণবন্ত করে গেছেন তার সঙ্গে বিভিন্ন জাতির শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানের মাধ্যমে। কোন দেশের ভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে সে দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছুই বাবার চর্চার বস্তু হয়ে পড়ত। বাবার কাছে ভাষাতত্ত্ব ছিল পেশা, কিন্তু জীবনের আসল রস ছিল শিল্পচর্চা।

শিল্পের প্রতি তাঁর যে কি পরিমাণ অনুরাগ ছিল তা ধারণার বাইরে। বাবার ডাইরি, নোটবুক, বইপত্র, লেখার খাতা বা কাগজ-পত্র সব কিছুর মধ্যেই তাঁর প্রিয় শিল্পীদের আঁকা ছবির ছোট ছোট প্রিণ্ট বা সুন্দর কোন শিল্প নিদর্শন ইত্যাদি থাকত। সময়ে-অসময়ে ওগুলো দেখা, মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে উঠে আলো জেলে সেগুলো দেখে আবার শুয়ে পড়া এত তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু লিখছেন, হঠাৎ উঠে গিয়ে সংগৃহীত শিল্প-দ্রব্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। কোন মূর্তিকে

বাবার সঙ্গে লেখিকা।
(১৯৫১ সালে তোলা)

একটু এগিয়ে আনলেন, কাউকে পিছিয়ে দিলেন, কাউকে বা বেশী প্রাধান্য দেওয়ার জন্য পিছনে একখণ্ড সাদা কাগজ রেখে দিলেন, দু'-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলেন, আবার গিয়ে লেখা শুরু করলেন। কালো পাথরের উপর খোদিত হর-পার্বতীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বাবা বলতেন, "আমার উপাসনার কাজ হয়"। এর থেকে বোঝা যায় শিল্প তাঁকে কোন আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হোত।

শিল্পী হিসাবে বাবার পরিচয় দিতে গিয়ে শিল্প যে বাবার জীবনে সমস্ত কিছুই জুড়ে বসেছিল এ-কথা বার বার উল্লেখ না করে থাকা যায় না। স্কুল-কলেজের জীবন থেকেই ছবি মূর্তি ইত্যাদি দেখার জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল। মতি শীলের ফ্রী স্কুলে লেখাপড়া করতেন, পয়সা-কড়ির স্বাচ্ছন্দ্য মোটেই ছিল না; এ অবস্থাতে বহু দূর পায়ে হেঁটে মিউজিয়াম-এ ছবি, মূর্তি ইত্যাদি দেখতে আসা একটা নেশার মত ছিল। দেশ-বিদেশের ইতিহাসের প্রতি সহজাত আকর্ষণ থেকেই শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বাবার মনে আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ঠিক কবে থেকে ছবি আঁকা শুরু করেন না জানা থাকলেও কলেজ-জীবনে নাটক বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকগুলির (চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি) পোশাক-পরিচ্ছদ সঠিক কি ধরনের হওয়া উচিত তার জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম ঘুরে সেই সময়ের সৈনিক, প্রজা, নারী, রাজন্যবর্গের ছবি থেকে তাদের অঙ্গসজ্জা পোশাক ইত্যাদি অতি যত্নে স্কেচ করে আনতেন, সেই মত নাটকের পোশাক ইত্যাদি প্রস্তুত হত। শুনেছি বাবার বিশেষ বন্ধু শিশির ভাদুড়ী তাঁর সীতা প্রভৃতি নাটকের পোশাক ইত্যাদির ব্যাপারে বাবার স্কেচ এবং পরামর্শ নিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে থাকার সময় শুনেছি ক্লাসে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখতেন ব্ল্যাকবোর্ডে কোন ছাত্র কিছু ব্যঙ্গচিত্র আঁকার চেষ্টা করছেন। সেই ছাত্রকে দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করিয়ে নিজে দৃঢ় পরিচ্ছন্ন রেখায় কিছু এঁকে সকল ছাত্রকে চমকে দিয়েছেন।

আমাদের ছোটবেলার বহু স্মৃতি বাবাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। সারাদিনের অধ্যাপনার কাজক, মিটিং ইত্যাদি সেরে সন্ধ্যার পর সময়টা ছিল আমাদের জন্য, সুর করে পাঠ করতেন নানা ভাষার কাব্য-মহাকাব্য। ছবি আঁকতেন আমাদের ফরমাস মত। কখনও বা কাগজে, কখনও বা ঘরের মেঝেতে চক দিয়ে। কুমীরের পিঠে বাঁদর চড়ে নদী পার হচ্ছে, হনুমান কলা খাচ্ছে তার বিরাট লাঙ্গুল কাঁধে ফেলে বা গণেশ অথবা হাতি পিছনে হাত রেখে পা তুলে নাচছে। ছবির বক্তব্যই ছিল তখন আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দের। রেখার বলিষ্ঠতা বা কিরূপ দ্রুত গতিতে অবলীলাক্রমে যে সেগুলো আঁকতেন এটা চিন্তা করার বয়স তখন আমাদের হয় নি। পরবর্তীকালেও দেখেছি, বিশেষ মন দিয়ে কিছু লিখছেন কিম্বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে গুরুগম্ভীর কিছু আলোচনা করছেন, গিয়ে হাজির হয়েছি, খাতা নিয়ে কাগজের টুকরো নিয়ে আবদার ধরেছি ছবি আঁকতে—বিরক্ত না হয়ে তখনই কথা থামিয়ে লেখা বন্ধ করে সেই কলম দিয়েই কাগজে এঁকে দিয়েছেন পালকীতে বউ চলেছে, ঘোড়সোয়ার বর পরে হাতে বল্লম ধরে ছুটে চলেছে, কি। শিবাজী তাঁর গুরুর সামনে নতমস্তকে বসে আছেন ইত্যাদি। রেখার উপর অসামান্য দখল ছিল অর্থাৎ "সরল রেখাপাতের উপযোগী হস্ত-শক্তির" অধিকারী ছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সেই একটানে নির্ভুল বৃত্ত আঁকার গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাবার আঁকা প্রায় গোটা পঁচিশ-তিরিশ স্কেচ আছে, সবগুলোই প্রায় কলমে আঁকা রেখাচিত্র; দু'-একটি পাথরের উপর বিশেষভাবে খোদাই করা মর্থ—রং-এর ব্যবহার করতে বাবাকে দেখি নি। অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বাবা—কিন্তু আমি সঠিকভাবে বলতে পারি না শিল্পী নন্দলাল বা অবনীন্দ্রনাথ বাবার ছবি আঁকার প্রতিভার কোন খবর জানতেন কি না॥ বাবার জীবনে এঁদের প্রভাব খুবই ছিল॥ এঁদের শিল্পের আধ্যাত্মিক ভাব তাঁকে যে অপার্থিব অমৃতের স্বাদ দিয়েছে তার কথা বাবা সব সময় স্বীকার করতেন। এখানে একটা সম্ভাবনা আমার মনে হয়—বাবার কাছে শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, "উট মুট ঘোড়া—তিন শিল্পের গোড়া"। বাবাও সেইমত উট, মুট (অর্থাৎ মুখ), ঘোড়া আঁকায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

সীল এবং সিম্বল বা প্রতীক চিহ্নের নকশা তৈরী বাবার আরো একটি বিশেষ আনন্দের কাজ ছিল। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতীক চিহ্ন আঁকার ব্যাপারে বাবা নানা কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কলিকাতা পৌর সংস্থার, নিউ থিয়েটার্সের (জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়া মু) প্রভৃতি বহু সংস্থার প্রতীক চিহ্নগুলি গ্রহণ করার সময় বাবার সুচিন্তিত মতকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ সালে লিখিত "ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ" নামক প্রবন্ধে বাবা যে জাতীয় পতাকার

ভাষাশিল্পীর এক অনবদ্য প্রকাশ

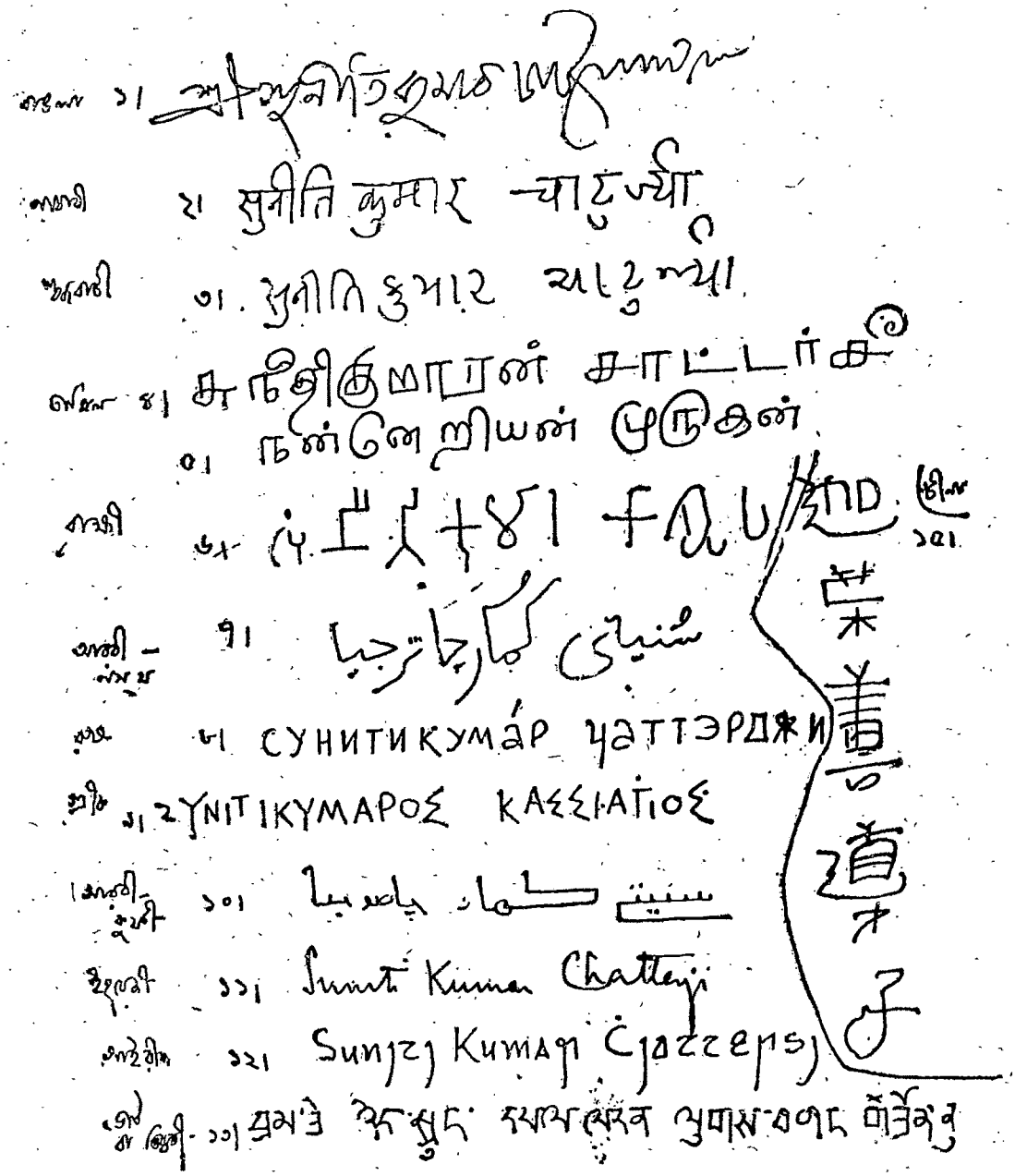

ভাষাসমুদ্রের শ্রেষ্ঠ অভিসারী সুনীতিকুমারের একত্রে পনেরটি ভাষায় স্বাক্ষরের প্রতিলিপি। এই অমূল্য সম্পদটির মধ্যে লক্ষণীয়—দেশের ও বিদেশের এতগুলি ভাষার মেলায় ভাষাচার্য সবার উপরে স্থান দিয়েছেন মাতৃভাষাকেই।

পরিকল্পনা করেছিলেন তারসঙ্গে বর্তমান অশোকচক্র সম্বলিত জাতীয় পতাকার বহুলাংশে মিল রয়েছে।

সব কিছুর মধ্যেই একটা পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে বাবা খুবই পছন্দ করতেন। শিল্পের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে। বাড়ীতে বিশেষ অতিথি আপ্যায়নের অঙ্গ হিসাবে আল্পনা ফুল সাজানো এগুলো একান্ত অপরিহার্য কাজ ছিল। জীবন-শিল্পীর কেবল ছবি আঁকার প্রতি আকর্ষণ থাকবে একথা ঠিক নয়, তাঁর লক্ষ্য হবে, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশও যেন সুরুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে।

আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ী যখন তৈরী হয় তার ছোটখাট প্রতিটি কোণই সুন্দর শিল্পসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ষ্টোররুম বা ভাঁড়ার ঘরের দরজার মাথার উপর সাদা পাথরে খোদাই করা আল্পনার আকারে আঁকা আছে লক্ষ্মীর দুটি পা; রান্নাঘরের প্রবেশপথের মাথার উপর কালো পাথরের উপর সিম্বলিক ডিজাইনে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়ি আর স্নানঘরের দরজার মাথায় জলের ধারার রেখাচিত্র খোদাই করা আছে—এসবই বাবার ডিজাইন ও হাতের আঁকা। এছাড়া সারা বাড়িতে বিভিন্ন ভাষায় বিখ্যাত বাণী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্বেত পাথরে খোদিত করে রাখা আছে।

নন্দলাল বসুর হর-পার্বতী কালো পাথরে খোদিত হয়ে আছে—এটি আমাদের বাড়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে কাঠের ফ্রেমে সুদৃশ্য টেবিলের উপর এটি বসান আছে, তার পরিকল্পনা, টেবিলের উপর বসানো বাঘছালের সাদৃশ্য, ইতালীয় মার্বেল পাথর সবই বাবার শিল্পী মনের পরিচয় দেয়। কলকাতার এক রাজপথে বাবার পরিকল্পনা বা ডিজাইন অনুযায়ী গ্রাম বাংলার দোচালা গৃহের অনুকরণে এক মন্দির বর্তমান রয়েছে। হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীর অনেক ছোটখাট স্থাপত্যের সংযোজনা বাবার নিজস্ব ডিজাইনের।

বাবার ছবি আঁকা কোন বিশেষ সময় বা মনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত না। অটোগ্রাফ নিতে গেলে প্রায় দেখতাম তাঁদের খাতায় হর-পার্বতীর মুখ এঁকে দিচ্ছেন, তলায় ছোট্ট কোন শ্লোক দিয়ে শেষ করছেন। নয়ত এক আঁচড়ে কোন মেয়ের ছবি আঁকলেন, মাথায় উঁচু করে খোঁপা বাঁধা, তাতে এক গুচ্ছ ফুল গোঁজা—কিম্বা মারাঠা ব্রাহ্মণ মাথায় বিরাট পাগড়ী, কপালে চন্দন সিন্দুরের ফোঁটা। বাড়ীর যে কেউ সামান্য শিল্পচর্চা করলে বা ছবি আঁকলে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন।

মা ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পী। নানা ধরনের হাতের কাজে খুবই পটু ছিলেন। সারাদিন প্রায় এসব নিয়েই কাটাতেন, এতে বাবার উৎসাহ ছিল অপরিসীম। আমার ছোট মাসীমাও দেখেছি বাবার কাছ থেকে পছন্দমত রেখাচিত্র আঁকিয়ে নিতেন পরে তাকে দক্ষতার সঙ্গে সূচীশিল্পের সুন্দর নিদর্শন করে তুলতেন।

গুরু রামদাস—শিষ্য শিবাজী

শিল্পী এবং শিল্প অনুরাগী বাবা তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিলেমিশে এত একাকার হয়ে গেছেন যে একে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই চিত্রাঙ্কন শিল্পী বাবার পরিচয় দিতে গিয়ে বার বার শিল্পপ্রেমিক ও শিল্পীদরদী বাবার কথা এসে পড়ছে। এ সম্বন্ধে নানা ঘটনা আছে তারই দু'একটা না বলে থাকা যায় না। প্রখ্যাত ভাস্কর সুনীল পাল তাঁর একটি ছবির নামকরণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছত্র উদ্ধৃত করেন, এতে বানানে ভুল থাকায় বাবা সেটি সংশোধন

করে দেন—তাতে শিল্পী সুনীল পাল লজ্জিত হলে বাবা বলেন, "ওর জন্য ভেব না, বানান ঠিক করে লেখার অনেক লোক আছে—তোমাদের কাজের লোক নেই"। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ছিলেন বাবার কাছে, শিল্পজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মতে পৃথিবীর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে দান, শিল্পজগতে এঁদের দান তার চেয়ে কিছু কম নয়। শিল্পী যামিনী রায়ের সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ রেখা, বর্ণবিন্যাসের ধারা প্রভৃতির মান যে কত উর্ধ্বে তা বলেছেন। যে কেউ ছবি আঁকতে পারতেন বাবার যেন তাঁর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব ছিল বলে মনে হত। কোন শিল্পীর প্রদর্শনীতে যেতে বল্লে খুব কম সময় তিনি তাঁকে নিরাশ করেছেন। কেউ শিল্পকর্ম বা ছবি দেখাতে এলে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। আমার আজও মনে পড়ে স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীমতী কবিতা সিংহ আমার মেজদির বন্ধু—স্কুলজীবনে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন (জানি না আজও আঁকেন কি না)। একটা ছোট খাতায় গল্প বা নাটক ছবির আকারে দৃশ্যের পর দৃশ্য এঁকেছিলেন—বাবা তার খুব তারিফ করেছিলেন সহজ সরল রেখাচিত্রের জন্য—সেই খাতাটি বোধহয় এখনও বাবার লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে।

গ্রীক শিল্পের নিরলঙ্কার সৌন্দর্যের অপরূপ মহিমা বাবাকে যেমন মুগ্ধ করত—দক্ষিণ ভারতের কারুকার্যময় মূর্তি স্থাপত্য বা অন্য শিল্প সামগ্রী অথবা আফ্রিকার সহজ সরল বলিষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি দেখেও সমান আনন্দ পেতেন। কাচের বা মাটির কোন সুন্দর মূর্তি চোখে পড়লে ধাতুতে ঢালাই করিয়ে তাকে চিরস্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করেছেন। লণ্ডন মিউজিয়াম থেকে পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন নগরীর নিগ্রো কন্যার মূর্তির প্লাষ্টার অব প্যারিসের অনুলিপি দেশে এনে ব্রোঞ্জে ঢালাই করিয়ে নিয়েছেন—এ মূর্তি বাবার যে কত প্রিয় তাত' অনেকেই জানে।

বাবার সঙ্গে বিদেশে ঘোরার অমূল্য সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি। কি অসীম আনন্দে, কি নবীন উৎসাহে চুরাশী বছরের বাবা সব কিছু দেখিয়েছিলেন। অপূর্ব সংগ্রহশালা প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের, সিশরীয় আসিরীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন, গ্রীক ৎপাত্রের সংগ্রহ, চীনা শিল্পের সংগ্রহ, ভারতের অমরাবতীর ভাস্কর্যাবলী ইত্যাদি, ওদিকে ইতালী ইউরোপের রেণেসাঁ যুগের অমর শিল্পীদের চিত্রমালা। প্রতিটি মূর্তির, প্রতিটি চিত্রের শিল্পগত উৎকর্ষ এবং বর্ণনা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম—দুঃখ হত আমার তাদের জন্য যারা এ সুযোগ পেল না। কোন্ মূর্তির পর কোন্ মূর্তি, কোন্ চিত্রের পর কোন্ চিত্র—কোন্‌টি কোন্ সালের, কোথায় তার সৌন্দর্য, কি তাঁকে মুগ্ধ করেছে অনর্গল তা বলে চলতেন। এখন আক্ষেপ হয় কেন তা লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত থাকতাম—মনে হত বাবা ত আছেনই, দরকার পড়লেই জেনে নেব।

বিদেশে দেখেছি অসম্ভব হিসাব করে চলতেন বিদেশী মুদ্রা বাঁচানোর জন্য, কারণ কোথাও কোন সুন্দর শিল্প নিদর্শন দেখেছেন তা কিনতে হবে—কোথাও কোন পুরাতন মুদ্রার অনুকরণ দেখেছেন তা সংগ্রহ করতে হবে—বাবার কাছে দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রার সার্থক ব্যবহার ত এইসব সংগ্রহেই। বিদেশ থেকে বরাবর যা কিছু এনেছেন আমাদের জন্য বা নিজের সংগ্রহশালার জন্য শিল্পসৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অতুলনীয়। বাবার জীবনে কোন কিছু কুৎসিত, খেলো, মেকি, চটকদার জিনিষের স্থান ছিল না—তাই যা কিছু করে গেছেন, যা কিছু রেখে গেছেন তাই সুন্দর অমূল্য ও চিরন্তন হয়ে থাকবে।

যে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষার বিশ্লেষণ, গবেষণা, তার উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন—সেই একাগ্রতা সেই নিষ্ঠার সঙ্গে যদি শিল্পচর্চা করতেন হয়ত বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত সুনীতিকুমারের নাম দেশবরেণ্য শিল্পী হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পেত। জানি না কেন নিজের এই প্রতিভার তেমন মূল্য বাবা দেননি, হয়ত গবেষণার জন্য শিল্পচর্চার যতটুকু প্রয়োজন বোধ করেছেন তার চেয়ে বেশী সময় এতে ব্যয় করার পক্ষপাতি ছিলেন না। আজ আর এপ্রশ্ন তুললে কারো কাছে কোন উত্তরই পাওয়া যাবে না। একমাত্র যিনি জবাব দিতে পারতেন তিনি ত' এখন সেই অমৃতলোকে, সেখানে শুধ আনন্দ, শুধু শান্তি, শুধু সৌন্দর্য।

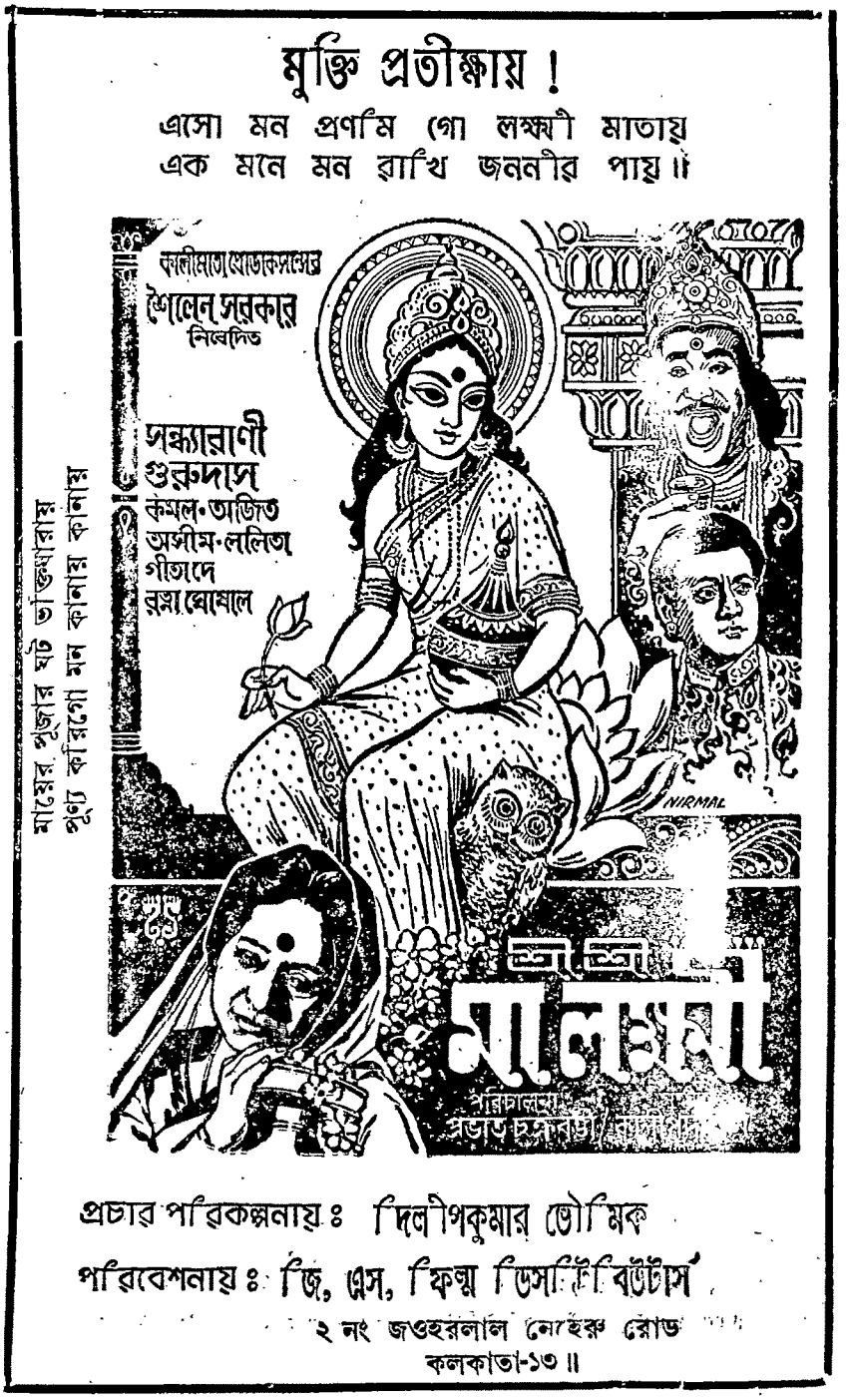

নশীপুরের নকীব

গেণ্ডু দাস ধমকে ওঠে—ব্যাটা হাঁ করে চেয়ে আছিস কি ? হিসেবটা বুঝলি যা ?

অবিনাশ উবু হয়ে মালিকের সামনে বসেছিল, একা অবিনাশই নয়, চর নশীপুরের আরও দু'-চারজন চাষী এসেছে, তারাও হিসেবটা শুনে বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। তারা চলে সোজা হিসেবে। কিন্তু গেণ্ডু দাসের হিসেবের ধারাটা ঠিক নেই পথে চলে না। বাকী ধানের বাজারদরে দাম ফেলে ও চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ কষে, আর ঋণের অঙ্কটা ফড়িং-এর মত লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ে ওঠে।

নিতাই বলে ওঠে—আজ্ঞে, কি বছরই যান আদায় দিচ্ছি, উবু ট্যাকাতো কমে নি। তাহলে আদায়গুলান গেল কুনদিকে আজ্ঞা দাস মশাই ?

গেণ্ডু দাস কিছু বলার আগেই গোমস্তা গিরিজা পাল বলে ওঠে :

—হিসেবের কড়ি। কি হে অবিনাশ, তুমি তো দু' পাতা পড়েছো, ও গণ্ডমূর্খটাকে একটু বুঝিয়ে দাও।

একটু দম নিয়ে বলে গিরিজা পাল —না হয় তোমাদের ওই প্রভাত মাস্টারকেই বলো, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদটা ওই কষে দেবে।

জনতার মাঝে পুঞ্জেরণটা দেখেছে গেণ্ডু দাস। ওই লোকগুলোর মুখ-চোখের চাপা রাগটাকে সে চেনে। আর তাদেরও গেণ্ডু দাসকে দরকার। তাই মুখের উপর প্রতিবাদ না করলেও ওরা ক্ষুব্ধ হয়েই বলে —না আজ্ঞে, বাবু বলেছেন ঠিকই আছে।

গেণ্ডু দাস চুপ করে সিগ্রেট টানছে। একটু চুপ করে থেকে বলে :

—কিন্তু এবার আর ভাগচাষী রাখবো না অবিনাশ।

অবিনাশ চমকে ওঠে। গেণ্ডু দাসের ভাগচাষী অবশ্য অনেকেই আছে। সারা চাকলার সরেশ জমিগুলো কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রবলে গেণ্ডু দাস নিজের কব্জায় এনেছে। আর দূর-দূরান্তরের গ্রামের মাঠেও বহু জমি বেনামে-বেনামে রয়েছে গেণ্ডু দাসের।

আর গেণ্ডু দাসও জানে কি করে বিষয় রাখতে হয়, বাড়াতে হয়। তাই জমিদারী চলে যাবার সময় নশীপুর-হাবিবে-

শক্তিপদ রাজগুরু

পুরের চৌধুরীবাবুদের দে-গাঁয়ের দত্তরায়-বাবুদের জমিদারীর বহু জমি তখন নানা-ভাবে কুড়িয়ে নিয়ে ভাই-ভাইপো-জামাই-মেয়েদের বেনামীতে রেখেছে। জমির আয় ছাড়াও এখন গেণ্টু দাস সুরু করেছে কন্ট্রাকটারী।

রাস্তা ছাড়াও ছোট-বড় অনেক রিজার্ভার, বাঁধ, সেচের ক্যানেল এসব কাজ হচ্ছে, লাখ লাখ টাকার কাজ। গেণ্টু দাস এখন ব্যবসায় নেমে সেই পথটাকেই চিনে ফেলেছে। তবু গ্রামের সম্পর্কটা বজায় রেখেছে। এই তার উন্নতির মূল, এই তার শোষণের সাম্রাজ্য। গেণ্টু দাস এখন গাছেরও খায়, তলার ফলও কুড়িয়ে চলেছে। তাছাড়া গেণ্টু দাস ক' বছরে বুঝেছে এই কন্ট্রাকটারীর লেবার-টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড-দের নিয়ে কাজ করে কিছু বেশী লাভ মেলে সত্যি, কিন্তু তাদের নিয়ে কাজ করার ঝামেলাও কম নয়, তারা কাজ বন্ধ করতে পারে। ইউনিয়নও করে। দাবী জানায়—চাপ দিয়ে সেই দাবী আদায়ও করে নিতে পারে। কিন্তু এই গ্রামের মানুষদের কাছে সে-সব তেমন কিছু নেই, এদের প্রতিবাদটা ফুটে ওঠে চোখের অসহায় চাহনিতে। মুখ-ফুটে বেশী কিছু বলতে পারে না। এরা মাটির কাছাকাছি থেকে মাটির মতই সর্ব-সহা হয়ে উঠেছে।

তবু আজ অবিনাশ—এই নকড়ি—দেপুরের বসন্ত ডোমের মুখ-চোখে দেখেছে গেণ্টু দাস একটা প্রতিবাদের কাঠিন্য। মুখে সেটা আজ প্রকাশ না করলেও মনে হয় কোনদিন এবার সোচ্চার হয়ে উঠবে তারা।

বেলা হয়েছে। চাষীদের অনেকেই দূর-দূরান্তরে থাকে। তারাও উঠেছে, অবিনাশ তবু বলে—ওই ভাগচাষীর কথাটা কি বললেন বাবু?

হাসে গেণ্টু দাস। ওরা যে ভয় পেয়েছে, সেটা বুঝেছে গেণ্টু দাস। তাই বলে সে—ও নিয়ে পরে কথা বলবো। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে বাপু ভাগচাষী বলে কোনদিন আবার রেকর্ড করাবে, না হয় জে-এল-আর অফিসে গিয়ে দরখাস্ত দেবে কেউ, তাই ভাবছি গাঁয়ে গাঁয়ে জোত করে গরু-লাঙ্গল রেখে নিজের হেপা-জতেই চাষ করাতে না হয়।

চমকে উঠেছে ওরা এই কথায়। ওদের নিজেদের জমিজায়গা তেমন নেই। তবু গেণ্টু দাস—গ্রামের সকলের জমি নিয়েই ওরা চাষ-বাস করে, খোরাকী ধানও কিছু মেলে বর্ষার সময়, আর ধান উঠলে দেনা শোধ করে দিতে হয়। তবু বেঁচে থাকে তারা ওইভাবেই। হঠাৎ সেই জমিগুলো হাত-ছাড়া হয়ে গেলে তারা কিভাবে বাঁচবে জানে না। মদন গরাই বলে ওঠে:

—ইকি বলছেন দাসমশাই? জমি আপনার—আমরা চাষ করি, লিখিয়ে নোব নিজের নামে?

হাসে গেণ্টু দাস—না, তুমি তা নেবে না। কিন্তু তেমন লোকেরও অভাব নেই হে! অবশ্য আইন যা বলবে তাই হবে। যাক্ পরে ওসব ভাবা যাবে। এখন এসো—বেলা হয়ে গেল।

গেণ্টু দাস চুপ করে বসে আছে।

ক' বছরেই গেণ্টু দাস এখন চড়চড় করে ঠেলে উঠেছে। ওর ভাগ্যের চাকাটা কোথাও বাধা পায়নি। অবশ্য তার জন্য গেণ্টু দাসকে কম মেহনত করতে হয়নি। অনেক আট-ঘাট বেঁধে চলতে হয় আজকের দিনে।

গেণ্টু দাস সেই পথটা চিনেছে। তাই আজ শুধু বিরাট জোতদারই নয় সে, ধাপে ধাপে কন্ট্রাক্টারদের প্রথম সারিতেই উঠেছে সে।

বিরাট বাড়ি করেছে সহরে।

আর গ্রামের বাড়িটাকে যেন ছোট-খাটো দুর্গে পরিণত করেছে সে। এদিকে বিরাট খামার বাড়িতে খানকয়েক ট্রাক, জীপ, একটা ট্রাক্টারও রয়েছে। ওদিকে সারবন্দী গোয়াল ঘরে বিরাট বিরাট বলদ, জারজী-হলস্টেন গরুর দল, একপাশে একটা শেডে বেশ কিছু লেগহর্ণ-রোডআইল্যান্ড মুরগীর পালও রয়েছে।

তাছাড়া গড়ে উঠেছে রেস্ট হাউস।

গেণ্টু দাস-এর ওটার দরকার। বাইরের মাননীয় অতিথিরা আসেন, তাছাড়া আসে কেতুলাল এখানের নামকরা নেতা, সদরের নামী দামী অফিসার—মায় মন্ত্রীদের কেউ এদিকে সফরে এলে এখানেই গেণ্টু দাসের পল্লীকুঞ্জে বিশ্রাম নেন। তাই গেণ্টু দাস এই রেস্ট হাউসটাকে মনের মতো করে সাজিয়েছে, বাগানও করেছে চমৎকার।

সব মিলিয়ে গেণ্টু দাস নশীপুরকে সাজিয়ে তুলেছে, বড় রাস্তা থেকে একটা পথ ছিল আগে গ্রামে, কাছিমের পিঠের মত উঠে যাওয়া পথটার ওদিকে লালমাটির বুকে শালবনের সুরু, এদিকে পথটা এসেছে সবুজ মাঠের দিকে, সামনে একটা নদীর বিস্তার, বেশ কিছুটা রূপোলী বালি ছড়িয়ে নদীটা জলের রেখা হয়ে চলে গিয়ে দামোদরে মিশেছে, নদীর উপরেই চড়াই-এর মাথায় নশীপুর।

ওদিকে নদীর ধারে বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর, ওসব ছিল সরকারী জমি, কিভাবে সমবায় সমিতির নামে সেই এলাকা দখল করে ট্রাক্টার নামিয়ে এখন সবুজ আখের খেতে পরিণত করেছে গেণ্টু দাস, আখ—আলু, বিস্তীর্ণ মাঠে গম সবই চাষ করে, জলের অভাব নেই। নদীটার বুকে ডিপ টিউবওয়েল, লিফ্‌ট পাম্প সবই করেছে গেণ্টু দাস, আর বিজলীও এনেছে গ্রামে।

—তাই এই চাকলার লোকে গেণ্টু দাসকে বলে কর্মবীর।

—গেণ্টু দাস আজ ওই পঞ্চগ্রামের চাষী-দের চোখেও চাহনিটায় কেমন একটা জ্বালা ফুটে উঠতে দেখে নিজের মনের রাগটা চেপে গেছে। অবশ্য রেগে উঠলেও গেণ্টু দাস কখনও চিৎকার করে সেটাকে প্রকাশ করে না। বেশ হাসি হাসি মুখ করেই থাকতে পারে সে সব ক্ষেত্রে। অবশ্য খুবই কঠিন কাজ এটা, কিন্তু গেণ্টু দাসের স্বভাবের সঙ্গে এই কৌশলটা মিশে আছে।

—ওই প্রভাত মাস্টার তাহলে বুদ্ধি-মতলব দিচ্ছে নাকি হে গিরিজা?

গিরিজা গোমস্তাই গেণ্টু দাসের এখানের প্রাইভেট সেক্রেটারী কাম ম্যানে-জার। গিরিজাবাবুর কথায় জাবেদা খাতা লেখা বন্ধ করে শোনায়—তাই তো মনে হয় দাসজী। ছোকরা ওদের গ্রামে গ্রামেও যায়, শুনেছি হাটতলায় সেবার নদীর বাঁধ বাঁধানো নিয়ে লেকচারও দিয়েছে।

—হুঁ! কথাটা ভাবছে গেণ্টু দাস।

—ত স্কুলের কাজকর্মও তো ভালোই করে শুনছি। গেণ্টু দাসের কথায় গিরিজা একবার ইতিউতি করে বলে:

—আজ্ঞে, সবাই তো কমবেশী ওই পথেরই। একা হেডমাস্টার মশাই কতো সামলাবেন। বাইরের বাবুদের মাস্টারী দিলেন ভালো পড়াবে বলে। তা ওনারাই তো এখানের লোকগুলোকেও পাখী পড়ানো করে ওই সব শেখাচ্ছে! কৃষক সমিতি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নাম ভূতের কেত্তন হচ্ছে এখানে।

গেণ্টু দাস চুপ করে কথাটা শুনছে। কি ভেবে বলে:

—গিরিজা, একবার অধরবাবুকে খবর দিও। সন্ধ্যায় যেন আসেন।

রাতের বেলায় স্তব্ধতা নেমেছে গ্রামে। ওদিকে আম্বাগানের ধারে টানা ইস্কুল বাড়িটা আব্ছা চাঁদের আলোয় দেখা যায়, যেন একটা বিরাট প্রাণী নাক তুলে জম্বা-লম্বি শুয়ে আছে। ওদিকে স্কুল বোর্ডিং-এর ঘরে দু-একটা আলো জ্বলছে।

গেণ্টু দাস বাবুর নামে ইস্কুলটার জন্য দশ বিঘে জমি দিয়েছিল, আর ওর ঠিকে-দারী ব্যবসার সুরু এইখান থেকেই। অবশ্য কেতুলালও তখন তাকে যথেষ্ট মদত দিয়ে-ছিল, অবশ্য গেণ্টু দাসই তৈরী করেছিল কেতুলালকে।

কেতুলাল-এর ভালো নামটা এ অঞ্চলের অনেকেই জানে না। তখন নশীপুরের ওই আমবাগানে একটা মাটির চালাঘর ছিল, প্রাথমিক স্কুল বলা হোত। দরজা-জানলার বালাই নেই, আর অধরের বাবা ভূধর ভট্টচায ছিল পাঠশালার হেড পণ্ডিত।

গেণ্টু দাস তখন ওখানের ছাত্র, আর কার্তিককুমার লাল ছিল শিরপড়ুয়াদের অন্যতম। পাশ করে বের হয়ে যাবার লক্ষণ নেই, কার্তিক-এর নামকরণ করেছিলেন ভূধর পণ্ডিত—কেতু! আর গেণ্টু দাস-এর নাম-করণ করেছিলেন রাহু। দুটিতে যেন মাণিকজোড়। গ্রামের যত নষ্টামি-দুষ্টুমির মূলে ছিল ওরা যুগলে।

পরে গেণ্টু দাস অবশ্য বাবার জমি-জায়গা দেখাশোনার সঙ্গে ব্যবসাও সুরু করে, রাহু যেমন চন্দ্রকেও গ্রাস করে, ওই গেণ্টু দাস ক্রমশ ভূধর পণ্ডিতের কথাটার সত্যতা প্রমাণ করেছিল এ চাকলার সব-কিছুকে গ্রাস করে। আর কেতু কক্ষচ্যুত দুষ্ট গ্রহের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

মুখে অমায়িক হাসি, সেবার নদীর বানে এই এলাকার বহু জমি গ্রাম ভেসে গেছে, বানের জলে সবুজ ধানক্ষেত ছেয়ে গেছে, হঠাৎ দেখা যায় কেতুলালকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষকে সে জাগিয়ে তুলেছে; শিবু ডোমকে ধরে ঢোল-সহরৎ করে হাটতলার মিটিং-এর খবরও ছড়িয়ে দিল। ফলে কাতারে কাতারে লোক জমেছে, কেতুলাল উত্তেজিত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তাদের দাবী আদায়ের জন্য তৈরী করে। পর দিনই এই এলাকার মানুষকে নিয়ে দল বেঁধে পনের মাইল দূরে সদর সহরে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ঘেরাও করলো! সহরের পথে পথে চলে ওদের বিরাট শোভাযাত্রা, কয়েকটা সাপ্তাহিক মফস্বল বার্তায় নাম বের হল কেতুলালের। আর রিলিফ-এর আশ্বাসও এসে গেল।

গেণ্টু দাসও দলে ভিড়েছে, অবশ্য কার্তিকই নেতা। চাল, গম, ধুতি-কম্বলও বেশকিছু এল। গেণ্টু দাস হল সেক্রেটারী, কার্তিক হল প্রেসিডেন্ট। এ অঞ্চলের মানুষের দরদে তারা ভেঙ্গে পড়লো। কার্তিক তখন থেকেই নেতা সেজে গেল।

গেণ্টু দাস অবশ্য বন্যার্তদের রিলিফ দিয়ে সেবার জীপটা কিনেছিল। কারণ দেশসেবার কাজে ওকে ঘুরতে হবে কার্তিককে নিয়ে।

কেতুলালকে সেই থেকেই গেণ্টু দাসই দেখে আসছে। কেতুলাল অবশ্য প্রকাশ্যে

উৎসবে আছে ভিন্ন সুর, ভিন্ন ছন্দ...

...এক আর অদ্বিতীয় শুধু

বোরোলীন

ত্বক-সাধনার উৎসবে

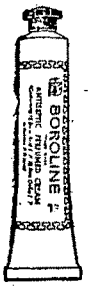

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বোরোলীন সত্যই অদ্বিতীয়। ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় এর তুলনা নেই। নিয়মিত ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলে ত্বকের স্বাভাবিকতা। ত্বককে করে তোলে সুরক্ষিত, বীজাণুমুক্ত। কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক রোদে ঝলসানো ত্বক বোরোলীনের সস্নেহ স্পর্শে পলকে স্বাভাবিক, সুস্থ।

উৎসবের আনন্দঘন দিনগুলোতে অন্যান্য উপচারের সঙ্গেও থাকুক বোরোলীনের নিরাময়ী প্রতিশ্রুতি।

হাটতলার মিটিং-এ সেবার জোর গলায় ঘোষণা করে—শোষণকারীদের আমরা বাধা দেবই। আর গেণ্টুবাবুকেও জানিয়ে দিতে চাই—বন্ধু বলে তাকেও ক্ষমা করা হবে না। তাঁর গোলার ধান দেশের মানুষের অভাবের সময় দিতেই হবে। না দিলে সেই ধানের পাহাড় কি করে ছিনিয়ে নিতে হয় তা আমরা জানি।

হাততালির শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে। সমবেত জনতা বাহবা দেয়।

—কার্তিকবাবুর হিম্মত আছে হে। বাপের ব্যাটা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অবশ্য কেতুলালের জন্য মূর্তি। তখনও গেণ্টু দাসের বাগান-বাড়ি ওই গেস্ট হাউস হয়নি। ওর বাড়ির ওদিকের ঘরে কষা মাংসের টুকরো চিবুতে চিবুতে কেতু বলে :

—এসব না বললে তোমার তিন হাজার মুণ লঠ হয়ে যেতো না দাসমশাই? ওরা তো তৈরী হয়েছিল।

হাসছে গেণ্টু দাস। ও খবর পেয়েছিল। কারণ দু' বছর ধরা অজন্মা চলেছে। ওর খামারে সারবন্দী ধানের গোলার ধানগুলো পাচার করতে পারেনি তখনও। গুপীপুরের চট্টরাজদের চারটে ধানের গোলা লুঠ হয়ে গেছে, শিবপুরের ভক্তি ঘোষের খামারেরও ধান কেড়ে নিয়েছে বুভুক্ষু মানুষের দল। এখানেও সেই ঘটনা ঘটতে চলেছিল, কার্তিক তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য পরদিনই গেণ্টু দাস-এর খামারে ঘটা করে ধানের মরাই ভেঙ্গে কেতুলাল দাঁড়িয়ে থেকে এই অঞ্চলের কিছু বিশেষ লোককে ধান কর্জ দেওয়া করালো, ধন্য ধন্য পড়ে গেল কেতুলালের নামে। কেউ আবার জয়ধ্বনি দেয় :

—পল্লীমঙ্গল সমিতি জিন্দাবাদ। কেতুলাল জিন্দাবাদ।

অবশ্য রাতের অন্ধকারে বড় রাস্তা ধরে কয়েকখানা ট্রাক বার কয়েক ফেরে দিয়ে সব ধান ততক্ষণে গেণ্টু দাসের ধান-কলে পাচার করে দিয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ধান।

গেণ্টু দাস এমনি করে নিজের স্বার্থেই কেতুলালকে গড়ে তুলেছে। সেই লক্ষ্যহীন কেতুলালকে সেবার গেণ্টু দাসই ভোটে দাঁড় করায়। গেণ্টু দাসের তখন রমরমা অবস্থা। সহরেও ধানকল, তেলকল চালু হয়েছে। আর ইতিমধ্যে স্কুল বাড়ির জন্য কেতুলালই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে জন-সভার মাধ্যমে শিক্ষার মহিমা প্রচার করেছে।

সবচেয়ে অবাক হল ভূধর পণ্ডিত। বৃদ্ধ হয়েছেন—সেদিন কেতুলালকে জীপ থেকে নেমে হাটতলার মিটিং-এ বক্তৃতা করতে দেখে এগিয়ে যান। কেতুলাল উদাত্তস্বরে বলে চলেছে :

—এই এলাকায় উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান গড়তে চাই। আমরা আমাদের এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে ছিনিয়ে আনতে চাই। তাই আপনাদের যার যা সামর্থ্য সাহায্য করুন। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন—সেই সাহায্যই আমাদের হাত শক্তিশালী করে তুলবে। আমাদের ছেলেরা যাচ্ছে—

ইতিমধ্যে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ছেলেরা বের হয়েছে।

—এ্যাই কেতো!

ডাক শুনে কেতু দাঁড়ালো,—পণ্ডিত মশাই!

কার্তিক অবশ্য ঠাট-ঠমকগুলো পুরো মেনে চলে। ভূধর পণ্ডিত অবাক হয়েছিল কেতোকে হঠাৎ শিক্ষা নিয়ে লেকচার দিতে দেখে। ও নাকি এখন সারা এলাকায় লেকচারও দেয়। অথচ কেতোকে সাত বছর পিটিয়ে তিনি প্রাইমারী পাশ করাতে পারেন নি। সেই কেতোকে আজ শিক্ষা নিয়ে রচনা লেখা নয়—বচন দিতে দেখে মনে হয়েছিল তাঁর—এবার একটা সর্বনাশ কিছু ঘটতে চলেছে। ভূধর পণ্ডিত বলেন :

—সাত বছর গড়িয়েও সন্ধি-সমাস আর সুদকষা-লঘুকরণ শিখলি না—আজ হঠাৎ স্কুলের জন্য এতো ভক্তি কেন র‍্যা?

পণ্ডিতগুলোই এমনি আকাট তা কেতু এর মধ্যেই জেনে ফেলেছে। তবু কেতুলাল ওই জনতার মধ্যেই পণ্ডিত মশাই-এর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁর ফাটা পায়ের এক-খামচা ধুলো তুলে নিয়ে গদগদ স্বরে বলে—আশীর্বাদ করুন পণ্ডিত মশাই, যেন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হই।

...স্কুল বাড়ির ব্লু-প্রিন্ট প্ল্যান সব হয়ে গেছে। গেণ্টু দাসের ওই জমিতে দোতলা স্কুল, সায়েন্স ব্লক হচ্ছে, বোর্ডিং ইত্যাদি হচ্ছে। কিছু টাকা উঠেছে, কিছু দিয়েছে গেণ্টু দাস। কাজও সুরু হয়েছে। কেতুলাল এর মধ্যে সহরের মাতব্বরদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেকটার মায় শিক্ষামন্ত্রীকে কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে এলাহি কাণ্ড করেছে।

আর স্কুল বাড়ির জন্য এসে গেছে লক্ষাধিক টাকা।

গেণ্টু দাস সেক্রেটারী, কেতুলাল প্রেসিডেন্ট। গেণ্টু দাসই বাড়ি তৈরীর ভারটা দয়া করে নেয়। পঞ্চগ্রামের লোকদের সভায় সেদিন ঘটা করে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কেতুলালের অনুরোধে গেণ্টু দাস ওই ভার নিতে রাজী হয়।

অবশ্য তারপর দফায় দফায় সরকারী অনুদান এসেছে, গেণ্টু দাসও কাজ করে চলেছে। তিন বছরের কঠিন সাধনায় দুস্তর আত্মত্যাগে সেদিন ওই স্কুল, সায়েন্স-ব্লক, বোর্ডিং, পুকুর এসব গড়ে ওঠে।

সারা এলাকার লোক ধন্য ধন্য করে।

বদন ডাক্তার হাটতলায় তার ডিসপেন্সারীতে পঞ্চগ্রামের রোগীদের সামনে ঘোষণা করে—কেতুলাল বাপের ব্যাটা হে। গেণ্টু দাস তো কসাই, লোকের সব লুটে নিত পারেনি শুধু কেতুলালের জন্য। উল্টে তাকে স্কুলের জন্য বেশ কিছু টাকা ও জমি দিতে হয়েছে।

সকলেই একবাক্যে কথাটা স্বীকার করে। কেতুলাল হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের একনিষ্ঠ দেশসেবক।

অবশ্য গেণ্টু দাস এবার সদরের কোন সাহেবকে তার স্কুল বাড়ির কাজ দেখিয়ে কোনা নদীর বিরাট জলাধারের বেশ কিছু কন্ট্রাক্টও পেয়ে গেছে। আর তার জন্য মূলধন ঘর থেকে বের করতে হয়নি। স্কুলের বিল্ডিং তৈরীর থেকেই বেশ কিছু টাকা সরিয়েছিল, আর বাড়তি ইঁট-মশলা দিয়ে স্কুলের রাস্তা, গ্রামের রাস্তা করিয়ে দিয়েছে কেতুলালকে দিয়ে।

ভূধর পণ্ডিতের নাম দেওয়া রাহু-কেতুর প্রাস্টা এমনি করেই কায়েম হয়ে বসেছিল ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের বুকে অন্যরূপে। সেইটাকে কায়েম করেছে কৌশলী গেণ্টু দাস ওই কেতুলালকে ভোটে জিতিয়ে।

কেতুলাল প্রথমে কথাটা শুনে চমকে ওঠে :

—ভোটে দাঁড়াবো কি হে গেণ্টু? শেষকালে হেরে গেলে বেইজ্জত হবো। তার চেয়ে এই ভালো।

কেতুলাল অবশ্য মাসে মাসে তখন গেণ্টু দাসের কাছ থেকে একটা টাকা পায়। সেটার খবর আর কেউ জানে না। ওই স্কুলের বাঁচানো টাকা, সেবার পঞ্চাশ হাজার টাকার ধান বেচার কিছু কমিশন, সহরের ধানকল তৈরীর সময় পারমিটের কয়েকশো টন সিমেন্ট কালোবাজারে বেচে দিয়েছে। নানা কাজের বাবদ গেণ্টু দাসের কাছে তার কিছু টাকা রয়ে গেছে। সে টাকা গেণ্টু দাস ব্যবসায় খাটিয়ে, ওকে মাসে মাসে সুদটা দেয়। কেতুলাল অবশ্য একটা ঘর-বাড়ি করতে চেয়েছিল। গেণ্টু দাস বলে :

—এ পথে ওসব চোখটাটানো কিছু করতে নেই কেতো। যত গরীব সেজে থাকবি, তত সুবিধে হবে আখের গুছিয়ে নিতে। আর ঘর-বাড়ির ভাবনা কি? এইখানেই থাকবি।

কেতুলালও বুঝেছিল কথাটা।

এবার গেণ্টু দাসের কথায় তবু অবাক হয়। গেণ্টু দাস দেখেছে জেলার রাজনীতির গণ্ডী ছাড়িয়ে তার হাতটা বাড়াতে হবে বৃহত্তর পরিবেশে, আর জেলার

আধিপত্য বিস্তার করা দরকার। ধাপে ধাপে সে উপরে উঠছে। এবার সরকার চাষ, নদীবাঁধ, রাস্তাঘাট-এর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করছে, তার বেশ কিছুটা ওকে পেতেই হবে। তাই ধাপে ধাপে এগোতে চায় গেণ্টু দাস। এখানের নেতা কিশোরলালজী সদরের লোক, দেখেছে গেণ্টু দাস কিশোরলালের ভাইপো কেমন করে ঠেলে উঠেছে। তবে গেণ্টু দাস কিশোরলালের কাছে কোন সাহায্যই পায় নি, বরং বাধাই পেয়েছে, ওই ঠিকেদারীর দু'-একটা কাজ হাতফসকে কিশোরলালের লোকদের কাছেই চলে গেছে।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেবই সেদিন বলেন গেণ্টু দাসকে ঃ

—জানেন তো ব্যাপার-স্যাপার। ওদের জন্য নেতারাই রেকমেণ্ড করেছেন। ওদের তো চটাতে পারি না। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা মুশকিল।

কথাটা বুঝেছে গেণ্টু দাস। তাই এবার সে বড়ের চালই দিতে চায় ওই কেতুলালকে দিয়ে।

গেণ্টু দাস বলে—আর ভয় পাচ্ছিস কেন কেতু? আমি তো পিছনে রয়েছি।

কেতুলাল অসুবিধা অন্যত্র। ভোটে জিতলেই নানা ঝামেলা। কলকাতা যেতে হবে। সেখানে তার বিদ্যের দৌড়টাও ধরা পড়ে যাবে। কিশোরীবাবু লেখাপড়া জানা লোক সে সামলাতে পারে, কিন্তু কেতুলাল জানে তার দৌড় কতদূর। তাই এড়াবার জন্য বলে কেতুলাল ঃ

—অনেক খরচাপাতির ব্যাপার।

হাসে গেণ্টু দাস—তোর সে ভাবনা নেই।

—কিন্তু কলকাতায় গেলে যে বিদ্যে-বুদ্ধি ফাঁস হয়ে যাবে রে? কেতু জানায়।

গেণ্টু দাস এর মধ্যে দেখেছে অনেক কিছু। সে বলে ওঠে ঃ

—যা শিখেছিস ভূধর পণ্ডিতের পাঠশালে ওই দিয়ে হবে. আর দু-চারটে ইংরেজী বুলি শিখে নিবি। ব্যস। ওই ইস্কুল-কলেজের বিদ্যে নিয়ে মাসে দুশো টাকার কেরাণী তৈরী হয় মাত্তর। ছাড় তো ওসব বাতেলা। নেমে পড়!

...কেতুলাল সারা এলাকায় এবার নোতুনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। দরিদ্রের বন্ধু, সারা অঞ্চলের মানুষের দুঃখের কথা জানাবার ব্রত নিয়েছে সে। ভোটের সময় অবশ্য তার টাকার অভাব হয়নি, কোন একটা দলের নেতাদের ব্যবস্থা করে গেণ্টু দাসই তার মনোনয়ন এনে দিয়েছে। আর কটা জীপ-ট্রাক-এ গোকজন দিনরাত ধুলো উড়িয়ে ঘুরছে, কেতুলাল ঘুরছে চরকির মত। স্তব্ধ বাতাস মুখর হয়ে ওঠে ঃ

—ভোট ফর কেতুলাল!

—কেতুলালকে ভোট দিন!

...আর গেণ্টু দাসের হিসেবে ভুল হয়নি। কিশোরীবাবু বাইরের লোক কেতুলাল এখানের ছেলে। চেনে-জানে অনেকে। এর আগেও বন্যাত্রাণ, শিক্ষা-প্রসার—সামাজিক অনেক কাজই করেছে। তাই সেই-ই বের হয়ে গেল ভোটে।

...ভূধর পণ্ডিত তখন শয্যাশায়ী। তার ছেলে অধর সবে কলকাতা থেকে পাশ করে এসেছে, গেণ্টু দাস তাকে স্কুলে চাকরিটা দিয়েছে। অবশ্য অধর ভটচায এর মধ্যে গেণ্টু দাসের সেরেস্তায় বসে কেতুলালের ইলেকশন-এর কাজ করেছে। গোপনে ক্যানভাসও করতে হয়েছে চাকরির দায়ে।

ভূধর পণ্ডিত কেতুলালের জেতার খবর পেয়ে চমকে ওঠেন।

—কেতু জিতেছে? বলিস কি অধর? ও যে সন্ধি-সমাসও জানে না, লঘুকরণ-সুদকষা-সরলের অঙ্কতেও গোল্লা পায়।

অধরবাবু তা জানে। ওদের দাম কি? কিন্তু দুনিয়ার মাপকাঠিটা বোধহয় বদলে গেছে। তাই অধর ভটচাযকেও চাকরির উমেদারী করতে হয় ওদের কাছে।

অধর বলে ঃ

—দিন বদলে গেছে বাবা!

ভূধর পণ্ডিত ধমকে ওঠেন—থাম তুই! এম-এ পাশ করে গাড়োল হয়েছিস।

অধর বাবার ধমকে চুপ করে যায়। ভূধরবাবু হাঁপাচ্ছেন কি উত্তেজনায়। আগামী দিনের একটা অন্ধকার ছায়া যেন তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে।

...কয়েকদিন পরই ভূধর পণ্ডিত মারা যান।

গেণ্টু দাস অবশ্য তাঁর কথাগুলো কানা-ঘুষোয় শুনেছিল, শুনেছিল কেতুলালও। কেতুলালের আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার মত অবস্থা। অধরবাবুই নিজে কেতুলালের সম্বর্ধনাসভা করেছে। পঞ্চগ্রাম, দশ গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে। আর কেতুলাল তাদের সামনে অধরবাবুর লিখে দেওয়া বক্তৃতা পড়েছে—হাততালি কুড়িয়েছে।

ভূধর পণ্ডিত সেই দৃশ্য দেখতে আর বেঁচেছিলেন না।

সেই বছর গেণ্টু দাসের পরামর্শে কেতুলাল গার্লস সেকশন খুললো এখানে। নারীজাতির শিক্ষার প্রসারকল্পে তার শিক্ষা বিষয়ক সারগর্ভ আলোচনা ফলাও করে সদরের দেশবার্তা সাপ্তাহিকে ছাপা হয়ে গেল।

অধরবাবুকে তারা গার্লস সেকশনের চাজে [illegible] কিছু আমদানীর ব্যবস্থা করে দিতে ভোলে নি, আর গেণ্টু দাস এখন বিরাট ঠিকাদার। বিশ লাখ টাকার রিজ-ভারের ঠিকাটা পাকা ফলের মত হাতে এসে পড়েছে, অবশ্য কেতুলাল ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে নিয়ে কলকাতায় গেছল এই ব্যাপারে।

...চাকাটা মসৃণভাবেই চলেছে এতকাল।

কেতুলাল এখন কর্মব্যস্ত মানুষ। জীপে করে ঘোরে। সহরেই আস্তানা করেছে, আর বেনামীতে বাসরুটও নাকি করেছে। কেউ বলে—গেণ্টু দাসের কন্ট্রাক্টারী বিজনেসের সেও পার্টনার।

কিন্তু গেণ্টু দাস হিসাবী দূরদর্শী লোক। তাই মেঘমুক্ত আকাশে হঠাৎ কালোমেঘের ছায়াটা আগে থেকেই দেখেছে সে। কিছুদিন থেকে গুজব রটেছে সারা চাকলায়—বিভিন্ন জেলায় জমি নোতুন করে সেটেলমেণ্ট হচ্ছে, আর ভাগচাষীদেরও নাম এবার থেকে রেকর্ড করা হবে।

গেণ্টু দাস, বংশরামবাটির হলধর ঘোষ, সোনাগাঁয়ের নিকুঞ্জ সাপুই এরা অনেকে ভাবনায় পড়েছে। নিকুঞ্জ সাপুই বলে ঃ

—ভোট দিয়ে জেতালাম আমাদের সর্বনাশ করতে? তাহলে এসবের মানে কি গেণ্টুবাবু?

জমিদারী চলে গেল, বন-জঙ্গল বর্তালো সরকারে। তবু জমি কিছু নানা-ভাবে সরিয়ে রেখেছিল তারা স্বনামে-বেনামে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো জমি-গুলো ভাগচাষীদের দিয়ে চাষ আবাদ করাতো, নিজের জোতে করানো সম্ভব নয়। কিন্তু এবার যদি ওই বর্গাদাররাই রেকর্ডে নাম বসাতে পারে তাহলে তারাই তো গোলমাল বাধাবে।

গেণ্টু দাসও শুনেছে কথাটা কেতুলালের কাছে আগেই। কেতুলাল বলে—এসেম্ব্লিতে এ নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। নোতুন করে সেটেলমেণ্ট হবে আবার।

গেণ্টু দাস হলধর ঘোষ, নিকুঞ্জ সাপুইয়ের কথায় জানায় ঃ

—তাই তো শুনছি। দেখা যাক কি হয়।

সাপুইমশায় বলে—আমাদের সর্বে না করে ছাড়বে না।

সারা এলাকায় ওরাই কয়েকজন বাঁচতে চায় মাটি কামড়ে থেকে, তাই যেন ভাবনায় পড়েছে।

আর গেণ্টু দাসও দেখেছে বিরাট একটা শ্রেণীর চোখে সেই বিক্ষোভের প্রতিবাদের আগুন। গেণ্টু দাস হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল। রাত্রি নেমেছে। অধ-

হারে কম পাওয়ারের বাল্ব কয়েকটা জ্বলছে রুচ উঠোনের আশপাশে। গেণ্ডু দাস অধর-বাবুকে দেখে চাইল।

—এসো মাস্টার!

অধর ভটচায জানে কিভাবে কত্তাদের খুশী রাখতে হয়। তার বাবার আমলের দিন বদলেছে। সেদিনের ভূধর পণ্ডিত আজীবন অভাব আর অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে, অধর তাই সাবধানী হয়ে উঠেছে। গ্রামে বসেই কয়েকশো টাকা মাইনে পায়। আরও এদিক-ওদিকের রোজগার কিছু আছে। জমিজারাতও করেছে অধরবাবু। অধরবাবু নমস্কার জানিয়ে বলে—কাল এসেছেন শুনলাম, স্কুলের কাজে আটকে ছিলাম, আজ অবশ্য সন্ধ্যায় আসবো ঠিক করেছি, তখনই গিরিজাবাবুর লোক গেল! তা শরীর ভালো তো?

গেণ্ডু দাস বলে—চলছে একরকম। তা ওই প্রভাতবাবু, রবিবাবু এঁরা কাজ-কম্মো কেমন করছেন? অবশ্য শুনেছি স্কুলের কাজের চেয়ে বাইরের কাজই বেশী করেন ওঁরা। মানে জনসেবা-টেবা—

অধরবাবু সাবধানী লোক। গেণ্ডু দাসের কথার সুরে অন্য একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে, অধরবাবু জানে ওদের ব্যাপারটা। তাই বলে—ওঁদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছি, এ গ্রাম সে গ্রাম যান।

গেণ্ডু দাস একটু কড়া স্বরে বলে—আর লোক ক্ষেপাতে চান—না? ওঁদের বলে দেবেন বাইরে থেকে এসে এসবের চেষ্টা যেন না করেন। আপনিও ওঁদের উপর নজর রাখবেন। তাঁরা যদি এইসব করতে থাকেন—আমরাও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

অধরবাবু চুপ করে কথাটা শুনেছে, ওঁরও ভাবনা ঢুকেছে। কারণ গেণ্ডু দাসকে সে চেনে। কেতুবাবুর চেয়েও অনেক গভীর জলের মাছ উনি। গেণ্ডু দাস বলে—ওই গার্লস সেকশনে গীতা রায়ের সঙ্গে ওনার একটু ভাবসাব শুনেছি।

অধরবাবু অবাক হয়! এত খবর কোত্থেকে দাসজীর কানে এসেছে তা ভাবতে পারে না। ভয় হয় তার এবারের হিসাবে চুমার ফাঁকগুলোর কথাই বোধহয় বলে বসবে এবার। অধরবাবু জানায়ঃ

—ওরা নাকি এক সঙ্গে পড়তে কলেজে।

গেণ্ডু দাস চুপ করে কি ভাবছে। বলে ওঠে—ওঁকে ওই গীতা রায়কে কাল বৈকালে একবার দেখা করতে বলবেন। আর আপনি ওঁদের উপর একটু নজর রাখুন। অবিনাশ-এর সঙ্গে শুনেছি প্রভাতবাবুর চেনাজানা একটু বেশী? ওই অবিনাশ গায়েন—নশীপুরের।

অধরবাবু অবাক হয় খবরগুলো শুনে। অধরবাবু বলেঃ

—শুনেছি বটে! অবিনাশের ওখানে যায়!

আজ গেণ্ডু দাসের আসল রূপটাকে যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছে অধরবাবু। অন্ধকারে একটা শয়তান তার ধারালো থাবা বের করেছে চরম আঘাত হানতে। আজ বাবার কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধ ভূধর পণ্ডিত বলতেন—চারিদিকে ওদেরই ধারালো নখ-দাঁত-এ কামড় বসবে অধর। দেখে নিস্ আমার কথা মিথ্যে হবে না। রাহু-কেতুর গ্রাসে আকাশের চাঁদও হারিয়ে যাবে, নামবে শুধু অন্ধকার।

অধরবাবু তখন ঠিক ভাবেন নি কথাটা। আজ মনে হয় নিজেকেও ওদেরই চক্রে আবদ্ধ করে ফেলেছে। তার থেকে বের হবার পথ ওর জানা নেই।

...অবিনাশ দাসজীর বাড়ি থেকে ফিরছে। সঙ্গে রয়েছে নকড়ি, দে-গাঁয়ের রামাই মোহান্ত, যতিলাল, আরও অনেকে। আজ দাসজীর কথাবার্তাগুলোয় তারা খুশী হয়নি।

যতিলাল বলে ঃ

—শালো ভূতিগাজনে ঢাক ফাঁসাবে নাকি গ অবুমামা?

অবিনাশ ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। তবু মনে হয় তাদের ভাত-তিত সব কিছুই জলজলগেন যেন ওই দাসজীর মত মানুষদের হাতেই সমর্পিত হয়েছে। নকড়ি ফুঁসে ওঠে—জমি কেড়ে লিবেক ভরা বর্ষায়! এতই সস্তা হে!

অবিনাশ জবাব দিল না।

সন্ধ্যা নামছে, কাজলা নদীর চর-ভূমিতে বিস্তীর্ণ সবুজ আখের খেতে বাতাস সুর তুলেছে, দু-একটা তারা ফুটে ওঠে শান্ত এই পরিবেশে। অবিনাশের মনে হয় তার জীবনে এই শান্তিটুকুকে উপভোগ করারও কোন অবকাশ নেই।

নকড়ি বলে—তুইও ঠিক থাকিস অবা, আমি সারা অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে কথা বলছি। জমিতে হাত দিতে এলে অনর্থ হয়ে যাবেক—হাঁ।

...টিয়া বৈকালে একটু সাজবেশ করে। আর সাজবেশ করার বয়সই তার। টিয়ার বাবা-দাদারা সদর সহরের লাগোয়া কোন গ্রামের লোক, তাই সহরের ছোঁয়া কিছুটা এসে লেগেছিল সেখানে। টিয়াও ছেলেবেলায় সেখানের পাঠশালায় পড়েছিল। ফ্রক পরে মাথায় ফিতে বেঁধে সেজেগুজে সহরের অন্যান্য মেয়েদের মতই স্কুলে গেছে, বেড়িয়েছে। মাঝে মাঝে দাদার সাইকেল-রিকশায় চেপে সহরের সিনেমায় গেছে। আর সেই টিয়াকে যে এমন অজ গ্রামে এসে পড়তে হবে টিয়া ভাবে নি। প্রথম প্রথম অবিনাশের সংসারে এসে মনমরা হয়ে থাকতো, আড়ালে কান্নাকাটিও করতো। মাঝে মাঝে ওই বেবশ টিয়া বিদ্রোহে মুখর হয়ে উঠতো।

অবিনাশ দেখেছে তাকে, টিয়ার রূপ-যৌবন যেন সবুজ গ্রামে এসে এখানের সতেজ গাছ-গাছালির মত প্রাণ-সম্পদে টসটসে হয়ে উঠেছে।

তবু অবিনাশ বলে ঃ

—এই গেরানের ঘরই ভালোরে!

টিয়া বলে—ছাই। সাঁঝবেলাতেই রাজ্যির আঁধার নামে, কাদা, প্যাচপেচে পথ, সিনেমা নাই—আলো নাই।

হাসতো অবিনাশ—ওসবে দরকার কি? জমিজারাত আছে, খামার, গরু, গোয়াল এসবের হেপাজত কর। গাঁয়ের সকলেই তো এই নিয়েই রয়েছে। তুই কেন থাকতে পারিস না?

টিয়ার ওসবে মন বসে না। মনের অতলের অতৃপ্তিটা ফুটে ওঠে ওর কথায়।

টিয়া বলে—তাও নিজের জমি তো দেনার দায়ে বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এখন ওই দাসজীর জমি নিয়ে এত রব-রবানি। বলে না—পরের সোনা নিও না কানে, টেনে নেবে হেঁচকা টানে!

অবিনাশ ওর দিকে চাইল। টিয়ার দু' চোখে কি কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। সুন্দর মেয়েটার মনের অতলে অবিনাশ দেখেছে চাপা অতৃপ্তির জ্বালা।

টিয়া বলে ঃ

—তার চেয়ে সহরেই চলো। দাদাকে বলে সাইকেলরিকশা ভাড়া করিয়ে দোব। একবেলা খাটলে আট-দশ টাকা রোজ! কি হবে দিন-রাত মাঠে এই রোদ-বৃষ্টিতে খেটে খেটে!

চমকে ওঠে অবিনাশ। মাটির কাছাকাছি মানুষ হয়েছে অবিনাশ। সহরে দু-একদিন গেছে, হাঁপিয়ে উঠেছে সে ওখানের জীবনের ভিড়ে। এখানের সবুজ দিগন্ত, তারাভরা আকাশ, মাটির মিষ্টি গন্ধ নেই। ক্ষেতে ধান-এর চারায় বাতাসের শিহরণ, তার মনেও আনে কিসের সাড়া। এসব সে টিয়াকে বোঝাতে পারবে না।

তাই টিয়ার কথায় জবাব না দিয়ে আপন মনে গরুর জন্য খড় কাটতে থাকে।

টিয়া সরে যায়।

এমনি করেই টিয়ার অবাধ্য মন অবিনাশের কাছে কোন সাড়া না পেয়ে গুমরে ওঠে। মুখ বুজে এখানে রয়ে গেছে মেয়েটা। আজ অবিনাশের মনে হয় টিয়ার কথাগুলো যেন সত্যি হতে চলেছে। ওই জমি-জায়গা সব ওরা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গ্রাম থেকে বের করে দেবে। এখানে এই

হরলিক্স

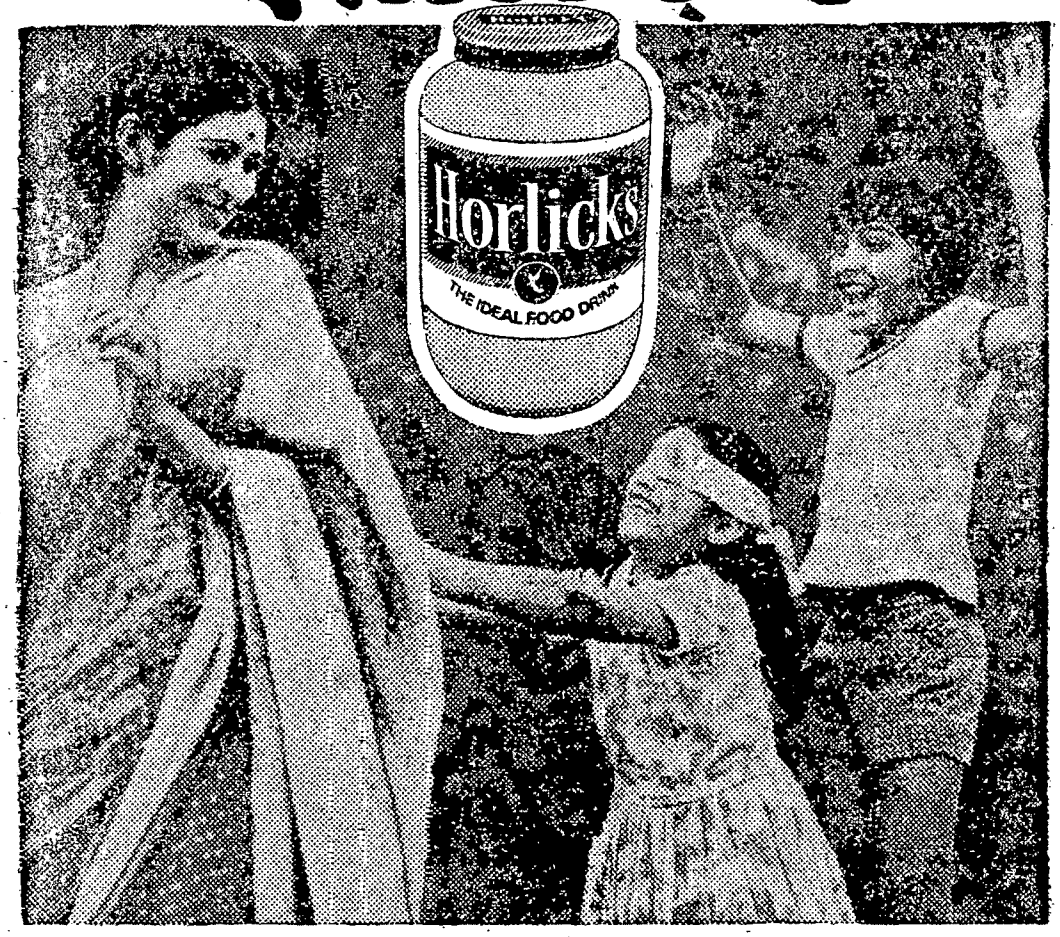

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে। এই স্বাস্থ্যই হ'ল সাফল্য ও সুখ। স্বাস্থ্যই আপনাকে কর্মঠ ও সক্রিয় রাখে এবং নিশ্চিন্ত ক'রে তোলে।

হরলিক্স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু, যা আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্সকে। সে জানে, হরলিক্স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

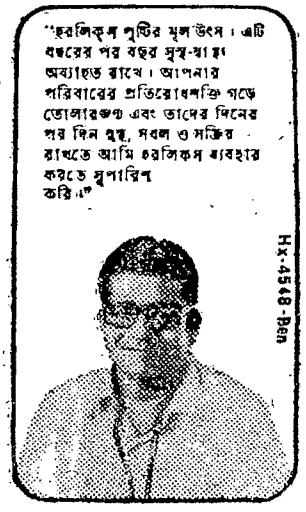

হরলিক্স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

মাটিতে থাকার অধিকারটুকু হারিয়ে যাবে তার। সহরে কলকারখানার ভিড়ে কুলি-গিরি, না হয় সাইকেলরিকশাওয়ালা হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে হবে তাদের। অবিনাশের সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নকড়ির মত সোজার হতে পারে না সে। তার মনের জ্বালাটা আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। একটা কিছু বিহিত তাদের করতেই হবে।

টিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলেছে। ক্রমশ তার অতৃপ্ত মন বাধ্য হয়েই এই নির্দেশ মেনে নিয়েছে, তবু একটা আশ্বাস তার মনে বাজে।

দাওয়ায় একটা মোড়া নামানো—একটু আগেই প্রভাতবাবু এসেছিলেন। পাশের গ্রামের স্কুলের মাস্টার।...

টিয়া বলে—ওতো নাই। দাসমশাই এসেছেন—ওখানে গেছে সবাই।

প্রভাত চাইল টিয়ার দিকে।

টিয়া বলে ঃ

—এসে পড়বে এখুনিই। বসুন না?

প্রভাত জানে কেন আজ দাসমশাই তাদের সকলকে ডেকেছে। ও এসেছে তাদের কথাগুলো শোনার জন্য। প্রভাত ক'বছর এখানে এসেছে স্কুলের চাকরি নিয়ে, দেখেছে অন্ধকার এই পল্লী অঞ্চলের সহজ-সরল মানুষগুলোকে, ওদের নগ্ন অভাব-দারিদ্র, তবু ওদের অন্তরের প্রীতিটুকুকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারেনি।

টিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালার কাজটা কোনমতে সেরে এবার চা-এর জল চাপিয়েছে।

রান্নার চালা থেকে দেখছে প্রভাতকে। টিয়ার মনে হয় প্রভাতের এখানে আসার আসল কারণ বোধহয় অন্য একটা কিছু রয়েছে। ওর অতৃপ্ত নারীমন এমনি অনেক স্বপ্নই দেখে, তার মূলে কোন সত্য আছে কিনা জানে না।

—চা!

প্রভাত অবাক হয়—আবার চা কেন?

টিয়া গাঁয়ের অন্য বৌদের মত জড়সড় হয়ে থাকে না। সহরে বাস করেছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়েছে সেখানে, তাই একটু মুখচোট আছে, আর রূপের চটকও না থাকা নয়। সেটাকে তবু ফুটিয়ে তুলতে পারে। অবশ্য তার জন্য অনেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু টিয়ার হাসির ঝিলিকটা অনেকটা ধারালো, ওই দিয়ে অনেক কথার জাল কেটে সে বেরুতে জানে। টিয়া হাল্কা স্বরে বলে ঃ

—বাঃ রে! চা তো খান গো! তা অবশ্যি আমাদের চা তেমন জুতের হবে না।

প্রভাত অপ্রস্তুত হয়ে বলে—না, না। বেশ চা করো তুমি!

টিয়ার মনের অতলে কথাটা জেগেছিল। হঠাৎ বলে ওঠে সে ঃ

—শুনছি জমি-জিরাত নকি চলে যাবে। আমার মনে হয় যাওয়াই ভালো।

প্রভাত ওর দিকে চাইল—কেন?

টিয়া বলে ওঠে—ইখানে থেকে কি হবে মাস্টারবাবু? তার চেয়ে সহরে গিয়ে তবু একটা কিছু করতে পারবে।

প্রভাত ওর কথা শুনে অবাক হয়। এ মাটিকে ওরা যেন ভালোবাসতে পারে নি। হয় তো ওই মানুষটাকেও। টিয়ার সারা দেহ-মনে সেই নীরব অতৃপ্তির জ্বালা। মা হতেও পারেনি সে—তাই ঘরের বাঁধন ওকে বাঁধতে পারেনি।

প্রভাত দেখছে টিয়াকে।

টিয়ার সারা মনের অতলে প্রভাতের ওই চাহনি যেন কি একটা ঝড় তুলেছে। নিজেকে আজ সে ওদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়. অবিনাশের কাছে সে

পেয়েছে শুধু অবহেলাই, তাই টিয়ার শূন্য মন নিজের প্রাধান্যকে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখে।

টিয়া বলে ঃ

—এখানে বন্দীলেড়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি মাস্টার। তুমি সহরের লোক, সহুরে মানুষ হয়ে এই অজ গ্রামে কি করে আছো বলতে পারো?

প্রভাত দেখছে বিচিত্র ওই টিয়াকে।

...হঠাৎ বাইরে কাদের কথার শব্দ শোনা যায়। অবিনাশরা ঢুকছে বাড়িতে। নকড়ি হ্যারিকেনের আলোয় প্রভাতকে দেখে বলে ওঠে ঃ

—আরে, ই যে মেঘ না চাইতেই জল গ! অ যতিলাল, উদিকে ডাক, মাস্টার হেথায় রইছে, কথাটা শ্যাষ করে যাই।

রাত্রি নামছে। অবিনাশ বেশ কিছু ক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ওর সারা মনের অতলে চাপা সেই জ্বালাটা ফুটে ওঠে। যতিলাল, নকড়ি ওরা সকলেই বসে চলেছে গেণু দাসের কথাগুলো।

প্রভাত বলে ওঠে—জমি তোমরা ছাড়বে না।

যতিলাল এমনিতেই ভীতু মানুষ। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আর তেমন খেতে না পেয়ে তার দেহ-মনের জোর অনেকখানি কমে গেছে।

ও বলে—যদি জোর করে ছাড়িয়ে নেয়!

ওরা জানে গেণু দাস, নিমাই ঘোষ,

হারুবাবুদের সেই শক্তি আছে।

অবিনাশ চুপ করে শুনছে ওদের কথাগুলো। টিয়াও দাওয়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভালোই লাগে খবরটা শুনে। এখানের পালা যত শীগগির ফুরোয় ততই মঙ্গল। অবিনাশকে চুপ করে থাকতে দেখে টিয়ার মনে হয় লোকটাও এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। তাই হয় তো এখানের এই মরামাটি ছেড়ে চলে যেতে চাইবে।

অবিনাশ যতিলালদের কথাগুলো শুনছে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলোর ছবি। তাদের নিজেরই ছিল ওই নদীর ধারে নোনাবাদায় এক লত্তে আট বিঘে জমি। ওর বাবা বলতো—আকালপোষ জমি। ওই জমিতে জলের জন্য ভাবতে হোতো না—আর নিজের চোখে দেখেছে ইয়া ধানের গোছ। এক হাতে ধরা যেত না। দীর্ঘ ধানের পুরুষ্ট শিষগুলো বাতাসে শির শির শব্দ তোলে।...

সেই জমি থেকে একদিন তাদের বাকী করের দায়ে নিলাম ডেকে কিনে নিল গেণু দাস। ওই চককে চক। সেবার ওর লাঠিয়ালরা হানা দিয়েছিল, সোনালী ধানের মাঠকে মাঠ ওরা কেটে নিয়ে গেল। তার বাবা বাধা দিতে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল আলের মাথায়, তাজা রক্তে সোনা ধানের মঞ্জরী লাল হয়ে উঠেছিল, তবু রুখতে পারেনি অবিনাশ তখন ছোট।

...আজ আবার ওরা তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায়।

নকড়ি বলে—কিহে অবিনাশ বলো ওই জমি গেণু দাসের হোক—তাতে ফসল ফলায় কে হে? আমরাই তো! তার জন্য আধা বখরা দিই—ধান ধার নিলে সুদ সমেত ফিরিয়ে দিই খামারে। তবে কেনে কেড়ে নিবেক জমি?

অবিনাশের চোখের সামনে তার বাবার পরাজিত রক্তাক্ত দেহটা যেন ভেসে ওঠে। তার সারা শরীরে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। অবিনাশ গর্জে ওঠে—রুখতে পারবি নকড়ি! দরকার হলে আমরাও দল বেঁধে রুখে দাঁড়াবো। দখল নিতে আসে, এবার লাঠির জেরিও দেখিয়ে দোবো। অনেক মার খেয়েছি, এবার জবার দিতে হবে।

প্রভাতবাবু দেখছেন অবিনাশকে। অন্ধকারে ওর দু' চোখ জ্বলে উঠেছে কি জ্বালায়। এমনি করেই বোধহয় মরীয়া হয়ে মানুষ কঠিন প্রতিবাদের জ্বালায় ফেটে পড়ে।

রমেশও তাজা জোয়ান। সে বলে—আমিও তাই বলি অবাদা। মরতে হয় এবার লড়েই মরবো।

—কে লড়াই করছে র‍্যা! অমা-নকড়াও রইছিস!

গিরিবালাকে দেখে চাইল ওরা। বুড়ির বয়স হয়েছে, একটা বাঁশের লাঠি ধরে যাতায়াত করে, কোমরটায় নাকি বাত পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছে। তবু বুড়ির তেজ এতটুকু কমে নি।

গিরিবালাকে দেখে নকড়ি বলে:

—তুমি আবার ফোড়ন কাটতে এলে কেনে গ?

বুড়ি বলে—শোনলাম কথাটা। তা বাপু মাস্টার—তুমি তো নেকাপড়া জানা ছেলে, সহরের বাবুদের কাছে বেত্তান্তটা জেনে-শুনে যা বলো তাই হবে। এ গোমুখ্যু গোঁয়ারের দলের কথায় কিছু হবে না।

যতিলালও শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা চায়। তাই লড়াই-এর কথায় সেও ভয় পেয়ে গেছল। এবার গিরিবালার কথায় সেও বলে:

—তাই ভালো মাস্টার। এখন সব তো শোনা কথা—ব্যাপারটা আসলে কি জানা দরকার। ঠিক বলেছো পিসী।

প্রভাত শুনেছে এদের কথা। সে বলে—তাই ভালো। তবে হুট করে মাথা গরম করা ঠিক হবে না অবিনাশ।

অবিনাশ বলে—মাথা যে গরম হয়ে ওঠে মাস্টারবাবু। ঠিক আছে—সবাই শলাপরামর্শ করেন, তারপর যা হয় করা যাবে। তবে বাবু—আম্মোও ছেড়ে কথা কইবো না আমার ভাতে হাত দিতে এলে।

রাত হয়ে গেছে। প্রভাতবাবুও ফিরে গেছেন বোর্ডিং-এ।

টিয়া গুম হয়ে শুনেছে অবিনাশের কথাগুলো। ওর মনের অতলে যেটুকু ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছিল, সেটা এক ফুৎকারে নিভে গেছে অবিনাশের কথায়।

অবিনাশ বলে—রাত হয়েছে। চল্ খেতে দিবি না?

টিয়া বলে ওঠে—ভাত তো চাপা দিই রেখেছি। ঢাকা খুলে খেয়ে নাও গে।

অবাক হয় অবিনাশ—তুই খারি না?

টিয়া সংক্ষেপে জবাব দেয়—আমার শরীর ভালো নাই। রাতে খাবো না।

অবিনাশ টিয়ার দিকে চাইল। টিয়ার রূপের খোলতাই ঠিক আছে। মুখে পানের লাল রস তখনও মিলোয় নি। পরনের শাড়ীটা নিজের হাতে কেচে ইস্ত্রি করে টিয়া। নিজেই শিবথানের মেলা থেকে লোহার ইস্ত্রি কিনে এনেছে। টিয়ার শরীর খারাপ হবার কোন লক্ষণই চোখে পড়ে না। বিকালে স্নান সেরে খোপাটাও বেঁধেছে, কপালে দিয়েছে কাঁচপোকার টিপ। তবু গুম হয়ে শরীর খারাপের কথা শোনাতে অবিনাশ অবিশ্বাসের সুরে বলে:

—কি যে হয় তোর মাঝে মাঝে?

টিয়া ওর দিকে জ্বালাভরা চাহনিতে চাইল মাত্র। অন্য দিন হলে সেও কঠিন স্বরে শুধোতো তার ওই কথা বলার কারণটার সম্বন্ধে। আজ টিয়ার ঝগড়া করতেও রুচি নেই। টিয়া তাই এড়িয়ে গেল অবিনাশকে। মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়ে সে।

অবিনাশ এ ঘটনায় অভ্যস্ত। ও দেখেছে টিয়ার এই জ্বালাটাকে। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, ওর মন বসাবার চেষ্টা করেছে অনেকভাবে এই মাটিতে, কিন্তু অভাবের কাঠিন্যে নয়—টিয়ার অতৃপ্তিই তার সংসারে মাঝে মাঝে কি অশান্তির জ্বালা এনেছে। অবিনাশের মনও তিলে তিলে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তার সামনে আজ টিকে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। অবিনাশ দেখেছে গেণু দাস, নিমাই ঘোষ, হলধর-বাবু—এ এলাকার সব জোতদারদের প্রকৃত স্বরূপটাকে, ততই যেন জ্বালাটা বেড়েছে তার। টিয়ার কাছেও সে কোন সমবেদনা-আশ্বাস পায় নি। চুপ করে জল দেওয়া ভাত আর একটু পোস্ত চচ্চড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল অবিনাশ। টিয়াকে কিছু বলারও তার নেই।

জ্যৈষ্ঠমাসের ধু-ধু রোদের জ্বালাভরা দিনের শেষে অবিনাশ নদীর ধারে তার সব্জীক্ষেতে জলসেচ করছে। পলি-মাটিতে সারবন্দী ঢেঁড়স-ঝিঙে-ডাঁটা-বেগুন লাগিয়েছে তারা, নীচু জমিতে কিছু বোরো ধানও বুনেছে। নদীপুরের চাষীদের কাছে এই নদী আর এই পলিচর সোনা ফসলের ক্ষেত। নীচু জমিতে জয়া-পদ্মা ধানের চাষও শুরু করেছে তারা। জল তোলে নদী থেকে। বুকটান ধরে দোনী টানতে।

যতিলাল বলে—ইবার একটা পাম্প কিনবো হে। তা ব্লকের বাবুরাই তো খাবেন শাঁসটুকু, আমরা ছোবড়া চুষে আর ইসব করতে পারি?

নকড়ি ওদিকে পটল কিছু লাগিয়েছে। পটলের দরও পায় ভালো। মহাজনরা ক্ষেতে এসে নিয়ে যায় সব্জী। কিছু হাটেও নিয়ে যায় তারা। নকড়ি গোছানো লোক।

তার নিজের পাম্প সেট একটা আছে। সেটা দিয়ে ধানের মাঠে জল তুলছে সে। নকড়ি বলে—তা বাবু যে পুজোর যে মন্তর, তা পড়তে হবে বৈকি! দিয়ে-থুয়ে ঘরে তোল কেন্নে পাম্পটো।

অর্থাৎ তারপর নকড়ি যে আর ওমুখো হয় নি, ব্লকের বাবুরাই এবার নকড়ির পিছনে ঘুরছে টাকার জন্যে তা অবিনাশ কেন, সকলেই জানে।

অবিনাশ জবাব দিল না, হাতের টানে শূন্য দোনটাকে টেনে জলে ডুবিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আপন ভারে জল ভাঙ দোনটা উঠে গিয়ে হুহুতে পড়ছে। মাটির বুকে ওই জল কোনদিকে চলে যায়, ভিজে ভিজে সুবাস ওঠে।

...বিকাল গড়িয়ে গেছে। মুক্ত উদার দিগন্তে নদীর বালুচরে সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যা নয়, কালো একটা মেঘ চারিদিক ঘিরে এগিয়ে এসেছে। অবিনাশ মাঠেই থাকে সারাদিন প্রায়। ঘরে টিয়ার সঙ্গে তেমন বনে না, টিয়াও এই জীবনকে মেনে নিতে পারে নি। দেখেছে অবিনাশ যতিলালের বৌ, নকড়ির বৌ ওরা মাঠে আসে ওদের জন্য মুড়ি-ভাত নিয়ে। যতিলালের বৌকে দেখেছে তিন পহর বেলায় নদীর ধারে ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে যতিলালকে খাওয়াতে, দু'জনেই খায় এখানে। ওদের যেন চড়ুইভাতির উৎসব জমে প্রায়ই। তবু অবিনাশ ভাবে এসব ভুল ভাঙবে টিয়ার। এ বছরের ফসল পেলে অবিনাশ টিয়ার জন্য হার একটা গড়াবে। আর সহর থেকে ভালো শাড়ি দু'খানা কিনবে। জয়া ধানের গাছে গাছে এসেছে মঞ্জরীর পুঞ্জে সোনালী পূর্ণতা। এই এলাকার সেরা ধান করেছে সে।

কয়েকটা বছর এভাবে ফসল পেলে সে এবার নিজের হারানো জমির বেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনবে। তখন আর পরের জমি ভাগচাষ করে ওদের দয়ায় সে বাঁচবে না, বাঁচবে নিজের জমিতে নিজের পরিশ্রমের ফসল আহরণ করে। সেই দিনের স্বপ্ন দেখে অবিনাশ, টিয়াকে সেটা বোঝাতে পারেনি।

হঠাৎ চাপা একটা শব্দ ওঠায় চাইল অবিনাশ। আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে মেঘে—স্তব্ধ দিগন্তসীমার শালবনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে মত্ত ঝড়ের তাণ্ডব। লাল-ধুলোর আস্তর মাখা কোন রুদ্র সন্ন্যাসী যেন হুঙ্কার তুলে এগিয়ে এসে শান্ত জনপদ-প্রান্তরের বুকে নেমেছে। ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে তাল-জটাজাল, মত্ত হুঙ্কারে দিক-বিদিক্ মুখরিত করে তুলেছে।

...একটা বিজলীর ঝলক সারা আকাশকে ফেড়ে-ফুঁড়ে ঝলসে ওঠে—কাঁপছে ওই প্রান্তর। তারপরই নেমেছে বৃষ্টির ধারা। চমকে ওঠে অবিনাশ!...সামনে পাঁচ বিঘে ধানের ক্ষেতে মঞ্জরী ভারাবনত পাকা ধানের ফসল। আকাশের দিকে চাইল সে। ধোঁয়াটে-ছোলাটে বিবর্ণ আকাশ। বৃষ্টির অঝোর ধারায় তার সারা গা ভিজছে—তবু মনে হয় শেষ গ্রীষ্মের মেঘ—দু-এক পশলা বৃষ্টির পরই থেমে যাবে এই তাণ্ডব। বাড়ির দিকে চলেছে অবিনাশ।

...টিয়ার নিজের দুটো গরু আছে। ওগুলোর হেপাজত করে সে—আর দুধও কিছু হয়। দু'জনের সংসার। টিয়া ওই দুধটা নিজে নশীপুরের দু-একটা বাড়িতে যোগান দিয়ে আসে। তবু কিছুক্ষণের জন্য সে বের হতে পারে।

টিয়া দুধ দিতে এসেছিল নশীপুরের এ পাড়ায়। ফেরার পথে ঝড় উঠেছে হঠাৎ। আর সেই সঙ্গে নেমেছে বৃষ্টি। টিয়া দৌড়ছে—তার দেহের ছন্দটা এই মুখ-আঁধারি বেলায় দেখার কেউ নেই। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে তার চুল, শাড়ির আঁচল। আর বৃষ্টিতে এর মধ্যে ভিজে নেয়ে উঠেছে। সামনেই বড় বাড়ির চাতালে উঠে পড়েছে। বিদ্যুতের ঝলক আর বাজের শব্দটায় খুবই ভয় লাগে টিয়ার, মনে হয় সারা আকাশ যেন ভেঙে পড়বে ওর মাথায়। মেয়েটা দৌড়ে গিয়ে ওই বড় বাড়ির চাতালে আশ্রয় নিয়েছে, তখন ভিজে গেছে ওর সারা শরীর।

...গেণ্ডু দাস মাঝে মাঝে এ বাড়িতে এসে উঠে। আজও বৈকালে সে কিছু কাগজপত্রের হিসাব-কিতাব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ওই ঝড়ো হাওয়ায় কোথায় বিজলির লাইনে গোলমাল হওয়ায় বাতিটা নিভে গেছে, গেণ্ডু দাস বের হয়ে এসেছে চাতালে। হঠাৎ সামনে ওই টিয়াকে দেখে চাইল। এক ঝলক বিদ্যুতের আভায় দেখছে মেয়েটার অসংযত বেশবাস। সারা দেহের নিটোল পূর্ণতা বৃষ্টির জলে ভিজে আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। টিয়ার খেয়াল নেই। নির্জন চাতালে আবছা আঁধার নেমেছে, ও ভেবেছে এখানে কেউ নেই, তাই ভিজে শাড়িটা গা থেকে খুলে নিংড়ে নিয়ে হাওয়ায় ধরেছে। আদুড় গা—মুখের ধারালো আদল—ওই দেহের মদিরতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে। হঠাৎ চমকে ওঠে মেয়েটা কার পায়ের শব্দে।

—কে!...

এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তিটা। টিয়া শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কৌতূহলী চাহনি মেলে চাইল।

—দাসমশাই!...

গেণ্ডু দাস দেখছে ওকে। মুখচেনা—কিন্তু ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

তবু শুধোয় সে—কোথাকার গো তুমি?

...টিয়া দেখছে লোকটাকে। এ চাকলার মহামহিম ব্যক্তি। তবু টিয়া ওই বিজলির আলোয় এই রাত নির্জনে দেখছে বিচিত্র একটি মানুষকে, যার চোখে ফুটে উঠেছে নীরব একটা তৃষ্ণার জ্বালা। ধূর্ত মেয়েটা চেনে এই চাহনিকে।

টিয়া সহজভাবে বলার চেষ্টা করে—উত্তর নশীপুরের মোড়লদের বাড়ির গো দাসজী! দুধের রোজ দিতে এসেছিলাম।

এবার দাসজী চিনতে পারে—অবার বৌ না তুমি?

টিয়ার হাল্কা ঠোঁটে একটু হাসির ধারালো আভাস ফুটে ওঠে। গেণ্ডু দাস দেখছে ওকে। টিয়া জানে ওর পরিচয়, ওই একটি মানুষ এই এলাকার সব মানুষের অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আজ নিজের প্রাসাদ বানিয়েছে। সেদিন দেখেছিল টিয়া নকড়ি, যতিলাল, অবিনাশদের চোখে নীরব ভয়ের আতঙ্ক, সব হারাবার আতঙ্ক।

টিয়া তাই ওই মানুষটাকে কাছ থেকে দেখতে চায়।

গেণ্ডু দাস বলে—তা এখানে দাঁড়িয়ে যে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাবে। বারান্দার এদিকে এসো।

টিয়া বলে ওঠে—বৃষ্টি ধরে আসছে মনে হয়।

গেণ্ডু দাস হাল্কাস্বরে বলে—যদি না ধরে?

টিয়া জানায়—বৃষ্টির মধ্যেই চলে যাবো। এমন ভেজা তো অভ্যেস আছে গো বাবু।

হঠাৎ ওই বৃষ্টির মধ্যে জিপটাকে আসতে দেখে চাইল। গেণ্ডু দাসও দেখেছে ওই হেডলাইটের নিশানা। কেতুলাল ফিরছে সহর থেকে। আজ রাতে অধর মাস্টার—আরও দু-একজন আসবে, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হবে। গেণ্ডু দাসের মনে হঠাৎ সেই কূট চালগুলো ভেসে ওঠে। ও যেন অন্য জগতে হারিয়ে যায়।

মেয়েটার কথাও ভুলে গেছে সে। এগিয়ে গেল ওদিকে।

বৃষ্টি কমে এসেছে। টিয়া এই ফাঁকে পিছনের পথ দিয়ে চলে যাবে ঝিমঝিম বৃষ্টির মধ্যে।

কেতুলালের সন্ধানী চোখে পড়েছে ওই মেয়েটি। জিপের হেডলাইটের আলোয় দেখেছে সে টিয়ার দেহের অফুরান ঢল নামা যৌবনপ্রবাহকে। কেতুর ধারালো চোখের চাহনি একনিমেষেই মেয়েটার সারা দেহ যেন পরখ করে নিয়েছে।

গেণ্ডু দাসকে এমনি আঁধার নির্জনে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে কেতুলাল। টিয়াকে সেও চেনে। তাই বলে ওঠে কেতুলাল :

—দাসমশাই-এর ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?

গেণ্ডু দাস চতুর লোক। ওর কথার ইঙ্গিতটা বুঝেছে। তবু সহজভাবেই বলে—আমার সবকিছু তো তোমাদের জন্যেই হে। আমার ব্যাঘাত-ট্যাঘাতের কোন প্রশ্নই নেই।

কেতুলাল হেসে ওঠে, তাহলে আমার কথাটা ভাবো দাসজী।

...টিয়া শুনেছে ওদের কথাগুলো। মেয়েটা এমন নির্জনে দেখেছে ওদের ভিতরের স্বরূপ। একটা মস্ত খবর তার জানা হয়ে গেছে। নিজের কাছেই মেয়েটার দাম বেড়ে যায় অনেকখানি। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে।

তখনও থেকে থেকে বিদ্যুতের আভা উলসে ওঠে সারা আকাশ ফুঁড়ে। টিয়ার মনে হয় সেও অনেক কিছু অঘটনই ঘটাতে পারে, আর অজান্তেই সেই খবরটা সে পেয়ে গেছে।

—এই বৃষ্টির মাঝে হঠাৎ হাসছে মেয়েটা। নিজের সুপ্ত মনের অতল থেকে জেগেছে একটা বিচিত্র সত্তা—যে ওই বিজলির ঝলকের মতই চঞ্চল, শক্তিময়ী আর অগ্নিগর্ভা।

অবিনাশ টিয়াকে দেখে চাইল। সারা গা মাথা শাড়ি ভিজে গেছে। দেহের খাঁজে খাঁজে বসেছে ওই শাড়িটা, অবাক হয়ে দেখছে অবিনাশ যৌবনমাতাল বিচিত্র একটি মাদকতাময়ী মেয়েকে। এ যেন অন্য টিয়া।

—কোথায় গিইছিলি রে? অবিনাশ বুধোয়।

—হাতের শূন্য ঘটিটা দেখে অবিনাশ বুঝেছে দুধের রোজ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু টিয়া সারা দেহে উদ্দাম লাস্য তুলে হাল্কা হাসিতে ভেঙে পড়ে বলে ঃ

—মরতে! তা যম বল্লে তুমি খুব সোন্দর। এত সকাল মরে কি হবে। তাই ফিরে এলাম, জ্বালার তো শেষ হয়নি এখনি!

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে না। টিয়া আঁচলা থেকে একটা শুকনো শাড়ি টেনে নিয়ে বলে ওঠে ঃ

—বিমুখ হয়ে বসো দিকি! ইগুলান ভিজে গোবর হয়ে গেছে। বদলে ফেলি। কি হিম রে বাবা! জাড়ে কালিয়ে গেলাম।

অবিনাশ সরে যায়। টিয়া এমনিই হাসিখুশি আবার যখন তখন কি রাগে ফেটে পড়ে। ওকে বোঝা দায়। তবু টিয়ার আজকের পরিবর্তনটা অবিনাশের চোখে পড়েছে।

টিয়া উনুনে চা চাপিয়েছে, কাঠের আঁচের একটু লাল আভা পড়েছে ওর নিটোল ফর্সা গালে। এমনি বৃষ্টিনামা রাত নির্জনে ওই পরিবেশে টিয়াকে যেন হঠাৎ ভালোবাসতে ওর ইচ্ছে করে, কিন্তু অবিনাশ দেখেছে আগেকার মনটা—সেই হঠাৎ খুশিতে ভরে ওঠার মত মানসিক পরিবেশটাও হারিয়ে গেছে। টিয়ার জন্য দুঃখ হয়, ওকে কিছুই দিতে পারে নি অবিনাশ। ওর মনের কোন সাধই পূর্ণ হয় নি। এমন কি মা হতেও পারে নি টিয়া। তাদের ঘর শূন্যই রয়ে গেছে।

আর বেড়েছে অভাব আর সমস্যা-গুলো।

—কি দেখছো গো?

অবিনাশ টিয়ার ডাকে চাইল। টিয়ার দুচোখে আজ বিচিত্র একটা চাহনির মাদকতা, হঠাৎ ওই ঝড়-বাদলের মাতন টিয়াকে যেন বদলে দিয়েছে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে গেণ্ডু দাসের সেই চাহনি, ওরও দেখেছে টিয়া কি নেশার ব্যাকুলতা। পুরুষ জাতগুলোকে দেখেছে টিয়া। আজ তার রক্তেও কি একটা নেশা এসেছে। অবি-নাশের ওই কথা ভাবার অবকাশ নেই।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে সে। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণই নেই। ঝড় থেমেছে কিন্তু আকাশ জুড়ে মোলাটে মেঘ জমে বসেছে আর অঝোর বৃষ্টির শব্দে ভরে উঠেছে চারিদিক। মাঠে পাকা ধানের গাছগুলোর কথা মনে পড়ে। হয় তো পাহাড়ী নদীর চল নামবে এই হঠাৎ বৃষ্টিতে! তারপর!

—অবিনাশের চোখের সামনে কি সর্বনাশের ছায়া ঘনিয়ে আসে। টিয়ার ওই আহ্বানে সাড়া দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। অবিনাশ বলে ঃ

—সর্বনাশ হয়ে যাবেক রে এই বর্ষায়, মাঠ জুড়ে পাকা ধান পড়ে রইল।

টিয়া ওর দিকে চাইল একটু হতাশা ভরে। অভিমানী মেয়েটার মনে হয় অবিনাশের কাছে তার কোন দামই নেই। ওর কাছে ওই মাটি-জমি-ধান-ফসলই সব-চেয়ে বড়। সেই ভাবনাগুলোর জমাট দেওয়ালে বারবার মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হয়েছে টিয়া। তার সারা মন কি বেদনার্ত হাহা-কারে ভরে উঠেছে। এখানে তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নেই। টিয়া চুপ করে থেকে বলে—রাত হয়েছে। খেয়ে নাও। ঘরদোর হেঁসেল মুক্ত করতে হবে।

টিয়ার মনের সেই সুরটা এমনি করে বারবার কি চরম হতাশায় হারিয়ে গেছে। গুমরে উঠেছে ওর ব্যর্থ নারীমন। অবিনাশ সে খবর রাখে না।

.....রাতভোর বৃষ্টির পরও আকাশ তেমনি মেঘে মেঘে ঢেকে রয়েছে। ছাড়ার নাম নেই! অবিনাশ ভোর হওয়ার মুখেই বের হয়েছে। তখন সবে ফর্সা হচ্ছে। সূর্য ওঠার নাম নেই—বৃষ্টি সমানে চলেছে।

মাঠের ওখানে গিয়েই চমকে ওঠে।

কাজলাদীঘির উঁচু পাড় থেকে দেখা যায় আদিগন্ত মেঘলার যেন নুইয়ে পড়েছে আর নদীর দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। রাতা-রাতি সেই আধমরা নদীর রূপ বদলে গেছে। নেমেছে গেরুয়া ঢল, নীচু জমি-গুলোয় জল জমেছে।

ওই বৃষ্টির মধ্যে অবিনাশ এগিয়ে আসে কি ব্যাকুলতা নিয়ে তার ধানের ক্ষেতের দিকে। অনেক কষ্টে জল ঠেনে ঠেনে ওই পাঁচ বিঘে জমিতে আই আর এইট ধান দিয়েছিল সে। সার গোবর দিয়ে দিনরাত হেপাজতে করেছে। নিজের সাঁচ্চত কিছু টাকার সবটাই ঢেলে ওই জমিতে সে এই অঞ্চলের সেরা ধান ফলিয়েছে। রাশি রাশি মঞ্জরীতে ঢেকে গেছে গাছ-গুলো, যেন ধানের স্তূপ হয়ে আছে ক্ষেতে। আজকালের মধ্যে কাটতো।

কিন্তু ওই গেণ্ডু দাসের জরুরী ডাকে কাল ওদের যেতে হয়েছিল সব কাজ ফেলে, শুনে এসেছে চরম সর্বনাশের কথা, আর কালই নেমেছে আকাশজোড়া বৃষ্টি। ধান কাটতে পারেনি লোকজন নিয়ে।

আজ ওই ধানক্ষেতের বুকে নদীর কাটা খাদ ছাপিয়ে এসে পৌঁছেছে গেরুয়া জল। চমকে ওঠে অবিনাশ, গাছগুলোর মঞ্জরীতে এসে পৌঁছেছে সেই জল। সোনা রং-এর সব দাক্ষিণ্যকে কি নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তছনছ করে দিয়েছে।

অবিনাশ দেখছে তার চরম সর্ব-নাশটাকে। চোখের সামনে তার যথাসর্বস্ব যেন লুঠ করে নিতে চায় নিষ্ঠুর কোন বিধাতা।

নকড়ি-যতিলালও এসেছে। ওদের ক্ষেতে জল এখনও পৌঁছেনি। যতিলাল বলে—কি দেখছো গো অবাদা, গাঁতিতে লেগে যাই নালে ধানগুলোন যে সব যাবেক।

সুখী ধান। যেমন ফলে এরা তেমনি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। নরম খড়গুলো এক রাতের জলেই পচে গেছে, তবু ওরা দল বেঁধে মাঠে নেমেছে।

খড়গুলো ধরা যায় না। কাস্তে লাগাবার উপায়ও নেই। আর আলগা ধানগুলোর অর্ধেক মঞ্জরী থেকে ঝরে ঝরে জলে পড়ে যাচ্ছে। জলে কাদায় ওই রাশ রাশ সোনাধান ছিটিয়ে পড়ে।

অবিনাশ গুম হয়ে দেখছে তার এই সর্বনাশটাকে। এত আশা-স্বপ্ন সব ওই নিষ্ঠুর বিধাতার অভিশাপে ব্যর্থ হয়ে গেল। কোনমতে পচা গলা ধান, খড়-এর স্তূপ খানিকটা এনে হাজির করেছে।

টিয়া দেখছে।

সেও অবাক হয়—ইকি গো?

অবিনাশ কথা বলে না। জলে-বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, সর্বাঙ্গে কাদা আর পচা খড়ের আস্তরণ। ও যেন পরাজিত একটা লোক। বেদনার্ত চাহনিতে চেয়ে আছে টিয়ার দিকে। অবিনাশ বলে ঃ

—কাল ওই গেণ্ডু দাসের ডাকে গিয়ে

এই হল বৌ। আরোও কি সব্বোনাশ হবে জানি না।

গেণ্ডু দাস-এর ডাকে হাজিরা দিতে যাবার ফলেই কাল ওরা কাজে করতে পারে নি। নাহলে ওই ধান সব কালই ওরা কেটে আনতো—তার ঘর ভরে যেতো সোনা ধানের স্তূপে। কিন্তু তা হয়নি—তার বদলে এসেছে খানিকটা পচা কাদামাখা ধানের স্তূপ। পচে গেছে—এবার ফল বেরিয়ে যাবে।

টিয়া কি ভাবছে।

বিজলির ঝিলিক আর মেঘের গর্জন-মুখর অন্ধকারে সে দেখেছিল একটা লোককে, তাকেও ডেকেছিল সে! তার চোখে দেখেছিল টিয়া কি আদিম লালসা। ওর বৃষ্টিভেজা দেহটাকে যেন চোখ দিয়ে গিলে খেতেই চেয়েছিল সে।

টিয়া চুপ করে ভাবছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। তখনও সমানে চলেছে। গরু ৭ কে টিয়ার খেয়াল হয়। ওকে খেতে দিতে হবে। ডাহরিতে বের হতে পারেনি—গোয়ালেই বাঁধা আছে ওরা।

একনাগাড়ে বৃষ্টি চলেছে। বদন ডাক্তার নশীপুর হাটতলার ওদিকে একটা চালাঘরে বসে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। বদন এখানের পুরানো লোক—এককালে তারই নামডাক ছিল এই দিগরে। বিস্তীর্ণ মাঠান এলাকা, মাঠের বুকে এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটা গ্রামবসত। ওদিকে বনের মধ্যেকার বসতের লোকজনের কাছে বদন ডাক্তারই ছিল একমাত্র ভরসা। সাইকেল চেঙিয়ে বদন যেতো গাঁয়ে গাঁয়ে—তার ভিজিটের বালাই নেই। ইনজেকশনও দিতে পারে, আর নাড়ি টিপে সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধের বাক্স খুলে যা হয় কিছু দিতো। চলমান ডিসপেন্সারীই বলা যেতো তাকে।

কালো চিমড়ে চেহারা, অবশ্য লোকে আড়ালে বলতো—পোড়া কাঠ।

কেউ বা আর একটু এগিয়ে যেতো, তাদের ভাষায় বলতো—আংরা! তবু বদনের দিন চলে যেতো ওইভাবে। ইদানীং নশীপুরে সরকারী ডিসপেনসারী হয়ে মুশকিল হয়েছে তার। তার কাছে রোগীরা বড় একটা আসে না—ওখানেই পাশ করা ডাক্তারের কাছে যায়। অবশ্য ওষুধপত্র তেমন থাকে না।

আর বদন এখন তার কাজের পরিধি একটু বাড়িয়েছে। মানুষের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং গরু মোষের চিকিৎসাও করে। আর কিছু বাঁধা খদ্দের এখনও আসে ওই মাঠ প্রান্তরের বসতে। তাইতে চলে কোন-মতে।

বদন অবশ্য চুপচাপ বসে থাকে না। আজ আটকে পড়েছে বর্ষায় আর কাজলা নদীর বানের দাপটে। বেলা হয়ে গেছে। অন্য দিন হাটবারে লোকজন আসতে সুরু করে মালপত্র, আনাজপাতি নিয়ে। বাঁধা দোকানের ব্যস্ততা দেখা যায়। রসিক ময়রার দোকানে তেলেভাজার কড়াই চেপে যায়। আলুর চপ, পেঁয়াজি ভাজা সুরু হয়।

মদনের কাপড় গামছার দোকানে লোকজন আসতে সুরু হয়। আর বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে কিছু উটকো ফিরিওয়ালার দল সস্তা মনোহারী জিনিস—আয়না, ফুলেল তেল, গেঞ্জি-শাড়ি-ফ্রক-এর বাণ্ডিল, ধন্বন্তরী দাদের মলম, হজমের যম—এ সব নিয়ে এসে আসর সাজিয়ে বসে। বাঁশবন, আম, বটগাছ ঘেরা জায়গাটা লোকের ভিড়ে আর কলরবে ভরে ওঠে।

আজ নিঝুম দু' একজন চাষী কিছু কুমড়ো কচু এনেছে, তারাও এখান-ওখানে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য। বৃষ্টি থামারও নাম নেই।

বদন ডাক্তার পাখার উল্টো পিঠ দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলে ওঠে পাশের সেলুনের হরিপদকে—আজ কি মাছি ওড়াবি রে হরি? লোকজন সব গেল কোথায়?

হরিপদ উৎকর্ণ হয়ে কি শুনছিল।

স্তব্ধ বাতাসে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে আসে নদীর মত গর্জনের শব্দ। দূরে কোথায় যেন কলরব উঠছে। হরিপদ বলে:

—খেয়া বন্ধ গো, লোকজন আসবে কি রে!

বদন অবাক হয়—এত বড় বান! বলিস কি রে!

হঠাৎ স্তব্ধতা ছাপিয়ে কলরব ওঠে। হরিপদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। বদনও অবাক হয়।

—কি রে?

—আজ্ঞে মদনপুরের বাঁধে হানা পড়েছে। সকাল থেকেই লোকজন গিয়ে পড়েছে ওখানে। অসময়ের বান—বাঁধও ঠিক নাই। যদি একবার ফেটে যায় বিবাক ভাসিয়ে দিবেক। তাই লোকজন হাটেও আসেনি।

বদন ডাক্তার অবাক হয় খবরটা শুনে। হঠাৎ তার যেন করার মত একটা কাজ এসে গেছে। চতুর সন্ধানী লোক বদন দত্ত। বেশ বুঝেছে আজ খদ্দেরপত্র আর তেমন হবে না।

বদন বলে ওঠে—বলিস কি রে? এ যে ভরাডুবি হবে রে!

কাঁধ থেকে সাদা কাপড়ের পটি লাগানো ছাতাটা নিয়ে মালকোঁচা মেরে চিমড়ে বদন দত্ত বের হয়ে পড়লো এই বৃষ্টিতেই।

...অসময়ে বান এসেছে ঠিক প্রথম বর্ষার আগেই। পাহাড় অঞ্চলেও কদিন অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে, তাই কাজলা নদীর শূন্য বুক জুড়ে নেমেছে গেরুয়া ঢল, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলরাশি মত্ত প্রবাহে বয়ে চলেছে। এর মধ্যে বৃষ্টির জল জমেছে দুদিকের গ্রামের মাঠে। সব্জীপত্র যা ছিল সব ডুবে গেছে ডুবে গেছে ধানক্ষেত, আখের বিস্তীর্ণ সবুজ জমিগুলো।

বাঁধের উপর লোকজন জমেছে। গেয়ো জলস্রোত এসে হানা দিয়েছে মদন-পুরের বাঁকের মাথায়। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলছে ওরা।

আশপাশের গ্রামের লোকজন এসে ভেঙ্গে পড়েছে।

অবিনাশ-যতিলাল-নকড়ি দেগাঁয়ের রঞ্জনের লোকজন আশপাশের গ্রামের সকলেই এসে পড়েছে। জমিজারাতের ফসল গেছে, এবার এই বানের সাপট হেনেছে তাদের জমিজারাত, ঘরবাড়ি—তাদের অস্তিত্বের উপরই। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে এই জলস্রোত বালির পাহাড় ঠেলে নিয়ে ঢুকবে তাদের জমিতে, কোথাও খাল করে দেবে—গ্রামবসতের মাটির ঘরবাড়িগুলোকে উড়িয়ে দেবে।

সেই চরম সর্বনাশের ছবিটা দেখে আজ তারা মরীয়া হয়ে ছুটে এসেছে বাঁধ বাঁধার জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি পড়ছে বাঁধে, প্রভাতবাবুরাও স্কুল থেকে এসে হাজির হয়েছেন। বাঁশ-গাছের ডাল-তালপাতা সব দিয়ে বাঁধের সামনে খুঁটি পুতে মাটি ফেলছে।

কিন্তু ওই মারমুখী নদীর ধারালো জিবের সাপটে ওই মাটিটুকুও সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে যায়। আবার জলের ধারালো ছোবল এসে আঘাত হানে বাঁধের গায়ে। বৃষ্টির ধারায় স্নান করে গেছে সকলেই। তবু ওদের চেষ্টার অন্ত নেই। প্রভাতবাবুও লোকজনদের নিয়ে বাঁধে লড়ছেন। এ যেন একটা হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গেই লড়ছে তারা।

হঠাৎ দেখা যায় বদন ডাক্তারকে। মাথায় ছাতি, কোমরে কাপড়ের উপর গামছাটা জড়ানো। সেও জলকাদা মেখে ওদের লড়াই-এর সামিল হয়ে চীৎকার করে —মাটি! মাটি ফেল!

প্রভাতবাবু চাইল ওর দিকে। বদন জানে কোথায় কি বলতে হয়। চীৎকার করে সে—শাঁখারা বাঁধ করেছে! এ যে ঘোগের বাসা গো—চারিদিকে শুধু ইন্দুরগাড়া।

জীর্ণ বাঁধটা ওই প্রচণ্ড জলের চাপ সইতে পারছে না। বাঁধের এদিক-ওদিকে ইন্দুরের গর্ত, সেগুলোতেই বিপদ ডেকে আনে। ওই গর্তে ঢুকেছে নদীর জল, আর বাঁধের ভিতরের সেই গর্তগুলোয় জল ঢুকে এবার ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে। থর থর

কাঁপছে বাঁধটা।

চীৎকার করে ওঠে প্রভাত—সরে যা অবা!

ওরাও বুঝতে পেরেছে তাদের এত লড়াই সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। উন্মত্তা কাজলা নদী এবার তাদের উপর চরম আঘাত হেনেছে। একটা সাপটে বিরাট খানিকটা মাটির চ্যাঙড় ধসে পড়ে—তারপরই একটা প্রচণ্ড শব্দে বাঁধের বেশ খানিকটা অংশ ছাড়িয়ে নিয়ে সফেন পেরুয়া চল লাফ দিয়ে নামল এ দিকের ক্ষেতে—চীৎকার আর্তনাদ ওঠে—রুদ্ধমুখ জলধারার উন্মত্ত গর্জনে ওদের আর্ত চীৎকার দিক দিগন্তের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম গ্রামান্তরের লোকও শুনেছে সেই সর্বনাশা আর্তনাদ।

—বাঁধ ভেঙেছে—কাজলা মোড়ের বাঁধ! আর করার কিছুই নেই। ওদের চোখের সামনে তখন নদীর জলস্রোত লাফিয়ে পড়েছে। বদন ডাক্তার চীৎকার করে।

—উ শালাদিকে ডাকো হে! বাঁধ বাঁধার মালিক সেই কেতুলালকে ডাকো।

ওর কথার জবাব দেবার মত অবস্থা কারোরই নেই। চারিদিকে বয়ে চলেছে জলস্রোত। ওরা এবার গ্রামবসতের দিকে ছুটেছে।

যদি কোনরকম ঘরবাড়ি—গরু-বাছুর—নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারে।

কেতুলাল অবশ্য খবরটা পেয়ে গেছে। গেণ্ডুবাবুও জানেন বাঁধ ভাঙার খবর। কেতুলাল তখন ওই গেষ্ট হাউসেই রয়েছে। গেণ্ডু দাসও এসে হাজির হয়। ছাদ থেকে দেখা যায় জল আর জল। অবশ্য তাদের এখানের টিলায় জল পৌঁছবে না। কেতুলাল বলে:

—মুশকিল হ'ল গেণ্ডুবাবু!

গেণ্ডু দাসের কিছু ক্ষতি হবেই। আখের ক্ষেতের বুকে জল দু-তিন দিনের বেশী থাকলে সবই যাবে। আর যাবার তেমন কিছুই নেই। বরং ক্ষতির তুলনায় লাভ বেশীই হবে। মনে মনে সেই হিসাবটাও কষে নিতে দেরী হয় না গেণ্ডুবাবুর। ওসব পরিকল্পনা আর লাভ-ক্ষতির মান-সাঙ্ক কষতে গেণ্ডুবাবুর বুদ্ধির অভাব হয় না।

ওই পশুগ্রামী লোকগুলোর চড়া মেজাজের রূপটা সে দেখেছিল কয়েকদিন আগে। ওদের তেল মরবে এই বানের পর। আবার তাদের কাছেই মাথা নীচু করে আসতে হবে তাদের। সেটা কম লাভ নয় গেণ্ডু দাসের, তা ছাড়াও অন্য একটা বিরাট ব্যাপারও রয়েছে। তাই কেতুলালের কথায় গেণ্ডু দাস পরম দরদীর মত বলে—তাতো হলই কেতুলাল। সারা এলাকার হাজার হাজার মানুষের সামনে এবার অভাব-অনটন-উপবাস সবই এলো কেতুলাল। সামনে বর্ষা চাষ আবাদের কথা আছে। আর বাঁধ বাঁধতেই হবে যে ভাবে হোক। ক'মাস মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কেতুলালও ভাবছে কথাটা। কিন্তু সমাধানের পথ সে খুঁজে পায় না। তাই বলে:

—কি করে কি হবে গেণ্ডুবাবু?

গেণ্ডু দাস এসব হিসাব আগেই কষে ফেলেছে। এবার তাদের ভূমিকা হবে অন্য-রকম। তাই বলে ওঠে গেণ্ডু দাস:

—উদ্ধার করতে হবে ওদের আগে। তারপর সরকারী রিলিফের দরকার। বীজ-ধানও দিতে হবে। আর বাঁধ বাঁধাতে হবে।

কেতুলালও এবার যেন লাইন ধরতে পায়।

ইস্কুল তৈরীর ব্যাপারে দু'জনে একত্রে ওই শিক্ষা বিস্তারের ব্রত নিয়ে কাজ করেছিল, পেয়েছিল বেশ কিছু। এবার সামনে তাদের বিরাট কর্মযজ্ঞ। বিরাট সমস্যা—সুযোগও।

কেতুলাল বলে—এসব করতেই হবে গেণ্ডুবাবু। আমি ডি এম সাহেবের কাছে যাবো।

গেণ্ডু দাস আরও বড় জায়গায় চার ফেলতে চায়।

তাই জানায়—মিনিস্টারদের কাছেও যেতে হবে কেতুলাল। খবরের কাগজ-ওয়ালাদেরও খবর দিতে হবে। ডি এম তো আছেনই। ওই সব জায়গাতেও খবর দিতে হবে—দরবার করতে হবে। এই এলাকার মানুষদের জন্য কিছু করা দরকার। এ আমাদের দাবী।

গেণ্ডু দাস সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে গেছে। ঘাটের নৌকাখানাকে এনেছে তার খামার বাড়ির নীচের জলায়, বদন ডাক্তারও বানের আগে খড়কুটোর মত এসে জুটেছে। আরও দু-চারজনের জুটতে দেরী হয় না। গেণ্ডু দাস বলে—নশীপুর, দে গাঁ-মদনপুরের দিকে চলে যাও ডাক্তার। জল-বন্দী লোকদের তুলে আনতে হবে। আর নটবর, তুমি কয়েকজনকে নিয়ে শালের কড়াই কখানা নামিয়ে চলে যাও এদিক-ওদিকের গাঁয়ে। তবু কাছাকাছির মানুষ-জনকে নিয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।

কেতুলালকে কোন রকমে ওরা নদী পার করে সদর রাস্তায় তুলে দিয়েছে। কেতুলাল এখানের মানুষের প্রতিনিধি। সে এবার ছুটে চলেছে সদর ছুঁয়ে কলকাতার দিকে। সামনে তার অনেক কাজ, তার মাথায় অনেক বড় দায়িত্বের বোঝা এসে পড়েছে।

গেণ্ডু দাস যেন দাবার ছক সাজিয়ে বসেছে। আর এক একটা ঘুঁটির চাল দিচ্ছে। ওর ধীর স্থির পদক্ষেপ ধরা পড়ার মত নয়। কিন্তু সব কিছুই যেন তার নখদর্পণে ফুটে উঠেছে।

...এর মধ্যে ওই টিলার ঘরগুলো—বিরাট স্কুলবাড়ি—হোটেলের দিকে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ ওই গুড়ের কড়াই ভাসিয়ে, না হয় হেঁটে, সাঁতরে, কেউ বা নৌকায়, না হয় কলাগাছের ভেলায় করে সামান্য সম্বল নিয়ে এসে উঠেছে, আরও অনেকে আসছে। সব তাদের ওই সর্বনাশা বানের তোড়ে আজ ভেসে গেছে।

অবিনাশ কোন রকমে গ্রামে এসে ঢুকেছে, তখন গ্রামের পথে জল এসে ঢুকেছে। পথে স্রোত বয়ে চলেছে। তার বাড়িটা তবু বেশ খানিকটা উঁচুতে, এর মধ্যে গ্রামের লোকজন গরু-বাছুরগুলোকে এনে হাজির করেছে সেই উঁচু টিলার উপর। কেউ হাঁটু জল, কোমর জল ভেঙে বাচ্চা মেয়েদের এনেছে। কলরব দৌড় দৌড়ি সুরু হয়েছে। যতিলালের কাঠবিড়ালীর মত বউটা খর খর করে লক্ষ্মীর হাঁড়িটা নিয়ে দৌড়চ্ছে। যতিলাল গর্জায়:

—ফেলে দে উ হাঁড়ি। চালের হাঁড়িটা নিয়ে চল তবু দুদিন সিজিয়ে খাবি।

বৌটা গজগজ করে—ঘরের লক্ষ্মী—নিকুচি করেছে তোর লক্ষ্মীর। ফ্যাল উসব্!

যতিলাল আজ স্রেফ বাঁচার পাথেয়-টুকু নিয়ে সরে আসতে চায়। গরু-বাছুর-গুলোও গোয়াল থেকে খোলা পেয়ে লাফ তুলে দৌড়চ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। অজানা ভয়ে ওদের কালো ডাগর চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ফারিত চাহনি।

টিয়াও দেখেছে সারা গ্রামের মানুষের চোখে কি আতঙ্কের ছায়া। ও এমনি দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। সহরে এসব ঘটে না। এই মাটিতে এসে এতদিন ধরে টিয়া অনেক বঞ্চনা, অনেক অবজ্ঞা সহ্য করেছে। তিলে তিলে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ওর সারা মন। কিন্তু আজকের এই সর্বনাশ তাকে বিচলিত করেছে। অবিনাশ তখনও ফেরেনি।

সকলেই এসেছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তাদের এই উঁচু ঢিবির আশপাশে। জানে না—টিয়া এখানে জল ঠেলে আসবে কিনা, তবু মনে হয় অবিনাশ তার জন্য এতটুকু ভাবে না, না হলে এতবড় বিপদের সময়েও সে ফেরেনি কেন? হয়তো তকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে সরে গেছে অবিনাশ। টিয়ার সারা মন কি এক ভয় আর চাপা রাগে ফুঁসে উঠেছে। তার করার কিছুই নেই।

এমন সময় জলকাদা মাখা অবস্থায়

অবিনাশকে ফিরতে দেখে টিয়া ফুঁসে ওঠে —কোথায় ছিলে ?

অবিনাশের সারা মনে ব্যর্থতার জ্বালা। দেখেছে অবিনাশ ওই বাঁধটাকে কারা ইচ্ছে করেই অবহেলা করে ফেলে রেখেছিল, আর প্রথম আঘাতেই সেটা চুরমার হয়ে গেছে—তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। টিয়ার কথায় চাইল অবিনাশ।

টিয়া বলে—সবাই ঠাঁই নিচ্ছে এখানে ওখানে, আমাদের কি হবে ?

অবিনাশের মনে হয় ভয়ই পেয়েছে টিয়া, তারও ফিরতে দেরী হয়ে গেছে। ও জানে না কিছু। তাই টিয়ার ওই মন্তব্যে রাগ করতে পারে না অবিনাশ। বলে সে—এখানটা অনেক উঁচু। জল বোধহয় এতটা আসবে না, এলেও বেশী হবে না।

টিয়া আর্তকণ্ঠে বলে—এখানেই পড়ে থাকতে হবে ? চারিদিকে শুধু জল আর জল !

অবিনাশও জানে সেটা। তাই বলে—উপায় নেই রে !

গুমরে ওঠে টিয়ার মন। আজ মনে হয় তাকে ওই অবিনাশ জোর করে এখানে বন্দী করে রেখেছে কি এক কঠিন শাস্তি দেবার জন্যই।

টিয়া বলে ওঠে—এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে জলে ডুবে মরাই ছিল ভালো। এর নাম বেঁচে থাকা !

টিয়ার কথায় চাইল অবিনাশ। টিয়ার ওই বিদ্রোহিনী মূর্তিটাকে আজ যেন নতুন করে দেখেছে অবিনাশ।

কানে আসে অনেকের কলরব, সারা গ্রামের মানুষের আর্তনাদ শোনা যায়। ওদের জন্য কোন সমবেদনাও নেই টিয়ার। ও যেন এ মাটির কেউ নয়।

রাত ঘনিয়ে আসে। উঁচু ভিটের নীচে এসে জল ঠেকেছে। আর আকাশের বৃষ্টিও চলেছে সমানে। ওই মানুষ, গরু-বাছুরগুলো এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছে। আবার কথাও কারো মনে নেই যেন। ছেলে-গুলো কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। সব ছাপিয়ে কানে আসে ওই বাঁধ ভাঙ্গা জলপ্রবাহের মত গর্জন। দূরে দেখা যায় নগীপুরের টিলার উপরের স্কুলবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়টায় দু একটা আলো জ্বলছে সেখানে।

এখানে আবছা অন্ধকারের মাঝে দু একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গণছে ওই অসহায় মানুষগুলো।

টিয়ার দু'চোখে নেমেছে জমাট আতঙ্কের স্তব্ধতা। শুকনো ডাঙ্গাটায় হঠাৎ একটা সাপ দেখে চীৎকার করে ওঠে টিয়া।

ওর চীৎকারে সাপটাও ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় এবার এগিয়ে এসে এক ছোবলে তার উপরই পড়বে। অবিনাশ ছুটে এসেছে। হ্যারিকেনের সামনে সাপটা ফণা নামিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে। ওর যেন আক্রোশ নেই—ও আজ আশ্রয় চায়। অবিনাশ বলে—সরে আয় টিয়া। ও কিছু বলবে না।

টিয়ার সাধ্য নেই নড়ার। ও ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অবিনাশই ওকে ঘর থেকে বের করে আনে এদিকের ফাঁকা চালায়, যতিলালের বৌ—মহিনের মা আরও অনেকে রয়েছে। সেখানেই এসেছে টিয়া—সেই মুহূর্তে ওই উত্তুরের পুরোনো মাটির বাড়িটা সশব্দে ধসে পড়লো—পোঁতায় জল লেগেছিল, ভিজে ভিজে দেওয়ালটা জীর্ণ হয়ে এই মুহূর্তেই ধসে পড়েছে।

চমকে ওঠে টিয়া। ও যেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। অবিনাশও অবাক হয়, তার ওই ঘরটাও আজ অতীতের সব স্মৃতির একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। ওরা ভিজছে—নিরাশ্রয় ওই জীবগুলো। এই কালরাত্রির যেন শেষ নেই। এর প্রতিটি দণ্ড প্রহর ওদের দেহে মনে এনেছে কঠিন একটা চাপ-জমাট আতঙ্ক। ওরা কোন প্রাগৈতি-হাসিক অন্ধকারের অতলে হারিয়ে গেছে।

জমাট অন্ধকারে টিয়ার সব সহ্যশক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে, কি অসহায় কান্নায় টিয়া ভেঙ্গে পড়ে।

জল আর জল। ধানক্ষেত, আখের জমি, সবুজ তরিতরকারীর ক্ষেত সব ডুবে গেছে, মাঝে মাঝে আখের ডগাগুলো দেখা যায় তখনও নড়ছে বাঁচার চেষ্টায়।

চরের বাবলা গাছের ডালে ডালে সাপগুলো জড়িয়ে রয়েছে, নীচে দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে।

প্রভাতবাবুরাও চেষ্টা করেছে অসহায় জলবন্দী মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য। ওরা বুঝতে পেরেছে সর্বনাশ ঘটে গেছে। তাই প্রভাতও রাতের বেলাতেই গেছে গেণ্ডু দাসের ওখানে। কেতুলাল, গেণ্ডু দাস দু'জনেই রয়েছে। আর এসে জুটেছে বদন ডাক্তার।

হঠাৎ রাতারাতি সে-ই লীডার বনে গেছে। ততক্ষণে হাঁক-ডাক করে নৌকা নামিয়েছে। বদন বলে ওঠে প্রভাতের উত্তেজিত কথাগুলোয়ঃ

—ওসব কি আমরা ভাবছি না মাষ্টার ? নৌকা বের হয়ে পড়েছে। গুড়ের কড়াইও নামিয়েছি খান আট দশ, কাজ সুরু করে দিয়েছেন গেণ্ডুবাবু।

কেতুলাল এদের সামনে অন্য মানুষ। গেণ্ডুবাবুর সামনে সে শিক্ষার্থী মাত্র, হয়তো বা গেণ্ডুবাবুর দাবার ছকে ঘুঁটি সে। ওর পরামর্শমত পা ফেলে। সেটা ভিতরের খবর। কিন্তু অন্য লোকের সামনে কেতুলালের ভিন্ন মূর্তি। গ্রামের কিছু লোকজন, স্কুলের অন্য মাষ্টারদের নিয়ে এসেছে প্রভাতবাবু ওদের সাহায্যের ব্যাপারে। কেতুলাল সিগ্রেট ধরিয়ে বলেঃ

—আমরাও বসে নেই প্রভাতবাবু, এই অবস্থার মধ্যে যেটুকু করা যায় করছি। আপনারাও আসুন। স্কুল-হোষ্টেলে ওদের জায়গা দিন। আমি কাল সকালেই সদরে চলে যাচ্ছি, দরকার হয় কলকাতায় মিনিষ্টারের ওখানেও যাবো। যা করার করবোই।

আর গেণ্ডুবাবু !...

গেণ্ডু দাস দেখছে কেতুলালের ওই বাচনভঙ্গী। কেতুলাল বেশ তৈরী হয়েছে। পরের চালটাও জানে গেণ্ডু দাস। ও নিয়ে কেতুলালকে তালিম দিয়েছে সে। কেতুলাল বলে ওঠেঃ

—অন্তত রিলিফ আসার আগের কয়েকদিনের জন্য আপনাকে কিছু চাল-ডাল-কুমড়ো দিতে হবে। লোকগুলোর এক-বেলার খাবারও চাই।

প্রভাতবাবুও এইটা নিয়ে ভেবেছে। জানে বন্যার্তদের অবস্থা, ওদের অনেকে না খাটলে খেতে পায় না। এখন কাজ কে দেবে তাদের। তাই উপবাস ছাড়া পথ নেই। প্রভাতও বলেঃ

—তারও বেশী দরকার গেণ্ডুবাবু।

গেণ্ডু দাসের মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরপুরান। ধান-চাল তার বেশী রয়েছে সহরের ধানকলের গুদামে। তবু এখানে যা আছে তাও কম নয়।

ডাল-কুমড়ো তার ক্ষেতের। কুমড়োর পাহাড়ই রয়েছে। সব এখনও ট্রাকবন্দী করে চালান দিতে পারেনি। গেণ্ডু দাস তবু অসহায়ভাবে বলে—এত কোথায় পাবো মাষ্টার ?

এবার কেতুলাল জানায়—আপনার কাছ থেকে আগাম কিছু নোবা। আর আপনি এই এলাকার বড় জোতদার, আপনি, নিমাইবাবু, হলধরবাবু, দেগাঁয়ের সাপুইমশায় এদের সকলের কাছ থেকেই কিছু নিতে হবে আমাদের। লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে। কি বলো মাষ্টার ?

প্রভাতও বুঝেছে ওদের সাহায্য নিতেই হবে। আর গেণ্ডু দাস দেখছে প্রভাত-বাবুকে। ছোকরার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে, দেখেছে এ এলাকার সাধারণ মানুষের চোখে নীরব সেই জ্বালা আর প্রতিবাদের কাঠিন্য। ওরা তার এতকালের সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়েছিল, ওদের সমবেত আঘাতে তাদের এতদিনের রাজানো প্রাসাদ তাসের ঘরের মতই ঝুর-

ঘুর করে বসে পড়ায় উপক্রম হয়েছিল। আজ! দিন বদলেছে। গেণ্ডু দাস বুঝেছে ওদের সাহায্য ছাড়া বাঁচার পথ ওই হাজার হাজার মানুষের নেই। ওদের এই দুর্ভাগ্যকে পুঁজি করেই গেণ্ডু দাস-এর দল আবার তাদের ইমারতের ভিতটাকে শক্ত আর মজবুত করে তুলবে। আর সামান্য যেটুকু যাবে তাদের ভাণ্ডার থেকে সেটা কয়েক গুণ হয়ে ফিরে আসবে। তুলে নেবে গেণ্ডু দাস। তবু সহজে রাজী হয়ে তাদের স্বার্থের স্বরূপটাকে জানতে চায় না, গেণ্ডু দাস জানায় :

—এত বড় সাধ্য আমার নাই মাষ্টারমশাই। দিয়ে থুয়ে শেষকালে বদনামের ভাগী হতেই বা কে চায় বলুন? অবশ্য হলধরবাবু, সাঁপুইমশায়, —নিতাইবাবু ওঁরাও যদি এগিয়ে আসেন আমার যথাসাধ্য করবোই। দাঁড়িয়ে এতবড় সর্বনাশ তো দেখতে পারি না। হাজার হোক আমারই প্রতিবেশী তারা। তারা সেটা মানুক না মানুক আমাদের কিছু করতেই হবে।

বদন ডাক্তার মাথা নাড়ে—ঠিক কথা। তবে জানো মাষ্টার যতই করো ওদের, ও ব্যাটারা সব বেইমান। সব ভুলে যাবে।

এই আমিই কতো চিকিচ্ছে করেছি ওদের, পাই-পয়সা তো দেয়নি আড়ালে বলে গোবদ্যি!

বদন বলে চলেছে—তবু থাকতে পারিনি ওদের বিপদে ছুটে এসেছি। তাই বলছিলাম দাস মশাই—যতই বলুন, আপনি সরে থাকতে পারলেন? পারলেন না।

কইরে—ওদের নিয়ে ইস্কুলের চালায় তোল গে। অ ক্ষুদিরাম!

কারা বানের জল পার হয়ে এসেছে। বদন ওদের ব্যবস্থা করতে চললো।

...সকাল হবার মুখেই নৌকাটা এসেছে একেবারে অবিনাশের খিড়কীর পুকুরের ঘাটে। মাঠ-ঘাট সব একাকার হয়ে গেছে। জল এসে ওদের চাটান ছুঁয়েছে। সারারাত জেগে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে তারা। টিয়ার চোখে মুখে ভয়ের ছায়া, মুখ বন্ধ করে বসে আছে সে। এমন সময় দেখা যায় নৌকাটাকে।

বদন ডাক্তারও রয়েছে তাতে—কইরে, সব ঠিক আছিস তো? বদন ডাক্তার আজ ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে এসেছে। অবিনাশ চাইল ওর দিকে। বদন এনেছে মুক্তির আশ্বাস। ওখানে গেলে আশ্রয় পাবে, খেতে পাবে তারা যা হোক কিছু। বদন বলে:

—চল! মেয়েছেলেদের আগে পৌঁছে দিয়ে আসি।

যতিলাল বলে—তাই ভালো।

ন'কড়ি বসেছিল একটা পৈঁঠার উপর। কাপড়টা জল-কাদায় ভিজে।

ন'কড়ি বলে—তাই যা বউ। কি রে অবিনাশ—

অবিনাশ ভেবেছে কথাটা। বান কমছে। এবার জল সরে যাবে। আর গেণ্ডু দাসের আশ্রয়ে যেতে মন চায় না তার।

তাই বলে—বান তো কমে আসছে রে, কেন যাবি? আবার তো ফিরতে হবে।

ন'কড়ি বলে—তাই ভাবছি।

বদন ডাক্তার জানে এরা ঠিক রাজী হবে না যেতে। তবু বলে:

—এখানে খাবার জল পাবি না। শেষকালে মড়কে মরবি?

টিয়াই শুনেছে ওদের কথা। এখানে দেখেছে সে তিলে তিলে অনেক অপমৃত্যুকে। কাল রাত থেকে তার দেহমনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে চলেছে। অনেক সয়েছে মেয়েটা। কাল রাতে সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে গেছে। তারপরই ওই আশ্রয়টুকুও ধসে পড়েছে। ঝুলছে ঘরখানা। এই চালায় পড়ে থাকতে হবে তাদের। টিয়া অবিনাশের এই জেদটার আজ প্রতিবাদ করে। ও বলে ওঠে—এখানে থাকবো না। কিগো খুড়ি।

গিরিবালাও দেখেছে সব। রাত থেকে বুড়ি জলে ভিজে কাশছে। যতিলালের বৌটা লক্ষ্মীর হাঁড়ি জলে ভাসিয়ে বের হয়েছে। ওদের কাছে লোকগুলোর এই জেদ বিশ্রী লাগে। ন'কড়ির ছেলেটারও জ্বর। গিরিবালাই বলে—তাই আমিও বলি বাপু, থাকতে হয় তোরা থাক। মেয়েছেলেগুলোনকে পাঠা। ইখানে থাকলে জ্বর জ্বালায়—না খেয়ে আর জলে ভিজেই মরতে হবে।

অবিনাশ টিয়ার দিকে চাইল। মেয়েটা আজ জলে ভিজে অনেকটা বদলে গেছে। সামনে দেখেছে সর্বনাশা বিপদ, তাই টিয়াও তার মনস্থির করে ফেলেছে। ও বলে অবিনাশকে :

ওখানে না পাঠাতে চাও, তাহলে সহরে বাবার কাছেই পাঠাও।

—এখন কি করে হবে! পথঘাট সব বন্ধ। নদীতে খেয়া নাই। অবিনাশ জবাব দেবার চেষ্টা করে। টিয়া দৃঢ়স্বরে বলে—তাহলে গিরিখুড়িদের সঙ্গেই যাবে আমি। এখানে থাকতে পারবো না।

অবিনাশ দেখছে ওকে। আজ টিয়ার মুখচোখে ফুটে উঠেছে কি কাঠিন্য। ও যেন চরম পথই নিতে চায়। গিরিবালা বলে :

—তাই চলুক অবা। বৌটার কি হাল করেছিস বল? বেচারা একা একা পড়ে থাকবে ইখানে?

অবিনাশও কথাটা ভাবে। মেয়েদের অনেকেই চলে যাচ্ছে ওই স্কুল বাড়ির আশ্রয়ে। তাই অগত্যা সেও রাজী হতে বাধ্য হয়—ঠিক আছে।

ওরা চলেছে নৌকায়। এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। দূরে গ্রামগুলো যেন ওই জলে ভাসমান। ঘরের চাল-কাঠ-বাঁশ-হাঁড়িকুড়ি ভেসে চলেছে। টিয়া দেখছে ওই সর্বনাশকে। এখানের উপর এই মানুষগুলোকে যেন সে সইতে পারছে না। বদন ডাক্তারের হুঁশিয়ারী শোনা যায় :

—জেরে বাইবি ভজা, সামনে ভাঙলোর সোত। ওরা এগিয়ে চলেছে ওই উঁচু গ্রামের দিকে। ইস্কুল বাড়ির বিরাট সাদা দেওয়ালগুলো ঝকঝক করছে বৃষ্টি ধোয়া রোদে।

গেণ্ডু দাস অবশ্য এর মধ্যে নিতাইবাবু, হলধরবাবু, সাঁপুই মশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কর্মপন্থা নিয়েছে। প্রভাতবাবুদেরও হাত লাগাতে হয়েছে। স্কুলের মাঠেই বড় বড় উনুন পেতে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। বিরাট মাঠে বসে পড়েছে ওই হাজারো অসহায় মানুষ—মেয়েছেলের দল। গেণ্ডু দাস নিজেও আসে তদারক করতে। ওই অসহায় মুখের ভিড়ে সে খুঁজছে সেদিনের তেজী মানুষগুলোকে। তাদের অনেকেই নেই। ওরা কলরব করে খেতে বসেছে। যেন কয়েকদিনও খায় নি তারা।

টিয়ার এসব ভালো লাগে না। সকলের সঙ্গে একটা ঘরে বন্ধ হয়ে আছে। শোবার জায়গা নেই। তাড়াতাড়িতে খানদুয়েক শাড়ি জামা মাত্র এনেছে। এমনিতে টিয়া একটু সৌখীন। তাদের সংসারের দায়দায়িত্ব—ঘটা তত নেই। আর নিজের দুধের যোগানের টাকা থেকে সে কিছু খরচা করে নিজের জন্য। এখানের এই জীবনে সে অভ্যস্ত নয়। আর খেতে গিয়ে ওই কাঙালী ভোজনের মত ব্যবস্থা, অবশ্য এ ছাড়া করার কিছু নেই। তবু সইতো, কিন্তু মানুষগুলোর এই কাড়াকাড়ি আর চিৎকারটা তার বিশ্রী লাগে। পাতা পেতে ওরা চিৎকার করছে—আমাকে দাও। আরও দাও গো।

যেন বেশী খিচুড়ি না দিলে ওরা খাবলে কেড়ে নেবে বালতিটা। কেউ হাতই দিয়েছে। পরিবেশনকারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তাই রাগের মাথায় হাতা দিয়েই পিটিয়েছে সে। তাই নিয়েই কলরব ওঠে। অবশ্য দু' হাতা খিচুড়ি পেতে সেও থেমে যায়। গোগ্রাসে গিলছে সেটা।

টিয়া ওই বুভুক্ষুদের লাইনে বসে ওইভাবে খেতে পারে না। তার কেমন বাধো বাধো ঠেকে। গিরিবালা অবশ্য দলবল নিয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে বসে পড়ে

তাড়া দেয়—অ টিয়া, বসে যা। নইলে জায়গা পাবি না।

গলা নামিয়ে যতিলালের কাঠ-বিড়ালীর মত বৌটা জানায় ঃ

—সব শেষ হয়ে যাবে, যা পাত পড়েছে।

টিয়া বসেনি। মনে হয় একবেলা চিড়ে এনেছে তাই চিবিয়েই কাটাবে এর চেয়ে। তাই বলে টিয়া—আমি খাবো না পিসী, শরীরটা ভালো নাই।

গিরিবালার এদিকে কান দেবার অবসর নেই। তখন খিচুড়ি আর এক হাতা পাবার জন্য চিৎকার জুড়েছে।

গেণ্টু দাস ওই বিভিন্ন পংক্তিতে খুঁজছে সেই দিনের মানুষগুলোকে, তার বড় ইচ্ছে হয় তাদের এখানে ওইভাবে দেখতে। কিন্তু হতাশই হয়েছে সে। অবশ্য গেণ্টু দাস সে কথাটা প্রকাশ করেনি। ও এসেছে এবারের তদারক করতে। পাশে রয়েছে বদন ডাক্তার। বদন ক'দিনই দাসমশাই-এর শ্রীঅঙ্গে এঁটুলির মত লেগে গেছে, আর দাসমশাইও তার এলেম দেখে মনে মনে খুশী হয়েছে।

গেণ্টু দাস শুধোয়—সবাই এসেছে হে? উত্তর নশীপুরের অবিনাশ—ন'কড়ি, দেগাঁয়ের যতিলাল—জগন্নাথপুরের ফটিক-চাঁদ—এদের তো দেখছি না?

বদন বলে—আজ্ঞে আমি নিজে গেছি ওদের গাঁয়ে। আবার গেছে নৌকো নিয়ে ছেলেরা। ওরা সক্কাই আসেনি।—গাঁ-ঘরে তবু কিছু আছে। সক্কাই এসে আর ঘরে কিছু থাকবে না। তাই অবিনাশ-ন'কড়িরা গাঁয়ে রইল।

গেণ্টু দাসের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটা আওয়াজ বের হয় ঃ

—হুঁ।

বাকী কথাটা বলে না। তবে মনে হয় গেণ্টুবাবুর যে ওরা ইচ্ছে করেই আসে নি। তাদের কোন সহায্য হাত পেতে নিতে তারা চায় না।

বদন নিজের ক্ষমতার কথাটা জানাতে চায়। তাই বলে ঃ

—তবে ওদের বাড়ির মেয়েরা এসেছে। ওই তো—অবিনাশের বৌ।

টিয়া খেতে বসেনি। ও চলে আসছে ঘরের দিকে। বন্ধ ঘরটায় জমেছে বহু মানুষ, কেমন বিশ্রী চিমসেনি গন্ধ ছাড়ছে। তবু ওখানেই ফিরে যাবে টিয়া। রাগ হয় অবিনাশের উপর। লোকটা তাকে তবু বাবার ওখানে পাঠালো না। সম্মানে বাধে নাকি তার। মান সম্মান! ওই বানের জলে ভেসে গেছে। আজ ঘরখানাও পড়ে গেছে—খাবারও তেমন কিছু নেই। সারা মাঠের ধান—ফসল সব হারিয়ে গেছে। তবু তার বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবে না সে। তার ইজ্জত চলে যাবে। টিয়ার সারা মনে একটা জ্বালা ঘনিয়ে আসে।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। টানা লম্বা বারান্দাতেও মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। ছেঁড়া চট-পুটলির গাদা জমেছে।

লোকগুলো এখন সবাই গিয়ে পড়েছে ওই খিচুড়ির পতে। বারান্দাটা নির্জন। হঠাৎ করে ডাকে চাইল টিয়া। বদন ডাক্তার ডাকছে তাকে। পিছনে রয়েছে গেণ্টু দাস। গেণ্টু দাস এসেছে এখানে ওদের থাকার জায়গাগুলোর তদারক করতে। টিয়া দাঁড়ালো। গেণ্টু দাস যেন হঠাৎ দেখে ফেলেছে তাকে। বদন ডাক্তার শুধায়—তুমি খেলে না?

গেণ্টু দাসও দেখেছে তেজী মেয়েটা পাতে বসেনি, উঠে চলে এসেছে। আর ওই তেজোদৃপ্ত রুক্ষ চেহারাটা গেণ্টু দাসের চোখে একটা নেশা এনেছে। টিয়া জানায়—শরীর ভালো নেই।

গেণ্টু দাসই বলে ওঠে—এভাবে থাকা-খাওয়া সত্যি কষ্টকর। দেখছো তো এত লোক এসে পড়ছে। আর ক'দিনই বা জোটাতে পারবেন এঁরা জানি না। অবিনাশ আমার খুবই ভাছের মানুষ। এক লপ্তে অনেক জমির চাষী। তাই বলছিলাম—তুমি বরং আমাদের ওখানেই থাকতে পারো। মানে অন্য সব বাজের লোকজন তো আছে—মেয়েরাও আছে।

বদন ডাক্তারই বলে ওঠে—ওর মহা ভাগ্যি বড়বাবু!

টিয়া কি ভাবছে। অবিনাশ তার খোঁজ-বরখও নেয়নি। কোনমতে ঘাড় থেকে নামিয়ে খালাস হয়েছে। কাজ থেকে এখানে পড়ে আছে টিয়া—তবু বাবার ওখানে যেতে দেয়নি অবিনাশ। টিয়া আজ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই করতে চায়। গেণ্টু দাস ওকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু নিরাশই হয়। তাই বলে—অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে আলাদা কথা। তবে তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম। আর অবিনাশ যখন জানবে আমি তোমাকে ঠাঁই দিতে চাইনি সেও কষ্ট পাবে।

টিয়া মনে মনে হাসলো। তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গের হাসি। গেণ্টু দাসের কথার স্বরে ওই আত্মীয়তার ভাবটা তার কাছে চাপা থাকেনি। সেই ঝড়ের রাতের দৃশ্যটা মনে পড়ে। ওর চোখে দেখেছিল টিয়া অন্য

এক চাহনি, তার অর্থ সে চেনে। আজ আবার ওই আমন্ত্রণটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তবু মনে হয় টিয়ার অবিনাশের কাছে তার দামটা জানানো দরকার। চাপা রাগ-অভিমান সব মিশে টিয়ার ভাবনাগুলো আজ অন্য পথে চলেছে। টিয়া বলে ওঠে :

—অসুবিধার কথা নয় দাসমশাই। অসুবিধেয় ফেলেছি আপনাদের। এত ঝামেলা নিয়ে রয়েছেন, আবার—

বদন দত্ত বলে ওঠে—আর বড় গাছেই ঝড় বাধে অবিনাশের বৌ। এসব সওয়া গেণ্টু-বাবুর অব্যেস আছে। দেখ না—দানছত্র খুলেছেন।

গেণ্টু দাস দেখছে মেয়েটাকে। বেশ সহজ আর ধারালো। গেণ্টু দাস বলে —অসুবিধা কি হবে? তাহলে বদন ওকে নিয়ে যাও ও বাড়িতে। আর কেষ্টোর মাকে বলে দিও, ওপাশের ঘরে অবিনাশের বৌ থাকবে। ওর খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেবে। যাই আমি আবার দেখে আসি এখানের ভাঁড়ারটা।

গলা তুলে ব্যস্ততার ভান করে গেণ্টু দাস হাঁক দেয়—অধরকে একবার ডেকে দে কে আছিস আর প্রভাতবাবুকেও। ভাঁড়ার ঘরের চাবি নিয়ে আসুক।

টিয়া কি ভাবছে। এর মধ্যে ওর ঘর থেকে তার পুঁটলিটা কে বের করে এনেছে। টিয়ার মনে হয় জীবনের একটা নোতুন ধারাকেই দেখবে সে। কি রুদ্ধ অভিমানে টিয়া আজ গেণ্টু দাসের আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছে, যার সামান্য মাত্র দয়া অবিনাশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। ইজ্জত!

টিয়া আজ ওগুলোকে অর্থহীন, তুচ্ছ বলেই ভাবে। তাই আজ সে নিজের মতেই চলেছে।

খবরটা গিরিবালাও শুনে গুম হয়ে যায়। ওরা খেয়েদেয়ে আর গেলাসে বাড়তি খিচুড়ি কোনরকমে তুলে নিয়ে এসেছে। রাতে খাবার ব্যবস্থা নেই—তাই কোনরকমে কিছুটা ওই লপ্‌সি তুলে এনেছে। ঘরে পা দিতেই দেগাঁয়ের এক বুড়ি জানায়—অবিনাশের বৌকে দেখলাম বাবুরা খাতির করে নে গেল নিজের বাড়িতে, ওর থাকা-খাওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হবে শোনলাম।

গিরিবালা অবাক হয়—তাই নাকি!

খিক্ খিক্ করে নকড়ির বেটা হেসে ওঠে। ধমক দেয় গিরিবালা।

—হাসছিস্ কেনে লা?

মেয়েটা বলে ওঠে—তা বাবুর নজরে ধরেছে নাকি গ? পলাশ ফুলের মতন বাহার তো আছে, আর দিনরাত সেজে-গুজে পরীটি হয়ে থাকে। বাবুদের দোষ কি বলো?

গিরিবালা জবাব দেয় না। কে বলে ওঠে :

—তা বাছা, বাবুরা ছিল বলে বানের মুখ থেকে বেঁচে এয়েছি। দুমুঠো খেতে পেছি। উ কথা কেন বলো বাপু! শোনলাম নিজের খাস চাষীর ঘরের বৌ—ঘরে ঠাঁই দিলেই দোষ?

নকড়ির বৌটা থেমে গেল। বুঝেছে এখানে প্রকাশ্যে এসব কথা বললে বিপদই হবে। বাবুদের কানে গেলে আরও মুশকিল বাড়বে। তাই চেপে গিয়ে ঘরে ঢুকলো তারা। গিরিবালা চাপা গলায় বলে, ইসব কথা এখন বাঁসস না ভাদু। শুধু দেখে যা।

অর্থাৎ এর বিহিত পরে করবে ওরা। এখন সময় সুযোগ আসেনি। তারই প্রতীক্ষায় থাকবে তারা। তবে টিয়ার সম্বন্ধে দু'চারটে মন্তব্য এরা না করে পারেনি। গিরিবালাই বলে :

—তখনই বলেছিলাম অবাকে সহর বাজারের নাচুনী মেয়েকে ঘরে আনিস না। তা কে শোনে কার কথা! এখন আটকা!

কেতুলাল জানে সামনেই এগিয়ে আসছে ভোটের দিন। এখন থেকেই তাদের দলকে তৈরী হতে হবে। এই এলাকাতেও তাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম থাকা দরকার। আর এমনি বন্যা-দুর্ভিক্ষ এলে তাদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা সহজ। অভাব আর অনাহারের মধ্যে কষ্টের মধ্যে নিঃস্ব মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের কিছুটা মাত্র হাতে পেলেই তারা খুশী হয়। আজ এই এলাকার মানুষের দরকার মাত্র দু'মুঠো ভাত আর একটু আশ্রয়ের। তারপর চাষ-এর সব পুঁজি ধান, ফসলও চলে গেছে। ওদের সামনে অন্ধকার নেমেছে। তাই কেতুলাল সমস্ত ব্যাপারটা কর্তাদের জানাতে তাঁরাও এগিয়ে আসেন। তাছাড়া সরকারী ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

খবরের কাগজের লোকজনদের নিয়ে আর সাহায্যের হুকুম সমেত কেতুলাল এসেছে সদরে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য এর মধ্যেই এসব এলাকা দেখে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। গেণ্টু দাসের এই স্কুলের লঙরখানা আর বিস্তীর্ণ এলাকার সব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জেনে গেছেন। তাই রিলিফও আসতে সুরু করেছে।

গেণ্টু দাস আজ মনে মনে খুশী হয়েছে। ক'দিন ধরে হঠাৎ তার নামডাকও বেড়ে গেছে এই এলাকায়। ওই আশ্রিতদের চোখে সে যেন দেবতা। অনেক বুড়ি আশীর্বাদ করে—রাজা হও বাবা।

অবশ্য রাজা হবার দিন আর নেই। রাজত্ব চলে গেছে। সে খবর ওরা জানে না। তাই ওই আশীর্বাদ করে। জয়ধ্বনি দেয়।

প্রভাতবাবু দেখেছে সবকিছুই। অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষগুলোর এই দুর্ভাগ্যকে নিয়ে গেণ্টু দাসও বেসাতি সুরু করেছে। তবু দেখেছে প্রভাতবাবু কিছু মানুষকে। তাঁরা এখানে আসেনি গেণ্টু দাসের কাছে মাথা বিকিয়ে দিতে। তাদের মধ্যে অবিনাশকেও দেখছে সে।

পরদিনই বন্যার তোড় একটু কমলেও তখনও নৌকাতেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রভাতবাবু জানে ওরা অনেকে আসেনি। কি অবস্থায় মরছে লোকগুলো জানে না সে। তাই নিজে থেকেই ভাঁড়ার থেকে কিছু চাল-ডাল-আলু, চিঁড়ে-গুড় নিয়ে বের হয়েছিল নৌকায়।

অবিনাশ - নকড়ি-ক্ষুদিরাম - যতিলাল আরও অনেকে ওই ভাঙা বাড়ির এদিক-ওদিকে বসে আছে। জল কমছে কিন্তু নামেনি তখনও। ওরা যেন শ্মশানপুরীতে বসে আছে। স্তব্ধপ্রায় গ্রাম—একটা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। ওই ক'টি মানুষ যেন সব শেষ করে এবার বসেছে। যতিলাল বলে—ভাতে ভাত রাঁধবো গো?

অবিনাশের মনটা ভালো নেই। টিয়া যে তার উপর রাগ করেই চলে গেছে তা বুঝেছে। যতিলালের বাড়ির সকলেই গেছে, ওর বোন মতি বলেছিল—ইখানে পড়ে থেকে কি করবে?

অবিনাশ মতির দিকে চেয়ে থাকে। মতির জীবনে ঘর-সংসার হয়নি। বিয়েও হয়েছিল কবে জানে না সে, তখন থেকেই যতিলালের বাড়িতে পড়ে আছে। দেহে যৌবনের ব্যর্থ সাড়া। একদিন অবিনাশ হয়তো স্বপ্ন দেখেছিল ওকে কেন্দ্র করে, কিন্তু সে স্বপ্নই রয়ে গেছে।

মতি বলে—কেন যাবে না তা জানি। তা ইস্কুল তো পঞ্চজনের। ওই গেণ্টু দাসের তো নয়? যেতে দোষ কি?

অবিনাশ বলে—তোরা তো যাচ্ছিস!

কাজ থেকে ওরা মুড়ি চিবিয়ে আছে। আজ মুড়িও মিইয়ে গেছে। যতিলাল ভাতে ভাত তো চাপাবে, কিন্তু চাল!...

নকড়ি বলে—চালের হাঁড়িটা দেওয়াল-চাপা পড়ে গেছে রে। হাসে অবিনাশ—তোদের বরাতের মতই পাথরচাপা। ওই মিয়োনো মুড়িই খা।

কিন্তু ওদের সাধ্য আর লড়াই-এর ক্ষমতা যেন ফুরিয়ে আসছে। ক'দিন এভাবে চলবে জানে না। নকড়ি বলে :

—তাই তো ভাবছি অবা। জল নামলে চাষ-আবাদ কি করে হবে? বীজধান নাই—খাবার নাই।

যতিলাল বলে ওঠে—আমাদের লিখনই নাই রে। যাও দাসজীর কাছে, খত দিয়ে ট্যাকা কর্জ করে এনে না খেয়ে না দেয়ে ধান কেলাও। পাকা ধানে উনি আসবেন সুদ—চক্রবৃদ্ধি সুদ আর মূলধন উসুল করতে।

অবিনাশ ভাবছে কথাটা। মনে হয় তাদের ন্যায্য পাওনাটুকুকেও ওরা আড়াল করে রেখেছে, যাতে ওদের মাথাগুলো কোনদিনই সোজা না হতে পারে। ভাবনার কূল-তল নেই। পেটের খিদেটাও চাগিয়ে ওঠে। নকড়ি ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ একটা শব্দ—কাদের টুকরো কথা শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তহীন স্তব্ধতা আর শূন্যতার মাঝে ওদের নৌকার দাঁড়ের শব্দ—দু'একটা কথা কেমন চমক আনে এখানে।

যতিলাল বলে, নৌকায় কে আসে গ। প্রভাত মাস্টারকে দেখছি।

প্রভাতবাবু নৌকা থেকে নেমে এক হাঁটু কাদা, খড় পচার জঞ্জাল পার হয়ে উঠে এল। দেখছে সে মানুষগুলোকে। প্রকৃতির নির্মম আঘাতে এরা মুষড়ে পড়েছে। মানুষ আর প্রকৃতি সকলেই যেন এদের শত্রু। সমবেতভাবে তাদের আঘাত দিয়ে চলেছে, আর এই মানুষগুলোও মুখ বুজে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে বাঁচার জন্য লড়াই করছে।

—কেমন আছো অবিনাশ?

অবিনাশ প্রভাতবাবুর কথায় চাইল। ওর চোখে বেদনার্ত ক্লান্ত চাহনি। শক্ত বলিষ্ঠ দেহটা যেন নুইয়ে পড়েছে, ক'দিনে চোখের কোলে জমেছে কালির আস্তরণ। যতিলাল বলে—আর বেঁচে থাকা বাবু। এই তো গেল।

বৌ-বাচ্চাদের পাঠিয়েছি স্কুলবাড়িতে। তবু থাকতে জায়গা পাবে, যা হোক দু'মুঠো খেতে পাবে।

অবিনাশ বলে ওঠে—কিন্তু কদ্দিন? তারপর?

তারপরের প্রশ্নই ওদের সামনে আজ বড় হয়ে উঠেছে। প্রভাতবাবুও তারপরের প্রশ্নটার কোন উত্তর দিতে পারেন না। বুড়ো নরহরি তখনও তামাক টেনে চলেছে। দা-কাটা তামাকের বৈশ কিছুটা সে বাঁচিয়ে এনেছে। আর কিছুই খেতে জোটেনি। হুঁকোতে ওই তামাক টেনেই ঠায় রাত জেগে কাটিয়েছে আর খং খং শব্দে কেশেছে। গলার রগগুলো ফুলে ওঠে। যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

নরহরি কাশি চাপতে চাপতে বলে:

—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ভগমান—

অবিনাশ গর্জে ওঠে—ওসব ভগমান-টগমান রাখো দিকি খুড়ো। ভগমান ওই গেণু দাস, নেতাই ঘোষ। ওরা ব্যাটা ভগমানকে কিনে নিয়েছে। লোকগুলোর মরা চোখে এখনও যেন আগুন জ্বলে। প্রভাতবাবু বলেন—সরকারী রিলিফ আসছে। বীজধানও দেবে—

ওরা তেমন উৎসাহিত বোধ করে না। প্রভাতবাবু বলেন:

—দেখা যাক, কিকমত মাতে রিলিফ পায় লোকে। চিড়ে-চাল-ডাল কিছু এনেছিলাম। ওগুলো নামিয়ে নাও।

যতিলাল-শিবু কামার ওসব নামিয়ে আনে। অবিনাশ গুম হয়ে বসে ছিল। প্রভাতের কথায় চাইল।

—তোমাদের বৌকেও দেখলাম ওখানে।

টিয়া জোর করেই গেছে ওখানে। কিন্তু আজ অবিনাশের মনে হয় টিয়া তার বাবার ওখানেই যেতে চেয়েছিল। অবিনাশই রাজী হয়নি। আজ মনে হয় টিয়া এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, অনাহারের মধ্যে থাকতে পারতো না। ওখানে গিয়েছে বাধ্য হয়েই। কিন্তু অবিনাশের মনে হয় টিয়াকে বাবার ওখানে সহরে পাঠানোই ছিল ভালো। সেখানে দেখেছে অন্য এক পরিবেশ। তার ভাই আর বোনদের স্বভাব চরিত্রের সম্বন্ধে, তাদের সহরের ভোগউছল জীবনের সম্বন্ধে বেশ একটা চাপা ঘৃণা রয়ে গেছে অবিনাশের মনে। ওই নোংরা পরিবেশে সে টিয়াকে পাঠাতে চায়নি। অবশ্য তার আপত্তির কারণটা খুলে বলতেও পারেনি সে টিয়াকে। টিয়া তাই ভুলই বুঝেছে তাকে।

আজ অবিনাশের মনে হয় তবু ক'দিনের জন্য টিয়াকে সেখানে পাঠাতে পারতো।

অবিনাশ শুধোয়—ভালো আছে তো সে?

প্রভাতবাবু দেখেছে ওই হাজারো মানুষের অবস্থা। ক'দিনেই সারা স্কুলটা নোংরায় ভরে উঠেছে। গন্ধ ছাড়ছে। আর খাওয়ার ব্যবস্থাও তেমনি। এছাড়া করারও কিছু নেই। তবু প্রভাতবাবু বলে সান্ত্বনার সুরে—ভালোই আছে।

অবিনাশ কি ভাবছে। ওরা ফিরছে নশীপুরের দিকে। অবিনাশ বলে:

—একবার ঘুরে আসি ন'কড়ি। ওরা সব গেল। কেমন আছে খবর নিই আসি। কি রে যতিলাল?

ওরাও খবর পেতে চায় ওদের। বাড়ির লোকজনদের ছেড়ে থাকতে অভ্যস্ত নয় ওরা। তাই অবিনাশকে যাবার কথা বলতে দেখে যতিলাল বলে—তাই যাও। আর দেখে-শুনে এসো সরকারী লোকজন কখন আসছে। তিন-চার দিনের পর জল নেমে গেলে বাঁধ মেরামত করতে হবেক। মাঠেও নামতে হবেক—

অবিনাশও জানে সেটা। তাই একবার যাওয়া দরকার। অবিনাশ ওদের সঙ্গে গিয়ে নৌকায় উঠছে।

কেতুলাল লোকজনদের নিয়ে ফিরেছে। গেণু দাস জানতো—কেতুলাল এখন চাষু হয়ে গেছে। তবে সাবধানী গেণু দাস কেতুকে ঠিক লয়ে বেশী বাড়তে দিতে চায় না। তাকে তার হাতেই রাখতে হবে।

কেতুলাল হৈ-চৈ করে খবরের কাগজের লোক-ফটোগ্রাফার-ডি এম সাহেবকেও টেনে এনেছে। ওদিকে কয়েকটা ট্রাকে করে মাল-পত্র এসেছে। টিন, তেরপল আর বস্তাবন্দী চাল, ডাল, চিড়ে—চটের বোরা জড়ানো ভেলি গুড়ের তাল, টিন টিন কেরোসিন তেল, তুলোর কম্বল—গাঁটবন্দী কাপড়-জামাও এসেছে।

একটা নৌকা—তাই দিয়ে নদীর খেয়া-পার হয়ে এসেছে ওরা। গেণু দাস গেষ্ট হাউসে ওদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়। সুন্দর সাজানো বাংলো—বাগানে ফুলের সমারোহ, বিরাট বারান্দায় সান-মাইকার টেবিলে আসে দামী সুরভিত চা-বিস্কুট—এই সর্বনাশের মধ্যে দাসমশাই-এর বাড়ির ছানার সন্দেশও ঠিক হচ্ছে।

সাংবাদিক ভদ্রলোক অবাক হন—এতো সব কেন? শুধু চা হলেই যথেষ্ট।

ডি-এম সাহেবও বলেন—অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন গেণুবাবু। এসবের কোন দরকার নেই।

তিনি বিস্কুট একখানা তুলে নিয়ে চা খেয়েই বের হতে চান ওই সব গ্রামের দিকে। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকও বলেন:

—দিনের আলো থাকতে থাকতে যেতে হবে। কিছু 'কভার' করতে চাই।

নৌকাটা নেই। তখনও ফেরেনি প্রভাত-বাবুদের নিয়ে। গেণু দাস খবরটা শুনে ধমকে ওঠে বদনকেই—তুমি ওদের যেতে দিলে কেন?

—প্রভাতবাবু রিলিফ নিয়ে গেল।

বদন ডাক্তার জবাব দেবার চেষ্টা করে।

গেণু দাস গর্জে ওঠে—ওগুলো কোথায় যাবে জানো? ওই মাস্টারকে চেনো না? ও যেন বাবার সম্পত্তি পেয়েছে।

প্রভাতবাবু ফিরেছে, এদিকেই আসছিল ডি-এম সাহেবের আসার কথা শুনে। কিন্তু গেণু দাসের ওই কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে সে। গেণু দাসও ওকে দেখে বলে—এই যে, এদিকে সাহেবরা বেরোবেন—কলকাতার কাগজের লোকজন এসেছে। তুমি নৌকা নিয়ে কোথায় ছিলে?

প্রভাত ওর দিকে চাইল। দেখছে লোকটাকে।

এর মধ্যে ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে ওকে দেখেছে। গেণু দাসও লোঙরখানায় গিয়ে ওই হাজার মানুষের খাওয়ানোর দৃশ্যের সঙ্গে নিজের ছবিটাও তুলিয়ে নিয়েছে। আজ ওদের সামনে গেণু দাস অনেক মহান

ব্যক্তি। তার নিঃস্বার্থ দানে এই এলাকার বহু মানুষ বেঁচে গেছে। এটা সে বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই মেজাজ নিয়েই প্রভাতকেই ধমকে ওঠে। অবিনাশও এসে পড়েছে। সেও শুনেছে কথাগুলো।

গেণ্টু দাস ওদের চুপ করে থাকতে দেখে বুঝেছে, তার কথাটা ওরা ভালো-ভাবে নেয়নি। আর ব্যস্ততার মধ্যে গেণ্টু দাস অধৈর্য হয়ে একটু ভুলই বলেছে। তাই এবার বলে সে ঃ

—ওঁরা তাড়া দিচ্ছেন। চলো—দেখিগে।

অবিনাশকে দেখে আরও অনেকে এগিয়ে আসে। কয়েকখানা গ্রামের মানুষ-জন ভিড় করেছে। ডি-এম সাহেবও অবিনাশের কথায় চাইলেন। অবিনাশ বলে ঃ

—বানের জল কমলে আগে ভাঙ্গা বাঁধ বাঁধতে হবে স্যার, না হলে আবার বান হবে, আবার ডুববো আমরা। আর বীজধান—চাষের খরচা—এসবের ব্যবস্থা করুন। দু'দিন রিলিফের খিচুড়ি খেয়ে টিকতে পারা যায়, বাঁচা যায় না হুজুর।

গেণ্টু দাস-এর মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। মনে মনে সে রেগে উঠেছে প্রভাতের উপরই। অবশ্য সে কিছু বলেনি, কিন্তু হুজুরদের আসার খবর পেয়েই সে চলে গেছল ওই লোকগুলোকে খবর দিতে। যাতে ওরা এসে হুজুরদের সামনে এই সব কথা জানাতে পারে।

তরুণ ডি-এম সাহেবও মন দিয়ে শুনছেন ওদের কথা।

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ওদের কথাগুলো শুনছেন, কি লিখে নিচ্ছেন ওর মধ্যে, বাড়ি—কতো জমি ডুবেছে। কি কি ফসল গেছে এই সব। ফটোও তুলে নেন ওদের।

গেণ্টু দাস বলার চেষ্টা করে ডি-এম সাহেবকে—নৌকা তৈরী হুজুর।

কেতুলাল ওদিকে ব্যস্ত।

ডি-এম সাহেব যেন গেণ্টু দাসকে এখন চিনতেই পারেন না। ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—ওদের বলতে দিন।

গেণ্টু দাস চুপ করে যায়, অপমানিত বোধ করে সে। আজ তার এত কৌশল যেন ব্যর্থ করে দিতে চায় ওই প্রভাতবাবুর দলবল।

—কোথায় ছিলে? গেণ্টু দাস কেতুলালকে দেখে এগিয়ে আসে।

কেতুলালও ব্যাপারটা বুঝে সামাল দেয়।

—চলুন স্যার, ওকেও সঙ্গে নিন। চলো অবিনাশ—ওই দিকেই যাবো। তোমাদের গ্রামও দেখবো।

ওদের নিয়ে নৌকায় উঠে বের হয়ে গেল ওরা।

গেণ্টু দাসকে বলে কেতুলাল—ততক্ষণে দুটো নৌকা লাগিয়ে ওপারের ট্রাকগুলোর মালপত্র খালাশ করো গেণ্টুদা।

ডি-এম সাহেবও বলেন, হ্যাঁ,—ওদের ছেড়ে দিতে হবে। নেক্সট ট্রিপ আনবে। আর মালপত্রগুলো একটা ভালো জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করুন। সেইটাই স্টোর রুম হবে। এসে ওই সব চেক করবো।

গেণ্টু দাস জানে কিভাবে কি করতে হয়। ও বলে ঃ

—ওসব হয়ে যাবে স্যার।

ওরা চলে গেল নৌকা নিয়ে।

গেণ্টু দাস বদনকে বলে—ওগুলো খালি করিয়ে আমার গুদামে তোলো বদন। হুজুরদের দেখাতে হবে। হিসেবের মাল সব যেন ঠিকঠাক থাকে।

বদন দত্ত ঘাড় নাড়ে—ওসব ভাববেন না গেণ্টুবাবু।

প্রভাত দাঁড়িয়ে দেখল মাত্র। গেণ্টু দাস তার চর-অনুচরদের নিয়ে এবার কর্মযজ্ঞে নেমেছে। তবু যাবার সময় গেণ্টু দাস প্রভাতের দিকে চাইল। গেণ্টু দাস সন্ধানী চতুর ব্যক্তি। ও দেখেছে প্রভাতের চোখে একটা জ্বালা।

গেণ্টু দাস ওদের বিশ্বাস করে না। একটু আগেই ওরা হাজারো মানুষ দিয়ে একটা আন্দোলন-ই খাড়া করে দিতো। অবিনাশও তাই চেয়েছিল বোধহয়। কিন্তু এবার সেও সাবধান হয়েছে। তবু প্রভাতের সম্বন্ধে তার ভয় একটা রয়ে গেছে।

ওদিকে কলরব উঠছে। খাবার-দাবারের তেমন যোগাড় আজ নেই। গেণ্টু দাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই সেও আজ থেকেই এবার সুদসমেত উশুল করার কথাই ভাবছে। ওদিকে কলরব ওঠে।

—সাহেব কোথায়? খেতে পাইনি আমরা, তা দেখবেক নাই গো! প্রভাতবাবু ওই দিকে এগিয়ে গেল। অরুণ, গণেশ মিত্তির আর ক'জনকে বলে—রিলিফের চাল এসে গেছে, ওদের খাবার দেওয়া হবে বলে দাও। ততক্ষণ কিছু চিড়ে-গুড়ই দিতে হবে।

অরুণ বলে—দাসজী তো ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে গেছে।

কে গর্জে ওঠে—নিয়ে এসো চাবি।

একটা গোলমাল উঠছে। প্রভাতবাবু এগিয়ে গিয়ে ওদের থামিয়ে নিজেই গেল চিড়ে-গুড়ের কিছু বস্তা আনাতে।

টিয়া ওই ইস্কুলবাড়ির ভিড় আর নোংরা পরিবেশ থেকে সরে এসে এখানে ঠাঁই পেয়ে যেন বেঁচেছে। একটা ছোট ঘরই ব্যবস্থা করেছে ওরা ওর জন্য। বেশ নিরিবিলি। ওদিকে কয়েকজন কাজের লোক থাকে। আর তারাও টিয়াকে যেন একটু সমীহ করে চলে। টিয়া এখানে এসে স্নান করেছে, শাড়ি বদলাতে গিয়ে দেখে এক-জোড়া নতুন শাড়িও আছে তার জন্য। কিছু টুকিটাকি জিনিষও আছে। আর বুড়ি মেয়েটি তাকে খাবারও দিয়ে যায়। যতীনের মা বলে ঃ

—তা, ব্যবুর হুকুম বাছা, নাও খেয়ে নাও। ওই ক্যাম্পলী ভোজনের খাওয়া কি খেতে পারা যায়? ছ্যা-ছ্যা যে হুল্লোড় ক্যাড়াকাড়ি চলেছে। বৌ-ঝিদের মান-ইজ্জতও থাকবে না।

ডাল-ভাত, একটা তরকারী, একটুকরো মাছও রয়েছে। টিয়া কেমন বিব্রত বোধ করে।

—এসব কেন?

যতীনের মা বলে—বড়বাবুর হুকুম বাছা। তা বাবু আমাদের দেবতুল্যি মানুষ। দয়ার শরীর। নাও বাছা খেয়ে নাও।

টিয়ার এসব খেতে যেন ঠিক ভালো লাগে না। ওদিকে দেখেছে কি করুণ হাহাকার। তার মাঝে তাকে এই স্বাতন্ত্র্য দিতে নিজেও মনে মনে বিস্মিত হয়েছে মেয়েটা। অবিনাশের কথা মনে পড়ে। ওই বন্যার মাঝে পড়ে আছে লোকটা, খেতে পাচ্ছে কি না কে জানে। ক'দিন ওকে ওই অসহায় অবস্থায় রেখে চলে আসার পর টিয়ার নিজেরই খারাপ লাগে।

অনেক চেষ্টা করেছে টিয়া, তবু সে ঘরে মন বসাতে পারে নি। এই দারিদ্র্যকে মেনে নিতে পারে নি। বার বার মনে হয়েছে অবিনাশ এই কষ্টের মধ্যেই থাকতে চায়, আর তাকেও কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করাতে চায়। অথচ টিয়া জানে বাইরে গেলে তারা এর থেকে ভালোভাবেই বাঁচবে। সেখানে পয়সা দেবার মত অনেক লোকই আছে। কথাটা অবিনাশকেও সে বোঝাতে পারেনি। আজ তবু ক'দিন ওই বিপদের মধ্যে লোকটাকে ফেলে রেখে এসে টিয়া তার জন্য দুঃখ বোধ করে।

....হঠাৎ জানলা দিয়ে ওই কলরব কোলাহল শুনে চাইল, কারা এসেছে কলকাতা থেকে। যতীনের মা বলে ঃ

—ড্যাম সাহেবও এয়েছে শোনলাম। কেতুবাবু আর আমাদের বড়বাবু এখানের লোকের জন্যে কতো ভাবে বাছা, সাত-মুলুক থেকে কুড়িয়ে রাজ্যির দ্রব্য এনেছে বানে ভাসা লোকগুলোর জন্য। তা ওই মুখপোড়ারা এমনি মানে? ওই পরভাতবাবু গ? ম্যাষ্টার।...

টিয়া চেনে প্রভাতবাবুকে। তাই শুধোয়—তার কি হল?

যতীনের মা বলে—ত্যানার কথাই বলছি বাছা। বাবুর ইস্কুলে চাকরি করছিস, বড়বাবুরই খাচ্ছিস—পরাছিস। তাই বলে বড়বাবুর পিছনে লোক লেপাবি? ধম্মো আর রইল কোথায়?

যতীনের মা কথাগুলো বলে চলেছে।

টিয়াও জানে সেটা। কিন্তু টিয়ার মনে হয় যতীনের মা জানে না ওই বড়-বাবুদের আসল পরিচয়, আর না হয় জেনে-শুনেও চুপ করে থাকে শুধু পোড়া পেটের দায়ে। যতীনও বড়বাবুর এখানেই কাম করে, আর যতীনের গুণের খবর টিয়াও জানে। রাতের অন্ধকারে দলবেঁধে যতীন এ-গ্রাম সে-গ্রামে হানা দিয়ে অসহায় গৃহস্থের সর্বস্ব লুঠ করেছে। রাতের বেলায় রাঁকড়া রোডের উপর ট্রাক থামিয়েও চুরি করেছে দলবল নিয়ে। সেবার ভোটের সময় যতীনের দলবল তাদের গ্রামে, আশপাশের গ্রামে গিয়ে লোকদের শাসিয়েছে—ভোট ওই কেতুলালকে দিতে হবে। না দিলে—

পরের ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। অবিনাশ, নকড়ি, যাতলালদের সেও চেনে। আর টিয়াও চেনে যতীনকে। ওই যতীন এখন গেণু দাসের পোষা নোকর, কুকুরও বলা যায়। তাদের মুখ থেকে এমনি কথা তো বের হবেই।

টিয়াও ওই বাড়ির সামনে বাগানের ধারে বের হয়ে এসেছে। কেতুলাল, ডি-এম সাহেব, গেণু দাসদের দেখছে। হঠাৎ নজরে পড়ে টিয়ার অবিনাশ এসেছে এখানে, প্রভাতবাবুর সঙ্গে অবিনাশ, আরও কয়েকজন লোকও এসেছে।

টিয়া এগিয়ে যায়, অবিনাশ তাকে দেখেছে বোধহয়। মনে হয় অবিনাশ এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াবে। খবর নেবে কেমন আছে এখানে, টিয়ারও বিশ্রী লাগে এখানে। এখানে তাকে অনেকেই এড়িয়ে চলে, ক'দিনেই টিয়া দেখেছে ওর যেন জাত বদলে গেছে এই বাড়িতে উঠে আসার পর থেকেই।

সেদিন গিরিবালা, নকড়ির বৌ ওরাও এসেছিল তার এখানে। গিরিবালা ছিমছাম নিরিবিলি ঘরখানা দেখে এদিক-ওদিকে চেয়ে বলে:

—তা বাছা বেশ ভালোই রইছিস লাগছে।

নকড়ির বৌ বলে—তা থাকবে বৈকি। শোনলাম বড়বাবু নিজে এখানে পাঠিয়েছে টিয়াকে। তা রূপ, নজরে পড়ার মত রূপ-গুণ থাকলে চোখে তো পড়বেই।

গিরিবালা আর ওই মেয়েগুলোর মধ্যে চোখে চোখে কি যেন ইসারা হয়ে যায়। কিন্তু জবাব দিল না টিয়া। ওর মনের অতলে একটা চাপা রাগই জেগে ওঠে। ওরা তাকে হিংসা করেছে এতকাল গ্রামেও। তার শাড়ি-জামা, সামান্য বেশ-বাস, প্রভাতবাবুর সঙ্গে হেসে কথা বলা নিয়েও পুকুর ঘাটে, পথে, দুপুরের বৈঠকেও অনেক কিছু আলোচনা করেছে। এসব খবর জানে টিয়া। তার মনটাকে ওরাও বিষিয়ে তুলেছে। তার রূপ যৌবন আছে—একটু ছিমছাম হয়ে থাকতে চায়, এসব কি টিয়ার দোষ?

টিয়া এসব মনতে চায় না। তবু ওদের নানা বিশ্রী ইঙ্গিতগুলোর খবর সে জানে।

আজ এই বিপদের মধ্যে এখানে আশ্রয় নিতে এসেও ওরা সেই নোংরা স্বভাবটাকে ভোলেনি। টিয়া বেশ বুঝেছে ওরা এসেছে তার এখানে—তার সম্বন্ধে এমনি সরস তীক্ষ্ণ কিছু মন্তব্য করতে।

গিরিবালা গলা নামিয়ে শুধায়—বানের জল নামছে, বাড়ি যাবি তো?

টিয়া গিরিবালার কথায় অবাক হয়ে চাইল। ওর কথার সুরে কি যেন চাপা একটা ইঙ্গিতই রয়েছে।

টিয়া অবাক হয়ে জানায়—কেন, বাড়িতেই যাবো!

—আ! গিরিবালা ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বলে—ভাবলাম বুঝি সহরে ভাইদের ওখানেই যাবি। তা বাছা নিজের ঘরের তুল্যি ঠাঁই আছে? বলে না—আপন কুঁড়েঘর স্বগ্গো।

টিয়া চুপ করে থাকে। গিরিবালাদের বার কয়েক দেখে গেছে যতীনের মা বুড়ি। গিরিবালাও সন্ধানী মহিলা। ওর চোখের চাহনিটা ভালো লাগেনি গিরিবালার। তাই চাপা স্বরে শুধোয়:

—ওই বুড়িটা কে-লা?

টিয়া জানায়—এখানের সব কিছু দেখাশোনা করে যতীনের মা।

গিরিবালা বলে ওঠে—ওরে বাবা। ডাকাতের মা চৌকিদার! তা বাছা এখানের ব্যাপার-স্যাপার দেখছি আলাদা। তা খেতে-টেতে ভালোই দেয় শুনেছি ইখানে। জমা-শাড়িও দিইছে। আমাদের ওখানে ওই লপ্‌সিই সম্বল। এসব ছেড়ে ভিটেতে ফিরতে পারলে বাঁচি। চল গো বৌ।

ওরা চলে যায়। টিয়া চুপ করে ভাবছে ওদের কথাগুলো। ওরা যেন একটা ব্যঙ্গের জ্বালাই ছাটিয়ে দিয়ে গেছে তার চারা মনে। মনে হয় টিয়া যেন ওদের থেকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীর মানুষ। যাকে ওরা তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ করে, ঘৃণা করে।

টিয়া চুপ করে ওসব কিছু সহ্য করে গেছে।

আজ ওই কর্তাদের সুরেজমিনে এখানে এসে সব খোঁজ-খবর নিতে দেখেছে টিয়া। কেতুলাল-গেণুবাবুরা তবু এখানের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে এটাও দেখেছে টিয়া।

আর অবিনাশকে দেখে কি চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এসেছে টিয়া। দূরে থেকে এত লোকের মধ্যে চোখে পড়ে অবিনাশকে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারায় ক'দিনেই একটা ভাসনের ছাপ পড়েছে। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। চোখ দুটোয় তবু একটা দীপ্তি ফুটে রয়েছে।

অবিনাশ ওই গেণুবাবু, ডি-এম সাহেবদের কি বলে চলেছে। ওরা শুনছে অবিনাশের কথাগুলো। টিয়া দূর থেকে দেখছে ওই তেজী লোকটাকে।

ক্যামেরায় একঝলক আলো ফুটে ওঠে। কারা ছবি তুলছে।

টিয়ার মনে হয় অবিনাশও তাকে দেখেছে। এবার ভিড় ঠেলে অবিনাশ এগিয়ে আসবে তার দিকে। তার সঙ্গে কথা বলবে, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলবে।

টিয়াও শত অভাবকেই মেনে নিয়ে আবার ওই তেজী লোকটার সঙ্গে ফিরে যাবে নিজের ভিটেতে। আবার ভাঙা ঘরটাকে সারিয়ে নতুন ঘর বাঁধবে।

এবার টিয়া অনেক কষ্ট-অভাব আর দুঃখ-বিপর্যয়কে দেখেছে, তার মধ্য দিয়ে চিনেছে তার ঠাঁইটুকুকে—আপনজনকে। এইখানেই বাঁচার চেষ্টা করবে সে সব সহ্য করে।

তারই প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি অসহায় মেয়ে, ওই টিয়া। কলরব-কোলাহলের থেকে দূরে কে কার প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হতাশ হয় টিয়া।

তার দিকে চাইবার সময় অবিনাশের নেই। তার চোখই বোধহয় এত লোকের মধ্য থেকে টিয়ার দিকে পড়ে নি। হয়তো দেখে থাকলেও টিয়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই অবিনাশের।

সে চলে গেল ওই সাহেবদের সঙ্গে নৌকার দিকে। টিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওরা নৌকা দুটোয় উঠে চলে

গেল বানে ডোবা মাঠ-প্রান্তরের উপর দিয়ে ওই ভাসমান গ্রাম-এর ধ্বংসাবশেষের দিকে।

টিয়ার দু-চোখ জলে ভরে আসে।

অবিনাশের অবজ্ঞাটা তার সারা মনে একটা হাহাকার এনেছে। কি ঝড় তুলেছে। লোকজনের ভিড় কমে গেছে ওদের চলে যাবার পর, টিয়া একাই একটা সোঁদাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে ওর সবুজ পাতার প্রান্তে গাঢ় হলুদ ফুলের মঞ্জরীগুলো ঝরে পড়ছে, এসেছে ডালে ডালে নিঃস্ব বিবর্ণতা। এ-যেন টিয়ার জীবনের মতই, ফুল ফোটার পালা ফুরিয়ে গেছে তার জীবন থেকেও।

হঠাৎ গিরিবালার ডাকে চাইল টিয়া।

বুড়িও প্রথম থেকেই দেখেছে টিয়াকে। মেয়েটা বের হয়ে এসেছিল অবিনাশকে দেখে। কিন্তু দেখেছে গিরিবালা অবিনাশ ওর দিকে চাইবার সময়ও পায় নি, বোধহয় দরকারও বোধ করে নি। টিয়া দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হা-পিত্যেস করে। গিরিবালা-যতিলালের বোন-নকাঁড়র বৌও দেখেছে ব্যাপারটা, তারা মনে মনে খুশীই হয়েছে।

এবার ওই ভিড় কমে যেতে অবিনাশ চলে যাবার পর এসে হাজির হয়েছে গিরিবালা। ও শুধোয় :

—কি বললো র‍্যা অবা?, নিতে এসেছিল বুঝি তোকে? টিয়া চাইল গিরিবালার দিকে। ওর চোখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসিটা দেখেছে টিয়া। তাই বলে সে :

—কাজে এসেছিল, সময় পায়নি, কর্তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ফিরে আসবে একটু পরেই। কাজের মানুষ কিনা—

কথাটা জানিয়ে টিয়া বেশ মাথা উঁচু করে এ-বাড়ির দিকে ফিরে এল। গিরিবালা হঠাৎ মুখের মত জবাব পেয়ে বেশ চটে উঠেছে মনে মনে। গিরিবালা গ্রামের মেয়েদের মুখপাত্র হয়েই টিয়াকে কথাটা শোনাতে এসেছিল। কিন্তু শক্ত জবাব পেয়ে বেশ চটে উঠেছে। গিরিবালা বলে ওঠে :

বরের চাকরি প্যাদাগিরি
তায় রেখেছে মোচ
সেই গরবে মাগের গরব
ঘরে দ্যায় না ছোঁছ।

কাজের মানুষ কিনা—রাজকাজে এয়েছিল, কথা বলবার সময় পায় নি। মরণ!

এবার গিরিবালা বেশ গলা তুলেই বলে—এখনে যে রাসলীলা করছিস সেটা কি শোনে নি লা? তাই কথা বলেনি ধিৎকারে। তোর খবর কে না জানে।

কথাটা শুনেছে টিয়া।

থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় ঘুরে গিয়ে জবাবটা এবার দিয়ে আসবে। কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল টিয়া। কথাটা সে ভাবেনি। হঠাৎ মনে হয় ওরা সব পারে। হয়তো ওদেরই কেউ অবিনাশের কানে নানা মিথ্যাকথা অতিরঞ্জিত করে বলেছে, আর তাদের কথাগুলো শুনে শুনে ওই অবিনাশও তাকে এড়িয়ে গেছে আজ ইচ্ছা করেই, ঘৃণাভরে।

টিয়া অবাক হয়। এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনও বোধ করে নি অবিনাশ। একতরফা ওদের কথা শুনেই তার সম্বন্ধে এতবড় একটা ভুল করবে, এটা ভাবতে পারে না টিয়া।

টিয়া চুপ করে এসে ঘরে ঢুকলো।

ব্যাপারটা দেখেছে যতীনের মা। ওর নজর সব দিকেই। বুড়ি দেখছে ক'দিন থেকেই ব্যাপাটা। ওই মেয়েগুলোর কথা-বার্তাও শুনেছে, এখানেও এসেছে ওরা। সব যেন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে-শুনে গেছে।

অবশ্য যতীনের মা জানে গেণ্ড-বাবুদের। কিন্তু এত টাকা-পয়সা যাদের —তাদের এসব অভ্যাসগুলোকে যতীনের মা মেনে নিয়েছে সহজ বলেই। তাই টিয়াকেও সে দোষ দিতে পারে না।

যতীনের মা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার গিরিবালাকে দেখে বলে ওঠে,—বেচারা মেয়েটাকে কি বলছিলে গা?

গিরিবালা একটু থমকে দাঁড়ালো। যতীনের মায়ের পদমর্যাদা সে দেখেছে। আর এদের আশ্রয়েই আছে। ক'দিন তবু থাকতে-খেতে পাচ্ছে, আবার নাকি চাল-শাড়ি-কম্বল এসবও মিলবে। তাই ওকে চটাতে সাহস করে না। যতিলালের কাঠ-বিড়ালীর মত বউটা বলে—গায়ের বৌ, পাড়াতেই ঘর, তাই কথা বলছিলাম।

যতীনের মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওদের।

গিরিবালাও জবাব দেবার একটা পথ পেয়ে বলে,—এই খোঁজ-খপর নিচ্ছিলাম বাছা।

যতীনের মা বেশ চড়া গলায় বলে —দরদে তো ফেটে পড়ছো কিনা, তাই খপরের জন্যে হেদিয়ে উঠেছো।

যতীনের মা কথাগুলো শুনিয়ে এই বাড়ির দিকে এগিয়ে এল। গিরিবালা সদলবলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কিছু না বললেও ওরা যে জ্বলে-পুড়ে মরছে, এটা বোঝা যায়।

গজগজ করে—বুড়িমাগী যেন দারোগা। মেজাজ দাখ্ না।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, খাবার আয়োজন হয়ে গেছে। বন্দী লোকগুলোর এখন করার কিছুই নেই। পাতা নিয়ে বসে কলরব সুরু করেছে। গিরিবালা হাঁক দেয়—বসে পড় লা তোরা।

প্রভাতবাবু দেখেছে চারদিকের অবস্থা। বানের জল নেমে আসছে। এই ক'দিন জলে ডুবে একাকার হয়েছিল। এবার বের হচ্ছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণটা।

সারা সবুজ দিগন্তের বুকে নদীর মত তাণ্ডব বয়ে গেছে ক'দিনেই। কোথাও সবুজ ক্ষেতের বুকে গড়ে উঠেছে নদীর মত গভীর খাদ, বানের তোড় বয়ে গিয়ে নদীই হয়ে উঠেছে ক'দিন, আর চারদিকে নদীর রাশি রাশি বালি ধানক্ষেতকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। গ্রামের পুকুরগুলোর কালো টলটলে জল আর নেই। পাড়ের সবুজ গাছ-গাছালি—কলা পেঁপের গাছগুলো গলে-পচে গেছে, পুকুরের জল ঘোলা বেনো জলে ভরে রয়েছে। আর কুয়ো, টিউবওয়েল দু'চারটে যা ছিল বুজে গেছে প্রায়, আর সাজানো ঘর-বাড়িগুলো ধসে ভেঙে পড়ে গেছে। এ যেন ধ্বংসপুরীর রাজ্য।

বর্ষার সুরু, এবার যেন আকাশ ছেয়ে মেঘ জমেছে নতুন করে ধ্বংসের আভাস নিয়ে। ক'দিন ধরে ওরা এই স্কুলেই পড়ে আছে। তাই যে যার বাড়ি ফেরার কথা এবার ভাবছে। ওদের মনে একটা চাপা অসন্তোষ জাগে।

—কতোদিন পড়ে থাকবো ইখানে?

—ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিবেক বললেক, তার কি হলো?

দেগঙ্গার লোকজন এবার ভাবনায় পড়েছে। নদীর হানামুখ তাদের গ্রামের সামনেই। তখনও বাঁধ মেরামতের কাজ সুরু হয়নি। বেশী বন্যা এলেই নদী থেকে জল বেরুবে আবার, বাকী জমি, গ্রাম-বসত ডুবিয়ে দেবে। বালির স্তূপ বয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের জমিকেই পাহাড় করে দিয়েছে, আরও দেবে। তারা এবার মুখর হয়ে ওঠে।

—ভিখেরীর মত ইখানে পড়ে থাকবো না। বাঁধ বেঁধে দিতে হবে।

...প্রভাতবাবু, অরুণ সেন, অবিনাশ এরাও এবার গ্রামে গ্রামে বাকী লোকদের নিয়ে মিটিং করেছে, সদরের কিছু লোকও

এসেছেন। তাঁরাও দেখেছেন সব কিছু। ওরাও ভাবনায় পড়ে।

—এভাবে চললে কোন সুরাহা হবে না। কেতুবাবুদের দরকার হয় বলতে হবে।

অবিনাশ চুপ করে কথাটা ভাবছে। কয়েক দিনে তার দেহ-মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। ওই রিলিফের বাবুদের অনেক কথাই শুনেছে। কিন্তু যা ঘটতে দেখেছে সেটা মোটেই সুবিধার নয়। নিজেও সদরে দৌড়াদৌড়ি করেছে, নকড়ি, গুপীনাথ-যতিলালদের নিয়ে গেছে। কিন্তু কর্তারা বলেন—সব ব্যবস্থাই তো কেতু-লালবাবু, গেণুবাবুরা করছেন। অবিনাশ বলে ওঠে—ওদের হাতেই তাহলে আমাদের জান-মালের জিম্মাদারীর ভার তুলে দিয়েছেন আমাদের মতামত না নিয়েই ?

ভদ্রলোক চাইলেন ওর দিকে। তিনি নিজে দেখে গেছেন এখানের ক্যাম্পের ব্যবস্থা। তাই বলেন—ওদিকের বহু লোকজন, মেয়েদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

অবিনাশ একটু কঠিন স্বরে বলে—আমরা ওই ভিক্ষে চাই না স্যার। বাঁধটা বাঁধিয়ে দেন, আর একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই, কিছু বীজধান, গরু-বাছুরের জন্য খড়—

ওঁরা বলেন—দরখাস্ত রেখে যান। আমরা দেখছি।

....ক'দিন ঝড়ের মত কেটে গেছে অবিনাশের। দেখেছে ফিরে এসে তেমন কোন সুরাহাই হয় নি। ওই স্কুলবাড়িতে অসহায় বুভুক্ষু মানুষের ভিড় কিছু বেড়েছে।

অবিনাশ বসন্তকে দেখে চাইল।

দু'দিন সদরে থেকে ফিরছে অবিনাশ। কিন্তু বসন্তকে পাতা নিয়ে ওইখানে বসে খিচুড়ি খেতে দেখবে ভাবেনি।

—তুই! বসন্ত!

প্রথম দিকে এখানে আসেনি বসন্ত। প্রতিবাদই করেছিল—ওদের ভিক্ষে নোব না হে।

বসন্তও কৃষক সমিতির একজন তেজী কর্মী। কিন্তু ক'দিনেই লোকটার দশাসই শরীর ধনুকের মত বেঁকে গেছে। চোখের কোলে জমেছে কালির দাগ। একা নয়, বসন্ত এসেছে আধমরা বৌ আর শীর্ণ মেয়েটাকে নিয়ে। ওরা গোগ্রাসে গিলে চলেছে ওই লপ্‌সি।

বসন্ত যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে। তাই আমতা-আমতা করে—ওদের নিয়ে আর উপোস দিতে লারলুম অবা। দু'দিন পড়ে থেকে শেষমেষ—

বসন্ত কথাটা শেষ করতে পারে না। কি রুদ্ধ অপমানে ওর গলা যেন বুজে আসে। পাশে বসেছিল নিতাই। একমনে খিচুড়ি খেয়ে চলেছে। নিতাই অবশ্য এখানেই থাকে। গেণুবাবুর সরকার মশাই-এর বাহন, খামার বাড়ির গরু-বাছুরের দেখাশোনা করে তার সন্ধ্যার পর থেকেই নিতাই-এর চেহারা বদলে যায়।

অনেকে বলে—নিতাই নাকি চোরা ভাটির মদ বানায়, আর সেই মদ বোতল-বন্দী করে বাইরেও চালান যায়, অবশ্য খামারের বিরাট সীমানায় কেউ যায় না। মন্দ লোকে বলে—সরকার মশাই-এর নাকি ওটা নিজস্ব ব্যবসা, নিতাই ওই কাজগুলো দেখাশোনা করে। বেশ দাপটের সঙ্গেই এখানে আছে নিতাই।

নিতাই অবিনাশকে চেনে। এর আগে সেবার নগাঁয়ের মেলায় যতীনের সঙ্গে ওদের গোলমাল বাধে। যতীন মেলাতে তিন তাসের আসর বসিয়েছে। অবশ্য কাজটা বেআইনী। কিন্তু ওরা জানে গেণু বাবুর লোক তারা। আর কেতুবাবুর তো যতীন-নিতাইকে না হলে চলে না। কেতু বাবুর ইলেকশনের সময় দু-চারটে জায়গাতে ভোটারদের জোকাতে হয়, যাতে ভোট দিতে তারা না পারে। আর যতীন-নিতাই-এর দলকেই সেই কাজটা করতে হয়।

তাই যতীন জানে তার জন্য আইনের বাঁধনটা আলগা হয়েই আছে। থানার বাবুরাও এখানে আসেন। তাদের পরিচর্যা গ্রহণ করেন, আর নিতাই-এর হাতযশের খবরও তাঁরা জানেন।

সব মিলিয়ে ওদের প্রতিষ্ঠা এখানে কায়েমই রয়েছে। শুধু অবিনাশ-নকড়ি যতিলাল আরও কিছু লোক তাদের দেখতে পারে না। প্রভাত মাস্টার, অরুণ ডাক্তার ওদেরই দলে। যন্তীনকে সেবার ওরাই মেলা থেকে তুলে দিয়েছিল।

নিতাইও এসে হামলে পড়ে যতীনের জন্যে।

—কেন ভস খেলবে নাই উ ?

অবিনাশ বলে ওঠে—জুয়োখেলা বন্ধ করতেই হবে। সোজা যাবে তো যাও না হলে—

ওর বাকী কথাটা ওরা অনুমান করতে পারে। ওরা মারবোরই করবে। তবু নিতাই গর্জায়—তোমাদের রাজি নাকি হে ?

নকড়ি সেবার হেঁকে ওঠে—তোর বাবা গেণু দাসের রাজি এটা লয়। চোপা করবি তো নদীর চরে পুঁতে দোব।

ওই বসন্তও সেদিন ওদের দলেই ছিল।

....অবিনাশদের আজ দেখেছে নিতাই। সেই তেজ দাপট কোন্‌দিকে উবে গেছে। ওদের চোখের জ্বালাটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। বসন্তকে এবারও মাথা নীচু করে এখানে এসে হাজির হতে হয়েছে। যতীনও বলে—অনেক মামুরই এবার নাকখত দিতে হবে।

আজ নিতাই সেই অবিনাশকে এখানে এসে ওইভাবে বসন্তকে বলতে দেখে সেও বেশ দাপটের সঙ্গে বলে ঃ

—কে কি করবে না করবে তুমি বলার কে হে ? ও যদি ইখানে আসে তুমি কথা বলবে কেনে ? তুমি কি ওর মাগ-ছেলাকে খেতে দিবা ?

অবিনাশ নিতাই-এর মুখে জবাবটা পেয়ে ওর দিকে চাইল।

বসন্তও চুপ করে গেছে। চাপা রাগে অবিনাশের সারা মন জ্বলে ওঠে। একটা ব্যবস্থা হবে, কিন্তু বসন্ত যে তাদের না জানিয়ে এখানে এসে নিতাই-যতীনের দলের একজন হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

অবিনাশ জবাবটা দিতে পারতো নিতাইকে, কিন্তু চেপে গিয়ে বলে—জবাব দে বসন্ত।

নিতাই-এর চড়াগলায় দু'-চারজন লোকও জুটে গেছে। যতীন ভাঁড়ার ঘরে ছিল। মালপত্রের দেখাশোনাও তাকে করতে হয়। সে এগিয়ে এসে অবিনাশকে ওই কথা বলতে দেখে জানায়—উ কি জবাব দেবে ? নিজেও তো ডব্‌কা বৌটাকে পাঠিয়েছো হে ? আর সে তো ইখানের হাটের মধ্যে না থেকে উদিকে সেজেগুজে পরীটি হয়ে আছে। বলি তুমার মেয়ে-ছেলের বেলায় দোষ নাই—দোষ উদের বেলায় ?

অবিনাশের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তার উত্তেজিত শিরাতন্ত্রীতে উষ্ণ রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়। অবিনাশ গর্জে ওঠে—যতীন।

অন্য সময় হলে যতীনের শীর্ণ দেহটাকে সে একঝটকায় ছিট্‌কে ফেলে দিতো, এর আগে নগাঁয়ের মেলাতে দিয়েছেও। আজ তবু সামলে নিয়েছে অবিনাশ। গর্জে ওঠে মাত্র। যতীনও চড়া পর্দায় বলে উঠে ঃ

—আগে নিজের ঘরের বৌটাকে দেখো—তারপর লুকের কথা বলবা—

বদন ডাক্তার এসে পড়েছে। অবিনাশ যতীনের টুঁটিটাই টিপ ধরেছে এবার। গোলমাল হৈ চৈ চীৎকার উঠছে। কলরব ওঠে।

নিতাই এবার অন্য ভূমিকা নিয়েছে। আজ তারাই এবার জবাব দেবে অবিনাশকে। কয়েকটা কিল ঘুঁষিও পড়েছে অবিনাশের উপর। প্রভাতবাবু, বদন ডাক্তার কোন

গ্রীষ্মে, শরতে, হেমন্তে, বসন্তে সব ঋতুতেই

কালিম্পঙ

বসে রঙ্-রূপের মেলা

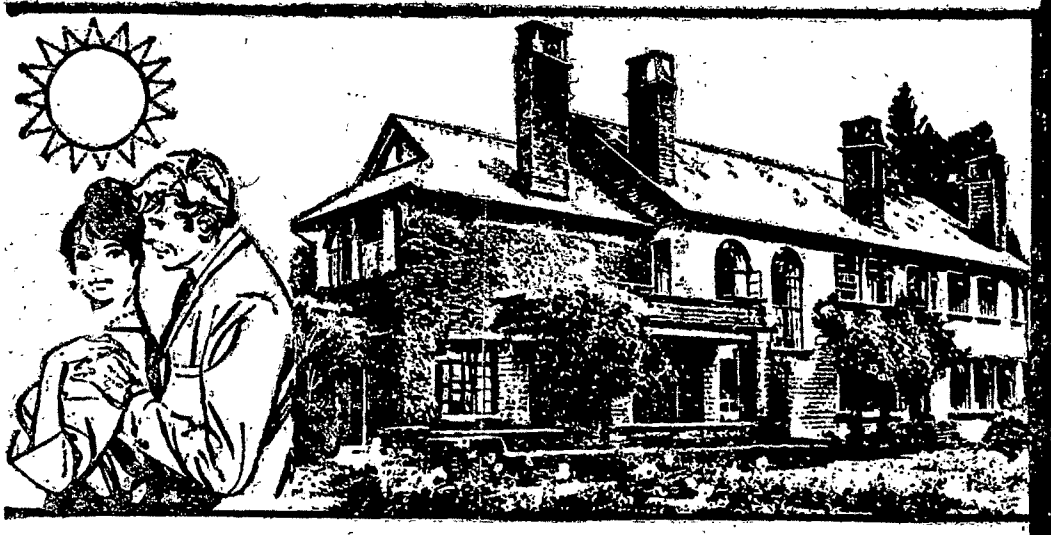

ঋতু পরিবর্তনের ছন্দে ছন্দে কালিম্পঙের রঙ্, বদলায়, কিন্তু বরফ ঢাকা চূড়ায় ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটির রূপের সম্মোহ বছরভোর অম্লান। যে কোনদিন চলে আসুন—একা কিংবা সঙ্গী সাথী নিয়ে।

আপনার পছন্দমতো সুসজ্জিত বিলাসবহুল কালিম্পঙ ট্যুরিস্ট লজ বা কম খরচে শান্তিলতা ট্যুরিস্ট লজ যেটায় ইচ্ছা থাকুন। কয়েকটি দিন আনন্দে কাটিয়ে যান।

কালিম্পঙ বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার। আর, ইচ্ছামত দার্জিলিঙ (৫১ কিলোমিটার) বা গ্যাংটকও (৭৭ কিলোমিটার) ঘুরে যেতে পারেন।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
রিজার্ভেশন কাউন্টার
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৬/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা
ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৬/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২৩-৮২৭১, গ্রাম ঃ TRAVELTIPS

৭৫/৪৪/৪৪/৭৬

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হুকুমে ওদের ছাড়িয়ে দিয়েছে। তবু মর্জায় যতীন—জান খেয়ে লিব।

অবিনাশ-এর নাকমুখ কেটে গেছে। টের ঠেকছে নিজের রক্তের নোনতা স্বাদ। আজ তার মনে হয় চারিদিকের রূপটা যেন বদলে গেছে।

প্রভাতবাবু বলে—চল এখান থেকে।

দু চারজন লোক তবু মৃদু প্রতিবাদ তোলে—এ কাজটা ঠিক হয়নি মাস্টার... খামোকাই অবিনাশকে মারবে ওরা? ইয়ার বিচার হবেক নাই?

গোলমালের জেরটা ওই নোতুন গ্রামেতে গিয়েও পৌঁছেছে। পৌঁছে দেবার মত লোকের অভাব নেই। আর রংচং লাগিয়েই ইতিমধ্যে খবরটা গেণু দাসের কানে পৌঁছেছে।

কেতুলাল-গেণু দাস এর মধ্যে হিসাব-কিতাব করে ফেলেছে। রিলিফের টাকা জিনিষপত্র আসছে। ওই জলবন্দী লোকদের জন্য ঘর তৈরী করার কিছু টাকাও এসেছে, তাদের এ সময় গ্রামে ফিরে গেলে সব কিছু গ্রামে গ্রামে সেন্টার করে সেখানের গ্রাম সমিতি বা কিছু স্থানীয় লোকের হাতেই তুলে দিতে হবে। তাতে এদের প্রাধান্য থাকবে না। সরকার থেকে সেটার ব্যবস্থা করা হবে।

এই ব্যাপারটাকে তাই তারা এখানেই সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করছে। এ নিয়ে অসন্তোষ আছে—এ গ্রাম ও গ্রামে কথাও উঠছে সে খবরও জানে ওরা। অবিনাশ যে সদরে এটা করানোর চেষ্টা করছে সেখানের বেশ কিছু লোকদের সাহায্যে। তাঁদের মদত দিচ্ছে এখানকার মানুষ; মায় প্রভাতবাবুর দল এ খবরও জানে সে।

অধর ভটচায-এর এখন স্কুল বন্ধ। আর সেও চায় ইস্কুল বন্ধই থাকুক। তাতে কাম করতে হবে না। এদিকে রিলিফের চাল-ডাল-ধুতি-কম্বল—মায় নগদ টাকারও কিছু অংশ মিলছে। অধরবাবু বলে ঃ

—আপনার প্রশ্রয় পেয়েই ওরা এসব করার সাহস পেয়েছে গেণুবাবু। আপনি মহান ব্যক্তি।

গেণুবাবু ঠা ঠা করে হাসে। হাসি থামিয়ে বলে ঃ

—সইতে হয় অধর। শোননি? যে সয় সেইই রয়। দেখা যাক কি হয়।

কেতুলাল বলে — লোকগুলোও বেইমান। ওদের জন্য দিনরাত খেটে মরছি। আর তলকুলুক চুঁড়ে এসব আনছি—ওরা তলে তলে নাকি দরখাস্ত করছে। ওই অবিনাশের দলও রয়েছে।

গেণু দাস ক্ষমাসুন্দর স্বরে বলে—আরে এতকাল দেশের কাজ করছো, কথা শোননি? এ আর নোতুন কি ব্যাপার কেতু? তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও, যে যা বলার বলতেই থাকবে। গীতায় পড়োনি কি হে অধরবাবু?

গীতা পাঠ করা যেন গেণু দাসের নিত্যকর্ম। সে হেডমাস্টার অধরবাবুকেই এবার গীতার থেকে প্রশ্ন করে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করে চলেছে। গেণু দাস বলে ঃ

—ওই যে মা ফলেষু কদাচন।। ফলের আশা করো না। কেতুলাল বোঝবার চেষ্টা করে গেণু দাসের বচনামৃত। অধর মাস্টারও মাথা নাড়ে—আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন

গেণু দাস জানে তার প্রাপ্তি-যোগের কথা। কর্মযোগ-এর পরই প্রাপ্তি-যোগ, তার কাছে এইটাই বড় কথা। আর্থিক আমদানী ছাড়াও তার কাছে জমার খাতায় প্রতিষ্ঠা—আর সমাজের মাথায় ওঠার অধিকারটাই অন্যতম প্রধান চাওয়া। তার জন্য সে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে পা ফেলে।

এমন সময় খবরটা এসে পৌঁছায়।

অবিনাশ-এর দলবল নাকি গোলমাল বাধাতে চায়। ওরা এখান থেকে লোকজনদের গ্রামে ফিরে যেতে বলছে। তাই নিয়ে দু একজন আপত্তি করতেই মারামারি বেধে গেছে।

তিনকড়িও ব্যাপারটা দেখে দৌড়ে এসেছে—আজ্ঞে যতীন নেতাই কি বলতে গেইছিলেন, তাদের ধরে পিটুছে।

—সে-কি! অধর মাস্টার একটু ঘাবড়ে গেছে। এমনিই ভীতু লোক—আর মনে মনে সে জানে অনেক অন্যায়ই করেছে সে। খাতাপত্রে রিলিফের হিসাব লিখেছে তাতে শতকরা সত্তর ভাগই জাল। এসব খবর জানতে পারবে ওই গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষগুলো। তাকেও ছেড়ে কথা কইবে না। তার ঘরেও রয়েছে বেশ কিছু ধুতি, রিলিফের কম্বলের গাঁট। সব যদি হাতে-নাতে ধরে ফেলে বিপদ হবে অধরবাবুর।

তাই বলে সে—এসব কি ব্যাপার বড়বাবু? ওরা হামলা করবে এখানে?

কেতুলালও অবাক হয়। গেণুবাবুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেছে এর মধ্যে। গেণু দাস মাথা ঠান্ডা মানুষ। রাগলেও সেটার প্রকাশ ঘটে না। গেণু দাস বলে ওঠে—চলো দেখে আসি কেতুলাল।

অধর মাস্টারও রয়েছে ওদের সঙ্গে। ভয়ে ভয়েই চলেছে সে বাধ্য হয়ে।

অবিনাশ ভিড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ চোট পেয়েছে।

নকড়ি, যতিলাল, দুখুরাম আরও দু-চারজন জুটে গেছে। গিরিবালাও এসে পড়েছে। তার গালবাদ্য শোনা যায় ঃ

—ওমা অবাকে নাকি ছাপু খুন করে ফেলাইছে শোনলাম। তা বাপু পাঁচজনে ঘিরে রাগে পেয়ে এভাবে মারে? বেচারা কোথাকার—

নিতাই ধমকে ওঠে—তুমি থামো দিকি। ওসব দালালি ছুটিয়ে দোব না?

এমন সময় খোদ কত্তাবাবুকে ঢুকতে দেখে যতীনও মুখ খোলে। নিতাইও নিজের প্রাধান্য জাহির করার জন্য বলে চলেছে ঃ

—এখানেও দল পাকাতে এসেছে বড়বাবু? লোকজনরা এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। খেতে পাচ্ছে আর ও বলে বেড়াচ্ছে ভিক্ষের চাল খেতে লাজ লাগে না? ইখানে কেন এসেছিস? গাঁয়ে ফিরে চল, সরকার ঘর বানিয়ে দেবে, চাষ করার খরচা দেবে, খেতে দেবে।

অবিনাশ প্রতিবাদ করে।

—ওসব কথা বলিনি। শুধোও বসন্তকে কি বলেছি।

গেণু দাস নিতাই-এর কথাগুলো শুনছে। ও একটু অবাক হয়। কথাগুলো আইনের কথা। আর পাকা মাথার কথা। লোকগুলো চলে গেলে রিলিফও বন্ধ হয়ে যাবে এখানে। তাই ঘাঁধ ঘাঁধার কাজও সুরু করছে না কেতুলাল গড়িমসি করছে। গেণু দাস চায় ওদের অভাব কষ্টটা ষোল আনাই থাকুক, তবেই তার কাছে ওরা মাথা নীচু করে থাকবে।

আর সামনের সেলেটমেন্টের আগেই সে ওদের ভাগচাষের জমি নিজের খাসে আনতে পারবে। না হয় এমন পারিস্থিতিতে সে চাষীদেরই উৎখাত করে দেবে।

কেতুলাল এবার স্কীম এনেছে এখানের ওই নদীর ধারে একটা কারখানাই করবে, সুগার মিলও হবে। জেলায় কোন কলকারখানা নেই। এখানে সরকারী সাহায্যে গেণু দাসই মিল চালু করবে। তাই এসব জমি তার খাসে আনা দরকার।

কিন্তু তার দাবার চালে বাধা দিতে চায় কিছু লোক। অবিনাশ তাদের অন্যতম। গেণু দাস রাগে যেন ফেটে পড়বে। কিন্তু সংযত স্বরে শুধোয়—এসব কথা বলেছিস অবিনাশ? কি প্রভাতবাবু আপনি তো ছিলেন?

প্রভাতবাবু পরে এসেছে। তাই ও সবটা জানে না। যতীনই বলে ওঠে ঃ

—একশোবার বলেছে।

মেলার সেই রাতের মারের শোধটা আজ নিতে চায় যতীন। অবিনাশ দেখছে নিতাইকে। আজ সে তার স্ত্রী ওই টিয়াকে নিয়েও ইঙ্গিত করে কথা বলেছে। অবিনাশ বলে ওঠে ঃ

—নিতাই কি বলেছে শুধোন ওকে? বানে ঘর ভেঙ্গে যাবার পর অনেক বৌ-ঝিদেরই এখানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের জড়িয়ে কি বলেছে ও শুধোন?

নিতাই একটু বিব্রত বোধ করে। গেণু দাসও চুপ করে কি ভাবছে। তার ওই বাড়ির আশ্রিতদের কথাই মনে পড়ে। অবিনাশ বলে ঃ

—মান-ইজ্জত নিয়ে কথা ওঠে যেখানে, সেখানে পাত পাড়ার চেয়ে ভিক্ষে করাও ভালো বড়বাবু। তাই বসন্তকে বলেছিলাম কথাটা।

কি রে বসন্ত বল?

সমবেত লোকদের মুখেচোখে জমাট বিষন্নতার ছায়া। গেণু দাস কিছু বলার আগে কেতুলাল বলে ওঠে—এত যদি সম্মান তবে এখানে এসেছিলে কেন?

যতিলাল জবাব দেয়—আপনাদের কাছে হাত পাতিনি বাবু, সরকারের কাছে হাত পেতেছি। তাঁরা দিচ্ছেন—আর আপনারা তাই নিয়ে সর্দারী করছেন ওই যতীন-নিতাইদের নিয়ে।

গেণু দাস অবাক হয়। ওই শীর্ণ বুভুক্ষু মানুষগুলোর মনের অতলে এমনি আগুন রয়ে গেছে ওই বুকের খাঁচার মধ্যে তা ভাবতেই পারেনি। সমবেত-লোকদের মাঝেও গুঞ্জরণ ওঠে। তারা এই ক'দিনে যেন ভিখারীর মত মাথা নীচু করেছিল এখানে ওদের দয়ায়। আজ আসল কথাটা জানতে পেরেছে তাই তারাও প্রতিবাদ করে—ঠিক কথা। ওরা অবাকে মারার কে?....

অবিনাশের দুচোখ জ্বলছে। ও বলে ওঠে ঃ

—ভাসা বাঁধে এক কোদাল মাটি পড়েনি কেনে? দাসমশাই চান নদীর মুখ খোলা থাকুক যাতে আমরা আবার ডুবি। তাই বলছিলাম—এখানে পাকা কোঠায় ভিখেরী সেজে লপ্‌সি খেতে চাই না। ঘরে ফিরে চলো, সব—বাঁধে হাত লাগাও। সরকার—ডি-এম সাহেব সেদিন তোমাদের হাতেই রিলিফের টাকা জিনিষপত্র তুলে দেবে।

চারিদিকে লোকজন ক্রমশঃ এখানে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। কাজকর্ম নেই। করারও কিছু যেন নেই তাদের। রাতারাতি ওই গেণু দাস-কেতুলালের পায়ের তলে ফেলে ওদের যেন গোলাম করে রেখেছে। আজ হঠাৎ ওই সমবেত মানুষ বুঝেছে এদের চালটা। অবিনাশ-এর রক্তখরা বলিষ্ঠ কঠিন মুখচোখে কি দীপ্তি।

গেণু দাস বলে ওঠে—লেকচার শেষ হয়েছে তোর?

অবিনাশ চাইল ওর দিকে। গেণু দাস বলে—যার খুশী থাকবে, যার খুশী চলে যাবে। তাতে কেউ বাধা দেবে না। তবে এখানে গোলমাল করতে এলে পুলিশেই খবর দোব অবিনাশ।

অবিনাশ জানে সে সাধ্য ওদের আছে। এখন এসময় কোন গোলমালও করতে চায় না সে। এই অসহায় মানুষগুলোকে নিরাশ্রয় করাও তার পক্ষে ঠিক হবে না। তবু তার এই কথাগুলো সমবেত মেয়েছেলে লোক-জনের মনে একটা প্রশ্ন তুলেছে, ওরাও চুপ করে এখানে পড়ে থাকবে না সেটা বুঝছে অবিনাশ। তাই সে বের হয়ে এল।

অবশ্য নিতাই তখনও গজ্‌গজ্‌ছে—ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছিস যে?

বদন ডাক্তারও ব্যাপারটা দেখেছে। সে চতুর ব্যক্তি। দেখেছে ওই বুভুক্ষু জনতার শীর্ণ মুখে প্রতিবাদের কাঠিন্য, যদিও সেটা সোচ্চার হয়ে ওঠেনি কিন্তু তার অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা যায় না। সেটা রয়ে গেছে। তাকে ওদের নিয়েই চলতে হবে। তার ডাক্তারি অচল হয়ে যাবে। তাই অবিনাশকেও চটাতে চায় না সে। নিতাই-এর কথায় বলে ওঠে বদন ঃ

—থাম নিতাই। বাবুদের কথার মাঝে তোর ফোড়ন কাটা কেন?

একজন সব ব্যাপারটাই দেখেছে দূরে থেকে। টিয়া ওই গোলমাল শুনে বের হয়ে এসেছিল, এমন গোলমাল এখানে প্রায়ই বাধে তুচ্ছ কারণ-অকারণে। এতগুলো মানুষ কাজকর্ম নেই শুধু বসে গুড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে, মনে রয়েছে জ্বালা। তাদের পক্ষে এমন গোলমাল বাধানো স্বাভাবিক ব্যাপারই।

টিয়া এখান থেকে একটু আলাদা ভাবে রয়েছে। আর দেখেছে টিয়া যতীনের বুড়ি মায়ের যন্ত্রটাও। সেদিন অবিনাশ তার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবার পর রাগে ফুলছিল টিয়া। অবিনাশের অবস্থাটা সে বুঝেছে, আর কারণটাও কি তা বোধহয় ও গিরিবালার মুখের কথাগুলোয় অনুমান করেছিল। তাই টিয়ার অভিমানই হয়।

যতীনের মা জানে এখানে টিয়াকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যটা। বাবুদের ব্যাপার সে অনেক কিছুই জানে। টিয়ার রূপ-যৌবনের বাহারও দেখেছে বুড়ি। তাই টিয়াকে বলে ঃ

—মরদ! এমন সোয়ামীর দাম কি বাছা? বলে না, ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোঁসাই। এতদূর এলি একবার দেখা করে গেলি না?

টিয়ার অভিমানী মন গুমরে ওঠে। ও বলে ঃ

—বান কমলেই বাবুদের বলে দাও যতীনের মা আমাকে সহরে পাঠিয়ে দেবে। ভাইদের ওখানেই চলে যাবো।

যতীনের মা কথাটা লুফে নিয়ে বলে ঃ

—তা বাবুতো ইদিকে আসেন কথাটা নিজেই বলো। দয়ার শরীর বাবুর, আর গাড়ি টেরাক তো যাতায়াত করছে, এ আর এমন কি কথা।

তাই বলছিলাম বাছা সোয়ামী আমাদেরও ছিল, এমন ছিল না। বলে না—ভাত দেয় কি ভাতারে? ভাত দেয় আমার গতরে। গতর খাটাবে। খাবে। এমন নিষ্কর্মা সোয়ামীর মুখে মারি আধোয়া খ্যাংরা।

টিয়া চুপ করে কথাগুলো শুনেছে। অবিনাশের উপর রাগটা জমেছিল। এখান থেকে চলে যাবার সুযোগই খুঁজছে সে। সহরে চলে যাবে—সেখানে বাঁচার একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

সন্ধ্যা নামে।

চারিদিকে ঘনিয়ে আসে জমাট অন্ধকার। ওপাশে বাবুদের বাড়ি নোতুন বাংলোয় বিজলীর বাতি জ্বলে। ইস্কুল-বাড়িটায় কয়েকটা বাতি লাগানো হয়েছে। কিন্তু বাকীটা সব অন্ধকার। এবাড়ির বাগানের গাছ-গাছালিতে আঁধার ঘনতর হয়ে ওঠে। মিটমিটে হ্যারিকেনের আভা ওই জমাট অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

টিয়া কথাটা ভেবেছে। এখান থেকে চলে যাবে সে সহরে। তাই বড়বাবুকে দেখে এগিয়ে যায় সে।

গেণু দাস সন্ধ্যার পর একটু বেড়াতে বের হয়। গোয়ালবাড়ি-খামারবাড়ির সব কিছু একবার তদারক করে সে এইদিকে বাংলোর দিকে চলেছে, হঠাৎ টিয়াকে দেখে দাঁড়ালো।

টিয়া দেখছে লোকটাকে। সেই ঝড়-বাদলের রাতে বিদ্যুতের ঝলকে দেখেছিল তাকে। তার চোখের সেই জ্বলন্ত চাহনিটা ভোলেনি টিয়া। আজ এই অবস্থা তারাজ্বলা অন্ধকারে, গাছের ছায়া অন্ধ-কারেও সেই চাহনিটাই যেন আবার দেখছে সে।

টিয়া তবু বলার চেষ্টা করে—আমাকে সহরে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। দাদার ওখানেই যাবো।

গেণু দাস ওর দিকে চাইল। গেণু দাস বলে ওঠে ঃ

—কেন? এখানে তোমার অসুবিধা হচ্ছে? যতীনের মাকে বলে দিয়েছি—

১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

সাগর-দ্বীপে

॥ দিনেশ দাস ॥

শ্রীগোপাল ভৌমিকের উদ্দেশে

ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি,
জল, আলো, রাত্রস খেয়ে মুখ মুছলাম।
তবু এক আকণ্ঠ পিপাসা—
"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা।"

সাগরদ্বীপের রুদ্রনগর থেকে
মধ্যরাত্রে আমরা তিনটি প্রাণী চলেছি সাইকেল-রিক্সায়,
দু'ধারে গাছের পাতাগুলি শির্‌শির্‌ শব্দ করে
আমাদের সাগর-যাত্রা রিলে ক'রে চলেছে :
দূর থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের ধ্রুপদী গর্জন।
এখন নিশুত রাত :
মালবাহী সাইকেল-রিক্সার পাটাতনে শুয়ে,
দেখছি আকাশে কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ
আর অগুন্তি নক্ষত্র,
অস্পষ্ট আলোয় ঘুমে গেছে আকাশ ও সমুদ্রের সীমারেখা।

বালি-মেশা মাটির তটভূমির ওপর দাঁড়ালাম :
উঁচু উঁচু ঢেউ একরাশ জল আর ফেনা ছিটিয়ে
আমাদের পা ধুয়ে দিল,
আমরাও সেই পদ্ধতি রাখলাম মাথায়।

ঝিনুকগুলো সাদা বেলফুলের মত
ছড়িয়ে আছে বেলাভূমির চতুর্দিকে :
চরের ওপর বেতঝাড়, কাঁটাগাছের জঙ্গল :
একটা শুয়োর নিঃশব্দে চরছে।

সাগর তার ফেনার অগুন্তি দাঁত দিয়ে
কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে
কপিল মুনির পুরোনো মন্দিরটি।
সেখানে পড়ে আছে শুধু ছোট এক ইঁটের স্তূপ,
চার পাশে একটি বাঁকানো, শীর্ণ নারকোল গাছ,
চার ডাল-পাতাগুলো জোয়ারের বাতাসে ঝির্‌ঝির্‌ শব্দ করে
প্রাচীনকালের কত কথাই শোনাতে চায়।

গঙ্গারাঢ়ের এই প্রাচীন ভূখণ্ড এখনও নিজেকে চেনে না,
বাতাস শুধু ভূতের মত হু-হু শব্দ করে :
আমরা তিনটি ভুতুড়ে প্রাণী
নরম, ভিজে, বালমাটির ওপর দাঁড়িয়ে :
রাতের হাওয়ায় সমস্ত শরীর শির্‌শির্‌ করে—
আদিম পৃথিবীর প্রাচীন ভালবাসা
বাতাসের চাদর দিয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরে।

আমাদের এই মেতে ওঠা

॥ নাজিম হিকমত ॥

॥ অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥

আমাদের এই মেতে ওঠায় নেই
ক্ষ্যাপা
নারাজ ঘোড়ার
টিপছাপ।
লাইন বেয়ে গড়গড়িয়ে নমলেও আমাদের মতন
যে-কে সে-ই ইঞ্জিন—
যে তার অয়স্কান্ত মান কখনও খোয়ায় না।
এমনই এক ইঞ্জিন।
প্রত্যেকটা এই টুকু-টুকু ইস্কুপ তাকে আঁটার জন্যে,
বস্তুবাদের দিকে আমাদের মনগুলোকে ফেরাই,
খোলা হয় আর বন্ধ হয় দিনের পর দিন
যাতে বুলবিদ্যার জটগুলো ছাড়ানো যায়।
শক্তির হাতে অর্পণ করব বলে আমরা তাকে বড় করেছি।
এখন ভূমিষ্ঠ সেই ইঞ্জিন
এই চেতনার দুলাল।
আজ, সে এতটাই
আমাদের মত যে—
আমরা যা কিছুই তাকে দিয়ে দলিত-মথিত করতে চাই
তার রাস্তায় ফেললে পয়সার মত করে সে পিষে দেবে।
তবে কথা এই,
আমাদের বেঁধে দেওয়া গণ্ডীর বাইরে
যদি ক্ষণমাত্রও সে পা বাড়াতে যায়,
তাহলে ভেঙে চুরমার হবে।
ওর আর আমাদের একই গোত্র;
আমাদের চেতনার অপত্য
ইঞ্জিন॥

গাঙ্গেয় ক্ষোভ

॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ ॥

সাগরে না গিয়ে পিছু হটে হটে
গোমুখীর দিকে ভাগীরথী ছোটে
ইলিশ মকর শুশুকের ঝাঁক
ফেলে আসা ভাঙা ঘাটে,
জল ছেড়ে বুক পিছলে পিছলে
শুকনো ডাঙায় হাঁটে॥
শুরুতে ও শেষে বিপুল ফারাক
অভাগী গঙ্গা লক্ষ্য হারাক
কিম্বা জহ্নু গিলে থাক তাতে
ক্ষোভ নেই তার ক্ষোভ নেই,
জন্মু চিরে গতিমুক্তি লাভের
লোভ নেই।।
কপিলের কোপে যারা হ'ল ছাই
ষাট হাজার নয়, ষাট কোটি ভাই—
গাঙ্গেয় তটে উজ্জীবনের
মৌসুমী ঝড় তুলে
সমবেত সুরে বলে, "ভগীরথ,
পুত সাধক, সমুদ্র-পথ
আবার দেখাও
গৈরিক পলিতীর্থের কূলে কূলে।।"

বোঝা

॥ গোপাল ভৌমিক ॥

শিলীভূত চৈতন্যকে
নাড়াচাড়া যেই দিতে চাই
অমনি তেত্রিশ কোটি দেবতারা
বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে আসেন এগিয়ে
এবং কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস
ভার হয়ে চেপে বসে বুকের উপরে।

শিলীভূত চৈতন্য যে সাজানো রয়েছে স্তরে স্তরে
তখন বুদ্ধিতে নয় অনুভবে সে কথাই বুঝি
এবং বিস্মিত হয়ে তাকাই সে বিস্মৃত অতীতে
যেখানে হাজার স্বপ্ন গাঁথা ছিল কংক্রিটের ভিতে
এখন কোথায় তারা ইতিহাসে অথবা পুরাণে
আর কিছু ধ্বংসস্তূপে দেউলে শ্মশানে।

শিলীভূত চৈতন্যের
বোঝা যায় প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে বেড়ে
এবং সে ভারে ন্যুব্জ পলাতক আসামীর মত
আমি শুধু ছটফট করি।
যেখানে যা ছিল সব ঠিক পড়ে থাকে
মাঠ, নদী, বন ও পাহাড়ে।

ডানা

॥ হরপ্রসাদ মিত্র ॥

অনেকগুলো ভাঙা রাস্তার লটবহরের জট,
বাতাসে আবর্জনার গন্ধ;
বুড়িটা ন্যাতাকাঁথা শুকিয়ে নিতে চায়।
দরমার দেওয়াল, চটের পর্দা,
শুয়োরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ এই জীবনযাত্রা
ইতিমধ্যে কলকাতার পিঠে একজোড়া ডানা বসছে
—যার নাম গতি।
ন্যাংটো হাল ছাড়ানো পথের ওপর
সেই ঝকঝকে বিজ্ঞাপন।
সোনাপটি, ছানাপটি,—চীনেপাড়া।
তারপর বি-বা-দী-বাগে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে
ভিজে গোবর যখন—
হঠাৎ মনে পড়লো
বনস্পতির পত্রঝরোকার মধ্যে
চুঁইয়ে পড়ছে রোদ্দুর,
একটা শ্যামাপাখি শিস দিচ্ছে কোথাও।
প্রেমও সেইরকম। এবং অন্যান্য বৈচিত্র্যও।

চিঠির ফাইল

॥ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সুখে, দুঃখে, লেন-দেনে, কথালাপে মিলে
আলমারী, ড্রয়ারে পাওয়া চিঠিতে, ফাইলে
পুরনো দিনের স্মৃতি দেখি বেছে বেছে
সবই আজ সমুদ্রের রাত্রি হয়ে গেছে।
সবই যেন সমুদ্রের রাত্রি হ'য়ে হ'য়ে
তরঙ্গিত শূন্যতার দিকে গেছে বয়ে।
নিঃসঙ্গ মঞ্চের 'পরে আমি আজ একা—
ছিলো যারা পাশে, নেমে গেছে বহুক্ষণ।
ফুরোলো কাজের পালা, বাকী শুধু দেখা।
মনে কাঁপে সে-দেখার অন্তিম রণন।
যে-দেখায় মধু নেই, কটু স্বাদ নিয়ে—
দিন যায়, রাত্রি যায়, রয়েছি দাঁড়িয়ে।
সমুদ্রের রাত্রি, অন্তহীন নৈশ নীল—
আলমারী ড্রয়ারে যত চিঠির ফাইল ॥

বৃহন্নলা

॥ সুশীল রায় ॥

শোনো বৃহন্নলা—
বৃহৎ যা-কিছু যদি মহৎ সেটাই, তুমি তবে
পৌরুষে প্রথমশ্রেণী, নারীত্বে তৃতীয়।
তোমার প্রেমের জন্যে লালায়িত থাকে যদি কেহ,
পারিবে কি দিতে তাকে মমতামণ্ডিত শান্ত স্নেহ?
জীবনের অন্তস্তলে বহে যায় পুরুষ-প্রবাহ,
বাহিরে দোভাষী শোভা; বক্ষের কবাটে
কড়া-নাড়া দিয়ে সাড়া পাবার জন্যে যে-ব্যাকুলতা
সে ভ্রান্ত বিলাস মাত্র, মাত্রা-অতিরিক্ত সে-বিভ্রম।
তবু তুমি জীবনের লালসার ঊর্ধ্বে আরোহণে
ব্যর্থ হয়ে বলাম্বিত লয়ে প্রাণধারণে প্রয়াসী।

আতপ্ত চুম্বনে ওষ্ঠ নিপীড়িত হোক, এ বাসনা
অস্থিতে মজ্জায় রক্তে এক হয়ে আছে, বৃহন্নলা,
প্রাণের নিভৃত বাণী স্তব্ধ আছে প্রাণের গুহায়।
তবু তুমি আছ, আছে তোমার আত্মার পরিচয়—
আমাদের কাছে হয়ে আছ তাই অসীম বিস্ময়।
ও-জীবনে কী-যে লাভ, কী-যে অর্থ ও-প্রাণধারণে
আমরা জানিনে তার মানে।
হতে পারে আমাদের কাছে সবই অজ্ঞাত অজ্ঞেয়
তবু জানি তবু মানি—জীবনের কাছে এ বিধেয়॥

পরস্পরের জন্যে

॥ কিরণশংকর সেনগুপ্ত ॥

কেন ডেকে আনতে চাও বার-বার
সেই সব স্মৃতিধূসর ঘটনাবলীকে
যা কখনোই ফিরে আসবে না?

নদীর ঢেউকে কি ফিরিয়ে আনা যায়?
যৌবনের প্রথম শিহরণকে?
কৈশোরের বৃষ্টিভেজা আনন্দকে?
কিংবা জন্মদিনে যে-গোলাপ উপহার পেয়েছিলে
তার আঘ্রাণকে?

মুহূর্তগুলো অবিরাম অতীতের দিকে যাচ্ছে,
নদীর খণ্ড খণ্ড ঢেউ যে-রকম মিশে যায়
জলের গভীরে।
যে-রকম প্রাচীন পুকুরে পায়ের ছাপ
ক্রমশ মিলিয়ে যায়
স্তূপায়িত শ্যাওলার আড়ালে।

এ রকম একটা অনুভবই আমাদের এক এক সময়
ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে;
অর্জিত জ্ঞানের মহড়া দিতে নয়,
পরস্পরের হৃদয়ের দিকে—
একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে।

যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে
বুঝতে পারি
দেনপক্ষে কিছুটা স্বার্থত্যাগ
এই মুহূর্তে
আমাদের পরস্পরের জন্যে
কতোটা জরুরী॥

আজীবন

॥ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

যুগ থেকে যুগের হাতে অবিরাম বাহিত যন্ত্রণা,
পিপাসায় শুষ্ক তালু, আর কিছু পাইনি, পাবোনা!
প্রাপ্তির কৈবল্যে নয়, প্রত্যাশার ব্যর্থতায়, দুঃখে
অভিশপ্ত এ অস্তিত্ব, প্রমিথিউসের অগ্নি, বুকে
রাবণের চিতা যেন আজীবন জ্বলে, তার দাহ
পৃথিবী পোড়ায়, রুদ্ধ করে নম্র প্রাণের প্রবাহ।
দু'দণ্ড মেঘের ছায়া দিয়েছেন কোনো কারুণিক;
তারপর ক্ষুব্ধ অগ্নি আরো তেজে জ্বলে সমধিক।

দু'-একটি নক্ষত্র যারা জ্বলেছিল মহিমায়, দূর
দিগন্তের পারে কবে অস্তমিত; সায়াহ্নে সিঁদুর
মেঘ ভ্রান্ত করে চিত্ত, অচিরাৎ দুরন্ত ঝড়ের
পূর্বাভাস রচে যেন; অথচ যে দুঃখ মহতের
গৌরব, আমার তা তো নেই; তবু ক্রুর লক্ষ ফণা
শতাব্দীর অভিশাপ কোনো দিন এড়াতে পারবো না!

দুতরফা

॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥

আলোচনা চলে আসে ভূমধ্যসাগরে।
শুরু হয়েছিলো ঝর্ণা-নদী-ঝর্ণা, পুকুরের পাশে
তালিমের ডালে যদি নির্বাসন দেয় লাল ফুল,
রুশের সুন্দর, একে বলা যায় মার্কসীয় দর্শনে?

এই অগোছালো, ব্যর্থ পড়ে-পাওয়া চোদ্দআনা শোভা
কার কাজে লাগবে? বলো, মাছ ঐ ফুলের প্রত্যাশী?
বরং, দু'মুঠি ভাত তিজেলের ফাঁকে—সে-ই তো সুন্দর।
মাছ কিংবা ভিকিরির কাজে লাগবে, সুখ্যাতি বাড়াবে
দেশের, মানুষ বলবে : আমাদের উদ্বৃত্ত যা ছিলো
খয়রাত করেছি, দ্যাখো, পচিয়ে করিনি তাকে পানি।
এও জানি তোমরাও দেবে, তোমাদের সাধ্যমতো, বিধানসম্মত
ভালোবাসা, কেউ খুঁটে খাবে, কেউ খাবে অপর্যাপ্ত পাঁক,
সে-ই তো প্রকৃত যোগ সুন্দরের সঙ্গে স্বদেশেরই ॥

যাবো

॥ কবিতা সিংহ ॥

আকাশ ভেঙে পড়লেও দ্যাখো
আবার উঠে দাঁড়ায় আকাশ
দেহ ভেঙে পড়লেও উঠে দাঁড়ায় বিদেহ
পথের শেষ কিনারায় এসে ডাক দিয়ে বলতে হয়—যাবো—যাবো—

শূন্যে তৈরী হয় গমন
নীহারিকায় দুলে ওঠে নিশানা।

সময়, পাশাপাশি আলাদা আলাদা উড়লি পথ
সে এই কাল থেকে সরে অন্যকালের ভাঁজে চলে গেলে
আমি সীমানায় গিয়ে ডাকছি যাবো—যাবো
শূন্যে তৈরী হচ্ছে গমন
নীহারিকায় দুলে উঠছে জন্ম-জন্মান্তর—
জন্ম-জন্মান্তর।

রুমাল

॥ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥

এখনও সেই রুমালে
এক লক্ষ বসরাই গোলাপের গন্ধ
এক হাজার কোজাগরী জ্যোৎস্নার সোনালি শুভ্রতা
এখনও সেই রুমালের কোণের
চিত্রল অক্ষরে
একশ পিকাসো সেজানের বাঙ্ময় স্বাক্ষর

উনিশে আগস্ট বেলা দেড়টার সুরভি দুপুরে হাতে-আসা
সেই রুমালের জোরে
এখনও সমস্ত বিশ্ব আমার হস্তামলক
তারই দৌলতে অসংখ্য ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছি
বহুবার কান্নাকে হাসি বানিয়ে দর্শককে তাজ্জব করেছি
পেয়েছি হাততালির বাহবা।
চূর্ণ গোধূলির সন্ধ্যায়
গতকাল
অন্যমনস্কের রাস্তায়
অনন্য সেই রুমাল ছুঁয়ে মনে হলো
রুমালে চোখের জল মোছা যায়
ব্যথা মোছা যায় না।

উচ্চগ্রামে

॥ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥

আর তো সময় কিছু ফেলে রাখা যায় না দু-হাতে
শুধু যেন স্রোত হবে অবিচ্ছিন্ন ধারার ধরাতে,
যে দিনটা চলে গেল, গেল শুধু অজানা আকাশে
তার থেকে যতটুকু পারা যায় ভরে তোলে শ্বাসে।

প্রতিটি নিঃশ্বাসে আছে ওঠানামা তরঙ্গ রেখায়—
রাতের আকাশে চেয়ে ঠিকানাটা হারাবে কোথায়;
জীবনের প্রেম যদি জেগে থাকে মানুষের ভিড়ে
হয় তো সম্পদ শুধু তার ধনে জীবন গভীরে।

রাস্তায় অজস্র খাদ চলার স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজা বৃথা
জলে ভরা পথ দিয়ে সমুদ্রে পেছনে ফেলে মিতা—
ছন্দের হিন্দোল চেয়ে দেখে যেন জীবন সাহারা,
শিখর সমীরে দুলে হিমালয়ে প্রার্থিত চেহারা।

অনন্ত স্রোতের ফেনা উথলে উথলে প্রতিদিন
তবু তার থেকে আরো প্রাহ্যতের শিখর স্বাধীন।

ভৌতিক

॥ পরমানন্দ সরস্বতী ॥

ভূতের সঙ্গে খেলে ভূত হঠাৎ হয় পাখি,
কয়েকটি হয় প্রজাপতি আলোর রেণু মাখি।
সোনালতার গাঁটে গাঁটে ফোটায় মায়া ফুল,
দিনের চোখে ছড়ায় ধুলো, বাঁধে রাতের চুল।

এমন কত কি,
কিষ্কু-বসুর ঘর সাজায় হাজার মায়ার ঝি।
খেলার নাম ভোজবাজি, মজার শত নাম—
মজায় মজে ভজার ঝরে অঙ্গে কাল ঘাম।
বাসি আশার ছাতাকুড়ো সবাই মাখে মুখে,
মরার আগে হাজার মরার সুখটা চাখে সুখে।

খেলতে খেলতে হাতের ফাঁকে গড়িয়ে পড়ে মন,
সেই মন হয় যেমন খুশি কুকুর পাখির মতন।
ভূতের সঙ্গে খেলে-খেলে ফুরাই আমি তুমি,
ভূতের বাড়ি পার হলেই তুমার দিব্য ভূমি॥

আকাশ-সুন্দরী

॥ রামেন্দ্র দেশমুখ্য ॥

সুবাসিত রহস্যের শেষ প্রান্তে হাসে অনুরাধা,
একটি নক্ষত্র নয়, দলে দলে আকাশ-সুন্দরী,
সমস্ত পরতে আমি বিমূর্ত শোভায়,
পদতলে মর্তলোক, ফুলের সুবাসে,
সবিস্ময়ে ঢাকি পরবাসে।

স্বাতী কিংবা রেবতীর বহুদূর মায়াবী আলোয়
অভিলাষে বিমোহিত আমি,
কৃষ্ণপক্ষ যামিনীর শিশিরাদ্র ধানের চিবুকে
কে দোলায় হীরাবিন্দু আকাশের প্রেমের প্রতীকে,
কোটি বৎসরের কাঁপে স্মৃতি।

শোনো তবে শ্রবণা সুন্দরী,
জানি সব অলৌকিক শত শত আকাশ-কিন্নরী,
সবিস্ময়ে জাগি রাত বৃদ্ধ বয়সের শেষ প্রেমে,
মনোরথে মহাকাশ, চিত্তে করি জ্যোতিষ্ক-বিহার,
বিনত প্রেমিক তুমি বেদনার শুভ্র ছায়াপথে।

এবং আপনি - - -

॥ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

সব ঘাট নেমে যায় জলে
সব গাছ এখানে-ওখানে
ঐ যে বহুদাকার বাড়ি
বাড়ির ঘুরোনো সিঁড়ি
এবং আপনি
মায়াময় ছায়াচ্ছন্নতায় ইতিহাস হয়ে রয়েছেন
এ-ও নাকি ভেসে যাবে জলে
উপকণ্ঠ এতই সুন্দর, না এলে জানিনি আগে
কখনো কোথাও
কণ্ঠের চেয়েও দামী আপনার উপকণ্ঠখানি
আপনি কি দু'দণ্ড আমার
থেমে থেমে থেকে থেকে একি উচ্চারণ
এই ঘাটে ডিঙি ভিড়েছিল
এই তীরে
এই এক সাজানো বাগানে
পৃথিবীর সমস্ত ঘুমায়।

সে পথ তখন তীর্থ

॥ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ॥

সব পথ তীর্থ নয়। সব পথও মেশে নাই তীর্থের প্রাঙ্গণে,
সব পথ ধূলি থেকে অপার্থিব সম্পদের সোনা হয়ে-ওঠা
দেবতার প্রতিরূপ রচনা করে না। তবু, করে একদিন
তখন সন্ধ্যার ছায়া খালপাড়, ধানক্ষেত নারকেল-বন
মধুর লজ্জার মতো নেমেছিল; সে-ছায়ায় কাচং পথিক
হাট থেকে যেতে যেতে অকস্মাৎ ডুবে যায় স্বপ্নের নদীতে;
দূরে আরতির গান ক্রমে ক্রমে থেমে যায় গ্রামের মন্দিরে।

প্রথম রাত্রির সেই ছায়াময় অন্ধকারে ওরা পথ হাঁটে
পরম বন্ধুর মতো। ওদের নৈঃশব্দ্য যেন মন্ত্র হয়ে ওঠে।
মনে হয় যাত্রী ওরা, অচেনা তীর্থের যাত্রী। ওরা বলেছিল,
এই পথ অবশেষে মিশে গেছে দিগন্তের তীর্থের প্রাঙ্গণে—
ভালোবাসা সে-দিগন্ত, আমরা সেখানে যাবো যতো রাত্রি হ'ক।

খালপাড় মুছে গেছে পেছনের দৃশ্যপটে। গ্রাম, স্কুল, হাট
সব কিছু একে একে পার হয়ে গেল ওরা। সঠিক ঠিকানা,
নির্ভর আশ্রয় কোনো, কাছে-পিঠে পান্থশালা, ওরা তো জানে না।
ওরা বুঝি চিরকাল এইভাবে পাশাপাশি পথ হেঁটে যাবে
সন্ধ্যার ছায়ার মতো শব্দহীন, আলোহীন চলে যাবে দূরে
যেখানে মৃত্যুর সভা, যেখানে জীবন স্তব্ধ, যেখানে শূন্যতা,
যেখানে আত্মার নদী বিচ্ছেদের বেদনায় নিঃসীম গভীর।

সব পথ তীর্থ নয়। তবু কোনো নম্র পথ কখনো সন্ধ্যায়
কিংবা শুধু চলে গেলে পরিশুদ্ধ তীর্থ হয়, কেউ তা জানে না।।

॥ আমি এই পৃথিবীতে ॥

॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

আমি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অন্ধকার ঘর ;
আমার এমন ; এই অতীন্দ্রিয় রাত্রির ঈশ্বর
আমাকে যখন এসে ছুঁয়ে যায়—ভোরে
নিজেকে কেমন যেন বিবর্ণ বিষণ্ণ মনে হয়।
অনেক ভোরের আলো, অনেক রৌদ্রের স্নেহ আর
জ্যোৎস্নার স্বরলিপি বিস্মৃতির বিকীর্ণ চত্বরে
নিজেকে পড়তে থাকে, আলোর আলাপে কোনো যৌবন বিস্ময়
কখনো হয় না জানি খোলে না দুয়ার।

নিরন্ধ্র আঁধার জমা—এ ঘরের মৃত আকাঙ্ক্ষার
চারিদিকে ঃ জয়-স্বপ্ন-ভালোবাসা-কর্মের প্রত্যয়
এই সব রয়েছে জানি—অজস্র ছবির মতন
নিস্তব্ধ দেয়ালে আঁকা ; একবর্ণ পড়তে পারি না।
দু চোখের নম্র আলো সে আঁধারে হয় না চারণ।

সাহস-সাধনা-প্রেম-আনন্দের নানা আয়োজন
থেকেও সূর্যের হাতে বাজে না সে সমিহিত বীণা।
অস্পষ্ট বিপন্ন মৃত মিশরের মমির মতন
আয়োজিত অন্ধকার চারিদিকে, দেখি না, বুঝি না।
কেউ কাউকে। কোনো দিকে নেই কোনো আলোর প্রত্যয়।
বিদীর্ণ তৃষ্ণার ব্যথা বুকে করে তবু পারাপার
করি এ পথের ব্যবসা, স্তব্ধ হয়ে থাকি অন্ধকারে।
অথচ উর্বর জমি— ;; হয় তো আবাদ করলে সোনা
ফলানো যেতেও পারত—জানে তা সময়।
কেউ সাক্ষী থাকে না যে ভূগর্ভের নীল যন্ত্রণার ॥

সমস্ত দৃশ্যের পিছে জীবনের অলৌকিক আনন্দময়ী অস্পর্শপারে
জাগাতে পারি না আমরা, তবুও ব্যর্থ আলোচনা
অন্তর্লীন থেকে যায়। অত্যন্ত আঁধারেও আলোর প্রত্যয়
নিবিষ্ট করেছে মন। অথচ তা অসম্ভাব্যতা।
প্রাসাদ-চূড়ায় কাঁপছে—আজীবন ছায়ানগ্ন রাতের স্তব্ধতা ॥

বেঁচে আছে

॥ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

মনে হচ্ছে যেন পুরো বেঁচে নেই
দম দেওয়া পুতুল, হাসছে, খাচ্ছে, বিয়োচ্ছে, মরছে।
দাঁত-ডাক্তারের ঘাঁটতে যেমন
দুধফেননিভ, অথচ কীটাঙ্কুর যন্ত্রণার
কিম্বা মাঠে ধানক্ষেতে উবু হয়ে
কোমর-বাঁকানো কায়দায় ক্ষিপ্রতাল
দেশের দশের কাজে ব্যথাতুর ম্রিয়মাণ,
অথবা দশটা-পাঁচটা চেয়ারে আসীন
মুখ-ভরা পান, মিশি-দাঁত পিকের পিচকারি,
দিনান্তের ইস্তাহারে শ্লোগানে উদ্গার,—
সবই এক অনির্দিষ্ট ত্রাসময়-কাতর।
বেঁচে নেই, বৃথা তবু বাঁচার তাগিদ,
মন্ত্রী কিম্বা সদস্য সভার
কৃষ্ণলাস রং বদল ঝোপে সংগোপন,
দল কিম্বা দেশ সবই বেশ পরিবর্তনের
সাজঘর, কখনো তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন,
কখনো গদার ঘায়ে ভূমিসাৎ, বেকায়দায়
রাণীর পায়ের নিচে আত্মসমর্পণ। পুনর্বার
বাগে পেয়ে রাণীর ধর্ষণ।
কেউ বেঁচে নেই, পুরো বেঁচে নেই কেউ,
বাঁচবার অভিনয় শেষে টাকার টংকার
আত্মস্ফীতি, অহংকার শুধু।

পণ্ডিত মশাই

॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥

এমন অনেক দুঃখ আছে
এক মুহূর্তও যা ভুলে থাকা যায় না।
তবে হৃদয়কে কিছুটা শান্ত রাখা চলে
পরসেবা ব্রতে সতত যুক্ত থেকে ;
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
হাসি মুখে শিশুদের মাঝে,
তাঁদের শিক্ষার ভার নিয়ে।
পাঠশালা তো শিশুনিকেতন,
ছোটদের মনের বাগিচা ;
কচি কচি মুখগুলি যেন ফুলের কুঁড়ি—
সেখানেই আছে শান্তি,
আছে সেথা অন্তহীন সুখ।

ছোট ছোট সেই কুঁড়িগুলি
ফুটিয়ে তোলার কাজে কত না আনন্দ।
তবুও সেখানেই মন ছুটে ছুটে যায়
হৃদয়ের আঘাত যেখানে
অনিশ্চিত প্রবোধ আশায় ;
বারংবার যেমন গিয়েছে
পণ্ডিত মশাই সেই দুঃখী বৃন্দাবন।
মিথ্যার বেসাতি যারা করে,
ছারখার করে তারা কত যে সংসারে
নেই তার লেখা জোখা মোটে ;
দুঃখ হয় পুড়ে পুড়ে অনেক অন্তর—
তবুও কোথাও রয় একান্ত নির্ভর।

তেমনি সে শিশুবালা,
মুখ কুঞ্জ বোষ্টমের বোন
পঞ্চবর্ষীয়া সেই নিষ্পাপ কুসুম ;
কেন সেই পল্লীছাড়া হওয়া ?
কী করে যে দিনগুলি কাটানো সম্ভব,
কী ভাবেই বা রাতে হয় ঘুম ?
তারই মধ্যে একদিন অকস্মাৎ
আসে অন্য নববধূ ঘরে ;
সে ধরণী বৃন্দাবন-ক্রোড়ে
সন্তর্পণে তুলে দিয়ে শিশু চরণেরে
সহসা বিদায় নেয়, অন্তিম বিদায়।

বেদনার বিষে জর্জরিত
বৃন্দাবন ভাবে মনে মনে,
পাঠশালে শিক্ষা বিতরণে।
ঠিকই কথা সহপাঠী বন্ধু কেশবের—
বৃন্দাবন উদ্ভ্রান্ত যুবক।
শিক্ষার প্রসার ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই
এ দেশের—এতো প্রশ্নাতীত।
কিন্তু যতক্ষণ শিক্ষিত ধনীরা
আপন আত্মীয় ভেবে কাছে টেনে
না নেবে সবারে যত 'ছোট লোকে'
ততক্ষণ সাধারণ মানুষের মনে
কখনো না দেখা দেবে সম্যক বিশ্বাস
ওপরতলার লোকের বিলানো শিক্ষায়।
সে কথাই বৃন্দাবন বুঝিয়ে দিয়েছে
অধ্যাপক বন্ধু কেশবেরে।
এবং রয়েছে ডুবে মানুষ গড়ার
শিক্ষাদানে নিজের ধারায়।

রামনগরায় সুযোগ হলেই
মাঝে মাঝে তবু যেতে হয়
অন্তরের যন্ত্রণা জুড়োতে।
একদিকে সমাজ-শাসন,
অন্যদিকে কর্তব্যের ডাক—
দোটানায় বিক্ষত-হৃদয়
বৃন্দাবন উদ্ভ্রান্ত যুবক।
এরই মধ্যে চোখে পড়ে হঠাৎ একদা
নদী থেকে স্নান সেরে
তারই পল্লী উন্মুখ যৌবনা
গৃহমুখী রূপসী কুসুম।
অন্তরে অনন্ত প্রশ্নের
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিজেকে হারিয়ে
বৃন্দাবন অবশেষে ব্যস্ত হয়ে পড়ে
তারই বুকের ধন চরণেরে
তুলে দিতে কুসুমের কোলে।

কুঞ্জ বোষ্টমে বলে
সে সুযোগও পেয়েছিল পণ্ডিত মশাই,
মাকে খুঁজে পেয়েছিল মা-হারা চরণ ;
মিটেছিল কুসুমেরও মাতৃত্বের সাধ
একদিন কোলে নিয়ে সেই শিশুটিরে।
তবু কিন্তু পতিগৃহে যায় নি কুসুম,
অভিমানে দিয়েছে ফিরিয়ে
স্বেচ্ছায় আগত স্বামী আর শাশুড়ীকে।
শেষে এক অঘটন ঘটে অকস্মাৎ ঃ
কলেরায় শাশুড়ীর মৃত্যুর সংবাদে
চঞ্চলা কুসুম—কে দেখবে চরণে এখন ?
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় বৃন্দাবন-গৃহে
দুশ্চিন্তা-কাতর মুখ আলুথালু বেশে
রসে গিয়ে কোলে নিয়ে স্নেহের দুলাল
কলেরায় মুমূর্ষু সন্তানে।
কিন্তু ব্যর্থ সব চেষ্টা—ফাঁকি দিয়ে
চিরতরে চরণ পালায় বক্ষ খালি করে।

এর পর এ সংসারে কেন আর থাকা,
কার জন্যে ? পণ্ডিত মশাই ভাবে—
তার চেয়ে যা কিছু সম্পদ আছে
গ্রামের সেবায় তার সব দিয়ে থুয়ে
গৃহত্যাগ সন্ন্যাসের ভিক্ষাঝুলি নিয়ে—
সে অনেক ভালো। সে সিদ্ধান্ত জেনে
কুসুম দাঁড়ায় এসে পথরোধ করে।
পুত্রকে সে হারিয়েছে বটে,
স্বামীকে সে হারাতে নারাজ।
যেখানেই যাবে বৃন্দাবন
সাথী হবে সেখানেই তার সাথে
সহ-ধর্মিণী কুসুম নিজ অধিকারে।
অগত্যা ঘটেছে তাই,
ধর্মপত্নী কুসুমেরে সঙ্গে নিয়ে
নিরুদ্দেশ পণ্ডিত মশাই। *

* 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসের পণ্ডিত মশাই।
শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত।

বাবু কলকাতার লীলাবিলাসিনী

সুভাষ সমাজদার

নিশীথ রাত্রি।

জনহীন রাজপথ। চারিদিকের নিথর স্তব্ধতাকে সচকিত করে চলেছে একটা দশফুকারের(১) বহুহ্যাম গাড়ি। আরোহী বাবুটির মাথায় তরঙ্গায়িত বাউরী(২) চুল। মিশির রঙে দাঁতগুলো স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। পরনে ফিন্‌ফিনে কালো পেড়ে ধুতি, শান্তিপুরী ডুরে উড়নী। গায়ে হরিদ্রাভ রঙের মসলিনের বেনিয়ান। হাতে বেলীফুলের মালা।

সৌখিন সেই অশ্বশকটটি বেশ্যা-অধ্যুষিত পল্লী মেছোবাজারের হাঁড়ি-হাটার কাছাকাছি আসতেই বিলাসী বাবুটির কানে এল কোন দেবমন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার দূরাগত শব্দ আর ফেরী-ওয়ালাদের হাঁক—মালা-ই-ব-র-ফ-অ-অ-চাই—বে-ল-ফু-ল—। গলির কাছে যেতে বাবুর নজরে পড়ল, তুখোর ইয়ারের দল ফুর ফুর করে ইংরাজী বকুনির মাঝে মাঝে হাসির গর্‌রা তুলে উদ্দামযৌবনা বিলাসবতীদের দরজায় দরজায় ঢুঁ দিচ্ছে। যেদিকে তাকাও—দেখা যাবে, রাত্রির অপ্সরীরা তাদের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে নাগরদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আবার কেউ বা দোতলার জানালার

(১) দশঘোড়ার গাড়ি। (২) বাবরি।

গরাদে উত্তুঙ্গ বুকটাকে চেপে ধরে একটি রঙীন মরীচিকার মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের অত্যুজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় তার পাতলা রেশমি শাড়ীর আড়ালে আঁকা দুটি সুপুষ্ট জঘার ছায়াময় লোভানি। তার সুকঠিন এবং উদ্ধত দুটো স্তন-ভাণ্ড একজোড়া দুরন্ত গরুর মতই সবুজ কাঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মতই গতিহারা। কোন রসিক নাগর সেই সু-যৌবনা বারবনিতাকে খুশি করার জন্যেই স্তব করছে—হে বিলাসবতী, তুমি এই মহানগরী কলকাতার ভূষণ-স্বরূপা। স্থলকমলিনীর শোভাকেও তুমি পরাজিত করেছো। তোমরা ওই বিশাল কুচযুগল ভোগীদের ভোগসাধনাস্থল। তোমার বাহুদুটো মৃণালের মত সুন্দর। সখি, রম্ভাকাণ্ডের মত শীতল আর মনোহর তোমার ওই উরু দুটোর সুখস্পর্শে আমার মদনজ্বর নিবারণ করো—

বাহবা—তোফা—তোফা—বেশ বলেছিস মাইরী!—তার ইয়াররা হো হো করে তাকে সমর্থন জানায়। আবার আর এক জায়গায় রূপসী এক বারবনিতার দিকে তাকিয়ে এক নাগর হাত নেড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বেসুরো গলায় গান ধরেছে—

দাও ফেলে দূরে হে লীলাবিলাসিনী।
যৌবন আর রূপের মদ॥
শেখ সযতনে সেই কৌশল।
কামীগণ যাহাতে হয় বধ॥

বহুহ্যাম গাড়ির সেই আরোহী অভিজাত বাবুটির মনে হলো, রূপ আর যৌবনের এই হাটে কতগুলো কামনা-উন্মত্ত উচ্ছৃংখল জনতার ভেতরে এসে পড়েছে সে। যার জন্যে সে মাসের পর মাস বিনিদ্র রজনী যাপন করছে; যে তার বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে নিশিদিন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে; তার প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তার ভেতরে যে ভারী—খুব ভারী, আর অনড় একটা পাথরের মত চেপে রয়েছে, মেছোবাজারের হাঁড়ি-হাটার বেশ্যানিকেতনগুলোর এই কুৎসিত পরিবেশে তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না—যেতে পারে না—তবুও—

তবুও প্রতিটি বারবধূর ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল তাকে। কোথাও পেল না তাকে। কিন্তু—কোথায়—কোথায় যেতে পারে সে? অসহ্য—অসহ্য একটা অস্থিরতায় তার হাত দুটো নিস্পিস করে উঠল।

খট্-খট্-খট্—চিৎপুরের খোয়া-বিছানো রাস্তা ধরে বজ্রহ্যাম আবার চলল বারবিলাসিনীদের পল্লী বটতলা পেরিয়ে নতুনবাজারের পাশ দিয়ে অভিজাত রূপোপজীবিনীদের মহল্লা সোনাগাছির দিকে। তার গাড়ির দুই ধার দিয়ে বিলাসী বাবুরা চলেছে নৈশ অভিসারে। কেউ যাচ্ছে রেশমী সুতোর ঝালর দেওয়া সুদৃশ্য পালকিতে করে। তার বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত খোপের ভেতরে মসলিনের ওয়াড় দেওয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বাবুটি আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন। পালকির দুই পাশে দুই হুঁকোবরদার ছুটছে আর থেকে থেকে হুঁকো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ওড়িয়া পালকি-বেয়ারাদের সমবেত ঐকতানে রাত্রির স্তব্ধতা সচকিত হয়ে উঠছে। আবার কোন বাবু চলেছে চৌঘুড়ির কেরাঞ্চিতে করে। তার ঘোড়াগুলোর খুরের খট্-খট্ আওয়াজ আর বগির পইস্-পইস্ শব্দ মিলিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ-তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে বাতাসে। বাবুদের ভেতরে যারা একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে বারবনিতাদের কাছে যেতে চায় তারা তাদের গাড়ির সহিস এবং কোচম্যানদের তকমা আঁটতে নিষেধ করেছে—কেউ বা চাদরে মুখ ঢেকে নিয়েছে। কিন্তু যারা লোকাপবাদকে তৃণজ্ঞান করে এবং বেশ্যাবাজীকে বাহাদুরী মনে করে তারা ফ্রেন্ড বা মোসাহেবদের নিয়ে ল্যান্ডো কি ব্রাউনবেরী হাঁকিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চলেছে জনপদবধূদের পল্লীতে। কিন্তু সব নদী যেমন সমুদ্রে যায় তেমনি যে বাবু যেভাবেই যাক, যে গাড়ীতেই যাক, তাদের লক্ষ্যস্থল কিন্তু একটা—

সোনাগাছি—রূপসী বাররাজাদের নিবাসস্থল।

বজ্রহ্যাম থেকে নামল আরোহী বাবুটি। কোচম্যানকে বলল, কোথাও যেও না কিন্তু—আমি এখুনি ফিরে আসবো—

সোনাগাছির সেই আলোকোজ্জ্বল সংকীর্ণ গলিতে পা দিতেই তার মনে হলো—কৃষ্ণপক্ষের রজনীর নক্ষত্রখচিত আকাশটাই যেন নেমে এসেছে মাটিতে। প্রতিটি ঘর আলো করে বহুরকমের অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবুদের বিলাসের সহচরীরা। তাদের রমণীয় বরতনুতে কতরকমের যে আভরণ—কারো কানে মুড়কি মাদুলি, কেউ পরেছে ধানি মাদুলি, আবার কেউ স্বর্ণপঞ্চনরি আর মুক্তোর লচ্ছা পরে নিজেদের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আর শাড়িরই বা বাহার কত—ভোমরা-পেড়ে, কোকিল-পেড়ে, ঠোঁটে হাসি-পেড়ে, রুমাল-পেড়ে, অহ্লাদে-প্রহ্লাদে রাজা-পেড়ে। সেইসব বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ এমন দোফের করে তাদের উদ্ধত দেহছন্দ পেঁচিয়ে পরেছে যে, সুপুষ্ট দুটো স্তনকলস বুকের ওপরে দুটো বিভ্রমের মত থমকে রয়েছে; স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে গুরুনিতম্বের রেখাগুলো। কিন্তু না—এখানেও সে নেই—বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোথায়—কোথায় যেতে পারে সে। তবে কি শোভাবাজারের মল্লিকদের বরানগরের বাগানবাড়িতে, না কুমারটুলির মিত্রদের গঙ্গার ধারে সেই সুখচরের প্রমোদগৃহে? যেখানেই যাক—তার আর বৈশিক্ষণ বাইরে থাকা চলবে না।

রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এখুনি—এখুনি পুবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে উঠবে।

দশফুকারের বজ্রহ্যাম এবার চলল হাটখোলার দিকে। প্রতিদিন দুই বেলা আতর আর গোলাপজল দিয়ে ধোয়া-মোছা তার চকমিলানো বিশাল সুদৃশ্য অট্টালিকা যত নিকটবর্তী হতে শুরু করল ততই যেন তাকে অজগরের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল রাশি রাশি আবিল চিন্তা: তার ঘুমন্ত স্ত্রী সৌদামিনীর বালিশের নীচে কয়েকটা তুলসীপাতা রেখে আর নবাগত তরুণ এবং সুশ্রী ভৃত্য নবকুমারকে তারই শয়নকক্ষে প্রহরার ভার দিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বেরিয়ে এসেছে। সে গিয়ে দরজায় মৃদু টোকা দেবে আর চাকরটি বেরিয়ে তার জায়গায় চলে যাবে আর সে সহধর্মিণীর পাশে নিতান্ত সুবোধ ও ধর্মপরায়ণ স্বামীর মত শয্যাগ্রহণ করবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি শ্রীমতীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহলেই—

সর্বনাশ। হাটখোলার দত্ত বংশের বাবুদের কখনো যা হয় নি তাই হবে। জানাজানি হয়ে যাবে যে—সে গণিকা-সান্নিধ্য করতে শহরের বেশ্যাপল্লীতে গিয়েছিল। দেশ-দেশান্তরের কত রূপসী নর্তকী, কত সুকণ্ঠী বাঈজী, কত উদ্ভিন্নযৌবনা রূপোপজীবনী তাদেরই বৈঠকখানায় এসেছে। তাদের কাউকেই কখনো কোন বারবনিতার কাছে যেতে হয় নি। কিন্তু নেহাতই তার দুর্দৈব—তাই তার সুরম্য বসতগৃহের চৌহদ্দির বাইরে যেতে হয়েছিল—

দশফুকারের বজ্রহ্যাম গাড়ির আরোহীটিকে; রজনীর মধ্যযামে বারস্ত্রীদের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে কোন্ গণিকার অন্বেষণ করছে সে; কোন্ সেই ভাগ্যবতী বাররামা যার বিরহ তাকে চঞ্চল করে তুলেছে; যার কবোষ্ণসান্নিধ্যের উদগ্র প্রত্যাশায় সে অধীর হয়ে উঠেছে—এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে যেতে হবে—চলে যেতে হবে সেই একশো কি দেড়শো বছর আগের ধনকুবের বিলাসী বাবুদের গরবে গরবিনী শহর কলকাতায়। এই ঘটনাটি সেই সময়ের যখন কলকাতা হয়ে উঠেছিল 'বেশ্যাঅধ্যুষিত শহর', যখন এই শহরের প্রতি পাঁচটি বাড়ির পরের ছয় নম্বর বাড়িটিই ছিল, রাঁড়ের বাড়ি। যখন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মত সমাজহিতৈষীরা তীব্রভাবে বিচলিত হয়ে তখনকার দিনের বহুলপ্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকা "সংবাদ প্রভাকরে" পত্রাঘাত করেছিলেন এই বলে..... "নগরীর যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান করিয়া গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত করে যে, ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন..... তাই সম্পাদক মহাশয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ—নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দিষ্টকরণের জন্য লেজিসলেটিব কৌন্সিলে দয়া করিয়া আবেদন করিবেন।"

শুধু তাই নয়। বাবু কলকাতার বেশ্যাপ্রীতিকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গও করেছেন তিনি অর্থাৎ হুতোমপ্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ—

আজব শহর কল্‌কেতা।
রাঁড় বাড়ি জুড়ি গাড়ি
মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারি ঐকতা।
খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি
ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।

কিন্তু বজ্রহ্যামের আরোহী বাবুটি কে? তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং 'তিনুবাবু'। পুরোনাম—রামতনু দত্ত। কলকাতার হাটখোলা অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ী, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক মদনমোহন দত্তের চতুর্থ পুত্র। সেই যুগের কলকাতায় আরও সাতজন বাবু ছিলেন—নীলমণি হালদার, বাগবাজারের গোকুল মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ ছাতু সিংহ, ঠাকুর পরিবারের ঊর্ধ্বতন পুরুষ দর্পনারায়ণ, নকুধরের দৌহিত্র রাজা সুখময়, নিমতলার গঙ্গাধর মিত্তির। এই সাত বাবুর শিরোমণি ছিলেন তনুবাবু। অগাধ ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা দামের একটা

মুহূর্ত মাত্র একবার ব্যবহার করেই পরিত্যাগ করতেন—শোনা যায় তাঁর বাড়িতে পিতল কি কাঁসার বাসন ব্যবহারের কোন রেওয়াজ ছিল না। প্রতিদিন একশো সোনা ও রুপোর থালা আহারান্তে মাজা ধোয়া হতো। ঘোড়ার গায়ের উৎকট দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না বলে প্রতি সন্ধ্যায় ঘোড়াগুলোর গায়ে আতর স্প্রে করা হতো। তাঁর বিলাসিতা আর বাবুআনির বহর দেখে লোকে বলতো—বাবু তো বাবু—তনুবাবু—

তনুবাবুর যেমন ছিল অঢেল বিত্ত তেমনি ছিল তাঁর বিস্ময়কর সৌখীনতা। আর সব বাবুদের মত তনুবাবুও দিনে ঘুমিয়ে বা ঘুড়ি উড়িয়ে এবং বুলবুলির লড়াই দেখে আর রাত্রে নৃত্যগীতে পটিয়সী বারাঙ্গনাদের ঘরে আমোদ-প্রমোদ করে কাল কাটালেও গণিকাচর্চাতে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য।

নিমতলা ঘাটের দিকে যেতে জোড়াবাগান থানার বিপরীত দিকে এখন যেখানে জোড়াবাগান পার্ক, দেড়শো বছর আগে সেইখানেই ছিল তনুবাবুর বিলাসের সহচরীদের সুরম্য বাসগৃহ। সারি সারি একতলা বাড়ি। মেঝেটা পাকা। কাঠের দেওয়ালে সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতের কারুকার্য শোভা পেত। ছাদটা খড়ের। লোকে বলতো—তনুবাবুর রাঁড়দের উঁচু বাংলো।

তনুবাবু যে নারীসান্নিধ্যের ব্যাপারে বৈচিত্র্যবিলাসী ছিলেন তার প্রমাণ—তাঁর রক্ষিতাদের ভেতরে বাঙালী, হিন্দুস্থানী থেকে শুরু করে আর্মেনিয়ান, ইরাণী, পর্তুগীজ, এমন কি দু'-একজন ডাচ এবং ফরাসী মহিলাও ছিল। থাক সেসব কথা—এখন বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক—

পরদিন।

সকালের রোদ সিল্কের ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়েছে জোড়াবাগানের মাঠে। তনুবাবুর পালকি এসে থামল দেশী-বিদেশী পণ্যবধূদের বাংলোর সামনে। অসময়ে বাবুকে আসতে দেখে তাদের ভেতরে চাঞ্চল্য জেগে উঠল। লক্ষ্ণৌয়ের ডাকসাইটে সুন্দরী বাঈজী রাখী বলল—কি রে বাবা—এই সাতসকালে আবার গানের ফরমায়েস করবে না কি?

গান-বাজনা শোনার মত মনমেজাজ আছে না কি বাবুর, চঞ্চল ছটফটে কিশোরী ইরাণী মেয়ে সারা তার ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, ওই যে বাঙ্গালী মেয়েটা পালিয়েছে তার ফাঁকা ঘরটায় বসে তার ধ্যান করবে দেখিস—

ঠিক বলেছিস, বারবনিতাদের ভেতরে চাপা হাসির রোল পড়ে গেল।

তনুবাবু উঁচু বাংলোর প্রাঙ্গণে পা দিতেই প্রধান খিদমৎগার, মশালচি, খানসামা, পাচক, দারোয়ান, আয়া এবং ভিস্তিওয়ালা ইত্যাদি সভয়ে ছুটে এসে কুর্ণিশ করল।

তোমরা কোন খবর পেয়েছো?

না হুজুর—

তোমাদের মুখে শুধু "না" আর "না"—এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে তনুবাবু বললেন, তোমাদের প্রত্যেককে আমি মাটির নীচে ঠাণ্ডা গারদে রেখে দেব—

উঁচু বাংলোর বাড়িগুলোর শেষপ্রান্তের সুরম্য কক্ষটিতে এল তনুবাবু। এখনও পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও ঘরের বাতাসে ভুর ভুর করছে বিলেতী আতরের গন্ধ। মেঝেতে ইস্পাহানের রেশমে পশমে বোনা সুদৃশ্য গালিচা। ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে সাদা ধবধবে চাদরের ওপরে ঝুলছে কারুকার্যমণ্ডিত ফার্সী গিলাফ (ওয়াড়) দেওয়া বালিশ। তার পাশে পাশে রয়েছে গালতাকিয়া। * মাথার ওপরে ঝুলছে কারুকার্যমণ্ডিত ফার্সী-পাখা। আছে—আছে, সব আছে—শুধু—

সে নেই।

হু হু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। আর এই ঘরে—এই সুসজ্জিত শয্যায় তার বহু প্রমত্ত রাত্রির ছন্দোসুরভিত মুহূর্তগুলোর স্মৃতি মৃদু একটা সৌরভের মত জড়িয়ে ধরল তাকে। আর বহু—বহু দূর থেকে যেন বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল তার মিষ্টি কণ্ঠস্বর—

তনুবাবু—আপনি কখনো আকাশ দেখেছেন?

আকাশ! মদের রসে ভিজে ভিজে গলায় সে বলেছিল—এখন আমার আমোদ-স্ফূর্তির সময়—ওসব হেঁয়ালী কথাবার্তা বলে আমার মেজাজটাকে খিঁচড়ে দিও না সুন্দরী—বলেই তন্বী স্বর্ণলতার মত নরম দেহটাকে বুকের ভেতরে সজোরে জাপটে ধরেছিল। আস্তে আস্তে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল। স্পষ্ট দেখেছিল, তার চোখে ঘৃণার ধিক্কার জ্বলছিল। খুব ক্ষীণ গলায় বলেছিল, তনুবাবু মনে রাখবেন—মেয়েমানুষের দেহটা—মানুষের দেহ—

—কেন এসব বলছো—তোমাকে সম্রাজ্ঞীর মত এখানে রেখেছি—তিন সেট জড়োয়া গয়না দিয়েছি—

কোন কথা বলল না সে। জানালায় দাঁড়িয়ে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়েছিল রাতের আকাশের দিকে। রাশি রাশি তারায় ভরা আকাশের ভেতরে সে কি ছাই দেখছিল কে জানে। আবার অস্ফুটস্বরে বলেছিল। বলেছিল, অদ্ভুত একটা কথা—তনুবাবু—আপনি কখনো সূর্যোদয় কি সূর্যাস্ত দেখেছেন—কখনো কোন সমুদ্রের ধারে কি পাহাড়ে গিয়েছেন—

সে আর সহ্য করতে পারেনি। প্রায় আস্বচ্ছ ময়ূরকণ্ঠী রঙের রেশমী-শাড়ির আড়ালে তার সুস্পষ্ট কদলিতার মত জঙ্ঘাযুগল, গুরুনিতম্বের ছায়াভাস তাকে অস্থির উন্মন করে তুলেছিল। তার রক্তের ভেতরে গুরু গুরু ঝড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ টলটলে জলে ভরা দীঘির কিনারে এসেও পিপাসার জলটুকু খেতে পারবে না। উন্মত্ত একটা বন্যার ঢেউয়ের মত সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তার ওপরে। আর মুহূর্তে একটা নদী হয়ে মিশে গিয়েছিল তার বুকের ভেতরে। বাইরে নিশীথ রাত্রিটাও বিপুল একটা অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সেই শেষ।

পরদিন দেখা গেল—তার ঘরের দরজার পাল্লাদুটো হাট করে খোলা। সে নেই।

এই ক্লিওপেট্রা কোচের ওপরেই পেয়েছিল তার একটা চিঠি। তার ভেতরে কি সব হিজিবিজি লেখা। তার এক বর্ণও সে বুঝতে পারেনি। বুঝবে কি করে—সে তো—ঠনঠনের ঘোষেদের কি নিম তলার মিত্তির বাড়ির ছেলেদের মত লেখাপড়া জানে না—

তনুবাবুর অগাধ ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার অজস্র উপকরণের ভেতরে সাম্রাজ্ঞীর মত বাস করেও কেন সে চলে গিয়েছিল; কোন্ বিতৃষ্ণা তাকে নিশ্চিন্ত জীবনের বিপুল সুখের ভেতর থেকে অজানা অনিশ্চিতের পথে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—কোন্ সে রমণী যে পণ্যবধূ হয়েও ঐহিক সুখকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে পারে—এসব বলতে হলে তার আগে একটু নেপথ্য ইতিহাসই জানা দরকার—

এই ঘটনাটি সেই যুগের যখন কলকাতার বাবুদের ভেতরে একদল যেমন বাঈজী আর বারাঙ্গনা নিয়ে প্রমত্ত নিশিযাপন করছিল আর একদল তেমনি ফিরিঙ্গী ডিরোজিও সাহেবের ইয়ং

* পাশ ফিরে শোবার সময় গালের নীচে চেপে রাখার জন্যে ছোট্ট বালিশ।

বেঙ্গলদের নাম লিখিয়ে নতুন চিন্তা নতুন আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে বিদ্যা আর সংস্কৃতির চর্চা নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছিল। এই শেষোক্ত দলের ভেতরে অগ্রগণ্য ছিলেন মহেশপ্রসাদ ঘোষ। তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যদের বন্ধু এবং সহকর্মী।

মহেশ ঘোষ গুণী লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর রক্তের ভেতরে ছিল বিষ—ছিল দুর্বার নারীসঙ্গলিপ্সা। এই মহেশ-ই তনুবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম তার কাছে।

সেদিনটা ছিল মহানবমী। মহেশ ডিরোজিও সাহেবের প্রিয় শিষ্য—তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে তার রক্ষিতার কাছে

যখন নিয়ে এল তখন তনুবাবুর মনে হয়েছিল, নবমীর আলোকোজ্জ্বল কলকাতার চেখধাঁধানো রূপও বুঝি ম্লান হয়ে গেল।

শেষরাতের আকাশের মত তার গায়ের রঙ। আর দেহসৌষ্ঠব? নীবার শুকবৎ তন্বী—অর্থাৎ নীবার ধান্যের শিসের মত তন্বী। তার কাজলটানা জাগর চোখ দুটোতে বুদ্ধির দীপ্তি ঝিকমিক করছে। ওর নাম কি জানো—শ্যামা। নাচে-গানে ওর জুড়ি নেই, একটু থেমে আবার বললেন মহেশ ঘোষ—শ্যামা লেখাপড়া জানে—কবিতাও লিখতে পারে—বলতে বলতেই শ্যামার রচিত কবিতা সুর করে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—

আহা, ভোরের পাখির গান হয়ে

কেন পারি নি ডেকে দিতে?

মহেশবাবু কি বলছেন; কাকে বলছেন কিছুই যেন শুনতে পেল না তনুবাবু। শ্যামার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর মুগ্ধ দুটো চোখের দৃষ্টি অপলক হয়ে উঠল।

শ্যামার সঙ্গে তনুবাবুর প্রথম পরিচয়ের দুদিন পরেই মহেশ ঘোষের আশ্রয় থেকে একদিন রাত্রে একদল দুর্বৃত্ত তাকে নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। তারপরে?

তারপরে যা ঘটেছিল তা যেমন বিচিত্র তেমনি চমকপ্রদ বলেই সেই ঘটনা ইতিহাস হয়ে গিয়েছিল।

মহেশ ঘোষ শ্যামার কোন খোঁজ-খবর করেছিলেন কি না জানা যায় না। হয়তো লোকলজ্জা আর নিজের সম্মানের ভয়েই চুপ করে থেকেছিলেন। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে গুরু ডিরোজিওর মত মহেশ ঘোষেরও অকালমৃত্যু হলো।

কিন্তু কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল শ্যামা?

বলা বাহুল্য, শ্যামা তনুবাবুর বিলাসগৃহ সেই উঁচু বাংলোর বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। শুধু একমাস-দুমাস নয়—পুরো তিন তিনটি গ্রীষ্ম, বর্ষা তার সহচরী হয়ে থেকেছিল শ্যামা। এই দিনগুলো কেমন করে কেটেছিল—সেটা শ্যামার-ই জবানীতে শুনুন—

"তনুবাবু দিনমানে আমার সঙ্গে কখনো দেখা করতো না। কিন্তু জোড়াবাগান থানার পেটা ঘড়িতে যেই রাত দশটা বাজতো—তার ধাতব শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই তনুবাবুর প্ল্যাসকিড্ জুতোর আওয়াজ বেজে উঠতো উঁচু বাংলোর বারান্দায়। ঘরে পা দিয়ে একটা কথা বলতেন না। কোন কুশল সম্ভাষণ নয়, কোন মিষ্টি কথা নয়। অর্থাৎ পূর্বরাগ, শৃঙ্গার ইত্যাদি কথাগুলো তনুবাবুর অভিধানে ছিল না। ক্ষুধার্ত পশুর মত আসতো। আর শুধু পরম পরিতৃপ্তি করে পেটভরে খেয়ে চলে যেত। আমি নির্জন ঘরে বসে অসহ্য আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতাম। কখনো বা মর্মান্তিক আক্ষেপে নিজের মাথার চুল নিজে ছিঁড়তাম—আবার কখনো বা নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতাম। আর বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতাম—হে ঈশ্বর—এমন কি একজন পুরুষও নেই যে আমাকে মানুষ বলে মনে করবে—আমার শিক্ষা-সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেবে—বারভোগ্যা মনে করবে না—

"আমার ব্যাকুল প্রার্থনা হয়তো বিধাতা শুনতে পেয়েছিলেন। প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, জোড়বাগান মাঠে আমাদের বাড়ির সামনে তিন-চারজন ভদ্রলোক ঘুরঘুর করতো। মেয়েদের ঘরের আশপাশে পুরুষরা যে অভিসন্ধিতে ঘোরাফেরা করে নিশ্চয়ই সেই মতলবে এরাও ছোঁক ছোঁক করছে—এই ভেবে আমি আমল দেই নি। কিন্তু তা নয়—

"একদিন উঁচু বাংলোর প্রধান খিদমৎগার পাঁচুর মারফৎ এল তাদের প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব আমার কাছে

যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি আমার বিপুল সৌভাগ্যের সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এল। তাদের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে একদিন রাত্রের অন্ধকারে প্রচুরই সহায়তায় আমি তনুবাবুর সেই সোনার খাঁচা থেকে পালিয়ে গেলাম।"

দিন কাটে। মাসের পর মাস চলে যায়। তনুবাবু এবং তার বিশ্বস্ত অনুচরেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় শ্যামাকে। কোথাও পাওয়া যায় না তাকে। আক্রোশে জ্বলে ওঠে তনুবাবু। ভাবে, একটা বেশ্যা! না হয় পেটে একটু বিদ্যা আছে—আছে কিছু রূপ-গুণ—তাই বলে তার এত দেমাক! তার বিপুল ঐশ্বর্য আর বিলাসব্যসনের সুপ্রচুর আয়োজন পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে?

একদিন তার এক মোসাহেব ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বাবু—খবর পেয়েছি—শ্যামার খবর পেয়েছি—বলেই সে-দিনের কাগজটা তনুবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিতেই 'পড়ো না—পড়তে পারছো না'—গর্জন করে উঠল তনুবাবু। বশংবদ অনুচরটি পড়ে শোনালো এই খবর—* থিয়েটারে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগ।

মন্মথনাথ দেব (লাটুবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র), প্রিয়নাথ বসু (সাতুবাবুর ভাগিনেয়), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোক্তারা একটি নাটকের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের শরণাপন্ন হলে তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন কিন্তু একটি শর্তে—বিলেতের অনুকরণে অভিনেত্রী নিয়োগ করতে হবে—

সেই মত জগত্তারিণী, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী এবং শ্যামা নামে চারজন বারাঙ্গনাকে অভিনয়ের কাজে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে—

—ও মাগী তাহলে থিয়েটারে নেমেছে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তনুবাবু। পার্শ্বচরটিকে বলল, থিয়েটারের লোক-গুলো ওকে কোথায় রেখেছে—এই খোঁজ আমি আজকের ভেতরেই চাই—

* সুলভ সমাচার, ৫৯ই এপ্রিল, ১৮৭৩

খুব বেশি দেরী হলো না। যেদিন জানা গেল, বিডন-স্ট্রীটের একটা বাড়িতে রেখেছে শ্যামাকে, সেইদিনই মধ্যরাত্রে নিঃশব্দে একটা পালকি এসে দাঁড়ালো সেই বাড়ির পিছনে সংকীর্ণ গলিতে। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে একটা ছায়ামূর্তি পা টিপে টিপে ভেতরে গেল। তাকে অনুসরণ করল আরও চারজন। কয়েক মুহূর্ত পরই মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে পালকিতে তুলল শ্যামাকে। আর চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল পালকি।

সর্বসাক্ষী আকাশে সূর্য উঠল।

রোজ যেমন ওঠে। সকালের রোদে ঝিকমিক করতে লাগল গঙ্গার বিশাল জলরাশি। তনুবাবুর বরানগরের বাগান-বাড়ির একটি সুদৃশ্য কক্ষে আহত নাগিনীর মত মর্মান্তিক আক্রোশে ফুঁসছিল। তনুবাবু এল। সাফল্যের আনন্দে হাস্যপ্রদীপ্ত মুখ। বলল, দেখ—থিয়েটারের লোকজন এখুনি হয়তো আমার কাছে এসে পড়বে—তারা এলে বলবো—তুমি স্বেচ্ছায় এসেছো—

না—না, অসম্ভব—আমি সারাজীবন আপনার কেনা দাসী বাঁদী হয়ে থাকতে পারবো না—

যদি ভালো চাও আপত্তি করো না শ্যামা—তুমি তো জানো—আমার নাম তনুবাবু, আমি যে মেয়েকে একবার চেয়েছি—তার আর নিস্তার নেই—

আপনার পায়ে পড়ি তনুবাবু। জলভরা চোখদুটো তুলে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল শ্যামা, লাটুবাবুর ছেলের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে—আমাকে থিয়েটারের পার্ট দেবে।

হো হো করে হেসে উঠল তনু-বাবু। সেই ঘরের স্তব্ধতাকে সচকিত করে তার অট্টহাসির লহর বয়ে গেল লহরে লহরে। হাসির রেশ টেনে সে বলল, তুমি একটা বেশ্যা—থিয়েটারের নাম করে ভদ্র ছেলেগুলোর মাথা খাবে—

শ্যামা আর সহ্য করতে পারল না। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বলল, আপনি একটি পশু—নরাধম—আপনি জানেন না, বেশ্যা হলেও তারা মানুষ—ভদ্র, শিক্ষিত জীবন—

এই কে কোথায় আছিস, খ্যাপা জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল তনুবাবু। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন খানসামা-বেয়ারা-দরকন্দাজ ছুটে এল। তনুবাবু তাদের বলল, শোন—একটা কাঁচি দিয়ে মাগীর চুলগুলো কেটে দে, আর যে রূপের জন্য ওর এত জাঁক সেই মুখখানা পুড়িয়ে—

না-না তনুবাবু—আমার এত বড় সর্বনাশ করবেন না—

এই দাঁড়িয়ে হাঁ করে তোরা দেখছিস কি? বেয়ারাদের ধমকে উঠল তনুবাবু। ওকে কয়েদখানায় নিয়ে যেয়ে যা বললাম তাই কর—

শ্যামাকে যখন টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল তখন সেই হতভাগী অভিশাপ উচ্চারণ করে বলেছিল—আপনাদের মত ব্যভিচারী বিলাসীরা একদিন নির্মূল হয়ে যাবেন—শুধু থাকবে আপনাদের হাজারো পাপের আড়ত এই বাড়িগুলো—

তারপর শ্যামার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রস্তাবে তার নিরবয়ব অন্ধকার জীবনে যে রামধনুর রঙীন ঝিলিমিলি ফুটে উঠেছিল তা চিরকালের মত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু—

তার অভিশাপ যে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে গিয়েছিল হুতোমের বক্তব্যের ভেতরে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—"বেশ্যাবাজীটা ছিল এই শহরের বড়-মানুষদের এলবাত পোষাকের মত। অনেক বাবু বহুকাল হলো মরে গেছেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলো আজও মনু-মেন্টের মত তাদের স্মরণার্থে রয়ে গিয়েছে।"

সাগরপারের গোপালপুর বা গোপাল-পুর-অন-সী এককালে ইউরোপীয়ান-দের গরবিনী প্রেয়সী ছিল। কালক্রমে তা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অঙ্কভাগিনী হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন সে দিনও তার গিয়েছে। ভ্রমণবিলাসী বা ট্যুরিষ্ট মহলে সে বিগতযৌবনার মতোই উপেক্ষিতা। যদি বা দামী হোটেল একটা আছে—তবে সেও কেমন চলে তা জানি না। সন্দেহ হয় চলে না। বছর বারো-চোদ্দ আর যাই নি। শুনেছি শহরটা একে-বারেই মরে যায় দেখে সরকার তাঁদের কিছু কিছু আপিস ওখানে স্থানান্তর করেছেন। আগেকার মাঝারি হোটেল-বাড়ীগুলোও তাঁরা দখল করে নিয়ে বাড়ীওয়ালাদের উপবাস থেকে রক্ষা করে-ছেন। আমার একাধিকবারের আশ্রয়দাত্রী, এককালের প্রবলপ্রতাপ হোটেলওয়ালী মিসেস মুরও এক মেয়ে-হোস্টেলকে তাঁর বাড়ী ভাড়া দিয়ে নিঃশ্বেস ফেলে বেঁচে-ছেন।

আমরা শেষবার যাই বোধহয় ঐ বছর বারো-চোদ্দ আগে। সেবার ডাঃ দাসের বাড়ী 'দ্য বিকন'-এর নিচেরতলার একাংশে ভাড়া ছিলাম। (ডাঃ দাস অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ও বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুর।) সমস্ত গোপালপুরের মধ্যে ঐ বাড়ীটিই বোধহয় সবচেয়ে হিসেব করে তৈরী। যেদিন কোথাও হাওয়া থাকে না সেদিনও এ বাড়ীতে ঝড় বয়ে যায়। এখন শুনছি সে বাড়ীরও নিচেরতলা কী একটা সর-কারী প্রতিষ্ঠান ভাড়া নিয়েছে। কারণ স্পষ্ট—ট্যুরিষ্টের অভাব।

আমাদের পূর্ব-পরিচিত হোটেলটি "থলু হ্যাভেন" উঠে গেছে শুনেই আমার এক বন্ধু আপিসের যোগাযোগে এই বাড়ীটি ঠিক করেন। কিন্তু তা হোক, পূর্ব আশ্রয়দাত্রীকে ভুলি নি। গিয়ে

দেখা করে অভিযোগও জানিয়েছিলাম। তিনি বিচিত্র ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলেছেন, "হোয়াট ক্যান আই ডু মাই সন, ওনলি টু মনথস্ অফ সীজন—ম্যান্ড দ্য রেস্ট—ইটিং মাছ।"

ভারতের মধ্যে ট্যুরিস্টের রাজা হল গরিব বাঙালী। এঁরা এখানে বিশেষ আসতে চান না। কেন যে এঁদের পছন্দ হয় না, তাও জানি। এখানে কোন তীর্থ নেই। সেই কারণেই হরেক রকমের পণ্য-দ্রব্যের বাজার বসেনি। বাঙালীর চাই রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা নয়—কলা কেনা। সেদিক দিয়ে কাশী, পুরী বা হরিদ্বার আদর্শ। তীর্থ যেমনই হোক, দেবতা যেমনই থাকুন—সে পর্বটা দু-এক টাকা প্রণামীর ওপর দিয়ে ম্যানেজ করে, পাণ্ডাদের বকে, ধমকে, টিটকিরি দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে মা-লক্ষ্মীরা লেগে যান রাশি রাশি বাজার করতে। গোপালপুরে এসব কিছু নেই। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, নয়নাভিরাম ব্যাক-ওয়াটার আছে, সেই কারণেই মাছও প্রচুর। আর আছে নিবিড় শ্যাম নারিকেল বাদামের বন। পুরীর মতোই বেরকার কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। এখানে স্নান করা অনেক নিরাপদ ও আরামদায়ক।

যাক গে ওসব কথা। গোপালপুরের প্রচার করতে এ গল্প ফাঁদিনি। আসল যা বলছিলাম, তাই বলি।

সেবারের গোপালপুর প্রবাসটা বহু দিক দিয়েই আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও বছরটা ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, এইটুকু শুধু মনে আছে হরিপদবাবুর ছেলে—রাষ্ট্রীয় এয়ার ফোর্সের যে তরুণ অফিসারটি দেশরক্ষার কাজ করতে করতে শহীদ হয়েছে—সেই বছরই সবে স্কুলের পালা শেষ করবে বলে তৈরী হচ্ছে। সেও তখন ওখানে। সন্ধ্যায় নিচে আসত আমার কাছে ভূতের গল্প শুনবে বলে, আর শুনতে শুনতে ভয় পেয়ে কাছে ঘেঁষে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরত।

কিন্তু এ সবের সঙ্গেও আসল গল্পের সম্পর্ক নেই। ওখানে সেবার চন্দন রায় আর অভিনেতা-কাম-চিত্র পরিচালক মৈনাক সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই নাটকীয় ব্যাপার একটা। এমন নাটক জীবনে ঘটে বৈকি, ঘটলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়—চলচ্চিত্রে বা মঞ্চেই শোভা পায়। এদের দু'জনকেই আগে থাকতে চিনি, চন্দন তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো—তাও না, ভাইপো বলাই উচিত বয়সের যা ব্যবধান—তবে এত অন্তরঙ্গ বলেই ভাই বলে মনে হয়, বন্ধুও বলা চলে।

প্রথম দেখা চন্দনের সঙ্গেই।

আমাদের বাড়ীর প্রায় সামনাসামনি জর্জ সাহেবের ছোট্ট এক হোটেল ছিল। ঘরের মধ্য থেকে সমুদ্র দেখা যেত না। পাকা বাড়ী হলেও খড়ের চাল। তবু হোটেলটি সিজন-এ প্রায় সব সময়ই ভর্তি থাকত। অনুগ্রাহকদের মধ্যে বেশীর ভাগই শিক্ষক-শিক্ষিকা। তার মধ্যেও ব্রাহ্ম বা কৃশ্চানই অধিকাংশ, যাঁদের পুঁজি কম অথচ একটু পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে চান। জর্জ সাহেব আর তাঁর মেমই হোটেল চালাতেন, বাজার-সরকারী থেকে ম্যানেজারী, রান্না থেকে বাথরুম সাফ, সব। মেমই রান্না-বান্না করতেন, বাঙালীপ্রিয়। 'মাছ-ঝোল-ভাত'ও শিখে নিয়েছিলেন। একটি মাত্র ভৃত্য, সেও এই এতগুলি বোর্ডারের ফাই-ফরমাশ খেটে ওঁকে সাহায্য করার বিশেষ সময় পেত না।

যতবারই গোপালপুর গেছি, দেখেছি জর্জ সাহেব (জর্জ নাম কি পদবী তা জানি না, সবাই জর্জ সাহেবই বলে) একটা খাকী হাফ প্যান্টের ওপর একটা হাতকাটা গেঞ্জি বা কখনও পুরোপুরি খালি গায়েই এটা-ওটা খুটখাট কাজ করে বেড়াচ্ছেন। শুনেছি খুবই ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের ভদ্রলোক, আর দেখেছি। (সেটাই সম্ভবত ওঁদের হোটেলের জন-প্রিয়তার মুখ্য কারণ) বাজারে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আনাজ ও সবচেয়ে ভাল ফল কিনতে। মুদির দোকানেও তাই, বেশী দাম দিয়ে ভাল চাল, ভাল ডাল, ভাল মাখন মার্মালেড ছাড়া কিনতেন না। অথচ রেটও অন্যান্য মাঝারি হোটেলের তুলনায় কমই। আমাকে বলতেনও—'আমার তো পেনসন আছেই, তাতে কুলোয় না বলেই এটা করা। কোনমতে দু'জনের খাওয়া-থাকার খরচটা চলে গেলেই আমি খুশী। বেশী লাভে আমার দরকার নেই।'

তবু যে আমরা কখনও ওঁর হোটেলে যাইনি, তার কারণ ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। সঙ্কীর্ণ বাগানের এক প্রান্তে এসে দাঁড়ালে তবেই ফেনোর্মিচঞ্চলা সমুদ্র চোখে পড়ত—কখনও মেঘবর্ণা, কখনও রৌদ্রকরোজ্জ্বল, গাঢ় নীলবর্ণা, কখনও বা শুক্লপক্ষের সহস্রচন্দ্র প্রতিবিম্বিতা।

এই জর্জ সাহেবের হোটেলের সামনেই সেদিন চন্দনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আগের দিনই পৌঁছেছি। সেদিনটা গেছে গোছগাছ করে থিতিয়ে বসতে—এইখান দিয়েই যাতায়াত করতে হয়েছে বার বার, তবু যে-কোন কারণেই হোক, দেখা হয়নি। অবশ্য এখানে দেখা হওয়ার প্রধান জায়গাটা সমুদ্রতীর—সেদিন তো আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

পরের দিন একটু 'নর্ম্যাল' হয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম জর্জ সাহেবকেই 'গুড মর্ণিং' জানাতে। দেখি ওঁদের ফটকের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে চন্দন—না, সমুদ্র নয়, সামনের বাদাম গাছটার দিকে তাকিয়ে।

চন্দন বলতে গেলে আমাদের পাড়ার ছেলে। জায়গাটা এখন কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—নইলে স্বগ্রামবাসীও বলা চলত।

'আরে! চন্দন! তুমি এখানে। কবে এলে?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল চন্দন, দুই চোখে রাজ্যের ঔদাসীন্য ও ক্লান্তি নিয়ে। এখন মনে হল মনটা বহুদূর থেকে কুড়িয়ে গুটিয়ে চোখে টেনে এনে আমাকে দেখল ও চিনতে পারল। চোখে-মুখে সবিস্ময় প্রসন্নতাও ফুটল একটু।

'মাষ্টারমশাই! আপনি! ও, বাঁচলুম' বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

এই মাষ্টারমশাই সম্বোধনের একটু ইতিহাস আছে। পাড়া সম্পর্কে আমার স্ত্রীকেও মাসীমাই বলে। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্য একটা সম্পর্কও ছিল। ছোট বেলায় মাস আষ্টেক-নয় ওকে পড়িয়েছিলুম। তখন অতটা বলত না, কিন্তু এখন আমাকে 'মাষ্টারমশাই'ই বলে শুধু। যদিচ ওর আসল শিক্ষক বা গুরু হলেন—হলেন মানে এখন বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিছুদিন আগেও ছিলেন—ওর অঙ্কের মাষ্টারমশাই, বঙ্কুবাবু। বঙ্কুবাবুকে ও গুরু কেন—বোধহয় ইষ্টের মতোই ভক্তি করত আর ভালবাসত, তাঁর কথায় প্রাণ দিতে পারত।

যদিও শুনেছি বঙ্কুবাবু কখনও ওর সে শ্রদ্ধার ওপর কোন দাবী করেন নি, জোর করে নিজের মত চাপাতে চান নি। কখনও কোন কাজে বাধাও দেন নি।

আমি ঠিক আলিঙ্গন না করলেও ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'তুমি কি একা এসেছ? না আর কেউ আছেন? মা-বাবা এসেছেন নাকি? উঠেছ কোথায়?'

'এখানেই উঠেছি, এই জর্জ সাহেবের হোটেলে। এঁর কথা আমাকে এক অফিস বস্ বলে দিয়েছেন। না, মা-বাবাকে আনি

ছি। আগে পেতুম ওঁদেরও—কিন্তু ওঁরাই আসতে চাইলেন না। মা আমার ভাই-বোনদের ছেড়ে আসতে চান না, যাবার অনিচ্ছা অন্য কারণে। সে তো আপনি জানেনও—আমার কাছে কোন-মতেই ওবলাইজড থাকতে চান না।'

তারপর একটু ম্লান হেসে বলল, 'ওঁদের আনলে কি আর এখনে ওঠা যেত ? মা কী রকম গোঁড়া জানেনই তো। ওঁদের আনলে পুরী যেতে হত।'

তারপরই আমার কথাটা মনে পড়ল বোধহয়, 'আপনি উঠেছেন কোথায় ? ও, ডাঃ দাসের বাড়ী ? শুনেছি দ্য বেস্ট হাউস। মাসীমারা এসেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, সবাই। ছেলে-মেয়েদের নিয়েই এসেছি। চলো না, ওখানেই চা-টা খাবে—'

'আপনি যে কী কাজে যাচ্ছিলেন ?'

'না না, কাজে নয়। জাস্ট জর্জ সাহেবকে গুড মর্ণিং জানাতে। সে পরে হলেও চলবে।'

'না মাষ্টারমশাই, আজ এখন থাক। এখানে, কিছু বলা নেই, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে। এঁরা খুব দুঃখিত হন বোর্ডাররা কেউ না খেলে।.....তাছাড়া আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। সে একটু নিরিবিলি না বসলে চলবে না। বরং আপনি যদি একটু বেড়াতে বেড়াতে এক সময় আসতেন তো বড় ভাল হত। এলে কিন্তু সময় হাতে রেখে আসবেন।'

'ঠিক আছে। একটু পরেই আসব। বাজার আমার হাতে নেই, খোকাই করবে। আমি শুধু ওদিকটা ঘুরে এসে বাড়ীতে চা-খাবার খেয়ে তোমার কাছে এসে বসছি।'

তখন আর অনর্থক জর্জ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলুম না। একটু পরে তো আসতেই হবে। মিসেস মুরের সন্ধানে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাজারে আসার ওঁরও আর দরকার নেই। শুনেছি এই জর্জ সাহেবের কাছ থেকেই লাঞ্চ, ডিনার যায় ওঁর। তবু এ সময়টায় রোজ একবার করে আসা চাই-ই। এটা নাকি ওঁর প্যাসনে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক ঘুরে খুব সস্তা পেলে কেনেন, একছড়া কলা কিম্বা কয়েকটা বেগুনফুলি আম।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ফলের বাজারেই দেখা হয়ে গেল মিসেস মুরের সঙ্গে। তেমনি একটা মোটা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। আমাকে দেখে—বিশেষ তাঁকেই খুঁজতে এসেছি শুনে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর। আমি যে তাঁকে মনে রেখেছি এতদিন পরেও—সেজন্য এই আনন্দে। অনেক কুশল প্রশ্ন করলেন, বন্ধুদের খোঁজ নিলেন। আমার স্ত্রী এসেছেন শুনে, একদিন অচির ভবিষ্যতে আমাদের ওখানে দেখা করতে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের যেতে বললেন না, সম্ভবত বসিয়ে চা খাওয়াবার জায়গাটুকুও রাখেন নি। একটি নুলিয়া ভৃত্য আছে, সে সারা-দিন থাকে, রাত্রে বাড়ী চলে যায়—খাবার তো জর্জ সাহেব পাঠান। কদাচিৎ ছেলে-বৌ এলে জর্জ সাহেবের কাছেই খাবে।

বাজারে আর ঘোরার প্রয়োজন ছিল না। আমি নাকি বেহিসেবী খরচা করি। তাই ছেলে এবার সব ভার নিজের হাতে নিয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হয়েই বাসার দিকে ফিরছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি পরিচিত মুখ। পরিচিত—তবু মনে করতে মিনিট দুই সময় লাগল। একদা অত উজ্জ্বল মুখ এত মলিন দেখব ভাবি নি বলেই দেরি লাগল।

মৈনাক সেন।

না, আমাকে চেনার কোন কারণ নেই তাঁর। আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, আমি তাঁর কোন 'ফ্যান'ও নই যে ঠিকুজি-কুলুজি মুখস্থ রাখব। আমি ভিন্ন জাতের মানুষ। যদিও লিখিটিখি একটু-আধটু কিন্তু সে লেখা তাঁদের চোখে পড়বে, তা আশা করি না। ফিল্মের জন্যে লিখিও না। ছাপে ফেলা লেখা আমার তেমন আসে না। যাদের আসে—তাদের যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে লেখক হিসেবে, তাও দেখেছি। সুতরাং ও চেষ্টাও করি না। যারা ফরমাশী লেখা লিখে দু পয়সা করে খাচ্ছে তাদের ঈর্ষাও করি না। মোটা টাকা বাঙ্গালী লেখক পায় না, মানে কলকাতায় পায় না—ঈর্ষা করব কেন ? শুধু নহি উৎসুক !

তবে মৈনাক সেনকে কে না দেখেছে বা না চেনে ?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'টক অফ দ্য টাউন' ছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা, বিখ্যাত মদ্যপ, বিখ্যাত প্রেমিক (লম্পট শব্দটা ঠিক ওঁর বেলায় প্রযোজ্য নয়), কুখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।

কুখ্যাত বলছি ইচ্ছে করেই। কারণ এই শেষেরটাই কাল হল লোকটির। অভিনেতা হিসেবে এককালে যে বিপুল খ্যাতি হয়েছিল তা কমতে দেরি লাগত। যেটুকু অবশিষ্ট থাকত তাতে আরও বেশ কিছুদিন মদ্যপানটা চলবার কথা। কিন্তু ওঁর হঠাৎ মনে হল—পরিচালক প্রযোজকরা ওঁর প্রতি অবিচার করছে। নিজেই গেলেন ছবি পরিচালনা করতে। তার চেয়েও যেটা মূঢ়তার কাজ—নিজেকে হিরো করে গল্প লেখালেন। ফরমাশী গল্প। নতুন প্রণয়িনীকে হিরোইন দিয়ে। সে ছবিতে যথাসর্বস্ব ডুবল। তাতেও চৈতন্য হল না। যেখানে যত ঘাঁটি ছিল সব জায়গা থেকে ধার করে আর একবার রাঘের খেলা দেখাতে গেলেন।

এবার অন্য একজনকে 'হিরো'—তরুণ নায়ক করেছিলেন, মাঝারি রকমের নাম করা কিন্তু গল্প তৈরী করে-ছিলেন একপেশে, মধ্যবয়সী এক ভদ্র-লোককে কেন্দ্র করে, আর বলা বাহুল্য, সে ভূমিকা নিজেই নিয়েছিলেন। ফলে ডরাডুবি। আর এখন পার্টও পান না, ছবি নিজে তুলবেন সে ক্ষমতাও আর নেই। ওঁর নতুন প্রিয়াও আর নেই—স্বভাবতই যাদের খ্যাতি মধ্যগগনে তেমনি একজনকে ভর করেছে।

এসবই আমার শোনা, তপু-দীপু—ভাইপোদের মারফত। বিশেষ তপু। কাজের কথা গুরুতর নিবিশেষে ভুলে যায়—কিন্তু ফিল্ম জগতের কথা একটাও ভোলে না। তারকাদের নাড়ি-নক্ষত্র ঠিকুজি-কুলুজি মুখস্থ। বোম্বের কোন্ 'তারা' কখন উঠছে, কখন ডুবছে ; বিয়ে হওয়ার পর কোন্ জুটির লাক আর ফেবার করছে না ; মাদ্রাজের কোন্ অভি-নেতার বাঙ্গালী মেকাপম্যান দেড় হাজার টাকা মাইনে পায় ; এখানে কার কখানা গাড়ী, কোন্‌টার কি নম্বর—সব তার নখদর্পণে। সে-ই আমাকে ইদানীং কার খানকতক স্টীল ফটো এনে দেখিয়ে-ছিল মৈনাকের, নইলে চিনতে পারতাম না। আগেকার সে দীপ্তি বা গ্লামার কিছুই নেই। আমি দেখেছি ওঁর দু-একখানা প্রথম দিককার ছবি, পর্দাতে ছায়া ফেললে প্রেক্ষাগৃহ যেন জ্বলে উঠত। এখন সে উজ্জ্বল কান্তিও নেই, চোখের কোণ দুটো—অতিরিক্ত মদ্য-পানের ফলে কিনা জানি না, ফোলা-ফোলা। ফলে অমন আশ্চর্য সুন্দর চোখেরও সে আকর্ষণ নেই। চুলটা তেমনই আছে অবশ্য, ঢেউ খেলানো, প্রচুর—তবে অর্ধেক চুলে পাক ধরেছে এর মধ্যেই। বহু পুরাতন, এককালে মূল্যবান একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে উদাসদৃষ্টিতে বাজারে ঘুরছেন লক্ষ্য-হীনভাবে।

আলাপ করার দরকার নেই।

আগেই করতে চেষ্টা করি নি, তার এখন।

দেখলাম, দুঃখও হল—কিন্তু হাহুতাশ করার মতো কিছু নয়।

বেরিয়ে এসে জর্জ সাহেবের হোটেলে ঢুকলাম আবার।

এতক্ষণে নিশ্চয় ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে চন্দনের।

চন্দন আমার জন্য বাইরেই অপেক্ষা করছিল, যেতেই পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে বসাল। আগেকার ভাষায় 'ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ'। সমুদ্র দেখা যায় না, তবে

হাওয়া আছে। চা খাবো কিনা আর একবার জিজ্ঞাসা করল। সে অবশ্য জর্জ সাহেবও করেছিলেন। এখনও চাইলে দিতে পারবেন, আর হবে না। মেমসাহেবের বয়স হয়েছে, লাঞ্চ-এর জন্য তৈরী হচ্ছেন এখন থেকেই। বারবার চা করতে গেলে ভাত হবে না।

আর কিছু দরকার নেই জানিয়ে ওরই বিছানাটায় বসলুম। টুকরা-টাকরা দু'-একটা কথার পর ওর কি কথা আছে জিজ্ঞাসা করতে যাবো, হঠাৎ আমারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এবার এখানে এক সেলিব্রিটিকে দেখলাম হে; মানে কিছু আগের সেলিব্রিটি, মৈনাক সেন। সে দীপ্তির কিছুই নেই আর। তবু বোধহয় সব সিনেমা দর্শক এখনও ভেসে নি। বাঙালী টুরিস্টরা টের পেলে পুলকিত হত। ভদ্রলোককে যে রকম লোনলি আর মুষড়ে পড়া দেখলুম—দু'চার জন লিউডো-ভক্ত গেলেও চাঙ্গা হয়ে উঠতেন!'

'মৈনাক মানে? য়্যাক্টর মৈনাক সেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, য়্যাক্টর ডিরেক্টর প্রোডিউসার—কী নন।'

'মৈনাক সেন! এখানে!'

দেখতে দেখতে মুখ-চোখের এমন পরিবর্তন ঘটল চন্দনের ঐ ক'টা—আটটা অক্ষর উচ্চারণ করায় যে সময়-টুকু বোধহয় দু'তিন সেকেন্ডের বেশী হবে না, তার মধ্যেই ওর মুখের চির-ন্তন একটা কবি-কবি আর বিনম্র মিষ্টিভাবের জন্যেই ও এত প্রিয় সকলের কাছে—সেই মুখ এমন কঠিন, দৃষ্টি এত কঠোর ও হিংস্র হয়ে উঠল যে, আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলুম। কী হল—স্ট্রোক? ফিট? য়্যাপো-প্লেক্সী? বেশ লক্ষ্য করলুম কেমন এক নিমেষে ওর নীলাভ চোখের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা লাল পর্দা পড়ে গেল। রগের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠল। এ যেন এক নতুন চন্দন।

'কোথায় দেখলেন? কখন?'

উত্তর দিতে দেরি লাগল বৈকি।

ঠিক এ ভাবান্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না তো। খতিয়ে খতিয়ে যেন কতকটা অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিলুম, 'এই তো, বাজারেই ঘুরছেন। এক্ষুণি দেখে এলুম। কেন বলো তো, চিনতে নাকি? টাকাকড়ি ধার দাওনি তো কখনও?'

এসব কথার উত্তর দিল না, আর কোন কথাই বলল না। শেষের কথাগুলো কানে গেল বলেও মনে হল না। ছিপ্তে-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি যে বেকুফের মতো একা বসে রইলুম, সে কথাও মনে রইল না তার।

॥ চন্দন ॥

ছি, ছি, সকালে অমনভাবে কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞান হারানোটা একেবারেই উচিত হয় নি। মাষ্টারমশাইকে ঐভাবে বসিয়ে রেখে—! একটা কথাও বলে গেলুম না, কী অসহায় আর অপ্রস্তুত বোধ করলেন উনি! শুনলুম, মিনিট পাঁচেক বসে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেছেন। কী অপমানিতই না বোধ করলেন! আর কী জন্তুই না ভাবলেন আমাকে! ছিঃ! ওঁর কাছে মুখ দেখাবো কি করে আবার—এইটেই সারাদিন ধরে ভাবছি, কী ভাষায় মাপ চাইব ওঁর কাছে!

আসলে শিক্ষা বা ভদ্রতার মার্জনা কিছুই কিছু না। কাঠের ওপরের পালিশের পাতলা পর্দা। যে-কোন আবেগের তাপ বা ব্যক্তিগত ক্ষতির আঘাত লাগলেই সেটা উঠে গিয়ে ভেতরের কর্কশ রুক্ষ কাঠটা বেরিয়ে পড়ে। মানুষের ভেতরের আসল জন্তুটা জেগে ওঠে।

মাষ্টারমশাই অনেকটাই জানেন, কিন্তু সবটা জানেন না যে! অথচ এই কথাটাই ওঁকে বলতে চেয়েছিলুম।...কী-ই বা হ'ল পাগলের মতো ছুটে গিয়ে। না পারলুম তাকে অপমান করতে, না পারলুম গালে দুটো চড় লাগিয়ে তার ন্যূনতম প্রাপ্য তাকে দিতে। তাতে চার-দিকে ভিড়ই জমে যেত, আর সে জনতা নিঃসন্দেহে ওর পক্ষ নিত। এ প্রতিশোধ তোলার কোন হকই তো আমার নেই—

না ন্যায়ত, না ধর্মত। বরং কথাটা বলতে গেলে আমাকেই পাগল ভাবত। ভিলেন অয় দি পীস্ হিরো হয়ে যেত এক মিনিটে। কিছুই করতে পারলুম না, মাঝখান থেকে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ হ'তে চলল।..... যেতে পারি এখনই, কিন্তু ও'র স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের সামনে এসব কথা বলতে পারব না। অন্য লোকের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত —এভাবে সকলকে জানানো চলবে না।

মাপ করবেন মাষ্টারমশাই, মাপ করবেন। জানি আপনি ক্ষমা করেছেন এতক্ষণে। চিরকালই প্রশ্রয় পেয়ে এসেছি আপনার কাছ থেকে। আপনি আর বঙ্কু-বাবু চিরদিনই প্রশ্রয় দিয়েছেন। হয়ত এত প্রশ্রয় আর স্নেহ পেয়েই এমন হ'দর তৈরী হয়েছি।

আপনাকে এ রহস্যের অনেকটাই বলেছি, তবু অনেকটা বাকীও রয়ে গেছে। সবটা যে আমিও এতদিন জানতুম না। জানতে চাই নি বলেই সে বলে নি। নইলে মিথ্যে সে কখনও বলে না। আমার কাছে কোনদিনই কোন কথা গোপন করে নি। সেও আমাকে ভালবেসেছে, তাই কোন মিথ্যা বা গোপনতার অন্তরাল রাখতে চায় নি আমাদের মধ্যে।

আপনি জানেন, শীলা আমার অফিসের সহকর্মী। বয়সে সামান্য একটু বড়, দেখতে চলনসই, স্বভাব মিষ্টি, ভদ্র, শান্ত মেয়ে; ব্রাহ্মণ-কন্যা। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক—অনেক কথা জানবার আছে, জানাবার আছে। আপনাকেই জানাতুম, জানিয়ে পরামর্শ নিতুম। কিন্তু তার আগেই যে ও এই কাজ ক'রে বসল!

হ্যাঁ, সুন্দরী যাকে বলে শীলা তা নয়। আমি তা মেনে নিয়েছি। সত্যটা পরিষ্কার থাকাই ভাল, নিজের কাছেও। কিন্তু যদি আমার এ চোখ দুটো দিয়ে দেখতেন! আপনিও বলতেন, এমন আশ্চর্য মেয়ে আর আপনার চোখে পড়ে নি। আর শুধু আমিই বা কেন, অমন সুন্দর অত উজ্জ্বল মানুষটাও তো ভুলেছিল।

বিবাহই হবার কথা আমাদের। হয়েও যেত আমি প্রস্তুত ছিলুম, বরং উৎসুক অধীর ছিলুম বলাই উচিত। কিন্তু আমার বাবা-মা প্রথম থেকেই বেঁকে বসেছিলেন। শীলারা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ বলে নয়—মেয়ের বয়স বেশী বলেই বেশী আপত্তি ত'াদের। শীলার অত বয়স দেখাত না, সে স্বচ্ছন্দে কমিয়ে বলতে পারত, কিন্তু ঐ আগেই বলেছি —সে মিথ্যা কথা বলতে চাইত না; কোন করণেই। বাবা বাধা দেন নি, ছেলেকে তিনি চিনতেন, কিন্তু ভেঙে পড়েছিলেন। সে কারণটাও অতি সূক্ষ্ম। তিনি নিজেও অত বুঝতেন না বোধহয়। তাঁর যা পেন-সন তাতে আমাদের সংসার চলত না— ছোট ভাই-বোন তখনও স্কুলে পড়ে— যদি ত'ারা আমাদের ত্যাগ করেন— আমার আশ্রয়টাও সেই সঙ্গে যাবে—অথচ সে আশংকাটা প্রকাশ করতেও ত'ার আত্ম-সম্মানে বাধত। তাতেই আরও এত মানসিক যন্ত্রণা ত'ার।

এ আশংকাটাই অবশ্য অমূলক। এ হিসেব আমরা করে ফেলেছিলাম। আমরা যদি একত্র থাকতে না পারি—অন্তত আড়াইশো টাকা মার হাতে দেওয়া দরকার হবে। সেটা দিতে পারব নিজেরা বাসা-খরচ চালিয়েও। দু'জনের মাইনে জড়িয়ে তখনই আমাদের হাজার টাকার বেশী আয় ছিল। আমার বাবাকে আড়াইশো আর শীলার বাবাকে দু'শো দিলেও বাকী যা থাকত তাতেই কষ্ট করে চালাতে পারতুম, না হয় টিউশানী নিতুম একটা।

কিন্তু বাধা শীলারও কিছু ছিল। ওর মার শরীর খারাপ—নার্ভাস ব্রেক-ডাউন গোছের একটা কি অসুখ, হঠাৎ দেখলে মাথা খারাপ বলেই মনে হ'ত, ওদের বাড়ীতে মেয়ে বলতে ওর একটা ছোট বোন—তার তখন মোটে দশ বছর বয়েস। সংসার কে দেখে? ঝি ছিল রান্নার কিন্তু ভাড়া করা লোকের দ্বারা তো আর গৃহিণীত্ব চলে না। তাই শীলার ইচ্ছা ছিল যে, আমার বাবা-মা যদি ওকে স্বীকার করতে বা ঘরে নিতে না চান তাহলে আলাদা বাসা না করে আমিই ওদের বাড়ী গিয়ে থাকি—অন্তত ওদের খুব কাছে কোথাও।

তাতে আমার আপত্তি ছিল। বাবা-মাকে ছেড়ে গেলেই ত'াদের যথেষ্ট আঘাত দেওয়া হবে। তার উপর যদি ঘর-জামাই হয়ে থাকি সে আঘাত হবে মর্মান্তিক—আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা,—এ্যাডিং ইনসাল্ট টু ইনজুরী। তাছাড়াও ঐ মহিলার—মানে শীলার মা'র সঙ্গে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমিও পাগল হয়ে যাবো হয়ত শেষ পর্যন্ত।

এই যৌথ কারণেই ইতস্তত করছিলাম আমরা দু'জনেই; এর মধ্যেই এই কাণ্ডটা ঘটল। আমারই দুর্মতি, সাধারণত আমরা হিন্দী বা বাংলা ছবি দেখি না, মৈনাক সেনের নাম হয়েছে বলেই—কেমন অভিনয় করে সে দেখতে একরকম জোর করেই ওকে টেনে নিয়ে গেলুম।

এই ছবি দেখতে দেখতেই শীলা যেন পাগল হয়ে গেল। অমন শান্ত, ভদ্র স্বভাবের স্থিরবুদ্ধি মেয়ে যেন ভূতে পাওয়ার মতো কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলল। মৈনাক তার কাছে ভগবান হয়ে উঠল। সেকালে অনেক ভক্ত নাকি চাইত জগন্নাথের রথ তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাক—ভগবানের রথের নীচে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও তাদের সুখ। শীলারও সেই মনোভাব কতকটা। মৈনাক যদি ওকে লাথি মারে সেও একটা স্পর্শ বুঝবে, তাতেই ওর সুখ। তার জন্যে আত্মনাশ করাই ওর জীবনের যেন চরম সার্থকতা। জানি না একেই স্যাডিস্ট মেন্টালিটি বলে কি না, মোট কথা ওর তখন ধারণা বা স্বপ্ন যাই বলুন—মৈনাক সেনের জন্যে চরম কোন স্বার্থত্যাগ বা অপরিসীম দুঃখ বরণ না করতে পারলে ওর জীবনের কোন মূল্য নেই।

প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্ষুব্ধ, ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। কোন মনোভাবই তাকে বিচলিত করল না। অনেক বোঝা-বারও চেষ্টা করলাম—নানা ভাবে নানা

সময়ে, কিন্তু ফল তাতে বিপরীতই দাঁড়াল বলতে গেলে। আমার সঙ্গই তার কাছে বিষবৎ হয়ে উঠল। আসলে কোন যুক্তি বা কথারই কোন অর্থ তখন তার মাথায় ঢুকছিল না, সে তখন নিজের স্বপ্নে ডুবে থাকতে চায়, নিজের অত্যুগ্র বাসনার নেশা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চায়—সেইজন্যেই কানের কাছে ভিন্ন রসের কথা বিরক্তিকর বলে বোধ হচ্ছিল। একদিন স্পষ্টই বলে ফেলল, 'তোমার ও একঘেয়ে বকুনি আমার আর ভাল লাগছে না, দোহাই তোমার, একটু চুপ করো, আমাকেও চুপ করে থাকতে দাও।'

আত্মসম্মানজ্ঞানের তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই নিজেকে শীলার কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম। তবে বোধ করি তার প্রয়োজনও ছিল না, সে-ই সরে গেল ক'দিন পরেই। অত রূপবান, খ্যাতিমান পুরুষ মৈনাক সেন সাধারণ মেয়ে শীলার মধ্যে কি দেখেছিল কে জানে—যার কাছে আসার জন্য শত শত সুন্দরী মেয়ে উৎসুক, চিত্রতারকারা তার প্রসঙ্গ পেলে ধন্য হয়ে যায়—সে একদিন শীলাকে নিয়ে সংসার পাতল। কে জানে কোন বিবাহের অনুষ্ঠান বা রেজিস্ট্রি হয়েছিল কিনা—তবে শাহারজাদীতে একটা ভোজ দিয়েছিল মৈনাক সেন, আর সে কথা সিনেমা পত্রিকাগুলিতে ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল। একটু মনুষ্যত্ব ছিল বোধহয়, আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করার চেষ্টা করেনি। তবে—সম্ভবত আমার সঙ্গ এড়াতে অথবা অনাবশ্যকবোধে চাকরিতে জবাব দিল শীলা, এই ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

না আত্মহত্যা করিনি মাস্টার-মশাই, তাহলে তো খবরই পেতেন। যদিচ সে কারণ যথেষ্টই ছিল। খবরের কাগজের ভাষায় 'প্রণয়িনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত' নয় তো, সোজাসুজি পরিত্যক্তই। ইংরেজীতে যাকে জিল্টেড বলে তাই। এর আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘরে-বাইরে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তরঙ্গ উঠল সেটা আরও মর্মান্তিক। মা বোধ করি দেওয়ালগুলোকেই সম্বোধন করে বলতেন, 'আজকালকার ছেলেরা মনে করে তারা মায়ের পেট থেকেই বেদব্যাস হয়ে জন্মেছে, তারা সবজান্তা, বাপ-মা সব আহাম্মক, কিছু বোঝে না। ঐ তো—ওনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। তেমন মেয়ে নাকি আর ভূ-ভারতে জন্মায়নি একটিও, শান্ত, ভদ্র, কত বিবেচনা, কত বুদ্ধি—এই তো ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।'

এ তো সামান্য একটু নমুনামাত্র। আরও কত কথা, কতক্ষণ ধরে চলত তা আন্দাজ করতে আপনার অসুবিধে হবে না আশা করি। অহরহ দিনরাত্রিই এই-রকম চলত। বাবা মধ্যে মধ্যে মাকে ধমক দিতেন কিন্তু তাতে কোন ফল হত না। এতকাল পরে এত বড় বিজয় লাভ হয়েছে—সেটা উপভোগ করবেন না? আপিসের আক্রমণটাই বরং কম, তাদের কান আছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু টিটকিরি কি তামাশা—সে তত কিছু দুঃসহ নয়। বরং কেউ কেউ বিভিন্ন কাগজে বেরুনো ওদের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক ইতিহাস দাগ দিয়ে দিয়ে টেবিলে রেখে যেত সেইটেই বেশী খারাপ লাগত।

তবে এসবই একদিন কমে এল—জুড়িয়ে এল বলতে গেলে। মাও বোধ করি শান্ততেই (আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়েই আরও) চুপ করে গেলেন। কিন্তু আমার জ্বালা জুড়লো না কিছুতেই। সত্যি বলছি মাস্টারমশাই—ওকে যে এমন একান্তভাবে চেয়েছিলাম আগে ততটা বুঝি নি, বুঝলাম হারাবার পর। সমস্ত জীবনটাই যেন অর্থহীন বিস্বাদ—জীবন রাখার জন্য এই যুদ্ধ-টাও অকারণ হয়ে উঠল। কিন্তু এ অনুভূতিটাই চরম নয়। তখন মনে হ'ত জীবনের চরম আঘাতটাই পাওয়া হয়ে গেছে, পরে বুঝলুম যতদিন বেঁচে থাকে মানুষ কোন কষ্ট-দুঃখ-আঘাতই চরম বলে মনে করার কারণ নেই।

বছরখানেক পরেই খবর পেলুম। শীলা মৈনাক সেনের কাছে বাসি-ফুলের মালা হয়ে গিছল। তাকে জীর্ণ পাদুকার মতোই ত্যাগ করে এক 'গ্ল্যামারারস' তারকার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

মনে হ'ল বুঝি এই ঘটনাটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। নির্লজ্জের মতোই উঠে-পড়ে লাগলাম তার খবরের জন্যে, তাকে খুঁজে বার করার জন্যে। না, বাবা-মার কাছে সে যায় নি, তাঁদের কোন খবরও দেয় নি। মনে হ'ল কোন চেনা লোকের কাছেই যায় নি সে। আমি কোথাও খোঁজ নিতে বাকী রাখিনি—এতদিনে তার এখানের আত্মীয়-স্বজন সকলের কথাই শুনেছি তার মুখে—এমন কি হাসনাবাদে ওদের দেশের কিছু লোক এসে বাস করছে, তাদের কথাও—তাদের সকলের সঙ্গেই দেখা করেছি যতদূর সম্ভব, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে নি।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ঐ মৈনাক সেনটার কাছেই গিছলাম একবার। এমনি খুব একটা অভদ্র ব্যবহার করেনি, রূপ ও খ্যাতির তুঙ্গে তখনও—অহঙ্কার তো একটু থাকবেই, সেটুকু মেনে নিলে কোন অসুবিধে নেই আর। সেদিন ওকে বরং একটু অপ্রতিভও মনে হ'ল, হাতজোড় করে বলল, 'বিশ্বাস করুন, সত্যিই বলছি আমি কোন খবর জানি না। আমি হয়ত—মানে একটু যাকে বলে এদিক-ওদিক করেছিলুম, তাও সবটা সে কারণে নয়—কাজের চাপে আরও সবদিন আসতে পারতুম না। তবু আমার সংসারের সে-ই কর্ত্রী ছিল তাতে তো সন্দেহ নেই, কেন চলে গেল কে জানে। আমি আপনাদের কথা শুনেছি—আমি তো ভাবছিলুম কোন অভিমানে আপনার কাছেই চলে গেছে—'

আর কিছু বলার ছিল না তখন। পরে শুনেছিলুম, শুধু অভিমানে নয়, দৈহিক কারণেই ঘর ছাড়তে হয়েছিল শীলাকে। একাদিক্রমে দীর্ঘদিনই আসত না মৈনাক। আর একজনকে নিয়ে স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে অন্য সংসার পেতেছিল, বাড়ীভাড়া, সংসার খরচা শীলাকে চালাতে হচ্ছিল নিজের গয়না এমন কি শেষের দিকে ভাল শাড়ীগুলো বেচেও। তাইতেই নিরুপায় হয়ে গৃহত্যাগ করেছে সে।

তারপর এই দীর্ঘকাল কেটেছে। মৈনাকের উত্থানও যেমন দেখলাম—পতনও। অতি অল্প সময় মাত্র ক'বছরের মধ্যেই উচ্চতম চূড়ায় উঠল আবার অতল গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল। তা হোক তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। শীলার কথাটাই আসল। এই দীর্ঘকালেও আর কোন খবরই পেলাম না তার। মনে হয়, সে মনের ঘেন্নায়ও বটে—নিরুপায় দিশাহারা হয়েও বটে—আত্মহত্যাই করেছে।

এই সম্ভাবনার কথাটা যখন ভাবি—তখনই মনে হয়, ঐ লোকটাই এর জন্যে দায়ী। অমন একটা প্রাণ অকারণে অকালে নষ্ট হয়ে গেল ঐ অপদার্থ নির্বোধ বৃথা অহঙ্কারী লোকটার তুচ্ছ খেয়ালের খেসারত দিতে। এই কথাটা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না, সব যেন চোখের সামনে লাল দেখি—স্পেনের সেই বুলফাইটের ষাঁড়ের মতো—কোন জ্ঞান, কোন হিসেবই থাকে না। সেইজন্যেই আপনার সঙ্গে অমন অভদ্রতাটা করতে পারলুম মাস্টারমশাই।

॥ লেখক ॥

তুমি যে কেন সেদিন অমন পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা করলে চন্দন, তা কতকটা বুঝতে পারি বৈকি। তোমার মনের অবস্থা তো জানিই—সেই জন্যেই আজ তোমাকে উদ্দেশ করে

লিখতে বসেছি। আমি জানি—তবে আমি যে জানি সেটা তুমি জান না।

শীলা মৈনাকের কাছে যাওয়ার পর তুমি যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলে সেটা আমার চোখ এড়ায় নি। তুমি বুঝতে পারতে না—ভাবতে যে, কেউ তোমার মনোভাব বুঝবে না, তুমি সহজ আছ—কিন্তু তোমার মুখের চেহারা তোমার হুকুম মানে নি। বেদনার ছায়া তোমার ক্লান্ত চাহনিতে, অপরিসীম অবসাদে ও ললাটের অসংখ্য নবাঙ্কিত রেখায় ফুটে উঠেছিল। তোমাকে চিরদিনই স্নেহ করি। তোমার জন্যেই আরও খবর রেখেছিলাম।

অবশ্য একটা সুবিধাও জুটে গিছল খবর রাখার। দৈবই সহায় বলতে হবে। তপু, দীপুরা তো আছেই। মাসিক আনন্দ-কল্লোলের চিত্রসমালোচক—স্টুডিওতে পড়ে থাকা, নরেশ গুপ্ত আমার প্রতিবেশী হয়ে এল সেই সময়টায়। পরিচয় ছিলই, সেটা ঝালিয়ে নিল নরেশ। মধ্যে মধ্যে কোন একটা ছুটির দিন সকালে চা খেতে আসত। তার মুখেই খবর পেতাম ও-জগতের। আরও শীলার খবরের জন্যেই ধৈর্য ধরে শুনতাম, নইলে আমার খুব একটা রুচি ছিল না ওসব খবরে। আজও নেই। আবার আমি যে শুধু ঐ খবরটাই জানতে চাই তাও ওকে জানাতে পারি না—তৎক্ষণাৎ স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে নরেশ—কাজেই বিভিন্ন সংবাদের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো করে শীলার দুর্দশার কাহিনী সংগ্রহ করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, দুর্দশাই তুমি আজও শুনলে দুঃখ পাবে জানি কিন্তু উপায় নেই। নেশাতেই পেয়ে বসেছিল শীলাকে—প্রবল নেশা—তবে সে নেশা কাটতেও দেরী হয় নি। মৈনাকের কাছে ওটা খেলা—কিন্তু সমাজে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ না করলে শীলা ওর অঙ্কশায়িনী হতে রাজী হবে না বলেই আলাদা বাসা করে একটা লোক-দেখানো সংসার পাততে হয়েছিল। দু'-দিনের খেয়াল দু'দিনে মিটে গিয়েছিল, আর যাওয়াই তো স্বাভাবিক, অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে যার জন্যে পাগল, সে একটা সাধারণ মিষ্টি চেহারার মেয়েকে নিয়ে তৃপ্ত থাকবে—এমনটা আশা করাই তো ভুল হয়েছিল শীলার।

সে ভুলের কঠোর শাস্তি পেতে হ'ল। সর্বনাশে মূল্য শোধ হ'ল তার। তবু, দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল সেই অনাহার আর অপমান। শেষে আর পারল না। একদিন একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল। বস্ত্র বিশেষ আর ছিলও না অবশ্য, গহনা তো নয়ই। শুধু—তুমি যে তাকে অনেকদিন আগে এক জন্মদিনে একটা হাতঘড়ি উপহার দিয়েছিলে, সেটা সে সহস্র দুঃখেও বেচে নি। সেইটেই সম্বল করে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য সে না বেরোলে দু'-চার দিনের মধ্যেই বাড়ীওলা আদালতের পেয়াদা এনে বার করে দিত। ততদিনে দেড় বছরের ভাড়া বাকী পড়েছিল।

বোধহয় মরতেই চেয়েছিল শীলা।

ঠিক জানি না, নিশ্চয় করে বলতে পারব না। হয়ত বেরিয়ে এসে মুহূর্তের-কের মায়া হয়েছিল জীবনটার প্রতি—অনেক ভেবে খুঁজে খুঁজে এক বাল্য-বন্ধুর বাড়ী এসে উঠেছিল। ভাববার প্রয়োজন ছিল বৈকি, এ অবস্থায় কারও

বেনারসী, সিল্ক ও তাঁতের শাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
স্থাপিত-১৮৬২
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট • বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৬৪০২

সংসারে এসে ওঠা যায় না; লজ্জা তো বটেই—লাঞ্ছনার সম্ভাবনাও কম থাকত না। এ বন্ধুটি অবিবাহিতা, ভাল চাকরি করে, তার আত্মীয়রা থাকে রায়গঞ্জে, এখানে ট্যাংরায় সে একটা সরকারী সিংগল্ রুম ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। ঐ পাড়ায় দীপরা থাকে—তাদের মুখেই বিস্তৃত খবর পেয়েছি সব। এই বন্ধুটি —রচনা নাম বুঝি—সে ওর খবর রাখত। তার কাছে এসেই বাবা-মা'র খবর পেল। বাবা নানা অসুখে শয্যাশায়ী—একটা স্ট্রোকের পর আর উঠতে পারেন নি। মা তো বহুদিনই অথর্ব। ছোট ভাই একটা চাকরি পেয়েছে বটে, তবে সে নাগাল্যাণ্ডে—সেখানের খরচ চালিয়ে মাকে একশো টাকার বেশী পাঠাতে পারে না। সে টাকা আর বাবার পেনসনের টাকায় নুন ভাত যদি বা হয়—চিকিৎসা করানো চলে না।

মেয়েদের দায়িত্ব নেই, যিনি সন্তান উৎপাদন করেছেন সন্তান প্রতিপালন করার দায় তাঁর—তার বদলে তিনি সন্তানদের কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারেন, কিন্তু দাবী করতে পারেন না।

এ সবই জানে শীলা, মৈনাকের কাছে এ ধরনের কথা সে অনেক শুনেছে —কিন্তু তার এতদিনের ধারণা এসব যুক্তি বিচার করতে পারল না। গভীর অনুতাপই বোধ করল, সেই সঙ্গে একটা প্রবল অপরাধবোধ।

বন্ধুর কাছেই আশ্রয় পেয়েছিল, কোপড়-জামাও। কিন্তু চাকরি কোথাও পেল না। সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে, সে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বয়সও নেই, নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবার। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভরসা—সেখানেও সুপারিশ না থাকলে পাওয়া যায় না। শেষ অবধি এক গুজরাটী ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় পেল—এই শর্তে যে, তিন মাসের মধ্যে শর্টহ্যাণ্ড শিখে নিতে হবে। তাঁর পেটোলপাম্প থেকে কাপড়ের দোকান—অনেক ব্যবসা, কিন্তু তিনি ওকে সেক্রেটারী হিসেবে নিজের কাছেই রাখতে চান।

এটা প্রকাশ্য শর্ত, অপ্রকাশ্য শর্তটা জানা গেল পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই। প্রথমটা প্রবল ঘৃণাই বোধ হয়েছিল কিন্তু তারপর—সারারাত ধরে ভেবে বুঝল, এছাড়া গতি নেই। এভাবে দীর্ঘকাল একজনের গলগ্রহ হয়ে থাকা সম্ভব নয়; বহুদিন ঘুরে এইটুকু কাজ পেয়েছে, মাইনে আড়াইশো টাকা খাতায়-পত্রে। (তাতেই আশ্চর্য বোধ হয়েছিল প্রথমটায়)—অপ্রকাশ্য শর্ত মেনে নিলে তিনি অপ্রকাশ্যেই আরও দুশো টাকা করে দিতে রাজী আছেন। এ কাজ ছাড়লে আর কোথায় কী কাজ পাবে সে?

বুঝল এবং মেনেও নিল। কিন্তু গোলমাল বাধল অন্যত্র। বাবা-মা ওর উপার্জনের টাকা হাত পেতে নিলেন তবে ওকে আর বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্থান দিতে চাইলেন না। মৈনাক সেনের সঙ্গে বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয়, তাছাড়া শীলারই তো অসুবিধা হবে—তাদের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হবে, সবাই টিটকিরি দেবে—সেটাই কি ও সইতে পারবে?

এইবার বুঝল শীলা এতবড় কলকাতা শহরে ওর আপন কেউ নেই। একজন ছাড়া অবশ্য—সে তুমি, চন্দন। কিন্তু তোমার কাছে সে আর মুখ দেখাবে কী করে?

অনেক ভেবে দেখল সে। কোন এক হোটেল বা এমনি এক ঘর ভাড়া করে থাকতে পারে, তাতে খরচ অনেক বেশী, সে সব চালিয়ে মা-বাবাকে কি দেবে? আর এখানে নিত্য চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়—বাহ্য অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তার আড়ালে ব্যঙ্গবিদ্রূপের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও রসনা চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের—সকলেই 'সরল' ভাবে এ-অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সমবেদনা দেখায়।

শেষে—আবারও বোধহয় যখন আত্মহত্যার কথাটা ভাবছে—এই আশ্রয় পেয়ে গেল। ওর মনিবেরই আপন কাকা, ষাট-বাষট্টি বছর বয়স। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বহুদিন, এক ছেলে। সে কানাডায় থাকে। কেউ নেই সংসারে, ঝি-চাকর ভরসা। শরীর ভাঙছে, এ সময় একটু সেবা-শুশ্রূষার দরকার। তেমন কেউ আছে শীলার সন্ধানে—যে সঙ্গিনী, সেবিকারূপে তার কাছে থাকতে পারে, অবশ্য তাঁকে উনি গৃহিণীর মর্যাদাতেই গৃহে রাখতে রাজী আছেন।

প্রস্তাবের মধ্যে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, না বোঝার কথা নয়। শীলাও সে ভান করল না। তাঁর সঙ্গে একটা বড় হোটেলে চা খেতে গিয়ে কথাবার্তা পাকা করে ফেলল। দশ হাজার টাকা শীলা মা'র নামে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দেবে, ওর নিজের নামে তিনি আরও চল্লিশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দেবেন। থাকতে হবে ওঁর বাড়ীতেই—ম্যাঙ্গালোরে। সেখানে প্রাসাদোপম বাড়ী; অনেক কারবার ছিল, সব গুটিয়ে ফেলেছেন—তবে এখনও তিনটে পেট্রোল পাম্প আছে, ভাড়া বাড়ীও আছে ক'টা। বস্ত্র অলঙ্কার কিছুরই অভাব থাকবে না, শীলা নিজের রুচিমতো মাছ মাংসও পৃথক রাঁধিয়ে খেতে পারে। সব খরচা তো তিনি বহন করবেনই, মাসে আড়াইশো টাকা হাতখরচা দেবেন।

এফ ডি-টা করিয়ে নিল শীলা তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে আবার এমনি নিরাশ্রয় হয়ে না পড়ে এই কারণে। নইলে, জাভেরাজী আশ্বাস দিয়েছেন, শীলা যদি তার কাজ ঠিকমতো করে— তিনি তাকে একটা বাড়ি এবং ঐ পেট্রোল পাম্পগুলোর স্বত্ব লিখে দেবেন। দু'বছর দেখে সে ব্যবস্থা করবেন।

শীলা বেঁচে গেল। এখান থেকে সে পালাতে পারল সেইটেই বড় লাভ। দু-তিন দিনের মধ্যেই সে চলে গেল জাভেরীজীর সঙ্গে। সেখানেই আছে সে তাঁর আশ্রয়ে। কোন অসুবিধা নেই। বাবাকে মাসে দুশো টাকা করে পাঠায়। সুখে আছে কিনা জানি না—নিশ্চিন্ত হয়েছে সেটা বুঝতে পারি।

না চন্দন, এ কথা বলিনি তোমাকে। বলা যাবে না। তার খবর জানলে হয়ত তুমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসবে, হয়ত তাকে বিয়ে করবে—সেও হয়ত রাজী হয়ে যাবে। ঘরকন্না-সন্তানের মোহ মেয়েদের যায় না কোনদিনই—কিন্তু তারপর? সে জগদ্দল শীলা তুমি বইতে পারবে?.....

শুধু সংসার চালানোর কথা বলছি না—সমাজ বলে একটা জিনিস আছে, আত্মীয়-পরিচিতদের সমাজ। আজকাল কেউ ধোপা-নাপিত বন্ধ করে 'একঘরে' করতে পারে না—কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে নিজেদেরই সংকুচিত নির্বান্ধব করে নিতে হয়—বাধ্য হয়ে। ধনীদের হয়ত হয় না—তোমার আমার মতো মধ্যবিত্তদের হয়।

তার চেয়ে এই ভাল। প্রেমের যে স্বর্গ নিজের মনে রচনা করেছে তাতে বেদনাও যেমন আছে, তেমনি সুখও কিছু আছে। অন্তত বাস্তবের রূঢ়তা বা গ্লানি তো নেই।

শাড়ি বদল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সেই একই বৃদ্ধ কাউণ্টারে। চোখে নিকেলের চশমা। গায় সাদা টেনিস গার্ট, হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ চেহারা। কানের ওপর দু'-পাশে থোকা থোকা সাদা চুল। চালু চকচকে কপাল। দোকানের মালিকও হতে পারেন আবার মালিকের মতই কর্মচারী হওয়াও অসম্ভব নয়। আগেকার আমলের নাবালক জমিদার কিম্বা কেবলা জমিদারের দু'দে নায়েবের মত। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে চলেছে। শেষ পাতে গোটাকতক পিঁপড়ের মত একটা দুটো খদ্দের বিশাল দোকানের এখানে ওখানে। তেমন তাড়া নেই। কিছু কিনলেও হয়, না কিনলেও হয় এই ভাব। বিকাশ ইচ্ছে করেই এই সময়টা বেছে নিয়েছে। সকালে কিম্বা সন্ধ্যেবেলায় ভিড়ের সময় তাকে কেউ পাত্তা দেবে না। যে কাজে এসেছে সে কাজও হবে না।

বিকাশ ব্যাগ থেকে শাড়ির প্যাকেটটা বের করে আস্তে আস্তে কাউণ্টারে বৃদ্ধের সামনে রাখল। রাখতে রাখতেই মঞ্চে যেমন ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হতে থাকে সেই কায়দায় বিনয়-বিগলিত এক ঝলক হাসি নিয়ে মুখে ফুটিয়ে তুলল। বিকাশকে দেখলে মনে হবে সে ক্রেতা নয়, মেয়ের বিয়ের খরচ ভিক্ষে করতে এসেছে। পয়সা ফেলে জিনিষ কেনার ধরন এটা নয়। বৃদ্ধ বিক্রেতা দুপুরের অলস মেজাজে ছিলেন। সবে পানে এক খিলি পান পুরেছেন। একটা পা টুলের ওপর তোলা, ডান হাতটা সেই পায়ের উরুর ওপর আঙুলের খেলা খেলছে। বাঁ হাত কাউণ্টারে শরীরের তেরছা ভর রেখেছে। ওঝা যেভাবে সাপের দিকে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ সেইভাবে কিছুক্ষণ বিকাশের হাসির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফুরফুরে হাওয়ায় জনের মাঝখানে পড়ে থাকা শাড়ির প্যাকেটের ছেঁড়া একটা অংশ হাওয়ায় উড়ছে। বৃদ্ধ কোনো কথা বলছেন না দেখে বিকাশ তার হাসিটাকেই সুখের ওপর খেলাতে লাগল নানাভাবে। অবশেষে বৃদ্ধ তাঁর ডান হাতটাকে থাবার মত প্যাকেটের ওপর থ্যাপাস করে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কি?'

বিকাশ তার হাসিটাকে একটু মেজে, হাসিতে কথাতে মিশিয়ে বললে, 'এবার পাড়। খোলের সঙ্গে পাড়ের রঙ ম্যাচ করাতে পারে নি।' বৃদ্ধ প্যাকেটটা ক্যাঁস করে খুলে শাড়িটাকে একটু ভাঁজ খুলে কাউণ্টারের ওপর রাখলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, শিল্পী যেভাবে তাকিয়ে থাকে ছবির দিকে। তারপর বিকাশকে নয় অদৃশ্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে, হ্যাঃ এই পাড় পছন্দ হয় না। তবে কোন্ পাড় আর পছন্দ হবে। এর চে ভাল পাড় হয়।' বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাড়ি পরে আর দরকার নেই। ম্যাকসি কি বেলবট নিয়ে যান। এই নিয়ে তিনবার হল। একটা শাড়ি কতবার পাল্টাবেন মশাই।' বিকাশ ততক্ষণে ক্যাশমেমোটা বের করে ফেলেছে। বৃদ্ধ বললেন, 'মেমোটার কি অবস্থা হয়েছে। এরপর আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। বাঁধিয়ে ফেলুন।'

বিকাশ মনে মনে ভাবল, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। কাউণ্টারের ওপার আর এপার। বৌয়ের শাড়ি তো কোনদিন কেনেনি বুড়ো। কিনতে হলে বুঝতে ঠ্যালা। তোমাদের কালের বৌ আর একালের বৌ হেভন এণ্ড হেল ডিফারেন্স। কতবার পাল্টাবেন? ততবার পাল্টাবো যতবার পছন্দ না হবে। শাড়ি তুমিও পরবে না, আমিও পরব না, যে পরবে তার পছন্দ দেখতে হবে তো। প্রথম শাড়িটা একেবারেই পছন্দ হ'ল না। রুমা চোখ মুখ কুঁচকে বললে, এটা কি একটা রঙ। টর্চার অন মাই টেষ্ট। দ্বিতীয়টা রংটং যদিও চলে, জমি। একি একটা জমি হ'ল। এতো চাষের জমি নয়, পতিত জমি। জ্যাল জ্যাল করছে। জলে পড়লেই গুণচট। তৃতীয়টা পাড়েতেই মেরে

দিলে। এই খোলে এই পাড়। কোনো কলার সেনস নেই। এর নাম ম্যাচিং?' বিকাশ শাড়ির সমর্থনে একটু ওকালতি করার চেষ্টা করেছিল। ঘুরিয়ে করতে পারেনি। বিকাশ আসলে কলার-ব্লাইণ্ড। লাল, নীল, হলদে, সবুজ তার চোখে মিলেমিশে একাকার।

বৃদ্ধ শাড়িটাকে ভাঁজে ভাঁজে মেলাতে মেলাতে বললেন, 'ভদ্রলোকের ছেলে এসব হাঙ্গামা ঘাড়ে নেন কেন? যার শাড়ি তাকেই বলবেন কিনে নিতে।' 'শাড়ি তো আমার বৌয়ের।' 'সে তো বুঝতেই পারছি। বৌ না হলে কার আর এত বায়নাক্কা হবে।'

ভাঁজ করা শাড়ির ওপর একটা হাত আলগা করে রেখে বৃদ্ধ উদাস দৃষ্টিতে পান চিবোতে লাগলেন। হাতে বড় বড় পাকানো পাকানো পাকা চুল। বিকাশ তাকিয়ে আছে বৃদ্ধের মুখের দিকে। সামনে পড়ে আছে শাড়ি সমস্যার চেহারা নিয়ে। সমাধান থাকে থাকে সাজানো শাড়ির আকারে পেছনের আলমারিতে। যে কোনো একটাতে বিকাশের স্ত্রীর পছন্দ মিশে আছে। সেটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। বিকাশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বলা হ'ল না। বিকাশের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বৃদ্ধ হৈ হৈ করে উঠলেন, 'আসুন দিদি আসুন।' ঘাড় ঘুরিয়ে বিকাশ আদরের দিদিকে একবার দেখল। প্রথম দিন বিকাশও ছিল এমনি আদরের এমনি হৈ হৈ অভ্যর্থনার জিনিস। দিদির বয়েস বেশি নয়। ফর্সা টুকটুকে উজ্জ্বল চেহারা। বোঝাই যায় সম্ভ্রান্ত। হ্যাভস্ দের দলভুক্ত। বিকাশের মত হ্যাভস্ হ্যাভ নটসের মাঝামাঝি ল্যাটু বাবু নয়। জীবনটা লটকে পটকে চলছে না।

ভদ্রমহিলা চুপায়ে গটগট করে বিকাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই সুবাস। বিকাশের বহু দিনের বাসনা স্ত্রীর গায়ে এমনি একটু সেণ্ট ছড়িয়ে দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় সূর্যাস্তের পর পাশাপাশি হাতে হাত রেখে বসবে, ভারি পর্দা ফেলা পেছনের ঘর থেকে রেকর্ড প্লেয়ারে মৃদু রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা সেতারের আলাপ ভেসে আসবে। পায়ে একটাও মশা কামড়াবে না। তার স্ত্রী প্রতি কথায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে না। বিকাশ যা বলবে তাইতেই মৃদু মৃদু হাসবে। গুনগুন করে কথা বলবে। একবারও রাতে কুমড়োর ধ্যাঁট আর রুটির ভয় দেখাবে না। সেণ্টটা বিলিতি এবং ভয়ানক দামী। স্ত্রীর গায়ের দিশী সাবানের কাপড় কাচা কাপড় কাচা গন্ধের সঙ্গে কম্পেনসেট করতেই হয়েছে। টাকা যখন নেই বৎস বিকাশ, কল্পনার কুসুম মনেই শুকোতে দাও।

ভদ্রমহিলাকে দেখে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি টুল থেকে পা নামিয়ে নিয়ে বেশ সভ্যভব্য হয়ে উঠেছেন। চোখে কাজল টানার মত ঠোঁটে একটি ফোগলা হাসির রেখা টেনেছেন। বিগলিত বাচনভঙ্গী। 'কি চাই দিদি, তাঁত, না মিল, না সিনথেটিক।' বিকাশ আড়চোখে একবার দেখে নিল, পরনে তাঁতের শাড়ি। বিকাশের পাশেই মহিলা দাঁড়িয়েছেন। ইচ্ছে করলে কাঁধে কাঁধ ঠেকানো যায়। পাখার হাওয়ায় আঁচল উড়ে উড়ে বিকাশের হাতে শিরশির করে লাগছে। একটু সরে দাঁড়াল। ছেলেবেলায় মা বলতেন গায়ে শাড়ির আঁচল লাগলে অসুখ করে, রোগা হয়ে যায়। বিকাশের মনে আছে। কি অসুখ করে মা স্পষ্ট করে বলেননি, জ্বর কিম্বা ন্যাবা। বিকাশের এখন মনে হয় তেমন তেমন আঁচল লাগলে মানসিক ব্যাধি হতে পারে। ভোমলা পাগলের মত সারা জীবন বলতে হবে, 'এই ছিল, এই নেই, এই ছিল, এই নেই।'

মহিলা চারিদিকে সাজানো শাড়ির ওপর টর্চ লাইট ফেলার মত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মাথার ওপর পাট খোলা খোলা শাড়িগুলো দেখলেন। বিক্রেতার ধারাভাষ্য চলেছে অনর্গল। শাড়ির নাম, ধাম, ডিজাইন, সুতো। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল বিকাশের ফিরিয়ে দেওয়া শাড়িটার ওপর। শাড়িটা কাছে টানার আগে ভদ্রতা করে বিকাশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিয়েছেন নাকি?' উত্তর বিকাশকে দিতে হল না, বৃদ্ধই সোৎসাহে বললেন, 'না না, দেখুন না অরি ভাল শাড়ি। যেমন খোল তেমনি পাড়, যেমন রং তেমনি আঁজলার ডিজাইন।' হোস পাইপে জল দেবার মত বৃদ্ধ হুড় হুড় করে বাক্যবর্ষণ করে চলেছেন। খদ্দের মা-লক্ষ্মী, ইনি আবার মা-লক্ষ্মী খদ্দের। আপ্যায়ন দেখে বিকাশের হিংসে হচ্ছিল। এক কথায় শাড়ি পছন্দ। শাড়ির প্রতি বোল্ড অ্যাপ্রোচ। নো ঘিনঘিনে বিজনেস্। জুলিয়াস সিজারের মত ভিনি, ভিডি, ভিসি। দু'আঙুলে জমি পরখ। এক সেকেণ্ডে পাড় পছন্দ। ফর্সা হাত কনুই পর্যন্ত কাপড়ের ওপর রেখে রং ম্যাচ। একটি মাত্র প্রশ্ন, ক' হাত, কি দাম। পুট করে হাত ব্যাগ খুলে বৃদ্ধের হাতে কড়কড়ে একশো টাকার একটি নোট। ক্যাশ খুলদুলির কাছে মেমো নিয়ে যাওয়া নয়, ডেলিভারি কাউণ্টারের সামনে তীর্থের কাকের মত দাঁড়ানো নয়, বৃদ্ধই ছুটোপাটি করে সব করলেন। প্যাকেট আর ব্যালেন্স নিয়ে মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ বিগ্রহের সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকার মত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখটা হাসিতে গলা আমের মত তোবড়ানো।

আস্তে আস্তে জোড়হাত বুক বেয়ে ভুঁড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে শরীরের দু'পাশে নেমে এল। মুখের বিভিন্ন জায়গায় টোল ভরে উঠল। বৃদ্ধ তখনও একটা ঘোরের মধ্যেই আছেন যেন। সুন্দরী নো ডাউট। স্মার্ট। ব্যক্তিত্ব আছে। তা বলে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত কিছু নয়। হিন্দি ছবির নায়িকা যদি হঠাৎ দোকানে ঢোকেন বৃদ্ধকে তো কোরামিন দিতে হবে। সেই ঘোরের মধ্যে থেকেই বৃদ্ধ বললেন, 'জানেন কে?'

বিকাশের জানার কথা নয়। বিকাশ এই অঞ্চলেই থাকে না। ঘাড় নেড়ে জানাল, না, সে চেনে না।

'ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে। দেখলেন না, চেহারা দেখলেন না। লক্ষ্মী সরস্বতী এক দেহে।'

'কোন্ ডিষ্ট্রিক্টের'?

বৃদ্ধ খ্যাঁক করে উঠলেন 'যে কোনো একটা ডিষ্ট্রিক্টের। ডি এম-রা কি যে কোনো একটা জেলায় বাঁধা থাকেন? জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ান হন্যে হয়ে। এই মুহূর্তে কোন্ জেলায় আছেন বলবো কি করে।'

বিকাশ বললে, 'তা ঠিক। বড় বিচ্ছিরী চাকরি। ঘুরে ঘুরে হয়রানি। মাইনেও তেমন বেশি নয়। মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু তার চেয়ে বেশি রোজগার করেন।'

'কি কন্ মশয়। ডি এমের চাকরিরে আপনি ফালতু কইতাছেন। আপনার জ্যাল হইবো।' উত্তেজনায় বৃদ্ধর ভাষাই পাল্টে গেল, 'দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা ডি এম। ডি এমের বাংলো দেখছেন? ফরিদপুরে দ্যাখসি আমি। সায়েব ডি এম। বিশাল, বিশাল, কোলা ব্যাঙের হাতি দেখাবার চেষ্টার মত বৃদ্ধ দুটো হাত দু'দিকে বিস্তার করে বুকের ব্যায়াম করার কায়দায় বাংলোর বিশালত্ব বোঝাচ্ছেন। 'বিশাল, বি ই শাআল বাংলো। বিঘার পর বিঘা জমি, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সেপাই, শাত্রী, জিপ, ঘোড়া, মোটর। ছাদে দাঁড়িয়ে একবার রিভলভার ছুড়লে সারা জেলা একেবারে চুপ। কোলের পোলাও পর্যন্ত কাঁদতে ভুলে যায়। সেই ডি এম-রে কন হয়রানির সাকরি। কোন্ দেশের লাট আইল রে।

বিকাশ বললে, 'ধুর মশাই সে সব ছিল বৃটিশ আমলে যখন আমরা ছিলুম ইংরেজের বুটের তলায়। স্বাধীন ভারতে কারুরই আর অত দাপট নেই। এই তো আমাদের ছেলে বেলায় লাল পাগড়ি দেখলেই মার আঁচলের তলায় ঢুকতুম। এখনকার ছেলেরা খোড়াই কেয়ার করে। পুলিশদা বলে সিটি মারে। বাসে টিকিট না কাটলে কণ্ডাক্টার নামিয়ে দেয়। জমানা বদল গিয়া হো।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তা যা বলেছেন। একদম ভয় ভেঙ্গে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে কেউ কাউকে মানছে না। মনে আছে যৌবনকালে পার্ক ষ্ট্রীট ধরে সকালবেলা ভয়ে ভয়ে হাঁটছি,

একটা বড় বাড়ির তলায় এক সায়েব বসে বসে ছবি আঁকছে। ভাবলুম একবার উঁকি মেরে দেখি। যেই না মুখটা বাড়িয়েছি, ঠাস করে একটা চড়। সায়েবের হাতের চড় মশাই, মাথাটা বোঁ করে তিন পাক ঘুরে গেল। মুখটা দেখতে দেখতে ফুলে গোল। সেই থেকে আমার ভাঙা মুখ চাঁদের মত গোল হয়ে আছে। পানসে দুটো কশের দাঁত ঢক ঢক করে নড়ছিল, খুলে পড়েই গেল, না পেটে চলে গেল বুঝতে পারলুম না। ডেনটিস্টের কাছে আর যেতে হল না। খরচ বেঁচে গেল। ওই চড়ের এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আবার যদি সায়েবরা ফিরে আসে,—দোকানটা কোনো সায়েবকে বেচে দিয়ে নিজে কর্মচারী হয়ে যাব। এখানে আসে না, আসতেও না। লণ্ডনে একবার যদি যেতে পারে এয়ারপোর্টে নেমেই আগে চায়ের সঙ্গে দুটিন অ্যাসর্টেড পামার্স আর জেকব খেয়ে তবে অন্য কাজ।

বিকাশ বললে, 'ওই সায়েব সায়েব করেই জীবনটা নষ্ট করলেন। দেশকে ভালবাসতে শিখুন, আমাদের মত দেশের মানুষকে একটু খাতির করতে শিখুন। খালি ডি এম ডি এম করলে ঘেড়ার ডিম হইবো। বুঝলেন। আমিও বঙ্গের, ডি এমের মেয়েও বঙ্গের। আমি কিছু বানের জলে ভেসে আসিনি দাদু।'

বিকাশের কথায় বৃদ্ধ যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হলেন, 'হ বঙ্গের তো বটেই। তিনদিন ধইর‍্যা শাড়ি কিনতাসেন। আর ওই দেহেন মাইয়্যা

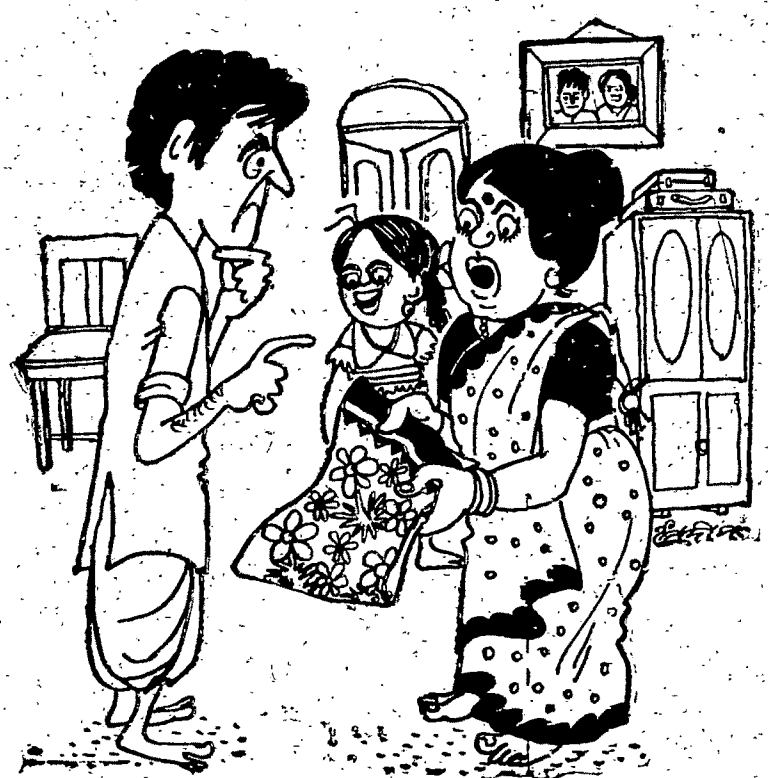

দেখবেন হোয়াইটওয়ে লেডল' হয়ে যাবে। তখন ওই একটা শাড়ি কিনে ছত্রিশ বার পালটাবার সাহস কোনো বাপের ব্যাটার হবে না।'

ওঃ, সেই হায়াইটওয়ে। প্রতিটি প্রাচীন মানুষের মুখে বিকাশ তিনটে নাম শুনবেই, হোয়াইটওয়ে লেডল', হাওলি পামার্স আর জেকবের বিসকুট। হোয়াইট ওয়েটা যে কোথায় ছিল আর কি যে ছিল, জীবনে একবার যদি দেখতে পেত। আর কয়েকটা বছর আগে জন্মালে হত। বিসকুট দুটো এদেশে আর লোগ, আইলেন, দেখলেন, সত্তর টাকা ফেললেন, শাড়ি বগলদাবা কইর‍্যা চললা গ্যালেন। এরে কয় কেননের বংশ, দ্যাখনের নয়।'

আরে বুড়ে দেখি বংশ ফংশ ধরে টান দেয়। আর তো সহ্য করা যায় না। রাস্কেল বৌয়ের জন্যে ছাপড়ওলার কথা শুনতে হবে। আত্মীয়স্বজনের সমালোচনা বিয়ের পর থেকে শুনেছে। বেশ। যে হেতু স্বজন তারা, পান থেকে চুণ খসলেই ঝাড়বে। ওটা শাস্ত্রসম্মত প্রাপ্য। কথাতেই আছে আপনার চে পর ভাল, পরের চে বন ভাল। প্রতিবেশীরা আছেন। সেখানে এর বৌয়ে তার বৌয়ে চুলোচুলি হবেই। ডেলি ন্যাচারাল। এই দিদি দিদি হলায় গলায়, পর মুহূর্তেই লঙ্কাকাণ্ড। তা বলে ডি এমের বংশ তুলে কায়দা করে সায়েব দিয়ে চড় খাওয়ানো, 'ওয়াণ্ডিং দিচ্ছি দাদু, বংশ-ফংশ তুলে কথা বলবেন না। শাড়ি পালটে দিতে হয় দেবেন, না দিতে হয় সাফ বলে দেবেন। ডি এম দেখাবেন না।' মনে মনে বললে, তা হলে তক্ষাফাই করে দোব। বৃদ্ধ মালিক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বিকাশের তখন ফ্লো এসে গেছে, 'আমার বংশ জানেন আপনি? জানার মধ্যে জানেন ওই সায়েব আর সবে ধন নীলমণি এক ডি এম। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ চীফ জাষ্টিস ছিলেন, প্রিন্স দ্বারকানাথের সঙ্গে এক গাড়িতে জগন্নাথ ঘাটে হাওয়া খেতেন। দ্বারকানাথের জাহাজে চেপে বিলেত গিয়েছিলেন। দুশো লোককে ফাঁসিতে লটকেছিলেন এক এক কলমের খোঁচায়—হ্যাণ্ড টিল ডেথ। পিতামহ ছিলেন ম্যাকিনটশ সায়েবের বন্ধু। সিম্পসনের সঙ্গে বেলভেডিয়ারে শেরি খেতেন। এখন সব এত বড় বড় অয়েল পেনটিংয়ে ঝাপসা মেরে আছেন। কি বংশ দেখাচ্ছেন! আমাদের বংশ ইতিহাসে আছে। একপুরুষে ডি এম নয়। সাত পুরুষের নীল রক্ত।'

বৃদ্ধ হঠাৎ বলে ফেললেন: 'তা হ'লে আপনার স্ত্রীর বংশ ভাল নয়। যে শাড়ি এক কথায় ডি এমের মেয়ে পছন্দ করে সেই শাড়ি আপনার স্ত্রীর পছন্দ হয় না কেন? আপনার বিয়াটা ভাল হয় নাই।' আর যায় কোথায়! বিকাশ কাঠের কাউণ্টারে একটা প্রচণ্ড ঘুষি ঝেড়ে বললে, 'হোয়াট।' এতক্ষণ বাংলায় যা হয়নি এক ইংরেজী হোয়াটের ধাক্কায় বৃদ্ধ খানিকটা পেছিয়ে গেলেন। বিকাশ কর্কশে গলায় বললে, 'সে ইট এগেন। আই উইল চেঞ্জ ইওর জিওগ্রাফি।' বিকাশ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, তার পেছনে ছোটো মত একটা ভিড় জমে গেছে। ক্যাশকাউণ্টারে ঝাঁকড়া চুলো যে ছেলেটি বসেছিল সে উঠে দাঁড়িয়েছে। দোকানের উচ্চতাকে দু'ভাগ করে কাঠের দোতলার রেলিং ধরে তিনজন কর্মচারী ঝুঁকে পড়েছে। ব্যাপারটা তিল থেকে তাল হয়েছে।

বিকাশ বললে, 'আমার স্ত্রীর ফ্যামিলি ইকোয়ালি গ্রেট। শুনবেন? শুনতে চান? ঈশ্বর গঙ্গানারায়ণ ছিলেন সাগরা ভূস্বামী, তস্য পুত্র হরিনারায়ণ নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শহীদ, তস্য পুত্র জগৎনারায়ণ রায় বাহাদুর, তস্য পুত্র নরনারায়ণ কর্ণেল, তস্য কন্যা আমার স্ত্রী। ইয়ারকি পেয়েছেন? জিনিস কিনবো পছন্দ করে কিনবো, যাচাই করে কিনবো, বাজিয়ে কিনবো, গাজিয়ে কিনবো, হৈ হৈ করে কিনবো। যারা একপুরুষে বড়লোক

তারা বোকার মত যা দেখবে তাই কিনবে, যারা সাতপুরুষে বড়লোক তাদের চেষ্টাটাই আলাদা। জানেন আমার ঠাকুমার বালুচরী শাড়ী মিউজিয়ামে আছে। একসময় আমাদের টাকায় ছাতা পড়ত। আমাদের বংশের নামই হয়েছিল ছাতাপড়া চৌধুরী। ছেচল্লিশের রায়টে আমাদের তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ স্রেফ পুড়ে গেল। দেশের বাড়িতে সাতবার ডাকাতি হ'ল, সেভেন টাইমস। এখানকার বাড়িতে দু'বার চুরি হ'ল। লাস্ট চুরি গত সপ্তাহে হয়েছে। প্রায় সর্বস্ব গেছে। এখন আমরা কলাপাতায় ভাত খাইতাসি। রোজ একবার করে থানায় যাই, চোর ধরা পড়ল কিনা জানতে। তিন মাস দেখবো তারপর সব স্টেনলেস কিনবো। আর কাঁসা নয়। আমার স্ত্রী এখন পাজামা পরে বসে আছে। একটাও শাড়ি নেই। চোরে ঘুশো শাড়ি নিয়ে গেছে। বিয়ের বেনারসীটার দাম ছিল দেড় হাজার টাকা বুঝেছেন মিয়া। খাপ খুলেছেন কোথা।'

দোকানে মোটাসোটা ফর্সা চেহারার এক যুবক ঢুকলেন। লটরপটর প্যান্ট। ছাপকা ছাপকা জামা। হাতে একটা ছোটো ট্রানজিস্টার। রেডিওটা বাজছে। খেলার রিলে হচ্ছে। ও, আজ আবার মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের খেলা। মোহনবাগানের গোলের মুখে সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে। বল নিয়ে জোর জটলা। গোলকীপারকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যকার বলছেন, 'দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে সমবায় প্রথায় মোহনবাগান ঠ্যাং দিয়ে সকলে মিলে বল আটকাবার চেষ্টা করছেন। তবে হাতের কাজ কি পায়ে হয়। গোলকীপার এই দুর্যোগে কোথায় যে গেলেন! গোলরক্ষক বোধ-হয় মাঠে নামতেই ভুলে গেছেন। এত বড় একটা ভুল কারুর নজরে পড়ল না। আশ্চর্য!' পাশ থেকে সহযোগী ভাষ্যকার মন্তব্য করলেন, 'আমার মনে হয়, আমি তাকে যেন একবার গোল লাইনে খেলা শুরুর সময় দেখেছি। লাফিয়ে লাফিয়ে ক্রশবারে হাত ঠেকাচ্ছিল। এখন কেন যে তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয় নেচারস কলে বাইরে গেছে। বলে যাওয়া উচিত ছিল। দিস ইজ এ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। রেফারীর উচিত খেলা বন্ধ করে গোলিকে খুঁজে বের করা। এক্ষুণি গোল হয়ে গেলে কে বাঁচাবে?

বিকাশের পেছন থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা রেজাল্ট কি?'

'ইস্টবেঙ্গল একটা দিসে। নাইন্যাই ঢকাইসে একটা।'

'গোওওল, গোওওল,' বিকাশের পেছনে যারা দাঁড়িয়েছিলেন সকলেই সমস্বরে প্রথম গোলটার জন্যে চিৎকার করে উল্লাস জানালেন একজন বললেন, 'মোহনবাগান আইজ এক ডজন খাইবো।'

বিকাশ বললে, 'আমার রিলে শোনার সময় নেই। আমি এখুনি চলে যাবো।' ভিড় বললে, 'যান না মশাই, কে আপনাকে আটকে রেখেছে। মোহনবাগানের সাপোর্টার। বুঝতেই পেরেছি।' বন্ধ দু'হাতে কাউণ্টার চেপে ধরে উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'চোকা, চোকা, হালায় ঢুকাইতে পারতাসে না ক্যান, কইতা পারিস, ফাউল, ফাউল করসে, হ্যাণ্ড বল, পেনাল্টি।' বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখি এবারে কে বাঁচায়।'

বিকাশ বললে, 'আমি আর দাঁড়াতে পারবো না।'

ভিড় বললে, 'খুয়্যা পড়েন। শোয়নের অবস্থা তো হইসে। একটা খাইসে, অখনই তো একটা খাইব, তারপর আর একটা, তারপর রাজ একটা, ডজনের বেশি দিমু না, সেটুকু ভদ্রতা আমাগোর আসে।'

বিকাশ গলা চড়িয়ে বললে, 'শাড়িটার কি হবে? প্রথমে আমদানী করলেন ডি এমের মেয়ে, এবার খেলা। আমার অত সময় নেই।' ট্রানজিস্টারের ভল্যুম একটু কমিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'কি হইসে বাবা। ভিড় জমাইয়া ফেলস।' 'তরে কইছিলাম না, উটকো খদ্দের জ্বালায় ভারি। এক শাড়ি লইয়া তিনদিন জ্বালাইতাসে। একবার কইয়া লয়া যায়, আবার আসে, আবার যায়। ওনাগোর বৌয়ের শাড়ি আর পসন্দ হয় না, ছ্যামড়া লয়্যা কাম।'

FOR ELECTRO-PLATING & POLISHING MATERIALS

B. C. Maity & Company

(EST . 1909)

: Showroom :

94 Prem Chand Boral Street : Bowbazar

Calcutta - 12

Distributing Agents For All Reputed

INDIAN MAKE

Electroplating chemicals, polishing materials & plating accessories and machineries

Gram : "LIBERTY" Calcutta

PHONE : Showroom 34-3173 (34-4846 Office)

ভিড়ের কণ্ঠ, 'বাড়িতে তাঁত আর তাঁতি বসিয়ে নিন, বৌমার পছন্দ মত শাড়ি বুনে নেবে।

ট্রানজিস্টার: গোওওল, না না না, আশ্চর্য, কাঁকা গোল, উনি গোল পোষ্ট দেখতে পেলেন না, আশ্চর্য। আজ এ কি খেলা হচ্ছে। মোহনবাগানের গোলকিপার গোলের বাইরে নেটের ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। একে কি খেলা বলে বিনয়দা। বুঝলে খগেন, একে বলে রিমোট কণ্ট্রোল। আধ্যাত্মিক শক্তি বা উইলফোর্স দিয়ে গোল আটকানো।'

বিকাশ বললে, 'ব্যাপারটা আমার সঙ্গে দোকানের মালিকের, ছ আর ইউ টু কমেণ্ট?'

ভিড়: আমরা ইষ্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আপনি মোহনবাগান। আপনাদের গোলকি গালিয়েছে।

ট্রানজিস্টার যুবক গম্ভীর গলায় বললেন, 'তিনবার পাল্টে দেওয়া হয়েছে আর হবে না, যান আপনার শাড়ি নিয়ে যান।'

বিকাশ বললে, 'ঠিক আছে ভাই হোক, দিন আমার শাড়ি দিয়ে দিন, আমি চলে যাই।'

যুবক বললেন, 'শাড়ি আপনার কাছে আমরা দোবো কি করে? আপনি তো বদলাতে এসেছেন।'

ভিড়: বাহা দাদা, একি মোহনবাগানের গোল পাইসেন গোলকি ছাড়াই গোল দিবেন। শাড়ি রইল গিয়া বাসায়, বদল দিবেন গিয়া দোকানদার, ভাল কারবার।

বিকাশ বললে, 'যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলেন কেন? এটা কি খেলার মাঠ।'

ট্রানজিস্টার: 'ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা গ্যালারীর কাঠ খুলে ঘাড়ে করে বন্যার স্রোতের মত মাঠের দিকে হু হু করে ছুটে চলেছেন। ক্ষমা নেই। আজ কারুর ক্ষমা নেই। চোখের সামনে গোলপোস্ট, তোমরা গোল করতে পারছ না। আগুন, আগুন, টেণ্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ক্রোধান্ধ সমর্থকরা।'

বৃদ্ধ বললেন, 'মিথ্যা কইব না, বুড়া মানুষ, শাড়িটা সামনে রাখসিলেন, বিক্কি হইয়া গেসে গিয়া। ও শাড়ি আর পামু কই।'

ভিড়: 'ধ্যাত মশাই, আগুন লেগে গেছে, জামটা দিয়ে ঝঞ্ঝাট বিদেয় করুন তো। মালকে চিনে রাখুন আর ঢুকতে দেবেন না।'

বৃদ্ধ হাঁকলেন, 'বিষ্টু, বিষ্টুরে'। ক্যাশের ছোকরা চিৎকার করলেন, 'হ হ কন'।

'এরে পয়ষট্টিটা টাকা দিয়া দে। যান মশয়, কইয়া দেসি।'

বিকাশ বললে, 'বাঃ বেশ মজা বেচলেন শস্তরে দেবেন পঁয়ষট্টি, কেন শুনি?'

'আরে মশয় দরাদরি করে আপনি পাঁচ ক্ষমাইছিলেন, দিদিমণি সস্তর দিসেন তাঁর খুশি। খদ্দের বুঝে দাম। আপনার টাকা আপনি পাইলেন, তাতেও সন্তুষ্ট নয়, আমার লাভ নিয়ে টানা-টানি।'

ট্রানজিস্টার: 'হাতাহাতি চলছে, হাতাহাতি, লাথালাথি ঘুষোঘুষি। মাঠে একটা গরু ঢুকে পড়েছে। থ্রি-কোর্থ গ্যালারি নেই।'

ক্যাশ থেকে পঁয়ষট্টি টাকা পকেটে পুরে বিকাশ প্রায় সন্ধ্যের পথে এসে দাঁড়াল। শ্বশুর বাড়ি থেকে একশোটা টাকা দিয়েছিল। তিরিশ টাকা কয়েক পয়সায় বিকাশ একটা সিলপার কিনেছিল। পঁয়ষট্টি টাকায় ঝকমারির শাড়ি। বাকিটা খুচখাচ খরচ। শাড়িতে আর কাজ নেই শ্যামা। উলঙ্গ হয়েই থাকো শিবের বুকে পা দিয়ে। নন্দী, ভৃঙ্গী যদি কণ্ট্রোলে থাকতো দেখিয়ে দিতুম বুড়ো তোমাকে, কেতনা ধানে কেতনা চাবল। আমার বৌয়ের পাড়াতুতো কুরুপোর সংখ্যা জানিস? মিছিল করে এলে দোকান তোমার ময়দানের গ্যালারি করে ছেড়ে দিতুম।

বিকাশ আস্তে আস্তে হাঁটছে। মেজাজ খুব খারাপ। শালেভাই অপমান। হাই প্রেসার আছে। ব্যাপারটা মিটে গেলেও ভেতরের ঝাঁঝাড় থামতেই চাইছে না। মাঝে মাঝে জোরে কথা বলে ফেলছে। মনের কোণে সব কটা চরিত্র স্পষ্ট হয়ে আছে। কাউণ্টার, বৃদ্ধ, ডি এমের মেয়ে, বৃদ্ধর মোটা ছেলে, ভিড়, প্রতিটা কথা। শীতের চোয়ার মত গুমোট। কিছুতেই বেরোতে চাইছে না। কেবলই মনে হচ্ছে ওই কথাটার আরো ভাল উত্তর দেওয়া যেত—সেটা এই। বিকাশ দক্ষিণে প্রায় মাইল খানেক হাঁটল। মনের আকাশে বৃদ্ধের আকৃতি স্থির কমল না, ক্রমশই দৈত্যাকার হয়ে উঠল। বৃদ্ধের মুখটা মাঝে মাঝে তার বাবার মুখের মত হয়ে উঠছে। বাবা যেন বলছেন, 'কুকুরকে বেশি নাই দিও না মাথায় উঠবে।' সামান্য একটা শাড়ি নিয়ে কুমার এরকম করা কি উচিত হ'ল। আসলে মাসে ভিড়, যাতায়াতের অসুবিধের কথা ভেবে তাকে সঙ্গে আনেনি বলে প্রতিশোধ নিল। হাম ভি দেখলেঙ্গে। পাকিট মে পঁয়ষট্টি রুপিয়া কক্‌কড়ে।

বিকাশ ঘুরে পড়ল বারে। অনেকদিন গলা ভেজানো হয়নি। পেয়ারকা নগমার এই তো পরিণতি। পেয়ার থেকে কুমা, কুমা থেকে শাড়ি। শাড়ি থেকে বাড়ি। লাগাও একটা বড়। বিকাশ অন্যমনস্ক, চানাচুর খাচ্ছে। বরফভাসা লাল জলে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে। উল্টোদিকে একজন ভারিক্কি মানুষ। অন্ধকারে মুখটা ভাল করে দেখা না গেলেও গেলাসে গোঁজা বিলের সংখ্যা দেখে অনুমান করা যায় তিনি এখন তরললোকে বুদবুদ হয়ে ভাসছেন। মাথার ওপর চোয়ার ছায়াপথ সিলিং-এর ফুটো থেকে আলোর রেখা মেখে প্রেয়সীর আঁচল হয়ে আছে। বিকাশের মনে বৃদ্ধ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শাড়িটা নেই, আঁচলটা আছে, কাউণ্টারটা কার্ণিশের মত সরু হয়ে এসেছে, ভিড়ের বদলে বিশাল মাঠে একটা দুটো নিঃসঙ্গ বাঁকড়া গাছ, মধ্যরাতে ট্রেণের জানলা থেকে যেমন দেখা যায়।

তিনটে বড়র পর বিকাশের মনে হ'ল তার একটা কনফেসান করা উচিত। বিকাশ হাত বাড়িয়ে সামনের ভদ্রলোকের কবজি স্পর্শ করল। ভদ্রলোক অন্ধকার থেকে বললেন, 'ইয়েস মাই সান'। বিকাশ আর একটা বড়র অর্ডার দিয়ে বললে, 'আমার বন্ধু প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথের বন্ধু ছিলেন না, আমি মিথ্যে কথা বলেছি।' ভদ্রলোক বললেন, 'একটা মিথ্যে আমি এক্সকিউজ করতে পারি বাট নট মেনি। আই অ্যাম এ ম্যান অফ প্রিনসিপল।' বিকাশ বললে, 'আমার পিতামহ বেলভেডিয়ারে সিম্পসনের সঙ্গে শেরি খেতেন না। মিথ্যে কথা বলেছি।' বাট হার্মলেস লাই।' ভদ্রলোক বললেন, 'হাউ ডু ইউ নো যে তিনি খেতেন না। তিনি কি এমন সাধু লোক ছিলেন যে মাল খেতেন না। ইউ আর দি প্রুফ। আপনি খাচ্ছেন, আপনার বাবা খাচ্ছেন, আপনার চোদ্দ পুরুষ খেতেন। আমরা সবাই মালের হেরিডিটি নিয়ে চলেছি। সত্যিটাকে আপনি মিথ্যে করতে চলেছেন। আই ওণ্ট অ্যালাউ। অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—' বিকাশ বললে, 'বিশ্বাস করুন আমার পিতামহ অজগাঁয়ে টোলের পণ্ডিত ছিলেন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কলেরায় মারা যান।' ভদ্রলোক একটু হেঁসে অন্ধকার থেকে সামনে ঈষৎ ঝুঁকে চশমার ওপারে চকচকে চোখে বললেন, 'দ্যাটস ইওর স্টোরি। একটা মিথ্যে ঢাকতে আর একটা মিথ্যে। প্রডিউস হিজ ডেথ সার্টিফিকেট, ব্রিং সাম উইটনেস।' বিকাশ বললে, 'সে তো অনেক খরচ।' ভদ্রলোক গেলাসে গেলাসো ঠেকিয়ে স্কিং করে একটা শব্দ করে বললেন, 'আই উইল পে ফর ইট।' বিকাশ বললে, 'বেশ এটা না হয় কনট্রোভার্সিয়াল কিন্তু সসাগরা ভূম্যধিকারী ঈশ্বর গঙ্গানারায়ণ কে আমি জানি না। আমার স্ত্রীর ফ্যামিলির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই হয়ত নেই, আমি সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছি বুড়ো শালাকে টিট করার জন্যে। বুড়ো আমার শাড়ি খুলে নিয়ে ডি এমের মেয়েকে দেখিয়েছে। বংশ তুলে গালি দিয়েছে।' ভদ্রলোক বললেন, 'কি রকম দেখতে?'

'ভীষণ সুন্দর। লক্ষ্মী-সরস্বতী কম্বাইণ্ড। আমার স্ত্রীর চে হাজার গুণ সুন্দর। আমার স্ত্রীর শাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।'

ভদ্রলোক অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন, বিকাশের পাশে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় বললেন, 'ডোণ্ট ওয়ারি মাই ফ্রেণ্ড। সি মাস্ট বি মাস্টার ওয়াইফ। শাড়ি কেন, সামটাইমস সে আমার প্যাণ্টও খুলে নেয়। এণ্ড দ্যাট ওলড ম্যানার মাস্ট বি দি গ্রেট ফাদার ইন ল'। আমি তোমার শাড়ি ফিরিয়ে দোবো। আমার স্ত্রীর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ছি ছি ছি ছি, তোমার শাড়ি খুলে নিয়েছে!' ভদ্রলোক সরু গলায় 'কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য বলতে বলতে বিকাশের চেয়ারের পায়ের কাছে দুমড়ে মুচড়ে ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে ভেঙে পড়লেন।

নজরুল সৃষ্টিবীক্ষণ ঃ লৌকিক দিক

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত

॥ ১ ॥

আধুনিক বাঙলা কাব্য ও সংগীতের জগতে কাজী নজরুল ইসলাম একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। নজরুল গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করলেও কবি হিসাবেই তাঁর পরিচিতি সর্বাধিক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নজরুল তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। সংগীত-রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে নজরুলের কৃতিত্ব তাঁর কবিকৃতির চেয়ে কম নয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোধহয় তা বেশীই হবে।

নজরুল লোকবল্লভ কবি। জনপ্রিয়তার বিচারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সংগেই তাঁর তুলনা করা চলে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কেউই তাঁর মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। পরবর্তীকালেও জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিরা জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে নজরুলের ধারে কাছেও আসতে পারেননি। তবে এই প্রসংগে একটি কথা মনে রাখা উচিত, জনপ্রিয়তা কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই উৎকর্ষের একমাত্র মানদন্ড নয়। তবে জনপ্রিয়তাকে যে কোনো রচনার গুণনির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে বহু ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে রচনার মধ্যে সাময়িক বিষয়বস্তুর উত্তেজনা ও আগ্রহ থাকায় তা সমকালীন পাঠকের মন জয় করে। কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব রচনায় কালোত্তীর্ণ হওয়ার গুণ না থাকায় সেগুলি তেমনভাবে পঠিত হয় না। তাই এক যুগের লোকপ্রিয়তা অন্য যুগে লোকপ্রিয়তার যে আশ্বাস দেবে এমন কথা নেই। কিন্তু আনন্দের কথা, রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের জনপ্রিয়তা ও তাঁর বিষয়ে আগ্রহ এ যুগেও কমেনি।

নজরুল নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরুর মর্যাদা দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। তাঁর ওপর সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমুখ কবিদের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন নয়। তবুও নজরুল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন তা তাঁকে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের এক শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দিয়েছে। এই সময়ে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও হতাশাগ্রস্ত জনগণের ব্যথা, নৈরাশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে সার্থকভাবে তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এইজন্য তিনি চারণকবির মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। জাতির এই চারণকবির ভূমিকাটি এই সময়ে আর কেউই গ্রহণ করতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভূমিকা গ্রহণের একটা আগ্রহ দেখা গিয়েছিল এবং তাঁর কোনো কোনো রচনা এই ভূমিকার প্রসংগে স্মরণীয় হলেও নজরুলই সার্থকভাবে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে নজরুল সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

গানের প্রসংগে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের মতোই নজরুল বহুসংখ্যক সংগীত রচনা করেছেন এবং সংগীতের সংখ্যার দিক দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছেন। অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ সংগীতকারদের তুলনায় নজরুলের জনপ্রিয়তা যে বেশি এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। অন্যান্য গীতিকারদের চেয়ে নজরুলের সংগীতে বাঙলাদেশের লোকমনের প্রতিফলন বেশী ঘটেছে। সেইজন্যেই নজরুলের গান জনমনের বেশী কাছে আসতে পেরেছে।

কবি, গীতিকার ও সুরকার হিসাবে নজরুলের অসামান্য জনপ্রিয়তাও সাফল্যের অন্যতম কারণ তাঁর লোকজীবন ও মন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে বাস্তবনিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মলাভ করে তিনি জীবনে অনেক উত্থান-পতনের সংগে পরিচিত হন। বাল্যকালে তাঁকে চরম দারিদ্র্যের সংগে যুদ্ধ করতে হয়। বর্ধমান গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে মাত্র দশ বছর বয়সে জীবিকা অর্জনের জন্যে সেই মক্তবেই শিক্ষকতার কাজ করেন। এই সময় অর্থের প্রয়োজনে তাঁকে শিক্ষকতার কাজ ছাড়াও নিকটবর্তী গ্রামে মৌলবীগিরি করতে হত। একসময় তিনি হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজার-শরীফের খাদেম হন এবং মাঝে মাঝে মসজিদের এমামতিও করেন। নজরুল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাকে আবদ্ধ না রেখে তিনি নানা মানুষের সংস্পর্শে জ্ঞানলাভের জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আন্তরিক মনোযোগের সংগে কীর্তন, কথকতা, যাত্রাগান, কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি শুনে শিক্ষালাভ করতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ, সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকজনের সংগে তিনি মেলামেশা করে তাঁদের জীবনযাত্রা জানতে সক্ষম হন। ধর্মপ্রাণ বাঙলার গণমানসকে জানার সুযোগ লাভ করেছিলেন বলে নজরুল সব ধর্মের মধ্যে ঐক্যের সুরটি ধরতে পেরেছিলেন এবং সেই জন্যে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমান নৈপুণ্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নজরুল ছেলেবেলা থেকেই বাঙলার লোক-সংস্কৃতির সংগে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবংগে লেটো নাচ নামে এক ধরনের আমোদ-প্রমোদ রীতির প্রচলন ছিল। এই লেটো নাচ অনেকটা যাত্রা গান ও কবির লড়াইয়ের মিশ্রিত সংস্করণ। নজরুল এই লেটো নাচের জন্যে পালাগান রচনা করে অর্থোপার্জন করতেন। এই সময় তিনি শকুনিবধ, মেঘনাদবধ, চাষার সঙ, রাজপুত্র, আকবর বাদশা ইত্যাদি পালাগান রচনা করে তাঁর কবিশক্তির পরিচয় দেন। তিনি এই সময় ইংরেজী বাঙলা মিশ্রিত কমিক গানও রচনা করেন।

এরপর নজরুল তাঁর জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রাম ছেড়ে বর্ধমান জেলার মাথরুণ হাই স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার আগেই বা কিছু পরেই তিনি

স্কুল ত্যাগ করে কবিগানের দলে যোগ দেন: তিনি পালাগান লিখতেন এবং নিজের লেখা গানে সুর দিয়ে সেই গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করতেন। বর্ধমান জেলার অন্ডালের রাণ্ড লাইনের একজন বাঙালী ক্রিশ্চান গার্ডসাহেব কবিগানের আসরে নজরুলের গান শুনে মোহিত হন এবং তাঁকে তাঁর প্রসাদপুরের বাংলোতে বাবুর্চীর কাজে নিয়োজিত করেন। কিন্তু এই মদ্যপ গার্ডসাহেবের সংগে থাকতে না পেরে নজরুল এই বাবুর্চীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আসানসোলে চলে আসেন। এই সময় আবদুল ওয়াহেদের রুটির দোকানে মাত্র পাঁচ টাকা বেতনে একটি কাজ পান। এরপর আসানসোলের এক দারোগা কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ নজরুলের যন্ত্রসংগীতশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁর নিজের গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর-সিমলাতে নিয়ে যান এবং সেখানে দরিরামপুর হাই স্কুলে ফ্রি স্টুডেন্ট হিসাবে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। কাজীর-সিমলা থেকে দরিরামপুর স্কুলের পাঁচ মাইল পথ হেঁটে যাওয়ার সময় নজরুল পূর্ববংগের জনজীবনের বিচিত্র দৃশ্য দেখে তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন নজরুল ময়মনসিংহ ত্যাগ করে রাণীগঞ্জে এসে শিয়ারশোল রাজস্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলে পড়ার সময় সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

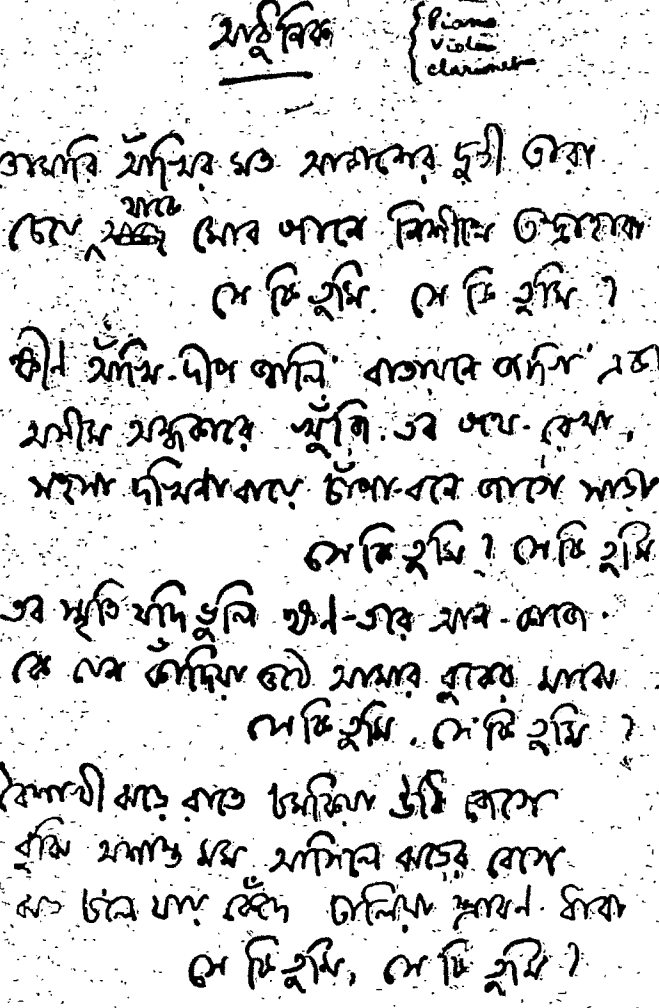

নজরুলের একটি বিখ্যাত গানের পাণ্ডুলিপি। লক্ষণীয় এই—শিরোনামের পাশেই এই গানের সংগে ব্যবহার্য বাদ্যযন্ত্রগুলিও নির্দেশিত।

সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এই স্কুলেই নজরুল প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের সৈনিকরূপে নির্বাচিত হয়ে প্রথমে লাহোর হয়ে নৌশেরাতে চলে যান। সেখানে তিনমাস ট্রেনিং গ্রহণ করে তাঁকে করাচী সেনানিবাসে যেতে হয়।

নজরুলের সৈনিকজীবনের শেষ হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সৈনিকজীবনের কঠোর কর্মব্যস্ততার অবসরে নজরুল সাহিত্যচর্চা করতেন। এই সময় তিনি নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা পাঠাতেন। তৎকালীন 'বংগীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' ছিল বংগীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র। সমিতির অফিস ছিল ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ির দোতালার সামনের দিকের অংশে। প্রখ্যাত শ্রমিকনেতা মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক ও একমাত্র সবসময়ের কর্মী। বংগীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় রচনা প্রকাশের সূত্রে মুজফ্ফর আহমদের সংগে নজরুলের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তাঁর সান্নিধ্য নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পল্টন ভেঙে যাওয়ার কয়েকদিন পর নজরুল মুজফ্ফর আহমদের পরামর্শে কলকাতায় ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে বংগীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির অফিসে এসে ওঠেন। এরপর নজরুলের জীবনে নানা পরিবর্তন দ্রুত ঘটতে শুরু করে। একদিকে যেমন কবি, সাংবাদিক, গীতিকার ও সুরকার ইত্যাদি হিসাবে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহ, কারাবরণ, পুত্রের মৃত্যু, যোগাসক্তি ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। নার্গিস বেগমের সংগে আবদ্ধ (বিবাহচুক্তি) হয়ে তা ভেঙে যাওয়ার পর কুমিল্লার গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তের সংগে তাঁর বিবাহ হয়। হিন্দু পরিবারে বিবাহের সূত্রে তিনি হিন্দু বাঙলা সংস্কৃতিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণের সূত্রে তিনি পূর্ববংগের লোকজীবনের সম্যক পরিচয়লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের সংগেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। জীবনের একটা পর্যায়ে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থক হলেও নজরুলের রচনায় বিপ্লবের কথাই বেশী ধ্বনিত হয়েছে।

এতক্ষণ নজরুলের জীবন এবং বিশেষ করে তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হল সেগুলি থেকে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বাঙলার লৌকিক মন ও জীবনের অভিজ্ঞতা নজরুল-সৃষ্টির পেছনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর সমসাময়িক কোনো কবি, সংগীতকার ও সুরকারের এই ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তাঁদের কেউই নজরুলের মতো চারণকবির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। যে জনপ্রিয়তার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছি তার মূলে এই চারণকবির ভূমিকার বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবন-

যোগ্য। নজরুল-সৃষ্টির এই লৌকিক দিকটি তাঁকে অন্যান্য কবি, সংগীতকার ও সুরকারের তুলনায় অনেক বেশী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

নজরুল ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে খুব গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন না। কীটস, শেলী, ব্রাউনিং প্রমুখ কিছুসংখ্যক কবির কবিতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, পুরাণ প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তির প্রচুর প্রমাণ আছে। গ্রাম-বাঙলায় অনেক আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলন বিশেষ করে মুসলমান সমাজের মধ্যে দেখা যায়। নজরুলের অনেক রচনায় আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহারে গ্রাম বাঙলার এক-শ্রেণীর লোকের বিশেষ মেজাজ ও রুচি ফুটে উঠেছে।

আমরা এবার নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও গীতিসৃষ্টির মধ্যে তাঁর লৌকিক দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করব।

॥ ২ ॥

নজরুলের কাব্যগ্রন্থগুলির বিষয়-বস্তু অনুধাবন করলে তিনটি ধারার অস্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্য-বাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'জিঞ্জীর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে কবির বিদ্রোহী রূপই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর প্রেমিক রূপের অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'চিত্তনামা' ও 'মরু-ভাস্কর' জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ। এই তিনটি ধারার কবিতাবলীর রচনায় নজরুল বাঙলার লৌকিক উপাদান অর্থাৎ তার লৌকিক ভাব ও ভাষাকে বিশেষভাবে স্থান দেওয়ায় তাদের লৌকিক মেজাজটি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং সেগুলি সাধারণের হৃদয়বেদ্য হওয়ায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার প্রতিফলন থাকলেও তিনি বিশেষভাবে বাঙলার কবি এবং বাঙালীর কবি। এইটি তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

নজরুলের বিদ্রোহীভাবব্যঞ্জক কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত এবং প্রথম প্রকাশিত 'অগ্নিবীণার' মধ্যে প্রচুর আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাঙলা ভাষায় এক আশ্চর্য গতি ও দীপ্তি সঞ্চারিত হয়েছে। তাছাড়া অনেক দেশজ

স্বপরিজন নজরুল : কোলে দুই ছেলে, পাশে সহধর্মিণী প্রমীলা

কথার সুষ্ঠু প্রয়োগও দেখা যায়। ইমেজ বা ভাবরূপচিত্রের মধ্যে পল্লীবাঙলার পরিচিত পরিবেশ, দেব-দেবী ইত্যাদির বাধাহীন ব্যবহার নিঃসন্দেহে তাঁর বিদ্রোহী রূপকে সাধারণের কাছে আবেদনময় করে তুলেছে। এই একই রীতি তাঁর বিদ্রোহীভাবমূলক অন্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও দেখা যায়। তবে পরবর্তীকালে তাঁর বিদ্রোহীভাব-ব্যঞ্জক কাব্যগ্রন্থে 'অগ্নিবীণা'র তুলনায় আরবী, ফারসী শব্দের কম প্রয়োগ পরি-লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মর্তব্য যে, নজরুলের বিদ্রোহীভাবের সঙ্গে প্রেমিকভাবের কোনো বিরোধ নেই। প্রেমের প্রকৃত রূপের প্রকাশের জন্যেই তাঁর বিদ্রোহ। এই প্রেম কখনো মানবিক ও সামাজিক প্রেম, কখনো বা ব্যক্তিক দেহজ প্রেমের রূপ ধারণ করেছে। আর এই উভয় রূপের পরিস্ফুটনেই তাঁর মধ্যে লৌকিক ভাবচিন্তা ক্রিয়াশীল। 'অগ্নি-বীণার' বিদ্রোহী কবি অনায়াসে ঘোষণা করতে পারেন,

"আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল
করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার
কাঁকন-চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার
আঁচর কাঁচলি নিচোর।
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল
উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী,
বেণু-বীণে গান গাওয়া।"

এক অনবদ্য লৌকিক মেজাজ ও আবেদন ফুটে উঠেছে যখন কবি 'অগ্নি-বীণা'র 'কামাল পাশা' কবিতায় হতভাগ্য তরুণ মৃত সৈনিকদের দুঃখ-যন্ত্রণায় আকুল হয়ে বলে উঠেছেন,

প'চে মরিস পারখাতে, মা-বোনেরাও
শুনে বলে 'বাহা'।
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী
কেউ কি রে নেই? আহা! —
আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ
সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত চেলী প'রে,
আঁধার শাড়ী প'রবে এখন প'শবে যে
এবার তোরা সত্য বল্॥"

এই ঋজু লৌকিক ভাষাভঙ্গী নজরুলকাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তার অন্যতম গুণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

নজরুলের বিখ্যাত 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতা থেকে আরও একটি অংশ স্মরণ করা যাক।

"বোঝে না'ক যে সে চারণের বেশে, ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি? দিন যাবে এবে পান খেয়ে!
র'বে না'ক ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি-গাড়ী,
চাঁদা চাই, তা'রা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে দেখ চেয়ে'।
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায় নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?"

উদ্ধৃতাংশে নজরুলের লৌকিক ভাবনা যে লৌকিক ভাষাভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে তার আবেদন অব্যর্থ হতে বাধ্য। এই গুণটির জন্যেই তিনি বিশেষভাবে চারণকবির জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাঙলার লৌকিক জীবনে স্বরাজের মিথ্যা আশ্বাস ও সেই আশ্বাসের আশাভঙ্গ নজরুল এক মর্মান্তিক বাস্তবতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তোর গোরের বাসর-ঘরে।—
ভাবতে নারি, গোরের মাটি ক'রবে মাটি
এ সুখ কেমন ক'রে—
সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে।
বিদায়-বেলায় আরেকটিবার
দিয়ে যা ভাই চুমো॥
অনাদরের ভাইটি আমার!
মাটি মায়ের কোলে এবার ঘুমো॥"

এইরকম বহু উদাহরণ নজরুলের কবিতাবলী থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আমি 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতা থেকে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এখানে দেখা যাবে আরবী ফারসী দেশজ শব্দের প্রয়োগ ও লৌকিক ভাষারীতি কি অসাধারণ শক্তিতে তাঁর রচনাকে আবেদনময় করে তুলেছে!

"নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হ'লি
আপন ফাঁকির আফ্‌সোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই,
নাই তলোয়ার খাপ-কোষে।

নজরুলের প্রেমভাবমূলক কবিতার মধ্যে লৌকিক ভাব ও ভাষারীতি বিদ্রোহীভাবব্যঞ্জক কবিতার তুলনায় বেশী আশ্রিত হয়েছে। তাঁর 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর অনেক কবিতা সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য। তাঁর প্রেমভাব প্রকাশে পল্লী-বাঙলা তার সমস্ত রূপ কথা-ধ্বনি-রঙ নিয়ে হাজির হয়েছে। 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'চড়ই হাওয়া' কবিতার একটি অংশ এই প্রসঙ্গে পড়া যাক। হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ার স্মরণে বাথিত কবি বলে উঠেছেন,

"বউল ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের পীড়ায় টস্‌টসে বুক ঝুঁকছে কোলাযজম!
কামরাঙারা রাঙল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায়, কে দেবে দাম!"

গ্রাম বাঙলার রূপের মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর প্রিয়ার রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে লৌকিক। এই প্রসঙ্গে 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতার একটি স্তবক স্মরণ করা যেতে পারে। প্রিয়ার সম্বন্ধে কবির উক্তি,

"মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটীরে,
খুশীর হাতে করবে সেবা ধূলি-মুঠিরে।

তাই হলি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ,
সত্য কথা বলতে ডরাস,
তোরা আবার করবি কাজ!
ফোঁপরা ঢোঁকির নেইক লাজ!
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই
ঘর ছুটিস সব রাম-ছাগল!
মুক্তি তোদের খুব বুঝেছি,
দুধকে দুধ আর জলকে জল!

আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাস্‌বে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে
'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের 'তোমারে পড়িছে মনে' কবিতায় নজরুল স্মরণপারের প্রিয়ার উদ্দেশে লৌকিকভাবে ও ভাষায় জানিয়েছেন,

তোমারে পড়িছে মনে
আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে,
যূথিকার আশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে
কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে—
তোমারে পড়িছে মনে।
হয়ত তেমনি আজি দূর বাতায়নে
ঝিলিমিলি-তলে
ম্লান লুলিত অঞ্চলে
চাহিয়া বসিয়া আছ একা,
বারে বারে মুছে যায় আঁখি-জল-রেখা।
বারে বারে নিভে যায় শিয়রের বাতি,
তুমি জাগ, জাগে সাথে বরষার রাতি।"

এই রকম অজস্র উদাহরণ নজরুলের প্রেমব্যঞ্জক কবিতাবলী থেকে আহরণ করা যেতে পারে। নজরুলের এই ধরনের কবিতা জসীমউদ্দিন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের পল্লীবিষয়ক কবিতাবলীর প্রেরণা জুগিয়েছে সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাববস্তুর বিচারে নজরুলের পাঁচ শ্রেণীর গান দেখা যায়, যেমন স্বদেশাত্মক গান, মানবিক প্রেমগীতি, ভক্তিমূলক গান, প্রকৃতিগীতি ও হাসির গান। এই পাঁচ শ্রেণীর গানে লৌকিক ভাব, ভাষা ও রীতি বিশেষভাবে অবলম্বিত হয়েছে। লৌকিক ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই নজরুল অসামান্য যৌথ-সঙ্গীত রচনা করতে পেরেছিলেন। কোরাস-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তুলনীয় হতে পারেন। মার্চ-সঙ্গীতে বাঙলা গানের ক্ষেত্রে নজরুলের জুড়ি নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'অগ্র-পথিক হে সেনাদল' (জিঞ্জীর), 'চল্ চল্ চল্' (সন্ধ্যা), 'আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল' (সর্বহারা) ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' (সর্বহারা) গানটি কোরাস সঙ্গীতের ক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে অতুলনীয়।

স্বদেশাত্মক ভাবে উদ্দীপিত হয়ে নজরুল বাঙলা দেশের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্যে পল্লী বাঙলাই মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে। বাঙলাদেশের ছয় ঋতুর পটভূমিকায় অঙ্কিত বাঙলা মায়ের

উদ্দেশে 'বন-গীতি' গ্রন্থের একটি গানে তাঁর উক্তি,

"নমঃ নমঃ নমো
চির-মনোরম
গ্রীষ্মে নাচে বামা
লহসা বরষাতে
শরতে হেসে চলে
গাহিয়া আগমনী-
হরিত অঞ্চল
ফেরে সে মাঠে মাঠে
শীতের অলস বেলা
ফাগুনে পরে সাজ

বাঙলা দেশ মম
চির-মধুর।..
কাশ-কেশেখী ঝড়ে,
কাঁদিয়া ভেঙে পড়ে,
শেফালিকা-তলে
গীতি বিধুর॥
হেমন্তে দুলারে
শিশির-ভেজা পায়ে,
পাতা ঝরার খেলা
ফুল-বধূরে॥"

'সুর-সাকী' সংগীতগ্রন্থের একটি গানেও বাঙলা মায়ের রূপবর্ণনায় নজরুলের কণ্ঠে শুনি,

"কে বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল্-বদনে॥

"আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে,
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বিরাগিনী বীণ্ বাজায়॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লী গ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে সাদা খড় মাটি,
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা বারি ছিটায়॥"

লৌকিক ভাব, ভাষা ও রীতির অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের মানবিক ভাবমূলক সংগীতগুলিতে। এই ধরনের প্রেমসংগীতগুলির মধ্যে গজল গান রচনায় নজরুল দ্বিতীয়রহিত। গজল পারস্য দেশের এক শ্রেণীর লঘু প্রেমসংগীত। এই গানে অস্থায়ী অংশটি ছন্দে গাওয়া হয় এবং বাকী অংশগুলি ছন্দোহীন আবৃত্তির রীতিতে গান করা হয়ে থাকে। এই আবৃত্তির অংশগুলিকে বলা হয় 'শায়র'। নজরুলের আগে অতুলপ্রসাদ সেন গজল রচনা করেন। কিন্তু তাঁর গানে বাঙলা গানের প্রকৃত চরিত্রটি যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়নি বলে তা বাঙলা জনসমাজে বিশেষভাবে গৃহীত হয়নি। অন্যদিকে নজরুল পারস্য গজলের সুরটিকে অনন্যসাধারণ দক্ষতায় বাঙলা গানে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে তা এক সময় বাঙলা জনসমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল এবং আজও এর আবেদন লক্ষ করা যায়। বাঙলার আপামর জনসমাজের মধ্যে এই গজলগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাদের লৌকিক ভাষা ও ভাব। নজরুলের অসাধারণ জনপ্রিয় একটি গজলের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই সূত্রে পড়া যাক।

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজো তা'র ফুল-কলিদের ঘুম টুটে নি, তন্দ্রাতে বিলোল॥
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় করেছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল-গাওয়া, মৌমাছি বিভোল॥
কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' আসবে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে জাগবে রে ঘুম ঝুমুরে ঝোর কপোল॥"

আর একটি গজলের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিও পড়া যেতে পারে।

ঝিমিয়ে আসে ভোমরা-পাখা,
ঘুমুর চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
দূর্-দালানে ভোর গগনে॥
লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়।
মালিকা-সম বঁধুরে জড়ায়
মালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে॥

এই সূত্রে নজরুলের আরও অনেক বিখ্যাত গজলের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি বাল্য ও কৈশোরকালে যে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন তাই তাঁকে এই সব গজল রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। লৌকিক জীবন ও ভাবপ্রীতিই তাঁকে পারস্য গজলের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

ভক্তিমূলক গানের ধারায় তিনি লৌকিকভাবে শ্যামাসংগীত ও ইসলামী-সংগীত সমান দক্ষতায় রচনা করেছেন। বৈষ্ণব সংগীত প্রণয়নেও তাঁর কৃতিত্ব দেখা যায়। প্রকৃতি সংগীত ও হাসির গানেও তিনি বাঙলার লৌকিক ভাবকে রূপায়িত করেছেন। কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি গ্রাম বাঙলার প্রাণ সুরসম্পদকে তিনি নতুন মর্যাদায় ভূষিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর বাল্যকালের লেটো নাচ, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তাঁর নিদারুণ দারিদ্র্যের মর্মজ্বালা তাঁকে বাঙলা জনজীবনের ব্যথা-বেদনার শরিক করে তুলেছে। তাঁর সৃষ্টিতে বাঙলার লৌকিক জীবন মূর্তিময় হয়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

নজরুল-সৃষ্টির দুটি প্রধান ধারা কবিতা ও গান সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'ল তা তাঁর অন্যান্য রচনা সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে। তিনি তাঁর রচনার সর্বত্রই লৌকিক উপাদান গ্রহণ করে তাকে জনজীবনমুখী করে তুলেছেন। এইখানেই তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় শক্তি ও আবেদন নিহিত। এই কারণেই নজরুল স্বাভাবিকভাবেই চারণকবির মর্যাদা লাভ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত একটি কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নজরুল তাঁর চারণকবির ভূমিকার জন্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আবার এই চারণকবির ভূমিকা গ্রহণের পেছনে ছিল তাঁর বাঙলার লৌকিক ভাবচিন্তা ও ভাষা-ভঙ্গীর বিশেষ শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা। কিন্তু চারণকবির ভূমিকায় তাঁর স্বাভাবিক কবিত্ব যতটা জনপ্রিয়তা এনেছে, ততটা উৎকর্ষ আনতে পারে নি। তাই নজরুলের রচনা অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষের চূড়ার অভিমুখে গিয়েও সেখানে পৌঁছতে পারেনি এবং অনেক রচনাই পূর্বেকার রচনার ক্লান্তিকর অনুবৃত্তি ও একঘেয়েমির দোষে দুষ্ট। সংখ্যার তুলনায় তাঁর রচনায় গুণের পরিমাণ কম। যাই হোক, নজরুল তাঁর জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বাঙলার লৌকিক ভাবচিন্তা ও ভাষাভঙ্গীকে অন্তরঙ্গভাবে আয়ত্ত করেছিলেন বলে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় চারণকবির ভূমিকাটি সার্থকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই ভূমিকাটি বাঙলার সংস্কৃতি জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কোমিক্যাল ডিটেকটিভ

অদ্রীশ বর্ধন

মধুসূদনবাবুর নিবাস আমার বাড়ীর একখানা বাড়ী পরে। বাংলা প্যাটার্নের একতল বাড়ী। ছিমছাম সাজানো।

মধুসূদনবাবুর স্ত্রী বিদুষী এবং রুচি-সম্পন্না। বাড়ীটিকে আর্ট গ্যালারীর মত সাজিয়ে রেখেছেন তিনিই। একমাত্র ছেলে নরেন্দ্রপুরের আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকে এবং পড়ে। শুনেছি ছেলেটি বাপ-মায়ের মতই মেধাবী।

মধুসূদনবাবু এ-পাড়ায় এসেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিলেন। সেকেলে মানুষ। তখনো বিয়ে করেন নি। খর্বকায়। মাথাজোড়া টাক। বুদ্ধি-উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাট। পরিষ্কার চোখ দুটিতেও যেন বুদ্ধি মাখানো। বয়স তখন চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমার বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসলেন সোফায়। ঝাড়া এক ঘণ্টা গল্প করে বিদায় নিলেন। তারপরেও এসেছেন মাঝে মাঝে। হাতে সময় পেলেই আসতেন। কিন্তু সময় পাওয়াটাই ছিল ওঁর সমস্যা।

কারণ, উনি এ-পাড়ায় এসেই কারখানা খুলেছেন রেলঘাটার কাছে বিবিবাগানে। গবেষণাগারটিও ঐখানে। মধুসূদনবাবুর মুখেই শুনেছি উনি একটা নতুন ধরনের সিনথেটিক ফাইবার আবিষ্কারের জন্যে রিসার্চ করছেন। নাইলন, টেরিন, ডেক্রনের চাইতেও অনেক সস্তায় এই সুতো বানানো সম্ভব। কয়েকজন মারোয়াড়ী ওঁকে অর্থ-সাহায্য করছেন। বোম্বাইতে শুরু করেছিলেন গবেষণা। কিন্তু আমেদাবাদী জাপড়কল্ল মালিকদের চক্রান্তে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হয়েছে কলকাতায়।

পাড়ায় বসবাস শুরু করে বিয়ে করলেন খুব ঘটা করে। ছেলেও হল। ছেলের বয়স এখন ছয়।

মধুসূদনবাবুর গবেষণা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি কয়েকটা সিনথেটিক ফাইবার বানিয়েছেন বটে, কিন্তু মনে ধরেনি। কিন্তু যে-রকমটি চাইছেন, সে-রকমটি পাচ্ছেন না। উদয়াস্ত খাটছেন। আজকাল আর আড্ডা মারতেও আসেন না। ওঁর গিন্নীর সঙ্গে একদিন বাজারে দেখা হয়েছিল। শুনলাম, গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনের মত সুতো পাওয়া গিয়েছে। সস্তা, টেকসই এবং বাহারী।

তার দিন সাতেক পরেই রাত দশটা নাগাদ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো সারা বিবিবাগান। শূন্যপথে জ্বলন্ত কাঠ ছিটকে এসে পড়ল একটা ৩৮ নম্বর স্টেট বাসের ওপরে। আগুনের লকলকে শিখা লাফিয়ে উঠলো আকাশ লক্ষ্য করে। পিলপিল করে লোক বেরিয়ে এল আশপাশের কারখানা আর গেরস্তবাড়ী থেকে। প্রত্যেকেই এক-বাক্যে বললে, আতসবাজীর গুদোমেও আগুন লাগলে নাকি এ রকম ভয়ংকর শব্দ হয় না। কি ছিল মধুসূদনবাবুর কারখানায়?

দমকল এল। আগুন নেভানো হল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেল একটা কাঠকয়লার মত পোড়া লাশ। মাথার টাক আর আঙুলের আংটি দেখেই বোঝা গেল, কার লাশ।

* * *

কেসটা গোলমেলে। তাই তদন্তের ভার পড়ল জয়ন্তর ওপর। প্রাথমিক তদন্ত শেষ

করে আমার বৈঠকখানায় বসে সেই কথাই বলছিল ও।

বলছিল—"মধুসূদনবাবুকে শেষবারের মত জীবন্ত অবস্থায় দেখেছে ও'রই দারোয়ান। একটা এ্যালার্ম ক্লক কিনতে পাঠিয়েছিলেন। ঘড়িটা দিতে যেতেই ল্যাবোরেটরীর মধ্যে থেকে তেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মধুসূদনবাবু। এমনিতে উনি ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু কাজের সময় ব্যাগড়া পড়লে নাকি মাথার ঠিক থাকে না। দারোয়ান তাই ঘড়ি দিয়েই সরে পড়েছিল নিজের জায়গায়। তখন রাত সাড়ে ন'টা। দশ মিনিট পরেই বাড়ীতে ফোন করেছিলেন মধুসূদনবাবু। ওয়াইফকে বলেছিলেন, কাজ শেষ, আর আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে যাবেন।"

"কিন্তু পৌঁছোন নি?" ইন্দ্রনাথ গালের ব্রন খুঁটতে খুঁটতে জিজ্ঞেস করল।

"না। বিস্ফোরণ ঘটেছে ঠিক তার পরেই।"

সোফার কোণে হেলান দিয়ে সুন্দর চোখ দুটি মেলে ধরে শুনছিল কবিতা আস্তে আস্তে বললে—"নিভার কি কপাল!"

"শুধু বিধবা হল বলে নয় বৌদি, তখের ভিখিরীও," বললে জয়ন্ত।

"কেন? মধুসূদনবাবু কি কপর্দকশূন্য?"

"হ্যাঁ, ব্যাংকে কানাকড়ি নেই। নিজের এবং পরের সব টাকাই গবেষণায় লাগিয়েছিলেন। কাগজপত্রগুলোও যদি পাওয়া যেত, তাহলেও ভদ্রমহিলার টাকার অভাব থাকত না। কিন্তু সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সিনথেটিক ফাইবার আবিষ্কারের কোন কাগজপত্রই নেই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গবেষণা।"

"তাই যদি হয় তো কেসটা গোলমেলে হয় কি করে?" শুধোলো ইন্দ্রনাথ।

জয়ন্ত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, "দারোয়াড়ীদের বিশ্বাস এটা স্যাবোটেজ।"

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। —"সস্তার সুতো বাজারে বেরোলে যাদের ব্যবসা লাটে উঠবে, তাদের কাজ?"

নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল জয়ন্ত।

ঠোঁট কামড়ে বললে কবিতা—"পিশাচ!"

আমি বললাম—"সংসার বড় বিচিত্র। অর্থ এবং স্বার্থের জন্য সবই সম্ভব।"

ইন্দ্রনাথ চোখ কুঁচকে বললে—"মধুসূদনবাবুকে তাহলে খুন করা হয়েছে। সেটা আগুন লাগানোর আগে, না পরে?"

"আগে। পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেলেও করোটির পেছনে হাতুড়ির চোট লক্ষ্য করেছি। ময়না তদন্তে তা প্রমাণিত হবে। চোখদুটোও খুবলে নেওয়া হয়েছে। অ্যাসিডে হাত আর মুখ একেবারে জ্বলে গেছে। হাতের আংটি আর মাথার টাক দেখে লাশ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।"

"ও'র স্ত্রীর কাছে নিশ্চয় ঘুরে এলি?"

"হ্যাঁ।"

আরও দু-চার কথার পরে বিদায় নিল জয়ন্ত। অমনি ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বৌদি, মধুসূদনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে না?"

"তুমি যাবে?" স্থির চোখে তাকিয়ে বলল কবিতা।

"তুমি যদি যাও।"

"চলো।"

আমিও গেলাম ওদের সঙ্গে। সামাজিক কর্তব্য। সদ্যবিধবা নিভাননীকে দেখে কিন্তু মনে হল না খুব শোক পেয়েছে। একটু যা স্তব্ধ—তার বেশী কিছু নয়। নিভার সঙ্গে বিশ বছরের তফাৎ মধুসূদনবাবুর। সেইজন্যই বোধ হয় শোক ততটা স্পর্শ করেনি সদ্যবিধবাকে। ডাগর চোখের কোলে রাত জাগার কালি। মুখটি সুশ্রী—কিন্তু থমথমে। আটপৌরে নীল শাড়ী পরে দু' হাত কোলের ওপর জড়ো করে চুপ করে বসে রইল কৌচে।

"ছেলেকে খবর দিয়েছেন?" প্রশ্ন করল কবিতা।

"না।" শুষ্ক কণ্ঠ নিভাননীর।

কবিতা আর কথা খুঁজে পেল না। ইন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই কোন কথা বলে নি। আর্ট গ্যালারীর মত সুসজ্জিত বসবার ঘরে দেওয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। এখন উঠে গিয়ে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"এই কি আপনার ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

"বাপের মতই কটা চোখ পেয়েছে দেখছি।"

চোখের ভুল কিনা জানি না—পলকের জন্য মনে হল নিভাননীর দু'চোখে যেন ছায়া ভেসে গেল। ঈষৎ শক্ত গলায় বললে —"ওর বাবার চোখ কটা নয়।"

"তাহলে বোধ হয় পূর্বপুরুষদের কেউ পিঙ্গলাক্ষ ছিলেন," জোর করে হেসে বলল ইন্দ্রনাথ।

"হতে পারে," শক্ত মুখ নিভাননীর। স্পষ্টতঃ, এ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন তার অভিপ্রেত নয়। এ প্রশ্নের সময়ও এটা নয়। আমিও বিরক্ত হলাম ইন্দ্রনাথের ওপর।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললাম—"লাশ পেতে কিন্তু দেরী হবে। পোস্টমর্টেম হচ্ছে তো। সৎকারের কি ব্যবস্থা করবেন?"

"হিন্দু সৎকার সমিতিকে খবর দিয়ে মুগাঙ্কবাবু। আমার আর কেউ নেই।" এই প্রথম নিভাননীর কণ্ঠে আর্দ্রতা লক্ষ্য করলাম। মানুষ হঠাৎ শোকে পাথর হয়ে যায়। কিন্তু সহানুভূতির ছোঁয়া পেলেই শিলাও গলতে থাকে।

আমি বললাম—"আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন। আমি তো রয়েছি।"

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ইন্দ্রনাথ পর পর তিনটে অদ্ভুত কথা বলল আপন মনে—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।" তারপর—ছোকরার চোখ কটা কেন? সবশেষে—নিভাননী শোকে ভেঙ্গে পড়েনি কেন?

রাগ করে কবিতা বললে—"ওর অ্যাডভার আছে বলে।"

সন্ধ্যে হতেই ইন্দ্রনাথ ফের এল আমার বাড়ী। বললে—"জয়ন্তর আসার কথা আছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আনবে।"

আমি বললাম—"সিনথেটিক সুতোর কারবারে যাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা মধুসূদনবাবুর আবিষ্কারে, তাদের লিস্ট তৈরী করছে জয়ন্ত?"

"করছে। মারোয়াড়ীরা খুব টাকা ছড়াচ্ছে। আমাকেও হাজার টাকা বায়না দিয়ে গেছে।"

"হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিজে না ফেঁসে যাস।" বললাম আমি—"এতবড় ল্যাবোরেটরী যারা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে—তারা তোর মত চুনো-পুটিকেও গুমখুন করতে পারে।"

"দেখা যাক," বলে চুপ করে বসে রইল ইন্দ্রনাথ। কফি পর্যন্ত খেল না।

একটু পরেই এল জয়ন্ত। পড়ে শোনালো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। জয়ন্তর অনুমান যথার্থ। পেছন থেকে হাতুড়ির ঘায়ে মৃত্যু হয়েছে মধুসূদনবাবুর। ল্যাবোরেটরী থেকে পোড়া কাগজপত্র ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ছাই নিয়ে মাইক্রোকেমিক্যাল টেস্ট করা হয়েছে। খান কয়েক পোড়া কাগজ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে কিছু তত্ত্বকথা পাওয়া গিয়েছে, আর একটা নাম—বাণীব্রত ভৌমিক।

ইন্দ্রনাথ ভ্রূকুটি করে বললে—"বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ব্রহ্মতত্ত্বের কাগজ কেন?"

"মনে হয় কোন প্যামফ্লেট। —এই বাণীব্রত ভৌমিকটি ব্রহ্মবাণী শোনাতেই এসেছিল ল্যাবোরেটরীতে—উদ্দেশ্য ছিল নরহত্যা।"

চুপ করে হাতের চেটোর দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। আমি আর জয়ন্ত দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ঘর নিস্তব্ধ। এমন সময়ে কফি আর বাদাম ভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকল কবিতা।

বললে—"কি হল? সব চুপচাপ কেন?"

আমি বললাম, কেন। বাণীব্রত ভৌমিকের নাম শুনেই কিন্তু কবিতা বলে উঠল—"ওঃ, তোমরা না এক-একটা—আরে বাণীব্রতবাবু তো প্রায়ই আসতেন মধুসূদনবাবুর বাড়ীতে।"

চোখ তুলল ইন্দ্রনাথ। কিছু বলল না।

কবিতা বললে—"বাণীব্রতবাবুর মাথায় পোকা আছে। থিয়সফির পোকা। বলেন, অদৃশ্য সহায়ক না থাকলে নাকি আমরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়তাম।"

জয়ন্ত খুব মৃদুস্বরে বললে—"বৌদি, বাণীব্রত ভৌমিকের মাথার পোকাটা থিয়সফির নয়—খুনের। বড় ধড়িবাজ ভদ্রলোক। অ্যাসিড আর আগুন দিয়ে ল্যাবোরেটরী ছাই করে দিয়ে ভেবেছিলেন রেহাই পাবেন।"

কবিতা থ হয়ে গেল। একটু পরে সামলে নিয়ে বললে—"আশ্চর্য! বেড়াল-চোখো লোকগুলোর মতিগতিও বোঝা ভার।"

এতক্ষণে যেন কমলহীরে জ্বলে উঠল ইন্দ্রনাথের দুই চোখে। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে চোয়ালের হাড় শক্ত করে—"বেড়ালচোখো, তাই না? নিভাননীর ছেলের চোখও তাই। মোটিভটা এবার স্পষ্ট হল জয়ন্ত?"

"স্যাবোটেজ নয়—অবৈধ প্রেম?" জয়ন্ত চকিতে বুঝে নিয়েছে।

"দয়া করে লাশটার এক্স-রে ফটো তোল এবং কোল্ডস্টোরেজে রাখার ব্যবস্থা করো। আর মধুসূদনবাবুর বাড়ীর ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে চলো।"

"বাণীব্রত ভৌমিককে—"

"দেখো চেষ্টা করে ধরতে পারো কিনা।"

এর পরে দুটো দিন ইন্দ্রনাথ এবং জয়ন্তর টিকি দেখতে পেলাম না। বাণীব্রত ভৌমিকের টিকি আবিষ্কারের চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরছে বোধ হয়। এদিকে নিভাননী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছেলে চলে এসেছে নরেন্দ্রপুর থেকে মুখাগ্নির জন্যে—কিন্তু লাশ বার করা যাচ্ছে না ঠাণ্ডাঘর থেকে।

দু'দিন পর বম্বসেল নিউজটা বোমার মতই ফেটে পড়ল খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। চিৎপুরের একটা গলির মধ্যে তিনতলার হোটেলে পুলিশ হানা দিয়েছিল মধুসূদনবাবুর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। কিন্তু হত্যাকারী পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে আত্মহত্যা করে। ঘরের ভেতর থেকে গুলির শব্দ পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে পুলিশ এবং দেখে টাক মাথা রক্তাপ্লুত একটি দেহ।

দেহটি স্বয়ং মধুসূদনবাবুর!

খবরের কাগজ হাতে হতভম্ব হয়ে বসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি আমরা স্বামী-স্ত্রী, এমন সময়ে বাজল টেলিফোন। তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের বিদ্রূপ-তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর।

"লেখক নাকি? কাগজ পড়েছো?"

"হাতে নিয়ে বসে আছি।"

"বসেই থাকো। —মধুসূদনবাবু যে নিজেই খুনী, এটা তোমার গোড়াতেই আঁচ করা উচিত ছিল।"

"কি করে?"

"লাশটার মুখ আর হাত এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন? মুখের চেহারা আর আঙ্গুলের ছাপ নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে। ড্যাকটিলোসকপি মানে ফিংগারপ্রিন্ট সায়ান্স নিশ্চয় ধরে ফেলত নিহত ব্যক্তির পরিচয়। তাই এত হুঁশিয়ারি। একই কারণে সন্দেহ গিয়ে পড়ল চোখের ওপর।"

"নিভাননীর ছেলের চোখের ওপর?"

"আরে না। পুড়ে কাঠকয়লা লাশটার চোখদুটো খুবলে নেওয়া হয়েছিল মনে নেই?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—"

"কেন জানো? পাছে চোখ দেখে কেউ লাশ সনাক্ত করে ফেলে—তাই।"

"চোখ দুটো তাহলে—"

"কটা রঙের এবং লাশটা বাণীব্রত ভৌমিকের। এক ঢিলে দু'পাখী মেরেছেন মধুসূদনবাবু। ভুয়ো গবেষণার নামে অনেক টাকা সরিয়েছিলেন—আর অসতী বউকেও শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল। বাণীব্রতর মাথায় টাক থাকায় সুবিধে হয়ে গেল—শুধু নিজের আংটিটি পরিয়ে দিতে হল বাণীব্রতর আঙ্গুলে—হাতুড়ি মেরে মারবার পর।"

"শুধু দুটো প্রশ্নের জবাব দিবি?"

"দেবো।"

"ডেডবডি এক্স-রে করতে বললে কেন? মধুসূদনবাবুর বাড়ীর ডাক্তারের কাছে যেতে চাইলি কেন?"

"প্রমাণের জন্য। ডেডবডি এক্স-রে করে কঙ্কালের চেহারা পাওয়া গেল, তাই নিয়ে মধুসূদনবাবুর হাউস ফিজিসিয়ানকে দেখাতেই তাঁর সন্দেহ হল। তিনি বললেন, কঙ্কালের দাঁতের গড়ন, মুখের গড়ন এবং বুকের গড়ন মোটেই মধুসূদনবাবুর মত নয়।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

নিয়মিত পড়ুন ও অন্যকে পড়ান

বছরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়।

বার্ষিক চাঁদা : ৭-৫০ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা : ৩-৭৫ টাকা।

প্রতি সংখ্যা ১৫ পয়সা

মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা :- "ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশানস্",
গভর্নমেণ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২৩, আর, এন, মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

(ক্রশড্ চেক বা পোস্টাল অর্ডারও এই নামে পাঠানো যেতে পারে।)

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা :

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি
(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)..... ৪-৫০

নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি
(প্রথম সংস্করণ)..... ৪-০০

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি
(প্রথম সংস্করণ)..... ২-৫০

হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি
(প্রথম সংস্করণ)..... ৪-৫০

(পুস্তক-বিক্রেতাদের পাইকারী ক্ষেত্রে ২০% কমিশন)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

সুকান্ত মূল্যায়ন..... ৫-০০

পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা..... ১৫-০০

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি..... ৫-৫০

গঙ্গাসাগর মেলা..... ২-০০

(প্রত্যেকটি বই তথ্যের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান)

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, ৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র : নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা—১

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১০৬২৭।৭৭

সীমানা

দার্জিলিং থেকে 'ঘুম' স্টেশন ছুঁয়ে যে রাস্তাটা নেমে মিরিক উপত্যকার দিকে চলে গেছে, তারই একপাশে, ঘুম থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটি ছোট্ট জনপদের নাম—'সীমানা'। পিচঢালা পাকা রাস্তা, রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে, উঁচু-নিচু হতে হতে এগিয়ে চলেছে। তার কোথাও কোথাও এমন বৈশিষ্ট্য যে, একপাশে 'নেপাল', অন্য-পাশে 'ভারত'। আসলে জনপদটি সীমান্তে অবস্থিত বলেই বোধহয় নামাঙ্কিত হয়েছে—"সীমানা"।

পাহাড়ী জনপদ যেমন হয়, 'সীমানা'-ও তাই—তবে এই গ্রামে বা জনপদে বিদ্যুৎ এসেছে, এবং কাছেই একটি চা-বাগান ও বাগান সংশ্লিষ্ট বাহারী ঘর-বাড়ি বা বাংলো থাকায় নিছক গ্রাম না হয়ে একটি ক্ষুদ্র জনপদের রূপ পেয়েছে, যার জন্য পাহাড়ীরা একে বলে 'শহর'।

'শহর' বা 'গ্রাম' যাই-ই হোক না কেন, 'সীমানা'য় এলে চোখ কিন্তু জুড়িয়ে যায়। মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে অথবা রাস্তা ছেড়ে জনপদের এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়ালে বহু মনোরম দৃশ্য চোখে পড়বে। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে খাদ; এ-অঞ্চলের এই পরিচিত দৃশ্য ছাড়াও যা চোখে পড়বে, তা সবুজের সমারোহ। চা-বাগানের শ্রেণীবদ্ধ চা-য়ের গাছ থাকে-থাকে নিচে নেমে গেছে বা ওপরে উঠে গেছে। দূর থেকে মনে হয় নকশাকাটা বিরাট এক সবুজের আস্তরণ বিছানো। কোথাও বা চলতে চলতে নিচে তাকালে রজত-ধারার মতো পাহাড়ী নদীর দেখা মিলবে, যে নদী সমতলে গিয়ে 'বালাসন' বা ঐ ধরনের কোনো বিস্তৃত স্রোতস্বিনীর রূপ নেয় বর্ষার সমাগমে।

এমন যে জনপদ 'সীমানা', তার সন্নিহিত চা-বাগানকে কেন্দ্র করে কিছু বাঙালীর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, কেশিয়ার ও নাম প্রধান হিসাবরক্ষক—তিনজনই বাঙালী। তাঁরা তিনজন বা তাঁদের পরি-বারের কথা ছেড়ে দিই, এ-অঞ্চলের বহু লোকই দেখা যায়, অল্পবিস্তর বাংলা বোঝে। আর কারণ, মিরিক উপত্যকার অনেক লোকই বিভিন্ন কাজে সমতলে যায়; মিরিক উপত্যকার বহু স্থানীয় পরিবারের কেউ-না-কেউ সমতলে গিয়ে চাকরি করেছে বা করছে।

সেজন্য দেখা যায়, চা-বাগানাশ্রিত বাঙালীরা কিছু নাচ-গান বা নাটকের আসর কোম্পানীর হলঘরে উপস্থাপনা করলেই লোকের অভাব হয় না। অভাব কেন, লোক উপচে পড়ে বললে আরও ভালো শোনায়।

'সীমানা'র সন্নিহিত এলাকায় চা-বাগান থাকায় লোকজনের সমাগম হয় মন্দ নয়। স্থানীয় শ্রমিক ছাড়াও ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা আছে, আর নেপালের সীমান্ত বলে কেনা-বেচার বহরও এখানে কম নয়। এখানে ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল আছে, হাস-পাতাল আছে, পুলিশ-ফাঁড়ি আছে। শুল্ক-আদায়ী রাজপুরুষরা আছেন। এমন কি টিনঘেরা একটি প্রকাণ্ড চালাঘর পর্যন্ত আছে যেখানে মাঝে মাঝে সিনেমা পর্যন্ত দেখানো হয়।

'গ্রাম' ধরলে এখানে লোকের আধিক্য বেশী, কিন্তু তাহলেও প্রাকৃতিক পরি-বেশের উদার গাম্ভীর্যের জন্য এখানকার আকাশে-বাতাসে এক শান্তির সুর যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। দৈনন্দিন কেনা-বেচার কলকোলাহল এখানকার ওই প্রশান্তিকে যেন কখনোই আবিল করতে পারে না।

এখানে তুলনায় দোকান-পাট কম নয়, এমন কি চায়ের দোকানের সংখ্যা এক নয়, দুই নয়, একেবারে চার। তার মধ্যে আবার

শচীন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়

নানীর দোকান রীতিমত খ্যাতিসম্পন্ন। নানীর দোকানে চা-জলখাবার ত পাওয়া যায়ই, ওপরতলায় চাইলে ঘরভাড়াও পাওয়া যায়। রীতিমত সাজানো-গোছানো দু'খানি 'ডবল বেড' শয়ন-কক্ষ। নিচে নানীর কাছে ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ-মাংস। অন্য তিনটি দোকানে এ-সুবিধা নেই, কিন্তু ভাতের যোগাড় তারাও করে দিতে পারে, দরকার হলে। আসলে দোকানগুলি ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট-বনাম-হোটেল। দার্জিলিঙে শীতকালে যখন সমস্ত নিঃঝুম, এখানে কিন্তু তা নয়। দার্জিলিঙের উচ্চতার তুলনায় 'সীমানা' যে কৌলিন্যহারা, এ-কথা বলাই বাহুল্য। বরং 'সীমানা'কে কার্শিয়াঙের (ডাউ হিল বাদে) সমগোত্রীয় বলা যায়; যদিও উচ্চতায় 'সীমানা' বোধহয় কার্শিয়াঙেরও কিছু নিচে। অবশ্য নিচে হলেও সৌন্দর্যে কিন্তু 'সীমানা' থেকে খাস মিরিক উপত্যকা পর্যন্ত অঞ্চলটা অনেক প্রখ্যাত শৈল-নিবাসকে টেক্কা দিতে পারে।

'যত্ন নিয়ে জায়গাটার উন্নয়ন করতে পারলে কাশ্মীর এর কাছে ম্লান হয়ে যাবে, তুই বিশ্বাস কর—বলে প্রমীলা তার দিদিকে চিঠি লিখছিল। চা-বাগান সন্নিহিত সুদৃশ্য বাংলোর দোতলায়, কাচের পাল্লা দেওয়া জানালার পাশে বসে সকালের ঝিরঝিরে বাতাস আর ঝিকিমিকি রোদ্দুরের আভা উপভোগ করতে করতে চিঠি লিখবার ছলে যেন অনুপস্থিত দিদির সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথোপকথন করছিল প্রমীলা। বর্ষা গিয়ে শরতের নিরুদ্দেশ মেঘের দল পাহাড়ের মাথায় উঁকিঝুঁকি মারছে, বাঁয়ে জামার ওপর একটা হাতকাটা গোলাপী সোয়েটার, হলদে শাড়ীর আঁচলটা এলোমেলো হয়ে মেঝেয় লুটোচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রমীলা লিখে চলেছে—তোকে লেখা এই আমার চল্লিশ নম্বর চিঠি। অর্থাৎ এর আগে উনচল্লিশখানা চিঠি তোকে লিখেছি, কিন্তু তবু তোর ধ্যান ভাঙাতে পারি নি। এখানে একটি বারের জন্য অন্ততঃ চলে আয়। এ সোখীন দার্জিলিং নয়—এ 'সীমানা',—এই সীমানায় তুই হয়ত নতুন একটা কিছু আবিষ্কারই করে বসবি। আমি ইঞ্জিনীয়ারের বউ, সঙ্গদোষে আমার তত কবিত্ব আর আসে না, কিন্তু তুই এলে তোর চোখ দিয়ে আমিও হয়ত নতুন কিছু পেয়ে যাবো। আমাদের ড্রাইভারের নাম কৈরালা। তার মতো দক্ষ জীপচালক এ অঞ্চলে আছে কিনা সন্দেহ। তাকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব দার্জিলিঙ, কার্শিয়াঙ ত যখন তখন যেতে পারি, খোকাকে দেখতে প্রতি সপ্তাহে একবার করে দার্জিলিঙ যাই-ও, কিন্তু কথাটা তা নয়, আমরা নতুন-নতুন জায়গায় বেড়াবো। বাবার সঙ্গে দার্জিলিঙ ত তুই আগে কতোবার এসেছিস, কিন্তু সন্দকফুতে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিস কখনো? আমিও দেখিনি, কিন্তু আমাদের 'সীমানা'র কিছু দূরে একটা জায়গা থেকে সন্দকফু পাহাড়টা যে কি অদ্ভুত দেখায়, তা আর কী বলবো! তুই চলে আয়। কলকাতায় লোকজনের ভীড় লেগেই আছে, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার বড়ি ঠেকে বেঁস্ত করে লোকজনে একেবারে থৈ-থৈ করছে,—এর থেকে ছাড়া পেতে কি তোর ইচ্ছা করে না? ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'ট্রাংকুইলিটি' যাকে বাংলায় বড়জোর বলতে পারি 'প্রশান্তি', তা যদি পেতে চাস ত' সে এইখানে। একটু মানসিক বিশ্রামও ত' তোর দরকার। তোর ভগ্নীপতিও খুব আক্ষেপ করে বলে, 'দিদি এলেন না একবারও!' আমি কী উত্তর দেবো বল? আমি চুপ করে থাকি। মানুষটা ইঞ্জিনীয়ার হলেও কাঠখোট্টা নয়। নাটক বল, গান-বাজনা বল, সাহিত্য আলোচনা বল সব বিষয়ে সমান উৎসাহী। সেই দূর-দূর থেকে বাংলা বই পড়তে নিয়ে আসে, কখনো কার্শিয়াঙ থেকে, কখনো দার্জিলিঙ থেকে কখনো বা বাংলা বইয়ের খোঁজে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চলে যায়। তোকে যে কথা বারবার লিখেছি, সে কথা এখনো লিখছি, মানুষটি তোর ভীষণ ভক্ত। তোর নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরুনো মাত্রই ও শিলিগুড়ি চলে যায়, সেই বইয়ের খোঁজে। প্রায়ই এদের লোকজন যায় কলকাতায়, তাদের মারফৎ বই আনিয়ে না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। তুই বই পাঠাবি পাসেল করে, সেই বই আসবার আগেই ওর পড়া শেষ হয়ে যায়। এ রকম কতোবার হয়েছে। ধর—তোর ঐ শেষ বইখানা—'

প্রমীলা এই পর্যন্ত লিখেছে, এমন সময় নিচে দরজার কাছে জীপের শব্দ হতে কলম থামিয়ে দিলো। টের পেলো কাণ্ডা নিচে সদর দরজা খুললো, আর তারপরেই কাঠের সিঁড়িতে দুড়-দাড় শব্দ। ঐ অভ্যাস! লাফিয়ে-লাফিয়ে না উঠলে মানুষটার বুঝি ভালো লাগে না।

চেয়ার ছেড়ে প্রমীলা উঠলো। উঠে, কাগজপত্র গুছিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই প্রদোষ এসে চৌকাঠে দাঁড়ালো। ধবধবে ফরসা রঙ, ছাই রঙের সুটটা

পরা, কোটের নিচে সাদা সোয়েটারটার অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছে। দোহারা চেহারা, একটু ছটফটে ধরনের মানুষ। আর সত্যি কথা বলতে কী ওর এই ছটফটে স্বভাবটাকেই দারুণ ভালো লাগে প্রমীলার।

অল্প একটু হেসে প্রমীলা বললে,—কী হলো? অসময়ে কারখানা থেকে বাড়ি? এক কাপ বাড়ির চা?

প্রদোষ বললে, একেবারেই না। এখখুনি রওনা দিতে হবে। টেলিগ্রাম এসেছে। আর জানোই ত' এখানকার অবস্থা। টেলিগ্রাম হাতে এসে পৌঁছলো পুরো একটা দিন পরে।

—কীসের টেলিগ্রাম?

—দিদি আসছেন।

—মানে!

—মানে, তোমার দিদি,—শাশ্বতী সান্যাল নামে যিনি বিখ্যাতে।

কথাটা শুনে প্রমীলা কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলো। তার মনে হলো, সে ভুল শুনছে না তো! যাকে সে ইনিয়ে-বিনিয়ে এতক্ষণ চিঠি লিখছিল, সেই তার দিদি একেবারে সশরীরে তাদের কাছে আসছে! এতদিন পরে! উনচল্লিশখানা চিঠি লিখেও যাকে নড়ানো যায়নি কলকাতা থেকে, সেই দিদি কিনা হঠাৎ—!

প্রমীলা আর ভাবতে পারলো না, রুদ্ধ আবেগে সে যেন থরথর করে কাঁপছে। কোনোক্রমে বললে,—কই দেখি টেলিগ্রাম।

—ও আর কী দেখবে!—প্রদোষ বললে—'রিচিং কাশিয়াঙ অ্যাট অ্যাবাউট নাইন এ-এম বাই কার, ওয়েট ফর মি।'

—কেন, কাশিয়াঙ কেন?

প্রদোষ বললে—সেটাই ত' বুঝতে পারছি না। শিলিগুড়ি থেকে সোজা এখানে আসাই ত' সহজ!

বলতে বলতে প্রদোষ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো,—এনি ওয়ে, এখুনি রওনা হচ্ছি, পৌঁছতে পৌঁছতে নটা না বেজে যায়।

প্রমীলা ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো,—আমি যাবো।

—নানা, তোমাকে যেতে হবে না—প্রদোষ বললে,—আমি পাংখাবাড়ি রোড ধরে যাবো, রাস্তার বাঁকগুলো ত' জানো,—তোমার মাথা ঘুরবে।

—তা হোক, তবু আমি যাবো।

—এই দুর্গম রাস্তায়?

—তুমি যদি যেতে পারো, আমি পারবো না কেন?—প্রমীলা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে,—যাই নি কখনো, না?

প্রদোষ হেসে ফেললো, বললে,—উঃ! সে কী যাওয়া! একটু করে গাড়ি চড়াই উঠছে আর সরু রাস্তায় সাঁ করে বাঁক ফিরছে, আর তুমি চোখ দুটো বুজে আমাকে জড়িয়ে ধরছো ভয়ে সিটিয়ে উঠে!

—যাও, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

প্রদোষ আর কিছু বললো না, হাসতে লাগলো। প্রমীলা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলো। তারপরে কৈরালার জঙ্গল, আর সীমানা ছাড়িয়ে কিছু পথ ঘুরে, অনেকটা নেমে, বালাসনের দীর্ঘ সেতু পেরিয়ে কুখ্যাত পাংখাবাড়ির রাস্তা ধরে কাশিয়াঙের দিকে এগিয়ে চলা। অতল-স্পর্শী খাদের পাশ দিয়ে গাড়ি যখন সরু রাস্তায় সাঁ করে বাঁক নেয়, তখন ভয়ে শরীর সিটিয়ে না উঠে উপায় কী। প্রমীলা প্রদোষের বাহুটা সজোরে চেপে ধরে।

—কী হলো, ভয় পাচ্ছো ত?

প্রমীলা কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলে,—দিদি কাশিয়াঙে আসছে কেন বলো ত? আমরা ত' শিলিগুড়ি থেকেই ওকে নিয়ে আসতে পারতুম! তাহলে এই সর্বনেশে রাস্তায় ত আর আসতে হতো না!

প্রদোষ বললে,—তা হতো না বটে, কিন্তু তোমার মতো আমারও প্রশ্ন,—কাশিয়াঙ কেন? দিদি কি একা আসছে, না, সঙ্গে—?

—কে জানে!

এই প্রশ্ন নিয়ে ওরা যখন কাশিয়াঙ পৌঁছলো, তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে নটা ছাড়িয়ে পৌণে দশটার নিশানায় গিয়ে পৌঁছেছে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা খুঁজতে আরম্ভ করলো,—কোথা দিদি, জনৈক সমালোচকের ভাষায় 'অসাধারণ বিদুষী লেখিকা'—শাশ্বতী সান্যাল। মাসিকে-সাপ্তাহিকে কিছু গল্প, আর গোটা দশেক উপন্যাস লিখেই যিনি 'বিদুষী' আখ্যা পেয়েছেন তাঁর বৈশিষ্ট্য আর স্বকীয়তার জন্য,—কোথায় তিনি?

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তাঁকে পাওয়া গেল নির্জন রেলওয়ে প্লাটফর্মের সংলগ্ন রেস্টুরেন্টের ভিতরে,—সামনে শূন্য চায়ের কাপ, কাছেই দেওয়াল ঘেঁষে সুটকেশটা দাঁড় করানো। পরনে সাদা শাড়ী, কোলের ওপর একখানা শাল জড়ো করা, গায়ে গাঢ় সবুজ বর্ণের ব্লাউজ। মাথার চুলে কোনো পারিপাট্য নেই, আলগা করে খোঁপা বাঁধা, কিন্তু সে-শাসন অগ্রাহ্য করে কিছু কেশাগ্রভাগ কপালের কাছটায় এসে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। মুখখানা শুকনো শুকনো, চুপচাপ বসে বসে গভীরভাবে কী যেন ভাবছিল।

প্রমীলাই ঘরে ঢুকেছিল প্রথমে, বললে,—দিদি!

চোখ তুলে তাকালো। দোহারা চেহারা শ্যামাঙ্গী, কিন্তু চোখ দুটিতে এক ধরনের স্নিগ্ধতা রয়েছে। উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ; আসলে চেহারায় বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে তাহলো ঐ চোখ দুটিতে। আয়ত নয়, ঢলোঢলো বলে কবিত্ব করারও কিছু নেই, হঠাৎ চোখে পড়বার মতোও নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলে, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললে ঐ চোখের চাউনিতে সে বৈশিষ্ট্য রসগ্রাহী মানুষের দৃষ্টিতে পড়তেও পড়তে পারে। তা নইলে, আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; পাঁচজনের একজন হয়ে ওঠবার মতো দেহসৌষ্ঠব নয়; যাকে বলে 'সাধারণ চেহারা',—কুশ্রী নয়; বরং সুশ্রীই কিন্তু ভীড়ে হারিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ দশ-বিশের ভীড় থেকে এ মহিলাকে চেহারার জন্য আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

প্রদোষ বললে,—এখানে এসে বসে আছেন? আমাদের অবশ্য একটু দেরি হয়েছে। আসলে টেলিগ্রামটা—

শাশ্বতী উঠে দাঁড়ালো, বললে,—ঠিক আছে, এখন চলো।

বলেই মুখ ফিরিয়ে কাউণ্টারের কাছে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের দিকে তাকালো, বললে,—মিঃ মিত্র, অনেক ধন্যবাদ আতিথেয়তার জন্য। চলি।

ভদ্রলোকের চোখ ছিল প্রদোষের ওপর, বললে,—হ্যালো প্রদোষ, আছো কেমন?

মিঃ মিত্র কাশিয়াঙে থাকেন, কাদের একটা চা কারখানার সঙ্গে যুক্ত। প্রদোষ বললে,—মিত্তিরদা, দিদিকে চেনেন নাকি?

—না, মানে, তোমার নাম করলেন বলে এখানে বসিয়ে রাখলাম। একে বাঙালী, তায় তোমার নাম—

প্রদোষ বললে,—পরিচয় করিয়ে দেই।

তারপরেই শাশ্বতীর দিকে হাত উঠিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেল,—ইনি হচ্ছেন—কিন্তু কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিলো শাশ্বতী,—প্রদোষ হচ্ছে আমার ভগ্নীপতি,—আর এই আমার বোন,—প্রমীলা,—আমি এদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বলে, নমস্কার জানিয়ে, সুটকেশটা হাতে ঝট করে তুলে নিয়ে প্রমীলাকে তাড়া লাগিয়ে বলে উঠলো,—চল্-চল্ দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বলতে গেলে একরকম টেনেই ওদের বাইরে নিয়ে এলো শাশ্বতী। বাইরে আসার পর প্রদোষের যেন চমক ভাঙলো। বললে,—আঃ ছি-ছি। সুটকেশটা দিন।

বলেই ওটা কেড়ে নিয়ে অদূরে

দাঁড়ানো কেরালার উদ্দেশে হাঁক দিলো,—কৈরালা—

—জী।

এইভাবে এগিয়ে এসে জীপের ওপর উঠে পড়া। দুই বোনে বসলো পিছনের সীটে, সামনে প্রদোষ ড্রাইভারের পাশে।

চলতে চলতে প্রশ্নমালা শুরু হলো। প্রথমেই কথা বললো প্রমীলা। বললে,—দিদি, তুই কার্শিয়াঙে এলি কেন? তোকে ত' পথের বর্ণনা দিয়ে অজস্র চিঠি দিয়েছি। শিলিগুড়ি থেকে সোজা আমাদের ওখানে যেতে হয়। কার্শিয়াঙ-পাহাড়ে ওঠার দরকারই করে না।

প্রদোষ মুখ ফিরিয়ে বললে,—হ্যাঁ দিদি, আপনি সেইভাবে টেলিগ্রাম করলে আমরা একেবারে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে উপস্থিত থাকতাম।

শাশ্বতী মুখ টিপে হাসলো। মাথার চুল হাওয়ায় উড়ছিল, হাত দিয়ে সেই চূর্ণালক ঠিক করে নিতে নিতে বললে,—ট্রেনে আসিনি।

—তবে?

মুখ টিপে হাসছিল শাশ্বতী। তার সিঁথি শূন্য, এখান-ওখানে সিঁদুরের চিহ্ন পড়েনি সেজন্যই হোক আর অন্য কারণেই হোক, দেখাচ্ছিল যেন ওই ছোট বোন, বিবাহিতা প্রমীলাই যেন ওর দিদি।

আসলে কিন্তু বয়সে দু বোনে যথেষ্ট তফাৎ, ওদের মাঝে এক ভাই আছে, সে থাকে আমেরিকায়। পড়তে গিয়ে সেখানেই সে থেকে গেছে, বিয়ে করেছে ওখানে। কিন্তু সেসব পারিবারিক প্রসঙ্গ এখানে না তুললেও চলে।

ওদের কথার উত্তরে শাশ্বতী বললে,—এমন কী, বাসেও আসিনি। এসেছি কলকাতা থেকে সোজা মোটরে, জাতীয় সড়ক ধরে।

উত্তর শুনে প্রমীলা চোখ কপালে তুললো বলা চলে, বললে,—একা?

আবার হাসলো শাশ্বতী, হাসিটা যেন কেমন একটু ম্লান; বললে,—না, একা নই।

—তবে?

শাশ্বতী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—আসলে কলকাতায় খুব হাঁপিয়ে উঠেছিলুম রে।

কথাটা সে শেষ করলো না। প্রমীলা বলে উঠলো,—আমি জানি। কলকাতায় তুই যে হাঁপিয়ে উঠবি তা জানি। সেজন্য বারে বারে চিঠি লিখেছি এখানে আসবার জন্য।

প্রদোষ শুনছিল ওদের কথা। সে বললো,—দারুণ খুশি হয়েছি জানেন দিদি!

সীমানা আপনার সত্যিই খুব ভালো আনবে।

অল্প একটু হাসলো শাশ্বতী, বললে,—নামটিই ত' সুন্দর!

এই সময় গাড়িটা একটা বিপজ্জনক বাঁক নিয়ে নিচে নামছিল। প্রমীলা শরীর সিটিয়ে চোখ বুজে সে ধাক্কাটা সামলে নিলো, কিন্তু শাশ্বতী এ অঞ্চলে নবাগতা হয়েও বিচলিত হলো না, বরং বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে খাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কৈরালা পাকা ড্রাইভার। সে বাঁকের পর বাঁক অবলীলায় পার হয়ে যেতে লাগলো। প্রমীলা শক্ত হয়ে নিশ্চুপে বসে রইলো, অতঃপরে বাঁকের পর্ব যখন কমে গাড়ি সোজা চলতে শুরু করলো, তখন সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। দিদিকে আচমকা জড়িয়ে ধরে বকে উঠলো,—তোকে পেয়ে যে কী ভালো লাগছে! এতক্ষণে প্রদোষও বোধহয় কথা খুঁজে পেলো। বললে,—কিন্তু দিদি, আপনি বললেন একা আসেন নি, সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কোথায়?

শাশ্বতীর মুখে ফুটলো বিচিত্র হাসি, বললে,—তারা দার্জিলিঙ। আমাকে কার্শিয়াঙে নামিয়ে দিয়ে স্টেশনে জল-খাবার খেয়ে একেবারে সোজা দৌড়।

প্রমীলা অবাক হয়ে দিদির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দিদি কলকাতা ছেড়ে অর্থাৎ তাদের বাবাকে ছেড়ে চট করে কোথাও যেতে চায় না। বাবা বুড়ো মানুষ; দীর্ঘদিন ধরে বাতে ভুগছেন, তার ওপর একটু চোখ রাখা আর নিজের লেখাপড়া-এই-ই ত দিদির জীবন। তাদের মা নেই, যা মারা গেছে অনেকদিন; এখন ঐ বাবাই তাদের সব। বি-চাকর-রাঁধুনী থাকলেও নজের লোক কেউ চোখ না রাখলে চলে? দিদি তাই বাবাকে আঁকড়ে রইলো, বিয়ে পর্যন্ত করলো না। এমন যে মানুষ যে ছোট বোনের এতো আহ্বান সত্ত্বেও আসে নি, সে আজকে দলবলের সঙ্গে হঠাৎ ছুটে এলো,—এ-ও যেন কেমন একটা জিজ্ঞাসার সূচনা করে। নিছক খেয়ালের বশে বেরিয়ে পড়ার মতো মেয়ে যে দিদি নয়, সে খবর প্রমীলা ছাড়া আর কে বেশি জানে? আর তাছাড়া দিদির বেশবাস দেখেও বড় অদ্ভুত লেগেছে। দিদি বেশ সৌখীন মানুষ, দামী শাড়ী ছাড়া পরে না, তাও সাদা শাড়ী নয়, কখনো-সখনো পরতো সাদা শাড়ী। সেই মানুষ এভাবে সাধারণ একটা শাড়ী পরে বেরিয়ে পড়েছে, প্রসাধনের কোনো বালাই নেই,—এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। আর তাছাড়া,—দিদি হাসিখুশি হয়ে কথা বলছে বটে, কিন্তু হাসিটা যেন কেমন ম্লান।

বাড়ি ফিরে, একটু চা-টা খেয়ে, বাথরুমে ঢুকে গরম জলে স্নান করে প্রমীলার একখানা পাটভাঙা গোলাপী ডুরে শাড়ী পরে, ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে শাশ্বতী যখন কাছে এসে বসলো, তখন প্রমীলা ওকে ঐ প্রশ্ন করলো,—কাদের সঙ্গে এলি দিদি, ওরা কারা?

বলা বাহুল্য, প্রদোষ যখন কাছে ছিল না সে চলে গেছে কারখানা। সে এলে খাওয়ার টেবিলে সবাই বসবে কথা আছে।

শাশ্বতী কাঁচের জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে,—না, জায়গাটা সত্যিই সুন্দর।

প্রমীলা বললে,—দেখছি ত' চিঠিতে একটুও বাড়িয়ে লিখি নি।

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলো, বললে,—সেটা আন্দাজ করেই ত' কার্শিয়াঙে নেমে পড়লাম। দার্জিলিঙ গেলাম না।

—যাদের সঙ্গে এসে তারা ছেড়ে দিলো?

শাশ্বতী মুখ টিপে একটু হাসলো, বললে,—না দিয়ে উপায় কী?

প্রমীলা বললে,—কিন্তু দিদি, তুমি ত' শিলিগুড়িতেই নেমে গেলে পারতে, কার্শিয়াঙ পর্যন্ত উঠতে গেলে কেন?

—স্টেকুই দুষ্টুমী করলুম,—শাশ্বতী বললে,—আমার প্ল্যান আগে থেকে করা ছিল, নইলে প্রদোষকে টেলি-গ্রাম করলাম কী করে? তবে ঐ প্ল্যান ওদের জানতে দিই নি। কারণ, শিলি-গুড়িতে ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ওরা ধরে বসতো,—কোথায় যাচ্ছো, কার কাছে যাচ্ছো, সব বলো। আর যদি বলতাম, ওরা আর দার্জিলিঙ যেতো না, সব এসে জুটতো এইখানে; আমাদের নিভৃতির শান্তি একেবারে চুরমার করে দিতো।

—তা কেন,—প্রমীলা বললে,—পাঁচ-ছ' কী সাত জন পর্যন্ত সামাল দেওয়া যেতো। তবু ত' একটা ঢেউ উঠতো। এখানে বাঙালীর মুখ আমরা দেখি কতটুকু—

শাশ্বতী হেসে উঠলো, বললে,—তারা যে সব বাঙালী, এ-কথা বুঝলি কী করে?

—তাহলে?

শাশ্বতী বললে,—এখানে এসে জুটজে বিপদে পড়তিস কি না কে জানে!

তারা ক'জন? এবং কারা? কিছু ত' ভেঙে বলছো না?

শাশ্বতী বললে,—ড্রাইভার আর আমাকে বাদ দিলে তারা তিনজন মাত্র।

প্রমীলা ঠোঁট ওল্টালো,—মোটে! সঙ্গে আনলে পারতে, খুব জমতো! নাই বা হলো বাঙালী?

শাশ্বতী চুপ করে রইলো।

প্রমীলা আবার বললে,—কিন্তু তাঁরা যে-ই হোন, তোমাকে ত' খোঁয়াড় থেকে বার করে আনতে পেরেছেন, যথেষ্ট তাঁদের শক্তি, একথা বলতেই হবে।

শাশ্বতীর পাতলা ঠোঁটের ওপর হাসির একটা রেখা ফুটে উঠলো, বললে,—শক্তি হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। যেন হিঁচড়ে আমাকে বার করে আনলো!

প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে দিদির চোখের দিকে তাকালো, কিছু একটা হয়ত আন্দাজ করে নিলো, কিন্তু সে প্রসঙ্গ তুললো না, তুললো অন্য কথা। বললে,—আচ্ছা দিদি, বাবার কথা বলছিস না কেন? বাবা কেমন আছে?

শাশ্বতী চোখ তুলে তাকালো বোনের মুখের দিকে, বললে,—প্রত্যেক চিঠিতেই ত বাবার কথা লিখি। এখন বেশ ভালো আছেন, হাঁটতে হাঁটতে পার্ক পর্যন্ত যেতে পারেন, অবশ্য লাঠি লাগে।

—বাবাকে যদি একবার আনতে পারতুম,—বলে চুপ করে গেল প্রমীলা।

কিন্তু প্রসঙ্গের শেষ এখানেই হলো না। প্রদোষ আসার পর খাওয়ার টেবিলে হাল্কা গল্প-গুজব চললো। তারপর প্রদোষ কারখানায় বেরিয়ে গেলে বিশ্রাম নিতে নিতে দু-বোনের মধ্যে আবার কথাটা উঠে পড়লো। প্রমীলাই আচমকা প্রশ্ন করলো,—টেনে-হিঁচড়ে তোকে কে বা কারা নিয়ে এলো দিদি?

বালিশে মাথা দিয়ে টান টান হয়ে শুয়েছিল শাশ্বতী, গায়ের ওপর কম্বলটা টানা দেওয়া। মুখটা ফিরিয়ে বোনের দিকে তাকালো, এক মুহূর্ত থেমে থেকে খুব আস্তে করে বললে,—আন্দাজ করতে পারছিস না?

প্রমীলা দিদির পাশে শুয়েছিল। এবার কৌতূহলে, উত্তেজনায় একেবারে উঠে বসলো, বলে উঠলো,—অসীমদা?

ছোট্ট উত্তর,—হুঁ।

প্রমীলা দিদির গায়ে হাত রেখে ওকে একটু নাড়া দিয়ে বললে,—সে এখানে এলো কী করে?

—এলো,—খুব সহজভাবে শাশ্বতী বললে,—ফিলাডেলফিয়া থেকে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে বিলেত হয়ে ভারতবর্ষ। এর মধ্যে চমকটা কোথায়?

শাশ্বতী হাসতে হাসতে বললে,—কেমন মজা! ঠকিয়েছি তো?

—এত দিন, এত বছর পরে?

শাশ্বতী হাসলো, বললে,—খেয়াল।

—আমি হলে মুখদর্শন করতুম না! একখানা চিঠি নেই কিছু নেই! তার ওপর যে কাণাঘুষো শুনেছিলুম, সে-কথা সত্যি হলে—

বোনকে চুপ করিয়ে দিয়ে শাশ্বতী আবার হেসে উঠলো,—বললো, যা রটে, তার কিছু বটে।

ঘটনাটা সত্যি। স্বচক্ষেই ত' দেখলেম। মানে!

শাশ্বতী বললে, দোতলায় আমার ঘরে বসে লিখছি, বাবার ঘরে কে এসেছে, কথা-বার্তা একটু-আধটু শুনতে পাচ্ছি, এই পর্যন্ত। কিন্তু সে যে স্বয়ং অসীমকুমার, তা কী করে আন্দাজ করবো। খানিকক্ষণ পরে জুতো মসমসিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত। হঠাৎ দেখলে তুইও চিনতে পারতিস না। গায়ের রঙ ফর্সা হয়েছে, আর সেই রোগা ছিপছিপে চেহারা গেল কোথায়? দিব্যি মোটাসোটা চেহারা, শুধু মাথার চুল একটু পাতলা হয়েছে।

—তারপর!

শাশ্বতী বললে,—মাঝে যে দশ-দশটা বছর কেটে গেছে, সে যেন ওর খেয়ালই নেই, সেই আগের মতো পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসা,—সেই রকম স্তব-স্তুতি।

প্রমীলা হঠাৎ দিদিকে জড়িয়ে ধরলো, ছেলেমানুষের মতো কলরব করে উঠলো—ও দিদি, লক্ষ্মীটি দিদি, তোর পায়ে পড়ি, সব খুলে বল।

—ওরে ছাড় ছাড়, সব বলছি, শাশ্বতী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো, বললো,—দেখ, তখন আমার বয়সটা ছিল ছাব্বিশ, এখন ছত্রিশ, অনেক তফাৎ। ওর ভাবভঙ্গী দেখে আমার কেমন করুণা হলো, লেখার কাগজ-টাগজ গুছিয়ে রেখে বললুম,—

—সোজাসুজি বলো ত', এত বছর পরে দেখা,—কী করতে চাও আমাকে নিয়ে?

অসীম বললে,—দার্জিলিং যাচ্ছি। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে।

এক কথায় রাজী হয়ে বললুম,—চলো।

তোকে বলবো কী,—বলতে গেলে এক কাপড়েই বেরিয়ে এলুম, অবশ্য বাবার অনুমতি নিয়ে।

রুদ্ধশ্বাসে যেন শুনছিল প্রমীলা, বললে,—এখনো কিন্তু সব স্পষ্ট হলো না।

—এ কী স্পষ্ট হবার জিনিস! আমার কাছেই কি সব স্পষ্ট হয়েছে?—কেমন যেন কান্নার মতো শোনালো শাশ্বতীর কণ্ঠস্বর। বলতে লাগলো,—গাড়ীতে আসতে আসতে ডরোথি বলছিল,—হি ইজ এ গ্রেট অ্যাডমায়ারার অব ইওর ওয়ার্কস! ইন ফ্যাক্ট—হি ইজ ট্রান্সলেটিং ওয়ান অফ ইয়োর বুকস! হি ইজ—

প্রমীলা বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—ডরোথি?

—ওর বউ।

প্রমীলা নির্বাক হয়ে গেল।

শাশ্বতী বলতে লাগলো,—বউকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে, সঙ্গে এক এদেশী বন্ধু,—কে এক মিস্টার হালদার। তার মধ্যে আমি কে? গাড়িতে মাঝখানে আমি, এক পাশে ডরোথি, অন্য পাশে অসীম। আমাকে বললে,—দার্জিলিং চলো।

অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।

প্রমীলা বললে,—কথাগুলো শুনে নিলে পারতিস।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো শাশ্বতীর মুখে, বললে,—কী আর বলবে? সেই স্তব-স্তুতি ত'? আর না হলে, আমার বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ,—এছাড়া আর কি কথা থাকতে পারে?

প্রমীলা বললে,—আচ্ছা দিদি, তুই হঠাৎ করে ওদের এড়ালি, 'কার্শিয়াঙে' এসে?

শাশ্বতী হাসতে লাগলে। হাসতে-হাসতে রাঙা হয়ে গেল মুখখানা। বললে,—দারুণ বুদ্ধি করেছিলুম! কী বললুম জানিস? বললুম,—আজ সন্ধ্যায় কার্শিয়াঙ রেডিও স্টেশনে আমি গল্প পড়বো, আমার প্রোগ্রাম আছে। আমাকে নামিয়ে দাও, আমি কাল সকালে দার্জিলিং পেঁাছোচ্ছি। তোমরা কোন্ হোটেলে উঠছো,—ঠিক করেছো কিছু?

অসীম বললে,— ম্যালের কাছেই—উইন্ডামায়ারে। টেলিগ্রাম করে রিজার্ভ করে রেখেছি। তিনটে রুম।

আমি বললুম,—ঠিক আছে। আমি ঠিক চলে যাবো।

ডরোথি জিজ্ঞাসা করলে,—রাত্রে থাকবে কোথায়?

উত্তর দিলুম,—সরকারী অতিথি। ওরাই থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে।

প্রমীলা বলে উঠলো,—বাব্বা! এতোও পারিস! আমার কথা কিছু বলিস নি? আমি যে ওখানে থাকি, আমার স্বামী যে—

—দূর,—ওসব কথা বলতে আছে? শাশ্বতী বললে,—উইন্ডামায়ার ক্যান-সেল করে দিয়ে এখানে এসে হৈ-হল্লা সুরু করতো।

প্রমীলা বললে,—কিন্তু দেখতে ত' পতুম! কেমন দেখতে ডরোথিকে?

—দারুণ!— শাশ্বতী বললে,—আমেরিকান মেয়ে, রঙের কথা ছেড়ে দি, ফিগারও দেখবার মতো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রমীলা হঠাৎ একটু হেসে উঠলো,—মজা লাগছে ভাবতে! সেই কালো-কালো, রোগা-রোগা ছেলেটা, তোর কাছে আসতো,—চুপচাপ বসে থাকতো,—কথা বলতো একটা-কি-দুটো,—সারাক্ষণই তোর দিকে তাকিয়ে আছে! তোকে ঘিরে ওর দু-চোখ জুড়ে ছিল বিস্ময়! তাই না, দিদি?

—কে জানে!—শাশ্বতী বললে,—আমার কেমন যেন করুণা হয় ওকে দেখলে, মায়া হয়! নইলে আমার কোটর থেকে আমাকে বার করা এতো সহজ নাকি? এতো চিঠি লিখেছিস, আসতে পেরেছি তোর কাছে?

—হ্যাঁ, এদিক থেকে অসীমদার কাছে আমরা ভৃতজ্ঞ, যেভাবেই হোক, তোমাকে ত' কাছে পেলুম!

শাশ্বতী বললে,—আমিও বেঁচে গেছি রে, তোদের কাছে এসে। এখানে আমি একটু বিশ্রাম করবো, সত্যিকার বিশ্রাম। কোনো লেখা না—পড়া না—এমন কি ডায়েরী লেখাও না,—খালি চুপচাপ থাকা। এবার নীরব করে দাও হে তোমার, মুখর কবিরে! মতি রে প্রমীলা, কলকাতায় আমি বড্ড মুখর হয়ে থাকি। লেখার মধ্য দিয়ে অজস্র কথা বলি, লোকজন এলে কথাবার্তায় মেতে যাই,—ভাবতে গেলে এক সময় বিস্ময় লাগে,—এতো কথাই বা কিসের? এখান-কার পাহাড়গুলোর মতো চুপচাপ ধ্যানে বসে থাকলেই বা ক্ষতি কী!

দুই বোনে আর কোনো কথা হলো না, যেন যে যার চিন্তার সমুদ্রে অবগাহন করলো। প্রমীলা ভাবছিল,—দিদি 'স্তব-স্তুতি' কথাটা বার-বার ব্যবহার করছে কেন? অসীমদা কি চিরকাল দিদির কাছে স্তব-স্তুতি করেই কাটাতো? তাই যদি হতো ত', দশ বছর আগে অসীমদা যখন সাগর পাড়ি দিলো, তারপরে দিদি অমন করে লেখায় ডুবে গেল কেন? বাবা বিয়ের সম্বন্ধ আনলেন, দিদির ঐ এক উত্তর,—না। তুমি বরং প্রমীলার বিয়ে দাও। আমরা জানতুম'। —প্রমীলা তার চিন্তার রাজ্যে নিজের সঙ্গেই নিজের কথা বলতে লাগলো,—অসীমদার জন্য দিদি অপেক্ষা করে থাকবে! কিন্তু সেই অপেক্ষারও ত' সীমা আছে! এক-এক করে কেটে গেল দীর্ঘ দশ বছর,—দিদির সেই 'না'-এর প্রাচীর আর ভাঙলো না। আমরা জানতুম,—অসীমদার বিরহই ওকে এমন তপস্বিনী করে তুলেছে। এ নিয়ে প্রদোষের সঙ্গে তার কথাও হয়েছে। প্রদোষকে সে কিছুটা বলেছে,—অর্থাৎ সবটা না জানলে প্রদোষ অনেকটাই জানে অসীম-শাশ্বতী পর্বের; কিন্তু এরপর? মানে,—আজ,—আজকের দিনে? দিদি বললে,—ছাব্বিশ আর ছত্রিশ কি এক? 'এক নয়, আমি জানি',—প্রমীলার আত্মকথন চলতে লাগলো,—কিন্তু আমি যদি বলি, দিদি তুই ছাব্বিশ থেকে একচুলও নড়িস নি, সেই ছাব্বিশেই অনড় হয়ে আছিস। যে কেউ তোকে দেখুক,—ছাব্বিশের বেশি বলবে না। আয়নায় দেখিস না নিজেকে?'

প্রমীলা এই সব ভাবছে, আর শাশ্বতীর ক্লান্ত শরীরে নেমে আসছে তন্দ্রার ঘোর। গাড়িতে কাটানো সারোটা রাত্রির অভিজ্ঞতা যেন নতুন করে ক্লান্তি এনে দিচ্ছে দেহে-মনে। এপাশে অসীম, ওপাশে ডরোথি, —মাঝখানে ওরা তাকে বসালো কেন, আর সে-ই বা বসলো কেন? অসীম ফাঁক পেলে ফিসফিস করে একটি কথাই তাকে বার বার বলেছে,—অনেক কথা আছে, দার্জিলিং গিয়ে সব বলবো।' ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা জেগে ওঠে,—আর কথা কেন? কিসেরই বা কথা? থাক তোমার ঐ স্তব-স্তুতি!' আমি তোমার প্রেরণা, আমি তোমার আকাশে চাঁদের মতো চিরকাল স্নিগ্ধ আলো বিকীরণ করবো,—এসব কথা ত' নতুন নয়, ছাব্বিশ বছর বয়সে অনেক শুনেছি তোমার গুণগুণানি। ছত্রিশে এসে আর তা নতুন করে শুনে কী হবে দার্জিলিংয়ে বসে?

কিন্তু অসীম-পর্ব থাকে। বাবার চেষ্টায় তার লেখা-ছাপানোর কাজ সুরু। প্রথম দু' খানা বই ত' নিজেদের টাকায় ছাপানো। কিন্তু আস্তে আস্তে তা প্রসার লাভ করতে লাগলো। বাবার চেষ্টাতেই সভা-সমিতিতে গমনাগমন, গল্প-পাঠ, তারপরে পত্র-পত্রিকায় রিভিউ,—বইয়ের কাটতি সুরু। পত্র-পত্রিকায় লেখা বেরুতে থাকা, প্রকাশক-দের চিঠি,—চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত,—একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটে যেতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে নামজাদা মানুষদের চিঠি, অভি-নন্দন-পত্র,—লিখে লিখে টাকা পাওয়া,— এমন কি শেষ পর্যন্ত সিনেমার আমন্ত্রণ। দুটি কাহিনীর সিনেমা-রূপ, আরও দুটি কাহিনী প্রস্তুতির পথে,—ইত্যাদি। লোকে দেখা করতে আসে, সমীহ করে কথা বলে,—কতো সভা-সমিতিতে নিয়ে যায় গাড়ী করে,—সবই জীবনে ঘটে যাচ্ছে,— অথচ যেন ঘটছে না! মনে হচ্ছে,— এ কোন্ শাশ্বতী? তার যে গুণ আছে, সে যে গুণী, এ-কথাটা এমন করে ব্যাপক আকারে রটালো কে? কে এনে দিলো তাকে এমন অভাবিত খ্যাতি? ভাগ্য? 'আজ আমার লেখা ছাড়া গতি নেই,'—শাশ্বতী ভাবতে লাগলো,—'পাঠকদের ভালো লাগছে, তারা আরও চায়।' কথাটা মনে আসতেই একটু যেন চমকে উঠলো শাশ্বতী,—কথাটা তার নিজের? না, অন্য কেউ এসে শুনিয়ে গেছে? হ্যাঁ, তা-ই। ডরোথি যেমন অসীমকে দেখিয়ে বললে,—হি ইজ এ গ্রেট অ্যাড-মায়ারার অফ ইয়োর ওয়ার্কস্,—তেমনি 'গ্রেট অ্যাডমায়ারার' আমার কম নেই। তারা আসে, কেউ প্রৌঢ়, কেউ যুবা,—নীরব অথবা সরব স্তুতি জানিয়ে চলে যায়। আমার লেখায় তারা কী পায় জানি না, অথবা এ কী আমার ব্যক্তিত্বের সৌরভ? ব্যক্তিত্ব, না নারীত্ব? পুরুষের ক্ষেত্রে যেটা ব্যক্তিত্ব, তরুণী মেয়ের পক্ষে সেটাই কি নারীত্ব? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তার গুণপনাই মানুষকে মুগ্ধ করছে, নিছক তার নারীত্ব নয়। ওরা ত' বলে না,—আপনি কী সুন্দর! ওরা বলে,—আপনার লেখা কী সুন্দর!

ঠিক এই কথাটাই আবার শোনা গেল সন্ধ্যার পর, প্রমীলাদের ড্রয়িং রুমে বসে। প্রদোষের আরও দু'জন বাঙালী সহকর্মী এসেছেন, সঙ্গে তাঁদের সহধর্মিণী। সবার মুখেই সেই

স্তুতি,—আপনার অমুক বইটা আমরা সেদিন পড়লুম। দারুণ। সত্যি। দুজাতার মনোবিকলন—

কথাগুলো কি তৃপ্তি দেয় না, আবেশে ভরিয়ে আনে না অন্তর?

নিশ্চয় দেয়। লেখকের সব থেকে বড় দুর্বলতা ত' এইখানে। ওঁরা যখন লেখার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছিলেন, তখন কানে সুধাবর্ষণ করছিল বই কী। গত দশ বছর ধরে ত' এই-ই চাচ্ছিল। এবারে অসীমদের সঙ্গে দার্জিলিং যেতে যেতেই ঐ সুধা-আস্বাদনে বিরতি ছিল না, বস্তুত, ঐ সুধালাভের জন্যই ত' এত ছুটোছুটি। ভক্তদের স্তব-স্তুতি কোন্ দেবী বা দেবতার না ভালো লাগে? অবশ্য প্রস্তরীভূত দেব-দেবতার অনুভূতির কথা জানা যায় না, কিন্তু জীবন্ত সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর মুখ-চোখ দেখে কি বোঝা যায় না, স্তব-স্তুতি তাঁদের প্রসন্নতার কোন্ স্তরে নিয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু তাহলে এই প্রসন্নতার স্পর্শ থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে কার্শিয়াঙে নেমে পড়া কেন? কেন আগে থাকতে প্ল্যান করে প্রদোষকে টেলিগ্রাম করা যে, কার্শিয়াঙে আমার জন্য অপেক্ষা করে! শাশ্বতী নিজের মনকে প্রশ্ন করলো, কই, এখানে এই সীমানা'য় এসে এঁদের অভিনন্দন আর ভালো-লাগার স্তুতি শুনতে ত' খারাপ লাগছে না! তা'হলে অসীম কী দোষ করলো?

বিয়ে করেছে সে? না, সে-ও আসল কারণ নয়। আসল কারণ নিহিত রয়েছে আমার নিজেরই মধ্যে। আমি যাকে দশ বছর আগে বিদায় দিয়েছিলাম, ও সে-অসীম নয়। দশ বছর আগে ওকে দেখলে আমার বুক কাঁপতো, চোখ উপোসী হয়ে উঠতো, কিন্তু দশ বছর পরে যাকে দেখলুম, তাকে দেখে আমার বুক কাঁপলো না, আমার বুক ভরে যা জেগে উঠলো, তা করুণা। কিন্তু সত্যি বলো ত' এখানেই কি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলে? না, তা পাচ্ছি না বলেই ত' মিথ্যা অজুহাত তুলে কার্শিয়াঙে নেমে পড়া, বলা যায় ধোঁকা দিয়ে 'সীমানা'য় পালিয়ে আসা। হোক না কয়েকটি দিন এখানে আমার অজ্ঞাতবাস! যাই না নিজেকে একেবারে ভুলে! সেই সন্ধ্যায় প্রমীলাদের ড্রয়িংরুমে বসে অতিথিদের সামনে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো শাশ্বতী,—দোহাই আপনাদের, কোনো সাহিত্য-সভা করবেন না, কোনো অভিনন্দন নয়,—আমি এখানে এসেছি নিছক ছুটি কাটাতে।

—ছুটি - ছুটি - ছুটি!'—পরদিন ভোরে উঠে শাশ্বতী একাই বেরিয়ে পড়লো সীমানার পথে-পথে। গোলাপী শাড়ী, গায়ে খয়েরী ব্লাউজ, এক ঢাল চুল পিঠের ওপর এলানো। টানা পিচের রাস্তায় তেমন কোনো পথিক নেই, ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদারণী ঝাঁট দিয়ে ঝরা পাতার স্তূপ ফেলে দিচ্ছে শুদ্ধ। কয়েকটা মুরগী তাদের বাচ্চার দল নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানগুলোও খোলেনি, একমাত্র নানীর দোকানটি ছাড়া। সে-দোকানে উনোনে আগুন পড়েছে, দু-একজন চা-প্রত্যাশী এসে ভিতরের টেবিলে বসেও আছে বোধ হয়। বুড়ো নানী উনোনের ধারে বসে তার দিকে একবার তাকালো, বুঝতে চেষ্টা করলো মানুষ কে, কোন্ বাড়ির। শাশ্বতী হাতের ওপর ফেলা শালখানার ভাঁজ খুলে গায়ে বেশ করে জড়িয়ে নিলো। অদ্ভুত ভালো লাগছে তার আজকের এই সকালটাকে। কোন্ প্রকাশককে কোন্ লেখা দিতে হবে, কোন্ সম্পাদকের আমন্ত্রণ তার জন্য অপেক্ষা করছে—এসব চিন্তা তার মনের দিগন্তে আজ আর উঁকি দিচ্ছে না, উঁকি দিচ্ছে দার্জিলিঙের উইন্ডামায়ার-হোটেলের কয়েকটি উৎসুক মুখ। উইন্ডামায়ারের অ্যাডমায়ারাররা মনের সুখে কম্বলের নিচে ঘুমিয়ে থাকুক,—সে আজ মুক্ত বিহঙ্গিনী। সীমানায় এসে সে আজ নির্বাধ প্রকৃতির মুখোমুখি। সে দেখেছে, মেয়েরা এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়ায়,—বরং রাস্তায়-ঘাটে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। চলতে চলতে শাশ্বতী দেখতে পেলো, ঝুড়ি ঘাড়ে করে কয়েকটি তরুণী মেয়ে রাস্তার ধারে নেমে পড়েছে, তারা পাথর ঝুড়িতে করে বয়ে নিয়ে এসেছে। ওদের কাছাকাছি হতে ওরা কেমন হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকালো। মেয়েগুলির গালে গোলাপী আভা,—বেশ লাগছে ওদের দেখতে,—ফুলের মতো মিষ্টি-মিষ্টি মুখগুলো।

হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেল শাশ্বতী, কখনো রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে বিস্তৃত চা-বাগানের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো, কখনো বা কোনো বাঁকের কাছে খাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী নদীর রজতধারার সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলো। এবং এইভাবে যথেচ্ছ ঘুরতে ঘুরতে কতদূর যে সে চলে গেল, তার ঠিক নেই। ফিরলো যখন, তখন দৈনন্দিন কর্মচাঞ্চল্য রীতিমত শুরু হয়ে গেছে। নানীর দোকানে তখন রীতিমত ভীড়। ওকে দেখে বুড়ী নানী একটু হাসলো, সে বোধ হয় এতক্ষণে খবরাখবর নিয়ে দেখে গেছে, এই নতুন মানুষটি কে। ক্ষুদ্র জনপদ, সবাই সবার খোঁজ রাখে, বিশেষ করে নানী। বলি-রেখাঙ্কিত মুখ, কিন্তু হাসিটি বড় স্নিগ্ধ। এই স্নেহমণ্ডিত হাসির জন্যই বোধহয় এ-অঞ্চলে নানী এত বিখ্যাত।

যাই হোক বুড়িকে ছাড়িয়ে বাড়ির সামনে আসা মাত্র ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো প্রমীলা, বললে,—কতদূর ঘুরতে গিয়েছিলি? ও তোকে খুঁজতে বেরুলো যে!

—কে, প্রদোষ?

—হ্যাঁ, আবার কে! বললে—নতুন মানুষ, বিপদে-আপদে না পড়েন।

শাশ্বতী কথাটায় একটু লজ্জা পেলো, বললে—দ্যাখ্ দেখি, তোদের আবার হয়রানিতে ফেললুম!

—না-না, হয়রানি আবার কী! জীপ নিয়ে বেরিয়েছে, এখুনি ফিরবে।

—জীপ!—শাশ্বতী সবিস্ময়ে বললে—আমি ত আসতে-যেতে কোনো জীপ দেখলুম না!

প্রমীলা অবাক-অবাক চোখে তাকিয়ে বললে,—কোন্‌দিকে গিয়েছিলি?

—কেন, ঐ বুড়ীর দোকান ছাড়িয়ে সোজা—

—দেখ দেখি কাণ্ড!—প্রমীলা বললে,—ওই দিকে গিয়েছিলি? ভটিা-পথে? আর ও গেল উজানের পথে, মিরিকের দিকে। আসুন—ঘুরে আসুন একটু—আয়, চা খাবি আয়! দিদির হাত ধরে প্রমীলা ভিতরে চলে গেল।

বলা বাহুল্য, খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এলো প্রদোষ। খাওয়ার টেবিলে সে এক কাণ্ড হলো বটে! যেন খুঁজে না পাওয়াটা একটা ভীষণ মজার ব্যাপার! প্রদোষ বললে,—পিছন থেকে মেয়েছেলে দেখছি, আর কাছে গিয়ে থামছি। ভাবছি, এই বুঝি পেয়ে গেলুম দিদিকে। আপনি যে উলটো পথে ঘুরছেন, তা কেমন করে জানবো!

শাশ্বতী হাসতে-হাসতে বললে,—কেমন মজা! ঠকিয়েছি ত'?

—তা ঠকান, এমন ঠকতে খুব রাজী আছি।

—কেন?

প্রমীলা এইবার ফোড়ন কাটলো, বললে,—বুঝলি না? তোকে খুঁজতে গিয়ে অজস্র পর-নারী দর্শন! যথা লাভ!

শাশ্বতী হেসে ফেললো, মুখখানা একটু আরক্তিম হয়ে উঠলো তার। প্রদোষ কিন্তু লজ্জা পেলো না, বললে,—আজ একটা লাভ হয়েছে। হঠাৎ আজ বুঝলাম, মেয়েদের শাড়ী পরার ধরনটা এখন সর্বভারতীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত পিছন

থেকে দেখলে একটুও বোঝা যাবে না, ভদ্রমহিলা কোন্ প্রদেশের। বাঙালী, না নেপালী, না অন্য কোনো দেশের।

যাই হোক্, হাসি-গল্পের মধ্যে সময়টা কাটলো মন্দ নয়। প্রদোষ জলখাবারের পালা শেষ করে কারখানার দিকে বেরিয়ে গেল। দুই বোনের তখন অখণ্ড অবসর। রান্না করার জন্য কাণ্ডী আছে, দারুণ কাজের মেয়ে। সে রান্ন ঘরে থাকলে আর কোনো ভাবনা নেই,—শুধু কী-কী খাবেন বলে দিন,—কাণ্ডী 'জান কবুল' করেও সে-কাজ করে দেবে। শুধু যেদিন 'সিনেমা' আসবে, সেদিন 'কৃপয়া' ওকে একটু 'ছোড়ে দিবেন'—ব্যস! (কাণ্ডী হিন্দী সিনেমা দেখে দেখে দিব্যি হিন্দী শিখে গেছে)

—সত্যি দিদি,—প্রমীলা বললে,—সিনেমা এলে আর রক্ষে নেই—কাণ্ডী-কাণ্ডা কাউকে আর হাতের কাছে পাওয়া যাবে না!

—সেদিন কী করিস?

প্রমীলা বললে,—কী আর করবো? পাছকোমর বেঁধে সোজা হেঁসেলে ঢুকে যাই।

শাশ্বতী বললে,—দাঁড়া, আমি একদিন হেঁসেলে ঢুকবো।

—তুই!—মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠলো প্রমীলা,—তুই ঢুকবি রান্নাঘরে? কখনো ঢুকেছিস? মা থাকতে ঢুকতে দিয়েছে কখনো তোকে? বরং আমাকে ঢুকিয়েছে, তোকে ঢোকায় নি, বলতো,—ও পড়াশোনা ভালো বাসে, ও ঐ নিয়েই থাক। সত্যি দিদি, তখনো তুই লেখালেখি শুরু করিস নি, তবু মার কতো স্নেহ! পড়াশোনায় নিদারুণ ভালো ছিলি যে!

—তুই ছিলি না বুঝি?—শাশ্বতী বললে,—আমরা তিন ভাই-বোনই লেখাপড়া ভালোবাসতুম, তাই না?

প্রমীলা বললে,—তা বাসতুম, কিন্তু তার মতো তপস্বিনী হলুম না আমি!

—দূর—কী যে বলিস, কোথায় দেখলি তপস্বিনী?

প্রমীলা ফস্ করে বলে বসলো,—বিয়ে-থাও ত' করলি না!

হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেল, বললে—ও কথা বলিস না, ও যে আমার পথ নয়, তা আমি ভালো করেই জেনে গেছি।

প্রমীলা একটু ঝুঁকে ওর হাত দুটো ধরলো,—বললো, অসীমদা এটা কী করলো? শেষকালে আমেরিকান মহিলা!

আশ্চর্য, শাশ্বতীর মুখখানা মুহূর্তে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল, বললে,—ভালোই ত' হয়েছে! ডরোথিকে তুই দেখিস নি, ছেলেফেলা করবার মতো মেয়ে সে নয়।

—তুই এতে খুশি হয়েছিস?

শাশ্বতী অত্যন্ত সহজভাবে বললে,—কেন হবো না?

প্রমীলা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে আর ও প্রসঙ্গে অগ্রসর হতে পারলো না, তবে একটু হাল্কাভাবে আর একটি কথা বলে বসলো,—বলো না এই দিদি, এতক্ষণ ওরা খুব ভারতে শুরু করেছে তো? তুই ত' গেলি না দার্জিলিং।

শাশ্বতী হাসতে লাগলো, বললে,—ভাবুক না বসে বসে। ভেবে কূল-কিনারা বার করুক।

প্রমীলাও হাসছিল, কিন্তু হাসি থামিয়ে একটু পরে সে বললে,—যাই বলিস দিদি, ব্যাপারটা কিন্তু ভালো হোলো না। একজন বিদেশী মেয়ে, সে-ই বা কী ভাববে?

—ওরে বাপ! তোর যে দরদের অবধি নেই!

—না দিদি, তুই ভেবে দেখ,—একটা খবর অন্তত দেওয়া উচিত।

শাশ্বতী বললে,—কী খবর দিবি? ওরা যদি টেন সেয়ে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করে?

প্রমীলা উৎসাহিত হয়ে বললে,—করুক না! ডরোথিকে তাহলে দেখতে পারো।

—খুব বুঝি ঝোঁক তোর ওকে দেখার?

—হবে না?—প্রমীলা বললে,—অসীমদা তোমাকে ফেলে ঐদিকে কেন ঝুঁকলো, জানতে ইচ্ছা করে না?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল শাশ্বতী, বললে,—'আমাকে ফেলে'—কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না, আমাকে সে ফেলেছে কোথায়? ফলে ত' বাঁচলুম! আমি ওর চোখে যেখানে ছিলুম, সেখানেই আছি।

—মানে?

শাশ্বতী বললে,—মানে? মানে খুব সহজ। আমাকে স্তব-স্তুতি করা চলে, তার বেশী কিছু না।

প্রমীলা দিদির কাছে আরও ঘন হয়ে এলো, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললে,—তার বেশি কিছু কি তুই কখনো চেয়েছিস দিদি? নামতে কি চেয়েছিস কখনো দেবীর আসন থেকে? সত্যি করে বল।

শাশ্বতী মুখ নামালো, তারপরে এ-সব কথাবার্তার দাহ যেন মুহূর্তে নিভিয়ে ফেলতে চেয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো বোনের হাতখানা ধরে বলতে লাগলো ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে,—কী সব আবোল-তাবোল নিয়ে আমরা সময় কাটাচ্ছি বলতো! কোনো মানে হয়? আয়, না হয় আমরা একটু ঘুরতেই বেরোই।

—কথাটা চাপা দিস না দিদি,—প্রমীলা মুখ গম্ভীর করে বললে,—দশ-দশটা বছর অপেক্ষা করে কাটালি—অথচ, না দিলি ধরা, না অন্যদিকে মনটাকে চালনা করতে পারলি। কী হবে তোর অমন দেবীর আসন নিয়ে?

শাশ্বতীর ঠোঁটের কোণ থেকে হাসি মিলিয়ে যায় নি, বললে,—বেশ কথা বলতে শিখেছিস যা হোক। সবাই যদি আমাকে দেবীর আসনে বসায়, আমি কী করতে পারি বল্! আসলে ঐ অসীমের কথাই ঠিক। বলে, তুমি গুণী মেয়ে, তোমার গুণই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

বলেই অল্প একটু হেসে উঠলো যেন নিজের মনে, তারপরে জের টানতে লাগলো তার কথার,—আমিও কেমন যেন শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আসলে অসীমদের স্তব-স্তুতি আমার ভালোই লাগে।

বলে, টেনে-টেনে হাসতে লাগলো শাশ্বতী।

প্রমীলা বলে উঠলো,—তাহলে দার্জিলিং গেলি না কেন?

—তোদের জন্য—শাশ্বতী বললে,—মন চাইলো তোদের কাছে চলে আসতে।

প্রমীলা এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো, তার পরে বললে—ঠিক আছে। এবার অসীমদাকে একটা ছোট্ট চিঠি লেখতো। না-না ঠিক চিঠি নয়—বার্তা। লিখবি,—ভেবো না, আমি কাশিয়াঙ থেকে সীমানায় চলে এসেছি বোনের কাছে। আমার বোন প্রমীলা এখানেই থাকে। ডরোথিকে নিয়ে এখানে চলে এসো।

শাশ্বতী, বললে,—এই-ই লিখতে হবে? কী করে পাঠাবি?

—ড্রাইভার যাবে চিঠি নিয়ে।

—এতখানি তেল পুড়িয়ে?

প্রমীলা বললে,—ঠিক আছে। টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। ওদের কারখানার লাগোয়া একটা সাব-পোস্ট অফিস আছে, সেখান থেকে টেলিগ্রাম করা যায়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

শাশ্বতী বললে,—কিন্তু কী দরকার বলতো এসব? এসব ঝুট-ঝামেলার জন্য কি তোদের কাছে এলাম? ভেবে দেখ দিখি, কলকাতায় আমার কতো কাজ? সে কাজ ফেলে রেখে এখানে চলে এলাম কেন? দু'-দণ্ড শান্তি পাবো বলে তো!

প্রমীলা তাড়াতাড়ি দিদির হাত দুটো ধরলো, বললো,—ভুল বুঝিস না দিদি, আমি ভালোর জন্যই বলছিলাম।

শাশ্বতী বললে,—না রে, জোর করে ভালো করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমায় শান্তিতে থাকতে দে।

—ওরা এসে অশান্তি বাধাবে তুমি বলতে চাও?

শাশ্বতী মুখ তুলে, গলায় একটু জোর এনে বলতে লাগলো,—হ্যাঁ, সে-ও এক-ধরনের অশান্তি বই কী! আমি তা চাই না

The Kalyani Spinning Mills Ltd.

(A GOVERNMENT OF WEST BENGAL UNDERTAKING)

6A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor)
Calcutta-13

Phone : 24-6144
24-6145
24-8644
24-8391

Manufacturer of

WEAVING YARN—in Hanks and Cones, Coarse, Fine, Superfine

and

SEWING THREAD—Grey, Bleached, Singed and Mercerised from selected Cotton under strict quality control, for further details please contact Sales Department at Calcutta.

and

Mills at Kalyani and Habra.

রে—সত্যি চাই না। আমি যে এই মুহূর্তে কতো সুখে আছি তা জানিস না।—তুই আর প্রদোষ,—এই দু'জন আমার পাশে থাক—আমি নিজের মনে একটু শুধু ঘুরে বেড়াই এই অপরূপ প্রশান্তির মধ্যে। আমার রয়েছে লেখার কাজ,—আর আমার জীবনে বাড়তি কী চাই?

অবাক হয়েই কথাগুলো শুনছিলো প্রমীলা। তারই দিদি, তারই মায়ের পেটের বোন,—কিন্তু কতো যেন দূরের মানুষ, যাকে ছোঁয়া গেলেও সঠিক বোঝা যায় না। সত্যিই কি ও শান্তি পাচ্ছে এভাবে? না কি, নিজের মনের খবর ও নিজেই জানতে পারছে না? তাই বা কী করে হবে, লেখার মধ্য দিয়ে এতো লোকের মনের খবর ও ছড়িয়ে বেড়ায়, আর নিজের খবরই জানে না?

—তাহলে তুই বলছিস্, দার্জিলিং-এ কোনো খবর পাঠিয়ে দরকার নেই?

—একেবারেই না,—শাশ্বতী মুখ টিপে হাসলো,—দেখ্ না রগড়টা, খবর না পেয়ে কী করে?

প্রমীলা এবার বোধহয় খানিকটা বুঝলো। বুঝলো, ওদের খবর না দেওয়ার মধ্যে দিদির বোধহয় কোনো মতলব আছে। ঠিক আছে, দেখাই যাক না।

সন্ধ্যাবেলা ওদের ঘরে যথারীতি আসর বসে। কারখানার সেই দু'জন ভদ্রলোক আসেন সস্ত্রীক। ঘুরে-ফিরে সেই সাহিত্যের কথাই উঠে পড়ে। উঠে পড়ে শাশ্বতীর লেখার কথা। ওদের পড়া ওর কোনো উপন্যাস নিয়ে প্রশংসার ঢেউ বয়ে যায়। এ-ও স্তুতি। এক-একসময় শাশ্বতীর মনে হচ্ছিল, ওদের মধ্য দিয়ে যেন সেই অসীমই কথা বলে যাচ্ছে। অনেকটা যেন একই ঢং, একই বলার ভঙ্গি। 'সত্যি, কী করে লিখলে? আশা রজতকে অমন ইন্‌টোডার্ট করলে কেন? অবশ্য তোমার বর্ণনার গুণ এক কথায় বলে শেষ করা যায় না। বিধিদত্ত গুণ না থাকলে এ-রকম লেখা যায় না। এক-এক সময় মনে হয়, তুমি লেখার জন্যই জন্মেছো। ঘর-সংসারের জন্য তুমি নও, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় তুমি আবিল হয়ে যেও না,—তুমি এমনি বসে থেকো তোমার উচ্চাসনে, আমরা দূর থেকে শুধু দেখে যাবো, তোমার গুণ-গুনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো।'

অসীমের কথাগুলোই এরা সবাই বলে,—হয়ত ভাষা আলাদা, হয়ত তার মতো গুছিয়ে ওরা বলতে পারে না। কানে অবশ্যই সুধা বর্ষণ করে, কিন্তু সময় সময় হাঁপ ধরে যায় না, ক্লান্তি লাগে না? 'কলকাতার ড্রইংরুম থেকে যে-জন্য পালিয়ে এলাম, যে-জন্য গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম কাশিয়াঙে —সেটার পুনরাবৃত্তি যে প্রমীলাদের নির্জন 'শালিনা'তেও ঘটবে, এটা কি ভাবতে পারা যায়?

না,—আর নয়—শীগ্‌গিরই পালাতে হবে কলকাতায়।—কিন্তু শাশ্বতীর এই চিন্তা ভোরের হাওয়ায় উধাও হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে তৈরী হয়ে নেয়, তারপরে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে-ঘুরতে অনেক দূর চলে যায়। তবে প্রদোষদের সয়ে গেছে, আর ওরা খুঁজতে বেরুচ্ছে না।

আরও দু'-দিন পর পর বেরিয়ে পড়লো সে। উইণ্ডামায়ারের অ্যাডমায়ারার-দের কোনো খবর নেই। কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে 'বাঘে খাইয়াছে মনে করিয়া, গ্রামবাসীরা যেমন দেশে ফিরে গিয়েছিল, এরাও হয়ত ওরকম কোনো দুর্ঘটনা অনুমান করে বোধহয় কলকাতার পথে পাড়ি দিয়েছে।

যাক—বাঁচা গেল। সেদিন সবুজ ব্লাউজের ওপর কচি কলাপাতা রং-এর শাড়ী, আর গায়ের ওপর টেনে দেওয়া তার শালটি, —এইভাবে নানীর দোকানের উল্টোদিকে শাশ্বতী হাঁটা শুরু করেছে। চলতে-চলতে —এ বাঁক ঘুরে—ও বাঁক ঘুরে—শেষে মূল রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অদ্ভুত একটা জায়-গায় এসে পড়লো শাশ্বতী। একটা বাঁকের কাছে ঘুরে দাঁড়ালে খানিকটা সমতলভূমি মানান ফুলে-ফোটা গাছ-গাছালিতে আকীর্ণ দেখা যায় তার পরেই একটা রীতিমত উঁচু ঢিপি পর্বত-শীর্ষের চেহারা নিয়ে দণ্ডায়মান। শিখরদেশে একটা গুমটি মতো করা, হয়ত পার্বত্যদৃশ্য ভালো করে দেখবার জন্যই ওটা তৈরী হয়েছে। শরতের আকাশ পরিচ্ছন্ন নীলিমায় ঝলমল করছে, হাওয়ায় ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব থাকায় রোদ্দুর বড়ো মিষ্টি লাগছে। আসলে সে দাঁড়িয়ে আছে পার্বত্যভূমির ওপর, চার-ছ' হাজার কিংবা কত ফিট উঁচু কে জানে, তার পরে ঐ সম-তলে খানিকটা অরণ্য অঞ্চল, সেটা পেরিয়ে পাহাড়ের ঐ চূড়া। জায়গাটা অভাবিত রূপে নির্জন। অনেক দূরে দেখা যায় মূল পথের ধারে মেয়েরা পাথর ভাঙছে। সকালে চা আর বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছে শাশ্বতী, সুতরাং এখনো বেশ কিছুক্ষণ বেড়ানো যায়। যাবে না কি সে একবার ঐ পাহাড়ের উপর? ক্ষতি কি? ভাবতে ভাবতে এক-সময় সে মনস্থির করে ফেললো। গাছ-গাছালির মধ্যে ঢুকে দেখলো, একটা পায়ে-চলা পথ এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে। সেজন্য চলতে কোনো অসুবিধাই হলো না। কিন্তু শাশ্বতীর একটা জিনিস বড়ো অদ্ভুত লাগছে, সে চলছে ত চলছে, পথ যেন আর ফুরোয় না।

আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা সরু পথ, কোথাও ডালপালা সরিয়ে এগুতে হয়—কোথাও পথ গেছে বাঁদিকে অনেকখানি বেঁকে, কোথাও বা ডানদিকে। এমনি করে করে প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর সে পাহাড়ের পায়ের কাছে এসে থামলো। প্রথমে একটু হাঁপাচ্ছিল সে। জায়গাটাকে জঙ্গলের জন্য সমতলভূমি মনে হলেও সমতল মোটেই নয়, উঁচু-নিচু করতে করতে ওটা এই পাহা-ড়ের দিকেই উঠে এসেছে। তখন পাহাড়ের পায়ের নিচে এসে সে দেখতে পাচ্ছে, জঙ্গলটা ঢালু হয়ে যেন খাদের দিকে চলে গেছে, খাদের পাশে যে পিচের রাস্তা রয়েছে, সেটা এখান থেকে দেখাই যায় না। কিন্তু আশ্চর্য দৃশ্য তার সামনে! খাদের ওপারের পাহাড়গুলির গাম্ভীর্য আরও যেন স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। ওপরে উঠলে না জানি কী অদ্ভুত দৃশ্যই চোখে পড়বে! একটা প্রায় খাড়া চড়াই পথ, যাকে পাহাড়ী ভাষায় এরা বলে 'চোরাবাটো' সেই পথে পা দিয়ে শাশ্বতী উঠতে লাগলো। শাড়ীটা খুলে কোমরে জড়ালো, গাছপালার ডাল আঁকড়ে ধরে দেখতে দেখতে ওপরে উঠে এলো শাশ্বতী। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দম নিলো সে। ঠিকই সে দেখেছিল নিচ থেকে, ওপরে কাঠ দিয়ে চালের মতো ছাওয়া, তার নিচে কাঠের বেঞ্চি মতন পাতা,—তবে সবই বিবর্ণ, ভাঙ্গা-চোরা,—চট করে যে এদিকে কেউ আসে না সেটা বোঝা গেল। রুমাল দিয়ে আসনটা মুছে চুপচাপ বেঞ্চিটার ওপরে বসে পড়লো সে। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘোরানো পথ-রেখা চোখে পড়ে। চোখে পড়ে ঝর্ণার বা পাহাড়ী নদীর রজতধারা। কোথাও বা দেখা যায়, বনের ধারে গরু বা ভেড়া চরছে, পাহাড়ের কোনো পথ দিয়ে জীপ ছুটে চলেছে, —কিন্তু সবই ঘটে যাচ্ছে নিস্তব্ধভাবে, —এখান থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না, —এটাই অবাক লাগছে তার কাছে। এমন অপরূপ নিঃশব্দতা কখনো অনুভব করে নি শাশ্বতী। বহুক্ষণ ধরে এই উদার এবং আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে উঠে দাঁড়ালো সে। পাছে বেশি দেরি হলে ওরা ভাবে, তাই ইচ্ছা না থাকলেও ফেরার পথে পা বাড়ালো।

বাড়ি এসে দৈনন্দিনতার মধ্যে ডুবে গেল বটে, কিন্তু মন থেকে ঐ অপরূপ জায়গাটার কথা সে সরাতে পারছিল না। 'এত দেরি যে? কতদূর গিয়েছিলেন', ভগ্নীপতি বা ভগ্নীর এ সব প্রশ্নের উত্তরে সঠিক কথা সে বলে নি, এবং কেন বলে নি বা বলতে ইচ্ছা করে নি, তার কারণটা কে বলবে? অর্থাৎ আমার একান্ত ভালো-লাগার কথাটি আমি দুনিয়ার কাউকে আপাতত বলতে চাই না', —এই-ই বোধহয় ছিল শাশ্বতীর মনোভাব। যে এক পরম ঐশ্বর্যের বার্তা সে নিজের কাছে সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে চায়। সাধারণ মেয়ে হলে এ-কথা সে কাউকে না বলে পারতো না, কিন্তু অন্তর্মুখী মন যার, যার মানসিকতা সৃষ্টিশীল, —তার পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শুধু বোনের কাছে কথায়-

কথায় সে বললে, —এমন জায়গায় আছিস যে, এখান থেকে চলে যেতে মন সরছে কই?'

প্রমীলা ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, —দিদি, তোর যতদিন খুশি, থাক। আমার কথা ছেড়ে দে, আমি ত তোর নিজের বোন, কিন্তু তোর জগন্নীপতিও তোকে পেয়ে একেবারে আত্মহারা!

—সে আমি জানি, —শাশ্বতী বললে, —আমার অজস্র কাজ পড়ে রয়েছে কলকাতায়, তবু এখান থেকে এখনই ফিরে যেতে মন চাইছে না। কেন বল্‌তো? তোদেরই গুণে। আর তাছাড়া—

বলে, একটু থেমে, একটু দম নিয়ে শাশ্বতী আবার বললে, —তাছাড়া, এ জায়গাটার তুলনা নেই। এমন প্রশান্তি!

প্রমীলা মুখে না বলে মনে মনে বললে, —সে তুমি দু'দিন এসেছো বলে মনে হচ্ছে। আমরা ত হাঁপিয়ে উঠি! তাই সময় পেলেই হয় দার্জিলিঙ, নয় কার্শিয়াঙ, আর নয়ত শিলিগুড়ি চলে যাই। তুমি এসেছো বলে, তুমি কাছে আছো বলে আমাদের দু'জনের জীবনে একটু বৈচিত্র্য এসেছে।

সন্ধ্যায় যথারীতি আসর বসলো। অতিথিরা জাঁকিয়ে বসলেন। গল্প-গুজব চলতে লাগলো। বলা বাহুল্য, শাশ্বতীই মধ্যমণি। ওর পড়াশুনার পরিধি, ওর চিন্তাশক্তি, ওর গুছিয়ে-বলার আশ্চর্য ক্ষমতা, এ সব দেখে প্রমীলাই অবাক হয়ে যায়। ছোট থেকেই ও ভাবুক প্রকৃতির, কিন্তু এমন পাণ্ডিত্য যে ওর মধ্যে একদিন বিকাশ লাভ করবে, এটা কে ভাবতে পেরেছিল? নিজের দিদি হয়েও যেন কাছের কেউ নয়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটি মানুষ।

কোলাহল মিটে যাবার পর রাত যখন গভীর, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে শাশ্বতী যেন আরও অনেক দূরে চলে যায়। ঘুরে-ফিরে আজকের দেখা সেই আশ্চর্য জায়গাটার কথা মনে পড়তে লাগলো। বিবর্ণ কাঠের সেই বেঞ্চিটা, তার ওপর ছুরি দিয়ে খোদাই করা কয়েকটা নাম, —সবই দেবনাগরীতে লেখা। দেবনাগরী হলেও জড়ানো-জড়ানো। তার মধ্যে একটা নামই সে ভালো করে পড়তে পেরেছিল, —নীললোচনা। কে এই নীললোচনা কে জানে, কবে সে এসেছিল ওখানে কে জানে, কিন্তু তার ঐ অদ্ভুত নামটা এখনো মুছে যায় নি। তার পাশে হাইফেন-সংলগ্ন আরও একটি নাম রয়েছে, —কিন্তু এমন বিবর্ণ হয়ে গেছে যে সে পড়তে পারে নি। কাল ভোরে আবার সে যাবে, আবার সে পড়বার চেষ্টা করবে।

পরের দিন ভোরবেলাটা একটু মেঘলা-মেঘলা। সেজন্য শীত শীত ভাব একটু বেশি। খুঁজে-পেতে প্রমীলার গোলাপী আর সাদায় মেশানো উলের স্কার্ফটা গায়ে জড়িয়ে, ব্লেক-কার্স্ট সেরে শাশ্বতী বেরিয়ে পড়লো। প্রমীলাও দিদির দেখাদেখি ভোরে উঠতে শুরু করেছিল। সে বললে, —আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

পথ হাঁটতে সঙ্গিনী পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু ঐ আশ্চর্য জায়গাটায় একা গিয়ে বসতে, আর নিজের মনটাকে ভাবনার স্রোতে ছেড়ে দিতে এমন মোহ অনুভব করলো শাশ্বতী যে, প্রস্তাবটা শুনে যেন আঁতকে উঠলো, বললে, —না-না, সে কী! প্রদোষ একটু পরে উঠবে। তোর কাজকর্ম আছে না? নারে, তুই থাক, এখানে একা একা বেড়াতে আমার একটুও অসুবিধা হয় না, বরং ভালোই লাগে।

—নতুন জায়গা তোমার পক্ষে, একটু ভয়-ভয় করে না?

শাশ্বতী বললে, —কেন করবে? পথে-ঘাটে দেখি তোরেই মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে। অনেকের সঙ্গে আমার মুখ-চেনা হয়ে গেছে, দেখলে মুখ টিপে টিপে হাসে।

প্রমীলা বলে, অবশ্য এসব জায়গায় মেয়েরা কখনো বিপদে পড়েছে শুনিনি, সে-সব দিক দিয়ে খুব ভদ্র জায়গা!

কথাটা শুনে শাশ্বতী হেসে ফেললো, —কী যে বলিস! ছত্রিশ বছরের বুড়ী, আমার আবার বিপদই বা কী?

প্রমীলা ওর কণ্ঠের লঘু স্বরকে উপেক্ষা করে নিজের কথার জের টেনেই বলতে লাগলো, —তা হোক বাপু, খুব দূরে দূরে যাস নি। বলা যায় না, বর্ডার বড়ো জায়গা!

শাশ্বতী এবার দরজার দিকে পা বাড়ালো, বললে, —গয়নাপত্তর, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই, শুধু আছে রিস্ট-ওয়াচটা, —তা-ও পুরোনো, —কে আর ছিনতাই করতে আসবে বল্?

চললুম। তোর এখানে ভোরে বেড়ানোটাই সব থেকে উপভোগ্য ব্যাপার আমার কাছে।

প্রমীলা আর কিছু বলে নি, একটা সবুজ স্কার্ফ গায়ে জড়িয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো, যতক্ষণ পর্যন্ত দিদিকে দেখা যায়।

চলার পথে আবার সেই বুড়ী নানীর হাসি, মজুর-মেয়েদের গোলাপী গাল, তাকে দেখে চাপা হাসি ও খুশীতে আরক্ত হয়ে যাওয়া, —সব পার হয়ে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। সেই বেঞ্চির গায়ে খোদাই-করা 'নীললোচনা'-নামটা তাকে যেন হাত-ছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। না, শুধু নামটাই বা কেন, —অমন নিরালা-নিস্তব্ধ জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? বিশেষ করে যারা লেখে, লিখতে চায়, —তাদের কাছে পরম কাম্য বস্তু। মুনি-ঋষিরা সেকালে বোধ হয় এমনই জায়গা খুঁজে নিয়ে ধ্যানে বসতেন। ভাবতে ভাবতে শাশ্বতী চলেছে, তারপরে এক সময়ে পথ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। তারপরে জঙ্গল ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা। সেই বেঞ্চি, সেই অপরূপ প্রশান্তির প্রতিমূর্তি!

চুপচাপ বসে রইলো শাশ্বতী, —কেউ নেই এখানে, নেই ভীড়, নেই বুদ্ধিদীপ্ত তর্ক-বিতর্কের ঝড়, নেই তাকে দেবী-জ্ঞানে পূজার্থীর জটলা, —এমন কি, তার বাবা, তার বোন, জগন্নীপতি, —কারুর চিন্তাই তার মনে রইলো না, —সে শুধু চোখ চেয়ে দেখতে লাগলো, —নীরব ঝর্ণা, মেঘের টুকরো পাহাড়ের বুকে নেমে এসে খেলা করছে, —স্থবির এবং অনড় পাহাড়ের বুকে পথের ওপর দিয়ে গাড়ি চলার গতি অনুভব করা যায়, —কিন্তু কোনো শব্দ নেই। যেন সিনেমা-ঘরে ছবি চলতে চলতে হঠাৎ তাদের কথা কওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এই ভোরের হাওয়া-দোলানো গাছের পাতার শিরশিরানি, আর মেঘের খেলার মধ্যে এই অনাস্বাদিত-পূর্ব নৈঃশব্দ, —একে সারা মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করাও কি কম সৌভাগ্যের কথা? শাশ্বতীর মনে হচ্ছিল, —এখানে এমন করে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি যুগ যুগান্তর কাটিয়ে দেয়।

যুগ-যুগান্তর নয়, হয়ত বা ঘণ্টার পর ঘণ্টাও নয়, হয়ত-বা বড়োজোর এক ঘণ্টা,—হঠাৎ তার ধ্যান যেন ভেঙ্গে গেল। মনে হলো এই সুমহান নীরবতাকে খান খান করে দিয়ে টুপটাপ যেন ঝরা পাতা ঝরে পড়ার শব্দ শুনলো সে। পাতা-ঝরার শব্দ সচরাচর শোনা যায় না, কিন্তু এখানকার নীরবতা এমন প্রগাঢ় যে এখানে বোধ হয় কান পেতে তা-ও শোনা যায়।

কিন্তু কোথায় পড়লো টুপটাপ করে ঝরা পাতার দল? কোথায় জেগে উঠলো মর্মর ধ্বনি,—তার সামনে, না পিছনে? সামনের গাছটার তলায় মনোযোগী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে মনে হলো, তার পিছনে কার যেন ছায়া। আর মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চট্ করে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরতেই—

পিছন ফিরতেই সে স্থানুর মতো অনড় দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, —অজগরের সামনে হরিণ-শিশু যেমন করে দাঁড়ায়, —তেমনি করে। না, তা-ই বা হবে কেন? হরিণ-শিশু বা হবে কেন সে আর যাকে দেখছে, সে অজগরই বা হবে কেন?

একটি মানুষ। লম্বা, শক্তসমর্থ চেহারার একটি মানুষ। কালো প্যান্টের ওপরে কমলা রঙের সোয়েটার একটা ছিটের হাফহাতা সার্টের ওপরে। দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিচ্ছন্ন মুখ হলেও, গালের কাছটায় একটা কাটার দাগ মুখখানার সমস্ত

কোমলতা হরণ করেছে। বয়স কিন্তু খুব কম নয়, চল্লিশের কম ত নয়ই, —কিন্তু সর্ব অবয়বে একটা কাঠিন্য এনে দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি ক্রুর—চোখ জ্বলজ্বলে এবং একটু লালচে। নিচের ঠোঁটটা তুলনায় একটু পুরু। গায়ের রঙ এককালে হয়ত ফর্সা ছিল, এখন তামাটে। আশ্চর্য, শাশ্বতী অবাক হয়ে দেখছে, আর লোকটার চেহারা বিশ্লেষণ করছে। ভয় পেয়ে আচমকা চীৎকার নয়, সে যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে, গলা দিয়ে স্বরও ফুটছে না। মন কিন্তু নিশ্চল হয়ে নেই, সে ওরই মধ্যে মিনিটখানেক কি দুয়েক ধরে লোকটার চেহারা বিশ্লেষণ করে চলেছে।

লোকটাও থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। মনে হয়, সে-ও যেন ওকে এখানে দেখে তেচকিত হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে লোকটা যেন সম্বিত ফিরে পেলো, হিন্দীতে যা বললো, তার অর্থ, —আপনি নিশ্চয়ই এদিককার লোক নন। কোথাকার আপনি?

শাশ্বতীর কণ্ঠে তখনো স্বর ফুটছে না। লোকটা দু-এক পা তার দিকে এগিয়ে এলো, বললে, —হিন্দী বুঝছেন না বোধ হয়?

বলে একটু থেমে, তাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলো, —বাংলা বুঝবেন কী? বোধ হয় মাথা নেড়ে শাশ্বতী নিজের অজ্ঞাতেই নীরবে উত্তর করেছিল, —বুঝবো।

—হুঁ, —লোকটা এবার বাংলায় বললে, —আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। এদিককার মেয়ে যখন নয়, তখন বাঙালী না হয়ে যায় না।

এতক্ষণ পরে স্বর ফুটলো শাশ্বতীর কণ্ঠে। লোকটার মুখে বাংলা শুনে মনে মনে সে বোধ হয় আশ্বস্ত হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলো, —আপনি কে?

লোকটা ঠোঁট টিপে একটু হাসলো, হাসবার ভঙ্গিটা ভালো নয়, বললে, আমাকে চিনে দরকার নেই, আমি জিজ্ঞেস করছি, এখানে একা একা এলেন কী করে? কোথায় থাকেন আপনি? নিশ্চয়ই নতুন লোক। পুরানো হলে, এখানে হুট্ করে কেউ পা দিতে সাহস করতো না।

শাশ্বতী অস্ফুটকণ্ঠে উত্তর দিলো, —কেন!

লোকটা আরও কাছে এলো, বললে, —এখানে কেউ আসে না।

—কেন!

—ভয় আছে।

শাশ্বতী চোখ তুলে তাকালো, —কীসের ভয়?

লোকটি বললে, —চারিদিকে চেয়ে দেখুন, লোকজন নেই, চীৎকার করলেও কেউ ছুটে আসবে না। এমন জায়গায় কেউ আসে চট্ করে?

শাশ্বতী আঙুল দিয়ে বেঞ্চিটা দেখালো, —ঐ যে নাম, —নললীলোচনা। নিশ্চয়ই কেউ আসতো। ভালো করে নামটি দেখলে লোকটা, তারপর বললে, —ও জমানা চলে গেছে। এখন এটা হয়েছে শ্মশানের মতো।

—শ্মশান

লোকটি বললে, —তাছাড়া কী! কী আছে এখানে?

শাশ্বতীর বিস্ময় ও বিহ্বলতার ঘোর তখনো কাটে নি, কিন্তু সেটা সে বাইরে প্রকাশ পেতে দিতে চায় না বলে সহজভাবে কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলো, বললে, —জায়গাটা সুন্দর!

লোকটা এবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে উঠলো, —সুন্দর-টুন্দর বুঝি না, এ কোথায় আপনি এসেছেন জানেন? এটা ভারত নয়, নেপাল। আপনি নেপালের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। এখানে আপনি খুন হলেও ওদিককার লোক ছুটে আসবে না।

এইবার বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো শাশ্বতীর, বললে, —তাহলে—!

লোকটি অদ্ভুত বাঁকা চোখে তার দিকে তাকালো, বললে, —তাহলে কী? ভুল করেছেন। নতুন লোক বলেই ভুলটা আপনার হয়েছে।

শাশ্বতী বললে, —কিন্তু আপনি? আপনি ত বাংলা বলছেন। আপনি কী—

লোকটার ভঙ্গিতে আবার ফুটে উঠলো অসহিষ্ণুতা, বললে, —আমি ভারতের কেউ নই। আসুন আমার সঙ্গে—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। দেরি করবেন না।

শাশ্বতীর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল, কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, —না-না আপনাকে পৌঁছতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারবো।

বলে, কয়েক পা পথের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই লোকটি ছুটে এসে তার সামনে রাস্তা আগলে দাঁড়ালো, কণ্ঠস্বর বুঝি বা একটু রুক্ষ, বললে, —যাচ্ছেন কোথায়? হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে। তার থেকে আমার সঙ্গে আসুন, আমার জীপ আছে, চট্ করে পৌঁছে দেবো।

—জীপ?

—হ্যাঁ, জীপ, লোকটি বললে, —আপনি যে রাস্তায় জঙ্গল পার হয়ে এসেছেন, সে-রাস্তায় নয়, উলটো রাস্তায় আমার জীপ আর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে চান? ওদিকে চলুন।

শাশ্বতীর যে-অবস্থাটা হয়েছিল, তাকে বলা যেতে পারে, হক্‌চকিয়ে যাওয়া। ঘটনার আকস্মিকতায় সে যেন কীরকম মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। নইলে, লোকটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তার ইঙ্গিত বা ইচ্ছামত সে ঐ টিলার বিপরীত দিকে এসে দাঁড়ালো কেমন করে?

টিলার যে দিকে বেঞ্চিটা পাতা ছিল, এটা তার বিপরীত দিক। এদিকে সে এসে কাল বা আজ একবারও দাঁড়ায় নি। দাঁড়ালে দেখতে পেতো, এদিকেও একটা পাহাড়ী রাস্তা,—এঁকেবেঁকে চলে গেছে। তবে এ-রাস্তা পিচ-বাঁধানো নয়, এ-রাস্তার রঙ গেরুয়া,—পরিসর ছোট, একপাশে অতলস্পর্শী খাদ। শাশ্বতী দেখতে পেলো, টিলার ঠিক নিচেই একটি পুরানো—বিবর্ণ জীপ দাঁড়িয়ে আছে। চাকাটাকাগুলো লাল ধুলোয় ভর্তি। জীপের বাইরে এসে বনেটের গায়ে ঠেস দিয়ে লাল সোয়েটার আর খাকী প্যান্ট পরা একটা এদেশীয় বেঁটেখাটো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তাদের দেখতে পেয়ে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো। সারা মুখে বসন্তের দাগ, লোকটার মুখখানা যেমন ভীষণ দেখাচ্ছে, তেমন ভীষণ আর ক্রুর তার চাউনি, সহ্য করা যায় না, আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতেই পাশের লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, চোখের কোণে তীক্ষ্ণ ধারাপদের দৃষ্টি, সারা দেহমন অস্বস্তিতে ভরিয়ে দেয়। সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে দাঁড়ালো, বললে,—থাক আপনার জীপ—আমি যেমন এসেছি তেমনি বাড়ি ফিরবো। ধন্যবাদ। বলে, ফিরতেই লোকটা চট্ করে তার একটা হাত চেপে ধরলো, বললে,—তা হয় না। আপনি—

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে শাশ্বতী বললে—আঃ! একী! ছাড়ুন হাত!

লোকটির মুখের হাসি বিস্তৃত হলো, বললে,—ছাড়বার জন্য ধরি নি। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বলে, তাকে কাছে টানবার চেষ্টা করতে লাগলো লোকটি। শাশ্বতী প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, বললে, পেয়েছেন কী আমাকে? ছেড়ে দিন, আমি যাবো না। রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি। সে চেঁচাবার চেষ্টা করতেই তার মুখে হাত চাপা দিলে লোকটা। বললে,—এখান থেকে হাজার চিৎকার করলেও লোকে শুনতে পাবে না—লোকালয় অনেক দূরে। তার থেকে মানে মানে চলে এসো, টুস্ করে জীপে তুলি, আর ঝপ্ করে পৌঁছে দেই।

লোকটা হাত তখনো ছাড়ে নি। সে খাঁচার মধ্যে বন্দী পাখীর মতো ঝট্‌পট্ করছে দেখে লোকটা বলে

উঠলো,—কোনো লাভ নেই সুন্দরী, আমি যখন—

—সুন্দরী!—নিজের মনেই সে উচ্চারণ করলো,—আমি সুন্দরী।

লোকটা, অর্থাৎ শয়তানটা বলতে লাগলো,—আমি যখন থাবা বাড়িয়েছি, তখন তোমার ছাড়ান নেই। যেতেই হবে।

লোকটা এবার সজোরে হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগলো বেঞ্চিটার পিছন দিকে। বোধহয় ও-দিকে কোনো 'চোরা-বাটো' বা উৎরাই-পথ আছে, যেখান থেকে সে উঠে এসেছিল, হয়ত বা নিচে থেকে তাকে কোনক্রমে দেখতে পেয়ে। কিন্তু শাশ্বতীকেও অতো সহজে কাবু করা যায় না।

সে অপর হাতটা বাড়িয়ে বেঞ্চিটার হাতল ধরে ফেললো, বললে,—না—যাবো না—কী করতে চাও আমাকে নিয়ে?

লোকটি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে চট্ করে ফিরে দাঁড়ালো, বললে,—সাচমুচ পেঁছে দিতেই চেয়েছিলাম। নিছক ভদ্রতা। হাজার হোক—বাঙ্গালী মেয়ে ত? কিন্তু তোমার জিদ আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আর ত তোমায় ছাড়তে পারি না—যেতে আমার সঙ্গে হবেই।

বলে, খপ্ করে ওর হাতটা আবার চেপে ধরলো লোকটি, চোখ দুটো এবার তার যেন বাঘের মতোই জ্বলতে শুরু করেছে।

আঃ! বলে সত্যিই চীৎকার করে উঠলো শাশ্বতী।

বাঁকা হেসে শয়তানটা বললে,—কোন লাভ নেই। মাইলের মধ্যে কোনো লোক নেই—কে শুনবে?

এক ঝট্কায় ওকে বুকের ওপর টেনে আনলো লোকটা, বললে,—আমার মাথায় যখন আগুন ধরিয়েছো, তখন তোমায় ছাড়বো না।

দু'হাতে সজোরে তাকে চেপে ধরেছে লোকটা। শাশ্বতীর কাছে এ অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। সে পূজা পেয়েছে, বড়োজোর তার হাতখানা আলতোভাবে স্পর্শ করেছে কেউ, তার বেশি কিছু নয়। এক অসীম তার হাত ধরে নিবিড় চাপ দিয়েছিল একবার—কি দু'বার,—এবং ঐ পর্যন্তই। তার ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত লোকে তার গুণপনার সুখ্যাতি করেছে, তার স্তাবকতা করেছে, তাকে 'দেবী'ও আখ্যা দিয়েছে অনেকে,—কিন্তু এ মানুষটার ব্যবহার অন্য! এ-রকম ব্যবহার তার সঙ্গে যে কেউ করতে পারে, তা তার ধারণাও ছিল না। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে সে বলতে লাগলো,—কী চাও! কী চাও তুমি? এই দেখ, আমার গায়ে সোনাদানা কিছু নেই, এই রিষ্টওয়াচটা আছে,—নাও, এটা নাও।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিলো লোকটা, বললে,—কই দেখি!

শাশ্বতী ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি ওর রিষ্টওয়াচটা খুলে লোকটার হাতে দিলো, লোকটা এক পলকে ওটা দেখে নিয়ে বললে,—এইচ-এম-টি? কত দাম? বড়োজোর চারশো! বলে, হাত থেকে ফেলে দিলো ঘাসের মধ্যে। তারপরে পকেট থেকে চট করে বার করলো একটা লম্বাটে ঘড়ির বাক্স। সেটা বেঞ্চির নিচে নামিয়ে দিয়ে বললে,—এই রইলো, হাজারের কম দাম হবে না। অটোম্যাটিক। তোমাকে দিলুম। এবার—

বলে, আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার গায়ের স্কার্ফ খুলে পড়লো ঘাসের ওপর। লোকটির উদ্দেশ্য তার গয়নাগাটি বা হাতঘড়ি নয়, লোকটির উদ্দেশ্য অন্য। রুদ্ধকণ্ঠে শাশ্বতী বললে,—আমি কে জানো? জানো আমার পরিচয়?

লোকটা যেন ক্ষেপে গেছে, বললে,—কিছু জানতে চাই না—তুমি সুন্দরী—ব্যস—তা'হলেই হলো। এসো! এসো আমার সঙ্গে।

হাত ধরে আবার হিড়হিড় করে টানতে লাগলো। শাশ্বতী জানে, চেঁচিয়ে সত্যিই কিছু হবে না,—কেউ শুনতে পাবে না তার চিৎকার,—কেউ আসতে পারবে না ছুটে। যা করতে হবে, নিজের চেষ্টাতেই করতে হবে। সে প্রাণপণে ওর হাতের ওপর কামড় বসিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। মুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই কামড়-খাওয়া রক্ত ফুটে ওঠা হাতের দিকে তাকালো শয়তানটা, মুখটা তার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে,—সাবাস! এই ত চাই! কিন্তু আর ত তোমায় ছাড়া যায় না।

শাশ্বতী তখন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পালাবে কী করে? মুহূর্তে যেন ঝড় উঠলো। সে ওর হাতের ধাক্কায় পড়ে গেল তারই সেই লুটানো স্কার্ফটার ওপরে। আর তার পরেই ক্ষুধিত বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে। প্রাণপণ প্রতিরোধ করেও কিছু হলো না, বাঘটা যেন তার দেহটাকে ছিঁড়ে কুটে খেতে লাগলো। তার চোখের সামনে কখনো সেই বনা পশুর মাথাটা, কখনো বা নীল আকাশের বুকে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করা হালকা মেঘের ভেলা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, তার সর্বস্ব লুট করে লোকটা এক সময় যেন তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে গেল। সে সব বুঝছে, চেতনা আছে পুরো-মাত্রায়,—কিন্তু তার লুটিয়ে পড়া শরীরটা যেন তার শরীর নয়। সে নিশ্চল হয়ে মাটির ওপরে শুয়ে আছে, লোকটা তাকে যেন কী বললো, তারপরে সেই চোরাবাটো দিয়ে দুদ্দাড় করে নেমে গেল। আর, আকাশটা ততক্ষণ স্বচ্ছ নীলিমায় হেসে উঠেছে, শীতের শিরশিরানি নেই, হালকা মেঘের ভেলা ছুঁয়ে মনোরম রোদ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেন লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিয়েছে।

সময় তবু কাটে, মেঘের ভেলায় চড়ে সময় ঠিকই পার হয়ে যায়, শাশ্বতীকেও উঠে বসতে হয়। না, কেউ কোথাও নেই। সে ধীরে ধীরে হেঁটে সেইদিকে এসে দাঁড়ালো, যেখান থেকে সেই লাল রাস্তা আর জীপটাকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় জীপ? চোরের মতো সেটা গা ঢাকা দিয়ে ঠিক পালিয়ে গেছে। ও-পথে কিম্বা আশপাশে একটা জনপ্রাণীকেও আর দেখা যাচ্ছে না। শাশ্বতী কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে সরে গেল বেঞ্চির পিছন দিককার 'চোরাবাটো' বা উৎরাই পথের দিকে। পথটা খানিকটা নেমে বাঁ-দিকে বেঁকে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেখলে বেশ বোঝা যায়, অদৃশ্য পথটা ঘুরে চলে গেছে যেখানে জীপটা দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই দিকে। তাহলে এটা পরিষ্কার, শয়তানটা এই পথেই এসেছিল। কিন্তু শাশ্বতীকে সে দেখতে পেলো কেমন করে? নিচে, জীপটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে কি তাকে দেখা যায়? হয়ত যায়। যখন সে চুপচাপ বেঞ্চিতে বসেছিল, তখনই তাকে নিচে থেকে দেখতে পেয়েছিল শয়তানটা, কিন্তু দেখতে পেলেই কি এমন রাক্ষসের মতো ছুটে আসতে হবে? এ-রকম যে করতে পারে, তা তার কল্পনাতেও আসে নি কখনো।

আস্তে আস্তে সে হেঁটে এলো বেঞ্চিটার কাছে। ঘাসের আস্তরণের ওপর পড়ে আছে তার এইচ-এম-টি ঘড়িটা। ওটা সে তুলে নিয়ে হাতে পড়লো। এবং পরা শেষ করতে না করতেই তার চোখ গেল বেঞ্চিটার কিনারে। লম্বাটে ঘড়ির বাক্সটা যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে, শয়তানটা নিয়ে যায় নি। সারা শরীর-মন একটা অশুচি ভাবে ও ঘৃণায় রী-রী করছে, তবু বাক্সটা সে তুলে

২৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

উড়ো চিঠি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

জয়ন্ত বাইরের ঘরে বসে চাকরির দরখাস্ত লিখছিল। আজকাল দরখাস্ত হাতে লেখে না, টাইপ করে দেয়।

কিছু পয়সা অবশ্য বেশী যায় কিন্তু দরখাস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। দেখতেও ভাল, পড়তেও সুবিধাজনক।

কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান লিখেছে দরখাস্ত আবেদনকারীর স্বহস্তে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাই জয়ন্ত দরখাস্ত লিখছে খুব ধীরে ধীরে সাবধানে কলম আঁকড়ে ধরে।

জয়ন্তর হাতের লেখা খারাপ নয়, মোটামুটি ভাল, যত্ন নিয়ে লিখলে আরও ভাল হয়।

যত্ন না নিয়ে উপায় আছে! সম্ভব হলে জয়ন্ত নিজের বুকের রক্ত দিয়ে দরখাস্ত লিখত, নিজের হাড়ের কলমে।

এম.এ পাশ করেছে বছর চারেক আগে। তারপর থেকেই চলেছে এই দরখাস্ত লেখার পালা।

এই ক'বছরে কাগজ যা লেগেছে তা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা হয়ে যেতে।

স্তোত্র লেখা হলে দেবতাদের মন্ত্র টলত। কিন্তু অফিসের দেবতারা অচল, অনড়।

ভাগ্য ভাল, সংসারটা ছোট।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের প্রায় কিনারে পৌঁছাল বাপ, রোগজর্জর মা ও ছোট একটি বোন। বোনটি এত ছোট যে তার বিয়ের সমস্যা আগামী দশ বছরের মধ্যে হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

এটা যেমন স্বস্তির কথা, তেমনই

আশঙ্কার কথাও। কারণ, বোনের ভার যে জয়ন্তর উপর পড়বে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে জয়ন্তর সম্বল তিনটি টিউশনি। রাই কুড়িয়ে বেল। সংসারটা শুধু জলধিই নয়, উত্তাল তরঙ্গসংকুলও।

চারটে টিউশনি সেই ক্ষুব্ধ জলধিতে কাঠের ভেলা সদৃশ। তাতে সংসার বাঁচানোর চেষ্টা বাতুলতা।

জয়ন্তর জীবন একেবারে ছকে বাঁধা। সকালে দুটো টিউশনি, রাত্রে দুটো, আর সারা দুপুর অফিসে অফিসে টহল দরখাস্তের বোঝা নিয়ে।

এর ওপর মা'র সাবধানী বাণী আছে। মাকটার চাকরি আর মোটে দু-বছর। সরকারী অফিস নয় যে আজীবন পেন্সন পাবে। লোকটা রিটায়ার করার আগে একটা চাকরি জুটিয়ে নাও, না হলে সবাইকে উপোস করে মরতে হবে।

মা কথাগুলো এমনভাবে বলে যেন জয়ন্তকে লোকে সাধাসাধি করছে। সে ইচ্ছা করেই চাকরি নিচ্ছে না। অফিসের দেবতার অফিসের সিঁড়িগুলোর চেয়েও কঠিন। দরখাস্তও হাত পেতে নিতে চায় না।

বাপের এমন চাকরি নয় যে, ছেলেকে তার আফিসে ঢোকাবে। নিজেই বহুবার খসতে খসতে বেঁচে গেছে। মারোয়াড়ী মালিক। বাঙালী পোষণ খুব প্রীতির চোখে দেখে না।

দরজায় খুটখাট শব্দ।

ছবির সন্তর্পণ করস্পর্শ।

বাবা অফিসে, মা রান্নাঘরে, বোন স্কুলে।

বাইরের ঘরে জয়ন্ত একলা। কাজেই তাকে উঠতে হ'ল।

এই সময় আবার কে এল? দরজা খুলেই জয়ন্ত পিছিয়ে এল।

নিভা।

মুখে-চোখে উদ্বেগের ছাপ।

এ বাড়ী নিভা চেনে, কিন্তু বিশেষ আসে না।

কি ব্যাপার?

একটু আসতে পারবে?

কোথায়?

মোড়ের পার্কে আমি অপেক্ষা করছি, তুমি এস। নিভা চলে গেল।

খোলা দরজার সামনে জয়ন্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নিভার সঙ্গে তার আলাপ বছর দুয়েকের ওপর।

মাঝে মাঝে কলকাতায় দুর্যোগ নামে।

বৃষ্টির জলে রাস্তা ফুটপাথ একাকার। যানবাহন অচল। পথচারীর দুর্দশার শেষ থাকে না।

তেমনই এক বিকালে।

জয়ন্ত অফিসে টহল সেরে জল-কাদা ভেঙে বাড়ী ফিরছিল। পায়ের চটি হাতে, মাথায় অবশ্য ছাতি, কিন্তু তাতে বৃষ্টি আটকাবার সম্ভাবনা কম।

যেতে যেতেই হঠাৎ চোখে পড়েছিল।

একটি তরুণী ভিজে ভিজে চলছে।

জয়ন্ত তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আসুন ছাতার মধ্যে।

মেয়েটি একটু দ্বিধা করেছিল, তারপর জয়ন্তর ছাতার নীচে এসে বলল, কি বিশ্রী বৃষ্টি।

জানা গেল, জয়ন্ত আর মেয়েটির গন্তব্য-স্থল একই দিকে। মেয়েটি ভবানীপুর, জয়ন্ত কালীঘাটে।

যেতে যেতে কথা হয়েছিল।

মেয়েটির নাম নিভা। এক সেলাইয়ের স্কুলে গিয়েছিল। ফেরার পথে এই বিপত্তি।

এক শহরে বাস, তাও এত কাছাকাছি। আরও কয়েকবার দুজনের দেখা হয়েছে। কথাও।

নিভা জয়ন্তকে উৎসাহ দিয়েছে।

চিন্তা করবেন না, এত পরিশ্রম করছেন, ঠিক আপনার একটা চাকরি হয়ে যাবে।

এই উৎসাহটুকু জয়ন্তর খুব ভাল লেগেছিল। চারিদিকে কেবল নিরাশার ছিটে। নেতি নেতি ভাব। জয়ন্ত জীবনের ওপর আস্থাই হারিয়ে ফেলেছিল।

নিভার কথা সঞ্জীবনীমন্ত্রের সামিল। আরও অনেক কথা হয়েছে। অন্তরঙ্গ কথা। তারপর হঠাৎই দুজন আবিষ্কার করেছিল যে, দুজনে দুজনের খুব কাছে এসে পড়েছে।

একজন আরেকজনের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য। জয়ন্ত বলেছে, তার জীবিকার স্থিরতা এলে সে নিভাকে কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু সে কবে!

নিভা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যবেই হোক, সে অপেক্ষায় থাকবে।

নিভার সংসারের অবস্থা জয়ন্তর সংসারের মতন এমন ভয়াবহ নয়।

বাপ সরকারী অফিসের উঁচুতলার কেরাণী। বড়ভাইও চাকরি করে। অবশ্য কলকাতার বাইরে। সংসারের হাল মায়ের জিম্মায়।

জয়ন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে নিল। ধুতিটা পাট করে জড়ান ছিল। সেটা খুলে ভাল করে পরে নিল।

তারপর চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মা দরজাটা একটু বন্ধ করবে এস, আমি বের হচ্ছি।

মা'র নজর ছিল তরকারির কড়ার ওপর। আঁচল দিয়ে কড়া নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখন কোথায় যাচ্ছিস?

এই মোড়ের মাথায়।

কথাটা বলেই জয়ন্ত দরজার দিকে এগোতে আরম্ভ করল।

মা পিছন পিছন।

রাস্তায় নেমে জয়ন্ত জোরে জোরে পা চালাল।

এই সময়ে পার্কে অবশ্য ভিড় থাকার কথা নয়, তবু মেয়ে-ছেলের বসে থাকার পক্ষে যে কোন সময়ই অস্বস্তিকর।

পার্কের কাছাকাছি গিয়ে জয়ন্ত এদিক-ওদিক দেখল। নিভাকে দেখতে পেল না।

তার তো এমন কিছু দেরী হয় নি। অপেক্ষা করে অতিষ্ঠ হয়ে নিভার তো চলে যাবার কথা নয়।

একটু এগোতেই জয়ন্ত নিভাকে দেখতে পেল। রাস্তার ওপারে একটা দোকান থেকে বের হচ্ছে।

আমি তোমায় পার্কে খুঁজছিলাম।

নিভা হাসল। হাসিতে কোন ফুর্তি নেই। ম্লান হাসি। এক পাতা সেফটিপিনের দরকার ছিল, তাই দোকানে গিয়েছিলাম।

কি করবে বল?

এস না। তোমার তো তাড়া নেই।

তাড়া নেই কথাটা জয়ন্ত বুকে ঘা দিল।

কি বলতে চাইছে নিভা?

তুমি তো বেকার, তোমার হাতে অফুরন্ত সময়। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করার মতন।

কোথায় যেতে হবে?

পার্কে চল।

দুজনে পার্কে ঢুকল।

পাশেই পার্ক। অযত্নে অবহেলায় গাছ-পালা অর্ধেকের বেশী বিগতপ্রাণ। রেলিং-গুলো খুলে নিয়ে গিয়েছে। বেঞ্চগুলোও সব অক্ষত নয়।

একেবারে কোণের দিকে একটা বড় সেঁদাল গাছের নীচে, ঘাসের ওপর দুজনে বসল। পাশাপাশি, তবে খুব ঘেঁষাঘেঁষি নয়।

জান, আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

নিভার কণ্ঠে কান্নার রেশ।

সে কি?

জয়ন্তর স্বরও আর্তনাদের মতন শোনাল।

সে মনে মনে ভাবতে লাগল।

আজ দিন সাতেক নিভার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এই সাত দিনের মধ্যে একেবারে বিয়ের ঠিক হয়ে গেল!

একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?

প্রায়। ছেলের বাবা আমাকে দেখে পছন্দ করে গেছেন। কাল এসেছিলেন বিয়ের তারিখ ঠিক করতে। কোন দাবী নেই। এমন সুযোগ কোন মেয়ের বাবা ছাড়ে?

জয়ন্ত চুপ করে রইল।

পরিবেশ ভুলে নিভা জয়ন্তর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। এই, তুমি কিছু বল? চুপ

করে আছ কেন ?

কি বলব ?

তুমি কি চাও বিয়ের রাতে আমি বিষ খাই ?

জয়ন্ত নিভার দিকে মুখ ফিরাল।

নিভা অপূর্ব সুন্দরী নয়। নিতান্ত সাধারণ। কিন্তু এই মুহূর্তে জলভরা চোখে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে তাকে বেশ দেখাচ্ছে।

কি করব বল ?

যা রে, আমাকে বলে দিতে হবে ? তুমি কিছু ঠিক করতে পার না ?

তাহলে দু'-একদিন ভাবতে সময় দাও।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

নিভা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে দু'চোখ মুছল। রাস্তার দিকে দেখল। এখন অফিস স্কুলের বিশেষ তাড়া নেই; তাই যানবাহনও স্তিমিতগতি।

নিভাই বলল, থেমে থেমে, চাপা গলায় একটা কাজ করলে হয়।

কি ?

তুমি পারবে করতে ?

বলেই দেখ না।

উড়ো চিঠি ছাড়তে পারবে ?

উড়ো চিঠি ! মানে ?

মানে বলছি। আমাদের পাশের বাড়ীতে শ্যামলী বলে একটি মেয়ে ছিল। তুমি দেখনি। তার বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম যখন তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে তখন তাদের বাড়ীতে উড়ো চিঠি আসে।

চিঠির তলায় নাম ছিল না। শুধু লেখা, আমি পাত্রের প্রতিবেশী। আপনাদের মঙ্গলের জন্য জানাচ্ছি যে, পাত্রের চরিত্র মোটেই ভাল নয়। দুশ্চরিত্র, লম্পট, আনুষঙ্গিক অন্য গুণও আছে। এসব সত্ত্বেও যদি আপনারা অগ্রসর হন তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

তারপর ?

সেই চিঠি নিয়ে শ্যামলীর বাবা আমার বাবার কাছে ছুটে এসেছিল।

বাবা এল মা'র কাছে।

ঠিক হল, সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, খবর যখন একটা এসে গেছে, তখন এখানে কাজ না করাই ভাল। ব্যাস, সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া হল।

তুমি আমাকে একটা উড়ো চিঠি দিতে বলছ ?

হ্যাঁ।

তাতে কাজ হবে ?

দেখাই যাক না। আমার তো মনে হয় হবে।

কি লিখব ?

তাও আমাকে বলে দিতে হবে ?

মানে কোনদিন লিখিনি কিনা।

আমিই বুঝি গণ্ডা গণ্ডা লিখেছি ? একটা কথা, পৃথিবীতে যত রকমের দোষ আছে সব পাত্রের ঘাড়ে চাপাবে।

ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি।

নিভা ব্যাগ খুলে একটা কাগজের টুকরো বের করল।

এই নাও এতে পাত্রের নাম-ঠিকানা আছে। আমার বাবার নাম-ঠিকানা তো তোমার জানাই আছে।

তুমি নিজের হাতেও লিখতে পার। তোমার হাতের লেখা আমাদের বাড়ীতে কেউ চেনে না। কিন্তু দেরী কর না। সম্ভব হলে আজই চিঠি ছেড়ে দিও।

দরখাস্ত লেখার ফাঁকে ফাঁকে জয়ন্ত চিঠিটা লিখল।

প্রথমে লিখতে একটা অনাগ্রহ ছিল। কিছু পরিমাণ বিরক্তিও। কিন্তু লিখতে শুরু করে ভালই লাগল। মজার কোন খেলার মতন।

পাত্রের নাম অবনীশ। না দেখা সেই ভদ্রলোকের ওপর জয়ন্ত যতটা সম্ভব কুৎসার কালি ঢালল। লম্পট, মদ্যপ, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির।

চিঠির তলায় কোন নাম লিখল না। কেবল লিখল, জনৈক হিতৈষী।

চিঠি লেখা শেষ করে দরখাস্তগুলো নিয়ে জয়ন্ত যথারীতি বেরিয়ে পড়ল। একেবারে জি পি ও-তে চিঠিটা পোস্ট করবে। যাতে কোন এলাকা থেকে লেখা হচ্ছে সে বিষয়ে কেউ আঁচ করতে না পারে।

দিন সাতেক পরে নিভার সঙ্গে দেখা। সে গলির মোড়ে অপেক্ষা করছিল।

ক্লান্ত জয়ন্ত তাকে দেখতে পায়নি। নিভাই পিছন থেকে ডাকল, এই জয়ন্ত।

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল।

কি খবর?

নিভা উচ্ছ্বসিত।

খবর খুব ভাল। চল কোথাও বসি।

এখানে বসবার দুটো মাত্র জায়গা। সামনের পার্ক আর একটু দূরের মোহন কেবিন। পার্কে এখন পাড়ার প্রৌঢ় আর বৃদ্ধদের ভিড়, আর মোহন কেবিনে আশে-পাশের মস্তানদের জটলা।

দু'জায়গাতেই সমান অসুবিধা। সমালোচনার শিকার হতে হবে।

তার চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে যাওয়াই ভাল। দু'জনে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল।

কাফে দ্য প্যারী, নামের তুলনায় খুবই দীন অবস্থা। একেবারেই খদ্দের হয় না।

অন্তরঙ্গ আলাপের আদর্শ জায়গা।

দু'জনে একটা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসল।

রং চটা, জরাজীর্ণ পর্দা, তবু পর্দা তো। লোকচক্ষুর সামনে একটা আবরণ।

বসেই নিভা জয়ন্তর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। কেলেঙ্কারি ফতে। সম্বন্ধ বাতিল। তোমার উড়ো চিঠি দারুন কাজ করেছে।

উড়ো চিঠি দারুণ কাজ করেছে।

গিয়েছিল। বানিয়ে বানিয়ে এত সুন্দর লিখতে পার। গল্প লেখ না কেন?

জয়ন্ত মুচকে হাসল, কিছু বলল না। সব কথা কাউকে বলা যায় না। নিভাকেও না। অনটনের সংসারে সাহিত্য চর্চা একটা বিলাসিতা। একটা গল্প লেখার সময়ে চারটে দরখাস্ত লেখা যায়।

এবার নিভা জয়ন্তর কোমল স্থানে আঘাত দিল। তোমার চাকরির কিছু হল?

কই আর হল। আবেদনের বদলে কেবল আশ্বাস পাচ্ছি।

চিন্তা করো না, হয়ে যাবে। তোমার চাকরি মানে আমারও চাকরি। তোমার বৌ হওয়ার চাকরি। বুঝছ তো। আমি উঠি। ফিরতে দেরী হলেই বাড়ীতে চে-চামেচি করে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, আমার নাকি রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়ান উচিত নয়।

নিভা উঠে দাঁড়াল।

জয়ন্ত বলল, চা-টা খেয়ে নাও।

নিভা বসে দ্রুত চুমুকের পর চুমুকে চা শেষ করে আবার উঠে দাঁড়াল।

যেতে গিয়েও ফিরে বলল, সামনের শনিবার ফ্রি আছ?

জয়ন্ত হাসল। নিস্তেজ, করুণ হাসি। বেকার তো সব সময়েই ফ্রি। কেন?

তাহলে গ্লোব-এর টিকিট কিনে রাখব।

আর কতকাল তোমার পয়সায় সিনেমা দেখব?

নিভা দুটো চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, ভাবছ কেন মশাই, বিয়ের পর এক একটা শাড়ীতে একশ'টা সিনেমার টিকিটের দাম উসুল করে নেব।

মাস দুয়েক পর আবার সেই সমস্যা। দু'জনে লেকের ধারে বসেছিল। নিভা আর জয়ন্ত।

জান, আবার মুশকিল হয়েছে।

কি হ'ল?

তুমি তো অনন্তকাল ধরে কেবল দরখাস্তই লিখবে। এদিকে আমি কি বিপদের পর বিপদ ঠেকাব?

নিভার কণ্ঠ অভিমানস্ফুরিত।

কি হ'ল কি বল না।

জয়ন্তর মেজাজ খুব খারাপ। একটা অফিসে শুধু আশা বা আশ্বাস নয়, রীতিমত লিখিত নির্দেশ পেয়েছে।

সামনের মাস থেকে চাকরি হয়ে যাবে। প্রথম তিন মাস সাময়িক, তারপর পাকা হবার খুবই সম্ভাবনা।

এখনই নিভাকে সে কিছু জানাতে রাজী নয়।

এবার পাত্র নিজে এসে পছন্দ করে গেছে। বাইরে থাকে, বাইরে মানে বর্ধমানে। কলেজে পড়ায়। কি হবে?

কি আবার হবে? উড়ো চিঠি ছাড়ব।

ঠিক কথা, কিন্তু—

কি কিন্তু?

তোমার হাতের লেখা তো চলবে না।

কেন, বলতে গিয়েই জয়ন্ত থেমে গেল। তার হাতের লেখাতো নিভার বাপ-মায়ের চেনা হয়ে গেছে। একই হাতের লেখা চিঠি আবার গেলে নির্ঘাত তারা সন্দেহ করবে।

এবার আমি টাইপ করে চিঠি দেব।

টাইপ করে?

হ্যাঁ, টাইপ করে, তোমার বাবার নামে।

ঠিক আছে, দাঁড়াও, তোমাকে পাত্রের নাম-ধাম লিখে দিই।

ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে নিভা সব লিখে দিল।

তোমার মা-বাবা সন্দেহ করবে না তো?

একটু হয়তো করবে। দেখাই যাক না।

এবারে জয়ন্ত আরও এক ধাপ ওপরে উঠল। অসৎ চরিত্র, মদ্যপায়ী তো লিখলই তাছাড়াও লিখল, নবদ্বীপে ভদ্রলোকের স্ত্রী-কন্যা বর্তমান।

তারপর অনেকদিন জয়ন্ত নিভার খবর পায়নি। নিজের চাকরির ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। দু'জন এম এল এ-র সার্টিফিকেট দরকার। সেগুলো যোগাড় করতেই ব্যস্ত। প্রাণান্ত।

চাকরি হল।

বাড়ীতে প্রায় উৎসব। কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর দু-প্রান্তের কালীই পূজা পেলেন। অন্য ছোটখাট দেবতারাও বাদ গেলেন না।

চাকরি ছ'মাস পরে পাকা হবে। তবে কর্মকর্তারা আশ্বাস দিলেন, পাকা হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা।

জয়ন্ত সচরাচর নিভার বাড়ীতে বিশেষ যায় না। একটা বেকার যুবকের যাওয়া-আসা স্বাভাবিক কারণেই বাড়ীর লোকের খুব পছন্দসই নয়। কারণ তারা নিভার মনের খবর কিছুটা পেয়েছে।

এখন অবস্থা বদলেছে। জয়ন্ত আর বেকার নয়। চাকরিটা পাকা হলে সে নির্ভীক চিত্তে নিভার দিকে হাত বাড়াতে পারবে।

খবর শুনে নিভা খুব খুশী।

জয়ন্ত মিষ্টির বাক্স নিয়ে গিয়েছিল। সেটা নিভার মার হাতে তুলে দিল।

নিভার বাবা শুধু হাসলেন। এ সংসারে তাঁর এইটুকুই অধিকার।

কোন মতামত দেবার ক্ষমতা নেই, সে ক্ষমতা নিভার মায়ের।

তারপর দুটো মাস জয়ন্ত আর নিভা যেন হাওয়ায় ভাসল।

সিনেমা, লেকের নির্জন প্রান্তে, পার্কের কোণে দু'জনে মুখর হয়ে উঠল।

ভবিষ্যৎ জীবনের আলপনা আঁকতে উদ্‌গ্রীব।

তোমার মা রাজী হবেন? জয়ন্তর কণ্ঠে সংশয়ের স্পর্শ।

নিভা কিন্তু বেপরোয়া।

রাজী না হলেই বা কি? আমি তো নাবালিকা নই। তবু কোনরকম গণ্ডগোল করা আমার ইচ্ছা নয়। মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে হবে।

অবশ্য জয়ন্তর ইচ্ছাও তাই।

সংসারের সকলের অমতে নিভা যদি বেরিয়ে আসে, তাতে হাজার সমস্যা।

জয়ন্তর বাড়ীর লোকও এ ধরনের বিয়েতে খুব যে খুশী হবে, এমন মনে হয় না।

তাই জয়ন্ত বলল ঃ

তোমার মাকে বোঝাবার চেষ্টা কর। সব যাতে ভালভাবে হয়, তাই আমি চাই। শুভকাজে কোন রকম বিঘ্ন হওয়া বাঞ্ছিত নয়।

এ নিয়ে আর কথা হল না।

এটা জয়ন্ত জানে, যে ক'টা সম্বন্ধ নিভার এ পর্যন্ত এসেছে, সব ক'টাই তুলনায় জয়ন্তর চেয়ে কাম্য।

জয়ন্তর একমাত্র জোর তার ভালবাসার।

অফিস জয়ন্তকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিল। নতুন জীবন শুধু নয়, নতুন জগৎও।

প্রচ্ছন্ন রাজনীতি যেমন আছে, তেমনই সহকর্মীরা হৃদ্যতার হাতও প্রসারিত করে

দিয়ে। যারোয়াড়ী মালিক, কিন্তু আচারের-আচরণে নায়েব-ঘেঁষা।

জয়ন্ত নিজের মনে কাজ করে যায়। দশটা থেকে পাঁচটা মাথাই তোলে না। মাঝখানে শুধু আধঘণ্টার বিরতি।

অনেক ঘাম ঝরে তবে জয়ন্ত এ চাকরির নাগাল পেয়েছে। ঘাম তো রক্ত।

একদিন অফিস থেকে বেরিয়েই জয়ন্ত অবাক।

ফুটপাথে নিভা।

কি ব্যাপার?

চল, কোথাও গিয়ে বসি। কথা আছে।

নিভার সারা মুখে আষাঢ় মেঘের ছায়া। দু'জনে কাছের এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল। পর্দা ঢাকা কেবিনে।

বল।

জয়ন্ত রীতিমত উদ্বিগ্ন।

মা'র কাছে তোমার কথা বলেছি।

তারপর?

মা বলল, ভাল ভাল সম্বন্ধ ছেড়ে শেষ-কালে ওই কেরাণীর গলায় মালা দিবি? আমি বলেছি, মোটেই কেরাণী নয়, জুনিয়র অফিসর।

জয়ন্ত আঁতকে উঠল।

সর্বনাশ, এ কি করেছ! অফিসে খোঁজ করলেই তো বিপদে পড়ব। আমি সবচেয়ে কনিষ্ঠ কেরাণী। তাও আবার এখনও কাঁচা।

তাইত, এসব ব্যাপারে একটু বাড়িয়ে বলতে হয়। মা হয়তো তোমাকে একদিন ডেকে পাঠাবে, তাই আগে থেকে তোমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। উল্টো-পাল্টা বল না যেন। ভয়ের কি, শেষ অস্ত্র তো আমার কাছেই আছে। নিভা হাসবার চেষ্টা করল। হাসিটা খুব ফুটল না।

নিভার মা ডাকবার আগেই বিপর্যয় ঘটল অফিসে কিছুদিন ধরেই একটা কানা-ঘুষো চলছিল। অফিসার মহলে ছুটোছুটি, রুদ্ধদ্বার আলোচনা। জয়ন্তর ধারণা ছিল বোধ হয় ব্যবসা-সংক্রান্ত উঁচু পর্যায়ের কথা-বার্তা চলছে।

কিন্তু সেদিন অফিসে এসেই থমকে দাঁড়াল। একেবারে সামনে নোটিশ বোর্ড, তাতে চারজনের নাম। যে চারজনের ওপর ছাঁটাইয়ের করাত নেমে এসেছে। সামনের মাসের পয়লা থেকে এদের আর প্রয়োজন হবে না।

এ তালিকায় প্রথমেই জয়ন্তর নাম।

চোখে অন্ধকারের বন্যা। জয়ন্তর মনে হল পায়ের তলার মাটি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। অন্তহীন একটা গহ্বরে কে যেন প্রবল বেগে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

জেয়াল ধরে জয়ন্ত টাল সামলাল। সারা-দিন অফিসে কোন কাজ করতে পারল না। চারিদিক থেকে সহানুভূতির প্রলেপ। সম-বেদনার বাণী তাকে আরও মুহ্যমান করে তুলল।

ঠিক বাড়ী ফেরার পথে গলির মোড়ে নিভার সঙ্গে দেখা। জয়ন্ত দেখতে পায়নি। তার কোনদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ ছিল না।

নিভাই এগিয়ে এল।

এই, আজ একবার আমাদের বাড়ী যেতে পারবে? মা ডেকেছে।

ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে জয়ন্ত নিভাকে দেখল। নিভা বেশ অস্পষ্ট ম্লান।

ভাঙ্গা গলায় বলল, আজ আর হবে না। আমার এক মাসির অবস্থা খুব খারাপ। এখনই তাকে দেখতে যেতে হবে। শনিবার, সামনের শনিবার তোমাদের বাড়ী যাব। দেখা করব তোমার মা'র সঙ্গে।

একটু দাঁড়িয়ে নিভা সরে গেল।

মাতালের মত টলতে টলতে জয়ন্ত বাড়ী চলে এল। মনে মনে হিসাব করল। আজ মোটে সোমবার। শনিবারের এখনও অনেক দেরী। তাও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। আজ রাত্রেই চিঠিটা লিখে কাল সকালে ডাকে দিতে হবে।

নিজের হাতে লেখাও চলবে না। গতবারের মতন এবারেও টাইপ করে দেবে। ইংরাজীতে নয়, এবারে বাংলায়। মোড়ে বাংলা টাইপ নিয়ে একজন বসে।

মনে মনে চিঠির বয়ানটা জয়ন্ত একবার আউড়ে নিল।

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, জয়ন্ত বাবু দুশ্চরিত্র, লম্পট, পানাসক্ত, জুয়াড়ী।

এছাড়া আর কি লিখবে? তহবিল তছরূপ করার অপরাধে চাকরিচ্যুত, এমন কথাও লেখা যেতে পারে। মোক্ষম ওষুধ নিভার মা-বাপের কাছে। জয়ন্ত একটা কাগজ টেনে নিয়ে উড়ো চিঠির খসড়া করতে বসল।

কুশল সংবাদ

সন্ধ্যেবেলা মোড়ের কাছে টুনুর বাস যেগুলো এসে থামে প্রত্যেকটিতেই প্রচণ্ড ভিড়। প্রত্যেকটির মুখ পুতুলের নাচের পুতুলের মুখ। প্রত্যেকের অঙ্গ সঞ্চালন একটা ধরা-বাঁধা দৈনন্দিন প্যাটার্ণ। গাড়ির চাকা থেমে যাওয়ার একটা তীক্ষ্ণ ঘষা আওয়াজ। মানুষের দেওয়াল ফুঁড়ে অসংখ্য মানুষের নির্গমন ও অবরোহণ। তাদের ভেদ করে আরো অনেকের গাড়ির ভেতর অন্তর্ধান। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ। পেছনের গাড়ির অধৈর্য হর্ণ।

তারপর এদিক গলির ভেতর সন্ধ্যার আলোয় ছায়ায় ক্লান্ত পদক্ষেপ। কোথাও বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। পাঁচিলের ওধারে রান্নাঘরের উনুনের ধোঁয়া। রেডিয়ো, বাচ্চার কান্না, হার-মোনিয়াম।

এবং ওধারের দোতলার বড়ো বারান্দার একপাশে ছোট বেতের টেবিলের দুপাশে দুটো ছোট চেয়ারে ঝুমা আর অশোক। সামনে চায়ের কাপ। হয়তো বা একটি প্লেটে কিছু নোনতা বিস্কুট।

এও দৈনন্দিন। প্রায় দু বছর ধরে দেখছি। সে সময় আমিও অফিস থেকে ফিরে গা ধুয়ে এসে জানলার কাছে ইজি-চেয়ার টেনে বসি। একটু পরে কেতকী আবার জন্যে চা নিয়ে আসবে। কাছে আরেকটি চেয়ার আছে। কিন্তু সেখানে বসবে না কেতকী। সে ফিরে যাবে রান্নাঘরে, কারণ সে আমার স্ত্রী। অথচ ঝুমা অশোকের সামনে বসে গল্প করবে, কারণ সে অশোকের স্ত্রী নয়।

ঝুমাকে আমি রঙীন স্কার্ট পরে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যেতে দেখেছি। তার-পর শাড়ি পরে কলেজে যেতে দেখেছি। ভালো ছাত্রী, কিন্তু এম-এ'র পর অনেক চেষ্টা করেও প্রফেসারি পায় নি। এখন একটা অফিসে কাজ নিয়েছে। শুনেছি পি - এইচ্ - ডি'র জন্যে রেজিস্ট্রেশানও করিয়েছে।

কেতকী চা আর জলখাবার নিয়ে এলো। একটা ছোট টেবিল সামনে টেনে দিয়ে তার উপর রাখলো। জিজ্ঞেস

করলো,—কি দেখছো ?

আমি কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কেতকী ওদিকে ফিরে ঝুমা আর অশোককে দেখলো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে শুধু বলে গেল,—চা ফুরিয়ে এসেছে। যদি বেরোও তো মোড়ের দোকান থেকে দুশো চা নিয়ে এসো।

আমার কোনো উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। সে জানে যে আমি বেরোবো এবং দুশো চা নিয়ে আসবো।

কেতকী আর আমার সংসার দশ বছরের পুরোনো। এগারো বছরও হতে পারে। আমাদের বিয়ের তারিখ যে বছর আমার মনে থাকে, কেতকীর মনে থাকে না। যে বছর ওর মনে থাকে, সে বছর আমি ভুলে যাই। বিয়ের পর প্রথম দু' বছর আমাদের বিয়ের দিনটি বাইরে কোনো রেস্তোরাঁয় খেয়ে সেলিব্রেট করতাম। বাড়ি ফেরার সময় এক ডজন রজনীগন্ধা কিনে নিতাম। তৃতীয় বছর বিয়ের তারিখের সময় কেতকী ছিল নার্সিং হোমে। তাই সেলিব্রেট করা হলো না। তার পরের বছর আমি ভুলে গেলাম। দিনটি পেরিয়ে যাওয়ার তিনদিন পরে কেতকী অনুযোগ করলো। পরের বছর কেতকীর বোধহয় মনে ছিল না। তখন আমিও ভাবলাম, মনে করিয়ে দিয়ে কী লাভ।

মনে মনে স্থির করেছি ঘটা করে রজত জয়ন্তী করবো। পুরোনো বন্ধুদের ডাকবো। ওদের বৌয়েরাও আসবে। অবিশ্যি তার অনেক দেরী। তদ্দিন হয় তো ঝুমা আর অশোকও বিয়ে করে পুরোনো হয়ে যাবে। কিংবা হয়তো ওদের বিয়ে হবে না। যদি হয়, তাহলে ওদেরও ডাকবো। কারণ ঝুমা আর অশোক দু'জনকেই আমিও চিনি, কেতকীও চেনে।

কেতকী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, —কি ভাবছো ?

আমি ঘাড় নেড়ে সিগারেটে টান দিলাম।

কেতকী বললো,—একটা ট্যালকম পাউডারও নিয়ে এসো।

আমি যখন ফিরে তাকালাম তখন কেতকী ঘরের ভেতর নেই।

ঝুমা আর অশোক দু'জনকেই আমিও চিনি, কেতকীও চেনে। ঝুমার দাদা আর আমি এক সময় খুব আড্ডা দিতাম পাড়ার অন্যান্য সমবয়েসীদের সঙ্গে। ওদের বাড়িও যেতাম। ঝুমা স্কুল থেকে সবে কলেজে ঢুকেছে। ঝুমার দাদার বিয়ে হলো। সরকারী গেজেটেড অফিসারের মেয়ে। ওদের ঘরে ভালো আসবাবপত্র। ঝুমার বৌদির নানা রকম শাড়ী। হঠাৎ ঝুমার বাবা মারা গেল। শুনলাম প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা ঝুমার দাদা নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে। এখন লাইফ ইনসিওরের টাকা ক'টাই ঝুমার মায়ের সম্বল। ঝুমার বৌদির সঙ্গে ঝুমার মায়ের বনিবনাও নেই। ঝুমাও বেশী কথা বলে না ওর বৌদির সঙ্গে।

ছেলেবেলায় ঝুমা ছিল বেশ দুষ্টু চঞ্চল আর সবার আদরে। সেই ঝুমাকে দেখলাম এখন একেবারে শান্ত, ক্রমশ গম্ভীর। মাঝে মাঝে আসতো কেতকীর কাছে। কেতকী আমায় বলতো ঝুমা খুব চাপা। মনের কথা কেতকীকেই অল্পস্বল্প বলে মাঝে মাঝে।

কেতকী বলতো, ওদের বাড়িতে খুব অশান্তি। জানি না ওর মা ওর বিয়ে দেবেন কিভাবে। কিছুই তো নেই। ওর দাদা যে ওর জন্যে বেশী খরচা করবে বলে মনে হয় না।

আমি নিস্পৃহ। অশান্তি কার বাড়িতে নেই। কেতকীর সঙ্গে বনেনি বলে বাবা আর মা আমার ছোট ভায়ের ওখানে গিয়ে আছে। কেতকী বোঝে না, বোঝাতে গেলে তর্ক করে, আর ওর সঙ্গে আমি কোনোকালেই তর্কে পেরে উঠি না। মা থাকলে আমার ছোট ছেলেটিকে দেখা-শোনা করতো। কেতকী নিশ্চিন্ত হয়ে অফিস করতে পারতো। বাড়িতে আর কেউ নেই বলেই চাকরি ছাড়তে হলো কেতকীকে। ওর চাকরিটা থাকলে আমার একলার ওপর এতটা চাপ পড়তো না।

কেতকীকে আমার মা-বাবা পছন্দ করে আনে নি। ওর দাদা আমাদের অফিসে চাকরি করতো। আমি ওদের বাড়ি যেতাম। মধ্যবিত্ত বাড়ি। কেতকীও চাকরি করতো একটা অফিসে। ওকে আমার ভালো লাগলো। আমাকে ওর ভালো লাগলো। ওর দাদাকে লুকিয়ে আমি আর কেতকী কিছুদিন একসঙ্গে সিনেমা দেখলাম, লকের পাড়ে হাত ধরে পাশা-পাশি বসে থাকলাম। তারপর একদিন ওর মা-বাবাকে বললাম যে কেতকীকে আমি বিয়ে করতে চাই। তখন শুনলাম আমাদের অন্তরঙ্গতা ওদের কাছে পুরোনো খবর। এবং আমাকে ওদের বাড়ির সবারই বেশ পছন্দ।

বিয়ের আগে আমার মা একটু মুখ-ভার করলো। কিন্তু বিয়ের সময় বেশ সহজভাবেই যা কিছু করণীয় সবই করলো। বিয়ের পর আমাদের দিনগুলো আর মাঝারি মাসিক পত্রিকার গতানুগতিক নায়ক-নায়িকার দিনগুলোর মতো নয়।

আমি কেতকীকে বললাম, বিয়ে সব মেয়েরই হয়। কারো আগে হয়, কারো দেরীতে হয়। ঝুমার বিয়েও আটকাবে না।

ঝুমাকেও যেমন চিনতাম, অশোককেও চিনতাম। অশোক আমাদের পাড়ার নয়, তবে কাছেই থাকে। যখন বাচ্চা, সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে আসতো। যখন বড় হলো, দুর্গা পুজোর চাঁদা চাইতে আসতো। ওরা আমার পিসেমশায়ের বাড়ির ভাড়াটে। ওখানে যেতাম, তাই ওদেরও জানতাম। পড়াশুনায় খুব ভালো। হায়ার সেকেণ্ডারীতে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। বি-এসসি'তেও অনার্স পেয়েছে। তারপর এম-এসসি।

কেতকীই ওকে ডেকে এনে আমাদের বাড়িতে ঝুমা ও ওর মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। পরে আমাকে বললো,—ঝুমার মা তো পয়সা খরচা করে ঝুমার জন্যে প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারবে না। অশোক মাঝে মাঝে এসে ওর পড়া দেখে দেবে।

আমি বললাম,—ঝুমার দাদার ভালো লাগবে না। হয়তো বকাবকি করবে।

কেতকী বললো,—কিচ্ছু বলবে না। ও রকম ছেলে পেলে ওরা বর্তে যাবে।

শুনলাম ঝুমার দাদা নাকি প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলো। বলেছিলো,—এসব আমি পছন্দ করি না। তাকে এখানে আসতে মানা করে দাও।

ঝুমার বৌদি বলেছিলো,—তাতে কি লাভ ? তাহলে ওরা বাইরে ঘুরে বেড়াবে। এখানে তবু আমাদের চোখের সামনে।

আমি কেতকীকে বললাম,—আমি আগেই বলেছিলাম—।

কেতকী বললো,—ও কিছু নয়। ওরকম কথাবার্তা প্রথম দিকে একটু হয়। এ শুধু সবাইকে শোনানোর জন্যে। গার্জিয়ান আপত্তি না করলে নায়কের উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়বে না ?

ঝুমাও একদিন পাশ করলো অনার্স নিয়ে। অশোক তখন রিসার্চ করছে। ঝুমা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হলো।

খবর শুনি কেতকীর কাছে।

সে কি ? ওরা বিয়ে করবে না ?

এত তাড়া কিসের ? অশোকের একটা চাকরি হোক। ঝুমাও পাশ করে বেরিয়ে আসুক। ওকেও তো চাকরি করতে হবে। একলার রোজগারে কি সংসার চলে আজকের দিনে ?

আমি মনে মনে বললাম,—নিজের

বেলা যদি একথা বুঝতে।

ঝুমাও একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পার হয়ে এলো। কেতকী বললো, অশোকের রিসার্চ এখনও শেষ হয়নি।

একদিন ঝুমাকে দেখলাম ডালহৌসি পাড়ায়। মুখে লিপস্টিক। পরনে রঙীন শাড়ী। হাতে নতুন ব্যাগ।

—হঠাৎ এ পাড়ায় ?

ঝুমার বেশ হাসি হাসি মুখ। বললো,—একটা ইণ্টারভিউ দিলাম।

—তোমার তো রেজাল্ট ভালো। কলেজে চেষ্টা করছো না কেন ?

পাচ্ছি না। ধরাধরির ব্যাপার আছে।

কেতকী বললো,—অফিসের চাকরিই ভালো। মাইনে বেশী। ঝুমা বলছে, সেও একটা রিসার্চ আরম্ভ করবে।

—চাকরি, রিসার্চ, দুটো এক-সঙ্গে ?

—তাতে কি ? আমাদের পার্থদা চাকরি করতে করতে পি-এইচ-ডি করেছে। ঝুমা আর অশোক, যদি দু'জনেই পি-এইচ্-ডি করে নিতে পারে, কোনো কলেজে ভালো কাজ পেয়ে যাবে।

—ওরা কি পি-এইচ্-ডি করার আগে বিয়ে করবে না ?

—এখন বিয়ে করে ফেললে কি রিসার্চ করতে পারবে ঠিক মতো ? সংসার সমুদ্রেই হাবুডুবু খাবে সারাটাক্ষণ।

—রিসার্চ কি বিয়ের চাইতে বেশী জরুরী ?

পি-এইচ্-ডি করে একটা ভালো ক্যারিয়ার করা অনেক বেশী জরুরী।

—অশোক বলছে একথা ?

—না, সে বলছে না। বলছে ঝুমা।

—ভালো। করুক যার যা খুশি।

আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার দিনগুলো সব এক রকম। অফিস বাড়ি, অফিস বাড়ি, তারপর রোববার, আবার অফিস বাড়ি, অফিস বাড়ি, তারপর রোববার। মাঝে মাঝে ছোটখাট বৈচিত্র্য, —টুকুদার ছেলের বিয়ে, অমল মামার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ, প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে ছোট শালীর মাখামাখির ঘটনা। অফিসের থিয়েটার, পুরোনো সহপাঠীদের সঙ্গে বাৎসরিক পিকনিক। টেস্ট ক্রিকেট। সিনে ক্লাবের শো।

আর দিনের শেষে অফিস থেকে ফিরে জানলার পাশে ইজিচেয়ার টেনে চায়ের কাপ নিয়ে বসি। তাকিয়ে দেখি ওধারে ঝুমাদের বাড়ির বারান্দায় বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে ঝুমা আর অশোক। ঝুমাও অফিস থেকে ফিরেছে। ফিরে এসে গা ধুয়ে একটা হালকা প্রিন্টের শাড়ি পরেছে। অশোক তার ল্যাবরেটারি থেকে সোজা এসেছে ঝুমার ওখানে। দু'জনারই মুখে অবসাদ কিন্তু চোখে আকাশ।

আমি ভাবি, ওরকম দিন আমারও ছিলো। আজ থেকে কয়েক বছর পরে ঝুমা আর অশোকও অন্য বাড়ির বারান্দায় অন্য কোনো দু'জনকে দেখে ভাববে,—হায়, ওরকম দিন আমাদেরও ছিলো।

কিন্তু এদের মেলামেশা পুরোনো হয়ে গেছে। আমি আর কেতকী বিয়ে করেছি আলাপ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই।

কেতকীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কি বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত ?

নিশ্চয়ই করবে,—কেতকী বললো, —এরকম ভাব ভালবাসা থাকলে আজ-কালকার দিনে বিয়ে না হওয়াটাই আশ্চর্য। ঝুমার মা ওরকম ছেলে পাচ্ছে কোথায় ?

—বিয়ে করে ফেললেই পারে।

কেতকী ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো,—তোমারই বা এত মাথাব্যথা কিসের ? তুমি আজ যেভাবে হাঁ করে ঝুমার দেকে তাকিয়ে থাকো সে আমার একটুও পছন্দ নয়।

রাগ হলো। ভাবলাম একটা কড়া উত্তর দিই। কিন্তু আমার এই ক'বছরের বিবাহিত জীবনের প্রধান অভিজ্ঞতা ঃ প্রতিবাদ করা বৃথা।

কেতকী নিজের থেকেই বললো, —বিয়ে আপাতত হচ্ছে না। কাল ঝুমা এসেছিলো। অশোক একটা ফেলোশিপ পেয়েছে। বাইরে চলে যাচ্ছে সামনের মাসে।

—ও। তাহলে ওদের বিয়ে হচ্ছে না ?

—কেন হবে না ? অশোক আপাতত চলে যাচ্ছে বিদেশে।

—বিদেশে কোথায় ?

কোন্ একটা ইউনিভার্সিটির নাম করলো। ঠিক মনে নেই।

—তারপর ?

—অশোক কিছুদিন ফেলোশিপ নিয়ে কাজ করবে। তারপর একটা চাকরি যোগাড় করে নেবে। তারপর কিছুদিনের ছুটি নিয়ে চলে আসবে। তারপর ঝুমাকে বিয়ে করবে। তারপর ঝুমাকে নিয়ে ফিরে যাবে।

কেতকী তারপর তারপর তারপর করে ঝুমাদের ভবিষ্যতের একটা সুন্দর ছবি এঁকে গেল। আমার চায়ের স্বাদ তেতো হয়ে গেল। ভাব-লাম, আজকাল এরা সবাই কথায় কথায় বিদেশে যায়। আমাদের বয়েসীরা সিভিল সাপ্লাইজ, এ-জি বেঙ্গল, মফস্বলের কলেজ এসবেই ফেঁসে রইলো।

কয়েকদিন ধরে দেখছি ওদের বারান্দায় সন্ধ্যেবেলা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো সিনেমায় যায় কিংবা বাইরে অন্য কোথাও। একদিন দেখি ঝুমা একা বসে চা খেতে খেতে নীল রঙের একটি লম্বা চিঠি পড়ছে। দেখে মনে হলো বিদেশী এয়ারোগ্রাম। কেতকীকে জিজ্ঞেস করলাম।

কেতকী ফিকে গলায় বললো, —হ্যাঁ, অশোক বাইরে চলে গেছে। কেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। ঝুমা একা একা বসে চা খাচ্ছে, তাই মনে হলো।

—তাহলে ওকে বলি প্রত্যেকদিন এ সময় এখানে এসে তোমার সঙ্গে বসে চা খাবে। কিংবা তুমিও ওখানে যেতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই।

আমি কোন উত্তর ভেবে পাওয়ার আগেই কেতকী পাশের ঘরে চলে গেল।

দু'দিন পর হঠাৎ দেখি ঝুমা সত্যি সত্যি চায়ের সময় আমাদের এখানে। কেতকী ওকে চা খেতে দিলো আমার ঘরেই। হেসে বললো, —ঝুমার আজকাল একা একা সময় কাটে না। তাই বললাম, সন্ধ্যেবেলা আমাদের এখানে চলে এসো। আমরা তো বেরোই না বড়ো একটা। বসে গল্প করা যাবে।

আমার হঠাৎ একটা প্রচণ্ড রাগ হলো কেতকীর উপর। কিন্তু কারো সে-কথা বোঝার উপায় নেই আমার মুখ দেখে। আমি সাধারণ ভাবে দু-চার কথা বললাম, অশোকের কথা, আজকাল বিদেশে ভারতীয়দের নানা রকম অসুবিধের কথা, ঝুমাদের অফিসের কথা, খেলা, রাজনীতি, একাডেমিতে নতুন নাটক, এইসব। তারপর একসময় উঠে বুশ শার্টটা চাপিয়ে কেতকীকে বললাম, —আমার একবার তরুণদের বাড়ি যেতে হবে।

মনে হোলো কেতকীর চোখ দুটো হাসছে।

কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের ধরনধারণ এখনও বড়ো মন্থর। গল্প লিখতে বসলে হয়তো কোন একদিন কেতকীকে ওর দাদার বাড়ি বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া যেতো। বাড়িতে আমি একা। ঝুমাকে বলতাম, —এসো, এসো। তোমার বৌদি এসে পড়বে একটু পরে। বলে গেছে, তুমি এলে বসিয়ে রাখতে। কি খাবে বলো, চা না কফি ? বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি নামতো। বাড়ির সামনে জল জমে যেতো। কেতকী এত দেরী করছে কেন ? নিশ্চয়ই জলে আটকে গেছে। তুমিই বা এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে কি করে। জানলাটা বন্ধ করে দিই। জলের ছাট আসছে। এসো, খাটের ওপরই এসে বসো। ঝুমাকে ফ্রক পরতে

দেখেছি। কিন্তু সে তো পনেরো বছর আগেকার কথা। —মনে মনে এসব ভাবতে ভালো লাগে।

কিন্তু আসলে এরকম তো হয় না। ঝুমা কখনও আসে, কখনও আসে না। কখনও হয়তো তিনজনে একসঙ্গে বসে চা খাই। এক এক সময় কেতকী আমাদের একলা রেখে রান্নাঘরেও চলে যায়। কিন্তু অনেক সময় কেতকী ঝুমাকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে বসে। ও চলে যাওয়ার পর যখন এ ঘরে এসে দেখে আমি একলা বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছি, কেতকী নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করে, —কি গো? মন খারাপ?

একদিন একথা শুনে রাগ হলো, ঝপ করে জানলাটা বন্ধ করে কেতকীকে ধরে জোর করে খাটের কাছে নিয়ে এলাম। কেতকীর বোধ হয় ভালো লাগলো। পরদিন আবার বললো, কি গো? মন খারাপ? আমি নির্বিকার নিরাসক্ত হয়ে বললাম, না, মন বেশ ভালো। আর কিছু বললাম না। কেতকী একটু অপেক্ষা করলো। কিন্তু আমি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠবার উপক্রম করছি না দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। যাক গে, ও তো আমার বৌ, প্রেমিকা তো নয়।

ঝুমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, —অশোকের কি খবর? ঝুমা বাড়িতে এলে জিজ্ঞেস করি। পথে দেখা হলেও এই একই কথা জিজ্ঞেস করি। অশোক ছাড়া আর কারো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার কথা মনে আসে না।

ঝুমা সহজভাবেই হেসে উত্তর দেয়, —ভালো।

কি করছে আজকাল? ফেলোশিপের কাজ শেষ হতে আর কদিন বাকী?

একদিন শুনলাম, অশোক একটা চাকরির যোগাড় করেছে। কেতকী আমাকে মাইনের অঙ্কটাও শুনিয়ে দিলো। আমি বললাম, ও টাকা আমাদের এখানেই শুনতে বেশী মনে হয়। আসলে ওদেশের হিসেবে খুব বেশী নয়। আমার মাইনেতে এ দেশে আমি যেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত, ঐ মাইনেতে বিদেশেও ওরা তেমনই মধ্যবিত্ত।

কেতকী বললো, —হ্যাঁ, তবে ওদের ওই মাইনেতে ফ্রিজ থাকে, ইলেকট্রিক টুনুন থাকে, টেলিভিশান থাকে, নতুন ঝকঝকে গাড়ি থাকে। শহরতলিতে নিজের ছোট বাড়িও থাকে। বাড়ির পেছনে এক ফালি বাগান থাকে।

আমি চুপ করে যাই। কে তর্ক করবে কেতকীর সঙ্গে।

—অশোকের কি খবর ঝুমা?

—ভালই আছে।

একবার এখানে বেড়িয়ে যাবে না?

ঝুমার মুখে একটা লাজুক হাসি। বললো, এখন ছুটি পাবে না। ঘুরে তো ঢুকেছে চাকরিতে।

—তাহলে এখন আসছে না?

—অপ্যাতত না।

—কেমন আছো ঝুমা, —আরেক দিন জিজ্ঞেস করলাম।

—ভাল।

—অশোক কেমন আছে?

—ভাল।

—কবে আসছে?

ঝুমার মুখে আবার হাসি দেখলাম। কারণ অশোক আসছে এই ডিসেম্বরে।

—ও আচ্ছা, তারপরেই তো মাঘ মাস।

ঝুমা মুখে হাত চাপা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল কেতকীর কাছে।

ঝুমা চলে যাওয়ার পর কেতকী এসে জিজ্ঞেস করলো—তোমার সঙ্গে একলা কথা বলে ঝুমা খুব খুশি যে। কি বলছিলো ওকে? আমায় তো বলো না ওরকম কোন কথা।

—ঝুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি কি বলেছি?

—আমার কি দরকার, —বললে কেতকী।

—জিজ্ঞেস করলেই পারতে। ঠিক আছে,

আমার মুখেই শোন। জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছো ঝুমা? —ভালো, —অশোক কেমন আছে?—ভালো।—ব্যস এই আর কি শুনলাম ডিসেম্বরে আসছে।

শুধু এটুকু কুশল সংবাদেই কি তোমাদের মুখে অতো আলো ফুটে ওঠে?

আমি যখন রিফ্রেশ ঘটাবো বলে ফিরে দাঁড়ালাম কেতকী তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—কেমন আছো ঝুমা?

—ভাল।

—অশোক কেমন আছে?

—ভাল।

—ডিসেম্বরে সে আসছে তাহলে?

ঝুমা কোন উত্তর দিলো না। একটা ছ্যাকাশে হাসি হেসে চলে গেল।

একটু পরে কেতকী এসে বললো, —তুমি ওকে অশোকের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে বুঝি? সত্যি তুমি কী বোকা! ওরকম জিজ্ঞেস করে?

—কেন? কি হয়েছে?

—ও, তোমায় বলি নি বুঝি? অশোক একটি বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করেছে। কি? মনে মনে খুব খুশি হয়েছো মনে হচ্ছে?

সত্যি রাগ হলো কেতকীর উপর। বললাম, —কি যে বলো। ঝুমা কোথায়? চলে গেল চা না খেয়েই?

দিন দুয়েক বাদে ঝুমাকে আবার যখন দেখলাম, তখন ও খুব সহজ স্বাভাবিক। হাসিমুখে গল্প করছে কেতকীর সঙ্গে।

কেতকী আমার ঘরেই আমাদের দুজনের চা এনে দিলো। —তোমার চা আনলে না?

—না বড্ড গরম। আগে একটু গা ধুয়ে আসি। তারপর।

কেতকী বাথরুমে চলে গেল। বাথরুমের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। এখানে আমি আর ঝুমা চুপচাপ বসে। একসময় আমি বললাম, —ঝুমা! সেদিন আমি জানতাম না। হঠাৎ অশোকের কথা জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

দেখলাম ঝুমার চোখ একটু ছলছল করে উঠলো।

হঠাৎ দেখি আমি ঝুমার হাত ধরেছি। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমার উপর রাগ করো নি তো?

ঝুমা মাথা নাড়লো।

বাথরুমের দরজার দিকে তাকালাম। তারপর ঝুমার মুখের দিকে তাকালাম। ঝুমা চোখ নামিয়ে নিলো। বাথরুমের দরজার ছিটকিনি নামানোর আওয়াজ পেলাম। ঝুমার হাত ছেড়ে দিলাম। কেতকী ঘরের মধ্যে ফিরে এলো।

গা ধোয়া হয়ে গেল? —না, এমনি হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। একেবারে রান্নাবান্না সেরে তারপর ভালো করে চান করে নেব।

—কেতকী আমার আর ঝুমার দিকে একবার তাকালো, —যাই, আমার চা-টা নিয়ে আসি।

—কেতকী চলে গেল।

সেদিন কেতকী আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

ঝুমার সঙ্গে আগের মতো আর দেখা হয় না। মাঝে মাঝে আসে। পথে দেখা হয় আরো কম। সে অফিস থেকে নাকি সোজা ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় ওর প্রফেসারের কাছে। থিসিসটা প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

আমাদের বাড়ি যখন আসে, আমার ঘরে বসে চা খায়। কেতকীও থাকে। ঝুমা খুব হাসি-খুশি আজকাল।

—কেমন আছো ঝুমা?

—বেশ আছি।

পরে এক সময় কেতকীকেই জিজ্ঞেস করি, —অশোকের কি খবর? কেমন আছে?

—ভাল আছে নিশ্চয়ই। ঝুমার কাছে ওর বৌয়ের ছবি পাঠিয়েছে। ওর ছেলের ছবি পাঠিয়েছে।

—তাই নাকি? চিঠিপত্র লেখে ঝুমার কাছে?

—শুনলাম, প্রায়ই লেখে।—কি লেখে?

—এইসব সাধারণ খবর, ছেলে কেমন আছে, বৌ কেমন আছে, ছুটি কাটাতে কোথায় গিয়েছিলো। এইসব।

—ঝুমা তাহলে ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিয়েছে মনে হচ্ছে।

কেতকী বললো, —সহজভাবে নাও বা যদি নেয়, দিবারাত্র জানলার ধারে বসে কি হাউমাউ হুঁফুস করে কাঁদবে নাকি?

একদিন কেতকী রান্নাঘরে। আমার ঘরে ঢুকে দেখি ঝুমা খাটের উপর বসে।

রান্নাঘরের দিকে একবার তাকিয়ে ঝুমার কাঁধে হাত রেখে বললাম,—কেমন আছো ঝুমা?

ঝুমা হেসে বললো, —ভাল।

রান্নাঘরে চায়ের কাপে চিনি মেশানোর আওয়াজ। সেটি হঠাৎ থেমে গেল। আমি হাত নামিয়ে নিলাম।

ঝুমা কিরকম একটা অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালো। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, ওর চোখ আমায় কি বলতে চাইছে।

কেতকী ঘরে এলো চা নিয়ে।

ঝুমা চলে যাওয়ার পর আমি জানলাটা বন্ধ করে খাটের দিকে এগিয়ে এলাম। কেতকী সেখানেই বসেছিল। কেতকীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিষ্কার শুনতে পেলাম। পরে যখন জানলাটা আবার খুলে দিলাম, কেতকী বললো, —জানো, অশোক ফিরে আসছে।

—তাই নাকি? ওর বৌ আর ছেলেকে নিয়ে?

—ওর বৌ আসছে না। ওর বৌ চলে গেছে। ওকে ছেড়ে চলে গেছে। অশোক ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে আসছে।

ও, —আমি বললাম, —ঝুমার কিন্তু অশোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখা উচিত। অশোক ওর উপর অন্যায় করেছিলো।

—ঝুমাকে বলো সে কথা। এই বলে কেতকী অলস পায়ে চানের ঘরের দিকে চলে গেল।

ঝুমা আমাদের বাড়ী অনেকদিন আসে না। কচিৎ কদাচিৎ পথেঘাটে দেখা হয়ে যায়।

—কেমন আছ ঝুমা?

—ভাল।

অশোকের কথা আমি জিজ্ঞেস করি না। কিন্তু অশোককে আজকাল প্রায়ই দেখি ঝুমাদের বারান্দায়। ঠিক আগেরই মতো। একদিন ওর ছেলেকেও দেখেছিলাম। ওর সোনালী চুল।

কেতকী বললো, —ঝুমা ওকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে।

আরেক দিন বললো, —ঝুমা ডক্টরেট পেয়েছে।

তারপর একদিন বললো, —ও দিল্লী যাচ্ছে। একটা ভাল চাকরি পেয়েছে। অশোকও যাচ্ছে। সেও একটা চাকরি যোগাড় করেছে দিল্লীতে। —শুনলাম অশোকের বৌ অশোককে ডিভোর্স করছে। পরে অশোক বিয়ে করবে ঝুমাকে।

অনেক দিন ওদের আর খোঁজখবর নেই। আমার আর কেতকীর মধ্যবিত্ত জীবন আশপাশের আর দশটা মধ্যবিত্ত জীবনের মতোই।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখি অশোক চা খাচ্ছে কেতকীর সঙ্গে।

—কি খবর অশোক? কেমন আছো?

—ভাল।

—ঝুমা কেমন আছে?

—ভাল।

কেতকীর দিকে তাকিয়ে দেখি সে একবার ভুরু কুঁচকালো। আমি ভাবলাম: কি হলো আবার!

চা খেয়ে অশোক চলে গেল।

কেতকী হেসে বললো, —জানো, একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে। ঝুমার বিয়ে হয়ে গেছে।

—তাই নাকি? সে আসে নি কেন?

কেতকী হাসলো, বললো, —তুমি যা ভাবছো, তা নয়। বিয়ে অশোকের সঙ্গে হয় নি, কেরালার এক মালয়ালী খৃস্টান ছেলের সঙ্গে হয়েছে।

১৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সত্যমেব জয়তে

মন্মথ রায়

[কুম্ভমেলার শেষদিন। 'ওঁ তৎসৎ' আশ্রমের সাধনচক্র। সাধনা-বেদীতে আচার্য, সম্মুখে পঞ্চসাধু। সন্ধ্যারাত্রি।]

আচার্য ॥ ওঁ ব্রাহ্মমে মনসি প্রতিষ্ঠা—

সাধুগণ ॥ আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আচার্য ॥ মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্—

সাধুগণ ॥ আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আচার্য ॥ আবিরাবির্ম্ম এধি।

সাধুগণ ॥ হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আচার্য ॥ ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি।

সাধুগণ ॥ আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব।

আচার্য ॥ সত্যমেব জয়তে।

সাধুগণ ॥ সত্যের জয় হউক।

আচার্য ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুগণ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচার্য ॥ ওঁ তৎসৎ।

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ।

আচার্য ॥ কুম্ভমেলার এই শেষ দিনটিতে ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমাদের শেষ কাজ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটিকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষটি কে?

দ্বিতীয় সাধু ॥ শুধু অভিনন্দন এবং আশীর্বাদেই কি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষটির উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন হবে আচার্যদেব?

আচার্য ॥ আমরা ভ্রাম্যমাণ সাধু। ধনসম্পদ আমরা আবর্জনা মনে করি। সত্যই আমাদের একমাত্র ধর্ম, সদিচ্ছা শুভেচ্ছাই আমাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। এ বিশ্বাস আমার আছে, ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমাদের অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করবেন এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ লোকটি।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ তিনি কে?

দ্বিতীয় সাধু ॥ তিনি কোথায়?

তৃতীয় সাধু ॥ তাঁকে দর্শন করার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রয়েছি আচার্য।

চতুর্থ সাধু ॥ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ লোকটি কিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তা জানতেও কৌতূহলের অন্ত নেই আচার্য।

পঞ্চম সাধু ॥ (চতুর্থ সাধুকে) আপনি কি বিস্মৃত হয়েছেন যে, গত বৎসর কুম্ভমেলা ভালে ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমরা সর্বসম্মতিক্রমেই আমাদের আচার্যদেবকে এই নির্বাচনের গুরুভার অর্পণ করেছিলাম?

প্রথম সাধু ॥ স্থির হয়েছিল মহামান্য আচার্য স্বীয় যোগবলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্বাচন করবেন বৎসরের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষটি।

আচার্য ॥ সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি সাধুগণ।

চতুর্থ সাধু ॥ আমার বিস্মৃতির জন্য অতীব অনুতপ্ত আচার্য।

পঞ্চম সাধু ॥ কিন্তু আর বিলম্ব নয় আচার্য। আমরা সেই মহাপুরুষের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে পড়েছি।

আচার্য ॥ তাঁকে আমি স্মরণ করামাত্র তিনি আপনাদের সমক্ষে আবির্ভূত হয়ে আপনাদের আনন্দ বিধান করবেন।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ অলং বিলম্বেন।

দ্বিতীয় সাধু ॥ তাঁকে স্মরণ করুন, স্মরণ করুন আচার্য।

আচার্য ॥ পাপ এবং অনাচার-অধ্যুষিত এই জগতে, মিথ্যাচার পরিপুষ্ট এই লোকসমাজে, এই ঘোর কলিকালে আমরা তোমার দর্শন কামনা করি হে শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ। আমরা বিশ্বাস করি তোমার মতো সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার সূচিত হবে সত্যের জয়যাত্রা। বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ, তুমি আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও। অন্ধকার জগৎ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হোক, সত্যের জয় হোক। ওঁ তৎসৎ।

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ। ওঁ তৎসৎ। ওঁ তৎসৎ।

[সাধুগণ ধ্যানস্থ হইলেন। সেখানে আবির্ভূত হইল একটি গুণ্ডা। মূর্তিমান এক শয়তান।]

আচার্য বাদে অন্যান্য সাধুগণ ॥ একি! স্বয়ং শয়তান!

[শয়তান আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল।]

প্রথম সাধু ॥ আমরা কি স্বপ্ন দেখছি।

দ্বিতীয় সাধু ॥ আচার্যদেব কি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন?

তৃতীয় সাধু ॥ আমরা অপমানিত বোধ করছি।

চতুর্থ সাধু ॥ মূর্তিমান শয়তানকে দর্শন করে আমরা অশুচি বোধ করছি।

পঞ্চম সাধু ॥ আচার্যদেব যত মহামান্যই হোন, আমাদের সঙ্গে এই মর্মান্তিক পরিহাস করার জন্য, আমাদের এইভাবে অপমান করার জন্য আমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছি।

আচার্য ॥ ধর্মভ্রাতৃগণ! আপনারা উত্তেজনা প্রশমন করুন, শান্ত হোন, শান্ত হোন। আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন।

সাধুগণ ॥ বলুন।

আচার্য ॥ ধর্মভ্রাতৃগণ, সত্যের পূজারিগণ! যোগবলে, আশা করি আমার যোগবল সম্বন্ধে আপনারা কোন সন্দেহ পোষণ করেন না—

সাধুগণ ॥ না, তা করি না কিন্তু—

আচার্য ॥ আপনারা অনুগ্রহপূর্বক

ধৈর্য ধরুন, শুনুন। যোগবলে, পূর্ণ একটি বৎসর লোকচরিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে আমি এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে—আজিকার জগতে এই মূর্তিমান শয়তানই সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ লোক।

সাধুগণ ॥ ধিক্। ধিক্ আপনাকে॥

আচার্য ॥ আমার যোগশক্তিকে আপনারা অপমান করছেন।

[নিস্তব্ধতা]

আচার্য ॥ আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, যোগশক্তি প্রভাবে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আমি এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমান সমাজে এই শয়তানই একমাত্র সৎ লোক॥ কারণ একমাত্র এই লোকটিরই কর্ম এর চিন্তাকে অনুসরণ করেছে। একমাত্র এই লোকটিরই কার্যাবলী ও বাক্যাবলী আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছি —যা অন্য কোন লোককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও পারি নি। একে আমি বুঝতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, যা অন্য কাউকে যোগবলেও পারিনি। এই শয়তান মনে যা ভেবেছে, মুখে হয়তো তা বলেনি, কিন্তু কাজে তা করেছে।

[শয়তান স্মিতমুখে আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল।]

আচার্য ॥ কিন্তু অন্য সব লোক সম্পর্কে আজ আর একথা বলা চলে না। তারা মনে ভাবে এক, মুখে বলে আর এক, কাজে করে অন্য কিছু। তাদের মন, মুখ ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না আজ।

প্রথম সাধু ॥ একথা কিন্তু অত্যন্ত সত্য।

দ্বিতীয় সাধু ॥ তা বটে। যেমন বিশ্বশান্তি। সবার মুখে আজ শান্তির বাণী, কিন্তু—

তৃতীয় সাধু ॥ কিন্তু তাদের মনের কথা কি তাই?

চতুর্থ সাধু ॥ তাদের কাজে কি তাই প্রমাণ হচ্ছে?

পঞ্চম সাধু ॥ মোটেই না। এই ধরুন, 'উন্নতি' আর 'উন্নয়ন', এই দুই শব্দ কার মুখে না শুনছি আজ?

প্রথম সাধু ॥ কিন্তু মানুষের দুঃখ-কষ্ট শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, দরিদ্র হচ্ছে আরো দরিদ্র।

আচার্য ॥ অলমতি বিস্তরেণ..... কিন্তু এমন ধাপ্পা শয়তান দেয় না। মুখে তার শান্তির বাণী নেই। কারো উন্নতি বা উন্নয়নের কথা সে বলেও না, চিন্তাও করে না। অপরের সর্বনাশই সে চিন্তা করছে। অপরের সর্বনাশই সে করছে। তাকে বুঝতে পারি আমরা। তার চিন্তা ও কার্যের সামঞ্জস্য ও সততা সন্দেহাতীত। কাজেই, আমার বিচারে শয়তানই আজ সত্যাশ্রয়ী এবং নিঃসন্দেহে সৎ-শ্রেষ্ঠ।

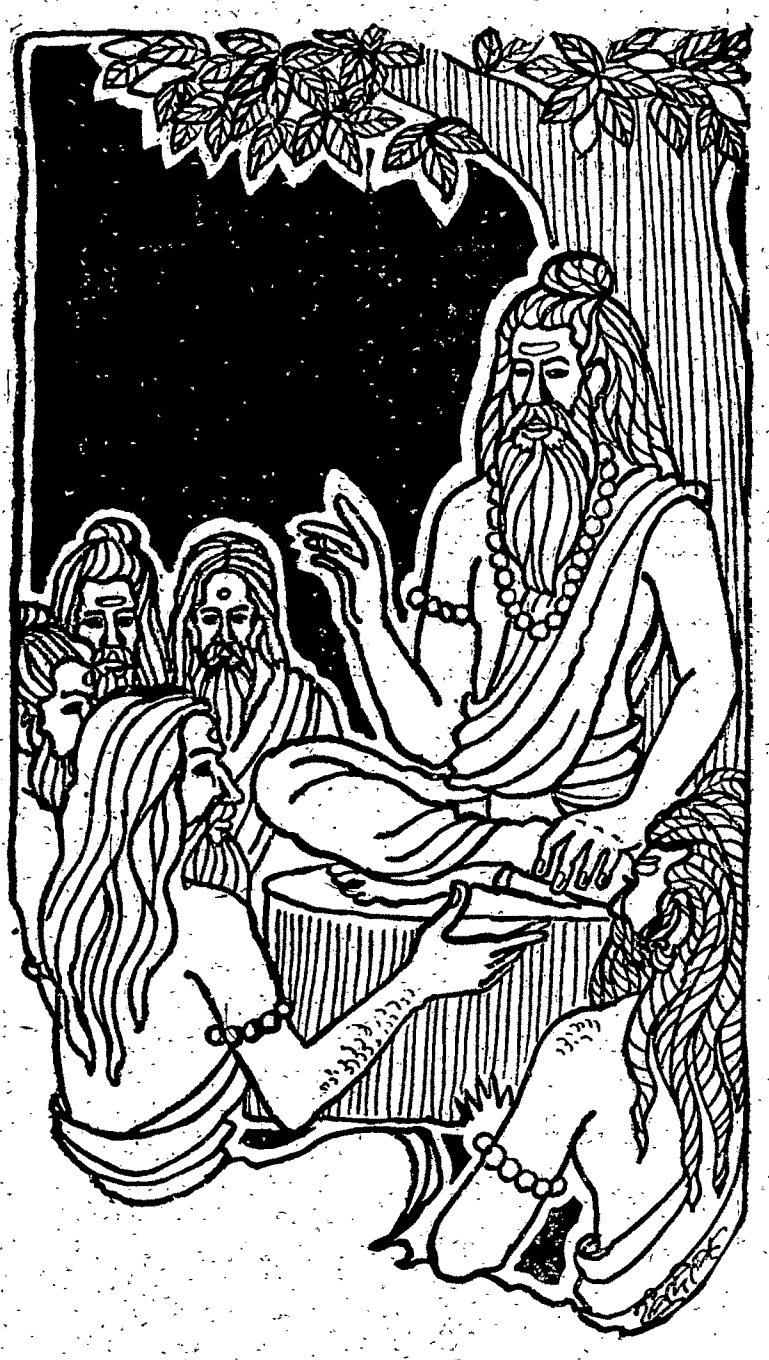

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

[শয়তান আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল।]

সাধুগণ ॥ সত্যমেব জয়তে।

শয়তান ॥ সত্যমেব জয়তে।

[শয়তান এবার সানন্দে সাধুগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।]

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ। ওঁ তৎসৎ॥ ওঁ তৎসৎ।

(সাধুগণ উত্তোলিত হস্তে শয়তানকে আশীর্বাদ করিলেন।)

॥ যবনিকা ॥

জঞ্জাল

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ময়লা শব্দটা একেবারে নির্ভেজাল। ময়লার সঙ্গেই ওর ভাল মিল— সব দিক থেকে। ময়লা আর সাফ—এ দুয়ের কোনো মাঝামাঝি অবস্থা পরিচ্ছন্ন মন স্বীকার করে না। কারণ, ধর্মঘটের সময় রাস্তার ধারে স্তূপাকার ময়লার শ্বাসরোধকারী অভিজ্ঞতা। তাই ময়লার সঙ্গে কোনো আপস চলে না, ওর মধ্যে কেমন একটা বিশেষ অশুচি ভাব আছে। কিন্তু জঞ্জালে তা নেই। সত্য কথা বলতে কি, এই আধেয় বস্তুপিণ্ডের মধ্যে একটা যেন ত্যাগের বীজ নিহিত রয়েছে। তাই জঞ্জাল বিশ্লেষণে তত্ত্বচিন্তার আমেজ এসে যায়। হাতে সময় থাকলে, জঞ্জাল ঘাঁটার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সন্তোষ মিলতে পারে। অন্ততঃ নোংরা ময়লা যতটা বিকার-ভাব উদ্রেক করে, জঞ্জাল ততটা করে না। কেন করে না, বলছি।

প্রথম কারণ—বোধহয় ব্যক্তিগত স্মৃতি। ছোটবেলায় যখন রঙ্গমঞ্চে 'আলিবাবা' দেখি, তখন 'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল' গানটির সঙ্গে মর্জিনার নাচের তালে তালে লীলায়িত ঝাড়ু-চালনা মনকে অভিভূত করেছিল। হয়তো সেই থেকেই আমার এই জঞ্জাল-'ফিক্সেশন'।

দ্বিতীয় কারণ—জঞ্জালের বিচিত্র রূপ ও জটিল চরিত্র। এর সংজ্ঞা ও পরিধি এতই বড় যে, তা নিয়ে রীতিমত একটি তত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধ লেখা যায়, যেটা তথাকথিত গল্পরচনার চেয়ে সারবান্ হতে পারে।

কত রকমের জঞ্জাল হতে পারে, একটু চিন্তা করে দেখুন। জঞ্জাল বলতে সাধারণতঃ বোঝায় যাবতীয় আবর্জনা অর্থাৎ যা-কিছু অপ্রয়োজনীয়, বর্জনীয়। মানুষের সৃষ্ট অথবা স্বয়ম্ভু, দৃশ্য ও অদৃশ্য। ঘরের দেয়ালে, ছাদের কোণে, রান্না ও ভাঁড়ার ঘরে ঝুলকালি থেকে দেশলাইয়ের কাঠি, সিগারেট বা উনুনের ছাই, বাজে কাগজের টুকরো, ঝাঁজিরির মুখে খড়কুটো, ঝরা-পাতা, ছেঁড়া বইয়ের পোকায় খাওয়া মলাট, পুরানো ছিপিহীন ওষুধের বা সেন্টের খালি শিশি, কানা-ভাঙা বোতল—এ সবকিছুই হল জঞ্জাল। এ তো একদিনের ফসল নয়। বহুদিন ধরে জমে-ওঠা, আলসেমি করে বাড়তে দেওয়া যত কিছু ফালতু বাতিল জিনিস।

এ আবর্জনা নানা জায়গায় পুঞ্জ-পুঞ্জ-ভাবে সঞ্চিত হতে থাকে। তারপর একদিন সব কাজ মুলতবি রেখে জঞ্জাল সাফ করতে বসতে হয় এবং তা করেন ঘরের ঘরণী। যদি খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ হন, তাহলে ঝি-চাকরের কাজে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। শ্রমসাধ্য হলেও, স্নানাদি স্থগিত রেখে ভাদ্র মাসের পচা গুমোট সহ্য করে ঘর্মাক্ত কলেবরে তিনি এ কাজ নিপুণভাবেই সম্পন্ন করেন। মনে করেন—জঞ্জাল বিদায় আর পঙ্কোদ্ধার তাঁর অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব—লৌকিক এবং রূপক উভয় অর্থেই।

পুরুষরা অবশ্য এই ঘন ঘন সাফ করার হাঙ্গামা ঠিক পছন্দ করেন না। মেহনতটা অবশ্য তাঁদের করতে হচ্ছে না অথচ ঘর-দোর, টেবিল, চেয়ার, সেরাজ ঝকঝকে, এতে কার মন না প্রফুল্ল হয়! বিশেষ করে কাজের পিছনে যে দরদী হাত! তবু কর্মিষ্ঠতার এই উজ্জ্বল পরিচয় যেমন আশ্বাস ও তৃপ্তিদায়ক, অপরদিককে তেমনি কিছু বিরক্তি ও গণ্ডগোলের সূচনা করতে পারে। কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে যদি দেখা যায়, অগোছালো জিনিস অতিরিক্ত গুছিয়ে রাখার ফলে দরকারী জিনিস বা কাগজপত্র অভ্যস্ত স্থানে নেই, তখন হাঁকডাক, খোঁজাখুঁজি করতে ভাল লাগে না। কিছু তর্ক, কিছু উষ্মা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন শুনতে হয়, "ভাল করতে গেলে মন্দ হয়" ... "রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো করে রাখলে এই বিনিমাইনের দাসীকেই পরিষ্কার করতে হয়...আগে চোখ বুজি, তখন দেখব কত ধানে কত চাল..." ইত্যাদি।

অবশ্য চোখ বুজলে কিছুই দেখা যাবে না আর সহস্র চোখ খোলা থাকলেও ধান-চালের হিসেব মেলানো শক্ত। গৃহিণীর বক্তব্যটা লঘু নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিস প্রময়মত হাতের কাছে না পেলে খারাপও লাগে। কাজেই জঞ্জালসন্ধানী দৃষ্টির তাড়নায় যদি আসবাবপত্র ঘন-ঘন স্থান পরিবর্তন করতে থাকে, তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় বৈকি! অবশ্য এমন পুরুষও দেখেছি যিনি মাঝেন অসংস্কৃত পরিবেশে থাকা পছন্দ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে বলছি, কোন পক্ষেই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। কারণ, মানুষ ও তার বসতি থাকলেই জঞ্জাল জমবে অল্পবিস্তর এবং তা নিয়ে উদ্বাস্ত কিংবা উত্যক্ত করা ভাল নয়। বাঙালী ঘরে ঝাঁট দেওয়া, ধোয়ামোছা কিছু ঘটা করেই করা হয়, বোধহয় জলের তেমন অভাব হয় না বলেই। কিন্তু খরা অঞ্চলে? বিদেশী মাত্রই নোংরা ভূত নয়। বিলাতেও ফি রবিবার সপ্তাহের জঞ্জাল সাফ হয়, আর 'স্প্রিং ক্লীনিং' তো বেশ ধুম করেই সমাধা হয়। কোনও পাবলিক ব্যাপারে টাকা তোলবার দরকার হলে আছে 'জাম্‌বল্‌ সেল'। পটীয়সী মহিলাদের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানের দৌলতে অনেক গৃহস্থের অব্যবহার্য জিনিস প্যাচার হয়ে যায়।

আর আমাদের আছে সেই সনাতন কাগজওলা শিশি-বোতল, ভাঙা কাচ, মরচে-ধরা টিন-লোহা, ছেঁড়া জুতো সব কিছু একেজো জঞ্জালের খরিদ্দার। পুরানো কাপড়, জাঁতির পাড়, কীটদষ্ট গরম জামা—এসব এক্সচেঞ্জের কাজ করে বর্তমানে সৌখিন স্টেনলেস স্টীলের বাসন কেনার ব্যাপারে। আগেকার দিনের থাগড়াই কাঁসার বাসন, তারপর এলুমিনিয়মের রাজত্ব চলে গেছে। আর ড্রেসডেন চায়নার ভাল ভাল ফিগারিন তো এখন রূপকথার সামিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। শুচি-বায়ুগ্রস্ত পুরুষ বা নারী ময়লা ছুঁতে চান না, কিন্তু জঞ্জাল ঘাঁটতে নারাজ নন। এঁদের কাছে নোংরার শ্রেণীভেদ ও জাতিবিচার আছে। কিন্তু জঞ্জাল হচ্ছে পাঁচমিশালী পদার্থ—ঝুড়ি বা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে সাবান দিয়ে হাত-পা ধুলেই যথেষ্ট, শাস্ত্রীয় অবগাহন স্নানের দরকার হয় না। তাছাড়া, এ তো স্বরচিত বা পারিবারিক জঞ্জাল; এতে স্পর্শদোষ ঘটে না।

একদিন সকালে ব্রজদার বাড়ী গিয়ে এই জঞ্জাল সম্পর্কে নানা তথ্য ও জ্ঞান লাভ করে এসেছি। পাড়া সম্পর্কে দাদা হলেও আমি ঘরের ছেলে বলেই গণ্য। তাই অবারিত-দ্বার। বাড়ীতে ঢুকে দেখি—দাদা সিঁড়ির পাশে একতলায় চৌকিতে বসে পরম নিশ্চিন্ত মনে ট্রাম থেকে জঞ্জাল বার করে কি যেন খুঁজছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু হারিয়েছে নাকি?" বললেন, "হ্যাঁ—একটা জরুরী চিঠি পাচ্ছি না। হয়তো ফেলে দিয়েছে বাজে কাগজের সঙ্গে। হারিয়েছে বোধহয়—আর হারাচ্ছে তো সবই।..... ধর না কেন, এই একটা পোস্টকার্ড, বারো বছর আগের লেখা..... কিন্তু মাঝে কত কি সব ঘটে গেল, তার কি কোনও হদিস আছে? এই তো একপাটি নাইলনের মোজা—কত শখ করে কিনেছিলুম। নিজের হাতে ঠাণ্ডা সাবানজলে ধুয়ে ছায়ায় মেলে দিয়েছি। আজ ওটা সঙ্গীহীন, আমিও নির্বিকার! আচ্ছা, এতো যে সুন্দর হরফে লোভনীয় রঙে ছাপা সচিত্র বিজ্ঞাপন—কতো বাজে খরচ বল তো? দু'দণ্ড পড়ে ফেলে দিচ্ছি। কি লাভ? এত লোকের শ্রম—ডিজাইন, লে-

জাউটের চিন্তা—সব বরবাদ!

"ঐ দেখো না, জং-ধরা লোহার বঁটির কলাটা! রাঁচীর এক শহরতলীর বাজার থেকে তোমার বৌদি দরদস্তুর করে কিনেছিলেন—আর কিনেছিলেন কতো শখ করে জয়পুরের জহুরীবাজার থেকে এই রাজস্থানী পুতুলটা। আজ ওর ঘাঘরা, ওড়না, গয়নার জলুসের চিহ্নমাত্রও নেই। মাথাটাও বেবাক ফুটো। সবই জঞ্জাল হে—সার দুনিয়াটা জঞ্জালে ভর্তি। পায়ের নীচে আটি থেকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়র পর্যন্ত রেডিও-এ্যাকটিভ ধুলো-বালি-জঞ্জালে ভরপুর!! আর মানুষের মগজে? তারও বেশী। যতো নীতি, ততো ছাইপাশ! মানবনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি নিয়ে কত মতভেদ—সাহিত্য, আলোচনা, নব্য সমালোচনা নিয়ে কত তত্ত্ব বিশ্লেষণ! সব বাক্যজঞ্জাল আর চিন্তার জঞ্জাল স্তূপাকার হয়ে মানুষকেই চেপে মারছে। বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা, সংশোধনের চেষ্টা তোমার এই জগৎ মানবে না। আর ঐ দেখ না, ঠোঙায় ভরা আলুর খোসা, শাকের পাতা,...কতো ভিটামিন যে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়! বলি, মাথায় কিছু ঢুকছে, নাকি বকেই মরছি...?"

বললাম—"কিছু কিছু। আপনি ততক্ষণ জঞ্জাল দেখুন, আমি বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসছি এখুনি...."

সোজা ওপরে উঠে গেলাম। দেখলাম, বারান্দার পাশে ছোটো ঘরের কোণটায় বৌদি পা ছড়িয়ে বসে। সামনে একটা রংচটা স্টীল ট্রাঙ্কের ডালা খোলা। ভিতর থেকে অনেক হাবিজাবি জিনিস, কিছু বা ফেলে দেওয়া হবে। বৌদি কি যেন হাতে করে দেখছেন, ভাবছেন। একটা নরম দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বৌদি! দাদা তো নীচে জঞ্জাল ঘাঁটছেন আর আপনি...?"

"আমিও তাই। যতো আদ্যিকালের জঞ্জাল....." বলে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বৌদি জিনিসটা বাক্সের মধ্যে একপাশে চট্ করে সরিয়ে রাখলেন।

উঁকি মেরে দেখি,..... বিবর্ণ সবুজ ফিতেয় বাঁধা খামশুদ্ধ একটা পুরানো চিঠির গোছা বলেই ঠেকল আর তারই পাশে রঙিন গামছার মতো জালি সুতোর কাপড়ে বাঁধা গাঁটছড়া!

ভাবলাম, সময়ের স্রোতে সব জঞ্জালই ভেসে যাবে, কিন্তু এই স্মৃতি জঞ্জাল কতদিন আর জমিয়ে রাখবে! কোন্ আঘাটায় গিয়ে শেষে ঠেকবে, কে-ই বা মর্যাদা দেবে!

কুশল সংবাদ

১৫৫ পৃষ্ঠার

আমি অবাক। কেতকী বললো, অশোক এক মাসের ছুটি নিয়ে ওর মাকে দেখতে এসেছিলো। হঠাৎ পেলো বিয়ের চিঠি। অশোক ঝুমাকে একটা চিঠি দিলো। —ঝুমা, আমাকে লুকিয়ে তুমি হঠাৎ এরকম একটা কিছু করে বসবে, আমি ভাবতেই পারিনি। ঝুমার উত্তর এলো, আমি ভাল আছি। এ্যান্টনিও ভাল আছে। তুমি কেমন আছো জানিয়ো। খোকনকে আমার চুমো দিয়ো।—অশোক তখন আরেকটা চিঠি লিখলো, —ঝুমা, এ অবস্থায় আমাদের আর কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখার কোন মানে হয় না। ঝুমার উত্তর, —আমি ভাল আছি, এ্যান্টনিও ভাল আছে। তোমার কুশল জানিয়ো। মাসিমাকে আমার প্রণাম জানাবে।

কেতকী বলে গেল, —অশোক কোথায় গিয়ে আর অনুযোগ করবে? তাই আমার কাছেই এলো। ওকে এখানে এসে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে চা খেতে বলেছি। অবিশ্যি তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, —এই বলে কেতকী আমার চোখের উপর ওর বড়ো বড়ো চোখ দুটি রাখলো।

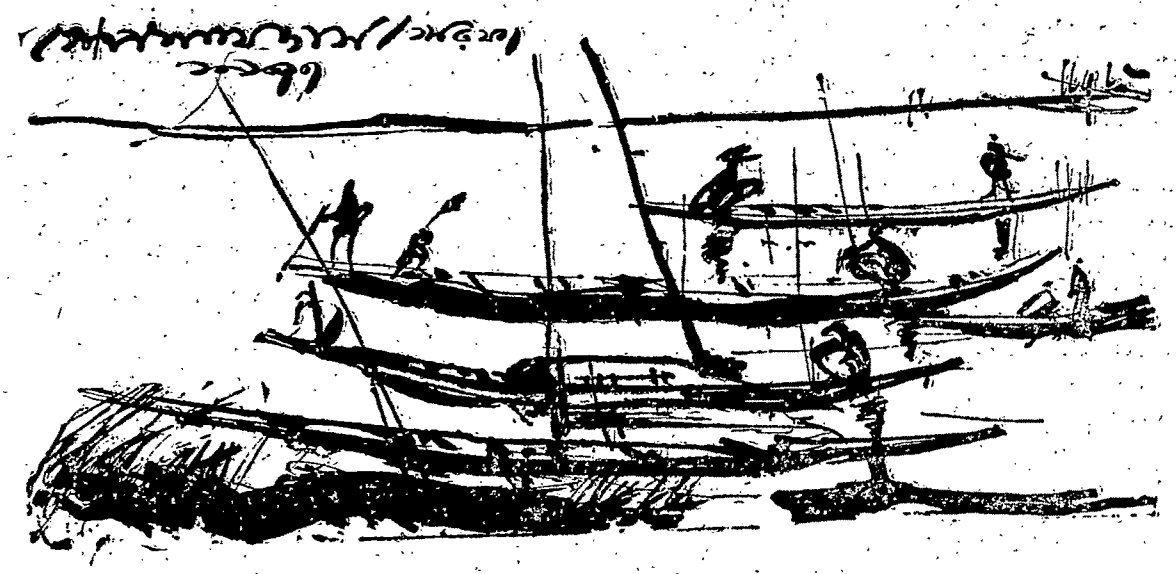

স্কেচ

—গোপীনাথ দাস

নশীপুরের নকীব

৯৭ পৃষ্ঠার পর

টিয়া জানায়—না। অসুবিধে কিসের ? ভালোই আছি।

—তবে চলে যেতে চাইছো কেন ? গেণু দাস ওর কাছে এগিয়ে এসেছে। দেখছে মেয়েটাকে। ওর নিটোল যৌবন-মদির দেহ, ওর সলজ্জ চাহনি, আর সংকোচভরা কথাগুলো গেণু দাসের মনের শূন্যতার মাঝে একটা সাড়া এনেছে।

টিয়া যেন ওর প্রশ্নে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবু জানায় টিয়া ঃ

—চুপচাপ বসে বসে খাবো কদ্দিন ? হাসছে গেণু দাস। একটা সমস্যা সমাধান-এর কথা ভাবছে সে।

গেণু দাস বলে ওঠে—মেয়েদের স্কুলে চাকরি করবে ? ধরো বেয়ারা তো চাই। খাতাপত্র ক্লাশে নিয়ে যেতে হবে। দিদিমণিদের ফাই-ফরমাস খাটবে। মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকবে স্কুল খুললে। খাওয়া-থাকা ছাড়াও মাস মাস কিছু টাকা মাইনে পাবে।

টিয়া কথাটা শুনে চমকে ওঠে। এভাবে তার মাথা উঁচু করে বাঁচার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি। গেণু দাস-এর সন্ধানী দৃষ্টি ওর মুখে পড়েছে। চতুর লোকটা জানে তার দাবার ঘুঁটির চালগুলো ব্যর্থ হয় না। তার একমাত্র লক্ষ্য সব কিছু পাওয়া—সব কিছুকেই গ্রাস করা। তার জন্য গেণু দাস ভেবে চিন্তে পা ফেলে।

গেণু দাস দেখেছে মেয়েটার চোখে-মুখের নীরব খুশীর ঝলক। এটাই সে আশা করেছিল। তবু গেণু দাস নিরাসক্ত স্বরে জানায় ঃ

—অবশ্য কথাটা তুমি ভেবে দেখো। তারপর ধরো অবিনাশ, মানে তোমার স্বামীর মতামতটাও বড় কথা।

টিয়ার অভিমানভরা মন ফুঁসে ওঠে। আজ সে নিজের পরিশ্রমে ভালোভাবে ভালো পরিবেশে বাঁচার একটা পথ পেয়েছে। তাই টিয়া বলে ঃ চাকরি করবো আমি, তার মতামতের কি থাকবে এতে !

গেণু দাস হাসছে, ওর হাসিটায় কোন সাড়া ওঠে না। নীরব অন্ধকারে যেন একটা চাপা খস্‌খসানির শব্দ ওঠে, যেন শুকনো ঝরাপাতার উপর দিয়ে একটা বিষধর সাপ বুকে হেঁটে চলেছে।

গেণু দাস বলে—মাথা গরম করে কিছু করো না। ক'দিন পরই স্কুল খুলছে। কাল বড়দিদিমণি আসছে, আমি বলে রাখবো। তুমিও ভেবে-চিন্তে দ্যাখো।

টিয়া কথাটা ভাবছে। গেণু দাস চলে গেছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে টিয়া। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল সে।

যতীনের মা ছায়ার মত এগিয়ে আসে। ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে বুড়ি—দেখলে তো বাছা, বড়বাবুর আমাদের দয়ার শরীর। কেমন খাসা চাকরির কথাটাও পাকা করে দিল। তা'হলে বাছা থেকে যাও এখানেই। ওই ভাঙ্গা ভিটেতে অভাব আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাঝে গিয়ে কি করবা ? গতরপাত করে এতদিন তো রয়েছিলে, তা দেখেছে সেই মানুষটা ?

টিয়া জবাব দিল না। চুপ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। যতীনের মা দেখছে ওকে। জানে বুড়ি—প্রথম প্রথম এমন একটা সমস্যার কথা মনে আসবেই মেয়েটার। কিন্তু ওই চাকরি আর এখানের জীবনের মোহটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা কষ্টকরই। বুড়ি এমন অনেককেই দেখেছে। তেজী বেবশ বুনো ঘোড়ার মত অবাধ্য অনেকেই গেণু দাসের ধুলোপড়ায় মাথা নীচু করেছে।

বুড়ি এইখানেই সেই ঘটনা একাধিকবার ঘটতে দেখেছে।

টিয়া কথাটা ভেবেছে।

মনে পড়ে কিছুদিন আগেকার এখানের শান্ত পরিবেশের কথা। আম-বাগান-এর মধ্যে বিরাট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে স্কুল—মেয়েদের স্কুলের পাকা-বাড়ি। ওদিক এদিকে বোর্ডিং আর আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছোট ছোট বাড়িগুলো। মাষ্টারবাবু, দিদিমণিদের বাসা। গ্রামের ঘিঞ্জি পরিবেশ নয়, গ্রাম একটু দূরে। ওপাশে বড়বাবুর সাজানো বাংলো। চড়াই-এর ওদিকে নদীর ধারে খামার বাড়ি, গোয়ালবাড়ির সীমানা সুরু হয়েছে।

এদিকটা এই এলাকার মধ্যে সাজানো। কেতুলালকে জেলার অন্যতম নেতা বানিয়ে গেণু দাস মদত দিয়ে এখানের রূপ বদলেছে। বাইরের দিদিমণিরাও এখানে থাকে। মেয়েরাও স্কুল বোর্ডিং-এ থাকে। এ যেন স্বতন্ত্র একটি পরিবেশ। টিয়ার মনে হয় এখানে থেকে চাকরিটা সে নেবে। তবু ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। সহরের নোংরা বস্তির মধ্যে ভাই বৌদির দয়ায় পড়ে থাকার চেয়ে এখানে থাকাই ভালো। তাছাড়া অবিনাশের আপত্তি হবে না। হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এখানে সে আগেও এসেছে দুধের রোজ দিতে, না হয় হাটবাজার করতে।

টিয়া আজ মনস্থির করেই ফেলেছে। মনে মনে সে এখানের জগতের একজন হয়ে গেছে।

সবিতা সান্যাল বাইরের থেকে এখানে চাকরী করতে এসেছে স্কুলে। স্বামী থাকেন দুর্গাপুরে, সবিতা এখানের স্কুলে এসেছে, তার ওখানেই থাকবে টিয়া। স্কুলের কাজকর্ম করবে। আর সবিতাও একা থাকে, তাই টিয়াকে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। ছিমছাম ভদ্র ধরনের মেয়েটিকে পছন্দ হয় তার।

গেণু দাসই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সবিতা বলে—কাল থেকেই চলে এসো আমার বাসায়। দু'জনে থাকা যাবে। টিয়া তার নতুন মনিবকে দেখে খুশী হয়েছে, তবু বলে টিয়া ঃ

—মাঝে মাঝে বাড়িতেও যেতে হবে আমাকে দিদিমণি। বেশীদূর নয়। নকী-পুরেই ঘর আমাদের।

হাসে টিয়া—ঘর আর নাই। বানে ভেসে গেছে।

কথাটা বলে কেমন চমকে ওঠে টিয়া। কি যেন একটা সর্বনেশে কথাই বলে ফেলেছে সে। সবিতা ওর দিকে চাইল। টিয়ার সিঁথিতে সিন্দুরের বিবর্ণ দাগ, ওর পোশাক দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না যে কোন ঘরের বৌ। নিজেরও স্বামী আছে। দু'জনেই দু'জনের জন্য ভাবে। তাই সবিতা টিয়ার ইঙ্গিতটা বুঝে বলে ঃ

—তা যাবে বৈকি।

টিয়ার সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে।

অবিনাশের খবর অবশ্য প্রভাত-বাবুর কাছেই পেয়েছে। গ্রামেও নেই অবিনাশ, সে এখন সদর সহরে যাতায়াত করছে আর সদ্য জেগে ওঠা গ্রামের মানুষগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত।

প্রভাতবাবু বলে—ও ভালো আছে টিয়া।

টিয়া জবাব দিল না। লোকটার উপর জমেছে শুধু অভিমানই। এত বিপদের সময় তাকে অচেনা অজানা জায়গায় ফেলে রেখে একবার খোঁজ নেবার দরকার বোধ করে না।

কারণটা অনুমান করেছে টিয়া। তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই খারাপ ভেবেছে অবিনাশ। তাই ঘৃণাভরে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তবু টিয়া বের হয়ে এসেছিল আজ অবিনাশকে এখানে দেখে। দেখেছে দূর থেকে ওই নিতাই-যতীনের দল তাকে ঘিরে ফেলেছে। আর

অসহায় বুভুক্ষু মানুষগুলোর হয়ে কথা বলতে গিয়ে অবিনাশ যেন অন্যায় করেছে।

টিয়া বুঝতে পারে না অবিনাশ কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামায়। এই পরের জন্য ভাবতে গিয়ে টিয়া দেখেছে অবিনাশ পদে পদে ঠকেছে। তার ভাগচাষের জমিগুলোই মালিক আগে কেড়ে নিতে হাত বাড়িয়েছে। তার ঘরের ধান চাল মায় টাকাপয়সা অবধি অবিনাশ লোককে বিলিয়ে দিয়েছে। আগে, এ নিয়ে টিয়াও বহুবার প্রতিবাদ করেছে। কথা কাটাকাটিও হয়েছে। আর অবিনাশ চটে উঠে বলেছে টিয়াকে—আমাদের বাড়তিটুকু অপরকে দিলে দোষ?

টিয়া বোঝাতে পারেনি ওকে।

এই নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে উঠেছে মতান্তর, আর ব্যবধান। টিয়াও বলেছে—ওই পরোপকার দেশসেবা করতে হয় কেতুবাবুর মত করো, তা নয় শুধু সব বিলিয়ে নিজেরা উপোস দিতে পারবো না।

টিয়ার অভিমানী মন গুমরে উঠে বার বার নিজের অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে—তবে জেনে-শুনে বিয়ে থা করেছিলে কেন?

বণ্ঠিতা একটি নারীমন বার বার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু অবিনাশকে সে টলাতে পারেনি।

আজ তাই ওদের মাঝে অবিনাশকে দেখে টিয়া একটু বিরক্ত হয়। এখানে এসে ওসব কথা না বললেই পারতো সে। অবিনাশকে দেখেছে সে, রক্ত ঝরছে নাক দিয়ে। বলিষ্ঠ কঠিন মানুষটা তবু নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গেণুবাবু কেতুবাবুরা এসে প'ড়ছেন।

কিন্তু অবিনাশ এতটুকু ঘাবড়ায় নি। সেও মাথা উঁচু করে ওদের সঙ্গে সমানে সওয়াল জবাব করে চলেছে। যেন তার কথাটাই বেদবাক্য। টিয়া লোকটার গোঁয়ার্তুমিটাকে সহ্য করতে পারে না। এখানে এসব কথা না বললেও চলতো।

টিয়া মনে মনে ওই অবিনাশের উপর চটে উঠেছে। শুধু তার জীবনেই নয়, নিজের জীবনেও ওই অবিনাশ এমনি ভুলগুলো বার বার করে এসেছে, ঠকেছে আর ঠকিয়েছে টিয়াকেও।

সেই শূন্যতার জ্বালা টিয়ার সারা মনে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওই দুঃখকষ্টের জীবন আর তার মাঝে গোঁয়ার একটা লোককে নিয়ে ঘর বাঁধার সব স্বপ্ন তার হারিয়ে গেছে। আজ সে তাই এখানের সহজ নিশ্চিন্ত জীবনের কথাই ভাবে।

গোলমাল থেমে গেছে। ইস্কুল-বাড়ির চত্বরে লপ্‌সির জন্য পাতা পেতে বসে ওরা কলরব করে চলেছে, এছাড়া আর করণীয় কিছুই তাদের নেই।

বাবুরাও ফিরে গেছে বাংলোয়। তাদের সামনে অনেক কাজ। অবিনাশ একাই ফিরছে। আজ তার মনে বেজেছে এদের আঘাত আর অপমানটা। ওই কথাটা সে ভুলতে পারেনি। তার স্ত্রীকেও এখানে পাঠিয়েছে সে। টিয়া এদেরই আশ্রয়ে দয়ায় টিকে রয়েছে এখানে। আরও কি যেন ইঙ্গিত করেছিল যতীন টিয়ার সম্বন্ধে। অবিনাশ ঠিক জানে না টিয়া কোথায় আছে। খবরটা নেবারও সময় হয়নি কারো কাছে। গোলমাল বেধে গিয়েছিল তার আগেই। অবিনাশ বাগানের মধ্যে এখান-ওখানে ছড়ানো বাড়িগুলোর মধ্যেকার পথ দিয়ে চলেছে। টিয়াকে তার দরকার। ওকেও নিয়ে যাবে এখান থেকে। এভাবে অপমান সহ্য করে এখানে রাখবে না ওকে, জল নেমে গেছে।

তবু হেঁটে যাওয়া যাবে, আর গঞ্জমধরেও ফিরতে হবে তাদের এখানের পালা চুকিয়ে যেতে চায় অবিনাশ।

হঠাৎ একটা আমগাছের নীচে টিয়াকে দেখে দাঁড়ালো। ওদিকে বাড়িটার গায়ে সবুজ বোগেনভিলা লতায় এসেছে গাঢ় লাল হলদ পাতা ফুলের ভিড়। টিয়াকে দেখে চাইল অবিনাশ।

ক'দিন ঝড় বয়ে গেছে এই মুলুকে। ইস্কুল বাড়ির আশ্রিত মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দেখেছে অবিনাশ, ওদের মুখচোখে শীর্ণতা, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, কাপড়-চোপড় ময়লা, পূতি-গন্ধময়। ওদের চোখে ফুটে উঠেছে হতাশার অন্ধকার। কিন্তু টিয়ার দিকে চেয়ে অবাক হয় অবিনাশ। ওই দারিদ্র্য-শীর্ণতা-কষ্টের কোন চিহ্ন ওতে নেই। হতাশার ছায়া ওর উজ্জ্বল চাহনিকে ম্লান করেনি। বরং ওর সারা দেহে ফুটে উঠেছে একটা লাস্য। শাড়িখানাও ফর্সা, পাটভাঙ্গা, সদ্য স্নান সেরে পিঠে একরাশ চুল মেলে দিয়েছে।

অবিনাশ দেখছে ওই টিয়াকে।

টিয়াও দেখেছে ওই ধ্বংসস্তূপের মত লোকটাকে। ক'দিনে ওর বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারাটায় এসেছে শীর্ণতা, আর চোখ দুটোর চাহনি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, কপালে নাকে ওদের মারের দাগ। আর ওই রুক্ষতার মাঝে ও যে কঠিন প্রতিবাদ-মুখর একটি প্রাণী।

টিয়া শুধোয়—হাঁ করে দেখছো কি? অবিনাশ বলে ওঠে—এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে। আজই।

চমকে ওঠে টিয়া, ওই শূন্যতার মাঝে ধ্বংসপুরীতে গিয়ে সাপখোপের মধ্যে আর নিদারুণ অভাবের মধ্যে বাঁচতে সে পারবে না।

টিয়া জবাব দেয়—ওখানে গিয়ে থাকবো কোথায়? ঘর তো ভিটেপুরী হয়ে গেছে। আর তুমি তো পথে পথেই ঘুরছো শুনলাম।

অবিনাশ ওর দিকে চাইল। ও দেখেছে টিয়ার চোখের ওই জ্বালাটাকে। টিয়া আজ কঠিন স্বরে বলে—আমার কথা কোন দিন ভেবেছো? সব হারিয়েও তবু জ্ঞান হয়নি তোমার? আজ এসেছে এদের এখানে ওই গেণুবাবু কেতুবাবুদের সঙ্গে টক্কর দিতে। পারবে তুমি ওদের সঙ্গে? তার জবাবও দিয়েছে ওরা। তোমার নাক-মুখ-এর ছবিটা দেখলে বুঝতে পারতে।

অবিনাশ আজ এই জবাব শুনবে তা যেন ভেবেছিল। জীবনে নিজের বলতে কোন কিছুর উপর মোহ তার কমই। টিয়ার উপর একটু দুর্বলতা তার তবু ছিল। কিন্তু সেই টিয়াই আজ তাকেও ভুল বুঝেছে। আর টিয়ার কথার জ্বালা তাকে ব্যথিত করেছে ওদের প্রহারের চেয়েও অনেক বেশী মাত্রায়।

অবিনাশ বলে ওঠে—তাহলে গেণু-বাবুরাই তোকে দলে টেনেছে বল টিয়া? তা ভালোই। কথাটা কানে এসেছিল আগেই—

টিয়া তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করে—কি শুনেছিলে জবাব দাও?

অবিনাশ ওর দিকে চাইল। তেজী মেয়েটার দু'চোখ জ্বলে উঠেছে। টিয়া বলে ওঠে:

—তা বলার সাহস তোমার নেই। নিজে জ্বলছো—তাই আমাকেও সারা জীবন জ্বালাতে চাও। তাই বলছি—ওসব আমি সইবো না। নিজে যদি বদলাও—আমি ঘরে ফিরবো। নাহলে ওই ধ্বংসপুরীতে একটা অপদার্থ লোকের কাছে আমি ফিরবো না। তাতে তুমি আমার সম্বন্ধে যা ভাবো—তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না।

অবিনাশ চুপ করে ওর কথাগুলো শুনছে। টিয়া কথাগুলো বলে ফিরে ওদিকের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলো। অবিনাশ কি বলতে চায়—কিন্তু টিয়ার সে কথা শোনার প্রয়োজন নেই। সে আজ অবিনাশকে জবাব দিয়ে গেছে।

অবিনাশ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে। এই ছায়াঘন আমকাঠালের স্নিগ্ধতা তার মনের জ্বালাটাকে কমাতে পারেনি। আজ মনে হয় তার সব হারিয়ে গেছে।

বানের জল নেমে গেছে মাঠ থেকে, তারা দিগন্তজোড়া প্রকৃতির বুকে শুধু ক্ষতের দাগের মত ঠাঁই ঠাঁই জেগে আছে মরা খাদ—বালির স্তূপ আর ঘোলা জলের সঞ্চয়। শান্ত প্রকৃতির বুকে নিরাভরণ শূন্যতা—নিঃস্বতার মাঝে মাথা তুলে চলেছে একটি মানুষ। তারও বুক-জোড়া অমনি ক্ষত, আর নিঃস্বতা। অবিনাশ ভাঙা বাঁধের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। নদীর মুখটা যেন 'হাঁ' হয়ে আছে কি ক্ষুধায়, আজ সর্বনাশা বন্যা তাদের সব সম্পদ—সব সঞ্চয়টুকুকে কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব ভিখারীর দলে পরিণত করেছে।

—অবা। অবিনাশ কার ডাকে চাইল।

রামু মোড়ল, দুঃখীরাম, শেখপাড়ার আইনুদ্দি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁধের ভাঙন মুখে। রামু মোড়ল বলেঃ

—বাঁধ কি বাঁধা হবে না, অবা? আমরা কি দাঁড়িয়ে ডুববো আবার? দশ-বিশখান গেরামের লোকে রাজী হয়েছে।

অবিনাশের বুকের জ্বালাটা এবার এক কাঠিন্যে পরিণত হয়। সে দেখছে ওই মানুষগুলোকে। ওরা হাত লাগাতে চায়, নিজেদের ভাগ্যকে আবার নোতুন করে গড়তে চায়। গড়তে চায় প্রতিরোধের বাঁধ। সব অন্যায় অত্যাচার, প্রলোভনের বন্যাকে তারা রুখতে চায়। অবিনাশের মনে পড়ে গেণুবাবুর কথাগুলো। ওদের দেখিয়ে দিতে চায় অবিনাশ তারা এত মহামারীতেও মরেনি। রক্তবীজের প্রাণশক্তি নিয়ে তারা বেঁচে থাকবে—লড়াই করবে জীবনের সঙ্গে।

—অবিনাশ!! আইনুদ্দি এগিয়ে আসে—তোরাও আয় অবিনাশ। লোকের অভাব হবে না। এ বাঁধ আমরাই বাঁধবো।

অবিনাশ যেন অনুভব করছে সূর্যের উত্তাপ। তার সব হারানো ব্যথাভরা মনটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অবিনাশ বলে ওঠেঃ

—হ্যাঁ। আইনুদ্দি চচা, রামুদা—বাঁধ আমরাই বাঁধবো। ঢোল সহরৎ করে দাও। কাল থেকেই বাঁধে মাটি পড়বে।

ব্যাপারটা দেখেছিল সবিতা।

তার বাসাতে এসে উঠেছে টিয়া। কাল থেকেই কাজে লেগেছে, মেয়েটার হাসিখুশি ভাব, তার চটপটে কাজকর্মগুলো সবিতার মনে ধরেছে। এক-আধটু লেখা-পড়াও জানে। সহরে মানুষ হয়েছে তাই এখানের যাদের আগে পেয়েছিল কাজ করার জন্য তাদের থেকে টিয়া অন্য রকমের, আর মন দিয়েই কাজ করে।

ঘরদোর গুছিয়েছে সুন্দর।

সবিতা ঘরে বসেছিল। দুর্গাপুরে তার স্বামীকে চিঠি লিখছিল—লোকটা একা বাসায় থাকে সেখানে, সবিতাও তাকে ছেড়ে এই পাড়াগাঁয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে বিশ্রী লাগে। তাই চিঠি লেখার সময় ওরা দু'জনে যেন কাছাকাছি এসে যায়, এই সান্নিধ্যটুকু সবিতা মন দিয়ে অনুভব করে।

হঠাৎ বাইরে টিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে চাইল। জানালার বাইরে গাছের নীচে টিয়ার সঙ্গে অবিনাশকে দেখে একটু অবাক হয়েছে সে। ক্রমশ বুঝতে পারে ওদের সম্পর্কটা। বলিষ্ঠ ওই অবিনাশের চোখে-মুখে দেখেছে সবিতা কি প্রতিবাদের কাঠিন্য, মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো—কাপড়টা ময়লা, তবু তার ব্যক্তিত্ব যেন ওই রুক্ষতার মাঝেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

ওদের উত্তেজিত কথাগুলো শুনেছে। সবিতা ঠিক জানে না ওদের ব্যাপারটা, তবু সরে এসে কাজে বসলো। কিছুক্ষণ পর টিয়াকে ঢুকতে দেখে চাইল। ওর মুখ-চোখ থমথমে। সবিতা শুধোয়—

—কি রে? নিতে এসেছিল নাকি তোকে তোর স্বামী?

টিয়া চাইল দিদিমণির দিকে। ওর মনে তখনও ঝড় বয়ে চলেছে। অবিনাশ আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু টিয়াই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ওর ওই খেয়াল আর গোঁয়ার্তুমিকে সে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু সেই কঠিন কথাটা দিদিমণিকে জানাতে কোথায় বাধে তার। টিয়া চুপ করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। বেলা হয়ে গেছে—এখনও রান্নার কাজ বাকী।

...মাছ-এর ঝোল-এর সুন্দর গন্ধ উঠছে। টিয়া রাঁধতে পারে ভালোই। ভাতও হয়ে গেছে। ফ্যান ঝেড়ে ভাতগুলোকে ঢাকা দিয়ে রাখছে। জুঁই ফুলের মত কার্তিক কলমা চালের ভাত—হঠাৎ টিয়ার মনে পড়ে অবিনাশের কথা। লোকটাকে আজ নির্দয়-ভাবেই তাড়িয়ে দিয়েছে সে। কোথায় রয়েছে—কি খাচ্ছে—খেতে পাচ্ছে কিনা তাও জানে না। নিজের এই সহজ জীবনের সঙ্গে অবিনাশের ওই কষ্টের জীবনটার পথ যেন অনেক দূরেই সরে গেছে। টিয়াই সরে এসেছে।

—খাবার হল টিয়া?...

সবিতার ক'দিন স্কুল ছিল না, দুর্গাপুর থেকে ফিরে এসেছে—কাল পরশু থেকেই স্কুলবাড়িটা খালি হয়ে যাবে, স্কুলও সুরু করবে তারা। আজও বেলাতেই খেয়ে দেয়ে একটু জিরোবার কথা ভাবছে। রান্নাঘরে ঢুকে টিয়ার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো। টিয়াও যেন ধরা পড়ে গেছে, দিদিমণির সামনে তার মনের অসহায় ভাবটাকে সে চাপতে চায়। তাই ওটাকে চেপে টিয়া কোনরকমে অশ্রুভেজা স্বরে জানায়—হয়ে গেছে দিদিমণি।

সবিতা বাইরে থেকে জানায়—জায়গা হলে ডাকবে।

সরে এল সবিতা। মেয়েটার মনের এই যন্ত্রণাটাকে সে হঠাৎ দেখে ফেলেছে। সবিতা তবু টিয়াকে সেই কথাটা জানতে দিতে চায় না।

...গেণু দাস এর মধ্যে বেশ কিছু লোকের সই-সাবুদ নিয়ে সদরে দরখাস্ত দিয়েছে বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জমি-জায়গার খাজনা মকুব করার জন্য। বদন ডাক্তার এ কাজের নেতা। লোকটা কিছু দিনের মধ্যেই হঠাৎ মাতব্বর হয়ে পড়েছে। বদন ডাক্তারের মনে একটা ফিকির চিরকালই বাসা বেঁধে থাকে। এক-একবার এক-এক পথে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। তাই কখনও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কখনও ধান-চালের ব্যাপারী, কখনও গরুর ডাক্তার, কখনও দেশসেবক।

আর এবার দেশসেবায় কাজে নেমে তবু কিছু হাতিয়ে এনেছে। আর দেখেছে এখানে মান-খাতিরও মেলে। বানের পর বদন ডাক্তারই এবার গেণুবাবুকে বলে এই দরখাস্তের সই সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে দু'-একটা গ্রামে মিটিংও করেছে। অবশ্য অন্য সকলের চেয়ে এতে গেণু দাসই লাভবান হবে বেশী। খাজনা তাকেই বেশী দিতে হয়, সুতরাং লাভটা তারই হবে।

তাছাড়া বদন ডাক্তার এখন কেষ্টবাবুদের লোক, তাই মান-খাতিরও পাচ্ছে। আর মিটিং-এ বদন বলেঃ

—ঘর গড়ার টাকাও আসছে।

লোকগুলো গ্রামের ভিটেপুরীতে ফিরে যাচ্ছে বাধ্য হয়ে। কারণ আশ্রয় গড়ে তুলতে হবে। জমির অধিকাংশ গেছে বালিতে ঢাকা পড়ে, মাঠে ধানও নেই। অন্য ফসলগুলোকেও বাঁচাতে হবে। তাই অনেকেই বলে—তা ট্যাকা কবে দিবেক গ?

...এরা এমন বন্যায় ডুবেছে মাঝে মাঝে। এসব কথাও শুনেছে, আর দেখেছে শেষকালে তাদের মহাজনদের কাছেই হাত পাততে হয়েছে। গেণু দাস, নিমাইবাবুদের ঘরে কম দামে চলে গেছে তাদের জমি-জায়গাত।

...আইনুদ্দি শেখ বলেঃ

—ট্যাকা দিবেক গোরে গেলে। ধান-ট্যাকা এসব তো ফি বারই দোব বলো, তা পেয়েছি কিছু?

বদন ডাক্তার ওদের কথাগুলো শুনে একটু ঘাবড়ে যায়। কয়েক দিন ধরে ওই কথাই শুনছে লোকগুলো। এবার তারা সাফ জবাব চায়।

তাই গোকুল বলে ওঠে—পাবা কচ-কলা। গটি গটি কাপড়—ইয়া ইয়া কম্বলের

গাট এসেছিল, মুদিরাম-নকুল এরাই নামিয়েছে। তা সেগুলান কুন দিকে গেল হে ডাক্তার?

বদন ঘাবড়ে যায়। ওসব কোথায় গেছে তা জানে না বদন, তবে খানদুয়েক কম্বল আর গোটাপাঁচেক শাড়ি হাতিয়েছে। এবার সেগুলোর কথাই বোধহয় বলে ফেলবে তারা। গুপীনাথ বলে :

—সে সব গেছে কত্তাদের ঘরে। না-হয় আবার ফিরতি ট্রাকে সদরের দোকানেই চলে গেছে। তু শালোরা হাত গায়ে দিয়ে থাকিস তাই থাকবি।

তোমাদের বাড়িঘরের ট্যাকাও অমনি চালান হয়ে গেছে দাদা। তাই বলছিলাম বাঁশ তালপাতা ছন খড় দিয়েই কোঠাবালাখানা বানাও। বর্ষায় মাথা গুঁজতে হবেক তো?

বদন ডাক্তার একটু টসকে গেছে। দেশসেবার কাজে এমন কথা শুনতে হবে তা ভাবে নি। তখন এই লোকগুলোই ইস্কুল বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে ওই খিচুড়ি পেয়ে বর্তে গিয়েছিল। এখন গাঁয়ের মাটিতে ফিরে এসে আবার নিজমূর্তি ধরেছে।

আইনুদ্দি বলে—ঘর তো বাঁধবি, তার আগে বাঁধ বাঁধ। না হলে এক হড়পায় আবার সুব ফোঁত।

ওরা তাই এবার বাঁধে এসে হাত লাগিয়েছে। দশ-বিশখানা গ্রামের মানুষ জমেছে এখানে। কেউ তাদের ডাকে নি, শুধু খবর গেছে মাত্র। অবিনাশ-যতিলাল-আইনুদ্দিরাও অবাক হয় এত লোকের সমাবেশ দেখে। এই এলাকার সব মানুষ এক নীরব শপথের কাঠিন্য নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে পড়েছে বাঁধে।

বদন ডাক্তার জগন্নাথপুরে গিয়েছিল সেখানের আটচালায় মিটিং করতে। গেণ্টু দাসই তাকে আশ্বাস দিয়েছে এই সব ব্যাপারে গেণ্টু দাসের নাম জাহির করবে এবার পঞ্চায়েত-এর ভোটে বদনকেই দাঁড় করাবে সে। আর বদন ভোটে জিতলে তারপর পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টই হয়ে যাবে। কারণ ওই পদটা গেণ্টু দাসের কৃপাধন্য লোক ছাড়া এতাবৎ কেউ হয়নি।

বদনও স্বপ্ন দেখে, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট থেকে সেই-ই কালক্রমে কেতুলালকে বসিয়ে এই চাকলার নেতার আসনে কায়েম হয়ে যাবে।

বদন ডাক্তার তাই ওর নড়বড়ে ঘোড়ায় চড়ে এখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। সঙ্গে অবশ্য ডাক্তারী ব্যাগটা থাকে। দু'-এক পুরিয়া ওষুধও দেয়।

ওখানেই খবরটা শুনে অবাক হয়। গ্রামে মরদ ব্যাটাছেলে নেই। বুড়োদের কে বলে—ছেলেগুলান তো বাঁধের কাজে গেছে গো। বাঁধ বাঁধছে। তা নাড়িটা একটুন দেখ দিকি! ক'দিন থেকে জ্বর জ্বর করছে, ওই মাইদো সেদ্ধ কি হজম হয় বাবু, তাই গিলেছি। শরীরের আর দোষ কি?

...ওর নাড়ি দেখার কথা বদনের মাথায় উঠেছে। গেণ্টু দাসই বলেছিল বাঁধ বাঁধার সরকারী ঠিকে আসছে, সেটা বদনকেই পাইয়ে দেবে। বদনও হিসাব কষে রেখেছে তার থেকে বেশ কিছু টাকাই সরাতে পারবে।

আজ সেই বাঁধ-এর কাজ সুরু হয়েছে, অথচ গেণ্টুবাবু তাকে একথাটা জানায় নি। আর কাউকে দিয়ে দিয়েছে। বদন ডাক্তার তাই এতবড় লোকসানের কথা ভেবে ঘাবড়ে গেছে। কোন রকমে বুড়োর নাড়িটা ছুঁয়ে গোটাদুয়েক পুরিয়া দিয়ে বদন ওই রোদেই ফিরছে বাঁধের দিকে। রোদও চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। ভিজে বানে ডোবা মাঠের জলকাদায় টান ধরেছে, বাতাসে ওঠে পচা ধানঘাসের চিমসে গন্ধ। কাক-চিলগুলো দু'-একটা পচা ইঁদুর-সাপের গলাপচা দেহগুলো ঠোকরাচ্ছে। বদন ডাক্তারের নড়বড়ে ঘোড়াটা চলেছে ওকে নিয়ে ওই বিবর্ণ মাঠের বুক দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে।

সামনে দেখা যায় কাজলা নদীর বাঁধে ওই লোকদের। বাঁধ বাঁধার কাজ পুরোদমেই চলেছে। ওই রোদের মধ্যে লোকগুলো ওদিকের জমি থেকে কয়েকশো কোদাল দিয়ে রাশি রাশি মাটি তুলে বাঁধে ফেলছে। বাঁশ-মরাগাছের গুঁড়ি—ডালপালার খুঁটো পুতে সেই বাঁধের আশপাশ পোক্ত করে ওরা মাটি ফেলছে।

...বদন ডাক্তারকে আজ ওরা দেখেও দেখে না। অবিনাশ-যতিলাল-নকড়ি-রামু মোড়ল-আইনুদ্দি-গোকুল সর্দার আশপাশের গ্রাম থেকে ওরা সবাই এসে হাত লাগিয়েছে বাঁধে।

...গেণ্টু দাস কথাটা শুনে অবাক হয়।

বদন ডাক্তারের আগেই খবর এনেছে নিতাই-যতীনের দল। এই বানের মরশুমে তারাও বেশ কিছু রোজকার করেছে, আর বাঁধের কাজ সুরু হলে বেশ কিছু দিন ধরে তারা কুলিমেট হতো। টেস্ট রিলিফের কাজে তারা প্রায়ই এসব কাজ পায় গেণ্টুবাবু, কেতুবাবুদের দয়ায়। পঞ্চাশটা কুলির নাম যোগাড় করে এ-হাত ও-হাতে টিপছাপ দিইয়ে তারা বিশজন কুলির টাকা দিয়ে বাকী ভূতুড়ে কুলিদের রোজটা নিজেরাই গায়েব করে এসেছে।

বাঁধের বড় কাজেও এবার কিছু পেতো তারা। কিন্তু হঠাৎ বাঁধে সেরগোল করে কাজ সুরু হতে দেখে ওরাও খবরটা এনেছে গেণ্টু দাসের কাছে। যতীন বলে :

—আজ্ঞে ধুরমার কাজ হচ্ছে দেখলাম বঁধে। তাহলে বাঁধ বাঁধার ঠিকা কে পেল কত্তাবাবু?

গেণ্টু দাস অবাক হয়—বাঁধ বাঁধছে! কারা?

বদন ডাক্তারই গলদঘর্ম হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এবার বিশদভাবে জানায়—ওই দশ-বিশখানা গাঁয়ের মানুষকেই দেখলাম।

গেণ্টু দাস জানে তারা যদি নিজেরাই বাঁধের কাজে হাত লাগায়, সরকার ওদেরই খরচা দেবে। আর গেণ্টু দাস যে দয়া করে বাঁধ বাঁধিয়ে দিয়েছে সরকারকে চাপ দিয়ে এই কথাটাও কেউ বলবে না। ওই সর্বহারা মানুষগুলোর মনে নিজেদের জন্য কিছু করার মত সাহস মনোবল ফিরে আসবে। সেটা গেণ্টু দাস-কেতুলালের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলেই কঠিন আঘাত হানবে। তাই গেণ্টু দাস কথাটা শুনে রেগে উঠেছে।

তাছাড়া জানে গেণ্টু দাস—ওই বাঁধের আশপাশের চটান জমিগুলো তারই। অবশ্য রেকর্ড পরচায় এককালে ছিল সরকারী খাসমহলের চরভূমি, তারপর গেণ্টু দাসই ওই বিস্তীর্ণ এলাকা জবরদখল করে বিরাট আখের ক্ষেত তৈরী করেছে। নিজের ট্রাকটার নামিয়ে চাষ দেয়—আর জলের যোগান রয়েছে কাজলা নদীতে বারো-মাসই। পাম্প দিয়ে তুলে ওখানে বিরাট ফার্ম করেছে। আর বাদবাকী ডাঙ্গাটা পড়ে আছে এখনও, ওখানেই ফ্যাক্টরী বসাবার জন্য সরকারী টাকাও আসবে।

আর গেণ্টু দাস আজ চমকে উঠেছে ওই হতভাগা মানুষগুলোর ঔদ্ধত্যে। ওরা তাকে অগ্রাহ্য করেই নিজেরা এ কাজে হাত দিয়েছে।

কেতুলালও কলকাতায় গিয়েছিল, বাঁধের ব্যাপারেও কথা বলে এসেছে, আর ফ্যাক্টরীর জন্যই গেণ্টু দাসের তাগাদায় গিয়েছিল সেখানে।

কেতুলালকে ফিরতে দেখে গেণ্টু দাস বলে :

—খবরটা শুনেছো?

কেতুলালও শুনেছে কথাটা। বদন ডাক্তার বলে ওঠে :

—ওই অবিনাশ-যতিলাল-আইনুদ্দি-রামু মোড়লদেরই দেখলাম।

কেতুলাল কিছু বলার আগে গেণ্টু দাস বলে—পিছনের নেতাদেরও খবর পাওনি বদন? ওই প্রভাতবাবুকে দেখো নি? উনিই তো নাটের গুরু।

প্রভাতবাবুকেও দেখেছে বদন। কিন্তু তার আগেই গেণ্টু দাসের কানে সব খবর এসেছে। গেণ্টু দাস বলে—ওরা বাঁধের মাটি নিচ্ছে আমাদের জমি থেকে। একবার দেখা দরকার।

নিতাই-যতীনের দলও তৈরী হয়েছে। গেণ্টু দাসও গেছে ওখানে সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখতে।

প্রভাতবাবুও ওদের খবরটা জানে।

আর তাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রভাতবাবুই সমর্থন করে। তাঁর কথামতই বাঁধটাকে ওরা গড়ে তুলছে। বাঁকের মাথায় নদীর স্রোত এসে ঘা মারে, তাই ওটাকে পোক্ত করা দরকার আর নদীর কোলেও কিছুটা মাটি পাথর দিয়ে ওরা একটা বাধার সৃষ্টি করতে চায়—যেখানে জলটা ঘা খেয়ে এদিকে পুরো চাপ না দিয়ে ওই পাশের বাঁধে হানা দেবে।

...পুরোদমে কাজ চলেছে।

হঠাৎ ওরা গেণ্ডু দাস-কেতুবাবুকে দলবল নিয়ে আসতে দেখে চাইল, অনেকে একটু ঘাবড়ে যায়। কে জানে—ওদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেছে কিনা।

গেণ্ডু দাস অবাক হয়, রামু মোড়ল-আইনুদ্দিকে দেখে বলে—এসব কি করছো রামু? সরকারী বাঁধ নিজেরাই খেয়াল-খুশীমত একে গড়বে-ভাঙবে একি কথা?

রামু মোড়ল ছোটখাটো জোতদার। সে বলে ওঠে—কতোদিন হল বাঁধ আর বাঁধছে না কেউ। ভরা বর্ষা সামনে, আবার ডুববো—তাই নিজেরাই জল আটকাবার ব্যবস্থা করছি বাবু।

আইনুদ্দি বলে ওঠে—নিজেদের জান বাঁচাবার হক, তো আছে গেণ্ডুবাবু? সরকারের বাঁধ সরকার বাঁধবেন, আমরাও হাত লাগিয়েছি, দোষ কোথায়? আর সদরেও খবর পাঠিয়েছি। প্রভাতবাবুই গেছেন।

গেণ্ডু দাস চুপ করে শুনছে কথাটা। এই কর্মকাণ্ডের মূলে যে প্রভাতই রয়েছে এটাও জেনেছে সে। কেতুলাল ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ঃ

—একটুও সবুর সইল না তোমাদের? ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো বোঝো করো।

অবিনাশও এদিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। গেণ্ডু দাস বলে ওঠে—তবে বাপু ওই জমি থেকে মাটি নেবে না। অন্য জায়গার মাটি নিয়ে বাঁধে দাও।

অবাক হয় তারা। রামু মোড়ল বলে ঃ

—মাটি তো ওখানেই রয়েছে কাছাকাছি।

ওই জমির মাটি না হলে বাঁধও হবে না। গেণ্ডু দাস তা জানে, তাই এবার একপর্দা গলা তুলে বলে সে ঃ

—ওই জমি আমার রামু, তোমরাও জানো। ওখানে আমি কারখানা বসাবার প্ল্যান স্যাংশন করিয়েছি। ও জমির মাটি নিলে আমার সমূহ ক্ষতি হবে। তাই নোটিশ দিয়ে গেলাম। ওখানে মাটি তুলবে না।

এতগুলো মানুষের উদ্যমে ভাটা এসেছে। আইনের কথা বলেছে গেণ্ডু দাস। প্রভাতবাবুও নেই। এদের সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, আর ওই মারমুখী নদীর সব বন্যা এবার তাদের গ্রাম জমির উপর দিয়ে কায়েমীভাবে বইবে।

গোকুল সর্দার ব্যাকুলভাবে বলে ঃ

—তাহলে কি হবে বড়বাবু? বাঁধ হবে না?

গেণ্ডু দাস দেখেছে ওই মানুষগুলোর মুখে বিবর্ণতা, হতাশার ছায়া। মনে মনে খুশী হয়েছে গেণ্ডু দাস। সে নিরীহ ভালোমানুষের মত বলে ঃ

—সেটা সরকার বুঝবেন। চলো হে কেতু।

ওরা চরম বাক্য শুনিয়ে এবার চলে যাচ্ছে হঠাৎ অবিনাশ এগিয়ে এসে এবার বলে ওঠে—জায়গাটা আপনার নয় বড়বাবু, ওটা হাল কড়চাতেও খাসমহলের জমি বলে লেখা আছে।

গেণ্ডু দাস চমকে ওঠে অবিনাশের সতেজ কণ্ঠস্বরে। সমবেত হাজারো মানুষও ওই কথাতে একটা আশ্বাস ফিরে পেয়েছে। গেণ্ডু দাস জানায়—আমার দখলের জমি—

অবিনাশ আজ নোতুন একটি মানুষে পরিণত হয়েছে। জীবনের অনেক কষ্ট-ত্যাগ-আঘাত, ওদের লাঞ্ছনা তাকে এই কঠিন জীবনের একটি অধ্যায়কে সুপরিচিত করে তুলেছে। অবিনাশ ওদের ব্যবহারটা ভোলে নি—সেদিন ওরা তাকে অন্যায়ভাবে মেরেছিল।

কিন্তু বসন্তকেও তারা সেখানে থাকতে দেয় নি। বানের জল কমার মুখেই তাদের সবাইকে সেই আশ্রয়শিবির থেকে বিদায় করেছে। আর টিয়ার মন বিষিয়ে তুলেছে, অবিনাশের বুকের জ্বালাই বেড়েছে সেই শূন্যতার বেদনায়। ওরা সবারই সব কিছু কেড়ে নিতে চায়। আজ এত গ্রামের লোককে নিশ্চিত সর্বনাশের মুখে নদীর বন্যার সামনে ফেলে রেখে গেণ্ডু দাসের দল নিজেদের জবরদখল কায়েম রাখতে চায়। অবিনাশ বলে ওঠে ঃ

—জোর করে দখলস্বত্ব জানাতে চান?

গেণ্ডু দাস ওর দিকে চাইল। দুপুরের রোদে অবিনাশ-এর মাটি মাখা বলিষ্ঠ দেহটা ঘামছে, গেণ্ডু দাসের মাথায় রোদ আড়াল দেবার জন্য কে ছাতা ধরে রেখেছে। গেণ্ডু দাস রেগে উঠেছে। এত লোকের সামনে অবিনাশ আর ওই কিছু লোক গেণ্ডু দাসের প্রতিষ্ঠাকেই চরম আঘাত হানতে চায় গেণ্ডু দাস বলে ওঠে ঃ

—তাহলে জোর করেই দখল করতে চাস তোরা ওই জমি?

রামু মোড়লও এবার পথ পেয়েছে। আজ দশ-বিশখানা গ্রামের মানুষ বাঁচতে চায়, তার জন্য ওই জবরদখলের হাতটাকেও সরাতে চায় তারা। রামু বলে ওঠে—নিজেদের কাজে তো লাগাই নি বাবু, সরকারের বাঁধে মাটি পড়বে সরকারী জায়গা থেকেই।

—রামু! গেণ্ডু দাস গর্জে ওঠে।

অবিনাশও গলা তুলে বলে—ধমকাবেন না বড়বাবু। ও জমি থেকেই মাটি আমরা নোব। জোর করেই নিয়ে বাঁধ বাঁধবো।

যতীন লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে, নিতাইও তৈরী ছিল। বড়বাবুর পোষা লোক তারা, তাদের সামনে বড়বাবুর এত বড় অপমানকে ওরা সহ্য করবে না। যতীন গর্জে ওঠে হাতের লাঠি তুলে ঃ

—তোর মাথাই ছাতু করবো আবা।

নিতাইও হাতের ছড়িটা থেকে ধারালো পুস্তি বের করেছে। তার আগেই অবিনাশও লাফ দিয়ে ওপাশ থেকে কার হাতের টাঙ্গিটা তুলে নিয়ে গর্জাচ্ছে—এক পা এগোলে তোদের দুটোকেই খতম করে দোব।

চাপা আক্রোশ গুমরে ছিল ওই মানুষগুলোর মনে, ওরা এতদিন নানা কিছু সহ্য করেছে। দেখেছে তাদের দুঃখ-অভাবকে নিয়ে ওরা এতকাল নির্লজ্জ বেসাতিই করেছে আর অত্যাচারই করে এসেছে তাদের সব কিছু লুঠে নিয়ে। আজও এসেছে তাদের সর্বনাশকে কায়েম করতে। অবিনাশ-রামু মোড়ল ও আইনুদ্দি চাচাকে আজ তাদের অন্যায় লোভের প্রতিবাদ করতে দেখে শেষ করে দিতে চায়।

কয়েকশো মানুষের নীরব কণ্ঠস্বর আজ গর্জে ওঠে। ওদের কাদামাটি মাখা শীর্ণ হাতের কোদাল-টাঙ্গিগুলো শূন্যে তুলে ওরা গর্জন করে—এক ব্যাটাকেও ছেড়ে দিবি না।

...গেণ্ডু দাস-কেতুলাল এমনি একটা কিছু ঘটবে ভাবতে পারে নি। নিতাই-যতীনের ওই প্রতিবাদ-এর কাঠিন্যকে যে ওরা এমনি করে নস্যাৎ করে জ্বলে উঠবে পুঞ্জীভূত আগুনের মত তা ভাবে নি। ওই বিশাল জনতা আজ গর্জে ওঠে।

...তাদের প্রতিরোধের সামনে এরা বিচলিত হয়ে পড়েছে।

গেণ্ডু দাস চতুর ব্যক্তি। সে উল্টে নিতাই-এর গালে একটা চড় মেরে শাসায়—তোকে কে আসতে বলেছে এখানে!

যতীন - তখনও গর্জাচ্ছে।...হয়তো দু-চারটে আঘাতেই ছিটকে পড়বে সে। আর একবার ওদের মারামারির নেশা এসে গেলে, গেণ্ডু দাস-কেতুলালও রেহাই পাবে না।

...এমন সময় দেখা যায় নদীর ওদিকে দুটো জিপ এসে থেমেছে। প্রভাতবাবুর সঙ্গে এসে হাজির হয়েছেন সেচ দপ্তরের পদস্থ কর্মচারী, বাঁধের ব্যাপারেও তাঁরা অন্য কাকে নিয়ে এসেছেন। বাইরের সাহেবদের সঙ্গে প্রভাতবাবুকে দেখে এদিকের জনতা একটু শান্ত হয়।

যতীন-নিতাইও এমনি সুযোগ বুঝে এবার কেটে পড়েছে। কেতুবাবু হঠাৎ

বলিয়ে চই সানরাইজের মশলা

ভালো খাবার মানেই ভালো রান্না। সুস্বাদু রান্না করতে হলেই চাই ভালো মশলা। 'সানরাইজ'ই একমাত্র দিতে পারে সবরকম গুঁড়ো মশলা যা দিয়ে রান্না করলেই আপনার রান্না হয়ে উঠবে অসাধারণ। শুধু তাই নয় 'সানরাইজ' আপনার পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ সেজন্য সবসময় 'সানরাইজ' ব্যবহার করুন।

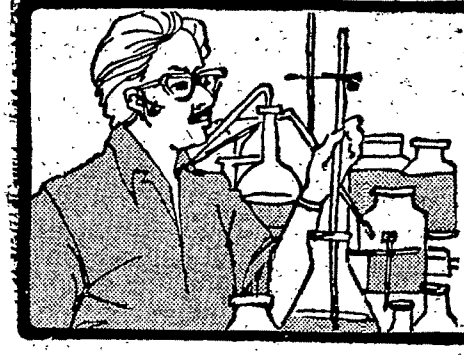

মশলা তৈরীর আগে এবং পরে নিজের ল্যাবরেটরিতে সর্ব্বদা মান পরীক্ষা চলছে। সম্পূর্ণভাবে নির্ভেজাল মশলাই সানরাইজ তৈরী করে এবং আপনাদের ব্যবহারের জন্য ডিলার মারফৎ বিক্রী করে।

কি ভাবে ব্যবহার করবেন ঃ-
প্রথমে একটি পাত্রে প্রয়োজনমত গুঁড়ো মশলা ঠাণ্ডা বা গরম জলের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশিয়ে দশ মিনিট থাকতে দিন। রান্নার সময় ঐ মিশ্রিত মশলা ব্যবহার করুন। ঠিক বাটা মশলার স্বাদই পাবেন। গুঁড়ো মশলা সোজাসুজি কখনও তপ্ত তেলে ব্যবহার করবেন না।

সানরাইজের তৈরী পাবেন ঃ
হলুদ, লঙ্কা, জিরা, ধনে, গোলমরিচ, গরম মশলা, আমচুর। এ ছাড়া পাবেন পোলাও বা বিরিয়ানির জন্য ফ্রায়েড রাইস পাউডার, শর্ষের রান্নার জন্য মাস্টার্ড কম্পাউণ্ড, ডাল কারি পাউডার, কারি পাউডার এবং লাশোফ (এতে তেল, ঘি বা কোন মশলাই লাগে না)

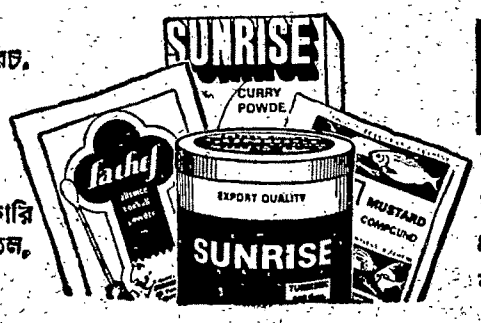

সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬, পাথুরীয়াঘাট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

কর্মব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে—এ্যাই। আরে থামো তোমরা। এসবের মীমাংসা একটা আলোচনার মধ্যেই হবে। কেন মাথা গরম করছো।

...সাহেবরা নদীর খেয়া পার হয়ে ভাঙ্গা বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছেন। গেণ্টু দাস গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ হঠাৎ সে দেখছে এতদিন ধরে যে ধারণা করেছিল, যে হিসাবে চলেছিল, সেই হিসাবটা কোথায় সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। ওই ক্ষুব্ধ জনতাকে সে বশ করতে পারে নি। ওদের মনের অগ্নিজ্বালাকে সে আজ প্রত্যক্ষ করেছে। হয়তো তাকে চরম আঘাতই করতো ওই লোকগুলো।

গেণ্টু দাস মনের জ্বালাটা চেপে রয়েছে। এ সময় তার মাথা গরম করা সাজে না। গেণ্টু দাস জানে কখন কিভাবে চরম আঘাত হানতে হয়। তাই এখনকার মত সে এত বড় ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিয়ে বলে—রাম্টু মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো। অবিনাশ জোয়ান মরদ, তার রক্ত গরম হতে পারে। কিন্তু আইনুদ্দি, তুমি তো বুড়ো হয়েছো, এখনও মাথা গরম করবে?

প্রভাতবাবুও এসে পড়েছে। গেণ্টু দাস বলে ঃ

—তাহলে ভালোই করেছো মাস্টার ও'দের এনে। কাজটা সুরু করা দরকার প্ল্যানমাফিক।

কেতুলাল স্থানীয় নেতা, তাই ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকেরা ওর সঙ্গেই কথা বলে বাঁধের এদিক-ওদিকে ঘুরে ম্যাপ দেখে একটা প্ল্যান ছকছেন।

আবার বাঁধের কাজ সুরু হয়েছে পুরোদমে। আইনুদ্দিও অবিনাশকে থামিয়েছে। অবিনাশ বলে ঃ

—মারামারি করতে তো চাই নি চাচা। ওরাই বলে ও-জমি থেকে মাটি দেব না। বাঁধ করতে না দেবার তালেই ছিল ওরা। তাই রুখে দাঁড়াতেই ওই ব্যাটারাই কাঁচা বের করলো।

আইনুদ্দি বলে—ছাড়ান দে ওসব কথা। এখন তো চুপচাপ করে রাজী হয়েছে।

অবিনাশ গর্জায়—রাজী হয়েছে? ওদের ঘাড়কে রাজী করাতাম চাচা।

অবিনাশ আবার মাথায় পগ্গ বেঁধে মজুরদের মাঝে চীৎকার করছে—মাটি ফেল! জোরসে মরদ। এ্যাই ফটিক মাংগনার কাজ এ করছিস না, পুরো রোজের কাজ। হাত চালা।

সরকার থেকেই এবার কাজের ভার নিয়েছে। কোন ঠিকাদারের ব্যাপারও নেই। সময় অভাবে কাজ সরকার পক্ষ থেকেই করানো হচ্ছে। আর তরুণ ইঞ্জিনীয়ার রমেশবাবুও খুশী হয়েছেন এদের কাজের পরিমাণ দেখে।

অবিনাশ বলে—আপনি শুধু দেখে যান স্যার, ঠিক ঠিক কাজ হচ্ছে কিনা। মাটি চুরির ব্যাপার এখানে হবেক নাই। ওরা এতেই খুশী। দিবে নগদ টাকা আর চালের হিসানে মজুরী নিতে হচ্ছে। দেখতে দেখতে নদীর সেই উদ্যত হাঁ করা হিংস্র হানামুখকে ওরা পাহাড় প্রমাণ করে বুজিয়ে আনছে। যাতে বন্যার হিংস্র হানা আর তাদের গৃহহানা, সর্বহারা না করতে পারে।

অবিনাশ ক'দিন ধরে ওই বাঁধেই পড়ে আছে। বর্ষার তোড়জোড় সুরু হয়েছে। বীজধানও এসেছে ব্লক অফিস থেকে। তারই ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা আছে।

রাম্টু বোড়ল-যতিলাল এরাই বলে ঃ।

—তুই এগিয়ে আয় অবিনাশ। বাঁধ তো সারা হল। এবার অন্যদিকে নজর দিতে হবে।

...ক'টা দিন ঝড়ের মত কেটে গেছে। কিন্তু গভীরভাবে দাগটা বসেছে গেণ্টু দাসের মনে। কেতুলালও দেখেছে এতকাল সব কাজে তাদের হাতটাই এগিয়ে গেছে সর্বত্র। এবার যেন তার রূপ বদলেছে। কেতুলালও দেখেছে সেটা।

বাঁধ বাঁধার এতবড় ব্যাপারটা নিয়ে একটা হিসাব করে রেখেছিল গেণ্টু দাস, সেই হিসাব পুরো গোলমাল হয়ে গেছে। সরকার থেকেই ওই কয়েক হাজার টাকার কাজ করানো হয়েছে, কাজটা করেছে ওই অবিনাশ-রাম্টু মোড়লের দল। আর তারাও যে এত বড় কাজ অনায়াসেই করতে পারে সেইটাই দেখিয়েছে। তাজলা নদীর বান এখন আর নেই, ওদিকে বেশ কিছু জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে গেণ্টু দাসের। বরং এবার গ্রামসভার সকলে দাবী জানিয়েছে ওই সমস্ত চরটার। দুশো বিঘের দখল এবার যেন গেণ্টু দাসের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চাষের বীজধান-সার-এর বিলি-ব্যবস্থার ভার পড়ে নি তাদের উপর। সেটার এখন ভার পড়েছে বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরদের উপর। তারাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের বিলি করছে। অপচয়ও হয় নি।

...বদন ডাক্তারও হতাশ হয়েছে। এবার তার সামান্য ডাক্তারী ব্যবসাতেও মন্দা পড়েছে। সেদিন নন্দীপুরের হাটে ওই গোকুল সর্দারই বলে—আর চাষাচাষির করে কি হবে ডাক্তার, ডাক্তারীই করো। এবার হাওয়া দেখছো না? ভোট এলে তখন সব উলটে না যায়।

বদন ডাক্তার অবশ্য সাবধানী ব্যক্তি। ও বলে ওঠে ঃ

—আমার কি বাবা। তোদের বিপদের সময় একটু দেখভাল করলাম, ব্যস, চুকে গেল ল্যাঠা। তা তোর ছেলের জ্বর কমেছে?

গোকুল সর্দার বলে—রামপুরের ডাক্তারখানাতেই দেখাচ্ছি বাবু।

বদন ডাক্তার জবাব দিল না। তবে মনে হয় এই জবাবে সে খুশী হয়নি। বদন ডাক্তার ও খবরগুলো গেণ্টু দাসের কানে তোলে—ওরা এখন সাবালক হয়ে গেছে বড়বাবু।

গেণ্টু দাস কথা বলে না। ভাবছে সে, এবার তাকে দাবার ঘুঁটিগুলো একটু হিসাব করেই চালতে হবে। প্রভাতবাবু-অবিনাশরাই আজ তার প্রতিপক্ষ। ক'টা মানুষই ওই হাজারো মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, ওদের মনের অতলের কম্পৃহা, একটা সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলছে।

কোথায় কিভাবে আঘাত হানতে হবে সেটাই ভাবছে গেণ্টু দাস।

কেতুলাল বলে—সদরের রিলিফ অফিসারের স্বার্থেই এসব হচ্ছে গেণ্টুবাবু। লোকটা কাজের নাম করে যতো অকাজ করছে। কেতুলালের কথায় গেণ্টু দাস কি ভাবছে। হঠাৎ বলে ওঠে ঃ

—ওকেই বদলি করা যায় না? মানে—একটা কিছু খাড়া করে। কেতুলালও ভাবছে কথাটা। নিতাই-যতীন-বদন ডাক্তারের দল আছে, আছে অধরবাবুর মত স্বার্থপর মধ্যবিত্ত মনের দুর্বলচেতা কিছু লোক। এরাই গেণ্টু দাসদের দাবার ঘুঁটি।

কেতুলাল বলে—চেষ্টা করতে হবে।

গেণ্টু দাস জানায়—তাই করো।... ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গেলে বিপদ ঘটে, সেটা জানানো দরকার।

গেণ্টু দাসের রাগটা বেড়ে গেছে। দেখেছে এত বিপদেও এ চাকলার কোন মানুষ তার কাছে সাহায্যের জন্য আসে নি।

পাশাপাশি বাসা দুটো। মাঝখানে কয়েকটা আম-কাঁঠাল গাছের ভিড়। টিয়া দিদিমণির বাসা থেকেই দেখেছে প্রভাতবাবুর সংসারের ছবিটাকে, সবিতাও চেনে প্রভাতকে। তরুণ ছেলেটি দিনরাত নানা কাজে ব্যস্ত। সদরে দৌড়চ্ছে, তারই চেষ্টায় ওই বাঁধ-এর কাজ হয়েছে, গ্রামের মানুষ বীজধান-সার, কিছু অর্থ সাহায্য, কৃষিঋণ পেয়েছে—যাতে মহাজনের কাছে তাদের জমি-জায়গা বিকতে না হয়।

সবিতা বলে—এত খাটুনি খেটে লাভ কি প্রভাতবাবু?

—লাভ। প্রভাত এর জবাব জানে না। বলে সে ঃ

—ওই মানুষগুলোর মাঝে অনেক প্রাণশক্তি, অনেক সৎবৃত্তি রয়ে গেছে।

ওদের কোন কাজে যদি লাগতে পারি, তাই এগিয়ে যাই।

সবিতার বারান্দায় বোগেনভিলা গাছের রঙিন পাতাগুলো বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ছুটির দিন—তাই চা খাবার অবসর মেলে। টিয়া চা এনেছে। প্রভাত ওর দিকে চাইল—তুমি?

সবিতা বলে—এখানে আমার কাছেই রয়েছে। কাজের মেয়ে।

টিয়া বলে ওঠে—দিনরাত ওদের জন্য খেটে কি পান?

প্রভাত জবাব দিল না। হাসল মাত্র। হঠাৎ মনে পড়ে যায় কোন গ্রামের কথা। প্রভাত বলে—আজ উঠি। বেরুতে হবে।

ঝড়ের মত বের হয়ে যায় সাইকেল দাবড়ে ওই বৃষ্টি-রোদের মধ্যেই।

টিয়া বলে—সারা এলাকার মানুষ ওকে ভালবাসে দিদি।

সবিতা বলে—হাই। নিজের গতরপাত করছে। খাবার ঠিক নেই—ফেরার ঠিক নেই। কি যেন নেশায় ঘুরছে ওরা।

টিয়া তবু দেখেছে ওই মানুষটাকে। এই অঞ্চলের গরীবের বন্ধু, ওই মানুষগুলোর জন্য বুকভরা দরদ ওর।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। দুটোর দিন খাওয়া-দাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রা দেওয়া সবিতার অভ্যাস। টিয়ার খেতে দেরী হয়ে গেছে, কাচাকাচির কাজ রয়েছে।

ওসব চুকিয়ে স্নান করে এসেছে, হঠাৎ দেখে ওদিকের বন্ধ বাসায় ফিরে এসেছে প্রভাত। সাইকেলটা ঠেসে নিয়ে ঘরে ঢুকলো গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায়।

প্রভাতের এমন প্রায়ই হয়। নাইবার-খাবার সময় নেই, কোথায় কোন্ গ্রামে আটকে গেছলো। তাই দুপুরে ঘরে কিছু থাকলে তাই দিয়েই লাঞ্চ সারতে হয়, নইলে কুঁজোর জল খেয়েই কাটিয়ে দেয়।

আজ বোধহয় প্রভাতের তেমনিভাবেই দিন কাটাতে হবে। স্নান সেরে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়েছে, এমন সময় টিয়াকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—তুমি!

টিয়ার হাতে টিফিন-কেরিয়ারে ভাত-ডাল-তরকারী। ওগুলো নামিয়ে দিয়ে টিয়া বলে—প্রায়ই তো দেখি জল খেয়ে, না হয় চিড়ে-মুড়ি চিবিয়ে দিন-রাত কাটান, বিদেশে শরীর খারাপ হলে কে দেখবে?

প্রভাত অবাক হয়েছে—এসব কেন?

টিয়া একটা প্লেটে খাবারটা সাজিয়ে দিয়ে বলে—দিয়ে গেলাম। খেয়ে নিন।

টিয়া দাঁড়িয়ে নি। বের হয়ে এসেছে।

ছায়াঘন বাগানে দুপুরের মেঘভাঙা রোদ কি ঔজ্জ্বল্য এনেছে। টিয়ার মনে পড়ে অবিনাশের কথা। ওরা যেন সকলেই এমনিই। একই সুরে বাঁধা...এমনি করে তিলে তিলে ওরা নিজেদের শেষ করে। ওদের আপনজন কেউ নেই—তাদের কথাও ভাববার প্রয়োজন নেই। এমন কি নিজেদের কথাও।

খবরটা তবু প্রভাতের মুখেই শোনে টিয়া।

অবিনাশ এখন ওই এলাকার পরিচিত নাম। সবিতাও দেখেছে লোকটাকে। প্রভাতবাবু মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় এসে হাজির হয়। গ্রামের বাইরে এই আমবাগানের এলাকাটায় সন্ধ্যার পর নির্জনতা নামে। ছোট্ট বাড়ি ক'খানার বাসিন্দাদের নিয়ে এই ছোট ছায়া অন্ধকার মত জগৎটা যেন নিজস্ব রীতিতে চলে। ওদিকে রোডিং-এর আলোগুলো জ্বলে ওঠে, ছেলে-মেয়েদের পড়ার শব্দ থেমে আসে। রাত্রি ভরে ওঠে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দে।

সবিতাই বলে প্রভাতকে—স্কুলেও তোমার সম্বন্ধে নাকি কথা উঠছে। তুমি নাকি ঠিকমত ক্লাশ নাও না—স্কুলেও যাও না মাঝে মাঝে।

প্রভাতও শুনেছে এসব কথা। জানে সে এসব কথা ওঠার কারণগুলো। আজ সে ওই সাধারণ মানুষদের হয়ে কাজ করেছে। তাদের গেণ্ডু দাসের শক্ত ধারালো থাবায় শিকার হতে দিতে চায়নি। সরকারী সাহায্য—ঋণ-অনুদান সব কিছুর সদ্ব্যবহার করেছে। তাই গেণ্ডু দাস-কেতুলালের দল তাদের শিকার হাতছাড়া হতে দেখে গর্জে উঠেছে।

প্রভাত বলে—ছুটি যা পাওনা তার থেকেই নিইছি সবিতাদি, আর তুমি তো জানো, আমার চেয়ে অনেক মাস্টার মশাইরা ক্লাশ বেশী কামাই করেন।

সবিতা ওই আপনভোলা ছেলেটিকে ছোট ভাই-এর মতই দেখে। তাই ওকে বলে—বিদেশে এসে ওদের সঙ্গে শত্রুতা না-ই বা করলে।

প্রভাত জবাব দেয় না।

টিয়া চা দিতে এসেছিল। ও বলে ওঠে—ওদের বীরত্বটা একটু বেশী দিদি।

তার জন্য আর যে কেউ যতই দুঃখ-কষ্ট পাক, ভাবুক ওদের কিছুই আসে যায় না।

প্রভাত শুনছে ওর কথাগুলো। টিয়ার মনের অতলের জ্বালাটার খবর জানে সবিতাও। মেয়েটা যেন মুখ বুজে অনেক কিছুই সহ্য করেছে। করছেও। চা নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে টিয়া। সবিতা বলে ওঠে:

—অবিনাশও সত্যি বিচিত্র। লোকটা একবার খবরও নিতে এল না—এত কাজ ওর? একবার ডেকে আনতে পারো তাকে প্রভাত?

প্রভাত জানে ব্যাপারটা। কিন্তু টিয়াকে সে চিনেছে। তাই বলে:

—আনবো। কিন্তু আমার যে ডান হাত অচল হয়ে যাবে ও বাড়িতে গেলে।

সবিতা বলে—তাই বলে এমনি জ্বালা নিয়ে মরবে মেয়েটা? ওর কি দোষ?

প্রভাত এর জবাব দিতে পারে না। টিয়ার জন্য দুঃখই বোধ করে। এ নিয়ে অবিনাশকে সেই-ই কথা বলবে।

খাওয়ার ব্যাপারটাও মাঝে মাঝে প্রভাতের এখানেই সারতে হয়। টিয়াও সেটা জানে। চাই রাত্রে রুটি কিছু বেশীই করে। আজও করেছে। খাবার জায়গা করে সে ডাক দেয়:

—খেয়ে নেবেন চলুন।

প্রভাত উঠছে। টিয়াই বলে—আর রাতে আপনার বাসায় খাবার বইতে পারবো না। এখানেই খেয়ে নিন।

সবিতা হেসে ওঠে। প্রভাত অপ্রস্তুতের মত বলে—রাতে মুড়ি-গুড়—দুধ রয়েছে।

টিয়া জানায়—দুধ বেড়ালে খেয়ে গেছে, শুধু মুড়ি চিবিয়ে কেন থাকবেন? চলুন।

...টিয়ার কাছে এখানের জীবনটাও কেমন একঘেয়ে বোধহয়। কানে আসে সব কথাই। নদীর বাঁধে সেবার এরা অবিনাশকে মারতে গিয়েছিল; তাও শুনেছে। দেখেছে ওদের সমবেত চেষ্টায় আবার মরা মাঠে এসেছে সবুজ ধানের ইশারা। সেই বুভুক্ষু মানুষগুলো আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। অবিনাশ সেই খজু সোজা মানুষগুলোর একজন।

আর টিয়া সেই কঠোর জীবন থেকে নিজে সরে এসেছে, তার মনগড়া কিছু যুক্তি দিয়ে, সে এই স্বার্থপরতাকে ঢাকার চেষ্টা করেছে। আজ মনে হয় ওই মানুষটার উপর অবিচারই করেছে টিয়া।

গ্রামের বাইরে আমবাগানে হাট বসে। সপ্তাহে দু'দিন হাট। আমবাগানের ফাঁকায় চালাঘরে কিছু কাপড়-জামা, মনোহারীর মাল নিয়ে ফিরিওয়ালারা আসে, আর কিছু তরিতরকারীও আসে।

বর্ষার সময়—চাষীদের অনেকেই মাঠে ব্যস্ত। তাই তরিতরকারীর আমদানী কম। তবু টিয়াকে আসতে হয় হাটে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। জিনিসপত্র নিয়ে ফিরছে টিয়া—এক পশলা বৃষ্টিও এসেছে, হঠাৎ কাঁঠালগাছের নীচে যতীনকে দেখে চাইল। হাটের দিন ওদের ব্যবসাটাও বেশ ভালোই চলে। নিতাই-যতীনদের চোরা ভাঁটির মদও প্রচুর বিক্রি হয়। আর নিজেরাও বেচা গিলে তৈরী হয় শেষকালে।

যতীন টিয়াকে বৃষ্টির মধ্যে নির্জন পথে দেখে এগিয়ে যায়। মেয়েটার উপর তার নজর রয়েছে কিছুদিন থেকেই। তবু বাবুদের জিয়োন মাছ-এর মত আগলে ছিল, আজ যতীন সাহসে ভর করে এগিয়ে আসে।

—বৃষ্টিতে ভিজে চলেছো টিয়া। মাইরী—যা সোন্দর লাগছে তোমাকে। গুপী বোষ্টমের গানের মতন—চলে লীল শাড়ি—

টিয়া ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। এই জানোয়ারগুলোকে এখানে দেখেছে সে। এরা অবিনাশের উপর সেই স্কুলের মাঠে চড়াও হয়েছিল, বাঁধের গোলমালে সেদিন গুন্ডি চালাতে গিয়েছিল তার উপর। আজ এসেছে টিয়ার সামনে একটা মাতাল জানোয়ারের মত আদিম লালসা নিয়ে।

টিয়া বলে ওঠে—পথ ছাড়ো।

যতীন টলছে। চোখে তার গোলাপী নেশার আমেজ। যতীন বলে ওঠে :

—ওই অবাকে ছেড়ে এসে ভালোই করছো। শলা—ফুকো কান্তান। লীডার! অমন লীডার দু-চারটে ট্যাকে গুঁজতে পারি। আমার শলা ট্যাকার অভাব? হি দিন—দুশ বোতল, মানে পঞ্চাশ ট্যাকা—

টিয়া ওকে এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছে, হঠাৎ যতীন ওর হাতটাই ধরেছে।

টিয়াও এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওর গালে সপাটে একটা চড় কষাতে ভিজে পিছল মাটিতে ওর টলটলায়মান দেহটা ছিটকে পড়েছে। টিয়াও এই সুযোগে দৌড় দেয়। দৌড়চ্ছে মেয়েটা, কি আতঙ্ক!

বাসার কাছে এসে হাঁপাচ্ছে। তরকারীর ঝুলিটা নামাতে দেখে সবিতা বলে—হাঁপাচ্ছিস কেন?

টিয়া প্রসঙ্গটা চেপে গিয়ে জানায়—আচমকা বৃষ্টি নামলো, তাই দৌড় লাগালাম কিনা—

...অবশ্য গেণ্টু দাস এর মধ্যে পথ করে নিয়েছে। কেতুলাল কলকাতা থেকে খবর এনেছে—জমি জায়গার নোতুন রেকর্ড পরচা তৈরী সুরু হবে এইবার ফসল উঠলেই, গেণ্টু দাসও তাই তৈরী হয়েছে।

সেদিন স্কুলের মিটিং-এ ব্যাপারটা নিয়ে সোরগোল ওঠে।

বদন ডাক্তারও কমিটির মেম্বার। বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণেরও একজন। অধরবাবু হেডমাস্টার, তিনিও কমিটিতে আছেন। বদন ডাক্তার, তিনকড়ি রায় দু'জনেই কথাটা তোলে।

—প্রভাতবাবুর ছুটি অনেক আর ক্লাশও বেশী নেন না। তাছাড়া শিক্ষক হবেন আদর্শ চরিত্রের। প্রভাতবাবুর চরিত্র সম্বন্ধেই একবার প্রশ্ন উঠেছে। এটার বিহিত হওয়া দরকার।

গেণ্টুবাবু চেয়ারম্যান। সে নিপাট ভালোমানুষের মত বলে—এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বদনবাবু, এ সম্বন্ধে সাক্ষী-প্রমাণ না থাকলে এসব কথা মিটিং-এ না তোলাই সঙ্গত।

বদন ডাক্তার জোর গলায় জাহির করে—সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আছে বড়বাবু। ওই মেয়েদের স্কুলের নোতুন দিদিমণি—ওর পাশের বাসাতেই থাকেন, ওখানেই তো বৃন্দাবন গড়ে উঠেছে, রাসলীলা চলছে। আজে আমি কেন—ওদিগরের সবাই জানে।

সাক্ষ্য দেবার লোকের অভাবও হয় না। যতীনও এগিয়ে আসে। ক্ষুদিরাম গোয়ালা বদনের হাতের লোক। সে ওইদিকে দুধের রোজ দিতে যায়, সেও দেখেছে অনেক কিছু। অবিনাশের তাজা বোটাও প্রভাত মাস্টারের ঘরের কাজ করে, খাবার করে দেয় নিজের হাতের কাজ ফেলে—এসব গুঢ় তথ্যও ওই প্রকাশ্য সভায় ঘোষিত হয়।

ভিড় জমে গেছে বাইরে। বেশ কিছু লোকও জুটেছে।

স্কুলের শিক্ষকরাও কেউ মন্তব্য করে :

—এসব কান্ড চলছিল, টেরও পাইনি আমরা।

গেণ্টু দাস আজ বিচারকের আসনে সমাসীন। গেণ্টু দাসই বলে :

—ত হলে ওদেরও ডাকা হোক। ওদের বক্তব্যটাও শোনা দরকার। অধরবাবু আপনি ওদের দু'জনকেই ডাকাবার ব্যবস্থা করুন।

অধরবাবু প্রথমে বদন ডাক্তারের কথাটা শুনে অবাক হয়। এমন কোন ঘটনা তার জানা নেই। প্রভাত ছেলে হিসাবে ভালোই, সবিতাদেবীকে সে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, আর ওই বাউন্ডুলে ছেলেটার সম্বন্ধে সবিতাদেবীর কিছুটা স্নেহ রয়েছে এটাই জানতো সে।

অধর ভটচায এতবড় মিথ্যা অপবাদটাকে মেনে নিতে পারে নি। ও বলে ওঠে—এসব কথার গুরুত্ব দেবেন না বড়বাবু। প্রভাতবাবু ওঁকে দিদি বলে ডাকেন, মান-সম্মান করেন—

গেণ্টু দাস একটু চমকে ওঠে। তার সাজানো ঘুঁটিগুলোই যেন বিদ্রোহ করে তার চাল বেচাল করে দিতে চায়। গেণ্টু দাসের মুখ-চোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে অধরবাবুর এই ব্যবহারে।

সেটা জানাতে চায় না গেণ্টু দাস। তাই বলে :

—কথাটা সত্যি না মিথ্যা এসব বলতে চাই না, আমি শুধু জানতে চাই প্রভাতবাবুর কাছে এর মূলে কি আছে।

বদন ডাক্তারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবার তিনকড়ি রায় আর শিক্ষক প্রতিনিধি দেবেশবাবুও।

—প্রশ্ন যখন উঠেছে তার জবাব দিতেই হবে কমিটির সামনে ওদের দু'জনকেই।

...খবরটা শুনে লজ্জায় অপমানে নীল হয়ে ওঠে সবিতা।...টিয়া ওঘরে কি কাজ করছিল, সেও ছুটে আসে।

—সবিতাদি!

সবিতা দু' হাতে মুখ ঢেকে কি যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। টিয়া দেখেছে প্রভাতবাবুকেও হন্তদন্ত হয়ে বাসা থেকে বের হয়ে আসতে। রবিবারের দুপুরে ওরা আজ বিশ্রাম করছিল, হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেছে ওই স্কুল বাড়িতে, সেই নোংরা মিথ্যার ঢেউটা বাতাসে ছড়িয়ে এখানে আসতে দেরী হয় না।

প্রভাতবাবুই এগিয়ে আসে—ওদের নোংরা কথাগুলো শুনেছেন দিদি? অসভ্য ইতরের দল এতবড় অপমান করতে সাহস করে আপনাকে? আমার সম্বন্ধে যা খুশী বলুক, তাতে আমার যায়-আসে না, কিন্তু ছি ছি, এত বড় জঘন্য মিথ্যাটা ওরা বলতে সাহস করে?

সবিতাও নিজেকে সামলে নিয়েছে।

আজ তার স্বামীর কথাগুলো মনে পড়ে। দুর্গাপুরের পদস্থ অফিসার তিনি, সুন্দর বাংলো—বেয়ারা সবই রয়েছে।

উনিই বলেন—চাকরির দরকার কি তোমার সবিতা?

সবিতাও এইবার চাকরি ছেড়ে দেবার কথাই ভাবছিল। কিন্তু এমনি বিশ্রী কথা শুনতে হবে, তা ভাবে নি।

সবিতা বলে—আমার জবাবটা আমি লিখে পাঠাচ্ছি প্রভাত। টিয়াই দিয়ে আসবে ওদের কমিটির সামনে চিঠিখানা।

প্রভাত চমকে ওঠে—রেজিগ্‌নেশন লেটার।

সবিতা হাসে—এই নোংরা চক্রান্তের মাঝে আর একদিনও থাকতে চাই না প্রভাত। স্কুলের প্রকাশ্য সভায় যারা এমনি জঘন্য মিথ্যার পশরা সাজাতে পারে—তারা শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু নোংরাই আনবে, তাই এখান থেকে চলে যাচ্ছি প্রভাত।

প্রভাত কঠিন স্বরে বলে—কোন প্রতিবাদই করবেন না?

সবিতা বলে—জ্ঞানহীনদের সামনে প্রতিবাদও অর্থহীন প্রভাত। তাই ঘৃণাভরে সরে যাওয়াই ভালো বুঝেছি।

টিয়াও শুনেছে সব কথা। প্রভাতবাবুর মত মানুষকেও ওরা কাদা মাখিয়েছে। আরও

বোধ হয় দিদিমণিকেও তারা বাদ দেয় নি। ওই গেণ্টুবাবুর দল। বদন ডাক্তারই নাকি কথাটা তুলেছে।

টিয়া বলে—ওসব ওই গেণ্টু দাসেরই ফারসাজি, বদন-তিনকড়ি ওরই চামচে। আমি ওই পাপগুলোকে চিনি দাদাবাবু।

প্রভাতও মনস্থির করে ফেলেছে। ওই শয়তানের দরবারে সে হাজির হয়ে কোন কৈফিয়তই দেবে না। ওদের সে আজ মূল্য করে। এর জবাবও দেবে না সে।

গেণ্টু দাস তখনও অপেক্ষা করছে। বাইরে বেশ কিছু কৌতূহলী শিক্ষক—লোকজনও রয়েছে। ভিতরে মিটিং চলেছে দুরোদমে। আজ এমন সরস ব্যাপারটাকে ওরা যেন অনেকেই উপভোগ করছে। এমন সময় টিয়াকে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা।

টিয়া চিঠিখানা গেণ্টু দাসের সামনে দিয়ে বলে :

—দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন।

গেণ্টু দাস চিঠিখানা খুলে ইংরেজী লেখা দেখে একটু ঘাবড়ে যায়। ওটা বিশেষ তার আসে না। বদন ডাক্তারের বিদ্যেও তেমনিই ক্ষুরধার। তাই অধরবাবুর হাতেই চিঠিটা দিয়ে বলে :

—পড়ো অধর।

অধরবাবু জানতো, এর জবাব এমনিই একটা হবে। প্রভাতবাবুও সেই জবাবই দিয়েছে, অবশ্য প্রভাতবাবুর জন্য তাদের রীতিমত ভয় রয়ে গেছে। কারণ স্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ড, ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড-এর টাকার গোলমালের খবর সে জানে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে সব টাকা জমা পড়ে নি, সেটাও জেনেছে সে। প্রভাতবাবু পদত্যাগপত্রের সঙ্গে তার প্রাপ্য টাকার দাবী জানিয়েছে।

টিয়া বড়বাবু-বদনবাবুর বিদ্যের বহর দেখে বলে ওঠে :

—আপনিই পড়ুন কেন বড়বাবু? তা নিজের বিদ্যে তো এই—আপনার চেয়ে বেশী বিদ্যের লোকের সম্বন্ধে তাহলে যা-তা বলেন কেনে?

গেণ্টু দাস ওর দিকে চাইল।

বদন ডাক্তার ধমকে ওঠে—থামবি তুই?

টিয়া হাল্কা স্বরে বলে ওঠে—দুটো প্রাণের কথা বলতে দাও গোবিন্দ্য মাশায়। ঝড়ের রাতে বিদ্যুতের আলোয় বড়বাবুর চোখের লিশাটাও দেখেছি—তার জন্যেই তখন পাকা কোঠায় ঠাঁই দিলে, চাকরিও দিতে চেয়েছিলে। তা আমি তো লষ্টাই গো তোমাদের চোখে, আমাকে জড়িয়ে প্রভাত মাস্টারের নামে দু' কথা বললে লোকে মানতো। কাজও হতো।

দিদিমণির মত মেয়ের নামে যা তা বলতে এটুকু বাধলো না তোমাদের?

গেণ্টু দাস চমকে উঠেছে মেয়েটার কথায়। ওর গতরের নেশাটা তার মিথ্যে নয়, আর প্রকাশ্য সভায় ওই টিয়া এসেছে সেই কথাটা জানাতে। টিয়া ওদিকে যতীনকে দেখে বলে ওঠে—চোলাই মদ বিচে বড়বাবুর দলে উঠেছিস বুঝি? তবে জেনেশুনে বড়বাবুর মেয়েছেলের দিকে সেদিন নজর দিইছিলি কেনে রে?

যতীন কাঁচুমাচু করছে। মেয়েটার জিবের ধার ওর রূপের মতই ঝকমকে।

বদন ডাক্তার ধমকে ওঠে—স্কুলের মিটিং চলছে।

টিয়া বলে ওঠে—তাই নাকি গো! আমি তো ভাবছিলাম পতিত করার সভা ডেকেছো। তাহলে যাই—আর যতীন সেদিনের চড়টা জোরে লাগে নি তো?

আহা—চলি গো বড়বাবু।

গেণ্টু দাস-এর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে। রাগে অপমানে ও কাঠ হয়ে গেছে।

অধরবাবুর কথাগুলো ঠিকমত যেন শুনতে পায় না। ওর মনের সেই বিজয়ীর তৃপ্তিটুকুও মুছে গেছে। অধরবাবু বলে :

—ওরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, তাই

পরবর্তী আকর্ষণ : উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা।

এস. এস. প্রোডাকসন্সের উত্তম • সুপ্রিয়া অভিনীত
তারাশঙ্করের দুই পুরুষ
লিলি চক্রবর্তী • দিলীপ • সত্য • শৈলেন • বিকাশ • তরুন • স্বপন কুমার • নন্দিনী মালিয়া
পরিচালনা • সুশীল মুখার্জী ✻ সঙ্গীত • অধীর বাগচী
চিত্রনাট্য • বিকাশ রায়

বিশেষ সংবাদ!
শরৎচন্দ্রের
দেবদাস
চলচ্চিত্রায়িত করছেন দিলীপ রায়
সৌমিত্র • সুপ্রিয়া • সুমিত্রা • উত্তম
চিত্রনাট্য • বীরু মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত • কালীপদ সেন

॥ দুই পুরুষ সমাপ্তির পথে ॥ দেবদাস গঠন পথে ॥

কৈফিয়ত দিতে রাজী নন।

বদন ডাক্তার বিজয়ীর মত চীৎকার করে ওঠে—আর কি বলবার আছে?... ওসব দুষ্ট গরুর দলকে দূর করুন মাস্টার মশাই। স্কুল হচ্ছে শিক্ষা মন্দির। মন্দিরের পবিত্রতা এখানে দরকার।

গেণ্টু দাস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে :

—ওসব কথা থাক বদন। তাহলে আজকের মত মিটিং শেষ হয়ে গেল।

গেণ্টু দাস জানে এই রসাল খবরগুলো এর মধ্যে ডালপালা গজিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর অবিনাশের রঙিনদী বৌটা প্রকাশ্য মিটিং-এ এসে তাদের অনেক কথাই ফাঁস করেছে, আর নির্মমভাবে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে গেছে। গেণ্টু দাসের আজ মনে হয় একটা ভুলই করেছিল সে ওই অবিনাশের বৌকে বিশ্বাস করে। ওরা সকলেই সাপের জাত—সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে, বিষ ভরা ছোবল। ওই সাপের জাতদের সে এক-একটা করে শেষ করবে।

...খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রভাতবাবু এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন শ্রীরামপুরের কোন স্কুলে চাকরি নিয়ে।

অবিনাশ-যতিরামের দলও খবর পেয়ে গেছে। আইনুদ্দি-রামু মোড়লরাও খবরটা পেয়ে চমকে ওঠে।

—মাস্টারকে ওই গেণ্টু দাসই তাড়াতে চায় অবা!

অবিনাশও বুঝেছে কারণটা। ওর সাহায্যেই তারা এই দুর্দিনে পার হবার মত ভরসা পেয়েছে। বাঁধ বাঁধার কাজে করেছে নিজেরাই। সব রিলিফ সাহায্য এসেছে সোজা তাদের হাতে, আর তার ঠিক ঠিক বিলি ব্যবস্থা হয়েছে। মাঝেপথে থেকে উধাও হয়ে যায় নি।

আজ তাই ওরা প্রভাতবাবুকে সরাতে চায়।

গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষের কাছে আজ ওদের প্রকৃত স্বরূপটা ফুটে উঠেছে স্পষ্টতর রূপে।

...টিয়া ভাবনায় পড়েছে।

আজ প্রকাশ্য সভায় চিঠি নিতে গিয়ে ওই কথাগুলো না বলে পারেনি। জানে টিয়া ওরা তার জন্য তাকেও ছেড়ে কথা কইবে না।

সবিতা গোছগাছ করছে। টিয়ার কথাগুলো তার এখানেও ভেসে এসেছে। তাই সবিতা বলে—তোর ওসব কথা বলার কি দরকার ছিল?

টিয়া জানায়—যা সত্যি তাই বলেছি।

—এর পর যাবি কোথায়? সবিতার প্রশ্নে টিয়া চাইল ওর দিকে।

কথাটা সেও ভেবেছে। কিন্তু তেমন কোন পথের হদিস সে পায়নি। তবু বলে টিয়া—জাহান্নমের দোর তো খোলাই আছে দিদি। আর কোথাও ঠাঁই না মেলে সেখানেই গিয়ে হাজির হবো। তার পথ তো জানাই আছে।

সবিতা মেয়েটার দিকে চাইল। ওর হাসির অন্তরে কোথায় একটা তীক্ষ্ণ বেদনার সুর ফুটে ওঠে, সেটাকে টিয়া চাপতে পারেনি। সবিতা কি ভাবছে। মেয়েটার উপর তারও মায়া পড়ে গেছে। সবিতা বলে—আমার সঙ্গে যাবি বাংলোয়?

টিয়া জবাব দিল না। মনে হয় এখানে তবু এ মাটির কাছাকাছি ছিল। অবিনাশকে চোখেও দেখেছে, সব খবরই পায় তার। এখান থেকে দূরে চলে যেতে তাই মনে মানে না।

টিয়া চুপ করে থাকে।

সবিতা বলে—ভেবে দ্যাখ তারপর বলিস।

...প্রভাতবাবু অবাক হয় ওদের দেখে। অবিনাশ-রামু মোড়ল-আইনুদ্দি আরও কারা এসেছে রাতের অন্ধকারে। ওদের মুখচোখে ফুটে উঠেছে কি কাঠিন্য।

আইনুদ্দি বলে—তুমি যারে না মাস্টার। আমরা দশ গ্রামের ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাবো না, ধর্মঘট করবো ইস্কুলে। দেখি ওদের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পারি কিনা।

অবিনাশও বলে—একবার খেলটা দেখো মাস্টার। তোমাকে সরিয়ে দিয়ে এবার আমাদের দুবলা করে মা মারবে। ওদের চালটা বুঝি।

প্রভাত ওদের থামাবার চেষ্টা করে।

—মাথা গরম করো না তোমরা। ইস্কুল বন্ধ করলে ছেলেদেরই ক্ষতি হবে। ওসব পথে যেও না। আর তোমরা যদি এক থাকে—ওদের সব চালই মিথ্যে হয়ে যাবে।

কথাটা ঠিক মানতে চায় না ওরা। অবিনাশ কি ভাবছে। রামু মোড়ল বলে—তোমাকে আটকাতে পারার মুরোদ আমাদের নাই।

প্রভাত কি ভাবছে।

অসহায় মানুষগুলোর মুখেচোখে কি যেন আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। প্রভাত বলে—সোনামুখীর স্কুলে যদি চাকরি নিই কাছেই তো থাকবো। ওসব পরে ভাবছি—কথা হবে। রাত হয়েছে এখন যাও।

...বাইরে আমগাছের নীচে থমথমে অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। মুঠো মুঠো জোনাকির পুঞ্জ ছিটিয়ে পড়েছে বাতাসে ওড়া আগুনের ফুলকির মত। তারাগুলো মেঘমুক্ত আকাশের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, আবার মেঘে ঢেকে যায় সারা আকাশ।

অবিনাশ শুনেছে কথাগুলো।

প্রভাতবাবুদের জন্য টিয়ার নীরব সেবার খবরও জানে সে। আজ ওই স্কুলের মিটিং-এ গিয়ে টিয়া যে ওদের মুখের উপর যা তা বলে এসেছে তা নিয়ে হাটতলার চায়ের দোকানে তুমুল আলোচনা চলেছে।

নেটন বলে—অবিনাশের বৌ হে—অমনিই তেজীয়ান তো হবেকই। বড়বাবু-ফাবুকে ও পরোয়া করে না।

অবিনাশ প্রথমদিকে যে টিয়ার উপর ভুল ধারণাই করেছিল সেটা আজ পরিষ্কার ভাবেই বুঝেছে। মনে হয় সেই অপরাধী, কিন্তু লজ্জায় টিয়ার সামনে আসতে পারে নি। স্কুল বাড়ির সেই সন্ধ্যার ঘটনাটাও মনে পড়ে। অবিনাশ ওই গিরিবালাদের কথায় রেগে ওঠে টিয়াকেও যা তা বলেছিল।

...ক'টা মাস কেটে গেছে। অবিনাশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নানা ঝড়। বাঁধ বাঁধানোর পর মাঠে নেমেছে। ওই বালুচর সরিয়ে আবার মাটি বের করেছে, সেই জমিতে আবার বীজ ফেলেছে—ধান রুয়েছে।

আজ মাঝবর্ষায় তাদের এসেছে একটু অবকাশ। মাঠে এসেছে সবুজ ধানের রাশি, নদীর বানের পলি তবু কিছু আশীর্বাদ রেখে গেছে এ মাটির অণু-পরমাণুতে। তাই আজ সেখানে এসেছে দুনো ফসলের সম্ভাবনা।

অবিনাশ আজ অতীতের কথাগুলো ভাবছে, মনে পড়ে টিয়ার কথা।

প্রভাতবাবুর ওখানে কথা বলে চলে গেছে ওরা সকলেই। অবিনাশ হঠাৎ প্রভাতবাবুর ডাকে থামলো। কি যেন বলতে চায় মাস্টার।

...অবিনাশ আজ ওর কথায় চাইল—তুই ভুল করেছিস অবিনাশ। ভেবেছিলাম নিজেই তোর ভুল বুঝে শুধরে নিবি। কিন্তু তা হয় নি দেখে যাবার মুখে কথাটা বলতে বাধ্য হলাম। টিয়ার উপর অবিচার করেছিস তুই।

অবিনাশ জবাব দিল না।

তবু ওর মনের নীরব ব্যাকুলতাটা চাপা থাকেনি। ওর চাহনিতে তা ফুটে উঠেছে। প্রভাত বলে—ও নাকি সবিতাদির সঙ্গেই ওর বাংলোয় চলে যাবে শুনেছি।

অবিনাশ চুপ করে কথাটা শুনে বের হয়ে এল।

টিয়াও চলে যাচ্ছে এখান থেকে অনেক

দূরে। সহরে নোংরার জীবনে যেতে চায়নি টিয়া, সে তাহলে ওই ভাইদের ওখানেই ফিরে যেতো। টিয়া চেয়েছিল একটু শান্তিতে বাঁচতে। তাই আজ দিদিমণির সঙ্গেই চলে যাবে।

অবিনাশের মনে হয় সবই তার হারিয়ে যাবে।

প্রভাতবাবু চলে যাচ্ছে, টিয়াও তাকে ছেড়ে যাবে। একা অসহায় একটা মানুষ এই শুকনো কাজ আর বিপদের অন্ধকারে একা পড়ে থাকবে। বাঁচার অর্থটাও তার হারিয়ে গেছে।

আবছা অন্ধকারে কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো অবিনাশ। জানে সে ওই যতীন-নিতাই-এর দলকে। তাদের রাজ্যে এসেছে সে, হয়তো অন্ধকারে তারা আজ চরম আঘাতই হানতে চায় তাকে সুবিধায় পেয়ে। অবিনাশের সারা শরীরের পেশীগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে, চোখে ওর জ্বলন্ত দৃষ্টি!

...হঠাৎ চমকে ওঠে অবিনাশ—তুই! টিয়া!

টিয়া এসেছিল বাইরে, অবিনাশকে দেখেনি সে। আজ সবিতাদির কথাগুলো তার সারা মনে একটা প্রশ্ন এনেছে। তার মনের চাপা অভিমানটা কান্না হয়ে ঝরে পড়ে। আজ তার স্বামী-ঘর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সেখানে তার কোন আহ্বান নেই। বিনা দোষে তাকেও নির্বাসিত করেছে অবিনাশ।

আর টিয়াও সেই দণ্ডই মেনে নিয়েছে। সে এখান থেকে চলে যাবে, সবিতাদির ওখানেই চলে যাবে সে।

...অসহায় মেয়েটা কি অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই অন্ধকারে তার কান্নাটার খবর কেউ রাখবে না।...হঠাৎ সামনে অবিনাশকে দেখে তাই চমকে উঠেছিল টিয়া।

অবিনাশ এগিয়ে আসে। তার চোখের সামনে তারাজ্বলা অন্ধকারে টিয়ার কান্না-ভরা অসহায় রূপটা কি বেদনা আনে তার সারা মনে।

—তুই কাঁদছিস টিয়া?

টিয়া সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—কাঁদবো কেন?

—কালই চলে যাচ্ছিস শুনলাম? অবিনাশের প্রশ্নে টিয়া নিজেকে চেপে কোন-মতে জানায়—হ্যাঁ। এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

টিয়া ফিরে আসছে বাসার দিকে। তার সব দুর্বলতা মুছে গেছে। আজ স্থির কণ্ঠে সে জানিয়েছে অবিনাশকে তার কথা-গুলো। কিন্তু মনে হয়েছে এর কোন দামই নেই। মিথ্যা অনেক কিছু হারাবার শোকে সে কাঁদছিল।

—টিয়া! অবিনাশের সারা মন কি হাহাকারে গুমরে ওঠে।

আজ চোখের সামনে থেকে বাঁচার আশ্বাসটুকু সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। তাই আজ পুরুষের দাবী নিয়েই অবিনাশ এগিয়ে এসে জানায়—তোর যাওয়া হবে না টিয়া। তোকে যেতে আমি দোব না।

টিয়া ওর দিকে চাইল। অবিনাশের এই কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হয়ে উঠেছে। অবিনাশ ওকে কাছে টেনে নেয়। আজ বলে ওঠে অবিনাশ:

—তুই ঘরে ফিরে যাবি টিয়া! নিজের ঘরে—আবার নোতুন করে ঘর বাঁধবো আমরা। এবারের ফসলে আমাদের ঘর ভরে উঠবে—

অবিনাশের বলিষ্ঠ দুটো হাতের বাঁধনে টিয়ার সব প্রতিরোধ-অভিমান কোথায় হারিয়ে গেছে। ওই নিবিড় স্পর্শটুকু টিয়ার শূন্য মনে কি সুর এনেছে। সেই অনুভূতির স্নিগ্ধ গহনে হারিয়ে গেছে টিয়া।

টিয়া সেই বানে ডোবা গ্রামের সর্ব-নাশা রূপটাই দেখেছিল, আর সেই হাহাকার ভরা মন নিয়ে চলে গিয়েছিল এখান থেকে, অনেক আশা আর আশ্বাসের স্বপ্ন দেখেছিল ওই নোতুন গড়ে ওঠা উপনিবেশ, —গেণ্ডুবাবুদের সম্পদের পরিবেশে। কিন্তু ক'মাসেই টিয়ার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে অন্য জগতের মানুষগুলোর জন্য রূপটা।

আজ সে এই সবুজ স্নিগ্ধ মাঠ গ্রাম—এখানের মানুষগুলোকে নোতুন করে চিনেছে।

যতিলালের বৌ গিরিবালা-মালতী ওরা সকলেই এগিয়ে আসে টিয়াকে দেখে। গিরিবালা বলে—

—নিজের কুঁড়ে ঘরই স্বগ্গো লা—ফিরে এসেছিস, আবার লোতুন করে ঘর-দোর গড়ে নে। আর অবা—ওই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছেড়ে এবার ঘরে মন দে বাপু। বেচারা মেয়েটাকে আর দগ্ধে মারিস নি।

এ যেন অন্য গিরিপিসী। যতিলালের বৌ—মালতী এরা এই মাটিতে ফিরে এসে ওই স্কুল বাড়ির ক্যাম্পের নীচতাকে ভুলেছে। টিয়ার মনে হয় এ মাটি স্নিগ্ধ সবুজের এই আশীর্বাদ মানুষকে অনেক সহজ করে তোলে। তাই এই গ্রাম—এই ভাঙা ঘরটাকেই নোতুন করে ভালোবাসে সে।

ক'মাসের টাকাটা সবিতাদির কাছেই ছিল, সবিতাদি চলে যাবার সময় ও খবরটা শুনে খুশী হয়ে বলে—এই ভালো করেছিস টিয়া। নিজের ঘরে ফিরে যা—সুখী হবি সেখানে। এটা ধর।

...অবাক হয় টিয়া—এত টাকা!...

হাসে সবিতা। বলে—তোর মাইনেটা রাখ, আর বাড়ি তো ভেঙে গেছে, দিদির কাছ থেকে কিছু নিলে কি দোষ হয় রে? আমি দিচ্ছি—রাখ এটা। ঘর তুলতে কাজে লাগবে।

অবিনাশও অবাক হয়—ঘর বানাবি তাহলে?

টিয়া হাসে—কেন ঘর তুলবো নাই গো?

টিয়া ঘরের স্বপ্ন দেখে, ধানের মঞ্জরীগুলো বাতাসে দোল খায়। টিয়াও এই মাটিকে নোতুন করে চিনেছে। আদিগন্ত সবুজের বুকে আসছে সোনালী হলুদ আভা। অবিনাশ অবাক হয়।

—তুই মাঠে এসেছিস টিয়া?

দিন থেকে মাঠে জলের তদারক করতে হয়। আমন ধানের গলা ফেটে থোড় বের হচ্ছে, আউশের মঞ্জরীতে এসেছে সোনা রং —মাঠের জলজমা বুক থেকে রোদের তাপে উত্তাপের আবেশ ওঠে। মাঠে মাঠে সোনা ধানের আশ্বাস, নোতুন করে বাঁচার আশ্বাস ওদের সারা মনে।

টিয়া বলে—কেন আসবো নাই।

অবিনাশের বুকে এসেছে নোতুন আশা। এ লগ্নে দশ বিঘা জমিতে পুরুষ্ট আউশের ধানে সোনা রং ধরছে। ওদের সব অভাব ঘুচে যাবে—গ্রামের মানুষের বহু কষ্টের দিন—বহু উপবাসের বেদনার স্মৃতি ছাপিয়ে এসেছে সোনালী আশ্বাস।

যতিলাল বলে—ইবার আউশের ফলন দেখেছিস অবা? আউস তুলেই বতরে চাষ দিই আলু বুনবো—চকচকে চক আলুর ক্ষেত করে দে।

...ওরা আশ্বাস পেয়েছে এবার!

হঠাৎ ঈষাণ কোণে কোথায় মেঘের সঞ্চার হয়েছিল এরা ভাবতে পারে নি। খেয়াল করে নি। সেই মেঘটাই তাদের আকাশকে গ্রাস করে সব আলোর দীপ্তি-টুকুকে মুছে দিয়েছে। এসেছে সর্বনাশা ঝড়!

...দুপুরে হঠাৎ গ্রামে সোরগোল পড়ে যায়। আর্তকণ্ঠে কারা চীৎকার করছে। কলরব ওঠে। গিরিবালা পঞ্চমে গলা তুলে চীৎকার করে—সর্বস্ব লুটে নিলেক রা। অরে অ আবাগীর ব্যাটারা—

...গ্রামের মানুষগুলো লাফ দিয়ে ওঠে। কেউ খেতে বসেছিল—কেউ ঘরে কাজে ব্যস্ত, মেয়েরাও বের হয়ে আসে। সারা গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। লাঠি-টাঙ্গনা-গাঁইতি-সড়কি যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই কাজলা নদীর ধারের দো-ফসলা জমির দিকে ছুটেছে।

...গেণ্ডু দাস হিসেবে ভুল করেনি। ও জানে কখন কোন দিক থেকে ঘা মারতে হবে। তার এতদিনের চাপা আক্রোশ আর

জমায়েটা যেন কঠিন দস্যুর মূর্তি নিয়ে আজ হাজির হয়েছে। ওপারের দিক থেকে এনেছে গোটা পঞ্চাশেক গরুর গাড়ি—শত-খানেক লাঠিয়াল—আর যতীন নিতাইও এসেছে আজ তৈরী হয়ে। ওদের সোনা ধান লুঠ করে নেবে।

লোকগুলো মাঠে নেমে অধপাকা ধান-এর মঞ্জরীগুলো কাটছে। তছনছ করছে এদের সারা বছরের পরিশ্রম, স্বপ্ন—বাঁচার আশ্বাস। লুঠেরার দলের নিয়ম যে যত কাটবে—তার সে ধান। তাই লুঠ করার লোকের অভাব হয়নি। নিতাই যতীন লাঠিয়ালের দল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে তাদের। গর্জন করে নিতাই :

—কেউ এগোবে লাশ দাখিল হয়ে যাবেক। এগিয়ে আয় কে বাপের ব্যাটা আছিস!

কোন বাধা না পেয়ে ওরা নিজেদের দখলই যেন কায়েম করে ফেলেছে এবার। উঁচু পগারের এদিকে নজর যায় না। মনের আনন্দে লুঠেরার দল ধান কেটে চলেছে, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে ওদিক থেকে জেগে উঠেছে অনেকগুলো প্রতিবাদকঠিন মুখ—তাদের জ্বলন্ত চোখের চাহনি।

ওরা সামনে থেকে আসেনি, দূরে দাঁড়িয়েছিল এদিকের কিছু লোকজন, অবিনাশ-যতিলাল-নকড়ি-রামু মোড়লের দলবল নদীর বাঁধে নেমে আড়াল দিয়ে এসে এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে এদের উপর। ওদিকে নশীপুরের আইনুদ্দিরাও খবর পেয়ে দৌড়ে আসছে মাঠ ভেঙে।

পিছনে উদ্যত মুষ্টির অতর্কিত আক্রমণে এরা হকচকিয়ে উঠেছে। কয়েকটা বলিষ্ঠ লাঠির আঘাতে ছিটকে পড়ে দু-তিনজন সর্দার, যতীন দৌড়ুচ্ছে—তার পায়ের উপর সজোরে লাঠিটা এসে পড়তে ছিটকে পড়ে যতীন—অবিনাশ!

আর্তনাদ করে সে!

আজ ওরা যেন ক্ষেপে গেছে। ওই পঞ্জ সোনা ধানের ক্ষেতের উপর আজ ওরা তাদের অধিকার নিয়ে—বাঁচার অধিকার নিয়ে এগিয়ে এসেছে। লোভী লুঠেরার দল দৌড়চ্ছে এদিক-ওদিকে। কারা ওদের গাড়ি থেকে গরুগুলো খুলে দিতে তারাও লেজ তুলে গ্রামের দিকে দৌড়চ্ছে—মাঠে একটা ঝড় বয়ে চলেছে।

ওই দস্যুর দলের পালাবার পথ নেই—সারা সবুজ ক্ষেতের এদিক ওদিকে জেগে উঠেছে সজাগ প্রহরীর দল। প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে ওরা—ওদের লুঠ করার সখ মিটে গেছে।

...গেণ্টু দাস দূরে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল তার প্রতিষ্ঠার দাপট। আজ ওই অসহায় মানুষগুলোর হয়ে কথা বলার কেউ নেই। সব জমি আসবে তার খাস দখলে, আর বর্গাদারীর নাম মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠবে তার নাম শ্রীজ্ঞানদাস দিগর!

কিন্তু হঠাৎ সারা দিগন্ত কাঁপিয়ে কিসের সাড়া উঠতে সেও অবাক হয়ে যায়। ওই শীর্ণ মানুষগুলোই আজ প্রতিরোধ গড়েছে। পালাচ্ছে ভীত-ত্রস্ত লুঠেরার দল—ওরা এগিয়ে আসছে। কার হাতের উদ্যত টাঙ্গি রোদে ঝকঝক্ করছে।

—পালান বড়বাবু!

নিতাই দৌড়ে আসছে তাড়া খেয়ে, ওর দু'চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। গেণ্টু দাসও দৌড়চ্ছে—দম বন্ধ হয়ে আসে, বুকটা যেন ফেটে পড়বে। পিছনে শোনা যায় কাদের চীৎকার।

হঠাৎ নোতুন উঁচু বাঁধের উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেণ্টু দাস—কোথায় হোঁচট খেয়ে ঘুরে পড়েছে। দাঁড়াবার সাধ্য নেই—তার ভারি দেহটা গড়াচ্ছে, আর্ত চীৎকার করে ওঠে গেণ্টু দাস—নীচে দেখা যায় ভরা আশ্বিনের কাজলা নদীর জল স্রোতের আবর্তে যেন মৃত্যুর অট্টহাসি নিয়ে বয়ে চলেছে।

...চীৎকার করছে গেণ্টু দাস—মনে হয় জীবনভোর এত হিসাব-নিকেশ সব মিথ্যে। এ বড় দাবার চালের একটা ভুলে তার রাজপদের কিস্তিমাত হয়ে গেল।

নদীর দিকে গড়িয়ে পড়ছে গেণ্টু দাস, তখনও তার ক্ষীণ চীৎকার ভেসে ওঠে—বাঁচাও।

ওই হাজারো মানুষ এমনি কাতর আর্তনাদ করে এসেছে এতদিন। গেণ্টু দাস তাতে কর্ণপাত করেনি। আজ তার একক ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও কারো কানে পৌঁছে না।

ঘটোৎকচ

বাণী রায়

চাতালে দুইখানি জীর্ণ চেয়ার। ছোট রাস্তার এক বাড়ীর তিনতলার ফ্ল্যাট। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। দোতলার ছোট ল্যান্ডিং-এর বিজলীবাতির বাল্বটি লাগানো থাকলে প্রায়ই চুরি যায়। একতলায় দোকান-ঘর। ওরা আলোর ধার ধারে না। রাস্তার দিকে দোকান। ভিতরের উঠোনে গুদাম। দোতলার সিঁড়ির দরকার নেই তাদের।

দোতলার ভাড়াটেরা নেহাত ঘরোয়া। অফিস-বাড়ী করেই দিন যায়। কদাচিৎ সন্ধ্যার শো-তে সিনেমা দেখাই একমাত্র আনন্দ। বাইরের লোক বড় কেউ আসে না। এলেও তারা আলো বা অন্ধকার গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু তেতলার ভাড়াটে মঞ্জরী মিত্রের মনোভাব নিদারুণ। সে অনতিক্রান্ত যৌবনা, মেকাপ অন্তে সুন্দরী। সাহেবী পাড়ায় একটি চশমার দোকানে রিসেপশনিষ্ট। চমৎকার পোশাক। অবস্থা অনুযায়ী অতিরিক্ত অবশ্য। কিন্তু ওর পেশায় রাখতেই এই ভড়ং-টুকু তাছাড়া মনও চায় চুলগুলো ছোট এবং কার্তিত।

মঞ্জরীদের অবস্থা এককালে মন্দ ছিল না কিন্তু বাবা রিটায়ার করার পরে অধোগতি দেখা দেয়। ছেলে দুটি সুযোগ্য নয়।

একজন সামান্য চাকরি করে, অন্যটি বছরে বছরে বি-কম পরীক্ষার আগে "তৈরী হইনি" বলে পরীক্ষা দেয় না। অবশ্য তার একটি সাইড বিজনেস আছে—লটারির টিকেট বিক্রয়।

টানাটানির সংসার। পিতা কলকাতায় গৃহ নির্মাণ করতে পারেন নি—চাকুরের যা স্বপ্নস্বপ্ন। পেন্সন সামান্য। মঞ্জরী পড়াশোনায় ভাল ছিল না। কোনমতে বি-এ পাশ করে চাকরির প্রত্যাশায় ঘুরে ঘুরে হঠাৎ কাজটি পেয়ে গেছে। বন্ধুদের সাহায্যে। বন্ধুভাগ্য ভালই ওর। অধিকাংশই সম্পন্ন গৃহের কন্যা, কেউ কেউ বা অভিজাতা। নিজের মত সাধারণ ঘরের গৃহস্থ কন্যাকে শ্রীমতী মঞ্জরী পরিহার করেই থাকে।

প্রায়ই নিমন্ত্রণ। মিশুকে প্রকৃতি, সুসজ্জিতা, স্মার্ট, সুশ্রী, ইংরেজি বলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সে সমাদৃতা। অকৃতদার তরুণ বড় বড় অফিসারেরা পার্টিতে ভাল মিঙ্গার মহিলা খোঁজেন। আহারাদি, নেশাভাং এবং সর্বোপরি বহু পুরুষসঙ্গ মেলে সেখানে। উভয়পক্ষে খরচ লাগে না।

ভ্রাতার সাইড বিজনেসের মত মঞ্জরীর সাইড বিজনেস—সোসাইটি নাইট ক্লাবে মাচানাচি, গাড়ীতে জয়-রাইড সবি মিলে যায়।

বাবা-মা বিশেষ পছন্দ করেন না এগুলো। কিন্তু টাকা খরচ করে বা যোগাড়-যন্ত্র করে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। মেয়ের রোজগারটা কাজে লাগছে। অভিজাত মহলে, আধুনিক সমাজে মেয়ে ঘোরাফেরা করছে। হয়তো আশাতিরিক্ত উপযুক্ত পাত্র একটা জুটে যাবে। অতএব চুপচাপ থাকেন, না দেখার ভান করে থাকেন।

মঞ্জরীর বড় ভাই পমেটম তেমন কিছুই করতে পেরে উঠল না। ছেলেবেলায় চুলে প্রসাধনী পোমাড বা পমেটম মাখিয়ে না দিলে সে কান্নাকাটি করত। সুতরাং ডাকনামের জন্য মাথা না খাটিয়ে মা-বাবা নাম রেখেছিলেন পমেটম। পরের জনের নাম নির্বিবাদে রাখা হল "টমটম"।

কিন্তু মেয়ের নাম "মঞ্জরী" বিকৃত করলেন না ওঁরা। মেয়ে যে পরের ঘরে যাবে। অবশ্য পরের জামাই হলে ছেলেদের যে পমেটম বা টমটম নাম কতটা হাস্যকর হবে সে বোধ মনে এল না।

পশুপতি মিত্র ভাল খেতে ভালবাসেন। মেয়ে মধ্যে মধ্যে প্রতিদিনের থেকে ভিন্ন জাতীয় খাবার, কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিচীজ কিনে আনে। কেরোসিন কাঠের খাবার টেবিলে স্যালাড বানিয়ে সাজায়।

মধ্যে মধ্যে বন্ধু-বান্ধব বাড়ী আসে-যায়। মঞ্জরী প্রাণপণে ঘরকে সাজিয়ে রাখে। ছোট একটি বসবার ঘর সে রেখেছে জোর করেই এক-আধদিন তাকেও পার্টি দিতে হয় বাধ্য হয়ে।

আপাততঃ এমন একটি পার্টির দিনে, আসুন আমরা হাজির হই।

বসবার ঘরেই আসবাবপত্র উঠিয়ে সেখানে ফরাস পড়েছে, নইলে স্থান সংকুলান হবে না। পমেটমের অফিসের উপরওয়ালাকে সে সন্তুষ্ট করতে চায়। মঞ্জরীর বন্ধুবান্ধবও আছে। পমেটমের দীর্ঘদিন অনুরোধ অন্তে অবশেষে মিষ্টার সানিয়াল রাজী হয়েছেন।

কোণের টেবলে রাশিকৃত সোডা, সট-জিনক হুইস্কির বোতল, জিন, রাম কিছু কিছু। ককটেল দেবার পার্টি এটা। মঞ্জরী ও পমেটম প্রধান হোতা। বিস্তর টাকা বেরিয়ে যাবে। তা হোক, যদি কোন সুবিধা করে নেওয়া যায়।

দু'ভাই-বোন লেগে ঘরদোর গুছিয়েছে। খাবার দিতে হবে, রাত্রের ডিনার। অবশ্য বাঙ্গালী মতে। কারণ ইংরেজী-খানা প্রস্তুত করা গ্রদের সাধ্য নয়। স্টেনলেস স্টীলের বাসন নেই, কাঁচের বাসন দু-চারটে যা আছে চটাওয়া, পুরনো শ্রীহীন। অতএব তারা ঠিক করল বারান্দায় আসন পেতে কলাপাতায় ও মাটির খুরিতে খাওয়ানো হবে। বেশ ভারতীয় ষ্টাইল। কিন্তু মেঝের ককটেলের আসর ও কলাপাতায় ডিনার! মঞ্জরীর চোখে অবশ্য অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল। কিন্তু কি করা যায়? তাদের খাবার টেবলের কেরোসিন কাঠে লোক বসানো চলে না।

মঞ্জরী সদ্যপ্রাপ্ত বান্ধবী নেবুকে নিমন্ত্রণ করল। নেবু বাসু বড়ঘরের বওয়াটে মেয়ে। সে মঞ্জরীর অফিসে পার্টির আগের দিন এসে বলল, "ভাই মঞ্জরী, একজন লোক একক্ষ্টা আনতে পারি? ভদ্রলোক সদ্য দিল্লী থেকে এখানে পোষ্ট পেয়েছেন। বড় চাকরি। কিন্তু নূতন লোক, এখ্যনকার সোসাইটিতে একটু মিশতে চান।"

নিজেকে "সোসাইটি" জেনে মঞ্জরী অতি হৃষ্ট। এক মুহূর্তে গলির পুরনো বাড়ী, অন্ধকার সিঁড়ি ভুলে গেল সে। বলল, "বেশ তো, এনো। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে নেবো। কি চাকরি?"

ঝপ্ করে রুমালের ঘায়ে মঞ্জরীর গালের একগাদা পাউডার ঝেড়ে ফেলে নেবু বলে "মিড সামার ক্লাবে আলাপ। ইনডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কাজ। দেখ না চেখে। চমৎকার বিরদান।"

হা-হা করে হেসে 'চমৎকার বিরদান' অর্থাৎ বিদ্বান নরেন সোমের আসা মঞ্জুর করল মঞ্জরী।

আজ মন দিয়ে সাজ করেছে মঞ্জরী, আর কবে না সে করে থাকে?

গাঢ় সবুজ সিল্কের সাড়ী, হাতকাটা জামা, গলায় পাথরগাঁথা রুপোর মালা। চটুল ভঙ্গীতে তন্বী মঞ্জরীকে দেখাচ্ছিল অন্য অনেক দিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

টমটম সাজপোশাক করে বেড়াচ্ছে। তার বন্ধু একটিমাত্র বলা হয়েছে। পমেটমের অধিকে আপত্তি ছিল না। কিন্তু মঞ্জরী বুঝিয়েছে "টমটমের ভাগাবন্ড বন্ধুদের আর কাউকে না বলাই ভালো। একটি মাত্র বলা যাক, নইলে টমটম রাগ করে পার্টি পণ্ড করতে পারে।"

পার্টি নষ্ট করা শক্ত নয়। এই রকম ছোট বাসাড়ে ফ্ল্যাটে পার্টি দেওয়া মানে থলের মধ্যে বিড়াল লুকিয়ে রাখার ইতিবৃত্ত। থলে থেকে বেড়াল যদি নাও বেরিয়ে আসে, ম্যাও-ম্যাও রবটা শোনা যেতে পারে তো? রাতারাতি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষে ফ্ল্যাটটাকে স্বর্ণপুরী বানানো চলে না, কিন্তু মোটামুটি একটা অংশকে সোনালী রং করা চলে। কাঁচা রং অবশ্য সামান্য ঘর্ষণেই উঠে যায়। তাই কোনরূপ অবাঞ্ছিত কুশ্রীতা বা চড়া সুর এখানে যাতে প্রকট না হয়, সেই চেষ্টায় মঞ্জরী যেন পার্টি চলাকালীন কাঁটার শয্যায় শুয়ে থাকে। কারণ মঞ্জরী স্নব্। সে যা নয়, বাইরে তাই দেখাবার আয়াসে নিজেকে নিত্য পালিশ দেয় সে। সে বাইরে যা দেখে, যে সমাজে ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মত যেতে ভালবাসে সেই সমাজকে বুকে ধরে রাখে।

নির্বিবাদ আজ দিনটি। শুধু পশুপতি যথাকালে প্রচুর খাদ্য না পেলে পশু হয়ে ওঠেন। বস্তুতঃ মাঝারী মাপের চাকরিতে যতটা সঞ্চয় তাঁর থাকা উচিত ছিল থাকে নি সেই খাদ্য-বিলাসে। অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেন এক হাঁড়ি রাজভোগ নিয়ে। সাধ করে রবিবারের বাজারে যেয়ে দু'পা বাঁধা একজোড়া মুরগী এনে ফেলতেন। রোজকার ডাল-ভাত-চচ্চরি-মাছের ঝোল তাঁর পছন্দ হোত না। খাওয়া মন্দ বা কম হলে গাঁ-গাঁ রবে চীৎকার করতেন। তাই পার্টির প্রথম উদ্বোধনের অংশই তাঁকে খাবার সাজিয়ে পৌঁছে দেওয়া। মঞ্জরীর মা বাতে ও হাঁপানীতে পঙ্গু। তিনি কোনদিকে বেশী বাড়াবাড়ি করতে চান না। শরীরে কুলোয় না বলে নির্বিরোধী।

বাড়ীর একমাত্র চাকরটিকে ট্রে-ভরে পশুপতির খাবার নিয়ে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার নিযুক্ত করেছে মঞ্জরী। উঁচু-উঁচু খুড়ো তোলা পোড়ামাটির লাল-লাল বাটি ভরে মাংস, মাছ, ছোলার ডাল, আলুর দম নিজ-হাতে হাতা ভরে সাজিয়েছে মঞ্জরী। ফ্রায়েড রাইস হয়েছে, বেগুনভাজি। এক দিনের ভাড়া করা রাঁধুনী রান্নাঘরে ব্যস্ত।

চাতালের জীর্ণ চেয়ার দু'খানা সরানো হয়েছে। বসবার ঘরে একখানা ডিভান ও

একসেট বেতের সস্তা সোফাসেট ছিল। বেতের সোফা সাজাবার কারণ সস্তায় একটা ব্যবস্থা রাখা বসবার। চাতালে সেগুলো বার করে রাখা হয়েছে সাজিয়ে। পাশের বাড়ী থেকে দেখা যায়। অতএব একখানা নীল বেডকভার ঝোলানো সেখানে। চাতালটি বড়। সেকালের ভাড়া বাড়ী, তাই এতটা স্থান মঞ্জরীরা অল্প ভাড়ায় পেয়েছে। মাঝে মাঝে মঞ্জরী ভাবে ফ্ল্যাটটা মন্দ নয়। কিন্তু যদি রং করে ঠিকভাবে সাজানো সাধ্য হত।

চাতালের একপাশে খাওয়ার ব্যবস্থা। নেহাত যাঁরা মেঝেয় বসতে পারবেন না, তাঁরা চেয়ার-টেবলে বসবেন। বেশী লোক বলা হয় নি অবশ্য।

মঞ্জরীর প্রাণে বেজায় আনন্দ আজ। দু'-দুটি উপযুক্ত পুরুষ আসছেন পার্টিতে আজ পমেটমের বস্ মিষ্টার সানিয়াল, আর মঞ্জরীর মন নৃত্য করে আনন্দে; নেবু নিয়ে আসছে নরেন সোমকে। বিদ্বান, ভাল চাকুরে, অকৃতদার।

একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবেই। বয়স চৌত্রিশ পূর্ণ হয়ে যায়। একটা চাকরি ছাড়া আশা-ভরসার কিছু নেই। বৃদ্ধ বয়সে দেখবে কে? রোগ হলে কথাই নেই।

হাল্কা মেঘের পাখায় ভর করে মঞ্জরী ছুটোছুটি করছে কাজের প্রয়োজনে। মনে হচ্ছে একজন বছর তেইশের মেয়ে, চৌত্রিশের মধ্যবয়সী নয় সে।

খপ্‌খপ্ শব্দ করে উঠছে কে? ঘরের, চাতালের সমস্ত আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল মঞ্জরী। নেবু সর্বাধিকারী এসেছে বন্ধু নরেন সোমকে নিয়ে।

ভদ্রলোককে দেখে চেয়ে-চেয়ে মঞ্জরী। থ্যাবড়া ও মোটা ভদ্রলোক, মুখখানা চওড়া চ্যাপ্টা কিন্তু ভালমানুষী মাখানো। বেঁটে নয়, কিন্তু মোটা বলে বেঁটে লাগে। চৌকোগোছের চেহারা। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। পোশাক পারিপাটি, কিন্তু চোস্ত নয় বিশেষ।

সব থেকে লক্ষণীয় ভদ্রলোকের পা দু'খানা। নৌকোর মত একজোড়া জুতো লেগেছে, এতই বড় পদযুগল। তৎক্ষণাৎ মঞ্জরী তাঁর নামকরণ করল 'ব্যাঙ সাহেব'।

ফরাস পাতা আসর দেখে ভদ্রলোক একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আরও দু'-একজন এসেছেন অনুরূপ পোশাকে ভদ্রজন। মেয়েদের বেশী বলে নি মঞ্জরী। অকৃতদার পুরুষ পার্টিতে এলে তার সেটের মহিলারা কেমন জঙ্গলে শিকারীর মত হয়ে যান। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নখ-দাঁত সমস্ত ব্যবহার করে আয়ত্তে আনতে চান। সকলেরি মনে মনে মঞ্জরীর মত ভয়। পড়ে রইলাম বুঝি, বাসটা মিস্ করলাম বুঝি!

মঞ্জরী নরেন সোমকে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, "সো!" অর্থাৎ নরেন সোম তেমন-তেমন হলে নেবু ভরসা করে মঞ্জরীর দৃষ্টিগোচরে আনত কি?

অন্যদের দেখাদেখি ব্যাঙ সাহেব বিরাট পা দু'খানা জুতো মুক্তান্তে মোজা পায়ে ঘরে বসলেন। মনে মনে মঞ্জরী বলল, 'ওর নিজের বসবার চেয়ে বেশী জায়গা লাগল পা দু'খানির। এখানেই বসে থাকো। চাতালে সানিয়ালকে বসাব।'

মিষ্টার সানিয়াল এসে হাজির সান্ধ্য পোশাকে। তাঁকে বাইরে চাতালে বসানো হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ সাহেবকে ফেলে নেবু সেখানে চলে গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখল নেবুকে মঞ্জরী। নানা রং-এ ছোপানো ইন্ডিয়ান সিল্কে দারুণ মনোহারিণী দেখাচ্ছে। মেকাপ্ অপরিসীম বলাই বাহুল্য। সর্বোপরি হেয়ার-ডু। নিজের খাটো চুলে হাত বোলাল মঞ্জরী। চুল কেটে ভুল করেছে। হেয়ার ড্রেসিং স্যালুনে যেয়ে নিত্য-নবীন চুল-সাজানো যেত বম্বা চুলে। অবশ্য খরচের প্রশ্ন আছে। রিং দিয়ে, নকল চুলে এবার চেষ্টা করে দেখবে সে।

নেবুকে বলার ইচ্ছে ছিল না মঞ্জরীর। নেবু কতকগুলো ঔষধ কেনায় প্রকান্ড কমিশন পেয়ে মনটা দিল-দরিয়া হয়ে গেল হঠাৎ। — পমেটমের কথাও মনে পড়ল, "দিদি, তুমি কখনও তেমন মেয়েদের ডাকো না। মিষ্টার সানিয়াল ভাববেন কি? অন্তত দু-একজনকে দেখাও। পার্টিতে ভালো মেয়ে না থাকলে ফ্লপ্ করে পার্টি।"

নেবুকে তাই বলে বলেছিল সে, অবশ্য পরে পাকা কথা কনফার্ম করবে ব্রহ্মাস্ত্রটি হাতে রেখে। কিন্তু নেবু নরেন সোমকে আনবে শুনে পাকাপাকি নেবুকে বলতেই হয়েছে।

পমেটম জানবে কেমন করে যে, অমায়িক ভদ্র এই সেটের মেয়েরা উপযুক্ত অকৃতদার দেখলেই নিমেষে জঙ্গলের আইন-কানুন বা জাঙ্গল-ল অনুসরণ করে? তখন অন্য মূর্তি এদের। নাক বোঁচা থাকলেও দিব্যি তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, চোখে ইস্পাতের উজ্জ্বল ঝিলিক খেলে। হঠাৎ যেন ওজন থাকে না দেহে, পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর-করা ব্যালে নৃত্যছন্দে দোদুল্য তারা, জুতোর ক্ষেপ্ হেলেদুলে। সর্বদিকে যেন বেপরোয়া। কে কার মনোনীতকে টেনে নেবে, কে কার গলায় ছুরি বসাবে!

মরীয়া এই মেয়েগুলিকে চেনে মঞ্জরী ভালো করে। সে নিজেও ওই দলে কি না!

নেবুর দিকে চোখ রেখে রেখে সকলকে আপ্যায়ন করছে মঞ্জরী। কমলাকে বলেছে, কাকীমার বোন, কলেজে ইংরেজী পড়ায়, অতি ভদ্র ও শালীন, অতএব সেকেলে। সে মনে করে ভিক্টোরীয় যুগের নারীকে অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য। কমলাদি কী নিদারুণ বোকা মেয়ে! মঞ্জরীকে উপদেশ দেয়, "জানো, সেই পুরনো কথাগুলো? মনে রেখ, When a lady says no, she means perhaps; when a lady says perhaps, she means yes. When a lady says yes, she is no lady."

শোন কথা, কোন্ মান্ধাতাকালে কোন্ নীল-নয়ন নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে উক্ত আলোচনা করত, হাসত তারা। নানা বন্দরে জাহাজ চালিয়ে দেশে ফিরে 'বিনত-ভুবন-বিজয়ী নয়না' ললনাকে বিবাহ করে দিব্য আয়েসে কাল কর্তন করত। সেদিন আছে না কি?

তুমি কমলাদি, বয়সে আমার চেয়েও বড় হয়ে তো তাকে তোলা রইলে। ওসব কথা আমাদের জন্যে নাকি? পল রোবসনের গান রেকর্ড শোন নি "Oh, no John, no?" লর্ডের মেয়ের ওসব নিয়ে চলে, আমাদের মত খেটে-খাওয়া মেয়েদের নয়।

কমলার মাথাটা ধরেছে। কলেজে রোমান্টিক যুগের ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়ে এসেছে শেষ ঘন্টায়। চীৎকার করতে করতে মাথা ব্যথা। গোড়ার দিকে বাংলা শিক্ষার মাধ্যম রাখায় কলেজে ইংরেজী ভাষায় পড়ানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণ কথাগুলোও বোঝে না ছাত্র-ছাত্রী। অথচ প্রিন্সিপাল বলেছেন, "লিখতে হবে ইংরেজীতে, ইংরেজীর অধ্যাপকেরা যেন বাংলায় পড়িয়ে অভ্যাস খারাপ না করে দেন।"

মাথা ধরে বিমর্ষভাবে বসেছে কমলা। মঞ্জরীর বাড়ীর আবহাওয়া তার ভালো লাগে না। মঞ্জরীকে ভাল লাগলেও। কিন্তু মঞ্জরী দিদির ভাসুরের মেয়ে। কুটুম্বস্থলে 'না' করা যায় না। আজ আবার ককটেল পার্টি। দেখ তো কান্ড!

বিশেষভাবে সুরা বর্জন করে চলে কমলা। গোঁড়া বাড়ীর মেয়ে, তায় শিক্ষাবিদ। কমলার পক্ষে অস্পৃশ্য উগ্র পানীয়। চোখে চোখে ইসারা হয়ে গেল পমেটম আর মঞ্জরীর। তিনটে বাড়ীর পরের রঞ্জনাও এসেছে। বাল্যবিবাহে সে চিহ্নিতা। একটি মেয়েও আছে। সুন্দরী হলেও নিরাপদ। স্বামী যথেষ্ট রোজগারী ও প্রেমিক এখনও। সম্প্রতি টুরে গেছেন। তাই কান্তবিহনে একাকিনী কান্তা এসেছে, মেয়েটিকে বাড়ীতে শাশুড়ীর হেফাজতে রেখে।

রঞ্জনার সঙ্গেও দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল এদের দু'জনের। এদের বাড়ী ক্রমাগত

বাতায়াত রঞ্জনার। মঞ্জরীর সে বন্ধু।

মঞ্জরী এক গ্লাস পানীয় তুলে দিল কমলার হাতে।

"এটাতে নিশ্চয় কিছু মেশাও নি?" জিজ্ঞাসু কমলা।

"পাগল নাকি? তুমি যে ড্রিঙ্কটা টিটোট্যালার জানি না নাকি? সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক দিয়েছি মাত্র। খেয়ে নাও, গলা কাঠ করে শুকিয়ে এসেছে তো বকে বকে এতক্ষণ।"

সত্যই কমলার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে একচুমুকে শেষ করে ফেলল শীতল, সুস্বাদু পানীয়। গলা ঠাণ্ডা হল, শরীর ঠাণ্ডা হল, মনও জুড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথাধরা অদৃশ্য। এক হাতে কপাল টিপে অন্য হাতে গ্লাস ধরেছিল সে। মাথাধরাটা ছেড়ে যেতে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ক্রমে ক্রমে সেই প্রফুল্লতা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ছোট ঘরটি অতিক্রম করে।

আকাশ ছেয়ে গেল প্রসন্নতায় যেন। সর্বপ্রসন্ন। কমলার হঠাৎ খুব ভালো লাগতে লাগল। এরকম পার্টিতে দায়ে পড়ে যে সে এসেছে, একথা মনে হয়ে ওর হাসি পেল সে কেন অনিচ্ছুক ছিল? চমৎকার পার্টি।

হাসতে লাগল কমলা। প্রাণভরে হাসল। পরবর্তীকালে আহারের সময়ে নিজের খাবার পরিমাণ ও রুচি দেখে সে চমৎকৃত। মাটির খুরিতরা মাছ-মাংস-সুপ প্রচুর ছিল। দেখে কমলা প্রথমে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু চেটেপুটে খেয়ে উঠল সে। কোন দিন এত চমৎকার খাদ্য সে বোধ হয় খায় নি, এমনটি প্রতীয়মান হল কমলার কাছে।

সমস্তই ভালো লাগতে লাগল। এমন কি পাশে বসা বিরাট পদযুগল সমন্বিত ব্যাঙ সাহেবকে পর্যন্ত। নরেন সোমের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় মেতে গেল সে।

মঞ্জরী নিশ্চিন্ত। ওর অভ্যাগত, যতই এখন অবাঞ্ছিত হোক না কেন, অতিথি তো বাড়ীতে। নরেনের দায়িত্ব সাময়িকভাবে কমলার ওপর অর্পিত। এতএব মুক্ত সে। নেবুর গতিবিধির দিকে চোখ রাখা চলবে।

নেবু হেলে বসেছে দেখা মিষ্টার সানিয়ালের গায়ের ওপর যেন। হা-হা হাসির বিরাম নেই। পানীয় মাহাত্ম্যে গাল দুখানি লাল।

খাবার দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে মূর্তিমান ভগদত্ত বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য উপস্থিত। যথাসাধ্য সজ্জা করালেও ছাপ পড়ে গেছে, ছোট রাস্তার অনাহুত এলাকার ভৃত্যের ছাপ। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাতালে গলা বাড়িয়ে চাপা ভাঙা গলায় ডাকল, "দিদিমণি।"

"কি?" বিরক্ত মঞ্জরী এগিয়ে যায়।

ফিস্‌ফিস্ করে এদিক-ওদিক চেয়ে মঞ্জরীকে জানাল ভৃত্য, "বাবু মাংস কম দেখে রাগ করছেন।"

তাই তো! এখনি সিংহনাদ উঠবে খাদ্য না পেলে মনোমত প্রাচুর্যে।

"চুপ, আমার বাটি থেকে ঢেলে দে খানিকটা।"

নিজের বাটিতে কমই নিয়েছিল মঞ্জরী—অল্প করে দিয়ে বলেছিল, "কমটা আমাকে দিও খেয়াল করে।" না, মাংস আরও আনল হোত। দামের জন্য মাংস আগের মত অত আনাতে পারে কই মঞ্জরী? তাই একদিন পেলে বাবার আরও চাই।

সকরুণ বিষণ্ণতায় মঞ্জরীর মন ভরে উঠল। যতই কেন না বিরক্ত হোক, রাগ করুক, বাবার কথা ভেবে মন মঞ্জরীর ব্যথাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে খাদ্য-সংযম নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে ঘরে প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ যাঁরা চান ভালো পোশাক-আসাক করা ও বাইরের ঠাট বজায় রাখা, তাঁদের খাদ্য-সংকোচ করতে হয়। শুষ্কমুখ অতিথি দ্বিপ্রহরে শহরের অপর প্রান্তে থেকে এলেও বড়জোর বিস্বাদ, মিষ্টিবিহীন এক গ্লাস ফ্যাকাসে সরবত রাসায়নিক পানীয় থেকে প্রস্তুত মেলে। পার্টি এঁরা দেন, দিতে হয়। চা বা কফির সঙ্গে ক্ষুদ্রকায় স্ন্যাকস্।

মঞ্জরী এ-দলীয় হলেও সে লোককে নিমন্ত্রণে ডেকে বহুল খাদ্য পরিবেশনের পক্ষপাতী। সে জানে, অতি শৈশবে মফস্বলীয় কনভেন্টে পড়াশোনা করেছে, যে পুরুষের হৃদয়ের দ্বার অনেক ক্ষেত্রে রসনার দ্বার। তাই আজ খাদ্যে প্রাচুর্য ছিল।

কিন্তু বার মাসের খাদ্যে সংকোচ পিতাকে সতত ক্ষুধার্ত ও খাদ্যান্বেষী করে ফেলেছিল। বাড়ীতে ভোজকাজ কমই হওয়ার দরুন যেদিন হতে পিতা সকাল থেকে উৎফুল্ল থাকতেন। কিন্তু খাদ্যে ঘাটতি পড়লে গুহাশ্রিত অলস সিংহ গর্জন করতেন।

"কালের মধ্যে দুই, খাই আর শুই"—নিজের মনে বলেই মঞ্জরী অনুতপ্ত। যেটুকু লেখাপড়া ঠাটঠমক সবই তো ওই অধুনা বেকার বৃদ্ধ বাবার পয়সায়। আজ সামান্য একটু মাংসে বৃদ্ধ লোভ দেখাচ্ছেন বলে সে বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু—চোখ ভরে জল এল মঞ্জরীর,—এই তো সেদিনকার কথা, বাবা একহাঁড়ি আমসন্দেশ হাতে ফিরে ডাকছেন, "ও খুকী, কোথায়? শীগ্গির আয়, খাবি আয়।"

তখনকার আমসন্দেশে আমের আস্বাদ মিলত, এখনকার মত কেবল আকারে আম নয়। কোথায় যেন বিশেষ সন্দেশ পেয়ে বাবা এনে হাজির। ভালবেসে নিজের হাতে আগেই আদুরী মেয়েকে দিয়েছিলেন। আজ এতদিন পরে আনা সামান্য মাংসে বাবার লোভ দেখে মেয়ে চটে গেছে!

আত্মসংবরণ করে মঞ্জরী চাতালে এগিয়ে সানিয়েলের কাছে গেল। দু' রাউণ্ড ড্রিঙ্ক দেওয়া হয়েছে, এখন খাদ্য আনা যাক। নীচে সকলের জায়গা করে দিয়ে কাউকে কাউকে টেবল-চেয়ারে বসাতে হবে। সানিয়াল অন্যতম। যে-কোন প্রকারে হোক, নেবুকে হটিয়ে পাশে মঞ্জরীকে বসতে হবে। কিন্তু হায়রে কপাল, হোস্টেস হওয়ার গৌরবে প্রায় সকলকেই দেখতে হয় যে। এমন কি ব্যাঙ সাহেবকেও।

আপাততঃ রঞ্জনাকে রেক্যুইজিশন করা যাক। নেবুকে এমন করে ফিল্ড ছেড়ে দেওয়া যায় না। রঞ্জনাকে ডেকে দিয়ে পরিস্থিতি রোখাতে তৎপর হল মঞ্জরী। কি শয়তানি! ব্যাঙ সাহেবকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের পথটা পরিষ্কার করে নেওয়া। নইলে জীবনে যা করে না তাই করল নেবু। একজন অকৃতদার চাকরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এল।

আমার কপালটাই মন্দ। বর্ণনা শুনে কত কি ভেবেছিলাম। এখন দেখছি ষোল কড়া কানা।

খাবার আয়োজন করার উদ্যমে মঞ্জরীর ক্ষোভ ধামাচাপা পড়ল।

মঞ্জরীর পার্টির পটভূমিকায় যবনিকা টেনে দেওয়া যাক।

ব্রেড অ্যান্ড বাটার কল

"কি খবর? দেখাই পাওয়া যায় না! ডুমুরের ফুল!"

"ভাই মঞ্জরী, আমি ডুমুর খাইনে, তুমি আমাকে তারি ফুল বলছ! What you mean?"

"I mean নেবু, তুমি আজকাল করছ কি? তোমার যে দেখা পাইনে।"

"কেন ভাই, আমার দেখা পাবার আর কি দরকার বল? মিলেই তো গেছে—নরেন, নরেন্দ্র, মানুষের মধ্যে ইন্দ্র। উনি পারমিশান চেয়েছেন তোমার বাড়ী যাবার। আমি বলেছি, যাবেন, আমি মঞ্জরীকে বলে দেব।"

"আমার বাড়ী ওঁর যাবার দরকার?"

"বারে, ব্রেড অ্যান্ড বাটার কল। উনি কতবড় বিদ্বান, কতবড় চাকুরে! ওঁর এই সমস্ত জ্ঞান থাকবে না?"

"কিন্তু ভাই নেবু, এত বড় বিদ্বানকে তুমি ছাড়লে কেন?"

"ওহো মঞ্জরী, He is not my type, I am also not his type."

"তা হলে উনি কি আমারি টাইপ?"

"কেন, মন্দ কি? তুমি হচ্ছো সিরিয়াস লোক, উনি হচ্ছেন সেই পেশেন্ট গবিন্দ টাইপ। থ্যাকারের ভ্যানিটি ফেয়ারে এমেলিয়া তুমি। গবিনেরও পা দুখানা বড় ছিল, না ভাই?"

এবার মঞ্জরী হেসে ওঠে, "এসো, এক কাপ কফি খাওয়া যাক। তোমার গাড়ী কোথায় আজ?"

"কারখানায়। I'll get a taxi."

কফির পেয়ালার উপর দিয়ে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন পাঠাল মঞ্জরী, "সানিয়ালের সংগে কতদূর?"

"কি আবার? ছাই!" ঠোঁট উল্টোয় নেবু।

"তা বটে! পমেটম বলেছে, এর মধ্যে একদিন তুমি অফিস থেকে ওঁর বস্‌কে গাড়ীতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন গেলে।"

"So what? লোকে আলাপীদের সংগে বেড়াতে যায় না?"

মঞ্জরীর মুখ চাপা রাগে লাল। উত্তেজনা হলে সর্বাগ্রে গলাটি ধরে যায় ওর। সে ভাংগা গলায় বলে, "কিন্তু আমারি পার্টিতে ওর সংগে তোমার আলাপ—এটা মনে রেখো।"

"So what?" নেবুরও মুখে লালিমা।

"আমাকে বাদ দিয়ে ওর সংগে তোমার ডেট করা উচিত না কি?"

হা হা হাসি হেসে নেবু বলে, "তুমি এখনও এত সেকেলে কেন? আমি তো একটিকে দিয়ে এসেছি বদলী। নরেন সোম, বড় চাকরি, বিরাদান, ব্যাচিলর, আর কি চাও? তোমাকে দেখা অব্দি পাগল হয়ে গেছে। টোপ গিলে ধড়ফড় করছে। ধড়ফড়, ধড়ফড়।" নেবু হাত নেড়ে কাৎরিয়ে কাৎরিয়ে দেখায়।

মঞ্জরী রাগের মধ্যেও হেসে ফেলল, "ছাটি বেছে নিয়ে ওই থপ্‌থপে ব্যাঙ-সাহেবকে আমার ভাগে—"

মঞ্জরীর হাসি দেখে নেবু যেন বেঁচে গেল। গা দুলিয়ে হাত দুলিয়ে আধো-আধো স্বরে আবৃত্তি করল—

"ও কে আসে থপথপিয়ে,
বেড়ায় সে যে দপদপিয়ে—"

"ও কি!" অবাক হয় মঞ্জরী।

"ডিয়ার, আমার বৌদি এক নূতন আয়া এনেছে বেবির জন্যে। বলেছিলাম ডার্টি বাংগালী রেখো না, রেখো না; নেপালী রাখ। কিন্তু ওর মামা হরিনাভির জমিদার—বাড়ী থেকে এক রেচেড্ ঝি হাজির করল। সে বেবিকে এই সমস্ত ছড়া বলে।"

"বেবি যদি তাতে খুশী হয় তোমার আমার আপত্তি কি? কিন্তু কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ যে বড়?"

নেবু গম্ভীর হয়, "মঞ্জরী, I am game, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নেমে যাও। আমার আপত্তি নেই—থাকবেই বা কেন? স্বীকার করছি তোমার পার্টি থেকে সানিয়ালের সংগে আলাপ। তোমার পক্ষেই তো সুবিধা বেশী, পমেটমের বস্।"

"কি যে বল? তাতেই তো অসুবিধা। কখন কি হয়, চট্ করে বেচারীর কাজটি চলে যাবে।"

"পাগলা!" মঞ্জরীর লাল-লাল গালে একটা টুসকি দিয়ে নিঃশেষিত কফি-কাপ নামিয়ে নেবু বলল, "আমি চলছি। Next time I pay. বাই-বাই।"

"কোথায় যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি?" সন্দিগ্ধ মঞ্জরী প্রশ্ন করে।

"যাচ্ছি—that's a secret. নরেনের প্রতি দয়া দেখিও।"

হাত নেড়ে নেবু অদৃশ্য।

কফি-কাপ নামিয়ে টাকার ব্যাগ বের করল মঞ্জরী। নেবু নিশ্চয় আজও সানিয়ালের সংগে আউটিং-এ যাচ্ছে। অবশ্যই যাচ্ছে। তাই এতটা গোপনতা।

অথচ নরেন সোমের বর্ণনা নেবুর মুখে শুনে ভুল করে সে নেবুকে ডেকেছিল। হায়, হায়, এমন প্রাইজ সানিয়াল হাতছাড়া হয়ে গেল!

এখন বাড়ী ফিরে চির বুভুক্ষু বাবার চাহিদা মেটানো মায়ের ঘ্যান-ঘ্যানানি শোনা টমটমের হা-হুতাশ, একটা চান্স্ সে পাচ্ছে না। পমেটমের প্রোমোশন হচ্ছে না। বাড়ীর নিরানন্দ দেওয়াল থেকে এক অশ্রুত কান্না উঠে আসছে, মঞ্জরী, তুমি চিহ্নিত হয়েছ ব্যর্থতার, বিফলতার জন্য। তোমার মুক্তি নেই। তোমার মুক্তি নেই। ওখানেই সংসারটাকে গলায় গেঁথে মরে যাবে তুমি। ঝুলের মত গোটা জীবন তোমার কালি হয়ে যাবে। নিরাশার কালি।

সেইদিনই রাত্রি দশটায় টেলিফোন বেজে উঠল।

বাবার আমলের টেলিফোনটি, সে ওঠাতে দেয়নি, রাখার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে হলেও। টেলিফোন না থাকলে মান যায়। মঞ্জরী সেটের সকলে এ ওকে জিজ্ঞাসা করে, "Are you on telephone?"

তখন হ্যাঁ বলতে পারলে কতটা গৌরব হয়? তা ছাড়া ডাকাডাকি নানা পার্টিতে, টেলিফোন না থাকলে ক্ষতি হয়। তাই মঞ্জরী টেলিফোন রাখত, কিন্তু হিসাব করে কল করত। খুবই কড়াকড়ি করত। বেচারী টমটমের যখন-তখন টেলিফোন করার প্রবৃত্তিটা দারুণভাবে শাসিত হ'ত।

এহেন টেলিফোনে রাত্রিবেলা ডাকে কে?

পার্টি না থাকলে মঞ্জরী দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ত। আজও নিজের ঘরে যাচ্ছিল, এমন সময়ে টেলিফোন। টমটম ছুটে ধরল।

"কুড আই স্পীক টু মিস মিটার, প্লীজ?"

"দিদি তোমার।"

টমটম শুতে চলে গেল। টমটম পমেটম একঘরে থাকে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে চাকর নীচে শুতে গেছে। এধার থেকে মঞ্জরীও ছিটকানী তুলে দিয়েছে।

"হ্যালো—"

মঞ্জরীর আহ্বানে অপর দিকে বিনীত কণ্ঠে শোনা গেল, "মিস মিটার, আমি নরেন সোম।"

"এত রাত্রে!" মঞ্জরী কণ্ঠের বিরক্তি গোপন করতে পারে না।

মঞ্জরীর জানবার কথা নয় যে সানিয়ালের সংগে সিনেমায় বসে ইন্টারভালে নেবু উঠে নরেন সোমকে টেলিফোন করে আজই রাত্রে মঞ্জরীর সংগে যোগাযোগ করতে বলেছে। মঞ্জরী নাকি চায়।

বিবেকে বিদ্ধ নেবু অচিরাৎ মঞ্জরীর মন অন্য ভুবনে স্থাপিত করবার আশায় কাজটা করেছিল।

অপ্রতিভ নরেন সোম থতোমতো খেয়ে তোতলাতে লাগল টেলিফোনে এখন, "আ—আ—আপনাকে ব—বিরক্ত করলাম কি—ই?"

ততক্ষণে মঞ্জরী আত্মসংবৃতা।

রাত্রি দশটা, রাত্রি বেশী হয়েছে বলা মানে নিজেকে প্রাচীন প্রমাণ করা। তাড়াতাড়ি সে বলে ওঠে, "না, না। আজ বাড়ীই ছিলাম। অনেকদিন পরে। তাই রাত্রি বেশী হয়েছে ভাবছিলাম। সন্ধ্যারাত্রি মাত্র। বলুন।"

ওপারে নরেন সোম আশ্বাস পেয়ে বলল, "কেমন আছে? সেদিন আপনার ওখানে ভারী আনন্দ পেলাম। একদিন যাব, দেখা করে আসব। কবে আপনার সুবিধা?"

বিরাট পদযুগল সমন্বিত নরেন সোমের মূর্তি মনে পড়ায় মঞ্জরী বিতৃষ্ণায় প্রায় অস্বীকার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সম্মুখে গোটা সপ্তাহ বন্ধ্যা। অগত্যা মঞ্জরী দিন স্থির করে দিল।

ব্যাঙসাহেব

"দিদি, ও দিদি, তোমার ব্যাঙসাহেব আসছেন। বাবাঃ, এই সপ্তাহে কতবার এল, বল দেখি?"

মঞ্জরী বসবার ঘরে বসে পিতা পশুপতির সংগে সংসারের আর্থিক অবস্থা, আয়ব্যয়ের হিসাবের বাজেট প্রস্তুত করছিল গাম্ভীর্যে ও প্রমাদে। কিছুতেই কুলানো যায় না। সংসারের চাকাটা সঠিক চলে কেমন করে যদি ব্যয় আয়ের দেড়া হয়ে দাঁড়ায়?

টমটমের কথা শুনে বিরক্ত মঞ্জরী, কি জ্বালাতন, আজ তো ওর সংগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না।"

পশুপতি নিশ্চিন্তে বসে রাজা-উজীর মারা খেলা খেলছিলেন মেয়ের সংগে। এমন আরামদার বসবার ঘরটি ছেড়ে শোবার ঘরে সহধর্মিণীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি শোনবার ভয়ে

ব্যাঙসাহেবের ওপর চটে উঠলেন, "দূর, দূর! দিনরাত লোকটা যেন আঠার মত লেগে আছে। যখন-তখন টেলিফোনে, 'কুড আই স্পিক টু মিস্টার।' ওই তো চেহারা, মুখে কথা নেই এসে ঘর জুড়ে বসে থাকা চাই।"

চমটম বলে, "না, না, উনি ভালো লোক, দেখতে অমন হ'লেও আমার লটারীর টিকেট প্রত্যেক মাসে একখানা করে কেনেন।"

"তা হলেই হ'ল। অমন উটকপালে লোকের কপালে কিছু জোটে নাকি। ছ্যাঃ! থাকগে, হিসেবপত্র গুটিয়ে ফেল, কাল দেখা যাবে। এখন ও'র সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ কর। প্রায়ই দেখছি আসছে।"

পশুপতি ঘর থেকে বার হয়ে যেতে যেতে অঘটনটার কালো মেঘে সাদা পাড় দেখতে পেলেন। মেয়েকে বল্লেন, "চা-কফি যা হোক একটা লোকটাকে দেবে তো? ওর সঙ্গে আমাকে এক কাপ দিও। গাটা ম্যাজ-ম্যাজ করছে।"

সিঁড়ির মুখে নরেনের সঙ্গে দেখা হোল। পশুপতির চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে—আরে, ব্যাঙসাহেবের হাতে ওটা কি গো? ফিতে-বাঁধা এক বাক্স অ্যাসোরটেড কেক! কতদিন দামী দোকানের কেক-পেস্ট্রি খাওয়া হয় নি।

কাঁচুমাচু মুখে, বিরাট পদশালী ব্যাঙসাহেব সলজ্জ নমস্কার করে বাক্সটি ওঁর হাতে দেয়, "রোজ আমি খাই, আজ আপনার জন্য সামান্য একটু কেক এনেছি। আশা করি রাগ করবেন না।"

নরেনের কথায় কান পেয়ে পশুপতি একটু রাগের ভান করলেন, "না, না, এসব কেন, এসব কেন?"

বাক্সটি হাতে ধরেই অনুযোগ জানাতে জানাতে পশুপতি হৃষ্টচিত্তে গুহায় ফেরেন। নিরাময় বাছা বাছা পেস্ট্রিগুলো রেখে তবে বাক্সটা সংসারে দেবেন।

ব্যাঙসাহেব ঘরের সোফা জুড়ে বসলেন। সাধারণ চেয়ারে ওঁর কুলায় না কিনা! ফোলা-ফোলা মুখে ডোবা-ডোবা চোখ মেলে একদৃষ্টে মঞ্জরীকে দেখছে নরেন সোম। রোজই এমনি করে চেয়ে থাকে, চলে যায়, কিছু বলে যায় না। আবার অচিরাৎ উদয় হয়।

পা-দুখানা গুটিয়ে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় নরেন ব্যস্ত। মঞ্জরী ওঁর কিম্ভূতকিমাকার পা-দুখানি থেকে জোর করে দৃষ্টি ফেরাল, যে কথা আজকাল সর্বদা মনের মধ্যে ফেরে সেটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে ফেলল, "এর মধ্যে নেবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"না, ও আজকাল মিষ্টার সানিয়ালের সঙ্গে ব্যস্ত।"

মঞ্জরী মনে মনে বলল, Like a fool, like a fool—আমি বোকার মত আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল এই লোকটি নানা স্থানে হয়তো ঘুরেছে। বিদেশী ডিগ্রী আছে, বড় কাজও করে। সানিয়ালকে চিনতেও পারে তো?

প্রশ্ন করে সে, "মিষ্টার সানিয়েল দারুণ স্মার্ট, না?"

হ্যাঁ।

"বড় কাজও করেন বেশ ?"

"হ্যাঁ। আপনি তো জানেন।"

স্বল্পভাষী লোক নিজে থেকে কিছু বলবে না। মঞ্জরী এবার মনে যে কথাটি তোলপাড় করছে, সেটাই বলে ফেলল, "নেবুর সঙ্গে বিয়ে হলে খুব মানাবে।"

"বিয়ে? বিবাহিত লোক মিস্টার সানিয়াল।"

"বিবাহিত? অ্যাঁ?" চেয়ার থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠতে গিয়ে যথাকালে মঞ্জরী সামলে নিল. "বিবাহিত? আপনি জানেন ঠিক?"

"আমরা বিদেশে একই শহরে ছিলাম। বিলেত যাবার আগে বিয়ে হয়েছিল ওঁর। শ্বশুর বিলেত পাঠান।"

"তবে ?"

রাশি রাশি চিন্তা মনে উদয় হতে লাগল মঞ্জরীর। সঙ্গে সঙ্গে সানিয়ালের বামতনু অতিবাঞ্ছিত বৈবাহিক যোগ্যতা খসে খসে পড়ল। নির্লিপ্ত ঔদাস্যে মঞ্জরী ভাবল, বাঁচা গেছে।

"স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ বনিবনা নেই। কোন পার্টিতে তিনি সঙ্গে যান না, কারুর সম্মুখে যান হন না। তাই মিস্টার সানিয়াল অন্য মহিলাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। কেউ জানে না উনি বিবাহিত।"

নরেন এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে নির্বাক হয়ে কফি-পাকোড়ার সৎকার করতে লাগল। নরেনের হাতে কেক দেখে মঞ্জরী শুধু কফি দেয়নি।

তাই তো। গমেটম জানবে কি করে মস্ বিবাহিত, কেউ যখন জানে না ? কিন্তু কি বদমাস! নেবুকে নিয়ে এমন করে ঘুরছে ? নেবু জানে না কি? ব্যাঙসাহেব কি বলে নি ?

মঞ্জরী নরেন সোমের প্রতি সহৃদয় হয়ে উঠল লোকটি যতই না কেন অনাকর্ষণীয় হোক, সোজা লোক। সানিয়ালের মত অগাধ জলের মাছ নয়। নরেনকে নেবু জানে কি না জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। কাল সকালে টেলিফোনে দোকানে যেতে বলবে নেবুকে মঞ্জরী। তারপর সইয়ে সইয়ে বলা যাবে।

আহা, বেচারী নেবু কত ব্যথাই না পাবে!

সানিয়াল রঙ্গভূমি থেকে সরে গেছে। নেবু তাকে নিয়েছে, ঠকেছে। ব্যাঙসাহেব, আর যা-ই হোক বিবাহিত প্রতারক নয়। মনটা বিগলিত হ'ল মঞ্জরীর। ব্যাঙসাহেব লোক ভালো। বেচারী নেবু!

নেবু

নেবু কিন্তু মুচকি হেসে বলে, "জানি, মোহন বিবাহিত। তোমার ব্যাঙসাহেব আমাকে বলেছে। So what ?"

মঞ্জরী আকাশ থেকে পড়ল, এতক্ষণ সে ভাবছিল কি প্রকারে নেবুকে সান্ত্বনা দেবে। আফটার অল্, ওরি ভাই গমেটমের বস, ওরি পার্টিতে আলাপ। এমন লোক, যে স্ত্রীকে হারেমে রেখে অন্য বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা জমায়, তাকে আনল কেন মঞ্জরী নিমন্ত্রণ করে? পার্টি দিয়েও তো গমেটমের কোন সুবিধা হয় নি। লাভের মধ্যে বন্ধু নেবু যায়। আমতা-আমতা করে মঞ্জরী বলে, "ভাবলাম নরেন সোম এত কম কথা বলে যে, তোমাকে হয়তো কিছু বলেনি।"

"না, না, আমাকে ক'দিন পথে-ঘাটে মোহনের সঙ্গে বেড়াতে দেখে নরেন আমাকে বলেছিল। নরেন আর মোহন এক সঙ্গে লন্ডনে পড়ত। মোহন খাস অক্সফোর্ডের ছাত্র, নরেন অন্য ইউনিভার্সিটির।"

"জেনে-শুনে তুমি নেবু....."—মঞ্জরীর গলাটা ধরে গেল।

"কেন?" রুক্ষ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছে নেবু মঞ্জরীর মুখে, "আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, মোহনের মত পাত্র পাব কোথায়? ওকে প্রথম দিন থেকেই, পছন্দ হয়েছে আমার। গোড়ায় অবশ্য বিবাহিত জানতাম না। নরেন বলে দিল। তখন মোহন স্বীকার করল। তত্‌দিনে আমরা—" কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেবু কথাটা উহ্য রেখে দিলেও মঞ্জরী বুঝে ফেলল।

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার "নেবু, কি করছ তুমি?"

নেবু স্বচ্ছন্দে হাতব্যাগের আয়না দেখে লিপস্টিক ঠোঁটে ঘষতে ঘষতে অবলীলাক্রমে বলে দিল, "মোহন স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করবে, কথা দিয়েছে।"

"তুমি ঘর ভাঙবে, নেবু? মোহন সানিয়ালের একটা মেয়েও আছে—তার বাবাকে—" ধরা গলায় মঞ্জরী বলার চেষ্টা করে।

"ঘর আবার ভাঙব কি? ঘর তো ভেঙেই আছে। মেয়ে পড়ছে হিলস্টেশনে। সেখানেই থাকবে।"

"এ কাজ কোর না নেবু, আরও অনেক লোকই তো আছে। হাতজোড় করে বলছি। ইস আমারি পার্টি থেকে এই কাণ্ডটা হোল!"

নেবুর চোখে খরদীপ্তি, হাসিখুসী সোসাইটি গার্ল রাতারাতি যেন ম্যাকবেথের ডাইনী বনে গেছে, "তুমি এত সেকেলে, এত প্রুড? তোমার পার্টি থেকে কি হবে? বরঞ্চ, thank your lucky stars, আমি ওকে না সরালে তুমি ফেঁসে যেতে। You softy, you felt like a ton of bricks in his love. তারপর, আর মোহনকে সামলাতে তুমি পারতে না। You are not his class. বেশ করেছি আমি। অনেক লোক আছে, কিন্তু মোহন সানিয়াল একটিই আছে।" এত অপমানসূচক বাক্যে মঞ্জরী চটে উঠল না, নেবুর ভবিষ্যৎ ভেবে মঞ্জরীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে। প্রথমেই সত্য যদি বলত সানিয়াল তবু তার চরিত্র আশা থাকত। মিথ্যা পরিচয়ে নেবুকে ভুলিয়ে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি। নেবু বুঝছে না কি ?

মঞ্জরীর নানাবিধ অনুনয়-বিনয়ে নেবু অবশেষে রাগে জ্বলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, যাবার আগে মঞ্জরীর কানে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল সে, "আমার মোহনকে বিয়ে করতেই হবে। ওর স্ত্রী গোঁসা করে বাবার বাড়ী গেছে। আমি রাত্রে ওর ফ্ল্যাটে থাকি। বাড়ীতে বলি বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি। যে-কোন প্রকারে ওকে বিয়ে করতে হবেই তো, তাই সবই করেছি।"

নেবুর ফর্সা রং-এ লাল আপেলের দ্যুতি, সিফন শাড়ীর সবুজ আঁচল টেনে ব্যাগ ঝুলিয়ে হতবাক, স্তম্ভিত মঞ্জরীর ছোট খুপরি থেকে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়।

মঞ্জরী টেবলে মাথা রাখল। কালিকলঙ্কিত কাঠের টেবলে অশ্রু ঝরতে লাগল মঞ্জরীর। সহসা যেন নেবুর সঙ্গে, মোহন সানিয়ালের সঙ্গে, ওই দলের সকলের সঙ্গে নিজের পার্থক্য সে অনুভব করতে পারল। তার মধ্যবিত্ত নীতি, পাপপুণ্যবোধ এদের কাছে ছেলেখেলা। চুল কেটে, মাস্কারা, লিপস্টিক লাগালেই মঞ্জরী মিত্র নেবু বাসু হয়ে যাবে না। যেতে পারে না। সে কেন এদের সঙ্গলোভে সর্বস্ব খুইয়েছে? নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডি ছেড়ে বিপথে পা না দিলে এমন শক পেতে হ'ত না।

নরেন সোম বোধহয় তারি মত। কিন্তু তার মত ধার করা ময়ূরপুচ্ছে সে নিজের জলুস বাড়ায়নি। সে যা সে তেমনি থাকে। তাই তো ধার করা ছটা না থাকায় তাকে চোখে লাগে না, নেবুদেরকে দেখা চোখে তাকে ধরে না, মনে ধরে না।

সমাধান

অতঃপর দু'মাস কেটে গেল। দূর থেকে নেবুর মধ্যে মধ্যে দেখা পেলেও মঞ্জরী নেবুকে পেল না। নিজের নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রায় কতকটা মানিয়ে নিল মঞ্জরী। পেখম গুঁজে সোসাইটি করার সখও কমে এল মঞ্জরীর। ব্যাঙসাহেব মধ্যে মধ্যে অসত্, প্রতিদিনই প্রায় কিছু খাদ্য উপহার সহ। পূর্বে পশুপতি লোকটিকে দেখতে পারতেন না। এখন কয়েকদিন না এলেই কন্যাকে তাগিদ দেন. "একবার টেলিফোন কর না নরেনকে। কি হ'ল? একা একা ম্যাকে ছেলেটা পড়ে।"

বিষাদে মঞ্জরী ভাবে, আমাদের খাদ্যঘাটতি পূর্ণ করার জন্য এই উপহার, অথবা বেড়াতে এসে প্রত্যহ খাদ্য গ্রহণের বিনিময়ে মধ্যবিত্ত ভদ্র-যুবকের সৌজন্য প্রকাশ? যাহোক, বাবা খাদ্য পেয়ে খুশী। বাবার

এমন দীনতাও আজকাল বিসদৃশ লাগে না। যা তাদের ঘরে স্বাভাবিক, তেমনটি ঘটলে ত্রস্ত হয়ে ওঠে না মঞ্জরী আর। নিজের গৃহের ঊর্ধ্বে পাখা মেলার প্রয়াস কমেছে। ব্যাঙসাহেবও আগের মত হাসির খোরাক যোগায় না। তাকেও মানানসই লাগে, ওর বৃহৎ পদযুগলকেও মানানসই লাগে।

উন্মনা হয়ে কত কি ভাবে মঞ্জরী। নেবুর কথা ভাবে।

মঞ্জরীর ঔষধের দোকানে না এলেও মানুষের ঔষধের প্রয়োজন হয়। চৌরঙ্গীর এক ঔষধের দোকানে নেবুকে ধরে ফেলল মঞ্জরী।

বিকালবেলায় বাসের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল মঞ্জরী। অফিস ফেরত ভিড়ে বাস দুর্গম। খরচ করে মিনিবাসে যেতেই হবে। ব্যাঙসাহেব আবার সন্ধ্যায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছে।

আরে, গাড়ীখানা চেনা যে! একটা লিফ্‌ট পাওয়া যাবে কি? অফিস ফেরতের সুখ-স্বপ্ন। এগিয়ে দেখল মঞ্জরী, নেবুর গাড়ী। নেবু কোথায়? ফিরে তাকাতে দেখা গেল দোকান থেকে প্যাকেট হাতে ভরে নেবু আসছে। এগিয়ে কাছে গেল মঞ্জরী।

একি চেহারা নেবুর? যেন খোড়ো কাক, বেশভূষার বালাই নেই। মঞ্জরীকে দেখে সে দাঁড়াল, কিন্তু সম্ভাষণ নেই।

"নেবু কেমন আছ? কি খবর?"

"খবর?" চিবিয়ে চিবিয়ে নেবু বলে, "তোমারি কথা ঠিক, মিস্ প্রুড্ মোহন বিয়ে করবে না, বড়লোকের মেয়ে বৌকে ডিভোর্স করবে না। স্পষ্ট বলে দিল। একটু আগে ওর বাড়ী যেয়ে দেখলাম বৌ ফিরে এসেছে। ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে দু-জনে চা খাচ্ছে লাভি ডাভি হয়ে। হাঃ, হাঃ লাভি ডাভি, লাভি ডাভি।"

গাড়ীর দরজা খুলে নেবু প্যাকেট রেখে উঠতে উদ্যত। রাস্তায় ভিড়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে মঞ্জরী প্রশ্ন করল, "তুমি এখন কি করবে? কোথায় যাবে?"

"ডাক্তারের কাছে যাব। ভাবনা করো না। আমার টাকা আছে। বাই, বাই।"

হাত নেড়ে গাড়ীতে নেবু অদৃশ্য হয়ে গেল।

বটোহী

রুদ্ধশ্বাসে ফিরল বাড়ীতে মঞ্জরী। কেমন করে কোন্ বাসে ফিরেছে মনে রাখে নি। সমগ্র কাহিনীটির বিকৃত অশুভ রূপটা যতদূর আঘাত দিয়েছে, সে থেকে অনেক বেশী আঘাত পেয়েছে সে, নেবুর স্বাভাবিক, সহজ আচরণে। এ ঘটনায় যেন আশাভঙ্গ ভিন্ন বিচলিত হবার কিছু নেই। টাকা খরচ করে ডাক্তার দ্বারা নির্ভয় হবে নেবু, দারিদ্র এড়াবে সানিয়াল। অতঃপর সমাজের চরকিবাজীর মধ্যে দেখা হলেও উভয়পক্ষে নিশ্চয় সহজতার অভাব দেখা যাবে না। নেবু কত ক্যাজুয়ালভাবে কথা-গুলো বলে দিল! না কি—তীরের মত সংশয়বিদ্ধ করে মঞ্জরীকে—এ ব্যাপার নেবুর জীবনে প্রথম নয়?

কোথায় চলছিলাম? মারাত্মক এক চোরাবালির উপর স্কী-খেলা পাশ্চাত্য ঢং-এ। প্রতি মুহূর্তে বিপদ এখানে, খেলুড়ীদের জানা আছে। সে ছিল নিজে আনাড়ী।

অতি যত্নে নরেন সোমের অভ্যর্থনার আয়োজন করে শোভন বেশে প্রতীক্ষায় বসে রইল মঞ্জরী। কোনদিনও সে এমন করে প্রতীক্ষু ছিল না। ওই যে হাস্যাস্পদ ব্যাঙ-সাহেব, সে এই খেলার জগতে একমাত্র সত্য মঞ্জরীর কাছে।

যথাকালে নরেন সোম এল। আজ এনেছে সংগ্রহ করে কৃষ্ণনগরের সরভাজা। নানা কথার পরে নরেন সোম জানাল, সে অচিরাৎ এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছে।

"সে কি?" মঞ্জরীর মাথায় আজ আকাশ খণ্ড খণ্ড হয়ে দ্বিতীয়বার পড়ল।

"কেন, আমার ট্রান্সফারের চাকরি জানতেন না? অর্ডার এসে গেছে। আমি বটোহী মিস মিটার।"

"বটোহী কি?"

"বটোহী মানে পথিক। পূর্ণিয়ার প্রাচীন প্রচলিত গানের সুর—পথিককে উদ্দেশ করে গাওয়া হত। বাংলাদেশের মাঝি-মাল্লা নিয়ে ভাটিয়ালি যেমন। ওখানে বাংলার নদী কোথায়? তাই পথিক অর্থাৎ বটোহীকে বা বিদেশী, এদের উদ্দেশ করে গান রচনা হ'ত। সতীনাথ ভাদুড়ির ঢোঁড়াইচরিত মানস পড়েন নি? বই-এর প্রথম চরণে গানগুলোর উল্লেখ আছে: "মোরা প্রাণা বসে হিমঘোহরে বটোহীয়া," অর্থাৎ "আমার প্রাণ থাকে হিমালয়ের গুহায়, রে পথিক—"

নেবু কেন নরেনকে বিদ্বান বলেছিল বুঝল মঞ্জরী। জিজ্ঞাসা করল "আপনি খুব ভালো করে সতীনাথ ভাদুড়ির বই পড়েছেন, দেখছি।"

"আমি উল্লেখযোগ্য সব সাহিত্যই পড়ে থাকি। আমার জন্ম পূর্ণিয়ায়, বাবা ওখানে কাজ করতেন। ওই গান আমার রক্তে মিশেছে, আমি পথিক। ঘুরে বেড়ানোতেই আমার আনন্দ। আমার পা-দুটো বড়, ভ্রমণ আমার ধর্ম।"

ব্যাঙসাহেবের নূতন মূর্তি দেখে চমৎকৃত মঞ্জরী। ওর যে মনের নিজস্ব একটা দর্শন থাকতে পারে ভাবেনি কখনও মঞ্জরী। আজ কি তার প্রকৃত জ্ঞান লাভের দিন? নেবুর স্বরূপ, মোহন সানিয়ালের স্বরূপ, অতঃপর নরেন সোমের স্বরূপ আষাঢ়ের সজল সন্ধ্যায় উন্মোচিত হয়ে গেল?

কান্না পেল মঞ্জরীর, নেবুর কথা তুলবে কি না, উচিত হবে কি না ভাবতে ভাবতে সে বলে ফেলল, "যাবেন না, আপনি যাবেন না।"

"কেন মিস্ মিটার? আপনি তো আমাকে 'ব্যাঙসাহেব' বলে ঠাট্টা করতেন, আমি নেবুর মুখে শুনেছি।"

চমকে উঠল মঞ্জরী, নেবু সর্বদিকেই কত-দূর নীচে যেতে পারে? বন্ধুর গুপ্ত কথা বলে দিয়ে বিশ্বাসভঙ্গেও বাধে না নেবুর। সমস্ত পৃথিবীর আগ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে মঞ্জরী যেন বলে উঠল, "না, না, ব্যাঙসাহেব নয়, আপনি বটোহী। পথে যা দেখেন দেখে যান, নিজে জড়িয়ে পড়েন না। কোন কটূক্তিতে আপনার অভিমান নেই। আপনি প্রকৃত পথিকের মতই উদাস, নির্লিপ্ত। আপনি যাবেন না। আপনি থাকুন, আপনি আমার কাছে থাকুন, নরেন।"

নরেন সোম উঠে দাঁড়াল, "তা হয় না। এ পর্যন্ত এমন কথা অনেক মেয়ের কাছে শুনেছি। কেউ আমার জন্যে আমাকে চায় নি, আমার চাকরির জন্য চেয়েছে। সারা দেশ আমি খুঁজে বেড়িয়েছি সেই মেয়েকে যে শুধু আমার জন্যেই আমাকে চাইবে। পাইনি। আমি চললাম, মঞ্জরী।"

বাইরে আষাঢ়ের আকাশে অজস্র বর্ষণ। চম্পা ঝরছে, ঝরছে পঞ্চশরের তূণীরের পাঁচটি তীর। কিন্তু তবু তো বর্ষার বুকের নীচেই ফুটে ওঠে কদম্ব, ফুটে ওঠে জুঁই কেতকী। তারা পথিককে গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে ফিরিয়ে আনতে জানে।

হাত মুঠো করে বর্ষার মেঘের দিকে চেয়ে মঞ্জরী বলে উঠল, "কিন্তু তুমি ফিরবে, আমি জানি, নিশ্চিত জানি। বটোহী, পথিক, তোমাকে আমারি দরজায় ফিরে আসতে হবে।"

—শেষ—

সে আজ বছর দুয়েক আগেকার কথা। আমার জীবনের এক পরম আশ্চর্যের ক্ষণ, এক বিস্ময়কর ঘটনা—যাকে আজো বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারি নে। রাত করে বাড়ি ফেরার পথে বড় ক্লান্তি বোধ করছিলাম।

সমস্ত দিন টো-টো করে ঘুরেছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই সুসম্পাদিত হয় নি। পত্রিকা-অফিসে লেখার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু টাকা পাওনা ছিল, সেখানে ব্যর্থমনোরথ হলাম। প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েও নব প্রকাশিত বই-এর রয়্যালটি বাবদ কিছুই পেলাম না। সুতরাং অখুশি মনে বাড়ি ফিরছিলাম।

বসন্তকালের ঝির্‌ঝিরে দক্ষিণের বাতাস বইছে। রাত দশটার কলকাতার রাজপথে তখনো ভিড়। ট্রামঠাসা, বাস-ভর্তি যাত্রী।

হাজরা রোড পর্যন্ত কালীঘাটের ট্রামে এসেছি। হাজরা রোড থেকে দেওদার স্ট্রীট,—এ পথটুকু হেঁটেই পাড়ি দেব। কিন্তু এক ঝলক মিষ্টি দক্ষিণের হাওয়া আর পার্কের মধ্যে বসন্তের জাগ্রত কিছু ফুল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল আমায়। একটু বসেই যাই না কেন!

যে-বেঞ্চটিতে বসতে গেলাম তার কোণের দিকে একটি লোককে দেখলাম পিঠ-পিছন করে বসা। লোকটির বসবার ভঙ্গী কেমন যেন আমাকে সন্দেহাকুল করে তুলল।

পার্কে আরো বেঞ্চ রয়েছে এবং রাত্তির বলে সেগুলি তখন ফাঁকাও বটে। এ ধারটায় আলো কিছু কম—একটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অন্ধকার। যদিও আমার কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই,—তবুও হাতঘড়ি আর দামী ফাউন্টেন পেনটা অন্তত তো রয়েছে। তাই ঝাপ্‌সা অন্ধকার স্থানে বসতে কেমন যেন একটা ভয় পেলাম—কলকাতায় যা রাহাজানির খবর নিত্যই প্রকাশ পায় তাতে জায়গাটা খুব নিরাপদ বলে বোধ হল না। এর চেয়ে এখানে না বসে বরঞ্চ আর একটু দক্ষিণে আরো দু'-চারজন লোক এখনো যেখানে আলাপ-আলোচনায় রত, সেখানে অপেক্ষাকৃত আলোকিত স্থানে বসে একটু বিশ্রাম নেওয়ার অভিপ্রায়ে যখন এগিয়ে চলেছিলাম তখন পূর্বদিকে হঠাৎ একটি বেঞ্চের একপ্রান্তে পিঠ পিছন করা লোকটি হাত তুলে থামবার জন্যে আমাকে ইশারায় জানাল।

তবু আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম। কী আশঙ্কা ছায়া ছায়া হয়ে আমার মনে ঘনিয়ে এল।

'পরিমলবাবু না? কোথায় চললেন?'

স্পষ্ট পরিচিত এক কণ্ঠস্বর যেন। পিছন ফিরে তাকালাম।

'চিনতে পারছেন না? আমি ডাকছি?'

'আমি? কে তুমি?'—কিন্তু সে-প্রশ্ন আর করলাম না। একটু অগ্রসর হয়ে আহ্বানকারীর কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, বাদামী রং সাহেবী বেশ-ভূষায় আচ্ছাদিত সেই রহস্যময় ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, আমাদের পাড়ার কাছাকাছি কলকাতা কর্পোরেশনের এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্মী নবাগত তরুণ চিকিৎসক ডাক্তার অবনী চৌধুরী। সম্প্রতি ডাক্তার চৌধুরী কালীঘাট অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বদলি হয়ে

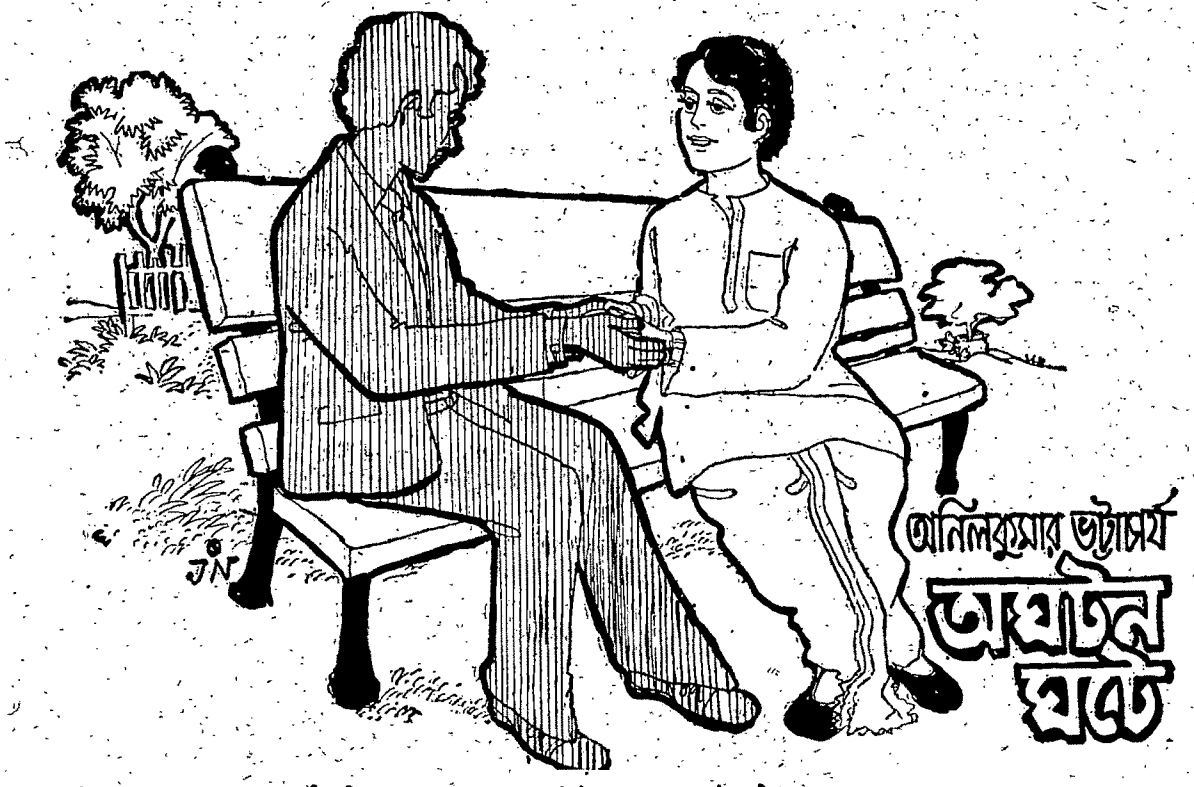

এসেছেন।

বয়সে তরুণ, কিন্তু কিছুটা ব্যক্তিতত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আমারই এক ভক্ত পাঠক বন্ধু তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে কিছুদিন আগে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার চৌধুরীও আমার নাম শুনে এবং আমার সাহিত্যিক- পরিচয়ে বিশেষ যত্ন নিয়ে আমাকে চিকিৎসা করেছিলেন। আমি তাঁর সুচিকিৎসায় অল্পদিনেই ব্যাধিমুক্ত হয়ে তাঁর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম।

তারপরও তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে এই পার্কের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সৌজন্যমূলক শুভ কামনায় কথার আদান-প্রদানও ঘটেছে; কিন্তু

ঘনিষ্ঠতা নয় তাই বলে।'

সন্ধ্যের সময় চা কিংবা কফি পান করে আমি প্রায়ই এসে বসি এই হাজরা পার্কে,—বিশেষ করে পিছনের এই দক্ষিণ দিকটায়। এখানটা খানিকটা নির্জনও বটে; আর কিছু গাছ-গাছালি এবং ফুলের শোভা আমাকে আকৃষ্ট করে।

ডাক্তার চৌধুরীও চায়ের দোকান থেকে একদিন এসেছিলেন এইখানে আমার সান্ধ্য-ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে। তিনিও এ-অঞ্চলের কাছাকাছি নেপাল ভট্‌চায্যির গলিতে থাকেন। শুনেছি, অবিবাহিত। আলাপ-আলোচনায় খুব মাত্রা রেখে কথা বলেন, ভদ্র, শিক্ষিত, সাহিত্য-রসিক তরুণ যুবক। হাজরা পার্কের কাছাকাছি রেস্তোরাঁটিতে রোজই তিনি চা, জলখাবার, কফি খেতে আসেন; কিন্তু নিজেকে ভারি বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। নিত্য চা-কফিপায়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে চায়ের পেয়ালার তুফানে রাজনীতি, সমাজনীতি, থিয়েটার, সিনেমা-যাত্রা প্রসঙ্গের তর্ক-বিতর্কে যোগ দেন না। এখানকার প্রাত্যহিক সমাগতজনের কারুর সঙ্গেই বিশেষ কোন আলাপ-আলোচনা করতে বা মেলামেশা করতে তাঁকে দেখিনি আমি। তাঁর এই স্বভাবের জন্যে তিনি বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারেন, আর আমারও তাঁকে ভালো লাগে এই কারণেই।

ডাক্তার চৌধুরীর কাছে এসে তাঁকে শুভ কামনা জানালাম।

তিনি কিন্তু পিছনের দিকে ঘাড়টি ফিরিয়ে বসেছিলেন।

'চলি তাহলে।'—এই কথা বলে বাড়ি-মুখো ফিরতে যাচ্ছিলাম।

ডাক্তার চৌধুরী বাধা দিলেন, 'এক্ষুণি কেন? বসুন না একটু।'

'না, আজ আর নয়। রাত অনেক হয়েছে'।

ক'টা বেজেছে?"

'রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি।'

'বসন্তকালের রাত দশটা। এমন কী রাত হয়েছে?'

একথার পর সেই বেঞ্চটিতে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত ভদ্রতার খাতিরে আমাকে বসতেই হল তাঁর কাছ ঘেঁষে। আর তিনি তাঁর ঘোরানো পিঠটিকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। এখন আমরা পাশাপাশি মুখোমুখি হয়ে বসলাম।

কিন্তু এ কী! তাঁর মুখাবয়বে সে স্পষ্টতার চিহ্ন নেই কেন? কেমন যেন এক অস্পষ্টতা আর ধোঁয়াটে ভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁকে।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোন আড়ষ্টতা নেই তাঁর। 'আজ আর চায়ের দোকানে যান নি?'

ডাক্তার চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'না, একটু কাজ ছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'ও, তাই আপনাকে আজ দেখিনি।'

ভাবলাম হয়ত সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তা। আমি আর তাঁর এ-কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলাম না।

'আমি কিন্তু আজ আপনাকে খুব খুঁজছিলাম।'

'আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বিশেষ কোন দরকারে কী?'

'ব্যবহারিক জগতের তেমন কিছু দরকার অবশ্য নয়।'

ডাক্তার চৌধুরীর এই রহস্যময় কথার অর্থ সম্যক অনুধাবন করতে না পারার দরুন বললাম, 'কথাটি কেমন যেন হেঁয়ালীর মতন ঠেকছে না?'

ডাক্তার চৌধুরী ফিকে হাসি হেসে বললেন, 'আপনারা তো হেঁয়ালী জগতেরই অধিকর্তা। কত কাহিনী লেখেন, কত হেঁয়ালী-মনের অস্পষ্টতাকে ব্যক্ত করেন।'

'না, তা ঠিক নয়। আমরা সম্পূর্ণ বস্তু-জগতেরই লোক। এই বস্তু-জগতের নানা বিচিত্র মানুষের মন নিয়েই আমাদের পর্যালোচনা।'

আমার কথায় ডাক্তার চৌধুরী এবার বেশ সহজ সরল হলেন। তাঁর অস্পষ্ট মুখাকৃতি ঝাপসা অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে স্পষ্ট হয়ে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। হ্যাঁ, এইবার বেশ চেনা যাচ্ছে তাঁকে। তিনি আমার খুব সুপরিচিত ব্যক্তি।

ডাক্তার চৌধুরী বললেন, 'আপনার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম আলাপ হল সেদিন নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে বোধ হয়েছিল।'

'কারণ?'

'আপনি একজন লেখক, সহৃদয়—আপনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, আপনি আমার কাছের মানুষ।'

ডাক্তার চৌধুরীর এ-কথায় কে না খুশি হয়। তবুও যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করে বললাম, 'আমার সৌভাগ্য।'

'আপনার নয়, আমার।'

ডাক্তার চৌধুরীর কথায় অতঃপর মৃদু হেসে বললাম, 'তাহলে স্বীকার করে নেওয়া যাক—আমাদের উভয়েরই।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে আবার কেমন একটা অস্পষ্টতার আবরণ সৃষ্টি হতে লাগল। আমার পাশে উপবিষ্ট ডাক্তার চৌধুরীর মুখখানি তেমন স্পষ্টভাবে আর দেখতে পাচ্ছি না কেন? দক্ষিণের বয়ে যাওয়া বাতাসেও কেমন একটা শিরশিরে ভাব।

'না, আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আমি একটা বিশেষ অন্তরের কথা শোনাবার জন্যেই আপনার খোঁজ করছিলাম। এখন কী সে কথা শোনবার সময় হবে আপনার?'

ডাক্তার চৌধুরীর এ-কথার উত্তরে বললাম, 'নিশ্চয়ই। অত্যন্ত খুশি হয়েই আপনার কথা শুনবো। আমার অসুখে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কি ভোলবার?'

'সে তো আমার চিকিৎসক-বৃত্তিরশেই করেছিলাম। আই ওয়াজ পেইড ফর দ্যাট।'

'কিন্তু এমন সিনসিয়েরিটি ক'জন চিকিৎসকের ভেতর আজকাল আমরা দেখতে পাই বলুন?'

ডাক্তার চৌধুরী আমার এ-কথায় কর্ণপাত করলেন না। হঠাৎ আবেগের বশে তিনি আমার আরো কাছে সরে এসে হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

শক্ত দু'খানি হাত, হিমশীতল,—আমি ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠলাম কেন?

ডাক্তার চৌধুরী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ও কী? ভয় কীসের? আমি আপনার কোন অনিষ্ট করব না, আপনি লেখক, সহৃদয়, সজ্জন।'

ডাক্তার চৌধুরী তাঁর ঠাণ্ডা এবং কর্কশ হাত দু'খানি আমার হাত থেকে তুলে নিলেন।

'পরিমলবাবু, আমার জীবনের এক গূঢ়তম ট্র্যাজেডির কথা আজ আপনাকে শোনাতে চাই,—যেকথা আর কাউকেই আমি জীবনে বলতে পারি নি। আর সেই জন্যেই আজ আপনাকে রেস্তোরাঁর চায়ের সান্ধ্য-আসরে খোঁজ করেছিলাম। সেখানে না পেয়ে এখানে এসেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।'

ডাক্তার চৌধুরীর কথায় আরো বিস্মিত হলাম আমি। 'কিন্তু সেকথা হঠাৎ আমাকেই বা বলতে চাইছেন কেন? আর তার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে চায়ের দোকানে আর এখানে অপেক্ষা করার কারণ কী?'

'আপনি দু'টি প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন।' ডাক্তার চৌধুরী অস্বাভাবিক গাঢ়স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার কথনের

মধ্যেই আপনার দুটি প্রশ্নের উত্তর নিহিত। প্রথমত—আপনি একজন লেখক। আর আপনার লেখা পড়ে অনুভব করেছি যে, আপনি বিশ্বস্ত এবং অন্তরঙ্গ লেখক। লেখার মধ্যে কোন প্রিটেনশন নেই আপনার। তাই আমার বিশ্বাস, আমার জীবনের এ-কাহিনী অবগত হয়ে হৃদয়বাদে একে ব্যক্ত করবেন আপনার লেখায়। সে-লেখা প্রকাশিত হতে দেখলে প্রকৃতই আমি অনেক শান্তি এবং সান্ত্বনা লাভ করব।'

আমি আশ্বাসের চোখ মেলে তাকালাম, আর পার্কের এই স্বল্পালোকিত রাত্রে আলো-আঁধারের কুহেলীর মধ্যেও ডাক্তার চৌধুরী তা যেন সম্পূর্ণরূপে দেখলেন। আমার প্রতি তিনি যে কতখানি বিশ্বস্ত তা মুখে ব্যক্ত না করলেও তাঁর চোখের দৃষ্টিধারায় তা প্রতিভাত হয়ে উঠল।

'শুনুন তবে।' ডাক্তার চৌধুরী তাঁর কাহিনী আরম্ভ করার আগে আর একবার আমার চোখের দিকে ফিরে তাকালেন।

আমি অনুভব করলাম সে-দৃষ্টিধারায় অন্ধকারের বিষণ্ণতা, কণ্ঠস্বরেও এক সুগভীর বেদনার আর্তি। বললাম, 'আপনাকে বড় পারটাইড় দেখছি আজ। কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে আপনার। থাক না কেন এখন এ-কথা, কাল বরঞ্চ একটু সুস্থ মনে বলবেন আপনার কাহিনী। আমিই দেখা করব আপনার সঙ্গে।'

'এর চেয়ে সুস্থ আর আমায় দেখতে পাবেন না পরিমলবাবু। যে বিষের জ্বালায় জ্বলছি আমি, সে বিষ উদ্গীরণ না করতে পারা পর্যন্ত আমার আর কোন শান্তি নেই। দোহাই আপনার, আপত্তি করবেন না। আমাকে আজই বলতে দিন সে-কথা,—যে-কথা কোনদিনই আর বলবার সুযোগ আমি পাব না'—

ডাক্তার চৌধুরী তাঁর দু'হাত দিয়ে আবার আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন। কী কঠিন তাঁর হাত দু'খানি আর কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা।

ডাক্তার চৌধুরীর দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি থেকে আমার হাত দু'খানি মুক্ত করে নিয়ে বললাম, 'সুরু করুন আপনার কাহিনী।'

ডাক্তার চৌধুরীর গলা কেমন যেন কাঁপতে লাগল। তবু তিনি সুরু করলেন, 'দেখুন পরিমলবাবু, আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। আমার জীবনের সেই প্রথম এবং শেষ প্রেম।'

প্রেমের কথা শুনে উৎসাহ বোধ করলাম, ভয়ও কেটে গেল। বললাম, 'ডাক্তার চৌধুরী, প্রেম তো সঞ্জীবনী সুধা। প্রেম মানুষকে বড় করে। কিন্তু আপনি তার জন্যে এত বিষণ্ণ কেন?'

'তা যে ব্যর্থ প্রেম পরিমলবাবু।'

'কোন প্রেমই ব্যর্থ হয় না ডাক্তার চৌধুরী। যদিও আমার এ-কথাটি উপলব্ধি করা শক্ত, বিশেষ করে আজকের এই ব্যবহারিক যুগে—যেখানে প্রেম শুধুমাত্র দেহজ, শুধুমাত্র কামনার পরিতৃপ্তি, শুধুমাত্র'—

আমার কথার মাঝখানেই ডাক্তার চৌধুরী বলে উঠলেন, 'আমার বেদনা তো পাওয়ার মধ্যেই। যদি তাকে না পেতাম তাহলে আমার অপরিতৃপ্ত কামনা আমাকে প্রতিক্ষণ সাপের ছোবল মারত। কিন্তু পরিমল আমি তাকে পেয়েছিলাম, তার হৃদয়ভরা চাওয়ায় সে আমার আশ্রয় চেয়েছিল।'

'তাহলে আর ট্র্যাজেডি কোথায়?'

ডাক্তার চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে এবার দৃঢ়তার ভাব জাগ্রত হল। প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে তিনি বললেন, 'আমি শুধু

মুক্তি প্রতীক্ষায়!

গতানুগতিক ছায়াছবির জগতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ছবি।

প্রচার পরিকল্পনায়ঃ—দিলীপকুমার ভৌমিক

শিশুসুলভ—সহজ সরল আত্মভোলা জটাধরের আত্মত্যাগের এক সমুজ্জ্বল ছবি॥

বিশ্বপরিবেশনায়ঃ—লালি ফিল্মস্

২ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা—১৩॥

গ্রহণই করেছি; কিন্তু নিজে থেকে প্রতিদানে তাকে কিছুই দিতে পারি নি পরিমলবাবু—এর থেকে ট্র্যাজেডি আর কী থাকতে পারে?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে ডাক্তার চৌধুরী। একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

আমার কথায় ডাক্তার চৌধুরী অতঃপর সহজ, সরলভাবে তাঁর প্রেম-কাহিনী ব্যক্ত করলেন, 'আমার নায়িকা জামসেদপুরের টিস্‌কো কারখানার একজন ফোরম্যান অফিসারের স্ত্রী। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। এমন সৌন্দর্য সচরাচর চক্ষে একটা দেখা যায় না।'

ডাক্তার চৌধুরীর কথা শুনে আমি আগ্রহান্বিত হলাম। এ প্রেম তাহলে পরকীয়া, সাহিত্যের রসদ, কাব্যরসের খনি। বললাম, 'আপনার প্রেমে অনুমান করছি গভীরতা আছে, যদিও সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায় এবং নৈতিক সংস্কারে অসমর্থনযোগ্য। কিন্তু, আমাদের চোখে অবিশ্যি তা নয়।'

ডাক্তার চৌধুরী আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাইতো একথা বলবার জন্যে শুধু আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। কিন্তু বিশ্বাস করুন পরিমলবাবু, আমি তার দৈহিক সৌন্দর্যেই শুধু আকৃষ্ট হই নি। তার প্রতি নির্যাতনই আমাকে তার দিকে টেনেছিল। আমি তাকে তার প্রতি প্রতিদিনের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলাম।'

'পারেন নি তাকে উদ্ধার করতে?'

'না পারি নি। আমি হতভাগ্য, আমি নির্বোধ।'

'কেন?'

'তার আগেই ইহধাম থেকে সে বিদায় নিল।'

'তার মানে এখন তিনি মৃতা?'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন।' আমি এবার স্পষ্টই ডাক্তার চৌধুরীকে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে দেখলাম।

চমকে উঠলাম আমি, 'আত্মহত্যা?'

হ্যাঁ, ডেলিবারেটলি, এ্যান্ড সী টুক পয়জন,—আর আমার ডাক্তারখানা থেকেই সে বিষ সংগৃহীত হয়েছিল। আমি তার কোন প্রতিবিধান করতে পারি নি। এমন কী যে কারণে সে আত্মহত্যা করে তার কোন প্রতিবিধানও করতে পারি নি। হী কাওয়ার্ড আমি!'

'কেমন গোলমেলে ঠেকছে আপনার এ-কথা আমার কাছে।'

আমার মন্তব্যের উত্তরে ডাক্তার চৌধুরী সবিস্তারে আবার বলতে সুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

পার্কে তখন বিশেষ লোকজন আর উপস্থিত নেই। একে একে সব ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বসন্তের আকাশে কোথা থেকে একরাশ মেঘ ভেসে এসে জ্বলন্ত নেশা তারকাদের চোখ ঢেকে দিয়েছে। মাথার ওপর চাঁদের আলো নেই। রাতও বাড়ছে। প্রায় জনহীন পার্ক এখন স্তব্ধতায় থম্‌-থম্‌ করছে। পার্কের এই নির্জন পূর্ব-দিকের গাছ-পালায় ঢাকা একটি বেঞ্চে আমরা দু'জন শুধু পাশাপাশি বসে আছি। একজন বক্তা আর একজন শ্রোতা।

ডাক্তার চৌধুরী বলে চলেছেন তাঁর আত্মকাহিনী।

'আমি তখন ডাক্তারি পাশ করে জামসেদপুরে প্রাক্‌টিস্‌ করছিলাম। পশার তখনো ভালো জমে নি। দু'-একটি রোগী দেখে অল্প-স্বল্প আয়ে কোন-রকমে দিন কাটে। একলা ব্যাচিলার লোক। নিজের ডাক্তারখানার সংলগ্ন কদমা-অঞ্চলে একটি ঘরে থাকি।

আমার সামনে সুন্দর সুসজ্জিত একটি একতলা বাংলোয় থাকেন টিস্‌কো কারখানার এজন অফিসার বিশেষ ব্যক্তি। মোটা, কালো গায়ের রং, কাঠখোট্টা ধরনের চেহারা,—আর অত্যন্ত ম্যাটার অফ ফ্যাক্টের লোক। তাঁর স্ত্রী অনুপমা, —নাম এবং চেহারায় সত্যিই অনুপম। কয়েক বছর মাত্র বিবাহ হয়েছে শুনেছি। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। স্বামী অফিসে বেরিয়ে গেলে একা একাই অনুপমা বাড়িতে থাকে। তার স্বামীকে মাঝে মাঝে নাইট ডিউটিও করতে হয়। অনুপমার ঘরসামাত্র একটি পরিচারিকা।

অনুপমার সঙ্গে আমার কয়েকদিন চোখাচোখি হয়েছে। আমার দিকে চেয়ে অনুপমা কোনদিনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় নি; কিংবা বেহায়াপনাও প্রকাশ করে নি। বরঞ্চ যেন পরিচয়ের জন্যে আগ্রহ প্রকাশের দৃষ্টি মেলে ধরেছে। আমি তার অনুপম দেহ, সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কী তার অপূর্ব কান্তি!! ফরসা টকটকে রং, একরাশ কালো চুল পিঠ পর্যন্ত মেলে সে খোলা ছাদে দুপুরে রোদ পোহায়। হরিণীর মতন আয়ত নয়ন। যৌবন উদ্ভাসিত সারা দেহ ঘিরে। বছর দুয়েক মাত্র বিয়ে হয়েছে শুনলাম, এখনো কোন সন্তানের জননী হয় নি। নরম-মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে ছাদে

ঘুরে বেড়ায়—সকালে স্নান সেরে সূর্য প্রণাম করে, দুপুরের রোদে চুল শুকোয়, সন্ধ্যে এবং রাত্রেও কখনো তন্ময় হয়ে খোলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। আমার ঘর থেকে খোলা জানালা দিয়ে অনুপমাদের ঘরের কিছু অংশও দেখা যায়—যদিও তা ঘন পর্দার আবরণে ঢাকা।

হাওয়ায় পর্দা খানিকটা সরে যায়,—আবার স্বামী ঘরে না থাকলে বাইরের রোদ-বাতাসের জন্যে অনুপমাই ঘরের পর্দা সরিয়ে দেয়। দেখি অনুপমাকে—দেখি তার ঘরের কিছু কিছু অংশও। অনুপমার ক্লিষ্ট মুখ, বেদনাহত দৃষ্টি। কিন্তু কেন?

সে কেনর সম্যক খবর না জানলেও বুঝি ঘরে শান্তি নেই।

স্বামী-স্ত্রীর সংসারে ছুটির দিনে নানা লোকের আসা-যাওয়া। নিত্যকার কর্মের দিনেও সন্ধ্যা এবং রাত্রে দু-একখানা দামী মোটর এসে দাঁড়ায়। স্বামীর অফিসেরই বড় বড় অফিসার শ্রেণীর তরুণ, প্রৌঢ়ের দল। প্রতিদিনের ঘরোয়া এই অনুপমাকে ভিন্ন পরিবেশেও দেখেছি। ঘরে ফ্লাস খেলার তাসের আড্ডায় থাকার পর পুরুষ অভ্যাগতের সঙ্গে বিলাসিনী বেশে অনুপমা বুঝি নৈশ ভ্রমণেও চলেছে। কেমন যেন খটকা লাগে।

এক-একদিন গভীর রাতে অনুপমার কান্নার শব্দও নৈশ বাতাসে ভেসে আসে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনে এমন কী অশান্তির তুষ জ্বলতে পারে। একদিন ঠিক দুপুরবেলায় রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হল।

পাশের বাড়ির সুন্দরী তরুণী বধূটি হঠাৎ একেবারে আচমকা আমার চেম্বারে এসে উপস্থিত। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম এই কারণে যে, আমার ডাক্তারখানা-ঘরে তখন অন্য কেউই আর ছিল না।

বধূ অনুপমা আমার চোখের দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আর্তভরা কণ্ঠে আমাকে বললে, 'সত্যিই নিরুপায় হয়ে আমি আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমাকে আশ্রয় দিন।'

আমি বিস্মিত হলাম। 'ব্যাপার কী?'

অনুপমা বললে, 'বেশি কথা বলার সময় নেই। আমার স্বামী এখন অফিসে। পরিচারিকা দোকান-পসরায় গেছে—এক্ষুণি ফিরবে। আমাকে ঘরে না দেখলে টেলিফোনে স্বামীর কাছে খবর চলে যাবে। আমাকে বাঁচান। এ-নরক, যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি নে। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। এই নিন আমার কিছু গহনা-পত্তর, আর কিছু টাকা-কড়ি। এখুনি চলুন এখান থেকে।'

'কোথায় যাব?'

'যেখানে হোক্! এমন জায়গায়—যেখানে হাঙ্গর-কুমীর নেই। ক্ষুধার্ত-কামার্ত জন্তু-জানোয়ার নেই। আপনি ভয় পাবেন না। আমি স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে গৃহত্যাগ করছি। আমাকে বাঁচতে দিন। বাঁচতে দিন।'—বধূটি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

'কিন্তু আপনার এ-কথার কোন অর্থই আমি বুঝে উঠতে পারছি নে।'

আমার কথায় অনুপমা আঁচলে চোখের জল মুছে বলল, 'আপনি আমার স্বামীর আসল পরিচয় জানেন না। সে নরপশু।'

'মানে?'

'তার চাকরির প্রোন্নতির জন্যে সে আমাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'সে কী?'

'হ্যাঁ, এতদিন তবু বাইরের হাসি-ঠাট্টায় আর যসান্ধ্য-ভ্রমণে তার অফিসের ঊর্ধ্বতন অফিসারের দেহ-কামনার ইন্ধন জুগিয়েছি। কিন্তু আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি নে। আমার স্বামীর আজকের আদেশ আরো ভয়ংকর। সে-কথা মুখে বলতেও বাধে। দোহাই আপনার, আমাকে রক্ষা করুন। আপনার কোন ক্ষতিই আমি হতে দেব না—সব দায়িত্ব আমার। আপনি আমাকে সাহায্য করুন,—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।'

অনুপমার কাঁপা কাঁপা চোখের দিকে তাকিয়ে তবু বললাম, 'আপনি পুলিশের আশ্রয় নিচ্ছেন না কেন?'

'তাতে আর কতটুকু লাভ হবে বলুন? সে-রাস্তা কী আর ওরা না ভেবেই এ-পথে নেমেছে? বরঞ্চ কেচ্ছা বাড়বে তাতে বেশি।'

'আপনার আত্মীয়-স্বজন, বাপ, মা, ভাই—এঁদের জানাচ্ছেন না কেন?'

অনুপমা ডুকরে কেঁদে উঠল আমার কথায়,—'সংসারে আমার আর কেউই আপনজন বলতে নেই ডাক্তারবাবু। বিয়ের আগে ছিলেন শুধু এক বিধবা মা। ভালো চাকুরে ছেলে দেখে সর্বস্বান্ত হয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন আমার—নির্ঝঞ্ঝাট স্বামীর একক সংসারে। বুঝতে পারেন নি কী কাল সাপের হাতে মেয়ে সমর্পণ করছেন। তিনিও আমার বিয়ের পরই মারা গেছেন। এখন আমি নিরুপায়। কেউ নেই আমার ডাক্তারবাবু, কেউ নেই। আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনি সদাশয়—বিবেচনা করেন নি। আপনিই এ-ঝুঁকি নিতে পারেন।'

অনুপমার জীবনের এই মর্মান্তিক কথা শুনে ও আকস্মিক কোন উপায়ান্তর না দেখে স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম—এ-ক্ষেত্রে আমার পক্ষে করণীয় কী থাকতে পারে।

'দেবেন আমাকে একটু আশ্রয়? আপনার তো স্ত্রী-পুত্রের সংসার নেই।'

'কিন্তু সমাজ আছে। আপনার স্বামীর পক্ষে রাষ্ট্রের আইনের সুযোগ-সুবিধে আছে।'

আমার এ-উত্তরে অনুপমা আমার দিকে শুধু একবার স্তব্ধ হয়ে তাকাল; তারপর দ্রুতবেগে আমার ডাক্তারখানার চেম্বার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু যাবার সময় আমার টেবিলে রাখা আসেনিক বিষ ভেষজটি কেমন করে সু-কৌশলে নিয়ে গিয়েছিল তার হদিস্ পেলাম পরদিন সকালে যখন পুলিশ এসে আমার চেম্বারে প্রবেশ করেছে।'

ডাক্তার চৌধুরীর কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'বলেন কী?'

ডাক্তার চৌধুরী বললেন 'হ্যাঁ সঠিক ঘটনার কথাই বললাম আপনাকে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? বধূটি সেই রাত্রেই বিষপান করে আত্মহত্যা করে, কিন্তু স্বীকৃতির লেখনীতে বিষাক্ত ঔষধটির সংগ্রহ কৌশল এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে যায় যে কারণে গুরুতর মামলায় আমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম। নিষ্কৃতি পেয়েছি বটে, কিন্তু পরিমলবাবু, আজো যে তার করুণ কণ্ঠের আশ্রয় ভিক্ষার শেষ আবেদন আমাকে তাড়না করে ফিরছে। অনুপমা নেই; কিন্তু আমি বেঁচে আছি কেন?'

ডাক্তার চৌধুরী আবার তাঁর কঠিন কর্কশ হিমশীতল হাত দুখানি দিয়ে আমার করযুগল চেপে ধরলেন। গলা তাঁর কাঁপছে,—কী এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর তাঁর, 'বলুন, এখন আর আমার উপায় কী? সুস্থ দেহ মন নিয়ে কী করে আমি বাঁচতে পারি?'

কিছুক্ষণের স্তব্ধতায় আমরা দুজনেই ডুবে গেলাম।

ডাক্তার চৌধুরী আবার বললেন, 'আপনি তো একজন সহৃদয় লেখক। আমার এ-জীবন-কাহিনীকে একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন কী?'

পার্কের স্বল্পালোকিত বেঞ্চে নিরালা পরিবেশে বসে ডাক্তার চৌধুরীর পাণ্ডুর মুখখানির দিকে তাকিয়ে আমি তাঁকে আশ্বাস জানালাম, 'ডাক্তার চৌধুরী, আপনি শান্ত হন। সত্যিই বধূটির জন্যে

আপনি কী-ই বা আর করতে পারতেন?'

'একটা নিষ্পাপ জীবনকে তো বাঁচাতে পারতাম পরিমলবাবু।'

'কিন্তু সে অবকাশ আপনি পেলেন কোথায়?'

'ঠিক বলেছেন পরিমলবাবু। মাত্র মুহূর্তের আকস্মিকতায় আমি আমার কর্তব্য স্থির করে উঠবার অবকাশ পাই নি। ঠিক বলেছেন আপনি। আমাকে অনেকখানি সান্ত্বনা দিলেন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাকে।'

'উঠুন, চলুন এইবার বাড়ি ফেরা যাক। রাত অনেক হল।'

আমার কথায় ডাক্তার চৌধুরীর কিন্তু ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। তিনি যেন গভীরতার অতলে ডুব দিয়েছেন। শুধু ইসারায় আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিলেন।

আমি ধীরে ধীরে পার্ক থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

পরের দিন সকাল বেলায় চায়ের টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদের দিকে চোখ পড়তে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে উঠলাম।

একটি আত্মহত্যার সংবাদ। আত্মহত্যাকারীর কোটের পকেটে লেখা স্বীকারোক্তি—'জীবনভার অসহ্যবোধ হওয়ায় আসেনিক বিষ পানে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলাম। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

খবরের কাগজের খবরে দেখা গেল আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিস্বয়ং একজন তরুণ চিকিৎসক। আর সে চিকিৎসকের নাম অবনী চৌধুরী। দক্ষিণ কলকাতা নেপাল ভট্টাচার্য লেনের অধিবাসী। জীবনের প্রতি বীতরাগী হয়ে গত সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, গতকাল রাত দশটায় হাজরা পার্কে যে ব্যক্তি সশরীরে আমাকে তার আত্মজীবনের ব্যথাহত কাহিনী ব্যক্ত করেছে তার মৃত্যু তার পূর্বেই কেমন করে ঘটতে পারে? তবে কী সংবাদপত্রের খবরে সময় নির্ণয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে?

খুবই বিস্ময়কর ঘটনা।

স্থির থাকতে পারলাম না। কালীঘাটে নেপাল ভট্টাচার্যের গলিতে প্রবেশ করতে ডাক্তার অবনী চৌধুরীর এক প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা আমার পরিচিত ব্যক্তি এবং তিনিও তরুণ অবনী ডাক্তারের একজন গুণগ্রাহী পেসেন্ট।

কথায় কথায় তিনি বললেন, "বড়ই দুঃখের কথা, এমন একজন সহৃদয় পরোপকারী তরুণ চিকিৎসক এমনভাবে আত্মবলি দিলেন। আমরা কেউ টেরও পেলাম না, নিঃশব্দে চলে গেলেন মশাই।"

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ঘটনাটি ঘটল কখন?'

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'কাল ঠিক ভর সন্ধ্যের সময়। বিকেলে ও যথারীতি রেস্তোরাঁয় বসে আমাদের সঙ্গে কফি পান করেছেন।'

আমার পায়ের তলার রাস্তার মাটিটা হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। পড়েই যেতাম, ডাক্তার চৌধুরীর প্রতিবেশী বিনয়বাবু আমাকে ধরে ফেললেন।

'কী হল আপনার?'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'কিছু না, হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। আজ কিছুদিন ধরে এইরকম হচ্ছে। ডাক্তার চৌধুরীর কাছে এসেছিলাম প্রেসারটা চেক করাবার জন্যে।'

'চলুন আমার ঘরে। একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর বাড়ি যাবেন।'

তাই যেতে হল। কেননা, সত্যিই আমার চারপাশের বিশ্ববহ্মাণ্ড তখন ঘুরপাক খাচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার কিংবা সুস্থভাবে পথ চলবার শক্তি আমি তখন হারিয়ে ফেলেছি। অথচ মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারছিলাম না যে, ডাক্তার চৌধুরীকে তাঁর মৃত্যুর পর আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ডাক্তার চৌধুরীর পাশের বাড়ির বাসিন্দা বিনয়বাবু আমাকে সযত্নে তাঁর বৈঠকখানার ঘরে বসালেন।

পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বললেন, এই কয়েকমাস আমরা প্রায় পাশাপাশি ছিলাম মশাই। দায়ে-বিদায়ে এমন সহৃদয় চিকিৎসক আর কখনো দেখিনি। হঠাৎ কী যে হল, কেন যে সম্ভাবনাপূর্ণ একটি জীবনের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটল, তার কোন হদিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা—স্টেঞ্জ, মোর দ্যান এ ফিকশন। তাই নয় কী?'

বিনয়বাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু আমি চুপ করেই রইলাম; সমস্ত ঘটনাটি তলিয়ে দেখার মতন মানসিক অবস্থা আমার তখন ছিল না।

বিনয়বাবু আমার পরিচয় জানতেন। ডাক্তার চৌধুরীর কাছ থেকেই শুনেছিলেন আমার কথা। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আপনি তো লেখক, আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন না?'

আমি কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না পূর্বরাত্রির কাহিনী—মৃত্যুর পরও ডাক্তার চৌধুরীকে আমি দেখেছি, মুখোমুখি হয়ে বসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেছি সমস্ত কাহিনী। এমন কী, এমন কী তাঁর হিমশীতল দুখানি হাতের স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করেছি। আর সেই কথা মনে করতেই আবার আমি কেমন যেন আত্মবিহ্বল হয়ে পড়লাম। কোথা থেকে একরাশ অন্ধকার এসে আমার চোখের সামনে দিনের আলোকে মুছে দিল। পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপছে। স্খলিতকণ্ঠে বিনয়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটি কথাই বলেছিলাম,—দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন এ্যান্ড আর্থ।

তারপর কোনরকমে বিনয়বাবুর বাড়ি থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে এসেছি কিন্তু ডাক্তার চৌধুরীকে আর কোনদিনই দেখতে পাই নি। না, এমন কী অনেক রাতে নির্জন সেই হাজরা পার্কের বেঞ্চে বসেও নয়।

লাল ত্রিকোণ

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

সীমা হাসপাতালের দরজার কাছে দাঁড়াল। একাই এসেছে। অমিত আসতে চায় নি, তার কেমন লজ্জা করছিল। সীমার না এসে উপায় নেই। অমিতের মত নিয়েই সে এসেছে। তাছাড়া অমিত সঙ্গে এলে মেয়েগুলোকে দেখবে কে?

সীমা নিজের মনেই হাসল। ওই ছবিগুলো যাঁরা এঁকেছেন, যাঁদের কথায় আঁকা হয়েছে, তাঁরা কি করে জানলেন সব সংসারে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হবে?

সীমার তো পর পর চারটি মেয়ে। যখন নিরিবিলিতে আবার সংসার শুরু করেছে, অমিত আশ্বাস দিয়ে বলেছে—পরের বারে নিশ্চয়ই ছেলে হবে, দেখো—।

আশা মরীচিকা। দ্বিতীয়বারও কন্যা, তৃতীয়-চতুর্থবারেও কন্যা। নাঃ!—আর নয়—অমিত আমতা-আমতা করে বলেছিল—

হাসপাতালের সদর দরজা পার হয়ে ছোট করিডোরের পেছন দিকে লাল ত্রিকোণ চিহ্ন। দরজার পাশে পারিবারিক মঙ্গলের অনেকগুলো উপদেশ লেখা রয়েছে। তার সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা: দুটির বেশী মোটেই নয়। ওপাশে বোর্ডের ওপর হাসি-খুশী দম্পতির একপাশে ছেলে, অন্য পাশে বিনুনী ঝোলানো মেয়ে, নীচে লেখা: ছোট পরিবার, সুখী পরিবার।

প্রথমবার সীমা-অমিতের অনেক আশাকে নিঃশেষ করে মেয়ে হয়েছিল। অভিভাবকরা হাসপাতালে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে? মেয়েও সন্তান—আর আজকালে মেয়েরাও ছেলের কাজ করছে।

সীমা বিছানায় শুয়ে হেসেছে, কিন্তু সে হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটু অভাবের আক্ষেপ রয়ে গেছে। সীমা-অমিত যদি এবার ছেলে হয়?

—ও আশা করে আর কি হবে? চারটে মেয়েকে মানুষ করতে হবে, বিয়ে দিতে হবে—তা ছাড়া আমার শরীরেও আর ধকল সইছে না।

—কি করবে?

—হাসপাতালে যাব, নষ্ট করে ফেলব।

অমিত কোন কথা বলছে না। বলার

মত অবস্থাও নেই তার। সত্যিই তো, যদি এবারেও মেয়ে হয়? সে যা মাইনে পায়, মাসের কুড়ি দিন চলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল আগে, এখন বারো দিনও চলে না। ছোট মেয়েটার জন্যে দুধ কেনার ঝামেলায় মাসে পঞ্চাশ টাকার ওপর খরচ হয়ে যায়। বেবী-ফুড পাওয়া যায় না সময়মত। অফিসের ছুটির পর এ দোকান সে দোকান ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানে হদিস পেলেও হতো দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। লম্বা লাইন; লাইনের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে নিজের মনে ভাবে, বাবা—এত লোকেরও ছেলে-পুলে হয়!

লাইনের শেষে বরাবর দাঁড়িয়ে অনেক কথাই অমিতের মনে হয়। সীমার জন্যে একটু ভাল খাবার কিনে নিয়ে যাবার ইচ্ছে করে। বেচারা, কতদিন ভালমন্দ খায় নি। ক্রমশঃ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আজকাল অমিত ভাল করে বাজার করতেই পারে না, ভালমন্দ কিনবে কি করে? ডাক্তারবাবুরা বলে দিয়েছেন সীমাকে বেশী করে মাছ খাওয়াতে, ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে—আরও কি কি লেখা ছিল প্রেস-ক্রিপশনের নীচে। সবটা পড়তে পারে নি, পড়েও নি। পড়ে কি হবে? খানিকটা পড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়েছিল অমিত। সে কাগজটা আর পায় নি অমিত। জিজ্ঞেস করতে সীমা বলেছিল—জামার পকেট ভালভাবে দেখি নি। কাচার সময় ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। ফেলে দিয়েছি।

অমিত আর কোন কথা বলে নি, বুঝতে পেরেছিল সীমা ইচ্ছে করেই প্রেস-ক্রিপশনটা অকেজো কাগজ মনে করে ফেলে দিয়েছে। ভুলে নয়, বুঝতে না পেরে নয়, পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সীমা বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল, ইংরাজী জানে বেশ ভালভাবেই, এমন কি অমিতের চেয়েও ভাল। সীমা প্রেসক্রিপশনটা পড়েছে বুঝতে পেরেছিল, এ সব করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ডাক্তারবাবুদের দায়িত্ব দিয়ে দিলেই শেষ, কিন্তু সে-গুলো কিভাবে সম্ভব হবে, সেকথা ভেবেও দেখেন না। দেখবার দরকারও নেই। বিলেত ফেরত ডাক্তার। বিলেতে পড়াশুনা করে-ছেন, বিলেতে প্রেসক্রিপশন করতে শিখেছেন, প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছেন, কিন্তু—কিন্তুর পরে যে অনেকগুলো কথা আছে, সেগুলো তারা জানেন না, সেগুলো যে বিলেতে শেখানো হয় না; আর এদেশের সাধারণ মানুষ ওই কথাগুলোর বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে না।

দুধ কিনে বাড়ীতে পৌঁছেই অমিত বলল—এই নাও তোমার মেয়ের দুধ, আর এই প্যাকেটে জমানো মাখন আছে তোমার জন্যে।

সীমা ছোট্ট মাখনের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে আশ্চর্য করুণ মমতা। কোন কথা না বলে, নিঃশব্দে তুলে রাখল সেগুলো।

পরদিন অফিসে যাবার সময় ভাত খেতে বসে অমিত দেখল, গরম ভাত, আলুভাতে, ডাল আর খানিকটা মাখন।

—আমায় মাখন দিলে কেন?

মৃদু হেসে সীমা উত্তর দিল—কি-ই বা দেব বল? শুধু আলুভাতে আর ডাল দিয়ে কি ভাত দিতে ইচ্ছে করে? তাড়া-তাড়ি খেয়ে নাও, ভাত জুড়িয়ে গেলে মাখন দিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে না।

—তোমার জন্যে রেখেছো?

চোখ রাঙানোর ভঙ্গিমায় সীমা উত্তর দিল—আর কথা নয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বাস স্ট্যাণ্ডে লাইন দিয়ে বাসে উঠতে এর পরে দেরী হয়ে যাবে।

বাধ্য ছেলের মত অমিত মাখন দিয়ে ভাত ভাঙল।

—এই! জানো, এ মাসে হয় নি।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে সীমা খবরটা দিল। অমিতের চোখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে এল। আবার সন্তান। পর পর চারটি মেয়ে। তারা সীমার দুদিকে পর পর ঘুমিয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে। দেওয়াল-ঘেঁষা খাটের ওপর বড় অয়েল ক্লথ পেতে শুইয়ে দিয়েছে মেয়েগুলোকে, নিজে শুয়েছে তার পাশে, অমিতকে সীমার অন্য পাশে শুইয়েছে। সীমার ছোট্ট সাম্রাজ্যে সে সম্রাজ্ঞী, সেখানে সে যা বলবে, তাই হবে, অন্য কারুর কথা একেবারে অচল।

—কি হবে? অমিতের অসহায় প্রশ্ন।

—আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল। আর সম্ভব নয়।

—হাসপাতালে! কিন্তু—

—না, কোন কিন্তু নয়। আমাদের আর ছেলে হবে না।

—যদি এবার ছেলে হয়?

—ও আশা করে আর কি হবে? চারটে মেয়েকে মানুষ করতে হবে, বিয়ে দিতে হবে, তা ছাড়া আমার শরীরেও ধকল সইছে না।

—কি করবে?

—হাসপাতালে যাব। নষ্ট করে ফেলব।

অমিত কোন কথা বলল না। বলার মত কিছু নেই। যদি আবার মেয়ে হয়। অমিত অনেকদিন থেকেই ভেবেছিল সীমাকে বড়ি খাওয়াবে, কিন্তু ভরসা পায় নি। অফিসের বন্ধু-বান্ধবদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা অনেক কুফলের কথা বলেছিল, কেউ বলেছিল—ওগুলো খেলে বমি হয়, সহ্য হয় না, কেউ বলেছিল—ক্যানসার হয়, কেউ বলেছিল—ভীষণ মোটা হয়ে যায়।

একা সংসারে সীমা বিপদে পড়ে যাবে বলেই অমিত সাহস করে বড়িগুলো কিনতে পারে নি। নিজেই অপারেশন করিয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু সীমা মত দেয় নি। ওসব অপারেশন করলে শরীর নাকি খুব খারাপ হয়ে যায়। সংসারের যে মানুষটি রোজ-গার করে, সে যদি স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে, তা হলে সংসারের সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। সীমার অপারেশন করতেও অমত ভরসা পায় নি, যদি কিছু ঘটে—এই তো সেদিন শুনছিল—কোন হাসপাতালে লাই-গেশন করতে গিয়ে এক রোগিণী আর বাঁচেন নি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে নানারকম নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন; সেই সব পদ্ধতিতে কোথাও কিছু বেসামাল হয়ে গেলে একটি সংসারের সমস্ত ছন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

—কিন্তু বাচ্চাগুলোকে কে দেখবে?

সীমা একটু চিন্তা করে বলল—তুমি একদিন ছুটি নাও। বাচ্চাগুলোকে তুমি দেখবে, আমি হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসব।

অমিত মত দিল। সীমার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হবে না; অনেক স্বস্তি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু, নার্স দিদিমণিরা এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন, মনে হয় আগন্তুক দম্পতি যেন ফাঁসির আসামী। যেসব প্রশ্ন করেন, তার উত্তর দিতে রীতিমত লজ্জা করে, সংকোচ হয়।

—বেশ, তাই হবে।

লম্বা বেঞ্চের এক পাশে সীমা বসল। নাম-ধাম লিখিয়ে দিয়েছে সীমা। নার্স এক এক করে রোগিণীকে ডেকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

সীমার নাম এল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সীমা উঠে দাঁড়াল। ভেতরে ভেতরে বিনবিন ঘামছে। ভয় ভয় করছে। এর আগে এ হাসপাতালে এসেছে সে, কিন্তু এ অবস্থায় কখনো আসে নি। পাপ করছে না তো? সন্তান ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরের দান নষ্ট করলে কি পাপ হবে?

ভেতরের ঘরে এসে দাঁড়াল সীমা। দু'জন ডাক্তার, একজন লেডী ডাক্তার, তিন-জন নার্স রয়েছেন ঘরের মধ্যে।

—কি নাম?

নাম মিলিয়ে নিলেন ডাক্তারবাবু, তারপর ডাক্তারবাবুর নির্দেশে পায়ে পায়ে টেবিলের প্রান্তে দাঁড়াল সীমা। ডাক্তারবাবু যা যা প্রশ্ন করলেন, সীমা এক এক করে সবই উত্তর দিল। ডাক্তারবাবু কনিষ্ঠ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন—সারুখনা

পাম্পে এ কেসটা করে দিতে পারবে না?

—চেষ্টা করব। ছোট ডাক্তার বলল।

লেডী ডাক্তারের দিকে বড় ডাক্তার তাকিয়ে বললেন—তুমিও যাও। এভাবে অপারেশন না করলে তোমরা শিখবে কি করে? যাও—।

নার্সের নির্দেশে সীমা পাশের ঘরে গেল। সে ঘরে আর কেউ নেই। সীমাকে পরিষ্কার করে নার্স অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। সীমার বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপানি। সে ভাবতেই পারে নি, আজকেই অপারেশন হয়ে যাবে। সে ভেবেছিল আজকে পরীক্ষার পর একটা দিন ঠিক হবে, সেদিন অমিতকে নিয়ে আসবে।

—আসুন।

লেডী ডাক্তারের আহ্বান। সীমা শুকনো মুখে জিজ্ঞাসা করল—আজকেই অপারেশন হবে?

—হ্যাঁ—কেন?

—ঠিক তৈরী হয়ে আসি নি কি না—

—ভয় কি? লেডী ডাক্তার হেসে সান্ত্বনা দিলেন—এটা অপারেশনই নয়। ওই যে পাম্পটা দেখছেন, ওটা দিয়ে শুধু পাম্প করে দেব, ব্যস্।

সীমা তাকিয়ে দেখল, পাশে একটা যন্ত্রের ওপর কাঁচের গোল জার বসানো। জারের মুখটা ঢাকা, মুখের ওপর নল লাগানো। সেই নল জার থেকে বেরিয়ে একটা চকচকে সরু ইস্পাতের বাঁকানো নলের সঙ্গে জোড়া। আরও অনেক কিছু আছে যন্ত্রের সঙ্গে। সীমা সেগুলো বুঝতেও পারল না, বোঝার চেষ্টাও করল না।

নার্সের নির্দেশে টেবলের ওপর শুয়ে পড়ল সীমা। চোখ বুজে থাকতে বলেছেন নার্স। বাধ্য মেয়ের মত চোখ বন্ধ করে, চিৎ হয়ে, পা ভাঁজ করে শুয়ে রইল। শরীরের মধ্যে একটা ধাতব নল প্রবেশের অনুভূতি। ক্রমশঃ ভেতরের দিকে যাচ্ছে। ক্রমশঃ গভীরে।

তলপেটে যন্ত্রণা। কী যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে। পাকিয়ে পাকিয়ে যন্ত্রণাটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা। যন্ত্রণার স্তর একের পর এক নেমে এক সময়ে যন্ত্রণার শেষ হ'ল।

—চোখ খুলুন।

নার্সের কথায় সীমা চোখ খুলল। বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল-মুখ ভরে গেছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তলপেটে মোচড় দিয়ে উঠছে মাঝে-মধ্যে।

টেবল থেকে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল। কাঁচের জার রক্তে ভরে গেছে। অত রক্ত বেরিয়েছে।

সীমাকে ধরে নার্স নিয়ে গেলেন আউটডোরের বেঞ্চে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলে সব উপসর্গ কমে যাবে। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর সীমা যখন বাড়ীতে ফিরে এল, তখন সে অনেকটা সুস্থ, অনেকটা স্বাভাবিক।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সীমা আবার হাসপাতালের দরজায়। এবার আর সন্তান নষ্ট করার জন্য আসে নি, এবার এসেছে অতিরিক্ত স্রাবের চিকিৎসার জন্য। প্রত্যেক মাসেই অতিরিক্ত রক্তস্রাব। স্বাভাবিক যাত্রার চেয়ে অনেক বেশী, স্বাভাবিক দিনের চেয়ে অনেক বেশী দিন থাকে। ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে সীমা। ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

আজকাল আর সংসারের ধকল টানতে পারে না আগের মত। মেয়েগুলো কান্না-কাটি করলে সীমার ভীষণ রাগ হয়, আর কয়েকটা চড়-চাপড় দিয়ে নিজে শুয়ে পড়ে থাকে। বেশীর ভাগ দিন অমিত নিজেই ভাত বেড়ে খেয়ে অফিসে চলে যায়।

—কি হয়েছে তোমার? অমিত জিজ্ঞাসা করে।

—কি জানি! সেই যে অপারেশন করিয়ে এলাম, তারপর থেকে কিছুতেই ভাল হচ্ছি না। ক্রমাগত স্রাব হচ্ছে, মাঝে মাঝে বন্ধ থাকছে।

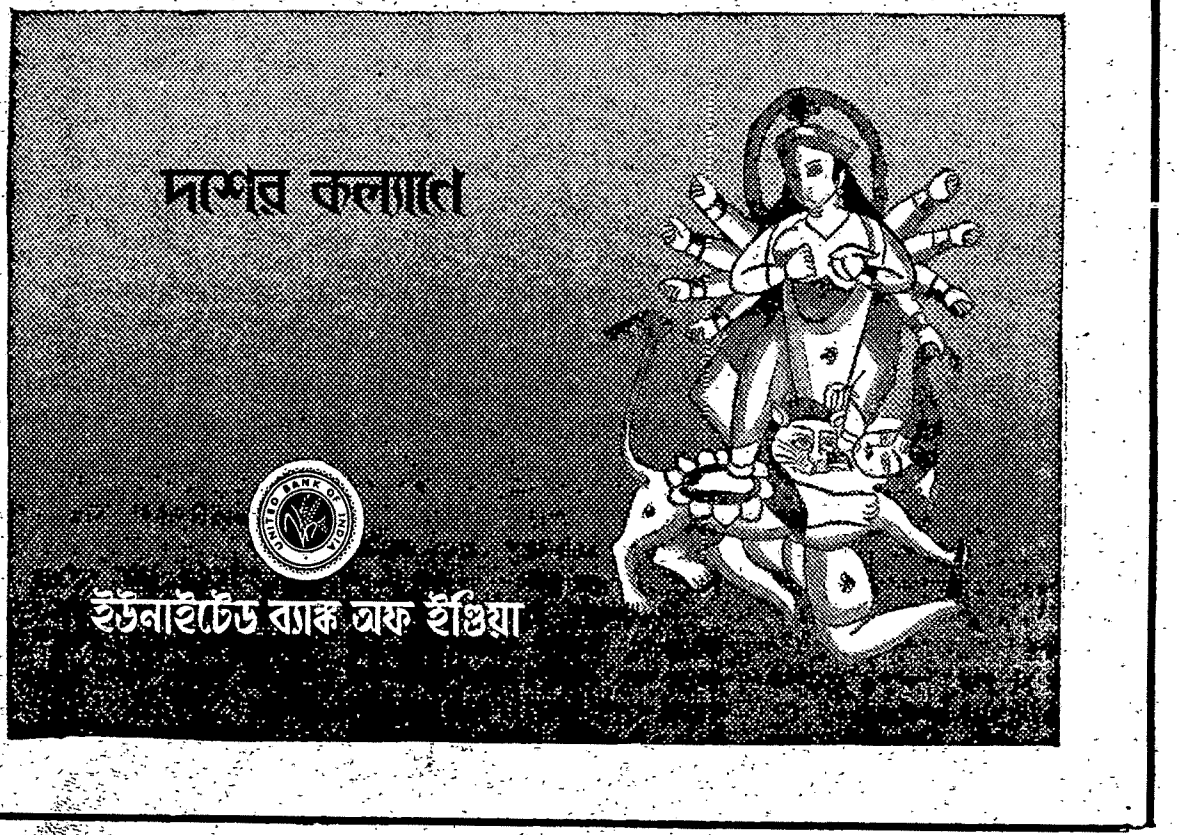

—তা হলে একদিন হাসপাতালে দেখিয়ে এস। আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি দেখব।

সেই ব্যবস্থা করে সীমা আবার হাসপাতালের দরজায় এসেছে। আবার নিজের নাম-ধাম লিখিয়েছে; অপেক্ষা করেছে বড় ডাক্তারের জন্যে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বড় ডাক্তারবাবুর দেখা পেল সীমা। তিনি আউটডোরে

ঢুকতে সীমা বুকে সাহস এনে বলল—আমাকে দেখে দিতে হবে। আমি বড় ভুগছি।

পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে ডাক্তারবাবু সীমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার এ্যাসিস্ট্যান্টদের দেখিয়েছেন?

—না।

—আগে ওঁরা দেখুন। প্রয়োজন বুঝলে ওঁরা আমাকে দেখাবেন।

অগত্যা সীমা জুনিয়রদের কাছে গেল। ওঁদের একজন সীমাকে পরীক্ষা করলেন, তারপর গম্ভীরমুখে বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে কি বললেন। বড় ডাক্তারবাবু, তাঁর সঙ্গে উঠে এসে, সীমাকে পরীক্ষা করলেন, তারপর নির্দেশ দিলেন—আপনাকে ভরতি করা হবে।

ভরতি? হাসপাতালে ভরতি হতে হবে? তা হলে সংসারের কি হবে? কে মেয়েগুলোকে দেখবে? অমিতই বা অফিসে যাবে কি করে?

আকাশ-পাতাল চিন্তাকে মিছিমিছি করে বড় ডাক্তারবাবু সীমার দিকে তাকিয়ে বললেন—সিস্টারের সঙ্গে যান। ফর্মে সই করে ভরতি হয়ে যান।

আজই ভরতি হতে হবে? বাড়ীতে কিছুই ঠিক করা নেই।

—দেখুন! হাসতে হাসতে বড় ডাক্তারবাবু বললেন—হাসপাতালের বেড পাওয়া আর লটারীর প্রাইজ পাওয়া একই রকমের দুর্লভ ব্যাপার। আজ বেড খালি আছে, তাই বলছি। আবার কবে হবে কেউ জানে না। চিন্তার কিছু নেই। ছোট্ট একটা অপারেশন করে দু-এক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেব। সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে আবার ভালভাবে সংসার দেখতে পারবেন।

সীমা আর কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। অপেক্ষারতা নার্সের সঙ্গে হাসপাতালের ভেতরে চলে গেল।

বিকেল বেলায় অমিত শুকনো মুখে দুটিকে কোলে নিয়ে, আর দুটিকে হাঁটিয়ে হাসপাতালে এল। পাংশুমুখে অমিত জিজ্ঞাসা করল—কি হ'ল? তোমাকে এ-ভাবে একেবারে ভরতি করে নিল?

তদোধিক পাংশুমুখে সীমা উত্তর দিল—কিছুই জানি না। একরকম জোর করেই ভরতি করে নিল আমাকে।

ডিউটির নার্স সীমার কাছে ভরতির ফর্ম হাতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—উনি আপনার কে হন?

—স্বামী—

নার্স ফর্মের এক জায়গা দেখিয়ে অমিতকে বললেন—এখানে সই করে দিন।

অমিত কথাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলোল। সে সীমার অভিভাবক হিসেবে ওইখানে সই করবে। সীমাকে অজ্ঞান করে অপারেশন করার অনুমতিপত্র।

অমিত কাঁপা হাতে সই করে দিল। নার্স ফর্মটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন—কাল আপনার স্ত্রীর অপারেশন হবে সকাল আটটায়। আপনি আসবেন।

কথাগুলি শেষ করে নার্স আবার নিজের কাজে চলে গেলেন। অমিত সীমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি করা যায় বল তো?

—এক কাজ কর। তুমি মায়ের কাছে গিয়ে সব বল। আমি যে ক'দিন হাসপাতালে থাকব, মা যেন আমার বাড়ীতে এসে থাকে।

—বেশ, তাই করি।

অমিত যেভাবে এসেছিল, তেমনিভাবেই মেয়েদের নিয়ে চলে গেল।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বড় ডাক্তারবাবু অমিতের দিকে তাকিয়ে বললেন—রিয়েলি আই এ্যাম সরি। প্রথম থেকেই বলেছিলাম, ওসব যন্ত্র দিয়ে অ্যাবরসন করা ঠিক নয়; কে কার কথা শোনে! তিন মিনিটে একটা অ্যাবরসন করতে হবে, তার হিসেব পাঠাতে হবে সরকারের কাছে। তাতে পেশেন্ট মরুক আর বাঁচুক ক্ষতি নেই।

অমিতের জিব শুকিয়ে আসছে। জিবটা যেন মোচড় খেয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। তেষ্টায় বুকের ছাতি শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।

—কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?

বড় ডাক্তারবাবু সহানুভূতির সঙ্গে

বললেন—অ্যাবরসন্ যখন করিয়েছিলেন, তখন প্লাসেন্টার একটা টুকরো জরায়ুর মধ্যে থেকে গিয়েছিল। দ্যাট্ হ্যাজ ক্রিয়েটেড দি মিসচীফ্।

—কি হবে ডাক্তারবাবু? অমিতের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে।

—ডোন্ট বী অ্যাফ্রেড্। আমরা জরায়ুর ভেতরের অংশ পরীক্ষায় পাঠিয়েছি। দিন-চারেকের মধ্যেই রিপোর্ট এসে যাবে। তত-দিন ও হাসপাতালেই থাক। এর মধ্যে দু-এক বোতল রক্ত যদি যোগাড় করতে পারেন, দিয়ে দেব। বড্ড অ্যানিমিক।

—তাই হবে।

অমিত রক্ত ব্যাঙ্কে হাজির হল ডাক্তার-বাবুর অনুরোধপত্র নিয়ে। ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—রক্ত আজকাল ব্যাঙ্কের টাকার চেয়েও দুর্মূল্য। যদি কোন ডোনার যোগাড় করতে পারেন, রক্ত পাবেন।

বিনাদ্বিধায় অমিত নিজের রক্ত দান করল, পরিবর্তে সীমার জন্যে এক বোতল রক্ত এনে ডাক্তারবাবুর হাতে দিল। ডাক্তার-বাবু বললেন—এবার বাড়ী যান। কাল আসবেন।

পরের দিন অমিত হাসপাতালে এসে দেখল সীমা অনেক সুস্থ, অনেক হাসি-খুশি। রক্ত দেওয়ায় সে অনেক চনমনে হয়ে উঠেছে। আরও এক বোতল রক্ত দিতে পারলে সীমা আরও চাঙ্গা হয়ে উঠত। যদি আরও কিছু টাকা যোগাড় করা যেত!

অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে দরখাস্ত করল অমিত। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বাবুরা বললেন—স্ত্রী যখন ভরতি হয়ে গেছেন, তখন সেরে উঠে বাড়ী ফিরলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত করবেন, টাকা পেয়ে যাবেন।

অমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে যদি ফ্রিজ সামলে সীমাকে বাড়ী আনতেই পারে, তাহলে অযথা আর টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করবে কেন?

চার দিনের দিন রিপোর্ট এল। ডাক্তার-বাবুর কাছে যেতে অমিতকে তিনি বললেন—আপনার ক'টি ছেলেমেয়ে?

—চারটি মেয়ে—

—নিশ্চয়ই আর দরকার নেই।

—না—না—

—তা হলে আপনার স্ত্রীর জরায়ু কেটে বাদ দিয়ে দিই।

অমিত কোন কথা বলতে পারল না। ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তারবাবু কণ্ঠস্বরকে জটিলতর করে বললেন—এখন জরায়ু কেটে না ফেললে পরে আর হয়ত পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে না।

অনেকগুলো বিদ্যুতের ঝলক এক সঙ্গে অমিতের চোখের মধ্যে ঝলসে উঠল। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে?

—জরায়ুতে পচন ধরেছে। এক রকমের ক্যানসার। সবে শুরু হয়েছে। এখনও জরায়ু কেটে বাদ দিলে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাবে। যদি ওই পচন ছড়িয়ে যায়, তা হলে আর কিছুই করবার থাকবে না।

—আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

অমিত পায়ে পায়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। হাসপাতালের সামনে বড় বোর্ডের লেখা নজরে পড়ল—ছোট পরিবার, সুখী পরিবার।

বারবার লেখাটি পড়ল, তারপর সে বাড়ীর পথে হাঁটা দিল। এতক্ষণে বোধহয় মেয়েগুলো স্কুলের ছোটে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

আমার বাবা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়িতে ঠাকুরের অভিষেক হয়ে যাবার পর গাছপালা বনের মধ্যে আমাদের অনেকটা ভয় কেটে গেল। কাছেপিঠে নতুন আবাস এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। তেমনি মাঠ পার হলে পুলিশের ব্যারাক, কাছারী দীঘি, বাদশাহী সড়ক—কেবল সেই চৌমাথায় নিমতলার কাছে নিবারণ দাসের বাড়ি এবং তার আশেপাশে আরও সব বাড়ি উঠছে। নতুন কলোনির পত্তন হচ্ছে। সাপ-খোপের উপদ্রব তেমন একটা কমেনি। বৈশাখ শেষ না হতেই জ্যৈষ্ঠ। খরা। ঝা-ঝা রোদ্দুর, মাঠ-ঘাট ঘাস সব হেজে গেছে। মাটি ফেটে চৌচির। মনে হ'ত দুপুরটা এক গনগনে আঁচের আগুনের কুণ্ড। এরই মধ্যে পিলু, কোথা থেকে কোঁচড় ভর্তি করে আম সংগ্রহ করে আনত। ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুর সবই সে সহজে সহ্য করতে পারে।

এখন এই বাড়িতে আমার বাবার সাধ বলতে আর কিছু ফল-টলের গাছ লাগানো। পাঁচ বিঘে জমির সবটা এখনও সাফ হয়নি। উত্তরের দিকে একটা বড় জঙ্গল রয়েই গেছে। বছরের ওপর হ'ল আমাদের এই নতুন আবাস। এখন আর এ জায়গাটাকে মনেই হয় না অচেনা-অজানা, ছুতুড়ে সাপখোপ অথবা শেয়াল-খাটাশের একমাত্র আস্তানা। ঠাকুরঘরটা হয়ে যাবার পর বাবা একদিন দুটো জবা ফুলের ডাল নিয়ে এলেন। তিনি গেছিলেন বেলডাঙ্গার কাছে মহুলা গাঁয়ে। নিবারণ দাসের বড় শ্যালকের বিয়ে। বিয়ের কাজ সেরে ফেরার সময় দুটো জবা ফুলের ডাল সঙ্গে এনেছেন। বিয়ে দিয়ে পেয়েছেন প্রণামীর টাকা আর একটা পুরোহিতবরণ। কিছু চাল-ডাল। অন্য সময় বাবা যখন এ-ভাবে ফিরে আসেন তখন উপার্জনের নিমিত্ত কতদূর যেতে হয়, এমন সব সাধুবাক্য সংকল্পের মতো পাঠ করেই থাকেন। এবারে অন্য রকম। সব কোন রকমে নামিয়ে রেখে হাঁকতে থাকলেন, —ও ধনবৌ, তোমার সুপুত্তুরা সব কোথায়? কাউকে দেখছি না। বাবা ফিরেছেন বিকেলে, তখন কী আর বাড়ি থাকা যায়। এবং বাড়ির পাশে, কোথাও কোন বাড়ি ছিল না বলে, শুধু বন-জঙ্গল ছিল বলে, বনের গাছপালা, লতাপাতা, সরু পথ, বুনো ফলের সন্ধান অথবা কোথায় এখন একটা এই গভীর বনে লিচু গাছ আবিষ্কার করা যায় সেই নেশায় বিকেল হলেই আমি পিলু কখনও মায়া সঙ্গে থাকত—বের হয়ে পড়তাম, কারণ আমরা কয়েকবারই এমন কিছু আবিষ্কার করেছি এই বড় বনটাতে যে বাবা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এবং আমাদের কাছে বাবাকে স্তম্ভিত করার আনন্দ ছিল পৃথিবী জয় করার মতো। বাবা দুদিন বাড়ি নেই, বাবা ফিরে এলে তাঁকে নতুন কোন খবর দিতে পারব না, সেটা কেমন আমাদের কাছে খারাপ লাগত। এটা লিচুর সময়। আম কাঁঠাল লিচু গোলাপজাম জামজামরুল সবই এ-সময়টাতে হয়। কাঁঠাল গাছ এবং দুটো আনারসের গাছ প্রথম আবিষ্কার করেছিল পিলু। আমি একবার একটা সরু পথ ধরে যাবার সময় প্রথম একটা আম গাছ তারপর আরও বনের গভীরে ঢুকে গেলে বুঝলাম, ওটা আমেরই বাগান, তারপর পিলু খবর নিয়ে এল বনটায় একটা বাতাবী লেবুর গাছও আছে, তখন আমি আর কি আবিষ্কার করব—একটা বাঁশ বাগানের মধ্যে যে ছোট্ট ঢিবি ছিল, একটা বড় গর্ত ছিল, সেখানে একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে এসে বাবাকে খবরটা দিলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে যথার্থই স্বাধীন, খাও-দাও ঘুরে বেড়াও, বিসি গরুটার জন্য ঘাস, তা অবশ্যই পিলুই সংগ্রহ করে থাকে; তারপর মায়া আমি কখনও কোন গভীর বনের মধ্যে ঢুকে নিরিবিলি গিমা শাক খুঁজে বেড়াই। বাবা আমার খুব গিমা শাক খেতে ভালবাসেন।

এ-হেন দিনে বাবা বাড়ি ফিরে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের তাঁর স্বগৃহে উপস্থিত থাকতে না দেখে খুব ক্ষেপে গেলেন। মাকে বোধহয় দুটো মন্দ কথাও বলে ফেললেন। আগের মতো আর তো মা'র প্রতি বাবার শংকাভাবটা নেই। নানা জায়গায় ঘুরে বাবা তাঁর খেরোপাতার লিস্টি মিলিয়ে সব যজমান এবং শিষ্যদের পুরো একটা তালিকা রচনা করে ফেলেছেন। এ-দেশে আসার পর দুটো বছর লিস্টি ঠিক করতেই চলে গেছে। যে-জন্য বাবা আমাদের অচেনা প্ল্যাটফরমে, অথবা কোনো ভাঙ্গা মন্দিরে ঠাঁই করে দিয়ে মাঝে মাঝেই নিরুদ্দেশ হতেন। তখন কি খাব কি খাব না তিনি আদপেই সেটা ভাবা পছন্দ করতেন না। ঈশ্বর, পৃথিবী, জলবায়ু এবং লতাপাতা যখন আছে সংসার ঠিক একভাবে না একভাবে চলে যাবেই। অকম্মা মানুষেরাই এটা ভেবে থাকে এবং বাবা মা'র কাছে এ-জন্য ফিরে এসে খুব ভালমানুষ সেজে থাকতেন। মা যত গালমন্দই করুক, রা করতেন না।

এখন আমাদের অবস্থা ফিরে গেছে, মা'র এবং বাবার আচরণে এটাই মনে হত। এবং অবস্থা ফিরে যাওয়ার মূলে বাবা, তিনি তাঁর গাছের শেকড়-বাকড় সত্যি মাটিতে এবার পুঁতে দিতে পেরেছেন। বনের শাক, কচু লতাপাতার ওপর আর যেহেতু সংসারটা নির্ভরশীল নয়, তখন তাঁর ছেলে-মেয়েরা যখন-তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে

রাবে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে, এটা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না।

বাবা জবা ফুলের ডাল দুটো নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঠাকুরঘরের পাশে লাগাবেন, না একটি সুন্দর ফুলের বাগান তৈরি করবেন, ফুলের বাগান তৈরি করতে হলে এলোমেলোভাবে লাগালে চলবে না। ক'হাত বাই ক'হাত বাগানটা হবে, গোয়াল-ঘর থেকে কতটা দূরে হবে, রাস্তা থেকে কি-ভাবে বাগানের সবটা দেখা যাবে এ-সব ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিলেন। তার ওপর যার ওপর ভরসা করে সব তিনি লাগাবেন, সেই মেজ পুত্রটি এখন বাড়ি নেই। মেজ পুত্রটি তাঁর তো পুত্র নয়, সাক্ষাৎ দেবতা। পছন্দ মতো জায়গায় গাছ লাগানো ঠিক না হলে তিনি সেটি তুলে তাঁর পছন্দমতো জায়গায় লাগাবেন। তাতে গাছ বাঁচুক-মরুক কিছুই আসে-যায় না। আর কাজটি এমন নিখুঁত সতর্কতার সঙ্গে করা হবে যে বাড়ির কাক-পক্ষীটি পর্যন্ত টের পাবে না। এ-ভাবে দামী দামী কতো গাছের চারাই তিনি বিনষ্ট করেছেন। সুতরাং বাবার সমস্যার শেষ নেই। তিনি তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা দেবীকে খুব মোলায়েম গলায় বললেন, আপনার মেজ পুত্রটির কি এখন আসার সময় হয়েছে?

মা বুঝতে পারে বাবা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বাড়ি ফিরে না দেখতে পেয়ে খুব রেগে গেছেন। আজকাল যজমান এবং শিষ্যরা মাসান্তে ঠাকুরের নামে দু-পাঁচ-দশ টাকা মনিঅর্ডার করে থাকে। অন্যান্যবার এসেই প্রথম বাবা সাধারণত বারান্দায় বসে হুঁকো সাজতে না সাজতেই বেশ মধুর স্বরে বলতেন, ও ধনবৌ, টাকা-পয়সা কিছু এল? সাধারণত কিছু এসেই থাকে। দু-টাকা পাঁচ টাকা মাঝে মাঝেই এসে থাকে। তাতে খুব একটা সমারোহে সংসার চলে যায় না—কোন রকমে ডালভাতের সংস্থান হতে পারে—এই ডালভাতের সংস্থান করতে পারাটা একটা উদ্বাস্তু পরিবারের পক্ষে কত কৃতিত্বের ব্যাপার সেটা বাবার হুঁকো খাওয়ার সময় মুখ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এবারে তিনি হুঁকোটি পর্যন্ত ছুঁলেন না। মা নিজেই হুঁকো সেজে বাবার সামনে এনে দিয়ে বলল, কোথাও গেছে। আসবে। বাবার মাথা ঠাণ্ডা করার এর চেয়ে মোক্ষম দাওয়াই আর কিছুই নেই। এতদূর থেকে এসে স্ত্রীর এমন আপ্যায়নে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন: গেছে কোথায়?

—কোথায় যাবে আবার। পিলু গেছে গরুটার জন্য ঘাস আনতে। মায়া-বিলুকে বলেছি, তোর বাবা ফিরবে, দেখনা দুটো গিমা শাক পাস কি না। এখন বর্ষা পড়েছে, কোথাও গজাতে পারে। তুমি তো গিমা শাক খেতে খুব ভালবাস। গাছে দুটো বেগুন হয়েছে। বেগুন দিয়ে রাতে গিমা শাক করব ভেবেছি।

এ-সবই হয়ে থাকে সংসারে এখন। সামান্য চাল ডাল নুন তেল থাকলে আর কোন উচ্চাশার কথা ভাবা হয় না। বাবা জবা ফুলগাছটা লাগাবার ঠিক আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। আমি আর মায়া। আমাদের কোঁচড় ভর্তি গিমা শাক। বাবা দেখে তো

বেজায় খুশি। বললেন, জবা ফুলের ডাল দুটো কোথায় লাগাবি? যেন আমি যেখানে পছন্দ করব সেখানেই লাগানো হবে। বাবা তাঁর নতুন আবাসটির কোথাও আর কোন ত্রুটি রাখতে চাইছেন না। এই সুমার বন-বাদাড়ে পুজোর ফুলের খুবই অভাব। বিশেষ করে শ্বেত জবা রক্ত জবা। এই দুটো ফুল পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। পুজোয় বসে বাবা সে-সব ফুল পাবেন কোথায়? বাগদি পাড়ার কাছে একটা করবী ফুলের গাছ শেষ পর্যন্ত কিছুটা বাবাকে স্বস্তি দিয়েছে। পুলিশ ব্যারাকে ফুলের গাছ বলতে ম্যাগনলিয়া, গোলাপ, বোগেনভেলিয়া। এমন সব ফুল যা একটাও পুজোয় লাগে না। সে-জন্য বাবা রোজ সকালে স্নান করার সময় ল্যাংড়া বিবির হাতা থেকে দুটো একটা পদ্ম তুলে আনেন। ভবিষ্যতে যাতে পুজোয় ফুলের অভাব না হয়, স্থলপদ্ম গাছ, শিউলি ফুলের গাছ এবং কিছু দোপাটি ফুলের চারা ইতিমধ্যেই লাগিয়ে গেছেন। আর বাবা বাড়ি না থাকলে পুজোর ভার আমার ওপর। পঞ্চদেবতার পুজো, গণেশের পুজো, লক্ষ্মীর ধ্যান, এই সব মন্ত্র একটা খাতায় লেখা থাকে। আমি দেখে দেখে মন্ত্র আওড়াই আর 'এষ ধূপায় নম, এষ ধূপায় নম' করি। তখনই সংসারে পিলু সব চেয়ে বেশি খাপ্পা হয়ে যায় আমার ওপর। যেহেতু আমাদের খুব শৈশবে পৈতা হয়েছে—পিলুর ধারণা পুজো করার এক্তিয়ার তারও আছে। কিন্তু বাবা বাড়ি থেকে যাবার আগে পুজোর ভার যেমন আমার ওপর অর্পণ করেন, তেমন গরুটা দেখাশোনার ভার পিলুর ওপর অর্পণ করে যান। এতে পিলু বাবার ওপর খুব রুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মুশকিল পিলু সকাল হলেই পেট ভরে খেতে চাইবে। পুজো করার কথা থাকলে সে না খেয়ে পুজোয় বসবে না, আসলে অত বেলা পর্যন্ত আজকাল আর না খেয়ে একেবারেই সে থাকতে পারে না। আর ওর ঈশ্বরে বিশ্বাসও খুব একটা প্রবল নয়। যদিও—ঈশ্বরের প্রতি ভূতের ভয়ের মতো একটা ভয় তার সব সময়ই আছে।

বাবা বললেন, আমার মেজ পুত্রটি না এলে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এবং এক সময় মেজ পুত্রটি ঘাসের বোঝা মাথা থেকে নামিয়েই বাবার কাছে ছুটে এল; বলল, বাবা, রাণীর বাগানে কত কচি ঘাস। বিসিটার শরীরে এবার ঠিক মাংস লাগিয়ে দেব।

মা ফোরন কাটলেন, আর হয়েছে!

বাবা খুব বিমর্ষ বোধ করলেন। এই গরুটা এনে বাবা যা আহাম্মকের মতো কাজ করেছেন তার তুলনা হয় না। বাবা এখন এটা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। দানের গরু খুব একটা ভাল হয় না বাবা জানেন। বাজারের ওটা গরুটি শ্রাদ্ধে দানের জন্য দেওয়া হয়। তবু বিশ্বাস ছিল বাবার, গরু বুড়ো হোক, বাচ্চা দেবে, দুধ দেবে। ভাল করে খাওয়ালে মোটাও হবে। তার কিছুই হয়নি। বরং গরুর স্বভাব দিন দিন পাল্টাচ্ছে। শুলে উঠতে চায় না আর। টেনে নড়ানো যায় না। মাঠে নামানো যায় না। মাঠের ঘাস খায় না। কেবল শুয়ে থাকতে ভালবাসে। মা আগে মাঝে মাঝেই গরুটির জীবনের

সঙ্গে বাবার জীবনের একটি তুলনামূলক তর্ক তুলে বেশ মজা পেত। কিন্তু ইদানীং ঠাকুরঘর হয়ে যাওয়ার পর, খেরো খাতায় দেশ ভাগের পর আবার নির্দিষ্টভাবে সব যজমান এবং শিষ্যদের একটি তালিকা নির্মাণের পর আর গরুর জীবনের সঙ্গে বাবার জীবনের তুলনা করতে সাহস পায় না। তবে অবেলায় মা'র এই কথা, আর হয়েছে, কেমন ভারি কষ্ট দিয়েছে বাবাকে। তবে বাবাও আমার দমবার পাত্র নন, বললেন, গরুটা আছে বলেই সকালে এত মৌজ করে ঘরদোর লেপা হয়। গরুটা না থাকলে কোথায় মিলত সব?

এটা অবশ্য ঠিক—এই বনভূমিটাতে এমন নির্জনতা রয়েছে, আর জঙ্গল এত বেশি এবং কতদূরে সব বাঁশের বাগান ছড়িয়ে আছে, ঘাস জন্মায় না বাঁশবনের নিচে, রাখালেরা গরু চরাতে পর্যন্ত আসে না, তখন এই শীর্ণকায় বুড়ো দানের রেটির মাহাত্ম্যকে এমন খর্ব করা বাবার একদম পছন্দ না। আর গেরস্থবাড়ি বলতে গরু, কুকুর, হাঁস, বেড়াল, কবুতর, ধানের গোলা, ঠাকুর ঘর, এসব মিলে। শুধু ক'জন মানুষ থাকল, আর এরা কেউ থাকল না, সেটাকে আর যাই বলা যাক আবাস বলা যায় না।

বাবা আর মা'র কথায় কান দিলেন না। তাঁর মেজ পুত্রটি নতুন মাসের একটা মাঠ এই সুমার বনের ভেতর আবিষ্কার করতে পারায় খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন আর ঘন ঘন হুঁকাতে টান দিয়ে বললেন, রেখে আয়। এখন অনেক কাজ।

পিলু হুঁকাটি যথাস্থানে রেখে এলে বাবা বললেন, দুটো জবাফুলের ডাল এনেছি। একটা শ্বেত জবা, একটা রক্ত জবার। কোথায় লাগাবি?

পিলু এত বড় গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে প্রথমে সামান্য হকচকিয়ে গেল। বাবা গাছটাছ তাঁর মর্জিমতোই লাগান। তারপর দ্বিতীয়বার আবার সেই গাছটাছ পিলুর মর্জিমতো লাগানো হয়। কোনটা বাঁচে কোনটা মরে। কিন্তু জবাফুলের ডাল দুটিকে দু' বার দু'জন দু'জনের মর্জিমতো লাগানে ধকল সইতে পারবে না। এবং এমন মহার্ঘ ডাঁল দুটোকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বাবা বাধ্য হয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের শরণাপন্ন হলেন।

বাবার দ্বিতীয় অথবা মেজ পুত্রটি পেছনে দু' হাত রেখে প্রথমে ঠাকুরঘরের চারপাশটা ঘুরে দেখল। যেসব গাছটাছ আছে, যেমন একটা স্থলপদ্মের গাছ, পাশে দুটো গোলাপের গাছ, টগর এবং জুঁই ফুলের গাছ, তার পাশে সুন্দর মতো একটা করবীর চারা বেশ সতেজ ডাল মেলে দিয়েছে, পিলুর জায়গাটি কেন জানি জাল জবাডালটির জন্য পছন্দ হয়ে গেল। সে উঠোনে গিয়ে বলল, বাবা, দাও লাগাচ্ছি।

বাবা ওই লাগাক, ওর মর্জিমতো কাজটা হলেই শেষ পর্যন্ত গাছটা বাঁচবে ভেবে বললেন, কোথায় লাগাবি ঠিক করেছিস?

—করবী গাছটার পাশে।

মেজপুত্রটি এমনিতে তাঁর বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু জায়গা নির্বাচনে কাজটি যে ঠিক হয় নি এবং সোজাসুজি ঠিক হয় নি বললেও মেজপুত্রটির শেষমেষ যদি নিজের জেদ বজায় রাখার নিমিত্ত আবার দু'বারের ঠেলা সামলাতে হয় গাছটাকে তবেই গেছে। তিনি ডালটি এবং একটা খুরপি নিয়ে ওর সঙ্গে এলেন। বললেন, সত্যি জায়গাটা খুব ভাল। গরু-ছাগলে খেতে পারবে না। কিন্তু করবী গাছটা খুব বড় হয়ে গেলে তোর জবার ডালটা আলো-বাতাস একেবারেই পাবে না।

এমন একটা সাধারণ সত্য-জ্ঞানের অভাব ভেবে পিলু কেমন বাবার ওপরই রাগের ঝালটা ছেড়ে দিল। তারপর আমাকে মাকে ডাকল। আমরা প্রায় বাড়ির সবাই, এমন কি কুকুরটা পর্যন্ত যতক্ষণ ডাল দুটো লাগানো না হল দাঁড়িয়ে থাকলাম। এবং বাবা এবারে যেন নিশ্চিন্ত মনে বললেন, যাক ধনবো, তোমার লাল জবা শ্বেত জবাও হয়ে গেল।

আসলে বাবা আমার তাঁর সেই দেশ-বাড়ির কথা বুঝি এতদিনেও এক বিন্দু ভুলতে পারেন নি। বাড়িটার জন্য বাবা কী যে না করছেন। ফলের গাছের একটা লিস্টিও বাবা এক রাতে বসে কুপির আলোতে বানিয়ে ফেললেন। মানুষের ঘর বাড়ি করতে যা যা লাগে তার কোন ত্রুটি থাকুক বাবা সেটা একদম পছন্দ করতেন না।

মা একদিন বাবার এত উৎসাহের মধ্যে বলে ফেলল, সবই হচ্ছে, খুজে-পেতে সব শিষ্য যজমানদের ঠিকানা নিয়েছ, সব খেরো খাতায় লিখে রেখেছ, ছেলে ক'টাও বড় হচ্ছে। শুধু তোমার ঘর বাড়ি বানালেই চলবে, বিলু পরীক্ষাটা দেবে না। পিলুকে শহরের স্কুলে দেবে না। মায়া বাড়িতেই পড়তে পারে। ছোটটার না হয় বয়স হয় নি.....।

বাবা নিশ্চিন্ত মনে বললেন, ও হয়ে যাবে। মানুষের বাড়ি ঘর হয়ে গেলে সব হয়ে যায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাক্স থেকে বইগুলো বার কর। বসে থাকলে তো পেট ভরবে না।

বাবা তাঁর পছন্দমতো কাজ না হলে নির্বিঘ্নে সব ভুলে যেতে ভালবাসেন। তিনি বই বাক্স থেকে কবেই বের করে দিয়েছেন। যখন দু-চার দিনের মতো খাবার মজুত ঘরে থাকত, তখনই আমাদের পড়ার কথাটা বাবার মনে পড়ত। প্রায় বাবা সকালে উঠে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতেন। নিজেই মাদুর পেতে বলতেন, পড়তে বোস। বই-টই নিয়ে এস, দেখি কে কতটা এগোলে। মাসাধিককাল পর পর তিন-চার দিনের বাবার এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা খুবই ওয়াকিবহাল ছিলাম। আমরাও তখন উচ্চস্বরে পড়তাম। সবচেয়ে উচ্চস্বরে পড়ত তাঁর মেজপুত্রটি। সে রাজ্যবর্ধনের বোন রাজশ্রীর সেই আগুনে ঝাঁপ দেবার মুখের দৃশ্যটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ত। গৃহবর্মার মালবরাজ দেবগুপ্ত আর বাংলার রাজা শশাঙ্কের মিলিত সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজয়ের প্রাতাগুলিও সে পড়ত গলা ফাটিয়ে। আর মাঝে মাঝে নিজের বোন মায়া দেবীকে ফিল চড় ঘুষ বাবার অলক্ষ্যে যখন যেটা সুবিধা ব্যবহার করে চলত।

আমাদের এই তিনজন পড়ুয়ার মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসে থাকতেন বাবা। বাবার কোলে যিনি থাকতেন, তার প্রতাপ সবার চেয়ে বেশি। সে খুশিমতো যার তার বই টেনে নিত, চিবুত, কখনও কোনো বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলত। তার সব অধিকার ছিল। বাবা মাঝে মাঝে তার ছোট পুত্রটির কাণ্ডকারখানায় বিব্রত হয়ে বলতেন, আহা কী করলি! দাদা বই ছেঁড়ে। ধমক দিলেই ছোট ভাইটির ভার। বদ অভ্যাস ছিল। নির্ঘাত সে বাবার কোলে পেচ্ছাব করে দেবে। বাবাও সেই ভয়ে খুব জোরে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। কোল থেকে তুলেও দিতেন না। কারণ মা'র তো সকাল থেকে কাজের অন্ত থাকে না। মাকে গিয়ে জ্বালাতন করবে ভয়েই বাবা সব উপদ্রব সরল মানুষের মতো সহ্য করে যেতেন। ছোট সন্তানকে তাঁর শাসন করার কোন অধিকারই মা বাবাকে দেয় নি। এ-ছাড়া এ-সব ব্যাপারে বাবার ভীষণ আপেক্ষিক তত্ত্বে বিশ্বাস ছিল।

আমি প্রথমে কিছু ইংরাজি কবিতা পড়লাম। কবিতাগুলি ক'দিন পড়লে বেশ মুখস্থ হয়ে যায়, না পড়লে আবার সহজেই ভুলেও যাওয়া যায়। বাবার সামনে কখনই বাংলা সংস্কৃত পড়ি না। কারণ বাংলা এবং সংস্কৃত পড়লেই তাঁর অধীত বিদ্যার মধ্যে পড়ে যায়। তিনি তখন এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকেন যে, আমার আসল পড়াটাই আর হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ বাবা আমার সংস্কৃতে এবং বাংলাভাষায়, এমন কী ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকালটা কীভাবে যে নষ্ট করে দেন। তাঁর মেজপুত্রটি বাবার এই দুর্বলতা বিলক্ষণ টের পায় বলেই প্রথমে ইতিহাস ধরেছে। বাবা একটা কথাও বলেন নি। তারপর বাংলা—বাবা তেমনি চোখ বুজে শুনে

যাচ্ছেন। উচ্চারণে ত্রুটি ঘটলে কেবল সেটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। বাবা কিছুদিন আগে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত একবিন্দু আমাদের কারো পড়া হয় নি, মা সেটা ধরিয়ে দিতেই মৌনীবাবা সেজে এখন ছেলে কোলে নিয়ে প্রায় মহাদেবের মতো বসে আছেন।

আর সেই বাবা সহসা বলে উঠলেন, ওরে বিলু, অঙ্ক করছিস না কেন?

বললাম, বইটার হাফ নেই বাবা।

—জ্যামিতি।

—ওটা আনতে হবে।

বাবা তারপর মোটামুটি হিসাব নিয়ে বুঝতে পারলেন, আমার বই-এর সংখ্যা যথার্থই কম। এবং বাবা যেন এটা আজই জানলেন, তেমনভাবে বললেন, তবে শহরে চল, মানুকে বলে-কয়ে কিছু পুরানো বই-টই পাওয়া যায় কিনা দেখি। কি কি নেই একটা লিস্টি করে ফেল।

এই লিস্টি আজ নিয়ে মোট পাঁচবার করা হল। কে পি বসুর অ্যালেজেব্রা আছে। তবে সবটা নেই। জ্যামিতির হাফ আছে। কারণ দু' বছরের টানা-হ্যাঁচড়া। এবং আমার আর কখনও পড়াশোনা হবে ভাবি নি। যতই বাবা বলুন, বাড়ি ঘর হয়ে যাক তখন দেখা যাবে। কখনও প্ল্যাটফরমে, কখনও পোড়ো বাড়িতে থাকতে থাকতে ভাবতেই পারি নি, এ দেশে এসে কখনও আমাদের শেষ পর্যন্ত বাড়ি ঘর হবে। সুতরাং বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ঘর হয়ে যাওয়ার পর পরীক্ষাটা না দিলে যেমন বাবার সম্মান থাকে না, তেমনি এই বাড়ি ঘর বানানোরও কোন অর্থ হয় না।

বিকেলেই বাবা শহরে মানুকাকার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, কাকাকে বল তোমার কী কী বই নেই। যখন পুরো লিস্টি দিলাম, তখন সেই কাকাটি হতবাক্। বললেন, কি করে পরীক্ষা দিবি? চার মাসও তো বাকি নেই। কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টার মশাই কাকার বন্ধু লোক। কাকা আবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি চিরকুট লিখে তাঁর এক শিক্ষকের কাছে পাঠালেন। তিনি তাঁর দুই ছাত্রের ঠিকানা দিলেন। ওদের বাড়তি বই-টই যদি থাকে। ওরা পাঠাল খেলোয়াড় বিনয় দাসের কাছে। সে এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে না। তার বইগুলি যদি পাওয়া যায়। কিছু পাওয়া গেল, কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলি যে নেই বলল না। বললে বিনয় দাসের বাবা মুদি-খানার মালিক তাকে আর আস্ত রাখত না। যাই হোক এই করে যখন কিছু বই নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম, মা আমার খুবই আশ্বস্ত হলেন। মা যে মা, যে কখনও জানেই না, কোন্ বই-এর কি নাম লণ্ঠন জ্বেলে উবু হয়ে বসল। সব বই দেখে বলল, এর তো দেখি ভেতরে সব পাতা কাটারে। কেমন সুন্দর করে কেটেছে দেখ!

বাবা বললেন, সত্যি তো!

আমি বললাম, বাবা বিনয় দাস চারবার চেষ্টা করে পারে নি। বোধহয় সেজন্য মা সরস্বতী রাগ করে সব ভাল ভাল জায়গাগুলি বই থেকে চুরি করে নিয়েছেন।

বাবা বললেন, তবুতো বই। এই বা কে দেয়। মন দিয়ে পড়লে ওতেই পাশ করে যাবে।

বাবা বলতে কথা। বাবার কথা ফেলা যায় না। তখন সেই বই সম্বল করেই আমার পড়াশোনা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রাই-ভেট পরীক্ষার্থী আমি। বাবা এক ফাঁকে নিবারণ দাসের আড়তেও চলে গেলেন। বলে এলেন, দাদামশাই, বড় ছেলে আমার এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। শুধু নিবারণ দাস কেন, যার সঙ্গেই দেখা হত একথা সেকথার ফাঁকে বাবা বলতেন, বিলুটা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার বাড়ি

ঘরের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াটা বড়ই গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাটা আরও যেন গম্ভীর শোনায়। বাবা সব সময় খুব দরকারী কথাবার্তায় খুব সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। এবং এ-ভাবেই এই বাড়িতে শীতকালও এসে গেল। এখন পিলু পর্যন্ত আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। আমার পড়ার জন্য বাবা শেষ পর্যন্ত একটা হ্যারিকেনও কিনে ফেললেন। গরুটার কিছু ঘাস-টাস কাটার দায়-দায়িত্ব আমার ছিল। পিলু আর আমাকে সেদিকে ভিড়তেই দেয় না। বাবা বাড়ি না থাকলে ঠাকুর পুজোটা শুধু আমার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল।

আর আমি জানি, বাবা যেখানেই এখন যাচ্ছেন বিয়ের কাজে অথবা কোনো পুজো-আচার ব্যাপারে ঠিক কথায় কথায় তাঁর বড় ছেলে কত লায়েক, কী পরীক্ষা দিচ্ছে সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করে ছাড়ছেন না। বাড়ি ফিরলেই বাবা বলতেন, জগদীশ বলল, প্রবেশিকাটা পাশ করলেই কর্তা আপনার আর কোন ভাবনা নেই। অফিসে চাকরি হয়ে যাবে। বাবার ছেলে অফিসবাবু হবে শুনে মা খুব আমায়িক হয়ে যেতেন। মা বলতেন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু কিছু খাও। কোন সকালে তো বের হয়েছ!

এই বাড়িঘর, গাছপালা এবং বনভূমির মধ্যে রাতে আমার উচ্চস্বরে পড়া বাবার চোখে-মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি এনে দিত। তিনি মাঝে মাঝে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন। আর কখনও সকালে সেই পড়াশোনার মধ্যেই পিলু খবর দিত এই বিরাট বনভূমির কোন্ দিকটার সব গাছপালা কেটে লোকে নতুন আবাস তৈরি করছে এবং আমার মনে হত পিলুর ভারি কষ্ট হত এতে। এই বনভূমিটা যেন পিলুর সাম্রাজ্য—সবাই কে কোথা থেকে এসে সব গাছপালা কেটে ফেলছে। বনভূমির সেই আদিম আশ্চর্য রহস্যটা সরে যাচ্ছে বলে পিলুকে প্রায়ই খুব ম্রিয়মাণ দেখাত। কুকুরটাকে নিয়ে সে আগে যেমন এই বনভূমির অভ্যন্তরে ঢুকে অদ্ভুত সব খবর নিয়ে আসত আমাদের জন্য এখন আর তেমন পারে না। গাছপালা কেটে ফেলায় একটা উষর জমির মতো দেখায় এবং সেখানে মাঝে মাঝে শোনা যায় বাঁশ কাটার শব্দ। বাবার খুব তখন আনন্দ। পুজো শেষ করে বাবা যত জোরে সম্ভব শঙ্খে ফুঁ দিতেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজাতেন। পিয়ন আসত ঠাকুরের নামে আসা যজমান অথবা শিষ্যদের মনিঅর্ডার নিয়ে। কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা মাসোহারা দেয়। আর বাবার কিছু যজমান নিবারণ দাসই ঠিক করে দিয়েছে। শহরের মানু কাকাও ভাল পুরোহিতের খোঁজে কেউ এলে বাবাকে খবর পাঠায়। আর যারা বাবার মতো নতুন ঘর-বাড়ি করছে, দিনক্ষন দেখতে এলে বলে দেন, ঠাকুরের ফুল-তুলসী নিয়ে যাও। ওতেই হয়ে যাবে। জায়গাটার কথা বললে বলেন, মাটি মাটি। তার তুলনা নেই ভুবনে। যেখানেই আবাস, সেখানেই মানুষের সবকিছু। বাবার এমন সুন্দর কথা ওদের খুব ভাল লাগত। পুজো-পার্বণে দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এটা বোঝা যাচ্ছিল সবই বাবার স্বভাবগুণে।

এ-ভাবে শীতকাল শেষ হয়ে গেল এই বনভূমিটায়। এখন আর আগের মতো একে আমরা ঠিক বনভূমি বলতে পারি না। কারণ বাদশাহী সড়কের ধারে ধারে সর্বত্রই মানুষের নতুন বাড়িঘর উঠে যাচ্ছে। ভেতরের দিকে, অর্থাৎ যে সুমার বনটা প্রায় মাইলব্যাপী কারবালা পর্যন্ত চলে গেছে এবং যেখানে কবে কোন্ আদ্যিকালে একটা ইঁটের ভাঁটাও কেউ করেছিল—কেবল সে জায়গাটা কেন জানি মানুষ এখনও ঠিক পছন্দ করছে না। ফলে ওদিকটার বড় বড় শিরিষ গাছগুলি থেকে পাতা ঝরতে লাগলো। ঠিক আগের মতই, কিছু শাল গাছ অথবা পিটুলি গাছের পাতাও ঝরছে। রোদের তাত বাড়ছে। মাঠে অথবা কোন শস্যক্ষেত্রে আগে যে খরগোস সজারুর উপদ্রব ছিল তাও ক্রমে কমে আসতে লাগল। কিছু বড় বড় গো-সাপ ছিল বনটাতে, ওদেরও আর বিশেষ দেখা পাওয়া যেত না। রাতে শিয়ালের সেই তীব্র চিৎকার ক্রমে দূরবর্তী শব্দের মতো মিহি হয়ে যেতে থাকল। এবং এত সবের মধ্যেই আমার একদিন শহরে যেতে হল পরীক্ষা দিতে। মা কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিলেন। বাবা-মাকে প্রণাম করতে হল। ঠাকুরের ফুল বেলপাতা বাবা পকেটে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্য বাবার বিশ্বাসে যা কিছু দরকার সবই করা হল।

পরীক্ষার ক'টা দিন বাড়ি থেকে বাবা কোথাও গেলেন না। পূজার সময় বেড়ে গেল। তাঁর শালগ্রামের মাথায় বোঝা বোঝা তুলসী পাতা চাপাতে থাকলেন। শহরে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। বাড়িতে বাবা ঠাকুরের কাছে পরীক্ষা দিচ্ছেন। ধৈর্যের পরীক্ষা বোধহয়। কারণ বাবার জানা যত দেবতা আছেন সবার উদ্দেশেই ফুল চন্দন দিতে দিতে বিকেল হয়ে যেত বাবার। কেউ বাদ গেলে ষড়যন্ত্র করে বাবার সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি মা খুব উদ্বিগ্ন চোখে-মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। মায়া ভাইকে কোলে নিয়ে রাস্তার গাছপালা দেখাচ্ছে। পিলু গরু আনতে গেছে মাঠে। কেবল বাবা নেই। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ। মাকে বললাম, বাবা কোথায়?

ঠাকুর ঘরে সেই সকালে ঢুকেছে এখনও পুজাই শেষ হচ্ছে না।

বুঝলাম, তাঁর বড় পুত্রের জন্য বাবা আজ তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই খুশি করতে ব্যস্ত। তাঁর নিজের এত সখের বাড়ঘরের কথা মনে নেই। প্রিয় গরুটার কথা মনে নেই। দেবতাদের তুষ্ট করতে গিয়ে দিন শেষে বেলা যায় - তাও তিনি বুঝি ভুলে গেছেন।

ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে এগিয়ে গেলাম। খুব সতর্ক গলায় ডাকলাম,—বাবা।

বাবা সা করলেন না।

আবার ডাকলাম, বাবা, আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

বাবা কেমন ধ্যানমগ্ন গলায় বললেন, শেষ হল বল না। পরীক্ষা সবে শুরু হল। বাবা কী অর্থে কথাটা বললেন, বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবা তখন ডাকলেন, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর এবং এ-সবে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের অভাব ছিল। তবু বাবার কথা। ঘরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম করলে সামান্য চরণামৃত দিলেন খেতে। এত সবের পর বাবার পুজো শেষ করতে পারলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরীক্ষা ভাল-মন্দের কথা তিনি আজ পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। সবই ঠাকুরের কৃপা, ভাল-মন্দ বলে যেন কিছু নেই। শুধু নিজের কাজটুকু করে যাও। বাবার এমন সব কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। মা মাঝে মাঝে একই কথা শুনে রেগে যেত। কিন্তু পরীক্ষার ক'টা দিন বাবার পুজো আচায় মা সাংসারিক অনটনের কথা বলে এতটুকু বিব্রত করল না। বাবার সঙ্গে মাও এ-ক'টা দিন খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম।

ফল বের হবার আগে পর্যন্ত বাবা আমাকে কোথাও গেলে সঙ্গে নিতে শুরু করলেন। শহরে মানু কাকার বাড়ি গেলে বললেন, সব তাঁরই ইচ্ছে। বিলুতো এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। তোর তো জানাশোনা আছে অনেক। দেখিস যদি কিছু করতে পারিস। নিবারণ দাসের আড়তে নিয়ে গেলেন একদিন। বললেন, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে বিলু।

এই প্রবেশিকা পরীক্ষা বাবার জীবনে তাঁর বাবার জীবনে কখনও ঘটেনি। অত বড় পরীক্ষা দিয়েছে ছেলে, তাকে দশ-

"দুই পুরুষ" — নীরোদ রায়

মনের কাছে নিয়ে যাওয়া বাবার খুবই দরকার। তাঁর বড় ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে; কত বড় কথা!

ফল বের হবার দিন শহরে গেলাম। মানু কাকা বললেন, তুমি এক বিষয়ে ফেল করেছ। স্কুলের মণ্টু মাষ্টার খবরটা দিয়ে গেছে। খুব দমে গেলাম। তিনি ফের বললেন, দু' মাস পরে পরীক্ষা হবে। তখন পরীক্ষাটা দিতে পারবে। অঙ্ক পরীক্ষা। দুটো মাস আর সময়। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে পাশ করে যাবে।

কিছুই ভাল লাগছিল না। বাড়ি ফেরার পথে সাহেবদের একটা নির্জন কবরখানা পড়ে। বড় বড় সব ঝাউগাছ। সেখানে সারাটা দুপুর শুয়ে থাকলাম। কেবল বাবার মুখটা আমার চোখে ভেসে উঠছে। তাঁর কত বিশ্বাস আমার ওপর। এখন মুখ দেখাব কী করে।

কী করি। ফেরার হলে কেমন হয়। তখনই মার সেই বিষণ্ণ মুখ ভেসে উঠল। বাবার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পুত্র-গৌরব নিমেষে কেউ হরণ করে নিয়ে গেল। তবু কেন জানি পিলু মায়া ছোট ভাইটার কথা ভেবে ফেরার হতে ইচ্ছে হল না। সাঁঝ লাগার আগে গুটি গুটি বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তাটা যেন আজ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। পুলিশ ব্যারাক পার হতেই বড় মাঠ। মাঠে পড়েই দেখলাম, সবাই বাড়ীর রাস্তায় গাছের নিচে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটতে ছুটতে আসছে। মায়া ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল। অন্য দিন হলে ভ্যাক করে কেঁদে দিত। আজ তার কান্নার কথা মনে পড়ল না। কতক্ষণে আমার কাছে পৌঁছাবে। ওরা কাছে এলে কীভাবে যে বলব, পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি পিলু। পিলু এ-কথায় সবচেয়ে বোধহয় বেশি ভেঙে পড়বে এবং বনভূমিটা থেকে আমরা যে ঘর-বাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছি, আমার মনে হল খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বনভূমি বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলবে।

পিলু চিৎকার করে বলল, দাদা, পাশ করেছিস?

কিছু বললাম না। কারণ বলতে পারছিলাম না কিছু। আমার চোখ ফেটে জল আসছে। বাবা এগিয়ে এসে বললেন, পাশ করলি।

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম।

বাবা বললেন, কান্নার কী আছে? সবাই বুঝি পাশ করে!

বাবার কথায় ভেতরের দুঃখটা সহজেই কত লাঘব হয়ে গেল।

বাবা আবার বললেন, ক' বিষয়ে পাশ করেছিস?

এটাই বোধহয় বাবার এখন সান্ত্বনা। বললাম, ন' বিষয়ে পাশ। অঙ্কে ফেল।

বাবা বিজয় গৌরবে এবার আমার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টা বিষয়ে পাশ—কম কথা হল। এটাতো পাশই। ক'টা লোক করে সব বিষয়ে পাশ করেছে। বড় হলে বুঝতে পারবি।

এবং তারপর থেকে আমার সেই নির্দিষ্ট অঙ্ক পরীক্ষার দিনটি পর্যন্ত যার সঙ্গে দেখা হত বাবা বলতেন, বিলুটা দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতেই পাশ করেছে। একদিন নিবারণ দাসের পাটের আড়তেও খবরটা দিতে চলে গেলেন বাবা। বললেন, কম বড় কথা না। কী বলেন দাসমশাই!

দাসমশাই আড়তে বসে হুঁকো টানছিলেন। হুঁকোটি বাবার হাতে দিয়ে বলতেন, সত্যি ভারি গৌরবের কথা। বাবা আনন্দে তখন তন্ময় হয়ে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতেন। পুত্র-গৌরবে হাসিটি তাঁর মুখে লেগেই আছে।

মহিলা মহল

কণা বসুমিশ্র

অনেকগুলো চটির আওয়াজ উঠছে সিঁড়িতে। বন্ধ দরজার ওপাশে অনেক মহিলা কণ্ঠের কলরব। পাশের ফ্ল্যাটে হয়ত কারা এলো। মহুয়ার হাতে তখন ফিডিং বটল। ছেলেকে ফলের রস খাওয়াচ্ছে। কৌতূহলবশতঃ দরজার গায়ে লাগানো আইয়ে চোখ রাখলো মহুয়া। ঠিক সেই মুহূর্তেই বেল বেজে উঠলো।

ছেলেকে প্র্যামে রেখে মহুয়া তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজা খুললো। তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিত মহিলাদলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

"নমস্কার, আমরা এই হাউসিং এষ্টেটের বাসিন্দা। আপনি নতুন এসেছেন, তাই আলাপ করতে এলাম।"

দু' হাত জড় করে মহুয়াও বললো, "নমস্কার। বসুন, বসুন।"

চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। এখনো সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারে নি। তারপর আবার দশ মাসের দস্যি ছেলের উপদ্রব। বইপত্র স্তূপাকার হয়ে রয়েছে বসার ঘরের মেঝেয়, যেখানে এখনো চুণের দাগ। দরজার গায়ে চুণের অসংখ্য সাদা ছোপ। সোফার ওপরে একগাদা জার্নাল। সিগারেটের অ্যাসট্রেটা ছাইয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। এ ঘর থেকেও উঁকি মারছে শ্রীহীন শোবার ঘরটা। বিছানার চাদরের আধখানা ঝুলছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে বিস্কুটের ভাঙা টুকরো। মেঝেয় একগাদা জল। এতক্ষণ ধরে ছেলেটা যে সব অপকর্ম করেছে ও ঘরে তারই নিদর্শন। সে কথা আর কেই বা বুঝবে? মহুয়া সুগৃহিণী নয়, সেই পরিচয় জেনেই এরা ফিরে যাবে। অথচ সকালেও সে ওঘর গুছিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি জার্নালগুলো সরিয়ে মহুয়া ওদের বসার মতন জায়গা করে দিলো। মনে মনে ও যতই অস্বস্তিতে ভুগুক, ওর মুখে ঠিকই আপ্যায়নের হাসি ফুটে উঠলো।

"এখনো বোধ হয় কাজের লোক পান নি?" একজন না বলে পারলেন না।

"কাজের লোক? হ্যাঁ, একটা ঠিকে লোক পেয়েছি। সব সময়ের পাই নি।"

"আচ্ছা, আমার বাড়ীর লোকটিকে বলে দেখবো, ওরা তো হামেশাই লোকটোক এনে দেয়। এইতো সেদিন আমার বোনের বাড়ী"—

"ও আপনি বুঝি লোক রিক্রুট করতে পারেন? দিন না আমায় একটি। যা মেজাজ দেখাচ্ছে না আমার 'শ্রীমতী'।"

আর একজন বললেন, "আমার শ্রীমতীটি তো পুজোর কাপড় না নিয়ে সরবেন না।"

অন্যজন বললেন, "হ্যাঁ, ওদের এই এক সময়। এ সময় দেখবেন, লোকের অভাব নেই। পুজোর পরেই সুড়্ সুড়্ করে সব কেটে পড়বে।"

"সত্যি, এদের চাকরী পাওয়া আর ছাড়া দুইই কত কুইকলি হয়। পরের জন্মে খাওয়া-পরার লোক হয়ে জন্মালে মন্দ হয় না।"

"না, খাওয়া-পরার লোক নয়, আমি স্ট্রেক ঠিকে লোক হতে চাই। এদের অ্যাডভানটেজ আরো বেশী। আজ বলবে, 'আমার সোয়ামী মেইরেছে গো বউদি। তাই ও বেলা আসতি পারি নি।' কাল বলবে, 'শাউড়ী অ্যামেলা করলে গো।' পরশু বলবে----।"

খিলখিল করে হেসে উঠলেন সবাই। মহুয়ার চোখে একরাশ কৌতূহল। ও এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল এঁদের কথোপকথন। এই আড্ডায় ওর ভূমিকা শুধুই শ্রোতার। ওর মন্দ লাগছিল না। কিন্তু পাশের ঘরে বুম্বাটা প্র্যামে। এতক্ষণ আবার নতুন কি কাণ্ড করছে কে জানে। ফ্রিজে কিছুই রান্না নেই। রূপ খেতে আসবে ঠিক সাড়ে বারোটায়। কাঁচা মাছগুলো পড়ে রয়েছে বেসিনের কলের তলায়। যদি এই আড্ডার মেয়াদ হয় আধ ঘণ্টা। ইস্ তাই যেন হয়। একটু চা বা কফি কিছু একটা দেওয়া উচিত। উঠতে হবে। ও উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফর্সা মতন মোটাসোটা মহিলাটি বললেন, "এই দেখুন, আমাদের পরিচয়ও তো আপনাকে দেওয়া হয় নি।"

মহুয়া ঠোঁট চেপে হাসলো। "আপনি তো আমার উল্টো দিকের বাড়ীটায় থাকেন? বোধ হয় সেকেণ্ড ফ্লোরে?"

"কি আশ্চর্য এর মধ্যেই আপনি আমায় চিনে ফেলেছেন!"

মহুয়া হাসতে থাকে। পান চিবোতে চিবোতে মহিলা বলেন, "সত্যি, এই খাঁচাগুলো থেকে তো একেক জনকে চিনে বার করা সোজা কথা নয়।"

"খাঁচা?" হেসে উঠলেন ছাপা শাড়ী পরনের মহিলাটি। "হ্যাঁ, খাঁচাই বটে।"

ষ্টেনলেস ষ্টীলের জর্দার কৌটো থেকে জর্দা মুখে পুড়ে প্রথম মহিলাটি ফের বললেন, "আমার তো মোটেই ইচ্ছে ছিল না এই ফ্ল্যাট-ট্যাট কেনার।"

"আমিও তো।" হলদে তাঁত পরনের মহিলা বললেন, "এই ফ্ল্যাট কেনার পক্ষপাতী আমিও তো ছিলুম না। কত্তাকে বলেছিলুম, জমি কিনে বাড়ী কত্তে। তো উনি বললেন, "জমি কিনে বাড়ী করার মতন ধৈর্য এবং সময় আমার নেই।"

নীল শাড়ী পরনের মহিলাটি এতক্ষণ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিলেন। হঠাৎ বললেন, "না ভাই, আমার সে ব্যাপার নয়। একটা মোটামুটি ভাল পাড়ায় জমি কিনে বাড়ী করার মতন সামর্থ্য আমার ছিল না।"

"কেন, লোন? ব্যাঙ্ক, এল, আই, সির লোন —অমন সুযোগ।" বললেন আর একজন।

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু লোনটাও তো শোধ করতে হবে।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। কথা আর এগোয় না। পান জর্দা খাওয়া মহিলাটি ফের বলেন, "কথায় কথায় আমাদের পরিচয়গুলো কিন্তু দেওয়াই হচ্ছে না।"

মহুয়া হেসে বলে, "কেন, হাউসিং এষ্টেটের বাসিন্দা, আগেই তো বলেছেন।"

"না, তবুও তো। এক্স, ওয়াই, জেডের মতন আমাদেরও তো পরিচয় আছে। আমি মিসেস চ্যাটার্জী।"

হলদে তাঁত পরনের মহিলা বললেন, "আমি মিসেস সোম।" সবুজ ডুরে বললেন, "আমি মিসেস দাশগুপ্ত।" নীল শাড়ী যাঁর পরনে তিনি হাসেন, "আমি মিসেস সেন।" ছাপা শাড়ী পরা মহিলাটি বললেন, "আমি মিসেস দত্ত।"

মহুয়ার দিকে তাকিয়ে মিসেস সেন বললেন, "আপনি তো মিসেস সরকার, দরজায় নেম-প্লেটে দেখলুম।"

পাশের ঘরে প্র্যাম থেকে ছেলের কান্না ভেসে এলো। অন্যমনস্ক মহুয়া বললো, "আপনারা বসুন, আমি কফি নিয়ে আসছি।"

"কফি?" মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন ওঁরা।

"তবে চা?"—মহুয়ার চোখে আগ্রহ ফুটে ওঠে।

"এই গরমে দরকার নেই। আর একদিন হবে খনে।"

"না না, তা কি হয়?" মহুয়া বলে, "এই প্রথম আমার বাড়ীতে এলেন।"

"আপনি ভদ্রতার সুযোগ অনেক পাবেন ভাই, এরপর আমাদের যন্ত্রণায় তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন।" হাসতে থাকেন মিসেস সোম। মিসেস চ্যাটার্জী বলেন, "ছঁ। এক বছর দু' বছরের নয়, আমরা আপনার সারা জীবনের সঙ্গী। যদি ফ্ল্যাট বিক্রী করে সরে না পড়েন তো বাকী জীবন ধরেই দেখতে হবে এই মুখগুলো।"

সবাই হাসতে থাকেন। মহুয়াও হাসে। কিন্তু ও যেন একটু অন্যমনস্ক। বাকী জীবন ধরে। মানুষ তো চিরদিন একরকম থাকে না। এই মধুর সম্পর্কে হয়ত একদিন চিড় খাবে। এই মানুষগুলোর সঙ্গে রোজই ওর দেখা হবে। কিন্তু আজকের মতন একে অন্যকে দেখে খুশি হতে পারবে কি?

"ঠাণ্ডাই আনি তবে?" মহুয়া আবার বলে।

"আপনার লোকজন নেই এক্কেই—" মিসেস চ্যাটার্জীর কথায় সায় দিলেন সবাই। মিসেস সেন বললেন, "বাচ্চাও তো কাঁদছে। কত বয়েস হ'ল?"

"এই তো দশ মাস কমপ্লিট করেছে সেদিন।" আঁচল দিয়ে ঘাম মুছলো মহুয়া।

"আপনি যান, যান ওকে ধরুন।" মিসেস দত্তের গলায় দরদ ফুটে উঠলো, "বেচারী।" মহুয়া সবার মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল পাশের ঘরে।

ছেলে তখন প্র্যাম থেকে নেমে হামাগুড়ি মেরে খাটের তলায় ঢুকেছে। ওখানে গিয়েই পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে ছেলে। স্প্রীং-এর পুতুলটা পিড়িং পিড়িং করে নাচছে সেখানে। ওটিকে বাগে আনতে না পেরেই ছেলের এই পরাজয়ের কান্না। বুবার পা—দুটো ধরে হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এলো মহুয়া। কি সব নোংরা তুলে খেয়েছে। ছিঃ ছিঃ। ও বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার করলো ওকে। বসার ঘরে তখনো চলছে নতুন অতিথিদের কলরব।

কুকারে ভাতটাই শুধু করে রেখেছিল তখন। ঠিকে ঝিয়েটি আনাজ কেটে রেখেছে। মাছগুলো ফ্রিজের তলায়।—রূপ বলেছিল, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে। লাঞ্চে এসে রোজই দেরী হয়।—আর একটু বাদেই বুবার ভাত খাবার সময়। ওকে অলিভ ওয়েল মাখানো হ'ল না।—রূপ এসে রাগ করবে, এখনো ওর চানই হ'ল না। উপায় নেই। উপায় নেই। মহুয়া ফ্রিজ খুলে বরফের ট্রেটা বার করলো, অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতলটাও।

ও চামচে নাড়ছে। বুবা ওর হাঁটু জড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে চলেছে।

ওকে খেলনার গাড়ীগুলো পেড়ে দিল মহুয়া। নাকের পাশটার ঘাম মুছলো আঁচলে। তারপর পাঁচ গ্লাস সরবত সাজিয়ে ট্রেটা ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল বসার ঘরে। রূপের যা মেজাজ। সময় মত লাঞ্চ না পেলে ও হয়ত রাগ করে ফিরেই যাবে। ভগবান, ও যেন আজ দেরী করে আসে। চাপা উদ্বেগে মহুয়ার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

"আপনাকে নিয়ে সত্যি আর পারা যায় না।"

"আমরা তো শুধু গল্প করতেই এসে-ছিলাম।"

"বসুন, বসুন, আপনার ছেলে কোথায়? এই অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত—।"

নানা জনের নানা কথার ফাঁকে মহুয়া শুধু হাসে "না, বিরক্ত আর কি।" ছেলেকে আর আনতে হয় না। কিছুক্ষণ পরই হাঁটি হাঁটি পা পা করে সে নিজেই চলে আসে।

"ওমা! কি লাভলি।"

"এই যে—।" তুড়ি দিয়ে ডাকেন মিসেস দত্ত। মিসেস সেন চিলের মতন ছোঁ মেরে কোলে তুলে নেন। "ইস্। আমার মেয়ে ওকে পেলে যা করবে না।" মিসেস সোম বলেন, "হ্যাঁ, আমার ছেলেও। বাচ্চা পেলে আর কথা নেই।" মিসেস চ্যাটার্জী টিপ্‌পুনী কাটেন, "তা ছেলের একটা বোন-টোন এনে দিলেই তো হয়।"

"আহা, ঝামেলাটা আপনি সামলাবেন?" মিসেস সোমের কথা শেষ হতে না হতেই মিসেস দাশগুপ্ত বললেন, "কাল টি, ভি'তে বহু পুরোন ছবি দেখলুম, 'উদয়ের পথে'।

"হ্যাঁ। এই আপনি টি, ভি, কিনেছেন?" মিসেস দত্ত সাগ্রহে তাকালেন।

"হ্যাঁ, এইতো গত সপ্তাহে।"

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "যাক আপনিও কৌলিন্যের মর্যাদা পেলেন তাহ'লে। আমার ভাই কত্তার যা মেজাজ টি, ভি, ফি, ভি, কেনার উনি মোটেই পক্ষপাতী নন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নাকি গোল্লায় যাবে।"

মিসেস দত্ত বললেন, "ঠিকই বলেছেন, আমি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তবে ষ্ট্রিক্ট হতে হবে। আমি তো রোজ টি, ভি, খুলি না। ওই বাচ্চাদের প্রোগ্রামটা—।"

"আপনার ছেলেমেয়ে তো খুব লক্ষ্মীই বলতে হবে। কথা শোনে। আমারটি না! হিন্দী মিন্দী যা ছবিই থাক না কেন সব তার দেখা চাই। 'উদয়ের পথে' কেমন লাগলো?"

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "ও বই কি আজকের? সেই তিরিশ বছর আগের বই। বিনতা রায়ের তিনটে গানই খুব হিট্ করেছিল। আমার কত্তা দেখতে এলে আমি তো ওই গানটাই গেয়েছিলুম।" "ওই মালতীলতা দোলে।"

মিসেস দত্ত হাসেন, "ও আপনি তাহ'লে আজকের লোক নন?"

"একেবারেই না।" মিসেস চ্যাটার্জী হাসতে থাকেন।

"এই কাল আপনাদের ওপরের ফ্ল্যাটে কি হয়েছিল বলুন তো?" মিসেস সোম প্রশ্ন ছোঁড়েন মহুয়াকে। মহুয়া আমূতা আমূতা করে "কই, কিছু না তো?"

"কিছু না কি বলছেন?" মিসেস সোম একেবারে আকাশ থেকে পড়েন। আমাদের ফ্ল্যাট থেকে পর্যন্ত শোনা গেছে।"

"কি আর হবে?" মিসেস চ্যাটার্জী বলেন, "সেই কত্তা গিন্নীর পুরনো ঝগড়া।"

মিসেস দাশগুপ্ত বলেন, "কত্তার কোন বান্ধবী আছেন, তাঁকে নিয়েই তো গণ্ডগোল।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "কাল রাতে নাকি গিন্নী বাড়ি ছিলেন না। হাওড়ায় বাপের বাড়ি গেছিলেন তো সেই ফাঁকে ভদ্রলোকের বান্ধবী এসে হাজির। সেই রাতে ভদ্রমহিলার ফেরার কথা নয়। কিন্তু ওঁদের অবাক করে দিয়ে রাত দশটায় তিনি এসে দরজায় কড়া নাড়লেন।"

নড়ে চড়ে বসলেন মিসেস সোম। "তারপর?"

মিসেস দত্তের চোখ দুটোও গোল হয়ে গেল, "দারুণ ইনটারেসটিঙ তো।"

মিসেস চ্যাটার্জী বলেন, "তারপর যা হবার তাই হ'ল। কত্তা গিন্নীতে মিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল।" মিসেস সেন বললেন, "ওই মহিলা নাকি ওই ভদ্রলোকের বিরহে বিয়েই করেন নি।"

"হ্যাঁ, ওঁদের যৌবনে কি একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। বোধ হয় দু'জনের মধ্যে একজনকার বাবা-মায়ের অমত ছিল এই বিয়েতে। অনুটুপ ছন্দ আর কি।" মিসেস দাশগুপ্তের গলায় কেমন যেন এক কান্নার সুর।

চমকে তাকালো মহুয়া। ও বুঝতে পারলো না ইনিও কোন বিরহিনী কি না।

কাল রাতে তো ওদেরও ঘুম হয় নি। ওপরতলার ঝগড়াঝাঁটি মারপিটটা প্রায় সারা রাত ধরেই চলেছে। তারপর আবার বুম্বাটার কান্না। ওর বোধ হয় পেট ব্যথা করছিল। গ্রাইপ ওয়াটার খাওয়ানোর পর বুম্বার কান্না থামলো। কিন্তু ওর কান্না থামলে হবে কি, ওপরের গোলমাল থামলো না। রূপ তো রেগেই আগুন, "তখনই তোমায় বলেছিলাম এসব প্ল্যান ছাড়ো। ফ্ল্যাট কিলে এই তো হলো। নিজের বাড়ী, অথচ শান্তিতে থাকার উপায় নেই।"

"তারপর ভদ্রলোকের সেই বান্ধবী কি করলেন?" মিসেস দত্ত ঝুঁকে পড়লেন মিসেস দাশগুপ্তের দিকে। কিন্তু মিসেস দাশগুপ্ত তখন উদাসীন। সংক্ষেপে বললেন, "জানি না।"

মিসেস চ্যাটার্জী রহস্যের হাসি হেসে বললেন, "সেটাই তো কথা।" একটু থেমে উনি ফের বললেন, "পাশের ফ্ল্যাটের ব্যাচেলর ছেলেটি ওঁকে জায়গা দিয়েছিল।"

"ওমা, তাই নাকি?" মিসেস সোম আশ্চর্যভাবে বললেন।

মিসেস দত্ত বললেন, "সেই ছেলেটি, যার গর্দভ রাগিণীতে টেকা দায় হয় মাঝে মাঝে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" মিসেস চ্যাটার্জী উৎসাহিতভাবে বললেন, "গলায় সুর না থাক, হৃদয় তো আছে রে বাবা। হি হি হি —। বেসুরো অর্কেষ্ট্রার মতন ওঁদের হাসি বাজতে থাকলো।

মহুয়ারও মনে পড়লো রোববারের দুপুরটা। সত্যিই, গর্দভ রাগিণী। ছেলেটির বেসুরো রবীন্দ্র-সঙ্গীত ওদেরও শান্তিভঙ্গ করেছিল।

মিসেস দাশগুপ্ত কিন্তু তখনো অন্যমনস্ক। উনি যোগ দেন নি ওঁদের হাসিতে। ওঁর চোখ দুটো তিনতলার জানলার বাইরের আকাশে। ভেজা চোখের পাতা তুলে তাকালেন মিসেস দাশগুপ্ত। সরবতের খালি গ্লাসটা ট্রের ওপরে নামিয়ে রেখেই ঘড়ি দেখলেন, "এইরে এগারোটা বুড়ি। আরে, আমার ছেলের স্কুল ছুটির সময় হ'ল। আমি ভাই রসভঙ্গ করলুম। পালাই।"

মিসেস সোমও উঠে বললেন, "আমারও তো সময় হয়ে এলো প্রায়।"

"এই বসুন তো।" ওঁকে প্রায় ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন মিসেস চ্যাটার্জী। "আপনার মেয়ের ছুটি তো সাড়ে বারোটায়। এখনো ঢের দেরী।"

মিসেস দাশগুপ্ত বেরিয়ে যাবার পর ওঁদের কথা আর তেমন জমে না।

কিছুক্ষণ পর প্রগল্ভ মিসেস চ্যাটার্জী

আপন মনেই বলেন, "আমার ছেলেমেয়েদের ছুটি সেই সাড়ে তিনটেয়। স্কুল বাস ওদের পৌঁছে দিয়ে যাবে সেই চারটেয়।"

নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহুয়া। বুঝাটা যে কবে বড় হবে। ও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে কথাটা।

হেসে ওঠেন সবাই। মিসেস সোম বললেন, "রেস্ট নিন, রেস্ট নিন। ছেলের ইস্কুল শুরু হলে তো সময়ই থাকবে না।"

"কি রে তাই নাকি?" বুবার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে হাসেন মিসেস দত্ত।

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "না বাবা, ছেলেমেয়ে স্কুলে কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকে বলেই তো আমাদের এই অবসর। রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সটা নইলে কি এমন করে জমতো?"

"তা সত্যি।" মহুয়াকে দেখিয়ে মিসেস সোম বললেন, "উনি নিশ্চয় তেমন সময় পাবেন না আমাদের এই রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে যোগ দেবার মতন।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার তো ছেলেকে নিয়েই সারাদিন কেটে যায়।"

"তবু আমাদের দিকেও মাঝে মধ্যে চাইবেন।" মিসেস দত্ত বললেন, "আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু পার্লামেণ্ট থেকে পকৌড়া, টলের ডিজাইন থেকে কত্তার মেজাজ।"

আবার হাসির ধুম পড়ে যায়।

"রিয়েলি।" মিসেস সেন বলেন, "আমি তো ওকে বলি, অফিস তো তোমার নয়। অফিস আমার। সকালে তাড়া লাগিয়ে লাগিয়ে ঘুম থেকে ওঠানো। তার আগে বার দুয়েক বেড্ টি। অফিস যাবার সময় দরকারী কাগজ-পত্তর গুছিয়ে দেওয়া। ওদিকে তখন ছেলে-মেয়ের স্কুলের বাস এসে যায়। নিজের অফিসের ফাইলগুলো পর্যন্ত ঠিক করে রাখবে না ----।"

মিসেস সোম আচমকা বলে ওঠেন, "পুজোর বাজার হয়েছে নাকি মিসেস সরকারের?"

এতক্ষণ মিসেস সেনের দিকে তাকিয়েছিল মহুয়া। এবারে মিসেস সোমের দিকে ফিরে তাকায়, "না, এখনো তেমন কিছু ---।"

মিসেস সেনের দিকে আড়চোখে চেয়ে মিসেস দত্ত বললেন, "পুজো বাজার এবার মিসেস সেনের। কত্তা হেভী বোনাস পেয়েছেন।"

"কেন, আপনার বাজারও তো দেখলুম কম হয় নি।" মিসেস সেন হাসেন। মিসেস দত্ত বলেন, "কই আর তেমন? আমার কত্তা তো আর বোনাস পান না।"

মিসেস সেন কৌতূহলী হন, "কেন?"

"বহুদিন আগেই তো উনি ষোলোশো পেরিয়ে গেছেন। ষোলোশোর ওপরে আর বোনাস কোথায়?"

"আপনার স্বামী কি ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট র‍্যাঙ্কে রয়েছেন?" মিসেস চ্যাটার্জীর সরল প্রশ্নের উত্তরে মিসেস দত্ত একটু হাসেন। বলেন, "না, উনি তো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট র‍্যাঙ্কে।"

কাষ্ঠহাসি হেসে মিসেস চ্যাটার্জী বলেন, "তবে তো বিগ্ বিগ্ ব্যাপার।"

মিসেস দত্ত হাসেন। হাসিটা কেমন যেন দার্শনিক দেখায়। আর মিসেস সেন থম্ মেরে যান। চেষ্টা করেও উনি হাসতে পারেন না।

খানিকক্ষণ পর মিসেস চ্যাটার্জী বলেন, "আমার কত্তার বাপু কলেজের ব্যাপার। নিতান্তই মাস্টারী।"

"থামুন, থামুন।" মিসেস সোম বলেন, "আপনার কত্তা তো নোট লিখে বস্তা বস্তা টাকা ----।"

"মা বলেছেন।" খুশির হাসি হাসতে থাকেন মিসেস চ্যাটার্জী, "আর আপনার কত্তা?"

"আমার কত্তার তো বিজনেস্।"

"আপনারই তো পোয়া বারো।" মিসেস দত্ত হাসতে লাগলেন। মিসেস সেন তখনো গম্ভীর।

মহুয়া অবাক হয়ে দেখছিল ওঁকে।

রূপ সেদিন বলছিল, বেশ তো ছিলুম পরের বাড়ীতে। মাস গেলে কিছু টাকা ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত। ওই সামান্য ভাড়ায় অমন পাড়া ভাবা যায়? নেহাত ভদ্দরলোক বাবার বন্ধু ছিলেন তাই। তা না তোমার ফ্ল্যাট কেনার সখ হল। ও পাড়ার কাছে এ পাড়া? ছঁ। ওখানে কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাতে যেতো না। কেউ কাউকে তোয়াক্কা করতো না।"

মিসেস চ্যাটার্জী আর একখিলি পান মুখে পুরে হঠাৎ বলেন, "এই, একদিন ছেচল্লিশ নম্বরে চলুন।"

"এই 'এ' ব্লকেই?" মিসেস সোম প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফার্স্ট ফ্লোরে অমিয়ার ছেলের খুব অসুখ।"

"ও মা, তাই নাকি?"

"মিসেস দে নাকি পরশু সারা রাত ওদের বাড়ীই ছিলেন। অমিয়ার ছেলের মাথার আইস ব্যাগ চেপে বসেছিলেন মিসেস দে।"

"তা এ খবরটা আরো আগে বলতে পারেন নি?"

মিসেস চ্যাটার্জী অপরাধীর মতন মুখ করে বললেন, "ভুলেই গেছিলাম। ইয়ে আমার ছেলে কাল বলছিল। তা অমিয়া তো আমাদের সঙ্গে বড় একটা মেশে-টেশে না।"

গলার স্বর খাদে নামিয়ে মিসেস সোম বলেন, "মিসেস দের সঙ্গে বুঝি ওঁর খুব ভাব?"

"কি ব্যাপার বলুনতো?"

"আহা জানেন না বুঝি?" মিসেস দত্তের চোখ হেসে ওঠে, "অমিয়ার স্বামীতো মিসেস দে'র কলেজের বন্ধু।"

মিসেস সোম তেমনি সুরেই বলেন, "তা পুরনো প্রেম বুঝি নতুন করে ঝালাই হচ্ছে?"

"তাছাড়া আবার কি?"

"অমিয়া কিছু বলে না?"

"কি বলবে? স্বামীর ব্যক্তিত্ব বেশী থাকলে তা হয়।"

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই নীচে গাড়ীর আওয়াজ। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "এই, আপনার কত্তা।"

মহুয়া প্রায় আঁতকে উঠলো। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো একগাদা কাঁচা মাছ।

"পালান, পালান।" মিসেস সোমের গলাটা আর্তনাদের মতন শোনালো।

হুড়োহুড়ি করে সবাই বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় মহুয়ার দিকে তাকিয়ে মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "আমি কিন্তু তোমায় তুমিই বলছি। বয়সে অনেক ছোট। এসো একদিন।"

মিসেস দত্ত বললেন, "এই, আসবেন।"

ওঁরাও বললেন, "এই, এসো, কেমন।"

নাম ষষ্ঠিচরণ। রোগা, একটু চ্যাঙা, তামাটে রঙ। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। ইস্কুলে টিফিন পিরিয়ডে লজেন্স, পাঁউরুটি, বিস্কুট বেচতে যায়। আবার ইস্কুলের যেদিন ছুটি, সেদিন চলে যায় এপাড়া-ওপাড়া অনেক দূর। একদিন সন্ধ্যার মুখে সে দূরের গাঁ থেকে ফিরে আসছে, মাঠের মাঝামাঝি দেখা হয়ে গেল পিরিমল হাড়ির সঙ্গে। তারপর এই গল্প।---

পিরিমল হাড়ির বয়স বাহান্ন-পঞ্চান্ন। মাথায় পাঁকল জটা, কানে তামার আংটা, ইয়াব্বড়ো গোঁফ। কটা চোখের তারা, পর্দা ছাগলের ঝুঁড়ির মতো নীলচে। সে ওস্তাদ লোক। ভূতের রোজা। গুণিন। বশীকরণ মারণ উচাটন ইত্যাদি ষট্‌কর্মে সিদ্ধাই পুরুষ। ত্রিকালজ্ঞ।

মাঠের মধ্যিখানে একটা পুকুর। পুকুরের ধারে একটা ঝাঁকড়া বেঁটে গাছ। ফলগুলো বাঘের নখের মতো দেখতে। তাই গাছের নাম বাঘনখা। তার তলায় বসে পিরিমল ওস্তাদ একটা কিছু করছিল। ষষ্ঠিচরণকে দেখে অথবা তার পায়ের শব্দ শুনে নড়ে বসল।

ষষ্ঠিচরণের বুক ছাঁৎ করে উঠেছিল। না জানি কী অঘটন ঘটাচ্ছে হাড়ির পো। কাকে নির্বংশ করছে, নাকি কার ঠ্যাঙে বগীবাণ মেরে বাত ধরাচ্ছে। কিংবা নাকি কোন ছোঁড়ার পয়সা খেয়ে কোন ছুঁড়ির মন ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

ষষ্ঠিচরণ দাঁত বের করে তার দিকে এগোলো। না এগিয়ে উপায় নেই। গাছের তলা দিয়েই গেছে পায়ে চলার সরু পথ। সিঁথির মতো পরিষ্কার। আর তখন সূর্য ডুবছে সোনা-টিকুরির মাঠের শেষে। ধনুকবাঁকা একটা রেখা ছুঁয়ে লাল ড্যাবডেবে ডিমের কুসুম গলছে। আঠালো লালচে আলো এলোমেলো মাখামাখি হচ্ছে এখনো সেখানে। ষষ্ঠিচরণ সেই আলো পিরিমলের মুখে দেখতে পেয়ে অন্তরে-মন্তরে খুব বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

ওই যে এখন আকাশ হটিটি পাখির ডাকে ভরে গেছে। গাছের গোড়ায় একটা ধানের শীষ আছে। কয়েক টুকরো শুকনো কাঠের গুঁড়ি আর কিছু শুকনো পাতাও আছে। ষষ্ঠিচরণ বলল—'কাজে' এসেছ ওস্তাদ?

পিরিমলের মুখে হাসি নেই। মাথাটা নাড়ল। তারপর বলল—কেমন বেচাকেনা হল? বাপ ষষ্ঠি?

ষষ্ঠিচরণ বাপ শুনে গলে গেল। বলল—হ'ল কিছু-কিছু। লোকের হাতে পয়সাকড়ি নাই হে ওস্তাদ। দিনকে দিন ঝিম মেরে যাচ্ছে। আজ তিনটে পেরাইমারি ইস্কুল ঘুরলাম। বললে বিশ্বাস করবে না, তিনটে টাকাও বেচিনি।

—গাঁ-গেরামে আর সুখ নেই রে বাছা। তবে টাউনবাগে যত সুখ।

যা বলেছ। ষষ্ঠিচরণ সায় দিল। তবে আমার হ'ল গে জ্বালা। টাউনে একেবারে মন টেঁকে না। যাই বটে মালটাল কেনাকাটা করতে, কতক্ষণে পালাব তাই ভাবি। দূর দূর।

পিরিমল বলল—ক্যানে?

—টাউনে বড্ড খরচা।

—রোজগারও তেমনি বাপ ষষ্ঠি। পিরিমল হেঁড়ে গলায় জ্ঞান দিল।---একাদোকা মানুষ তুমি। লেজে-পিঠে দুটো-পাঁচটা থাকলে বরঞ্চ ভাবনা ছিল। খাবে ভাল। পরবে ভাল। ছিনিমাটা দেখবে। রঙবাজী করবে।--- সে বেজায় কাশতে থাকল। তারপর সিগারেট ধরে নেভাল এবং কানে গুঁজলো।

ষষ্ঠিচরণ বলল—রঙবাজীর আর বয়েস আছে ওস্তাদ? এবং সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে থাকল।

পিরিমল তাকে দেখছিল। সাপের মতো চোখ, পলক পড়ে না। ষষ্ঠিচরণ তার সামনে বসে সিগারেট বের করে বলল—খাও ওস্তাদ।

পিরিমল আপত্তি করল না। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিল। দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে ষষ্ঠিচরণ দেখে ফেলল, পিরিমলের পাছার তলায় একটা মড়ার মাথা

—বয়েস? ষ্যাটাছেলের বয়েস লাগে না বাপ। অঘোর পোষ্টোমাষ্টেরের বয়েস কত?

—হুঁঃ। ছাড়ো ওস্তাদ। দুধ-ঘি খাওয়া শরীলের কথা বলতে আছে?

—দুধ-ঘি। তোমার মাথা খারাপ ষষ্টি? তিন পয়সার মাছ কেনেন, তাও কত ছলছুতো, ঝগড়া। কিপটের রাজা।—পিরিমল তেতো হয়ে বলল। তারপর বেমক্কা হেসে ফেলল আবার।

—হাসছ ক্যানে ওস্তাদ?

বাপ ষষ্টি, কাকেও বলিসনে। সেদিন দুপুরবেলা অঘোর পোষ্টোমাষ্টের সুবাসিনী চুড়িওলীর হাত ধরে টেনেছিল। সুবাসিনী গালে চড় মেরে বলেছিল—ঘাটের মড়া মিনসে। দিনধ্যান দেখে সোনাটুকুরির মাঠে যেও। দেখব শরীলে কতটা জোর। তারপর---

—তারপর, তারপর?

পিরিমল ফের সেইরকম হাসল।—গিয়েছিল।

—তারপর, তারপর?

—বাঘ-বাঘিনীর খুব যুদ্ধু হল। বাঘের গা বাঘিনীর নখে ফালাফালা।—পিরিমল একটু গম্ভীর হল।—আঙুল তুলে পুকুরের পশ্চিম পাড় দেখিয়ে ফের বলল—ওখেনে যুদ্ধুটা হচ্ছিল। বলবে, আমি কিসে জানলাম। ওই সময় আমার একটা 'কাজ' ছিল, এক পহর রাত হবে। ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনে টের পেলাম। আর আঁধারেও আমি দেখতে পাই বাপ ষষ্টি।

—তা পাও বটে। কী দেখলে?

—মানুষ এখনও জন্তু, বাপ।

—হুঁ। মানুষ এখনও জন্তু।---

দিন শেষের ফিকে আলোটা রঙ খুইয়ে পেঁচার বুকের মতো ধূসর হতে-হতে কালো হয়ে যাচ্ছে; বিলের দিক থেকে হয়তো শেষ পাখিটিও ফিরে এল। পিরিমল বলল—তাহলে এবার গা তোল ষষ্টি, আমি 'কাজে' বসব। ওই দেখ, তারা ফুটল। আমার লেট করা চলবে না।

ষষ্টিচরণ মুখ ঘুরিয়ে আকাশের প্রথম তারা দেখে নিয়ে বলল—হুঁ, উঠি।

সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হাঁটুর হাড়ে চাপা একটা শব্দ হ'ল। তারপর যখন পা ফেলছে, সে টের পেল শরীরের ওজন অসম্ভব বেড়ে গেছে। পা টলছে। মাথা ঘুরছে। টায়ারের স্যাণ্ডেলের তলায় যেন আঠা মাখানো আছে। মাটির সঙ্গে আটকে যাচ্ছে। পা টেনে টেনে অতি কষ্টে হাঁটতে থাকল ষষ্টিচরণ।

পিরিমল ওস্তাদের কথা মিথ্যে হবে কেন? তাকে খামোকা মিথ্যা বলবেই বা কেন? ওস্তাদ তো জানেই না, সুবাসিনীর সঙ্গে ষষ্টিচরণের ভেতর-ভেতর কী সম্পর্ক। সুবাসিনী যদি ষষ্টিচরণের জাতের মেয়ে হ'ত, কবে স্যাঠাটা হয়ে যেত। দু' জনেই একলা মানুষ।

সুবাসিনী বেদের মেয়ে। ষষ্টিচরণ কুনাই বংশে জন্মেছে। সুবাসিনী চারটে স্বামীর বুকে লাথি মেরে একলা হয়েছে। ষষ্টিচরণের বউ রোগে ভুগে মারা পড়েছিল—তারপর আর বিয়েই করেনি। পয়সা-কড়িরও অভাব ছিল। ওদের কড়াকড়ি কনেপণের রেওয়াজ। ষষ্টিচরণের ভুঁই ছিল না এক কাঠাও। গেরস্থ-বাড়ি রাখালী করে মানুষ হয়েছিল। এতদিন বাদে দু' দশ টাকা জমিয়ে বিস্কুট লজেন্সের কারবার ধরেছে। এদিকে একা থেকে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দোকা হওয়া মানেই আর একজনের ভাত-কাপড় যোগানো এবং নেহাত শরীলের জন্যে আর পাকাপাকি-ভাবে শরীল যোগাড় করতে ইচ্ছে করে না।

আগামী — মিত্রা মুখোপাধ্যায়

বাইরে-বাইরে শরীর জিনিসটার সুখ মেটাও, ব্যস। দায়দায়িত্ব নেই।

সেই সুখ মেটাতে গিয়েই সুবাসিনীর সঙ্গে সম্পর্ক। সুবাসিনীর বয়েস তার চেয়ে কিছু কম। চুল এখনও অঢেল এবং কালো কুচকুচে। থমথমে যৌবন। ভরা নদীর মতো। কিংবা দহের মতো—যার স্রোত বইছে, কী বইছে না, বোঝা কঠিন। গাঁয়ের মুখ্যুসুখ্যু বয়স্ক প্রেমিক তার প্রেমিকার যৌবনকে চেনাজানা জিনিস দিয়েই বোঝে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁটছিল ষষ্ঠিচরণ। বুকের ভেতর ঝড়। ওস্তাদ তাকে বড় ঝাংঘাতিক জায়গায় ঠেলে দিয়েছে।—

বড় গাঁ। ইস্কুল, থানা, ডাকঘর, সরকারী ডাক্তারখানা এসব আছে। জাতীয় সড়ক চলে গেছে গা ঘেঁষে। গাঁয়ের শেষে বেদেপাড়া। এক সময় দশ ঘর বেদে ছিল। এখন মরে হেজে দু'ঘরে ঠেকেছে। একঘর সুবাসিনীর, অন্য ঘর তার চাচাতো ভাই পীর বক্স। পীর বক্স পট দেখিয়ে গান করে বেড়াত। গরুর বদ্যিও ছিল। এখন ভিক্ষে করে বেড়ায়, সেও একা মানুষ। বোন সুবাসিনী মাঝে মাঝে পয়সা-কড়ি দেয়। আবার গালমন্দও করে। পীর বক্স বড় পেটুক লোক।

রাতে পীর বক্স একটা শব্দ শুনেছিল। সকালে দারোগা বাবুর কাছে শুধু ওটুকুই বলতে পারল। কেমন শব্দ? পীর বক্স আকাশ-পাতাল হাতড়ে তার বর্ণনা দিতে পারল না। শুধু বলল—কেমন একটা শব্দ।

সুবাসিনী ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছে। গলা কাটা। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ধারাল ক্ষুর ছাড়া অমন করে গলা কাটা যায় না। ঘরে রক্তের ছড়াছড়ি। গাঁয়ের বাবুরা বললেন—কুকুর আনুক পুলিশ। ধরা পড়ে যাবে।

অঘোর পোষ্টমাষ্টার দারোগা বাবুকে সাধা-সাধি করলেন। দারোগাবাবু বললেন—আপনার মাথা খারাপ মশাই? চোর-ডাকাতের কাজ। থামুন না, এক্ষুণি পাকড়াও করছি। এতে কুকুর টুকুর লাগে না।

সুবাসিনীর জন্যে গোয়েন্দা কুকুর? সূর্য পশ্চিমে উঠুক। এত খরচই বা দেবে কে? রিকেল নাগাদ গাঁয়ের নামকরা দাগী মকবুল আর জটা রাজবংশীকে ধরে চালান দিলেন দারোগা। মকবুলের বাড়িতে একটা ছোরা পাওয়া গেল। তাতে নাকি রক্তের দাগ ছিল। জটার বউ নাকি দীঘির ঘাটে সোয়ামীর কাপড় কেচে রক্ত সাফ করছিল—সেই কাপড়ও চালান গেল। জটার বউ বলেছে—ও কিছু লয় মাশাই, কুলার কষ। কলার মোচা কেটেছিল সিনসে—সেই দাগ। আমার বেটা-বেটীর মাথায় হাত দিয়ে বলছি মাশাই -----

দারোগাবাবু রুলের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছেন।

বছর ঘুরতে ঘুরতে মকবুল আর জটা রাজবংশীর যাবজ্জীবন মেয়াদ হয়ে গেল।—

পরের বছর তেমনি চৈত্রের এক শেষ-বেলায় ষষ্ঠিচরণ গাঁ ঘুরে ফিরে আসছে সোনাটিকুরির মাঠে। সেই পুকুরের ধারে রাঘনখার গাছের কাছে আসতে-আসতে হাতের রেখা অস্পষ্ট করে দিল সন্ধ্যার ধূসরতা। আকাশ হয়ে গেল হাটটি পাখির বুকের মতো চিত্রিত আর রহস্যময়।

পিরিমল ওস্তাদ সেই সন্ধিকালে আবার 'কাজে' এসেছে। মড়ার মাথা, ধানের শীষ, সিঁদুরের মোড়ক এনেছে সঙ্গে। বশীকরণ মারণ উচাটন স্তম্ভন ইত্যাদি ষট্‌কর্মের কোন্ কর্মে বসেছে, ওর নিষ্পলক পিঙ্গল চোখ দেখে আঁচ করা যাবে না। ষষ্ঠিচরণ থমকে দাঁড়ায়। ওস্তাদ নাকি?

পিরিমল হেঁড়ে গলায় বলে—হ্যাঁ বাপ। গাঁ ঘুরে এলে দেখছি।

—হুঁ।

—বসো বাপ। সেকেরেট দাও একটা।

ষষ্ঠিচরণ বসে। সিগারেটও দেয়। পিরিমল বছরের হালচাল, দেশের অবস্থা, জিনিসের দর-দাম নিয়ে কথা বলতে থকে। ওস্তাদ লোক সে। ভূতপেরেতের সঙ্গে সব সময় কথা বলে, মুখ ক্লান্ত থাকে, তাই মানুষজনের সঙ্গে কথাটা কমই বলে। কিন্তু এখন তাকে কথার নেশায় পেয়েছে। ষষ্ঠিচরণ হুঁ্যা হুঁ দিতে থাকে। কিন্তু মনে মনে অবাক হয়।

তারপর পিরিমল হঠাৎ বলে—জটার বউ ভিক্ষে করছে। একগুচ্চের ছেলেপুলে। বড্ড খোয়ারে পড়েছে, বুঝলে বাপ ষষ্ঠি।

ষষ্ঠিচরণ বলে—হুঁ, যা দিনকাল পড়েছে।

—মকবুলের বউটারও বড্ড কাহিল অবস্থা। আজকাল টেঁকিও নাই যে গতর খাটিয়ে খাবে।

—হুঁ। গাঁয়ের মানুষ আজ বাঁচবে না ওস্তাদ।

—কী করে বাঁচবে? পিরিমল কেমন হাসে। ভগমানের চোখ দুটোই যে কানা, বাপ।

ষষ্ঠিচরণও হাসে।—তা যা বলেছ ওস্তাদ।

—ষষ্ঠিচরণ?

ষষ্ঠিচরণ তাকায়। পিরিমলের পিঙ্গল চোখ জ্বলছে। তার মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ওই ভুতুড়ে দৃষ্টি। সে বলে—উঁ?

পিরিমল সিগারেট ঘষটে নিবিয়ে কানে গোঁজে। তারপর বলে—গতবার এমনি সময়ে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। একটু পরে তুমি চলে গেলে। তখন তোমার পিছুপিছু একজনকে যেতে দেখেছিলাম। ভাবলাম, ডেকে সাবোধান করে দিই। তো আবার ভাবলাম চোখের ভুল। তোমার পিছনে কালো একটা লোক ছিল।

ষষ্ঠি একটু কেসে বলে—এখন সে নাই ওস্তাদ? তাকিয়ে দেখ দিকিনি।

পিরিমল ঘড়ঘড় করে বলে—হুঁ। আছে।

—তাহলে মুখ বুজে থাকো, ওস্তাদ।

ভয় পাওয়া গলায় পরিমল বলে—মুখ বুজেই তো আছি বাপ। এক বছর মুখ বুজে আছি।

—হুঁ, তাই থাকো।—বলে ষষ্ঠিচরণ ওঠে। তার পা দুটো কাঁপছে। উরু তারি লাগছে। ঠিক গত বছরের সেই সন্ধ্যার মতো। মাথাও ঘুরছে যেন। পা ফেলতে গিয়ে টলে পড়বে মনে হচ্ছে। তারপর সে রুখে দাঁড়াল। পিরিমলের দিকে ঝাঁপ দিল। এই সময় শূন্য ধানক্ষেতে খড়কুটোর শব্দ তুলে একটা হাওয়া এল বিল থেকে। বাঘনখার গাছের ডালে অন্ধকার থেকে তেকে উঠল একটা প্যাঁচা ক্যাঁও—ক্যাঁও—ক্যাঁও। মাথার ওপর আকাশে তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো একঝাঁক বুনো হাঁস চেঁচাল আঁক—আঁক—আঁক্। একটু দূরে গলা কাটিয়ে বিকট আর্তনাদ করে উঠল একটা শেয়াল। পিরিমল হাড়িও গর্জন করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—খবর্দার ষষ্ঠিচরণ।

তারপর ষষ্ঠিচরণের দিকে মড়ার মাথাটা তুলে অংবং করে ঘুরে পড়তে পড়তে সে এগোল। আবছা অন্ধকারে মড়ার মাথাটা দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর হাসছে—শব্দহীন তার অমানুষিক হাসি। প্রসারিত মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

দিন রাতের মধ্যিখানে একটা সাঁকো। সেই সাঁকোর এক পারে পিরিমল, অন্য পারে ষষ্ঠিচরণ; আর পিরিমল এগিয়ে আসছে। শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো গলায় মন্তর পড়ছে। মড়ার মাথাটা প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে। ষষ্ঠিচরণের কানে এল প্রসারিত শব্দহীন সাদা হাসির স্তরে স্তরে এবার হাজার হাজার ঢাক বাজতে লেগেছে। ষষ্ঠিচরণ সাঁকো থেকে সরে আসার জন্যে পিছু হটে। কিন্তু বুঝতে পারে সাঁকোর এপারে অন্ধকার আরও ঘন। তখন সে বোবা মানুষের মতো আর্তনাদ করে কোথাও ঝাঁপ দেয়, পিঠ থেকে বিস্কুটের টিন ছিটকে পড়ে। টায়ারের স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে যায়। খালি পায়ে সে দৌড়য়। আছাড় খায়, আবার দৌড়য়। পিছু ফেরে না।—

* * *

এখন আর ষষ্ঠিচরণ ইস্কুলে ইস্কুলে লজেন্স বিস্কুট বেচে বেড়ায় না। জাতীয় সড়কে কোন কোন দিন তাকে দেখা যায়। আধ ন্যাংটো, নোংরা শরীর। আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটে। সে পাগল হয়ে গেছে। পাগলদের যা করা উচিত, তাই করে। কিন্তু তার পাগল হওয়ার কারণ কেউ জানে না। হয়তো একজনই জানত। তার নাম পিরিমল হাড়ি। সে কিছুদিন আগে রোগে ভুগে মারা পড়েছে। তার মাথায় জটা ছিল। কানে তামার আংটা ছিল। একটা জ্যান্ত মড়ার মাথা ছিল। সে অন্ধকারের খবরাখবর অনেকখানি রাখত। কত লোকের সর্বনাশ করেছে সে।---

এক নূতন বাংলা গড়তেও আমরা সাহায্য করি

★★★ ★★★ ★★★

- সমবায়গুলির মাধ্যমে দরিদ্র কৃষককে তাঁর চাষ-বাসের জন্য আমরা অর্থ-লগ্নী করি।
- বাংলার বেকার যুবকদের অর্থকরী চাকরির বন্দোবস্ত করতে আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের সমবায়গুলিতে ও শিল্প সমবায়গুলিতে অর্থ-লগ্নী করি।
- সমবায়গুলির মাধ্যমে আমরা পরিবহণ কর্মীদের সহায়তা করি।
- ক্রেতা সমবায়গুলির অর্থ-লগ্নীর মাধ্যমে মূল্যস্তর বেঁধে দিতেও আমরা সাহায্য করি।

আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য সত্ত্বেও বাংলার পরিসেবা করতে আমরা এখানেই আছি।

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

২৪এ, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

মনে নেই

রমানাথ রায়

কলিং বেল টিপতেই বুলির গলা ভেসে এল।

—কে ?

—আমি।

বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বুলি আসবে, বুলি দরজা খুলে দেবে, কিন্তু বুলি কই ? পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন ? কি হল বুলির ? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ? আবার কলিং বেল টিপলাম। আবার বুলির গলা ভেসে এল।

—যাচ্ছি।

রাত বাড়ছে। চারদিক আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে আসছে। ক'টা বাজে এখন ? সিঁড়িতে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় হাত-ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি পৌণে বারোটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার কলিং বেল টিপলাম।

এবার আর বুলির গলা শুনতে পেলাম না। এবার বুলির পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। বুলির পায়ে স্লিপার। বুলি দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দরজার কাছে এসেই স্লিপারের শব্দ থেমে গেল। এবার ছিটকিনি খোলার শব্দ হবে। খিল খোলার শব্দ হবে। না, কোন শব্দ হ'ল না। কি করছে বুলি ? দাঁড়িয়ে আছে কেন ?

—বুলি।

—কি ?

—দরজা খোলো।

বুলি দরজা খুলল না। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিক থমথম করছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। হঠাৎ কোত্থেকে একটা বিড়াল লাফ দিয়ে নিচে নেমে গেল।

—বুলি। এই বুলি।

—কি ?

—দরজা খোলো।

—ক'টা বাজে?

—পৌণে বারোটা।

—ক'টায় বেরিয়েছ?

—আগে দরজা খোলো। আমার কষ্ট হচ্ছে।

—আমারো।

—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

—আমিও না।

—আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

—আমারো।

—আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—আমারো।

—দরজা খুলবে না?

বুলি কোন উত্তর দিল না। বুলি আজ ভীষণ রেগে গেছে। কি হয়েছে বুলির? আমি ত প্রতিদিন রাত করে বাড়ি ফিরি। বুলিও প্রতিদিন ঘুমজড়ানো চোখে দরজা খুলে দেয়। কোনদিন কিছু বলে না। আজ এমন কি হ'ল? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। আজ বিকেলে আমার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কথা ছিল সন্ধ্যের শোয়ে আমরা সিনেমা দেখব। অফিস থেকে বেরিয়ে কথাটা আর মনে পড়েনি। মনে পড়লে আজ আর অন্তত তাসের আড্ডায় যেতাম না।

—বুলি।

—কি?

—আমার কোন দোষ নেই।

—আমারো।

—অফিসের একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম, বেরোতে পারিনি।

—আমিও সারাদিন এখানে আটকেছিলাম, বেরোতে পারিনি।

—কতবার তোমার কথা মনে পড়েছে।

—আমারো কতবার তোমার কথা মনে পড়েছে।

—আমি কষ্ট পেয়েছি।

—আমিও।

একটু থেমে আবার অনুরোধ করলাম।

—বুলি।

—কি?

—আর পারছি না।

—আমিও আর পারছি না।

আমি এবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। রাত বাড়তে লাগল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেল। কি করব এখন? বুলি কি দরজা খুলবে না? আমায় কি সারারাত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে? আমি ভীষণ রেগে গেলাম।

—বুলি।

—কি?

—কি করছ?

—দাঁড়িয়ে আছি।

—অন্ধকারে?

—হ্যাঁ।

—আলো জ্বালোনি কেন?

—এমনি।

—তুমি রাগ করেছ?

বুলি এর উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞেস করলাম।

—তুমি রাগ করেছ?

এবারেও বুলি চুপ করে রইল।

—কাল তোমায় সিনেমায় নিয়ে যাব।

—সিনেমা আমার ভাল লাগে না।

—কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাব।

—বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

—তাহলে?

বুলি চুপ করে রইল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

—কি ভাল লাগে তোমার?

শাড়ি?

গয়না?

সেন্ট?

পাউডার?

নেলপালিশ?

চুলের ফিতে?

বুলি খুব রেগে গেল।

—আমি কি শাড়ি ভালবাসি?

গয়না ভালবাসি?

সেন্ট ভালবাসি?

পাউডার ভালবাসি?

নেলপালিশ ভালবাসি?

বুলের ফিতে ভালবাসি?

—তাহলে? কি চাও তুমি?

—কি চেয়েছিলাম?

—কি?

বুলি কোন উত্তর দিল না। আমারো কিছু মনে পড়ল না, বুলি কি চেয়েছিল? বুলি কি কোথাও বেড়াতে চায়? তিন বছর আগে বুলি একবার সিমলা যেতে চেয়েছিল। কি একটা কারণে সেবার আর যাওয়া হয়নি। বুলি কি এখন সিমলা যাবে? অন্য কোথাও?

—বুলি।

—কি?

—সিমলা যাবে?

বুলি চুপ করে রইল।

—কাশ্মীর?

বুলি এবারেও চুপ করে রইল।

—নৈনিতাল?

দার্জিলিঙ?

আলগোলা?

—আমি কোথাও যাব না।

—তাহলে?

বুলি আর কথা বলল না। আমিও আর কিছু বললাম না। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

—বুলি।

—কি?

—দরজাটা খোলো। আর পারছি না।

—আমিও না।

তারপর হঠাৎ ছিটকিনি খোলার শব্দ, খিল খোলার শব্দ। কিন্তু বুলি দরজা খুলে একমুহূর্ত দাঁড়াল না। ভিতরে চলে গেল।

—বুলি।

বুলি উত্তর দিল না। আমি শোবার ঘরে এলাম। বুলি অন্ধকারে বিছানায় বসে আছে।

—বুলি। কি হয়েছে? কি চাই তোমার?

—কিছু না।

—ফ্রিজ?

রেডিওগ্রাম?

স্কুটার?

টি-ভি সেট?

—আমার কিছু চাই না।

—তা'হলে?

—আর পারি না।

—কেন?

—তুমি একদিন বলেছিলে, কথা দিয়েছিলে---

বুলি কথাটা শেষ করতে পারল না। কেঁদে ফেলল। আমি চমকে উঠলাম। আমি বহুদিন বুলিকে কাঁদতে দেখিনি। বুলির চোখে জল দেখিনি। কাঁদলে বুলিকে এখন কেমন দেখায়? আমি সব ভুলে গেছি। বুলির মুখ?

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো জেলে দিলাম।

—বুলি, আমি কি বলেছিলাম?

বুলি উত্তর দিল না। কাঁদতে লাগল। আমি বুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—বুলি, আমি কি কথা দিয়েছিলাম?

বুলি উত্তর দিল না। কাঁদতে লাগল। আমি বুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—বুলি, আমি কি বলেছিলাম?

বুলি, আমি কি কথা দিয়েছিলাম?

বুলি এবারেও কোন উত্তর দিল না। কাঁদতে লাগল। আমি বুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার কিছু মনে পড়ল না।

সিনেমা

বলরাম বসাক

সিনেমাটা নাকি চলে যাবে এই বৃহস্পতিবারে। খুব ভাল বই। পুতুলদি বলেছিল। কড়ায় খুন্তি দিয়ে বাটা মশলা নাড়তে নাড়তে বিভার কয়েকবার হাঁচি পেল। বেড়ালটা তখন থেকে মিউ মিউ করছে। পাশের বাড়ির পাম্পারে জল ওঠার গম্ গম্ শব্দ। মাথা ধরিয়ে দিলে। সুধা স্নান সেরে ছাদে গেছে কাপড় মেলতে। কিন্তু নেয়ে আসার নামগন্ধটি নেই। নিশ্চয়ই ও বাড়ির ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে। বিভা ঠোঁট টিপে হাসে। কলেজে যাবার সময় হল সুধার। সে কথাটা কি মনে করিয়ে দিয়ে আসব? তাহলে দারুণ হয়। মনে করিয়ে দিয়ে আসি—সেই সুযোগে ছেলেটার সঙ্গে কী নিয়ে ছথ কাটাকাটি হচ্ছে—তাও বেশ জানা যাবে। ব্যাঙের মত বিদ্‌ঘুটে গলায় সোলে-ফোলে কোন্ এক সিনেমার যেন এক যাচ্ছেতাই গান গাইবে—সত্যি, অনেক দেরি হয়ে যাবে দেখছি। ওদিকে পুতুলদি যদি এসে পড়ে। রান্নাবাড়া, খাওয়া-দাওয়া সেরে পান চিবুতে-চিবুতে হেলতে-দুলতে আসবে, বলবে, কি বিভা, তোমার ঘররুন্না হ'ল? চল তীর্থে বেরুই—। বেড়ালটা বিভার মুখে মৃদু মৃদু হাসি দেখে লেজ নাড়তে থাকে। তাই বিভা বেড়ালটাকে একটু আদর করে ডাকতে বাধ্য হয়, পুষি, আমার পুষি, ঠোঁট দুটো চুমু খাওয়ার মত চলো করে চুক্ চুক্ শব্দ করে।

ওমা, এককালি রোদ, তাও সরে গেছে কখন। সুধা এখনো ছাদে করছেটা কি? এখনো আলু ক'টা জলে ধুয়ে নিল বিভা। ওদের সামনা-সামনি গিয়ে পড়লে বেচারিরা বেশ হকচকিয়ে উঠবে। সেটাই দেখতে হবে। ওদিকে কাগজ-ওয়ালা হাঁক পাড়ছে—'শিশিবোতল, কাগজ বিক্রি।' কাদের বাড়িতে একটা লোক তখন থেকে কড়া নাড়ছে। ওমা, মানুষগুলো কি মরে আছে? দরজাটা একবার খুলে দেবার সময় হয় না?

কাটা আলুগুলো কড়াই-এর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে দিতে বিভা ভাবল, সিনেমা যদি দেখতেই হয় তাহলে আরো একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। শুন শো যে। এগারোটার মধ্যে নাওয়া-খাওয়া শেষ করতে হবে। ননদ-ঠাকুরপোদের খাইয়ে-দাইয়ে কলেজে পাঠাতে হবে। নাঃ সুধাকে বাপু একটু তাড়া দেওয়া দরকার। ওর একটু হুঁশ নেই?—ওদিকে কলেজের বেলা বয়ে যাচ্ছে। রমেন ঠাকুরপোই বা কি? কোথায় যে এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে চেঁচামেচি করছে, শেষ সময়ে এসে তাড়াহুড়ো করবে, বৌদি বৌদি করে চেঁচাবে, বাথরুমে ঢুকে বেরুবার নামটিও করবে না,—প্রেম চালাচ্ছে? চাল নেই চুলো নেই, কী বিচ্ছিরি একটা গোঁফ নাকে ছেলেটার জমাদারের মত—। ওর সঙ্গে এত কথা কিসের বাপু? কথা বললেই ছেলেরা নাই পেয়ে যায়। আজকালকার ছেলে যা পাকা! কেলেঙ্কারি করা ছাড়া আর কিচ্ছু করতে জানে না। নাই দিলে একেবারে মাথায় উঠে বসে। তুই বাপু নিজেই বলিস, ওর নাম বিজু না হয়ে বিচ্ছু হওয়া উচিত। হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ।

আর ছোঁড়াটাকেও বলি, গায়ে-গতরে চামড়া নেই—এত মুখঝামটাও হজম করতে পারিস! মশলার জল ঢালতে ঢালতে কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল বারান্দায়। বিভা তাকিয়ে দেখল রোদের উপর দিয়ে বেড়ালটা ছুটে পালিয়ে গেল। নিশ্চয়ই মাছের হদিশ পেয়েছে—না কি চড়ুই পাখি। বিভা খুন্তি নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বেড়ালটা পাঁচিলের ওপর উঠে ওপাশের বাড়িটার দিকে হুমড়ি খেয়ে আছে। টিয়েটা ডাকছে যেন। টিয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছে না কি!

'বৌদি', সুধা পাশে এসে দাঁড়াল, 'কী দেখছ বৌদি?'

'দেখ, বেড়ালটা ওদের টিয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'ধ্যুৎ, ভাত বাড়ো দিকিন। কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে—সুধা বিভার হাত ধরে টানে।'

তাড়াতাড়ি থালায় জল ঢালে। থালাটা ধুয়ে ফেলে। তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে সুধাকে কলেজে পাঠালে তবু কিছুটা সময় হাতে থাকবে। বঁ হাতে পিঁড়ি পেতে দেয়। সুধা ঘটি থেকে জল ঢালে, কলকল শব্দ হয়। উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে রাখে বিভা। দুধের বাটি বসায়।

'আবার ঝগড়া হচ্ছিল বুঝি?' ভাত বাড়তে বাড়তে বিভা বলল।

'নাই গুডনেস্।' আমি যাব ঐ ছিনে জোঁক-টার সঙ্গে ঝগড়া করতে? আঙুল দিয়ে ভাত নাড়ে সুধা। গরম ভাতে ফুঁ দেয়। গরম বাষ্প চোখে, কপালে আর গালে লাগছে। 'সব সময় ছাদে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। জানে এ সময় চান করে ছাদে উঠব। দিলে কলেজের অনেক দেরি করিয়ে—।'

তুমি কোন সাড়া-শব্দ না করলেই পারো। বিভা এ কথা বলতে পারত। কিন্তু কিছু বলে না। মুখ টিপে মৃদু মৃদু শুধু হাসে। ভাবে ওকথা বললে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে সুধা। বলবে, তোমাদের ধারণা আমি বুঝি ওর সঙ্গে ডেকে কথা বলি। কিংবা তোমরা মনে কর, আমি বুঝি ওকে খুব নাই দিই।

'ওমা, মাছ নেই?'

বিভা হাসে। রমেনই তো বাজারে গিয়েছিল। অবশ্য একটু বেলা হয়েছিল।

'আসুক বড়দা। রমেনের বাজার করা খুচোচ্ছি—।'

'রমেনের কি দোষ?'

'কি দোষ? বাজারের পয়সা মেরে রোজ সিনেমা দেখছে। কলেজ করে না হাতি।'

শুনে বিভার বুক দুরদুর করে উঠল। সুধার দিকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল। সুধা চুক্ চুক্ করে ডাঁটা চিবুচ্ছে। মাছ হয়ত আনতে পারত রমেন, যদি রমেনকে বাজারের টাকা কম না দেওয়া হ'ত। বাজারের জন্য বরাদ্দ টাকা থেকে দু' টাকা কম দিয়ে তিন দিনে বিভা ছ'টাকা বাঁচিয়েছে। তা না করলে একদিন অন্তর মাছ হয়ত আসত বাজার থেকে। চুনোপুঁটি, ট্যাংরা। তা হোক, মাছ তো। বিভার বুকটা এখনো দুক্‌দুক্ করছে। ছ'টাকা বাঁচিয়েছে বিভা চুপিচুপি। কী করবে বিভা। পুতুলদি আসবে। বলবে, কি বিজু, তীর্থে যাওয়ার কী ব্যবস্থা হল? তীর্থ মানে নুন শো সিনেমা। পুতুলদি অবশ্য নিজেই অনেক টিকিট কেটেছে। বিভাকে কতদিন টাকা দিতে হয়নি। ছি ছি—এরকম রোজ রোজ হওয়া কি ভাল? মাঝে মাঝে বিভারও উচিত নিজে থেকে টিকিট কাটা। কিন্তু খরচটা সে করবে কোথা থেকে?

উনি যা হিসেবি মানুষ। রোজগারপাতি বেশি নেই, হিসেবি না হয়ে উপায় কি। সংসার খরচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব করে রাজেন বলে, 'বিভা, এই দিয়ে এই মাসটা চালিয়ে দাও।'

কী আর করবে বিভা। কোথা থেকে অতিরিক্ত পয়সা পাবে? রান্নাঘরের দেয়ালের লালচে পোড়া রঙটার দিকে তাকিয়ে বিভা নিঃশ্বাস ফেলে। শুধু বিয়ের দু'বছরের মধ্যে সব রকম রঙ লাল নীল সবুজ বেগুনি গোলাপি —কোথায় হারিয়ে গেল। প্রত্যেক রবিবারে সিনেমা, প্রত্যেক শনিবারে চৌরঙ্গিতে ঘুরে বেড়ান, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, তারপর চিড়িয়াখানা, যাদুঘরে, আউট্রামঘাটে, জলসার আসরে, রবীন্দ্রসদনে, কত জায়গায় যাওয়া—সব আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল।

স্বামীর সঙ্গে অনেকদিন সিনেমা দেখেনি। আর কী হবে দেখে? বিভা কি এখন একটু বুড়িয়ে গেছে না? এখন আর সে বয়স নেই। এখন আর সেরকম মানায় না। সে যদি দেখতে হয়, সমবয়সি ওপাড়ার পুতুলদি'র সঙ্গে বেরুলে মানায় ভাল।

হঠাৎ সুধা মুখ শক্ত করে। ভাত চিবুনো বন্ধ করে। মুখ তুলে কান পেতে কী শোনে। সুন্দর ফরসা গালে একটা বাঁকানো কালো চুল নেমে আসে। বিভা তাকিয়ে দেখে। সুধার চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে পড়েছে কেন? ভুরু দুটো কুঁচকে যাচ্ছে। বিভা বুঝতে পারে না কি হল।

'শুনছ শুনছ, বিজুদা শিস্ দিচ্ছে—।'

'বাবারে বাবা, তোমাকে নিয়ে আমি—।'

বিভা কী বলবে ভেবে পায় না। যেমনি ছোঁড়াটা, তেমনি সুধা। কানের কাছে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে, আর সুধাও দিব্যি কান পেতে রেখেছে। নাঃ এবারে একটু বিরক্তি দেখান দরকার, 'মুখ বুজে খাও দিকি, কে কোথায় শিস্ দিচ্ছে না কি করছে—'

'কী যে বল না বৌদি, তোমরা, বড়রা গুরুজনরাই যদি বল মুখ বুজে সহ্য করতে—'

'তোমার বড়দা আসুক—ওকে বলে—সত্যি বিজুটার আস্পর্ধা দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে—'

'হ্যাঁ, বড়দাকে ব'লো বৌদি—এ আমার একদম সহ্য হচ্ছে না।'

জল খেল সুধা ঢক্‌ঢক্ করে। বেরিয়ে চলে গেল কলতলায়। তারপর ঢুকল শোবার ঘরে। ওখান থেকে পাশের বাড়ির দোতলার বারান্দাটা দেখা যায়। হয়ত আড়াল থেকে সুধা একবার দেখবে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কি না বিজু।

একটু পরেই ঠক্ করে জুতোর শব্দ হ'ল। 'বৌদি' 'বৌদি' বলে চেঁচান শুরু হ'ল। 'লোনে-মার্কা' গানের তান শুরু হল। রমেন এসেছে। জামা খুলে এদিকে ছুঁড়ছে, গেঞ্জি খুলে ওদিকে ছুঁড়ছে। বিভার বেড়ালটাকে একথাবলায় তুলে নিয়ে তাকে টেবিলের ওপর দাঁড় করাল, তারপর 'প্যাম্‌পারা-ভ্যাম্‌পারা-প্যাম্‌পারা' বলে বেড়ালটাকে নাচাতে লাগল।

'এই রমেন, তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া সারো—'

'প্যাম্‌পারা-ভ্যাম্‌পারা-প্যাম্‌পারা—'

'কী হচ্ছে, কী করছ?—'

'প্যাম্‌পারা-ভ্যাম্‌পারা-প্যাম্‌পারা—'

'এই ছাড়ো ছাড়ো, ছেড়ে দাও, ক্ষেপে গেলে কামড়ে-টামড়ে দেবে—।' বিভার চেষ্টায় বেড়াল বেচারির মুক্তিলাভ হ'ল। তারপর রমেন তাড়াতাড়ি চান-খাওয়ার তাড়া খেল, 'তোমার কি কলেজ নেই? তোমাদের জন্যে আমি কি রোজই দেরিতে চান-খাওয়া সারব—?'

'বাব্বা বৌদি, এত তাড়া কিসের, পুতুলদি আসছে নাকি—'

বিভা হাসে। 'যাও, যাও—অনেক বেলা হয়েছে না। তোমার কি কলেজ-টলেজ নেই? না কি ওপাট চুকিয়ে দিচ্ছ?'

রমেনের কলেজ সুধার কলেজের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে শুরু হবে। সে জন্যে সুধার চেয়ে রমেনের তাড়া একটু কম। তবু রমেন বাথ্‌রুমে ঢোকে। রমেন যখন ঘাড়ে জল-গড়ান ভেজা চুলে বাথরুম থেকে বেরুল, সুধা তখন বই-খাতা ভরতি শান্তিনিকেতনী ঝোলা কাঁধে নিয়ে ফর্সা-নির্মল রূপ বিস্তার করে তার বৌদির ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—'বৌদি, তোমার আকাশী রঙের শাড়িটা আজ পরলাম—কি রমেন —কিরে আজ যে মাছ আনিসনি। আজ যে মাছ আসার কথা ছিল। বুধবার। নিশ্চই পয়সা খেড়েছিস্—?'

'দ্যাখ্ সুধা—' রমেন গায়ে পেন্সি চাপাতে বলে এদিক-ওদিক ঘুরে গেঞ্জিটা খুঁজছিল, হঠাৎ খোঁজা থামিয়ে সুধার দিকে ঘাই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'দ্যাখ্ সুধা, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে।'

'কি বাড় বেড়েছে—? কাল তোকে অশোকা হলে লাইন দিতে দেখেছি। পয়সা কোথায় পেলি?'

'বেশ করেছি—তোকে পাকামো করতে হবে না ফাজিল মেয়ে। তুই যেখানে যাচ্ছিস যা না—'

'ইঃ, যেখানে যাচ্ছিস যা না, আসুক বড়দা।'

বিভার বুক কাঁপতে লাগল। রান্নাঘর পরিষ্কার করছিল বিভা। আর তা পারল না। সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত কাঁপছে বিভার। রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে দেখল বিভা, দুই ভাইবোন পরস্পরের দিকে মারমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আঃ কী করছ,' বিভা এগিয়ে আসে, রমেনকে ঠেলে দেয়, 'যাও দিকি—তাড়াতাড়ি খেতে বস—'

'কেন বলবে। পয়সা মেরেছি?'

'কেন বলব না, কাল মাছ আসেনি, আজ তো মাছ আসবার কথা।'

'আঃ সুধা, তোমার কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে না—?'

'তুই কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখিস না?'

'কি—? কি বললি, আমি কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখি—তুই তোর বুকে হাত রেখে বলত আবার—'

'এই তো বুকে হাত রেখেছি—'

'তু-তুই বুকে হাত রাখতে পারলি—' সুধা কাঁদতে শুরু করে। ওর চোখ থেকে জল গড়াতে শুরু করে। গাল ভিজতে থাকে। চোঁট ভিজতে থাকে। বিভা সুধাকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। বিভার চোখ দুটোও জলে ভিজে আসছে। কিন্তু সুধাকে সেটা বুঝতে না দিয়ে আঁচল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দেয়, 'দেখ দিকি কাণ্ড, কোথায় কলেজে যাবে—'

'বৌদি, তুমি বিশ্বাস কর, আমি কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখি—?'

'তুমি কলেজ পালিয়ে—' সুধার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে বিভা, 'তুমি কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখলে পার্ট ওয়ান কি পাশ করতে পারতে? তুমি কি মনে কর, আমি রমেনের মত অবুঝ। তুমি পার্ট ওয়ান পাশ করেছ। রমেন তো ছেলে হয়ে তাও পারেনি। যাও, মাথা গরম করো না।'

সিপাই মিউটিনি

মধু গোস্বামী রচিত
সুর ঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

নির্দ্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

শম্ভু নাগ রচিত
সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

লেনিন

হিটলার

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী

ওথেলো

আমি সুভাষ

কার্ল মার্কস্

নেপোলিয়ন

মাও সে তুঙ্

ক্রীতদাস

পরিবেশনা

তরুণ অপেরা

ফোন ৫৫-৭১২১

স্তালিন

বিভা সুধার একটা আলগা চুল খোঁপার মধ্যে গুঁজে দেয়। শাড়ির আঁচল থেকে একটা আলগা সুতো তুলে নেয়। সুধা কাঁধের ঝোলাটা একবার একটু দেখে নেয়, 'হ্যাঁ বৌদি, শোন, ওঘরে টেবিলের ড্রয়ারটা খোলা ফেলে এসেছি। আর শোন, বিজুদার কথা এখন বড়দাকে বলে কাজ নেই। বড়দার যা মেজাজ। ভাল করে হয়ত ব্যাপারটা না বুঝেই যা-তা কাণ্ড করে বসবে। আচ্ছা চলি—।'

সুধা চলে গেল। বিভা আঁচলে মুখ ঢেকে খুব হাসল। তারপর আঁচল সরিয়ে হাসল। রান্নাঘর হয়ে ভেতরঘরে গেল। সুধার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারটা বন্ধ করল। তার সঙ্গে হাসিটাও বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটু গম্ভীরও হ'ল।

বিয়ে করবে না সুধা। হুঁ-হুঁ। বিয়ে আবার করবে না? বি-এ পাশের আগেই বিয়ে করবে। বিয়ের পরেও তো পড়াশুনা করা যায়। যায় না? ইচ্ছে থাকলেই হয়। অবশ্য বিয়ের পর অন্য-রকম সব ইচ্ছে এসে যায়। আর পড়ার ইচ্ছে থাকে না। বিভার খুব ইচ্ছে ছিল বি-এ পাশ করার। তা আর হ'ল না। বিয়ের দু' বছরের মধ্যে অমিত কোলে এল। তার চার বছর পরে ছোটকু। ছোটকু এখন ফাইভে পড়ে, অমিত এইটে। ওরা নাকি আজ ইস্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে, তবে নিশ্চই তিনটের আগে নয়। বারোটায় শো সুরু হলে, সিনেমাটা নিশ্চয়ই তিনটের আগেই শেষ হবে।

খেতে বসে রমেন সেই কথাই বলল।

দা, ওকে একটু জানাতেই হবে। ঐ ছেলেটার খপ্পরে সুধাকে পড়তে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। বখাটে ছেলে। কে জানে কলেজে-টলেজেও ওকে বিরক্ত করে কি না। তা সুধা যা মেয়ে, চড়-চাপড় না বসিয়ে দেয়। সেও তো একটা কেলেঙ্কারি। বিভা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। আয়নাতে পেছনের দেয়ালে বিয়ের সময়কার ছবিটা দুলছে। বিভা তখন সুধার বয়সী, তার স্বামীর মুখখানাও কেমন কচি-কচি। ছোটকুর মুখখানা ওর মত। অমিত শুধু ওর ফরসা রঙটা পেয়েছে। ওকে একটু জানাতেই হয়। আর কত! এ ত' বাপু তোমারই দায়িত্ব—বাড়ন্ত চেহারা—বয়স অল্প হলে কি হবে? বিয়ে দিয়ে এই সব যৌবন-ঝঞ্ঝাটের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাও। যার জিনিস সে বুঝে নিক। পড়াশুনা? এম-এ পাশ না করে

'দেখলে তো বৌদি সুধার ধারণাটা, কী ছোট মন, আমি নাকি বাজার থেকে পয়সা চুরি করি। ভাই-এর সম্পর্কে এই রকম ধারণা যদি বোনের হয়—' বলতে বলতে কথাটা শেষ না করে রমেন ভাত মুখে পোরে। চুপচাপ খাবারের দিকে মন দেয়। বিভা কোন কথা বলতে পারে না। ঢিপ ঢিপ বুকে, ছল ছল চোখে রমেনের খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে থাকে। ডাল ভাত আর আলুর ঝোল। বুকটা কাঁপতে থাকে বিভার। সুধা রমেন ছোটকু অমিত ঐ খেয়ে কলেজ যাচ্ছে, ইস্কুল যাচ্ছে। এর জন্যে বিভাই দায়ী। বিভা চোখ বুজে থাকতে চায়। 'পুতুলদিকে কিছুতেই ঠেকাতে পারি না।' বিভা তাকে একটিও সিনেমা দেখাতে পারেনি। স্বামীর কাছে টাকা চাইলে—

'স্বামীর কাছে চাইব?' স্বামীর মুখ দেখলেই বুক শুকিয়ে যায়। বিভা নিঃশ্বাস ফেলে।

'শোন, ছ'টা টাকা দেব কাল, আধকিলো কাটা পোনা নিয়ে এস। আর চিংড়ি মাছ। বুঝলে। কাল খুব সকাল সকাল বাজারে যেও—'

'না। আমি আর বাজার করব না বৌদি। আজ মাছ আনিনি, কাল আবার একটা বড় মাছ আনলে সুধা বলবে, ঐ দ্যাখ—কাল চেপে ধরেছিলুম বলেই না—।'

বিভা হেসে ফেলে। খিল খিল করে হাসে। বেশ একটু হেসে হাল্কা হয়, মনে হয়, যেন একটা অসুখ সেরে গেছে।

রমেনের কলেজে যাবার মুখে পুতুলদি এল, তার হাতে টিকিট। দুটি হলদে রঙের কাগজ। বিভা চুপ করে থাকে। কেমন করে পুতুলদিকে ফেরান যায়? কী বলে ফেরান যায়? কী অজুহাত দেখান যায়? অন্যদিন হলে বিভা বলত, 'এস পুতুলদি, বস। আমার চান খাওয়া কিচ্ছু হয়নি।' আজ বিভা বলতে ভুলে গেছে। পুতুলদি অবশ্য হাসতে হাসতে নিজেই চেয়ার টেনে বসল। 'কী বিভা, চান-খাওয়া সারো। আজ মনে হচ্ছে ভালো সিট্ পেয়েছি।' পুতুলদিকে কি ফিরিয়ে দেবে, নাকি আজও তার পয়সাতেই বিভা সিনেমা দেখবে? ইস্ কি বিচ্ছিরি লাগছে বিভার। কী করা যায়? বিভা কি টিকিটের দাম নিয়ে সাধবে? না কি আজও চেপে যাবে? এভাবে আর ভাল লাগছে না। বাজার খরচা থেকে ছ'টা টাকা বাঁচান হয়েছে, ইচ্ছে করলে এখুনি টিকিটের দাম নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে সাধাসাধি করা যায়। তাহলে বিভার দারুণ মুখ বাঁচে। বিভা কী করবে? বিভা ঠিক পারে না কী করবে। কাল তাহলে মাছ আনা হবে না।

টিকিটের দাম নিয়ে সাধলে পুতুলদি কি তা নিতে চাইবে? যদি নিতে চায়, তাহলে? তখন তো দিতেই হবে।

পুতুলদি'র দিকে তাকিয়ে বিভা অল্প একটু হাসে। পুতুলদি অবাক হয়ে বিভার দিকে তাকায়। কী হয়েছে বিভার? বিভা মাথা নাড়ে—কিচ্ছু হয়নি। বিভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কী আর এমন হয়েছে। শোবার ঘরে ঢোকে বিভা। আয়নার দিকে, নিজের দিকে তাকায়। তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছেলে হয় নি বলে কোন দুঃখ নেই সুজাতার। পর পর যে দু'টি মেয়ে হয়েছে, তাদের নিয়েই সে খুশি ও সন্তুষ্ট। ছোট মেয়ে মিনুর জন্মের সময় কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, আর কোনদিন সন্তান হবে না। দশ বছর তারপর কেটে গেছে।

না হোক। তার জন্যে এতটুকু ক্ষোভ নেই মিহিরের মনে। স্ত্রীর জীবন ফিরে পেয়েছে, তার চেয়ে বেশী আর কিছু চায় না সে। রূপে-গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায় অদ্বিতীয়া সুলতা। সে ছাড়া মিহিরের জীবন অন্ধকার; পৃথিবী শূন্য। মনের মধ্যে পুত্রাকাঙ্ক্ষা যতই থাক, কোনদিন মুখে তা প্রকাশ করে নি মিহির। বরং সুলতা যদি কোনদিন ছেলের কথা তুলে কিছু বলতে যায়, মিহির সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এখন তো আর আগের দিন নেই। ছেলে-মেয়ে সব সমান। দু'জনেই বাপের সম্পত্তির সমানাধিকারী। মেয়েরা ছেলেদের মতই লেখাপড়া শিখছে। চাকরী-বাকরী করে সংসার প্রতিপালন করছে। বরং ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা একদিক থেকে ভাল, মা-বাপের সুখ-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায়। সেবা-শুশ্রূষা করে।

এবার হেসে ফেলে সুলতা। বলে—তোমার ছোট মেয়ে মিনু কি বলে জানো?

—কি গো?

—বলে কোনদিন সে বিয়ে করবে না। চাকরী করে আমাদের খাওয়াবে। ছেলে হয়ে জন্মেছে বলে ওরা কি ভাবে! মেয়েরা তো দেখিয়ে দিচ্ছে, লেখাপড়ায় তারা কত ভাল। এম-এ, বি-এ পরীক্ষায় এবার ইউনিভার্সিটিতে কতগুলো সাবজেক্টে মেয়েরা ফার্স্ট হয়েছে—দেখেছো তো, কাগজে তাদের সব ছবি বেরিয়েছিল।

এই বলে একটু থেমে অন্য কথায় ফিরে যায় সুলতা। মিনুটার মধ্যে যেন পুরুষালী ভাবটা বেশী। সেদিন মিসেস্ মজুমদার বলছিলেন কি জানো?

কথাটা বলার আগেই হেসে গড়িয়ে পড়ে সুলতা। বলে—উনি বলেন, বিধাতা পুরুষ ছেলে গড়তে গিয়ে ভুল করে ওকে নাকি মেয়ে তৈরী করে ফেলেছেন। ও যখন চুপ করে থাকে, মনে হয় আহা কি সুন্দর! যেমন টকটকে রং, তেমনি নাক, চোখ, ভ্রু, কোথাও এতটুকু খামতি নেই। তোমার বড় মেয়ে বিনুকে সবই ওর চেয়ে বেশী সুন্দর বলে। শান্ত-শিষ্ট, ঠাণ্ডা প্রকৃতি ও বেশ একটা লক্ষ্মীঠাকুরের প্রতিমার মত টানা টানা চোখ, কালো বাঁকা ভ্রু; তবু কিন্তু আমার কাছে বেশী সুন্দর লাগে মিনুকে। বিনুকে দেখতে অনেকটা শান্ত-স্থির, জলে ফুটে থাকা পদ্মের মত। আর মিনু যেন সাদা গোলাপ। তার ডালে কাঁটা, পাতায় কাঁটা, ফুলের দিকে হাত বাড়াতে গেলে আগে কাঁটায় হাত ছড়ে যায়। ওঃ ছেলেগুলোর সঙ্গে খেলতে খেলতে যখন ঝগড়া বেধে যায়, কি চেঁচানো চেঁচায় ছেলেগুলোকে ও কি বলবো! আমার বাড়ীর সামনে রাস্তায় ওরা খেলাধুলো করে, আমি ওপরের জানলা থেকে সব দেখতে পাই। ছেলেগুলো যখন ওর কাছে হার মানে আমার খুব ভাল লাগে। মেয়েদের চিরকাল ছেলেরা পায়ে থ্যাঁতলাবে, সেদিন চলে গেছে।

এই বলে আবার খানিকটা হেসে নিয়ে সুলতা বলে, মিসেস্ মজুমদার বলেন, ছেলে হয় নি বলে ও তোর মেয়েকে মেয়ে আবার ছেলেও বটে, ভগবান একসঙ্গে তোর দুই সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন। তোর বরাত ভালো।

মিহির হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, না না, এসবে তোমার প্রশ্রয় দেওয়া মোটে উচিত নয়। তুমি মেয়েকে এখন থেকে 'কন্ট্রোল' যদি না করো তাহলে পরে আফ-

চলো বালিগঞ্জ প্লেস

সুমথনাথ ঘোষ

চেয়ে করতে হবে।

তা আমাকে বলছো কেন? তুমি বাপু, তুমি তো শাসন করতে পারো। বলে বলে আমি হার মেনেছি। সেদিন বুলটুর মা ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির, এমন তাকে ধিমচে দিয়েছে, বাছার গলা দিয়ে ঘুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে। তাদের সামনেই তোমার মেয়েকে বেশ যা-কতক কিল-চড় বসিয়ে দিলুম। কিন্তু একফোঁটা জল ওর চোখে এলো না। বুলটুর মা ছেলেকে নিয়ে চলে যাবার সময় গজগজ করতে থাকেন, এমন দস্যি মেয়ে জীবনে দেখি নি। এ পাড়ায় তো এত মেয়ে রয়েছে, সবাই খেলা-ধুলো করে, কে ওর মত দুষ্টু মারকুটি?

সুলতা বলে, তারপর থেকে ওকে আর খেলতে যেতে দিই নি। ওমা, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, চারটে দিনও গেল না, সেই বুলটু আর পাড়ার ছেলে-মেয়েরা এসে ওকে ডাকছে আবার খেলার জন্যে। বুলটুটা অবশ্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি বলদুম, না, ও দুষ্টু মেয়ে, ও আর তোমাদের সঙ্গে কোনদিন খেলবে না। তোমরা সব ভাল ছেলেরা মিলে খেলোগে।

তখন আবার তারাই এগিয়ে এসে বলে, মাসিমা মিনুর তো কোন দোষ নেই, ওকে আগে বুলটু মেরেছিল।

সেকথা তখন তোমরা বুলটুর মাকে জানাতে পারো নি, সাত কথা আমায় এসে তিনি শুনিয়ে গেলেন বাড়ী বয়ে? যাও ওকে আর কোনদিন খেলতে দেব না। এখন থেকে স্কুল থেকে ফিরে ছবি আঁকবে, সেলাই করবে, গান শিখবে।

ছেলেরা ফিরে গেলে মিনুকে যখন জিজ্ঞেস করলুম তোকে আগে মেরেছিল বুলটু কৈ সেদিন তো বলিস নি? এবার মেয়ে পিঠের জামা তুলে দেখালে তখনো কালসিটে দাগ মিলোয় নি। কি সহ্যগুণ!

একটু থেমে সুলতা বলে, ওদিকে আবার তোমার মেয়ের ভীষণ প্রেস্টিজ-বোধ। সকলের সামনে বলতে চায় না যে ওইভাবে ও মার খেয়েছে। তাই রেগে গিয়েছিল। বুঝলে?

—না, না, দিস ইজ তেরী ব্যাড! কৈ এসব কথা তো আমায় তুমি কোনদিন বলো নি! মিহির বিরক্ত হয় মনে মনে।

বলি নি ইচ্ছে করেই। একেই বেচারী মার খেয়েছিল তার ওপর তুমি আবার বকাবকা করবে! মেয়ে বড় হচ্ছে। তার ধারণা তুমি বিনুকে বেশী ভালবাস ওর চেয়ে। তাই বকাবকি করলে, পাছে তোমার ওপর ওর বিরূপতা বেড়ে যায় সেইজন্যে জানতে দিই নি।

—তাই বলে সহবত শিক্ষা দিতে হবে না?

সুলতা বলে, কত বোঝাই! বলি, দ্যাখ তোর দিদিকে সবাই ভালবাসে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, পাড়ার সেরা সুন্দরী মেয়ে। আবার প্রত্যেক বছর ক্লাশে ওঠে, প্রাইজ পায় তিন-চারটে। ইংরেজীতে ফার্স্ট, ছবি আঁকাতে ফার্স্ট, গুড কনডাক্ট—ক্লাশের সব মেয়ের চেয়ে স্বভাব-চরিত্রে ভাল, ধীর, নম্র, শিক্ষকদের বাধ্য, তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে, এ ছাড়াও সেকেন্ড হয়েছে বলে আরো কতগুলো বই পেয়েছে।

মিহির বলে, বিনুকে তো দেখছে, স্কুল থেকে ফিরে একদম বাইরে কোথাও বেরোয় না। রং-এর বাক্স নিয়ে ছবি আঁকতে বসে, সেলাইয়ের ডিজাইন তোলে, স্কুলের লাইব্রেরী থেকে যে বই আনে, ঘরে বসে বসে পড়ে। কোনদিন বা এসরাজ বাজিয়ে গান করে। ঘরের ভেতরে এত সব আকর্ষণ থাকতে, সব ফেলে বাইরে যাবে কেন? দিদিকে দেখেও কি ওর শিখতে সাধ যায় না?

জানি না। ইচ্ছে না থাকলে কি করবো বলো! পাঁচদিন টিক টিক করতে করতে হয়ত বিনুর কাছ থেকে কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলো, কি ছুঁচ দিয়ে দু'-একটা ফুল তুললো, ব্যস্, অমনি মেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। জিনিসপত্র সব ছড়ানো পড়ে থাকে, কখন চুপি চুপি বেরিয়ে যায় খেলতে।

—'দিস ইজ তেরী ব্যাড!'

—ব্যাড। বললে কি করবো? সকলের ধাতে কি সব সয়? ওসব ছবি আঁকা কি গান-বাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, কোন শিল্পকাজেই ওর মন নেই। তোমার বড় মেয়ের যেমন 'আর্টিস্টিক টেম্পারামেন্ট' ছোটটি একেবারে তার বিপরীত। দেখলে না, গত বছর পুজোর সময় দেশে গিয়ে কি কাণ্ডকারখানা করলে। এই পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, এই বকুলগাছে কোথায় পাখীর বাসা তাই খুঁজে বার করে, দু-তিনটে বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির। বলে, ওদের দুধ খাইয়ে বাঁচাবো। তোমার বড় জ্যাঠাইমা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, বছরকার দিনে প্রাণিহত্যা! যা, শীগগির রেখে আয় যেখান থেকে পেড়ে এনেছিস। পনেরোটা দিন তো মোটে ছিলুম, তার মধ্যে ওই মেয়ে বাগানের পুকুরে ভাই-বোনদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে কিভাবে সাঁতার শিখে ফেলেছে কে জানে! ওমা আসবার দিন একটা বাঁশের টুকরো বুকে করে ওই বড় পুকুর এপার-ওপার হলো। কোথা থেকে যে এই দস্যি মেয়ে আমাদের বংশে এলো, এমন ধারা কখনো দেখেনি, তোমার জ্যাঠাইমা বার বার বলতে লাগলেন।

তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ গা বৌমা, থাকো তো তোমরা কলকাতার শহরে, ওই সরু গলির ভেতরে ছোট্ট দু'খানা ঘরে—সে তো আমি সেবার অর্ধোদয়যোগে কালীঘাটে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে চোখে দেখে এসেছি—সেখানে থেকে এ মেয়ে কেমন করে এমন গেছো হলো যে গাঁয়ের মেয়েরাও হার মানে! কি দুরন্ত রে বাবা!

মিহির চুপ করে যেন কি ভাবছিল। স্বামীর চোখ দুটো দেখে হয়ত বুঝতে পেরেছিল তা সুলতা। তাই তাকে সচেতন করার জন্যে এবার বলে ফেললে, জানো, তোমার জ্যাঠাইমার কি ধারণা?

—কি?—মিহির সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

সুলতা বিরসকণ্ঠে বলে, তিনি বললেন, যেসব মেয়ের মধ্যে মদ্দাটে ভাব বেশী তারা অলক্ষুণে, জীবনে কখনো সুখী হয় না। সেদিক থেকে তোমার বড় মেয়ের তুলনা হয় না। বলেন, একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। যেমন মধুর স্বভাব, ঠাণ্ডা প্রকৃতি, তেমনি সুন্দর দেখতে। যার ঘরে বিনু যাবে, ধন-দৌলত উথলে উঠবে, তুমি দেখে নিয়ো বৌমা।

—হ্যাঁগো, জ্যাঠাইমা যা বললেন, যদি তা সত্যি হয়!

মিহির বলে ওঠে—যদি তাই ওর ভাগ্যে লেখা থাকে, তুমি, আমি কি তাকে খণ্ডন করতে পারবো? যা হবার—তাই হবে, ও নিয়ে এখন থেকে মিছিমিছি মন খারাপ করে লাভ কি? তার চেয়ে মেয়েকে ভাল করে বোঝাও, এখন তো আর ছোটটি নেই!

সুলতা বলে, না তা নয়। ভাবছি, কে বলবে যে ওরা দুই বোন একই মায়ের গর্ভে জন্মেছে। দু'জনের স্বভাব একেবারে বিপরীত, কোথা থেকে এমন হলো কে জানে। লোকে বলে মা-বাপের থেকেই ছেলে-মেয়েরা সব কিছু পায়। কিন্তু আমি তো কোনদিন ঘর থেকে বাইরে রাস্তায় পা দিই নি। স্কুল-কলেজে গেছি বরাবরই গাড়ী করে। স্কুলের গাড়ী বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াতো আবার দিয়ে যেতো। আমার বাবা ও মা দু'জনেই একটু সেকেলে ধরনের। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে বলেই যে রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবে, একেবারেই পছন্দ করতেন না। ঘরের মধ্যেই আমরা ভাই-বোনে মিলে খেলা-ধুলো করেছি যখন ছোট ছিলুম, বড় হয়ে লাইব্রেরীর বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ—সব পড়ারই সময় পেতুম না স্কুল-কলেজের পড়া করে। তেমনি তুমিও তো বলো, খেলাধুলো ছোটবেলায় কখনো করো নি। স্কুল-কলেজে যখন পড়তে, তখনো খেলা-ধুলোর বদলে স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন নিয়ে মেতে থাকতে।

মিহির বলে, হ্যাঁ, একটা কাগজ বার করা কি সোজা কথা? লেখা যোগাড় করা, ছবি আঁকানো, প্রেসে কপি দেওয়া, প্রুফ দেখা, বাইণ্ডিংখানায় ছুটোছুটি করা—

সব কিছুই আমার একা করতে হতো। যদিও নামে ছিল আরো দু'জনের সহ-সম্পাদক হিসেবে। কিন্তু তাদের পাত্তা পাওয়া যেত না কাজের সময়।

সুলতা বলে, মিনুকে তো তাই সব সময় বকি—তোর এমন দাম্বালে স্বভাব হলো কোথা থেকে।

মিহির কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে।

সুলতা বলে, কি ভাবছো?

—কৈ না! কিছু ভাবছি না তো।

—আহা! ওই বলে আর আমার চোখকে ফাঁকি দিতে হবে না। আমি জানি, মিনুর জন্যে তুমি সব সময় কি যেন চিন্তা করো।

যত দিন যায় রূপ যেন তত বাড়তে থাকে। যেমন বিনুর, তেমনি মিনুর। ওদের বাপ-মা দু'জনেই সুন্দর। তাই দুই মেয়েই হয়েছে সুন্দরী। তবু মিনুর রংটা যেন বিনুর চেয়ে বেশী চড়া। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা যখন ওদের দুই বোনের রূপের প্রশংসা করে, তখন বেশীর ভাগই বলেন—বিনু, তোমার বিনতার রংটা মমতার চেয়ে নিরেস হলেও চোখ, মুখ, নাকের তুলনা হয় না, তেমনি কুচকুচ করছে মাথা বোঝাই চুল, ওটা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে, আর মুখখানা অবিকল বাপের মতন। 'পিতৃমুখী সদা সুখী'। দেখো এ মেয়ে তোমার রাজরাণী হবে।

ওদের দুই বোনের সামনেই এমনি সব সমালোচনা হয়। একদিন মিনু আর থাকতে পারলো না, খপ্ করে বলে ফেললে, দিদি তো রাজরাণী হবে আর আমি কি হবো বললেন না তো মাসিমা? নিশ্চয় ঘুঁটেকুড়ুনী! আমি বাবার মত মুখও পাই নি, আবার মায়ের মত সুন্দর চুলও আমার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির রোল উঠলেও, মাসিমা বলেন, বাঁচাই যাই, ঘুঁটে-কুড়ুনী হতে যাবি কোন্ দুঃখে! রংটা কি তোর সোজা? তোর বাবার চেয়ে মায়ের রং ফর্সা, কিন্তু তুই আরো ফর্সা, যেন মেমের মত মনে হয়।

মিনু বলে, কিন্তু অনেকেই তো বলেন, মায়ের সঙ্গে আমার অনেক সাদৃশ্য আছে!

এক গাছের ফল কি দু'রকম হয়! আছে ঠিকই, তবে মায়ের মত সুন্দর খাই-মুখ তোর নয়। ঠোঁটের নীচেটা বেশী মোটা। নাকটাও মায়ের মত টিকলো তুই পাসনি। আর দেখতো, কি সুন্দর সরু বাঁকা ধনুকের মত তোর মায়ের ভ্রু দু'টো—

খিল খিল করে হেসে ওঠে মমতা। তাহলে মিলের চেয়ে মায়ের সঙ্গে অ-মিলই বেশী বলুন!

সুলতা মেয়েকে ধমক দেয়। ছিঃ! গুরুজনদের সঙ্গে কি এইভাবে তামাসা করতে আছে! যাও তুমি এখান থেকে। নিজের কাজ করোগে।

মমতা চলে গেলে উক্ত মাসিমা মন্তব্য করেন, ওকে তুমি বকে কি করবে! আজ-কালকার মেয়েরা সমীহ করে যে কথা বলতে হয় বড়দের সঙ্গে তা জানে না। আর জানবেই বা কি করে? পেটে থেকে পড়তেই মা-বাপ তাদের চালান করে দেয় ক্রীশ্চান ছুঁড়িগুলোর কাছে সভ্যতা-ভব্যতা শেখার জন্যে। বাড়ীতে খুঁড়ি, জ্যেঠে, ঠাকুরমার কাছে থাকলে নাকি 'স্মার্ট' হয় না। স্মার্ট মানে তো ওই ক্রীশ্চান ছুঁড়ি-গুলোর মত অসভ্য বেশভূষা, আর যাকে যা বলা উচিত নয়, তাই বলা। মেয়েগুলোর ঢং-ঢাং সব পুরুষের মত। কে পুরুষ, কে মেয়ে, এখন চেহারা দেখে আর ধরবার উপায় নেই। বাড়ীতে আমার ভাসুরঝিকে নিয়ে জ্বালে-পুড়ে মরছি দিন-রাত। তিনি নাকি খুব স্মার্ট। ওদের ক্লাশের সেরা মেয়ে—ওর মত মডার্ণ সাজগোজ করতে কেউ পারে না! এর জন্যে গর্ব আর ধরে না ওর বাপ-মার!

মমতা আর বিনতা একই স্কুলে পড়ে। বিনতা যেমন লেখাপড়ায় ভাল, মমতা —তেমনি খেলাধুলোয়। বিনতা প্রত্যেকবারে যেমন তিন-চারটে প্রাইজ একসঙ্গে পায়, মমতা তেমনি খেলাধুলো ও স্পোর্টস-এ দু'-একটা প্রাইজ পায় ফি বছরেই। এবার সে 'রেকর্ড ব্রেক' করেছে। ছ'টা বিষয়ে নাম দিয়েছিল, ছ'টাতেই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

স্কুল ম্যাগাজিন-এ বড় করে ওর ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে। বড়-ছোট কাপগুলো সব একটা টেবিলে, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে মমতা।

ক্লাশ নাইনে উঠেছে মমতা, আর ওর দিদি ইলেভেন্-এ। কিন্তু দিদির ছবি বেরোয় নি। সে তো ফার্স্ট হতে পারে নি! তাই সগর্বে স্কুল ম্যাগাজিনটা এনে মমতা ওর বাবার হাতে তুলে দেয়।

অফিস্ থেকে ফিরে সবে জামাকাপড়

বদলে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বসেছিল মিহির।

গদগদ-কণ্ঠে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সুলতা বলে, কি সুন্দর ছবিটা উঠেছে, না! দিব্যি বড় মেয়ে! কিন্তু কটোটা ঠিক তুলতে পারে নি—বড্ড যেন বয়সের তুলনায় বড় দেখাচ্ছে, তোমার কি মনে হয়?

এক চুমুক চা খেয়ে মিহির বলে, ক্যামেরাতে যেমন চেহারা তেমনি উঠেছে, পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু কেমন যেন মুখের ভাবটা হাঠখোট্টা গোছের উঠেছে।

দিনকয়েক পরে হঠাৎ মমতার মেজমামা এসে হাজির। তিনি থাকেন আমেদাবাদে। কি একটা অফিসের জরুরী কাজে আজই সকালে উড়ে এসেছেন; আবার কাল ভোরের প্লেন ধরে ফিরে যাবেন। তাই একবার দেখা করতে এসেছেন ওদের সঙ্গে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই তিনি সুলতাকে প্রশ্ন করেন, আরে এটা কে রে, ওঘরে একটা এ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছেলে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওমা, ও তো মিনু। ছেলে কোথায় পেলে, হা কপাল!

তা মেয়েগুলোকে যদি তোরা এমন ছেলে বানিয়ে ফেলিস তো আমার কি দোষ! চুলটা ছেঁটে ফেলেছে। পুরুষের মত প্যান্টের ওপর একটা ছোট শার্ট পরে আছে, নিওন আলোয় ঠিক মনে হচ্ছে যেন এ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছেলে।

মিহির আমার ভুলটা কোথায় হয়েছে, তুমি দেখিয়ে দাও তো।—বলতে বলতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বিনু, মিনু, ওদের বাবা সবাই এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। তারপর সবাই মিলে এক প্রশ্ন, ক'দিন থাকবেন?

ক'দিন কিরে? ক' ঘণ্টা বল। কালই ভোরের প্লেন-এর টিকিট কাটা। যেতেই হবে। এয়ারপোর্ট হোটেলে উঠেছি, এখুনি তোর কাছে খেয়ে চলে যাবো।

সুলতা বলে, বাবা, পাঁচ বছর পরে তো এলে, তা বোনের বাড়ীতে দুটো দিন থেকে যাবে, ছুটি নিয়ে আসতে পারো নি?

এখন জরুরী অবস্থা। আমার চাকরী তো জানিস, একদিন এখন ছুটি নেবার উপায় নেই। দেখি, পরে ছুটিছাটা পেলে সবাইকে নিয়ে ক'টা দিন কলকাতা বেড়িয়ে যাবো।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় মিহিরের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু' চোখের পাতা এক করতে পারে না। শেষে এক সময় চুপি চুপি উঠে টর্চ নিয়ে যে বিছানায় বিনু, মিনু দুই বোনে ঘুমোচ্ছিল, তার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। টুক্ করে টর্চটা জেলে মিনুর মুখের ওপর ফেলে কি যেন খুঁজতে থাকে।

ওর বুকের ভেতরটা দুর-দুর করতে থাকে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এ্যাংলোইণ্ডিয়ানের মত দেখতে।

যেমন নেমে গিয়েছিল তেমনিভাবে আবার নিঃশব্দে বিছানায় এসে ঢোকে। কিন্তু ঘুম একেবারে দূর হয়ে যায়। মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মনে পড়ে, যে নার্সিং হোমটায় মিনু জন্মেছিল, একজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মহিলাও সেখানে প্রসব হতে এসেছিলেন। একই দিনে তাঁরও একটি পুত্রসন্তান হয়।

সুলতার কেসটা খারাপের দিকে যায় প্রসবের পরই। তাকে নিয়ে ক'টা দিন যমে-মানুষে টানাটানি চলে.....।

পাঁচ দিন পরেই এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মহিলা ছেলে নিয়ে বাড়ী চলে যায় ...

একে একে সব কথা মনে পড়ে। পনেরো-ষোল বছর আগের ঘটনা, কিন্তু মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। মিহিরের মনে হয়, মিনুর যে এত দুরন্তপনা—সে যে বংশছাড়া বলে যখন-তখন আত্মীয়রা পর্যন্ত বলে, তবে কি তার মূলে কোন সত্য আছে! প্রশ্নের পর প্রশ্ন মাথার মধ্যে ভীড় করে আসে।

পরের দিন সকালে উঠেই ছুটে যায় মিহির সেই নার্সিংহোমটায়। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের এক পুরনো নামকরা নার্সিংহোম। ছোট কিন্তু ভাল চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের তুলনায় চার্জ খুবই কম। বাঘাগঞ্জের কোন নার্সিংহোমের তুলনায় অর্ধেক টাকা-পয়সা লাগে।

মিনুর জন্মতারিখটা বলে। তারপর সেদিন যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলার ছেলে হয়েছিল, তার পরিচয় জানতে চায়। পুরনো মোটা খাতা আলমারী থেকে বার করে কেরাণীবাবু তার নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে মিহিরের হাতে দেন।

১৫/৩ রয়েড স্ট্রীট। মহিলার নাম মারিয়া। আর তাঁর স্বামীর নাম এ্যাডফ্রেড গোমেস। মিহির ইলিয়ট রোডের ট্রাম থেকে নেমে বাড়ীর নম্বর খুঁজতে খুঁজতে একটা সরু গলির মধ্যে গিয়ে ঢোকে। একটা দরজার চিঠির বাক্সটার গায়ে অস্পষ্ট অক্ষরে এ গোমেস লেখা নামটা পড়ে খপ করে কলিং বেলটা টিপে দিলে।

একটু পরে দরজা খুলে দিলে একটা তরুণ ছেলে। বয়েস ষোল সতেরোর মতই, ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

তাকে দেখেই মিহিরের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। ঠিক এমনি বয়সে মিহিরকেও এই রকমই দেখতে ছিল। ও ঘরের দেওয়ালে সেফটো এখনো তেমনি অবিকৃত আছে। তবে কি এই সেই? আবেগে যেন গলার স্বর বুজে আসে।

তাকে নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে।

—কি চান? প্রশ্ন করে সে মিহিরকে।

—তোমার বাবা আছেন?

—না। তিনি তো প্রায় দু' বছর হলো মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! আহা-হা-হা... হঠাৎ মিহিরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

—কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারছি না! তার সঙ্গে আপনার কি পরিচয় ছিল?

—থাক সে কথা। তুমি তো তাঁর ছেলে?

—হ্যাঁ।

—তোমার মাকে একবার ডেকে দাও তো বাবা, দরকার আছে তাঁর সঙ্গে একটু।

—তিনি তো এখন বাড়ী নেই। ডাক্তারখানায় গেছেন এখুনি ফিরবেন। একটু অপেক্ষা করুন।

মিহির ঘরের ভিতরে ঢুকতে ছেলেটি তার পড়ার টেবিলের সামনে যে চেয়ারটা ছিল তাতে বসতে বললে ওকে।

—মিহির এবার জিজ্ঞেস করলে, তোমার নামটি কি বাবা?

—সে বললে, মাইকেল।

—তুমি কোন স্কুলে পড়ো?

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে, ক্লাস টেন-এ-।

—ওঃ এই তো দেখছি রয়েছে তোমাদের স্কুলের ম্যাগাজিন। বলেই টেবিল থেকে সেটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মিহির বলে, আমাদেরও স্কুলে এমনি ম্যাগাজিন ছিল—আমাকেই সব দেখাশুনা করতে হতো। তোমার ম্যাগাজিনটা দেখে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে সব।

একটা নয়, পর পর অনেকগুলো একই সংখ্যার পত্রিকা দেখে মিহির প্রশ্ন করে, একই সংখ্যার এতগুলো তোমার কাছে কেন?

—এগুলো সব যাদের বিজ্ঞাপন আছে, তাদের কাছে পেঁছতে হবে।

—তোমাকে কেন পেঁছতে হবে? তোমাদের এতবড় স্কুল, কত চাকরবাকর, লোকজন রয়েছে!

ছেলেটি বললে, না তাদের দিয়ে এসব কাজ হয় না। পত্রিকার যা কিছু আদায়পত্র, হিসাবনিকাশ আমাকেই রাখতে হয় সব। তাছাড়া লেখাপত্র আদায় করা, প্রেসে দেওয়া, প্রুফ দেখা—সব কিছুর

ভার আমার ওপরে দিয়েছেন কাদারবা। অবশ্য আমাকে হেলপ্ করার জন্যে আরো তিন-চারজন ছেলে আছে।

মিহির উৎসাহে ফেটে পড়ে। বলে তোমার সঙ্গে তো দেখছি এসব ব্যাপারেও আমার অনেক মিল রয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘাড়টা একবার পিছন দিকে ফিরোতেই মিহিরের চোখ দুটো যেন হঠাৎ আটকে গেল একখানা বড়ো বাঁধানো ফটোগ্রাফের ওপর। খেলার পোষাক পরে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, আর তার দু' হাতে দুটো বড় বড় খেলার কাপ ও বুকে কয়েকটা মেডেল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি বললে, ওটা আমার মায়ের ফটো, মা খেলাধুলোয় খুব ভাল ছিলেন। স্কুলে যখন ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্রী তখনকার ওটা। নামিয়ে আনবো ছবিটা, দেখবেন?

না-না নামাতে হবে না। আমি দেখছি বলে মিহির চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ছবিটার সামনে দাঁড়ালো। একি! চমকে ওঠে সে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। একেবারে হুবহু মিনুর চেহারা। মাথাটা চট করে ঘুরে যায়। চোখের সামনে নিমেষে সব যেন অন্ধকার। মনে হয় ওই ঘরটা ঘুরছে। ওর দেওয়াল, ছাদ ওর মধ্যে যা কিছু আসবাবপত্র সব ঘুরছে। এখনি বুঝি ছাদটা ভেঙে পড়বে ওর মাথায়। তাহলে মিহির যা ভেবেছে, তাই সত্যি! মা বাপের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে! একি সম্ভব! এক একবার মনে হয় বুঝি স্বপ্ন দেখছে মিহির।

ছেলেটি বলে—মায়ের খেলাধুলোর আরো অনেক মেডেল কাপ আছে ঘরের ভেতরে আলমারীতে, দেখবেন? আনবো?

এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠলো। ছেলেটি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—মা, একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা একটা ওষুধের শিশি হাতে করে মিহিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়েসকালে যে প্রকৃত সুন্দরী ছিলেন, তার চিহ্ন সব সুস্পষ্ট।

সুমিষ্ট কণ্ঠে তিনি মিহিরকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

মিহির বললে, হ্যাঁ।

—কি দরকার বলুন।

মিহির বললে, খুব প্রাইভেট কথা। একটু আড়ালে বলতে চাই।

ভদ্রমহিলা ঘরের এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আচ্ছা আসুন। বলে মিহিরকে নিয়ে ভিতরে তার শোবার ঘরে গেলেন।

পরিপাটি করে সাজানো ঘরটি। একদিকে খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল আর একদিকে ছোট্ট একটি সোফাসেট আপাগোড়া গদি ঢাকা। সামনের দেওয়ালে যীশু খৃষ্টের একটি বড় ছবি টাঙানো। পাশেই একটি বুককেস, তার ওপরে কুরু-

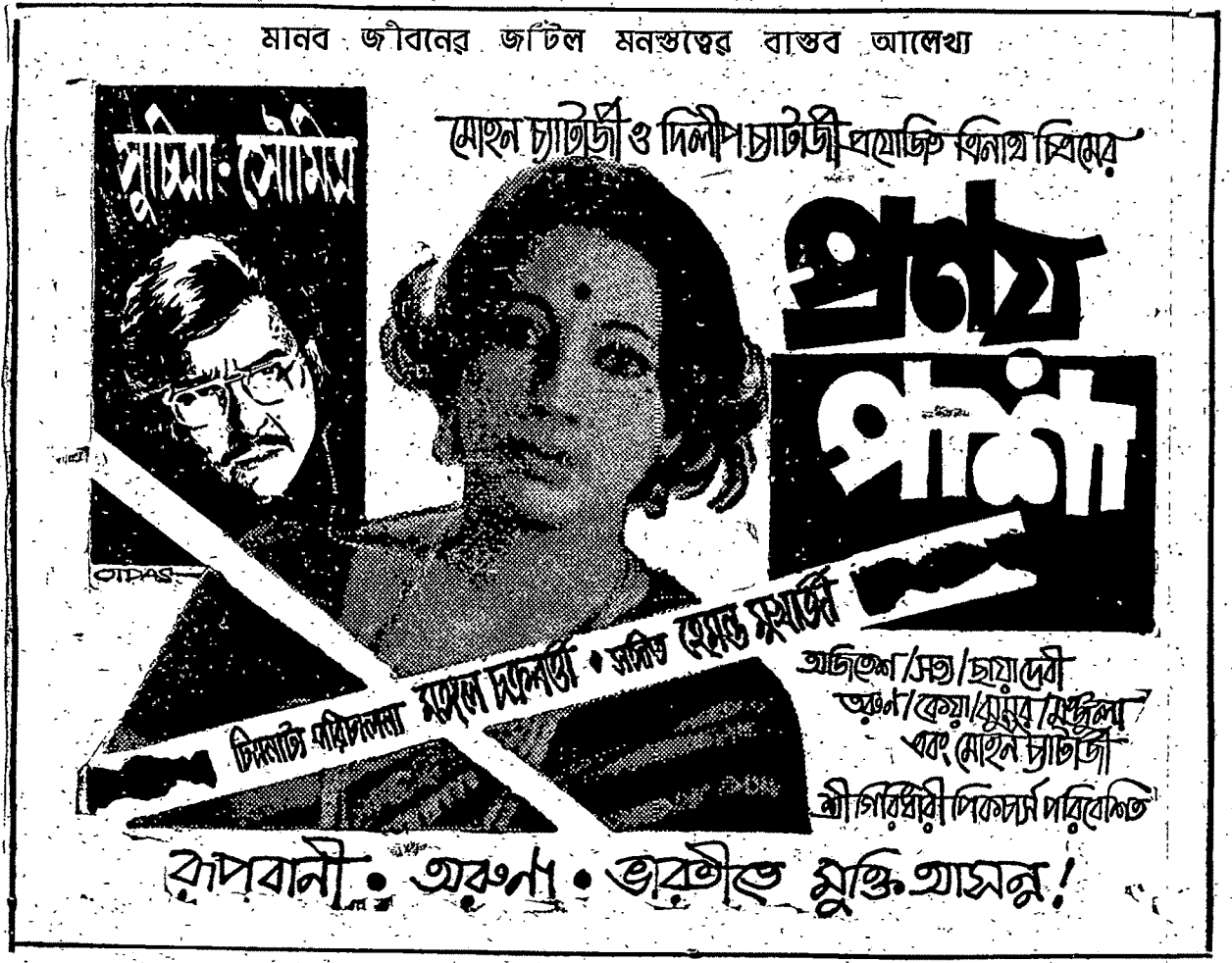

থেকে সোনালী অক্ষরে লেখা: বাইবেল।

ভদ্রমহিলা ওষুধের শিশিটা বুককেসের ওপর রেখে যে সোফাটায় মিহির বসেছিল, তার পাশে কৌচে বসতে বসতে বললেন, বলুন কি আপনার প্রাইভেট কথা।

মিহির একটু ইতস্তত করে বললে, দেখুন একটা যদি মর্মান্তিক কথা আপনাকে বলি আশা করি আমায় ক্ষমা করবেন।

ব্যাপারটা কি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এত ভনিতাই বা করছেন কেন?

মিহির বলে, আচ্ছা ওই যে ছেলেটি সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ে ওকি আপনার ছেলে?

—হ্যাঁ। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করার কারণ?

—কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। নইলে আমি এতদিন পরে আপনার কাছে ছুটে এসেছি কেন?

—আচ্ছা, ওছাড়া কি আপনার আর কোন ছেলে আছে?

—না। ওই আমার একমাত্র ছেলে।

—মিথ্যে কথা। ও আপনার ছেলে নয়। আপনি অন্যের ছেলে চুরি করে এনেছেন নার্সিংহোম থেকে।

—কি বললেন। রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকে ভদ্রমহিলার সারা দেহ। চেঁচিয়ে ওঠেন। মাইকেল শিগ্‌গির এই লোকটিকে গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দাও।

মাইকেল ছুটে এসে মিহিরের একটা হাত চেপে ধরলে ততক্ষণে মিহির আর এক হাতে বাইবেলটা বুককেসের মাথা থেকে তুলে নিয়েছিল। সে ভদ্রমহিলার সামনে বাইবেলটা তুলে ধরে বললে, এটা হাতে করে ওই যীশুর মূর্তির দিকে চেয়ে আপনি সত্যি করে বলুন তো ও আপনার ছেলে, ওকে আপনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন, নার্সিংহোম থেকে চুরি করে আনেননি?

নিমেষে ভদ্রমহিলা যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির নিশ্চল হয়ে গেলেন। শুধু চোখ দুটো যীশুর ছবির সঙ্গে যেন আটকে গেছে বলে মনে হয়।

এইভাবে কয়েকটা নিস্পন্দ মুহূর্ত কেটে যাবার পর ভদ্রমহিলা বাইবেলটা মিহিরের হাত থেকে নিয়ে মাথায় চেপে ধরে ওর পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে হুহু করে কেঁদে উঠলেন।

আমি চোর। আমি শয়তান। আমি ওয়ার্স্ট ক্রিমিন্যাল। আমার নরকেও স্থান হবে না। ও হো-হো-হো...বলে আছড়ে পড়লেন মিহিরের পায়ের ওপর।

মিহির তাড়াতাড়ি ভদ্রমহিলার মাথাটা পায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি চুপ করুন। শান্ত হোন। আপনি যে সত্যকে স্বীকার করেছেন, তাতেই আমি খুশি, আমি আর কিছু চাই না। যীশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলছি।

চোখের জল মুছতে মুছতে সম্মোহিতের মত মিহিরের চোখের ওপর চোখ রেখে ভদ্রমহিলা শুধু বললেন, তুমি আমার মাইকেলকে কেড়ে নিয়ে যাবে না? সত্যি বলছো?

হ্যাঁ। যীশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যা বলছি না। বিশ্বাস করুন।

বজ্রাহতের মত এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মাইকেল। স্তব্ধ, হতবাক্। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। সে মায়ের বুকের মধ্যে আছড়ে কাঁদতে থাকে, মা, একি করলে তুমি। তুমি আমার মা নও। এটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

মিহির মাইকেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, ওই তোমার মা বাবা। ওকেই তুমি চিরদিন মা বলে জেনো। যে তোমার গর্ভধারিণী, একবার শুধু আমার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে দেখা দিয়ে তুমি চলে এসো। আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।

—না-না পৌঁছতে হবে না। ওর আসল মা'র কাছেই ও থাক এরপর আর আমি মায়ের পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে পারবো না ওর সামনে।

মিহির বললে, কিন্তু আপনার মেয়ে কেমন আছে, তাকে একবার চোখে দেখবেন না? চলুন একসঙ্গে যাই। আপনার ইচ্ছা হয় তাকে নিয়ে আসবেন, না হয় তো আমার কাছেই থাকবে।

চলুন। আপনাকে মিনতি করছি, বলে দু'হাত জড়লে।

কিন্তু আমি কোন্ পরিচয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। মা হয়ে নিজের মেয়েকে ত্যাগ করেছি আবার অন্যের ছেলেকে চুরি করেছি। ছিঃ ছিঃ, এ কলঙ্কিত মুখ আমি আর সমাজে কারুর কাছে দেখাতে পারবো না। আমায় ক্ষমা করুন।

মাইকেল তোমার কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি—বলেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

মাইকেল মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মিহিরের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

মিহির বললে, চলো বালীগঞ্জ প্লেস।

একটি ভ্রমণ কাহিনী

রণজিৎ কুমার সেন

আমি একবার কোডারমার দিবরর ফরেস্ট অঞ্চলে ঘুরে আসতে গিয়ে ক'দিন আমার বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বন্ধু সীতেশ ওখানে ঝুমরিতিলাইয়ার পাকা বাসিন্দা, পেশায় মাইকা মার্চেন্ট। তখনও তিলাইয়া ড্যাম হয়নি। নির্জন জোয়ার আর বজরার অঞ্চল। পরিবেশটি ভারী মনোরম। সীতেশের সঙ্গে এ্যাসিস্টেন্ট ফরেস্ট অফিসার মাখন গাঙ্গুলীর খুব মাখামাখি। প্রায়ই ফরেস্টে গিয়ে দু'-এক রাত কাটিয়ে আসে। মাখন গাঙ্গুলীও তেমনি ফুরস ত পেলেই সীতেশের ঘরে এসে কয়েক রাউন্ড তাস পিটিয়ে যান।

সেদিনও অবকাশ মতো এসে দরজার কড়া নাড়লেন। ভিতরে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম। সীতেশ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েই সাদর আহ্বান জানালো মাখন গাঙ্গুলীকে, বললো : 'আজ সকাল থেকেই তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল গাঙ্গুলী। আমার যে সাহিত্যিক বন্ধুটির কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি, এই সেই প্রিয়তোষ মুখার্জী, সবে কলকাতা থেকে এসেছে। ভাবছিলাম—তোমার ওখানে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেবো, ইতিমধ্যে তুমি এসে পড়লে।'

নমস্কারের হাত উঁচিয়ে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মাখন গাঙ্গুলী, বললেন : 'আমাকে হয়তো ঠিক চিনতে পারেন নি, তাই না মিঃ মুখার্জী?'

প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললাম : 'ইতিপূর্বে সীতেশের এক চিঠিতে আপনার কথার উল্লেখ ছিল। খুব আনন্দ পেলাম আপনাকে দেখে।'

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'আমার আনন্দটাও কিন্তু কিছুমাত্র কম নয়। চলুন, ইতিমধ্যে আমার ওখানে এক রাত কাটিয়ে আসবেন। মাত্র ক'দিন আগে একটা ফিল্ম কোম্পানী দিবরে এসে স্যুটিং করে গেছে। যদিও ঘন অরণ্য নয়, অল্পখনির জায়গা, তবু সাহিত্যিক চোখে আপনার খুব খারাপ লাগবে না।'

জবাবে আমি কিছু একটা বলবার আগেই এবারে সীতেশ বললো : 'প্রিয়তোষ এদিকটায় এই প্রথম এলো ; এখানকার মাটি ওকে তাই সহজেই টেনে নেবে। সেই সঙ্গে তুমি যদি কিছু প্লটের যোগান দিতে পারো, তবে এক রাত কেন, সাত রাত কাটিয়ে দিতেও আপত্তি থাকবে না প্রিয়তোষের। তারপর একদিন সাহিত্যিকের কলমে তাই মূর্ত হয়ে উঠবে। ফরেস্টের আড়াল থেকে অগণিত পাঠকের চিত্তলোকে জেগে উঠবে দিবরর।'

খুসীর হাসি হেসে মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'সাহিত্যের ছোঁওয়া দেখছি আজ তোমাতেও লেগেছে। ভেরী চার্মিং।'

সীতেশ এবারে কিছু একটাও না বলে নীরবে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

আমি বললাম : 'বুঝতেই পারেন, সাহিত্যের খোরাক সংগ্রহে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে বেরিয়ে পড়তেই হয়। সীতেশ আছে বলে এখানে আসা হলো।'

মাখন গাঙ্গুলীর জন্যে এতক্ষণে চা এসে গিয়েছিল, কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন : 'প্লট কিছু যোগাতে পারবো কিনা, জানি না, তবে ভালো জাতের কিছু পাখী খাওয়াতে পারবো। আমাদের নিমাই চরণকে বলে দিলে ও ঠিক সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।'

জিজ্ঞেস করলাম : 'আপনার সাবজেক্ট, বুঝি?'

এবারে সীতেশ বললো : 'আরে না, না, হি ইজ এ্যাজ গুড এ্যাজ এ্যাবাভ এ্যাসোসিয়েট ; তবে একটু আন-ব্যালান্সড, এই যা।'

—'মানে?'

হাতের কাপটা এবারে নামিয়ে রাখতে রাখতে মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'ওরকম আন-ব্যালান্সড অনেকেই, ও কিছু নয়। বলুন, কবে যাবেন আমার ওখানে?'

বললাম : 'সীতেশের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন, ওর সময় হলেই যেতে পারবো।'

এবারে মাখন গাঙ্গুলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সীতেশ বললো : 'গিরিডিতে

মাইকায় একটা জরুরী অর্ডার রয়েছে, সেখানে আমরা দিন দু'য়েক কাটবো। ভাবছি, প্রিয়তোষকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ফিরে আসার পথে ওকে উটী ফল-সটা দেখিয়ে আনবো। এসে সামনের শুক্রবার মাগাদ তোমার ওখানে যেতে পারি। পারো তো দুপুরের দিকে তোমার গাড়ীটা পাঠিয়ে দিয়ো।'

—'ও, কো এ কথাই তবে রইল।' মাখন গাঙ্গুলী বলেছেন : 'আমি স্টেশনে একটা কাজ সেরে তবে ফিরবো, এখন তাই উঠতে হচ্ছে।'

ব্যস্ত হয়ে সীতেশ বললো : 'সে কি, খেলায় বসবে না, খেয়ে যাবে না, একি একটা কথা হলো নাকি!'

—'আজ থাক, একটু অসুবিধে আছে।' বলে এবারে উঠে পড়লেন মাখন গাঙ্গুলী, তারপর বাইরে গিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন।

ভেবে দেখলাম—কোডারমায় এসে আমার ভালই হলো। একদিন বাদেই বেরিয়ে পড়া গেল সীতেশের সঙ্গে। ট্রেনে পরেশনাথ পাহাড় অবধি এসে গিরিডি পর্যন্ত একটানা বাস। আঁকা-বাঁকা পথ, দু'ধারে শিশু শালের বন, মাঝে মাঝে ন্যুনো ক্যাক্টাস আর ফুলের শোভা। চোখ জুড়িয়ে গেল। গিরিডিতে এসে চিরঞ্জীলাল আগরওয়ালার আতিথ্য নিতে হলো। তিনি এখানে অভ্রের একজন বড় মার্চেন্ট। খানদানী পরিবার। বাপে আর ছেলেতে মিলে গাড়ীই হবে তিন-চারখানা। সন্ধ্যার পর ফ্রেস হয়ে নিজের ঘরেই স্কচের বোতল নিয়ে বসেন। তখন তাঁর সঙ্গে ব্যবসার কথা অচল। তাঁরই অতিথি আমরা। সীতেশের সঙ্গে আগরওয়ালাজীর যোগাযোগ বহুদিনের। মাইকা-মাইন-সের সম্পর্ক ছাড়া ভূভারতে আর যে কিছু আছে, তা বোধ করি আগরওয়ালাজীর কাছে অজ্ঞাত। ব্যাপারটা বোঝা গেল—যখন সীতেশ তাঁকে আমার পরিচয় দিল। চোখ তুলে আগরওয়ালাজী বললেন : 'পড়া-লিখাওয়ালা বাবু, তা ইস্কুলে আছেন, য়া কালেজে আছেন?'

শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। সীতেশ বুঝিয়ে দিয়ে বললো : 'স্কুল-কলেজের মাষ্টার নয়, কেতাব লিখনেওয়ালা বাবু প্রিয়তোষ মুখার্জী।'

এবারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আগরওয়ালাজী বলেছেন : 'সন্ধ্যায় আমার ঘরে আসবেন, ভালো স্কচ খাওয়াবো।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম : 'ওটা চলে না। বরং লেবু মিশিয়ে চিনির সরবত আমার অনেক বেশী প্রিয়।'

মোটা গোঁফের আড়ালে ঈষৎ হাসি টেনে আগরওয়ালাজী বললেন : 'ঠিক আছে, চিনি দিয়ে আপনাকে শেকার সরবত দিতে বলবো।'

তার সঙ্গে পুরো এক রাত দু'দিন ব্যবসা নিয়ে কেটে গেল সীতেশের। নাভের অঙ্কটা বোধ করি বেশ উঁচুর দিকেই থেকে গেল। তারপর আগর-ওয়ালাজীর ব্যবস্থাতেই একটা জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল উটীতে। সদর থেকে প্রায় মাইল নয়েকের পথ। কোথাও চরাই, কোথাও উতরাই। উটীর রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সমতল পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা এসে মিশিয়ে যাচ্ছে নদীতে। উপরে উঠে ঝরনার জলের ভিতর দিয়ে সীতেশ আর আমি স্কেটিংয়ের মতো কতক্ষণ যে ছুটোছুটি করলাম, হিসেব নেই।

এক সময় সীতেশ বললো : 'উটীর এই পরিবেশে কত প্রেমিক-প্রেমিকা এসে কত সময় ঘুরে যায়। তাদের জীবনে হয়তো প্রেমের আতিশয্য আছে, কিন্তু গল্প নেই। সেই গল্পটা এবারে বিচিত্র হয়ে ফুটে উঠুক না তোর কলমে।'

আশ্বাস দিয়ে বললাম : 'এমন কোনো গল্প যদি সত্যিই এসে যায়, তবে কাগজে ছেপে তোকে কপি পাঠিয়ে দেবো।'

তারপর উটীকে বিদায় দিয়ে একসময় আমরা এসে আবার জীপে চাপলাম। ফেরার পথে ব্রাহ্মহীল হয়ে তবে ফিরলাম। আগরওয়ালাজীর ঘরে খাবার প্রস্তুতই ছিল। সুতরাং পার্কস্থলীকে অযথা কষ্ট পেতে হলো না। স্টেশনে এসে আগরওয়ালাজী আমাদের সি-অফ্ করে গেলেন। এই দ্রুত ধাবমানতার মধ্যেও সবটাই যেন একটা গভীর দৃশ্য হয়ে চোখের গভীরে উজ্জ্বল হয়ে থেকে গেল।

ঝুমরিতিলাইয়ায় ফিরে আসার পর পুরো একটা দিনও কাটলো না। নির্ধারিত ঠিক শুক্রবার দুপুরে দরজার সামনে মাখন গাঙ্গুলীর গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভারকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, অতএব না যাবার প্রশ্ন নেই।

চলাফেরা সম্পর্কে সীতেশ চিরকালই বেশ চটপটে। সংসার আছে, অথচ বন্ধন নেই। অদ্ভুত একটা ঈষান্বিত জীবন। সেই তাড়া দিয়ে আমাকে গাড়ীতে তুলে নিল। এখান থেকে দ্বিবর একেবারে কাছে নয়। গাড়ী যত এগিয়ে চললো, দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ততই মনোরম হয়ে উঠলো আমার চোখে। তারপর ঈষৎ বাঁক নিয়ে গাড়ীটা এসে পড়লো ফরেষ্ট এরিয়ায়।

এ আর এক দৃশ্য। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। কোন্ আদি যুগে সৃষ্টির প্রথম আত্মীয় হয়ে জন্ম নিয়েছিল বৃক্ষ, তারই এক অনবদ্য সমাচ্ছন্ন রূপ সবুজে শ্যামলে ছড়িয়ে আছে এখানে। ভূগর্ভে তার শ্বেতশুভ্র অস্থি।

মাখন গাঙ্গুলীর বাংলোয় এসে গাড়ী দাঁড়াতেই সামনে এসে অভ্যর্থনা করে নিলেন তিনি আমাকে আর সীতেশকে। ছোট্ট সাজানো বাংলো, চারদিকে অনেক উঁচু বাউণ্ডারী দেয়াল। ভিতরে গিয়ে বসে কেমন একটা অদ্ভুত তৃপ্তি বোধ করলাম।

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'বসুন, আমার স্ত্রীকে ডাকি।'

একটু বাদেই স্মিতহাস্যে মিসেস গাঙ্গুলী এসে সামনে দাঁড়ালেন। সীতেশের সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় ছিল। এবারে আমি তাঁর মুখের দিকে চোখ দু'টি তুলে ধরতেই অনেককাল আগের একটি সুন্দর পরিচিত মুখ আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠলো। মিসেস গাঙ্গুলীও আচমকা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, 'সে কি, আপনি—মানে রনানী!'

বিস্ময়ের ছায়া এবারে মাখন গাঙ্গুলী আর সীতেশের মুখেও। মিসেস গাঙ্গুলী হয়তো মনে মনে একটুকাল স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইলেন, তার পর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন : 'আপনি তো প্রিয়তোষবাবু, তাই না?'

এবারে ত্রস্তকণ্ঠে মাখন গাঙ্গুলী বলেছেন : 'কেন, তোমাকে বলিনি—সীতেশ লাহিড়ীর সঙ্গে সাহিত্যিক মিঃ মুখার্জী আসবেন!'

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন : 'মিঃ মুখার্জী বললে কি আর আসল নাম বোঝা যায়!'

সীতেশ হয়তো চুপ করে থাকাটা সমীচীন মনে করলো না, বললো : 'ভারী অদ্ভুত তো!'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'নিশ্চয়ই তোমাদের খুব কাছাকাছি বাড়ি ছিল, তাই না?'

—'কাছাকাছি কেন, একটা বাড়িই হতে পারতো, কিন্তু হয়নি।' বলে এক সেকেণ্ডে অপেক্ষা করলেন না মিসেস গাঙ্গুলী, বললেন : 'তোমরা কথা বলো, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসছি।' বলে পিছনের পর্দার আড়ালে সরে গেলেন তিনি।

হাতমধ্যে পাশের দরজা দিয়ে একটি মাঝবয়সী লোক এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখে তাকে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। সমস্ত ঘরটাকে কাঁপিয়ে গক্ গক্ করে সে বলে উঠলো : 'মিল গিয়া, দো হড়িয়াল অউর দো চখা।' তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে হাতে ঠুকতে ঠুকতে বললো : 'দেশলাই আছে, দেশলাই?'

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'পাখী

ম্যানেজ করবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, নিমাই, কিন্তু এখানে দেখছো আমরা কথা বলছি, দেশলাইটা কি ঠিক এখানে না পেলেই তোমার নয়?'

বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, ইনিই খোকাখ্যাত সেই এ্যাসোসিয়েট নিমাইচরণ।

একটু থেমে পুনরায় তেমনি গক্ গক্ করে বলে উঠলো : 'অনেক দূর থেকে আসতে হলো, খুব টায়ার্ড, সিগারেটটা ধরাতে পারলে একটু রিলিফ হতো।'

আমি নিজেই এবারে পকেট থেকে দেশলাই বার করে তার হাতের দিকে এগিয়ে ধরলাম।

কাক যেমন খাবার ছোঁ মেরে নেয়, তেমনি আমার হাত থেকে এবারে দেশলাইটা লুফে নিল নিমাইচরণ। তারপর সিগারেটটা মুখে গুঁজে নিয়ে কাঠি জ্বালালো। কিন্তু তা সিগারেটে গিয়ে সংযোজিত হলো না। নিভে গেল। এমনি করে একের পর এক কাঠি জেবলে চললো সে, আর নিভে যেতে লাগলো।

আমি বললাম : 'কাঠিগুলো তো এত ড্যাম্প হবার কথা নয়, দিন, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু সে কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই নিমাইচরণের। যেমন করে আপন মনে কাঠি জ্বালাচ্ছিল, তেমনি করে জ্বালতে জ্বালতে একসময় একটি কাঠিও আর অবশিষ্ট রইল না। ঘরের মেঝেতে পোড়া কাঠিগুলো ছড়িয়ে রইল। আমার হাতে দেশলাইয়ের খাপটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বললো : 'ডেজাল নেই কোথায়, আপনেও ডেজাল; এ্যাডাল্ট-টারেটার বলে আপনাকে মশাই পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।'

বিরক্তির সঙ্গে এবারে হঠাৎ মাখন গাঙ্গুলী বলে উঠলেন : 'আঃ—একটু ভদ্র হতে চেষ্টা করো নিমাই; অনেক খেটেছ, যাও এবারে নিজের ঘরে যাও।'

নিমাইচরণ একটুকালও আর অপেক্ষা করলো না, যে-দরজা দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেই দরজা দিয়েই মুহূর্তে সে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

আমাকে লক্ষ্য করে মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'নিমাইয়ের কথায় আপনি যেন কিছু মনে করবেন না মিঃ মুখার্জী। ওকে নিয়ে প্রায়ই আমাকে এরকম ট্রাবল পেতে হয়। লাহিড়ী সেদিন ওর সম্পর্কে আন-ব্যালান্সড ঠিকই বলেছিল। আমি চেপে যেতে চেয়েছিলাম। আসলে স্ত্রী-বিয়োগের পর ওর মাথাটি একেবারেই যায়। বছর-খানেক এ্যাসাইলামে থেকে মোটামুটি ভালো হয়ে আসে। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় পাগলামিতে পেয়ে বসে। তবে আমার স্ত্রীর খুব বাধ্য। ফরেস্টের কন্সানেই ওকে কোনভাবে টিকিয়ে রেখেছি। পিছনের দিকে

আমার একটা আলাদা ঘর আছে, সেই ঘরেই থাকে নিমাই। একসময় ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারতো, ইংরেজিটাও বলতো ভালো। সে সব এখন গেছে। যেমন মাঝে মাঝে হয়, তেমনি আজ দু'দিন ধরে ওকে আবার কিছুটা পাগলামিতে পেয়েছে, নইলে মোটামুটি নর্মালই থাকে।'

বললাম : 'বড় দুঃখজনক তো!'

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'ওর দুঃখের দিকটা ভেবেই ওকে কিছু বলি না। হাজার হোক, এই নির্জন পরিবেশে ওই আমার একমাত্র এ্যাসোসিয়েট।'

ইতাবসরে ঝি-র হাতে ট্রেতে চা আর খাবার সাজিয়ে মিসেস গাঙ্গুলী সামনের একটা স্বতন্ত্র আসনে এসে বসলেন। ঝি ধীরে ধীরে চা আর খাবার সাজিয়ে দিল তেপায়ায়। মিসেস গাঙ্গুলী বললেন : 'নিন, চা খান, খেতে খেতে গল্প করুন।'

খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললাম : 'করেছেন কি, এ যে প্রচুর, এতটা কি চলবে!'

মাথা নিচু করে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন : 'সামান্য স্ন্যাক্স, এমন কিছু নয়, খান।'

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'তোমাদের পরিচয়ের সূত্রটা কিন্তু এখনও জানতে পারলুম না বনানী!'

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন : 'খুব কিউরিয়াস হয়ে উঠেছ, দেখতে পাচ্ছি! তা—মিঃ মুখার্জীকেই জিজ্ঞেস করো না!'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে এবারে হঠাৎ বুঝি আমি একবার বিষম খেলাম! তাকিয়ে দেখলাম—সীতেশ দিব্বি একান্ত মনে খাবারের প্লেট প্রায় শেষ করে এনেছে।

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'কি ব্যাপার মিঃ মুখার্জী, মনে হচ্ছে বনানীর সঙ্গে আপনার পরিচয় কিছু মিষ্ট্রি আছে। বলুন না শুনি! উই আর অল ফ্রেন্ডস হিয়ার।'

বললাম : 'সাসপেন্সেরও তো একটা মাধুর্য আছে, পরে না হয় কখনো আপনি ওঁর মুখ থেকেই শুনে নেবেন।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে এবারে সীতেশ বললো : 'সাহিত্যিকরা যত কথা যত সহজে লিখতে পারে, তত সহজে বলতে পারে না।'

বললাম : 'সব কথা কলমে ফুরিয়ে যায় কি না, তাই।'

এবারে আসন ছেড়ে উঠে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন : 'আপনারা কথা বলুন, আমি ততক্ষণে ঝিকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসি' বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন তিনি।

মাখন গাঙ্গুলী বললেন : 'কিন্তু কি আশ্চর্য, আমাদের এই দশ বছরের

বিবাহিত জীবনে বনানীর মুখে অনেকের নামই শুনেছি, কিন্তু প্রিয়তোষ নামটা কখনো শুনিনি।'

বললাম ঃ 'উল্লেখ করবার মতো কিছু ছিল না, তাই শোনেন নি। ঘটনাটা তাহলে বলি, শুনুন।'

এবারে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কিছুটা সোজা হয়ে বসলেন মাখন গাঙ্গুলী।

বললাম ঃ 'আপনার মিসেসের সঙ্গে আজ থেকে প্রায় বছর এগারো আগে আমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। ওঁরা তখন আসানসোলে। চাটুজ্জে বংশ। ওঁর এক মামার সঙ্গে কলকাতায় কি করে যেন আমার আলাপ হয়েছিল। নাম যতটা মনে আসচে, বোধ করি বলাইবাবু। তিনিই একদিন ওঁর একটি ফোটো সঙ্গে নিয়ে এসে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। আমার মা আর জ্যাঠাইমা তখন সংসারে বেঁচে ছিলেন। যদিও ফোটো দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, তবু মা আর জ্যাঠাইমার মতামত জানবার প্রয়োজন ছিল। বলাইবাবুকে তাই মার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলাম। মার তরফে কথাবার্তার বিশেষ কিছু ছিল না। ফোটো দেখে মার আর জ্যাঠাইমারও খুব পছন্দ হলো। বললেন ঃ যা না, নিজের চোখে দেখে একেবারে পাকা কথা দিয়ে আয়। তুই সুখী হলেই যে আমাদের সুখ! —বলাইবাবুর সঙ্গেই একদিন তাই আসানসোলে গিয়ে নামলাম। ওঁদের বাড়ির সে যে কী আদর-আপ্যায়ন বলে শেষ করা যায় না। পড়ন্ত বেলার গোধূলি লগ্নে আমরা দু'জনকে দু'জনে দেখলাম। কিছু হয়তো প্রশ্ন করার ছিল, কিন্তু মুখে এলো না, শুধু নীরবে তাকিয়ে রইলাম, আর ভাবলাম আমার সব চাইতে প্রিয় বইয়ের নায়িকাকে যেভাবে কেছি, তার সঙ্গে বনানী চ্যাটার্জীর একটুও বুঝি অমিল নেই! গোধূলি চলে যেতে যেতে শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আমাকে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে? —জবাবে অস্ফুট কণ্ঠে বনানী চাটার্জী বলেছিলেন ঃ নানা ম্যাগাজিনে আপনার গল্প পড়ে এতদিন আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, আজ দেখতে পেয়ে মনে হচ্ছে—গল্পের নায়কেরা আপনার কাছে কিছু নয়। —শুনে মনটা ভরে উঠেছিল। ভেবেছিলাম—এমন রূপময়ী পাঠিকাকে যদি জীবনসঙ্গিনীরূপে পাই তবে তার মতো আনন্দ বুঝি আর কিছু নেই! ফিরে আসার সময় কথা দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছা সেদিন বোধ করি ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। তাই পাঠিকা আমার পাঠিকাই থেকে গেলেন, গৃহিণী হলেন না।'

মাখন গাঙ্গুলীর সারা মুখে তখন অদ্ভুত এক কৌতূহলের ছাপ। প্রশ্ন করলেন ঃ 'কেন, ওদের তরফে কোনো আপত্তি উঠেছিল?'

বললাম ঃ 'না। ক্রিসমাস বাদেই বোধকরি বনানী চাটার্জির বি-এ পার্ট ওয়ান দেবার কথা ছিল, সেটুকুই যা অপেক্ষা। কিন্তু ঘটনাটা ঘটলো আমার তরফেই। মা হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গেলেন, আর জ্যাঠাইমা প্যারালাইজড্ হয়ে শয্যা নিলেন। কয়েকটা মাসের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেল। একদিন বলাইবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে বললাম ঃ কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু কথা রাখতে পারলুম না; আপনার ভাগ্নীর জন্যে আপনারা অন্য কোথাও খোঁজ করুন, দেখবেন—আমার চাইতে অনেক বেশী যোগ্য পাত্র পেয়ে যাবেন, সুখী হবেন আপনার ভাগ্নী। শুনে মনে মনে বোধকরি বলাইবাবু অনেকখানি দমে গেলেন।'

তারপর একটু কাল থেমে বললাম ঃ 'আজ এতদিন বাদে হঠাৎচক্রে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—বনানী মুখার্জি না হয়ে গাঙ্গুলী হয়ে আজ সত্যিই কত সুখী! আসলে ওঁর ভাগ্যটা আপনার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে ছিল। আপনি জিতে গেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে এবারে কেমন একটা অদ্ভুত হাসিতে ফেটে পড়লেন মাখন গাঙ্গুলী, স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললেন ঃ 'বনানী, শীগ্‌গির এসে একবার শুনে যাও।'

অপেক্ষা করলেন না মিসেস গাঙ্গুলী, একটুক্ষণের মধ্যেই এসে পুনরায় সামনে দাঁড়ালেন।

মাখন গাঙ্গুলী বললেন ঃ 'চিরকাল বইয়ের পৃষ্ঠায় তুমি শুধু গল্প পড়লে, কিন্তু এতক্ষণ মিঃ মুখার্জি তোমাকে নিয়ে যে অদ্ভুত জীবনের গল্প বললেন, তা আনফর্চুনেটলি মিস করলে। তোমাকে পেয়ে আমি নাকি জিতে গেছি। কিন্তু ফরেস্ট-সার্ভিসের এই জংলী মানুষটিকে নিয়ে তুমি বোধকরি একটা দিনও সুখী হতে পারোনি!'

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন ঃ 'এই দশ বছরে সুখ-দুঃখ নিয়ে কখনো হিসেব ক'রে দেখিনি, এবারে দেখবো।'

সীতেশ এতক্ষণ পাথরের মতো অনড় হয়ে বসে ছিল, এবারে বললো ঃ 'একটা অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের পাতা আজ আমাদের কাছে খুলে গেল। সো প্যাথেটিক, সো লাভলি।'

বললাম ঃ 'প্যাথেটিক নয়, সত্যিই লাভলি। মিস্টার এ্যান্ড মিসেস গাঙ্গুলী ছাড়া আজ যেন দু'জনকে এমন অদ্ভুত সুন্দর মানাতো না।'

মিসেস গাঙ্গুলী মাথা নিচু ক'রে চাপা গলায় বললেন ঃ 'আমার বলার মামার কাছে সব ঘটনা শুনে সেদিন আমাদের বাড়ীতে সবাই খুব দুঃখ করেছিলেন। আর আমি? পরীক্ষার পড়ার মধ্যে নিজেকে আরও বেশী ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। শুনেছিলাম—আমার ফোটোটা আপনাদের বাড়ী থেকে বলাই মামা আর ফেরত পাননি।'

এবারে কিছু একটা বলতে গিয়ে একটুকাল থামতে হলো। তারপর চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বললাম ঃ 'সেজন্যে এই মুহূর্তে আমি আজ সত্যিই লজ্জিত। কিন্তু যেদিন এ জীবন থেকে মা চলে গেলেন, জ্যাঠাইমা প্যারালাইজড্ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে একদিন শেষনিঃশ্বাস ফেললেন, যখন সংসারে আমার নিজের বলতে আর কেউ রইল না, তখন ঐ ফোটোখানিই ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা। এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়ে ফোটোটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।' বলে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে দেখলাম—মিসেস গাঙ্গুলী কখন নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ত্রস্তকণ্ঠে মাখন গাঙ্গুলী বললেন ঃ 'বনানী ফোটোর কথাটা উল্লেখ ক'রে ভুল করেছে মিঃ মুখার্জি; তার হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ও ফোটো আপনাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, ওটা আপনারই। বনানী আগে আপনার, পরে আমার।'

সীতেশ হাঁ ক'রে অবাক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল।

মাখন গাঙ্গুলী এবারে আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন ঃ 'সন্ধ্যা নামতে এখনও কিছু বাকী আছে, চলুন ততক্ষণ আপনাকে বাইরেটা ঘুরিয়ে দেখাই মিঃ মুখার্জি। যদিও এটা ফরেস্ট-এরিয়া, কিন্তু প্রধানতঃ মাইকা-মাইনসের জায়গা। রাতের দৃশ্যটা অনেক সময়ই নিরাপদ নয়, তখন বন্য প্রাণীরা অনেক সময় ঘন জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসে, এজন্যে সন্ধ্যার পর সঙ্গে আমার বন্দুক থাকে। আপাতত সে ভয় নেই; চলুন, সামনেই মাইনসের দু' একটা জায়গা আপনাকে দেখিয়ে আনি।'

দ্বিধা না ক'রে সীতেশ আর আমি বেরিয়ে পড়লাম মাখন গাঙ্গুলীর সঙ্গে। বেরোতে গিয়ে অনাবশ্যকভাবেই ঘর থেকে নিজের বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ভুল করলেন না তিনি।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে কতদূর যে আমরা এগিয়ে গেলাম, বুঝতে পারলুম না। এদিক-ওদিকে ইঙ্গিত ক'রে এক-একটি জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন মাখন গাঙ্গুলী। প্রাকৃতিক দৃশ্যে আমি

নিজের মধ্যে ক্রমেই খুশী হয়ে উঠলাম। তারপর যখন ফিরি, তখন অনেক চেষ্টা করেও উত্তর-সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারকে রোধ করা গেল না। আর সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে দূর থেকে অকস্মাৎ কোনো বাঘের গর্জন ভেসে এলো কানে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখলেন মাখন গাঙ্গুলী, বললেনঃ 'কোনো প্রয়োজন নেই, তবু ফর সেফ্‌টি—' বলেই পর পর দু'বার ট্রিগার টিপলেন তিনি, তার বিদীর্ণ শব্দ গিয়ে আকাশকে বিদ্ধ করলো। থেমে গেল বাঘের গর্জন। মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'ভয় পাবার কিছু নেই, মিঃ মুখার্জি। আর দু' পা এগোলেই কোয়ার্টারে পৌঁছে যাবো। বন্দুকের আওয়াজ যতদূর গেছে, তার চৌহদ্দিতে এখন আর কোনো বন্য প্রাণী নেই। এ মন্সটার এইটেই মজা।'

যদিও গা-টা একবার ছম-ছম ক'রে উঠেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। সীতেশের এসব অনেকটা ধাতস্থ। দ্রুত হাঁটার প্রয়োজন হলো না। মন্থর পায়েই একসময় ফিরে এলাম কোয়ার্টারে। তার ডাই বাউন্ডারী ওয়ালের দিকে ইঙ্গিত ক'রে মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'এত উঁচু ক'রে দেয়াল গাঁথার কারণই হচ্ছে বন্য প্রাণী থেকে কোয়ার্টারকে নিরাপদ রাখা। এজন্যে অবশ্যি বনানী খুব হ্যাপি নয়, তার ভিশনের পক্ষে এটা মস্ত বড় অবস্ট্রাকশন। কিন্তু উপায় কি, যতদিন এখানে চাকরিতে থাকতে হবে, ততদিন এ অবস্ট্রাকশন মেনে নিতেই হবে।'

বললামঃ 'এই জন্যেই তো দু' একবার চাকরীর অফার পেয়েও চাকরী করতে পারলুম না।'

এবারে দরজার দিকে এগিয়ে এসে স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে মিসেস গাঙ্গুলী বললেনঃ 'তুমি কী বলো তো? অন্ধকারে ফিরে এলে, অথচ বড় টর্চটা অবধি সঙ্গে নাও নি! মিছেমিছি ওঁদের কষ্ট দিলে কেন?'

মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'এখানে এই অরণ্যের অন্ধকারই যদি না দেখবেন, তবে কী অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবেন মিঃ মুখার্জি। হয়তো এই অন্ধকারই একদিন আলো হয়ে ফুটবে ওঁর সাহিত্যে।'

সীতেশ বললোঃ 'আফটার অল ডার্কনেস হ্যাজ এ স্পেশাল চার্ম, না কি বলো প্রিয়তোষ?'

বললামঃ 'সন্দেহ নেই; নির্জন জানালায় অমানিশার আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকবার এ কথাটা উপলব্ধি করেছি। আমাদের জীবনের প্রায় সবটাই তো অন্ধকার, বাকীটুকু আলোর অভিযাত্রী। সেটুকু এতই কম যে, দেখতে পাবার আগেই ফুরিয়ে যায়।'

মিসেস গাঙ্গুলী বললেনঃ 'এরকম কত কথা একদিন আপনার বইতে পড়েছি, হয়তো সবটা সেদিন বুঝতে পারিনি, তবু না বোঝারও একটা আনন্দ ছিল। কিন্তু আজ—' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়লেন তিনি, তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বললেনঃ 'যাক্‌ গে। কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে রান্না সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নিমাইচরণ যা ঘুমকাতুরে, একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর ওর খাওয়া হবে না। অথচ ওর নিজের হাতে আনা পাখী ওকে ফেলে আমাদেরই কি খেতে মন উঠবে! এবারে একটু বিশ্রাম ক'রে চলুন খেতে বসবেন সবাই।'

মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'নিমাইয়ের খাবার ওর ঘরেই পাঠিয়ে দাও, এদিকে আমরা একসঙ্গে চারজনে বসে পড়বো; মেইড আর ড্রাইভার আলাদা খেয়ে নেবে।'

এবারে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে মিসেস গাঙ্গুলী হয়তো সেই ব্যবস্থা করতেই পাকশালের দিকে চলে গেলেন।

আমরা একটুকাল বিশ্রাম নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিতেই পাশের ডাইনিং রুমে খাবারের ডাক পড়লো।

চারটে চেয়ারে আমরা চারজন। মিসেস গাঙ্গুলী কোনোরকম সঙ্কোচ করলেন না। খাবারের মেনুও অসাধারণ। ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে মাছের চপ, দু' রকম মাংস, সঙ্গে মিষ্টি আচার আর কড়া পাকের সন্দেশ।

খাবার মুখে তুলে বললামঃ 'এ যেন অমৃত আস্বাদ করছি। এই অরণ্যে বাস ক'রে এতসব সংগ্রহ করেন কি ক'রে মিষ্টার গাঙ্গুলী?'

মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'নিমাই-চরণ থাকাতে অনেকটা সুবিধে হয়। তবে ওর পাগলামীটা যখন বাড়ে, তখন আমাদের খাবারের মেনুটাও কিছু কাট্‌-ছাঁট হয়ে পড়ে। অবশ্য রান্নাটা বনানী নিজের হাতে রেখেছে, তাতে মেনুর তারতম্য খুব একটা উপলব্ধিতে আসে না।'

সীতেশ বললোঃ 'ওঁর রান্না খাবার লোভেই তো আমি মাঝে মাঝে দু' একদিন ক'রে এসে কাটিয়ে যাই।'

মিসেস গাঙ্গুলী এবারে ঠোঁটের আড়ালে ঈষৎ চাপা হাসি গোপন ক'রে বললেনঃ 'ভালো রাঁধতে পারি না বলে খুব ঠাট্টা করছেন তো? করুন, আমার আর এখন তাতে একটুও লজ্জা নেই।'

এমনি করে কথার পৃষ্ঠে নানা কথার অবতারণা ক'রে ডাইনিং টেবল-টাকে প্রায় আলোচনা-বৈঠকে পরিণত ক'রে এক সময় আমরা উঠে পড়লাম।

রাত বসে ছিল না। ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে দশটা। চারদিক নিশুতি, নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে গাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ আর নাম-না-জানা দু' একটা পাখীর কাকলি ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে আসছিল না।

মাখন গাঙ্গুলী নিজেই এতক্ষণে হাই তুলছিলেন। শোবার ব্যবস্থা হতে তাই দেরী হলো না। আমার আর সীতেশের জন্যে ভিন্ন ঘরে স্বতন্ত্র বিছানা। এসে শুতে শুতে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক হাটলো।

মুখ টিপে হেসে এক সময় সীতেশ বললোঃ 'দ্বিবরে এসে এতদিনে আমার সত্যিই দ্বিবর দেখা হলো। কোথায় বনানী তোমার ময্যাসেঙ্গিনী হবে, তা নয়, সঙ্গী পেলে আমাকে সো রেচেড রাইট টার ইউ আর!'

বললামঃ 'আজ রাতেই এখান থেকে ফিরে যেতে পারলে ভালো ছিল সীতেশ। জানি কিন্তু সকালে উঠে আর দেরী কোরো না। তোমার বাড়ী হয়ে বিকেলের গাড়ীতে আমাকে কলকাতায় না ফিরলেই নয়।'

সীতেশ বললোঃ 'ঠিক আছে, গাঙ্গুলীকে বলবো গাড়ী রেডি রাখতে।' বলে একটুকালও আর অপেক্ষা করলো না সে, শুয়েই নাক ডাকাতে শুরু করলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও অনেকক্ষণের মধ্যে দু' চোখের পাতা আমি এক করতে পারলুম না। এমনি ক'রে বোধকরি প্রায় মধ্যরাত কেটে গেল। হঠাৎ পিছনের ঘর থেকে উচ্চকণ্ঠে কেমন একটা বিলাপ ভেসে এলো কানেঃ 'সাবিত্রী, সাবিত্রী, তুমি আজ কোথায় চলে গেলে সাবিত্রী? তোমার প্রিয় সত্যবানের জীবন মরুভূমি ক'রে তুমি আজ কোথায় পালিয়ে গেলে সাবিত্রী? উঃ, কী কষ্ট, কি নিদারুণ কষ্ট, এ কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না সাবিত্রী। প্লিজ ডু কাম, প্লিজ এক্সটেন্ড ইওর হ্যান্ড টু মি,

লেট মি কিস ইট, লেট মি হ্যাভ ইট। কই, কোথায় তুমি সাবিত্রী?'

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে ঠিক নিমাইচরণের গলা বলে মনে করতে পারতুম না—যদি না সেই মুহূর্তে ওপাশ থেকে মাখন গাঙ্গুলীর কণ্ঠ ভেসে আসতো। বাইরে থেকে জানালার শার্সিতে আঘাত ক'রে তিনি বলেনঃ 'আঃ—কি হচ্ছে নিমাই, কেন চুপ ক'রে ঘুমোচ্ছ না, কেন মাঝরাতে এমনি ক'রে চেঁচিয়ে সকলের ঘুম ভাঙাচ্ছো?'

বুঝতে কষ্ট হলো না যে, নিমাইচরণের স্ত্রীর নাম ছিল সাবিত্রী। তাকে হারাবার বেদনা মাঝে মাঝে কী কঠিন পীড়নেই না পীড়িত ক'রে তোলে নিমাইচরণকে! কী অদ্ভুত দুঃখের জীবন! সীতেশের ঘুম কিন্তু একটুক্ষণের জন্যেও ভাঙলো না। শয্যার এক পাশে নিদ্রাহীন অবস্থায় নীরবে পড়ে থেকে এবারে নিমাইচরণের জন্যে আমার সত্যি সত্যিই বড় কষ্ট হলো।

সকালে উঠে মাখন গাঙ্গুলীই প্রথম এগিয়ে এসে বললেনঃ 'রাত ঘুমোতে তো কোনোরকম অসুবিধে হয়নি মিঃ মুখার্জি? নিমাইটা মাঝরাতে যেরকমটা শুরু করলো, তাতে ভাবছিলাম—আপনারা জেগে গেছেন কি না!'

বললামঃ 'কিছুটা শুনেছিলাম, বাকীটা শুনিনি। নিমাইচরণের এই নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখটা আমি বুঝতে পারি, কারণ সংসারে আমিও তো একা।'

ততক্ষণে মিসেস গাঙ্গুলী চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

আমার কথার পৃষ্ঠে হস্তকণ্ঠে মাখন গাঙ্গুলী বলে উঠলেনঃ 'সে কি, আপনি ব্যাচেলার, আজ অবধি আপনি ঘর বাঁধেন নি?'

মিসেস গাঙ্গুলীর দিকে আপাঙ্গে একবার লক্ষ্য করে মৃদুকণ্ঠে বললামঃ 'না, সঙ্গী কোথায় পেলাম যে ঘর বাঁধবো?'

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—চেপায়ায় চা আর খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে মিসেস গাঙ্গুলীর হাতখানি সহসা একবার কেঁপে উঠলো। রুদ্ধকণ্ঠে বললেনঃ 'সীতেশবাবু, দেখুন তো ভাই, চা-টা জুড়িয়ে গেল কি না!' বলে এক মিনিটও আর দাঁড়ালেন না তিনি।

এবারে সরাসরি প্রস্তাবটা পেশ ক'রে সীতেশ বললোঃ 'আমাদের কিন্তু আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে গাঙ্গুলী। প্রিয়তোষকে আজই কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে। তোমার ড্রাইভারকে বলো—আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'কাজ থাকলে জোর ক'রে আটকে রাখবো না, কিন্তু দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে গেলে বদনী বোধ করি খুব খুশী হতো।'

বললামঃ 'সময়ে কুলোতে পারবো না, নইলে আর একবার অমৃতের স্বাদ নিয়ে যেতে পারতাম। মাত্র ক'টি ঘণ্টার জন্যে এসে আপনার ঘর থেকে যে স্মৃতি নিয়ে যাচ্ছি, তা চিরকাল আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল মিঃ গাঙ্গুলী।'

ধীরকণ্ঠে মাখন গাঙ্গুলী এবারে শুধু বললেনঃ 'সো টু আস অলসো।' তারপর বোধ করি মিসেস গাঙ্গুলীকে খবরটা পৌঁছে দিতেই দরজার পর্দা সরিয়ে ভিন্ন ঘরে চলে গেলেন তিনি।...

ড্রাইভার যখন আমাদের পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ী রেডি করলো, মিঃ ও মিসেস গাঙ্গুলী এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন।

নমস্কারের যুক্ত হাত তুলে বললামঃ 'চলি এবারে মিঃ গাঙ্গুলী, বেঁচে থাকলে জীবনে আবার কোনোদিন দেখা হবে।'

বিনীতকণ্ঠে মাখন গাঙ্গুলী বললেনঃ 'সময় পেলেই আবার কখনো চলে আসবেন; খুব খুশী হবো।'

সীতেশ আগে থেকেই গাড়ীতে গিয়ে বসে পড়েছিল। এবারে আমি গিয়ে উঠতেই পিছন থেকে মিসেস গাঙ্গুলী হঠাৎ অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেনঃ 'একটু দাঁড়ান প্রিয়তোষবাবু।'

দাঁড়ালাম।

এগিয়ে এসে এবারে মিসেস গাঙ্গুলী হঠাৎ নত হয়ে আমার পা স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। চোখের ভাষায় তাঁর কি কথা লুকানো ছিল, জানি না। সেই চোখ দুটি হঠাৎ বুঝি একবার ভিজে উঠলো।

আমি কিছু একটা বলতে চেয়েও কেন যেন একটি কথাও বলতে পারলুম না। নীরবে সীতেশের পাশে গিয়ে বসে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

উত্তরবঙ্গের বৈতালিক

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

উত্তর বঙ্গের লক্ষ্মীছাড়া বৈতালিক,
ভাওয়াইয়া সন্তান সত্যেন রায় ওরফে বাউ,
বাউ ছিল নেহাতই একটা ক্ষ্যাপা!
তবে পরশ পাথর না পেলেও
সে খুঁজে পেয়েছিল একটা আশ্চর্য মণি—
প্রতিদিন পথ চলতে চলতে যার আলো ফেলে
প্রাণভরে দেখতো দেশের মুখ।
দেশকে সে ভালবাসতো,
যে-ভালোবাসায় ছিল যৌবনবতী করলার আবেগ, তিস্তার উন্মাদনা।

দোতারার মতো দীঘল হাতদুটো সামনে বিছিয়ে,
একতারার লাউয়ের মতো মুখটা ঈষৎ আকাশপানে তুলে
যখন হেঁড়ে গলায় গান গাইতো সত্যেন রায়,
তখন রাজবংশী পাড়ার সন্ন্যাসী হাওয়া
হঠাৎ সূর্যের গালে প্রচন্ড এক চড় কষে
ছুটে আসতো পাহাড়ীপাড়ায়,
সঙ্গে সঙ্গেই সে-পাড়ার পাহাড়গুলি
তাদের হরিণের মতো হাজার ঝর্ণাকে ছুটিয়ে দিতো তরাই অঞ্চলে,
যেখানে মহুয়া-মাদলের দুর্নিবার মিলন
চায়ের সবুজ পাতায় দিন গুণছে বসন্তের,
দিন গুণছে উত্তরাকাশের তারার দিকে চোখ পেতে।

এই তো সেদিন তার সাক্ষাৎ পেয়েছি বানারহাটে,
যেখানে চুণবালির চুমকি বসানো জামা গায়ে
তিন দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্কুলঘরগুলি;
মধ্যে এক খন্ড মাঠ
তার মরাঘাসের কাঁথা শুকোচ্ছিল
গুটিকয় দরিদ্র আলোর তাপ নিয়ে;
হঠাৎ সেখানেই সেদিন শীতের সন্ধ্যা
গাভুর একটি মদেশিয়া মেয়ের মতোই
হাসতে হাসতে কাছে ডাকলো সত্যেন রায়কে।

মুহূর্তেই সুরু হলো উৎসব,
উন্মুক্ত হলো সত্যেন রায়ের কন্ঠের উদাত্ত মন্ত্র,
যে-মঞ্চে প্রথমেই দেখা গেল ক্ষুদিরামকে
গলায় তাঁর ফাঁসির দড়ি;
দেখা গেল যতীন দাস, সূর্য সেন প্রমুখের ভিড়;
তারপর চিত্তরঞ্জন, সুভাষের পাশাপাশি
দেখা গেল বিদ্রোহী নজরুলকে,
হাতে তার অগ্নিবীণা।
সবার শেষে
লেনিনের কাঁধে হাত রেখে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ,
তিনি বললেন ঃ
ওই মহামানব আসে।

উত্তর বঙ্গের লক্ষ্মীছাড়া বৈতালিক
ভাওয়াইয়া সন্তান সত্যেন রায় ওরফে বাউ
বাউ ছিল নেহাতই একটা ক্ষ্যাপা,
সেই ক্ষ্যাপা আজ আর নেই।

জানি না, তাঁর খুঁজে পাওয়া সেই আশ্চর্য মণি
আজ সে কার হাতে দিয়ে গেল!

খাঁটি

কুমারেশ ঘোষ

সেই আদিকাল থেকে শুনে আসছি,
ভাল ভাল বাণী।
বেদ উপনিষদ গীতা,
মনুসংহিতা,
বাইবেল গ্রন্থসাহেব কোরআন
ইত্যাদি সব ধর্মগ্রন্থ থেকে
ধর্মগুরুরা বাণী দিতে-দিতে
হয়ে গেলেন হয়রাণ।
সেই একই কথা ;
ভাল হও, ভাল হবে তোমার।
সংযমী হও, সুখী হবে
শান্ত হও, শান্তি পাবে,
ত্যাগী হও, অনেক পাবে,
মুক্ত হও, স্বাধীন হবে
বিনয়ী হও, সম্মান পাবে,
এবং হও সবাইয়ের সুখে সুখী।
এজন্য কত গল্প বলা হলো।
পৌরাণিক গল্প, রূপকথা,
রামায়ণ, মহাভারত,
পঞ্চতন্ত্র, কথামৃত, কথামালা,
সব ভাল-ভাল কথার আড়ত।
ভুলিয়ে নামতা শেখাবার ব্যবস্থা।
আর কথায়-কথায়
ছোট ছেলেকে ভয় দেখানো যেন।
দোষ করলে দন্ড হবে।
নরকে পচতে হবে।
ভয় দেখানো কথার ঝুড়ি
যেন—খোকা, যাসনে ঐ পথে,
ধরবে বলে বসে আছে
পথের মোড়ে জুজুবুড়ি।
এতই যখন ফাঁদ আর ফন্দি—
তখন হতেই হয় সন্দিহান।
হয়তো কিছু আছে। নেই ভাবাটা পাপ।
লাগতে পারে পিতৃ-পুরুষের অভিশাপ।
কিংবা.....কী জানি বাপু.....

তাই মন্দিরে গেলে
কেমন যেন ভালমানুষ হয়ে যাই,
শ্মশানে গেলে
আসে শ্মশান-বৈরাগ্য ;
ধ্যেত্তেরি, সব বাজে!
ঐতো লোকটা পুড়ছে চিতায়।
বাড়িঘর টাকাপয়সা
লাগলো কি তার কাজে?
এমনি করে ভাবতে-ভাবতে
যখন ভাবি, এবার আমি হবো
ভাল মানুষ!
কারা যেন পেছন থেকে
মারতে থাকে চাঁটি!
চেয়ে দেখি—
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ
মদ আর মাৎসর্য হাসছে হো হো হো করে
আর বলছে কানটা ধরে আমার—
দেখো বাবার,
এ সংসারে আমরাই তো খাঁটি।

লেখক কে ?

চিত্রিতা দেবী

অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলাম,
ঐ জীবনটার দিকে।
ওটা অনায়াসে বেশ চমৎকার
একটা কবিতা হতে পারত,
কিন্তু হয়নি।
আসলে লেখাটায় দানা বেঁধে ওঠে নি।
তবু লিখেই চলেছে।
ওটার লেখক কে ?
আমি নয়ত ? কিম্বা তুমি ?
কিম্বা আর কেউ ?
শেষ হতে কত বাকি কে জানে।
এখনো তো শুধু লিখেই চলেছে,
অফুরন্ত কত কথা,
একটা ক্লান্তিকর উপন্যাসের মত।
না, এ লেখকের কল্পনার জোর নেই তেমন।
যদি কোথাও রেখায় রেখায় রঙের টাল ফুটল
দেখতে না দেখতে সব লেপে পুঁছে একাকার।
যদি কোথাও রসের আমেজ জমল,
জমতে না জমতেই সব রস কস নিংড়ে,
একেবারে শুকনো খট্‌খটে।
বিস্বাদ, বর্ণহীন, এ কি লেখা ?
তাও তো ছাপা হচ্ছে।
খরচ হচ্ছে কম কি ?
ঐ জীবনটা লিখে উঠতে
কত মাথার ঘাম পায়ে ঝরছে।
নুন, ডাল, তেল, মশলা, কত কি !
ইস্কুল, ফিস্কুল, জামা, কাপড়, ইত্যাদি।
তারপরে চাকরির ধান্দায় হন্যে হয়ে
ছুটোছুটি।
তারপরে আবার সেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি।
—বিয়ে এবং বংশবৃদ্ধি।
আহা, তেমন তেমন লিখিয়ে হলে,
একটা তুচ্ছ ঘটনাকেও অপরূপ করে তুলতে পারত।
এখানে দ্যাখোনা,
যেমন তেমন একটা প্লট খাড়া করতেই
এতদিন গেল।
তাও শেষরক্ষা করে উঠতে পারবে কি ?
তার আগেই বোধহয় ওটার দফারফা হবে।
মাঝপথেই হয়ত হঠাৎ
টেনে দেবে একটা অক্ষমতার দাঁড়ি।

ঋণ

বাসুদেব দেব

এ সবই আমার ইচ্ছে
এই বৃষ্টি বৃষ্টির ভিতরে চলমান
রঙিন ছাতার ছন্দ
ঐ আত্মমগ্ন খাস দূর এরোপ্লেন
এ সবই আমার ইচ্ছে
উঁকি দিচ্ছে আমাদের চিরে
বিশ্বরূপে প্রতিদিন
আমারই প্রদীপে সে চায় আরতি
শুধু এইটুকু ঋণ

টর্চ জ্বলে আর নেভে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

দুখের মুনিয়াগুলো
এই হাতের চেটোয়,
এই আকাশে।
ভেসে যায় বাতাসে।

চক্কর দেয়, টক্কর খায়;
আবার,
আবার উড়ে এসে বসে।

এইভাবেই তারা ওঠে,
এইভাবেই তারা খসে।
নদী পাড় ভাঙে,
শীত ডিঙিয়ে বসন্ত আসে।

একজন ঠায়,
যেন পুতুল নাচায়।
এই মাচায় ত' এই মাটিতে।

ফৌজ যতই থাক ঘাঁটিতে—
কখনো জিত, কখনো হার।
এর নামই সংসার।

টর্চ জ্বলে আর নেভে,
টর্চ জ্বলে আর নেভে,
টর্চ জ্বলে আর নেভে—

যা
এই যা হাতে,
এই হয় হাতড়াতে।

সিক্ত হই, রিক্ত হই

দিলীপ দাশগুপ্ত

হারানো-প্রাপ্তির সেই মোহময় স্পর্শ থেকে আজ
একেবারে নিঃসঙ্গ জীবনে
ফিরে দেখি দুরান্তের এলোমেলো পদচিহ্নগুলো।
পুণ্যকুম্ভ সুধা আর গরলের হিসাব-নিকাশ—
তাও যেন অতর্কিতে অসীমে চঞ্চল।
একই আত্মা এই দেহে তবু কতবার
দুলেছে-পুড়েছে আর বসন্ত-বাতাসে
রেখে গেছে কিছু কিছু সৃষ্টির সম্ভার।
প্রদোষে কি নীড়ফেরা পাখিদের কেউ
দেখে না ফুলের বনে
আগুন বা চন্দনের দহন-সহন ?
মুঠোভরা বিত্ত আর প্রেম-ভালোবাসা,
কুকরা জন্মান্তর-দাহ
সবই যেন জীবনের এপিঠ-ওপিঠ,
শ্রাবণে সিক্ত হয়ে রিক্ত হই চৈত্রের দু' পায়ে।
তবে কী এ আত্মা চায় প্রশান্তি-প্রলেপ ?
ইষ্টকল্প—অবিধৃত ঈশ্বরের দেখা ?

যাযাবর—নামগোত্রহীন

শিবদাস চক্রবর্তী

আয়ুর সরণী বেয়ে বহু দূর পেরিয়ে এলাম,
আমি এক যাযাবর ছন্নছাড়া—নামগোত্রহীন,
বারংবার ঘর বেঁধে ভেঙে ফেলি, ফের বাঁধি ঘর।
অতৃপ্তি ঘোচে না তবু, আশ্চর্য এ অনিকেত মন।

কেউ কারো কোনোদিন পেলাম না মনের নাগাল,
তবু কত গলাগলি, দেখা হলে প্রিয়-সম্ভাষণ।
মনের উপরিতলে দু' দণ্ডের হেসেনিল উচ্ছ্বাস,
অতল গভীরে তার সামুদ্রিক বিষণ্ণ স্তব্ধতা।

ভালো লাগে ভালোবাসি, কাছে টানি—দূরে সরে যায়,
সাগ্রহে বাড়াই বাহু, দেখি তাতে বাড়ে ব্যবধান।
ভুলের বিবর্ণ ফুলে ভরে ওঠে স্মরণের সাজি,
অকথিত কথা যত কেঁদে মরে রুদ্ধ বেদনায়।

পুত্র-কন্যা-কল্লোলিত কলরের সুখের সংসারে
হেসে-খেলে কাটে দিন, ওরা ভাবে বেশ আছি সুখে।
ওরা তো জানে না কেউ—অনির্দেশ্য কোন্ বেদনায়
অন্তরাত্মা নিত্য কাঁদে, অস্তিত্বের নিত্য অবক্ষয়।
সবার উপরে সত্য যে-মানুষ, তাকে খুঁজে ফিরি
শুধু স্নেহে প্রেমে নয়, অনন্য যে সহমর্মিতায়
তারি, সঙ্গলাভলোভে কণ্ঠে চির অতৃপ্য পিপাসা।
বুকিনে আপন পর খুঁজি তাকে স্বপ্নে জাগরণে।

কোথাও পাইনে তাকে, না-পাওয়ার অন্ধকারে ঘুরে
মনে হয়—জগতে প্রবাসী আমি, স্বঘরে অতিথি।

নীরব দর্শক

বংশীধারী দাস

হিসেবেই ভুল ছিল ? কিংবা আপাতত
রাজনীতি সাফল্যের হিসেবে সরাসরি
ছিল অন্য গভীর হিসেব ?
কে দেবে উত্তর ?

একি স্রেফ বাস্তববিমুখ
অন্ধ আত্মবিশ্বাসের মূঢ় অহমিকা ?
অথবা সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা নিজস্ব বিশ্বাসে ?
কে দেবে উত্তর ?

একি ভ্রান্ত অদূরদর্শিতা ?
কিংবা বিজ্ঞ পদক্ষেপ অটল বিবেকে
সুবিধা-চর্চার থেকে আদর্শ-চর্যায় ?
কে দেবে উত্তর ?
একদিকে সংগ্রামের উদ্যত হাতুড়ি
অন্যদিকে চরকার সমস্বরী গান—
মধ্যেখানে সেতুবন্ধ কিভাবে সম্ভব ?
কে দেবে উত্তর ?

জবাব এগিয়ে আসে আস্তিন গুটিয়ে
জবাবেই ছোঁড়া হয় টেবিল-চেয়ার
রক্তাক্ত তাণ্ডবে
ইতিহাস নিরুত্তর, নীরব দর্শক।

বলে গেলে বটে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বলে গেলে বটে অনেক কথাই
তবু যেন আজ মনে হয়,
আসল কথার কিছুই বলোনি—
নিজেকে করেছ জাদুকর।
দেশে দেশে কত দর্শকমনে
কুয়াশারই ফুল ছোঁয়ালে,
কে যে ধোঁয়া দেয় কখন
সে কার গোয়ালে—
মনে বাজে তারই সংশয়।

ভাগ্যের দোষে যে পায়
স্বতঃই অনাদর,
শিকারী তো খুশি তাকেই
কাদায় শোয়ালে।

জিজ্ঞাসা

পলাশ মিত্র

যাত্রার রাজার অভিনয়ে
অনেক ক্লান্ত হয়েছো ;
এইবারে বিশ্রামের অমল জীবনে
আশ্রয় নেবে কিনা জানতে চাই।
কৃত্রিম আচারের সঙ্গে আপসের পর
এইবার উন্মুক্ত আলোর মধ্যে
গান গাইবে কিনা জানতে চাই।
আবরণে আবরণে নিজেকে
সমাচ্ছন্ন করেছো বহুবার
এইবারে তুচ্ছতার সংকোচ
বিদীর্ণ করবে কিনা জানতে চাই।

আসবে না তবুও

শান্তশীল দাশ

সে আর আসবে না কোনদিন—
হারিয়ে সে গেছে একেবারে।
তবু কেন মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি
সে আসবে, হয়তো সে আসবে আবার।

তারই প্রতীক্ষায় থাকি,
সজাগ সতর্ক করে রাখি কান মন;
বারবার দুয়ারের পানে
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ঃ এলো কি সে ?
পদধ্বনি শোনা যায় তার ?

আসবে না, আসবে না সে তো;
সে চলে গিয়েছে একেবারে,
আর ফিরে আসবে না কখনো;
কোনদিন ফিরে আসবে না।

তবু কেন প্রতীক্ষা যে করি।
কেন তার পথ চেয়ে থাকি।
কেন ভাবি ঃ হয়তো সে এসে
দেখা দেবে সে-দিনের মতো।
সব কিছু ভুলে গিয়ে
পথে পথে খেলবো দু'জনে,
একেবারে সব ভুলে গিয়ে।

অশ্বারোহী পদাতিক সেনা

মাধুরী সিংহ

হয়তো জ্যোৎস্নভাসানো মাঠে
অশ্বারোহী পদাতিক সেনা
সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকে
ব্রোঞ্জের মূর্তির মত হুকুমের অপেক্ষায়
আদেশ আসবে আদেশ
ওরা এগিয়ে যায় তালে তালে পা ফেলে
সেই দুর্গের দিকে
যেখানে
পানপাতার মত মুখ ভিজে
মেঘের মত চোখ নিয়ে
সে এক রূপসী কন্যা আছে
তাকে লুঠে আনতে হবে
কেননা এখানকার রাজার
চাই কিছু প্রেম
ওরা সারা রাত
রোমান্টিক জ্যোৎস্নার নীচে নিশ্চল
অথচ সবাই ভুলে যায়
কেউ মনে রাখে না
একটা কবিতার জন্য ইচ্ছা হয় মনে মনে
কিন্তু কে লিখবে ওদের কথা?
চোরকাঁটাবনে জ্যোৎস্নায় ভিজতে ভিজতে
সারা রাত ওরা মনে মনে বলে
একটা কবিতা লেখো আমাদের নিয়ে

পাপপুণ্য

সামসুল হক

দিনের ভিতরে ছিলো ঘর
মানুষ ছিলো না
ওরা বুঝি হয়েছে অমর
গিয়েছে পাতালে
জোয়ারে ভাটায় ধরা পড়ে
ঈশ্বরের জালে

রাতের ভিতরে মানুষেরা
ছিলো ঘর নেই
যে-যার চামড়ায় তাঁবু ঘেরা
যে-যার চামড়ার তাঁবু ঘেরা
নিজের ছায়ার বীজ বোনে
ওরা কি অমর
কেননা নিজের মাংস কেটে
ওদের ঐ মদের উঠোনে
পাঠান ঈশ্বর

পুনরুদ্ধার

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

হাজার-হাজার প্রদীপ জেলে যখন দেখি তাকে,
তখন আমার বুকের ভেতর সিঁদিয়ে থাকা
জুঁই-গোলাপের পাহাড় ঠেলে হঠাৎ হঠাৎ
শীতের তাজা সুগন্ধ ঘায় ভ'রে;
রূপোর কাঁটা, সোনার চুড়ি, সবুজ ফিতে,
বেনারসী শাড়ির আঁচল ঘিরে—
স্বপ্ন দেখার সেই সময়ে,
আকাশ জুড়ে সূর্য ওঠে শিশির-ধোওয়া ভোরে;
ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে যখন দেখি তাকে,
তখন আমার হীরের মুকুট ফের পেয়ে যাই কাছে।

দূরের ভাবনা

জীবন সরকার

বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি করেছে
অনেক জমি
চলে গেছে বহু প্রতীক্ষার কাল
রেখে গেছে অনেক কান্নার স্মৃতি।

আমার জমিতে
শ্যামাপোকার অত্যাচারে হেলে গেছে
শস্যের গাছ
তবুও বসেছিলাম অসীম আশায়
এইবার এসে গেছে বর্ষার অমিয় বর্ষণ।
চারপাশে সোনালী রোদ্দুর
মনের খুশীর মতো সাদাসাদা মেঘ
আকাশের গায়।
এই বেলা
মনের কন্দর থেকে
সমস্ত কালিমা মুছে ফেলে
লাঙল নিয়ে মাঠে নামতে হবে।
নিতে হবে এ ভূমর পুণ্য আশীর্বাদ
শ্রমের শপথ নিয়ে
জমিতে ছড়াতে হবে
মুঠো মুঠো আকাঙ্ক্ষার বীজ।

বৃষ্টি

নলনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক পুঞ্জীভূত ক্ষত নিয়েই বেঁচে আছি।
ঠিক যেমনটি বেঁচে আছে
আমার আশেপাশের রাস্তা ঘাট,
খানা-খন্দর, সাবর্ণদের পোড়ো ভিটে,
আমার হালভাঙা সংসার:
রাতদিন দেখি আর ভাবি
কেন এমনটি হোল?
বাঁধভাঙা পারবতনের স্রোতে
এদের চেহারাটা কি একটুও
পাল্টায় না!
তবু মনটা যেন আমার কখন পাল্টাচ্ছে
ঠাহর করতে পারি না।
ভাঙা-গড়া; হাসি-কান্না,
খেয়াল খুশীতে পথচলা—
এ-যেন বালির বুকে দাগ কেটে কেটে যাওয়া।
তারপর,
আমার অজানতেই একপশলা
ঝমঝমে বৃষ্টি পড়ে:
সবকিছু পুরানো ক্ষত ধুয়ে পুঁছে একাকার।

নদী ও নারী

কার্তিক মোদক

নদী ও নারীর মধ্যে অস্তিত্ব কার বেশী এবং
দুঃখ কে বেশী বহন করে নদীর পলিমাটি,

নদী ও নারীর মধ্যে গভীরতা কার বেশী
কে বেশী নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবে

নদী ও নারীর মধ্যে চঞ্চলতা কার বেশী
মন না জলকল্লোল

নদী ও নারীর মধ্যে দাগ ও কলঙ্ক থাকে
সুখ ও দুঃখে ঢেকে রাখে

নদী ও নারীর মধ্যে প্রকৃত গভীর বিস্তার
এখন ও শিল্প সুষমায় বিস্ময়কর

মোনালিসা

অমিয় দত্ত

অনেকের মত আমিও মনে মনে ছবি আঁকি
হয়ত সেটা 'ছবি'
নয়ত কবি হবার একটা প্রচেষ্টা
ট্রামের ভিড়ে কিংবা বাসের লাইনে
সচকিত দৃষ্টি বামে-ডাইনে
তবুও পকেটমার হ'য়ে যায় মাসের শেষ সপ্তাহে
ভাবনার ভোজালিটা যখন কোপায়
অনিশ্চিত আবেগে
তখনি বোধহয় ছুটে যাই লিওনারদো দা ভিনচি
জীবনে যতই থাক উপরি পাওনা ভেংচি
আশা তবু একদিন হাসবে মোনালিসা
আর এই হাটা-শোয়া-বসা
ইতিবৃত্তে এনে দেবে অলিখিত অবজ্ঞাত বাণী
ছিলাম এবং আছি থাকবো কিনা তার
কতটুকু জানি।

মাটি ঃ সোনা

সলিল মিত্র

কুড়িয়ে নেবো মুঠো মুঠো
সোনা নয় তো, মাটি—
ছুঁইয়ে কপাল বুকের কাছে
রাখবো পরিপাটি।
প্রশ্বাসে তার গন্ধ মেদুর
রক্তে আনে ঢেউ—
মাটিই কখন হয় যে সোনা—
জানতে পারে কেউ?
মুঠো মুঠো মাটি, আহা,
ধানের খুশী তাতেই—
কাড়বে ক্ষুধা, আনবে সুধা
সূর্যওঠা প্রাতেই।

অসংগতি

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী সূর্যকে নাকি প্রদক্ষিণ করে
বছরে বছরে,
এবং নিজেকে ঘিরে সে নাকি ঘুরছে প্রতিদিন।

কাহিনীটি রীতিমত রোমাঞ্চে রঙিন,
শুনে যেন শিহরণ লাগে।

প্রসংগত প্রশ্ন জাগে ঃ
মন্বয়ের চিন্ময় চরিত্র এত কিসের নেশায়,
নিজীব জীবনে যদি সেই ছন্দ দ্বন্দ্ব না মেশায়?
জড়তা না যদি ছাড়ে জড়জগতের,
এত ছোটাছুটি কেন অপদার্থ জড়পদার্থের?

একদিনও যাইনি সেখানে

আইভি রাহা

আমি একদিনও যাইনি সেখানে
বনবাসর যেখানে হয় ক্রমশ নিবিড়
সারারাত অনৈসর্গিক নৈঃশব্দে
তিতির শামখোল কয়াপোকার
বোজা চোখ ঘুমেতে অঘোর
মহুয়ার ঘ্রাণ মেখে বাতাস মাতাল
জ্যোৎস্নার সাদা রঙে অসহ্য যৌবন
সমর্থ শালের বুকে শুয়ে থাকা স্বর্বলতা
সারারাত রনতল অসামান্য রমনীয়
প্রেমোন্মত্ত প্রেমিকের তৃষ্ণা আদিম
যাইনি কখনো আমি, কোনোদিন
আশ্চর্য সুন্দর সেই
মৌন-মূক সবুজ পাহাড়ে
যেখানে শৃংগার নেই
রমণীর অংগ ছুঁয়ে
সমর্পণ হয় একেবারে॥

অঙ্গীকার

বরুণ মজুমদার

ভোরের আরক্ত সূর্য গায়ে মেখে আমি হবো পাখি
দুপুরে রৌদ্দুর নিয়ে আমি হবো একা সূর্যমুখী।
বিকেলে ঝড়ের সাথে মুখোমুখী হতে হবে তাই
অশথ গাছের মতো বসে থাকবো অনন্য পথিক।

পূবের আকাশে রবো সন্ধ্যাবেলা ধ্রুবতারা হয়ে।
গোধূলিতে দীপ জ্বেলে যখন বধূরা যাবে ঘরে
টুং টাং পেয়ালার মধুর শব্দ শুনে আমি যাবো
ছোট গঙ্গা, বড় গঙ্গা পার হয়ে যন্ত্রণার হ্রদে।

না বন্ধু, এখন এই রোদমাখা শরৎ বেলায়
তোমরা আমাকে কেউ ডেকো নাকো অতি সমারোহে।
অতীত দিনের সেই শোকমগ্ন সমাধির পরে
কেননা শিশুর মত আমি চাই শুধু খেলাঘর।

না বন্ধু, এখন কেউ পুরানো ছবিতে হাত রেখে
ঘোষণা কোরোনা শুধু নতুন দিনের অঙ্গীকার।

আগমনীর গান

শরতে শিউলি ফোটে
কাশের শুভ্র চামর লোটে
বাউল ধরে আগমনীর গান।
পুলক জাগে সবুর মনে
থাকে না কেউ ঘরের কোণে
আনন্দেতে প্রাণ করে আনচান॥

আহা কি মনোলোভ
দেখ ভাই পুজোর শোভা
বঙ্গভূমে আজকে মোদের ঘরে।
ভক্তিদীপের জ্বালিয়ে আলো
দূর করে সব মনের কালো
অঞ্জলি দাও শ্রদ্ধানত শিরে॥

বিষ্ণুশর্মা

॥ স্বপনবুড়ো ॥

সে অনেকদিন আগের কথা। তখন পাখীরা বাসা বাঁধতে পারত না। বনের মধ্যে নানা গাছের ডালে ওরা থাকতো। ঝড়-বাদলের সময় নানা কষ্ট হত ওদের।

মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না—
বনের মাঝেই বাস—
ঝড়-বাদলে মনের দুখে
কাটায় বারো মাস॥

পায়রা ছিল আয়েসী পাখী।

সে মানুষের বসতিতে এসে ভাঙা দালানের মধ্যে, পোড়োবাড়ীতে থাকতো। বনে গিয়ে বিপদে পড়তে চাইত না।

কোকিল আরো চালাক।

ওরা সারা জীবন গান গেয়ে বনে-বনান্তরে ঘুরে বেড়াতো। যখন ওদের ডিম ফোটবার সময় তখন চুপচাপ গিয়ে কাকেদের বাসায় সেই ডিমগুলি রেখে আসতো।

কাকেরা ত' বোকা। না বুঝে কোকিলের ডিমে তা' দিত। তারপর ডিম যখন ফুটে যেতো, সেই কোকিলের ছানাগুলো ফুরুৎ-ফুরুৎ করে উড়ে নিজেদের মা-বাবার কাছে পালিয়ে যেত। বোকা কাকের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো।

কাকের বাসায় কেমন করে
ফুটত কোকিল ছানা,
কোকিল শুধু জানত নিজে
কাকের নাহি জানা।

এইসব দেখে-শুনে বাবুই পাখী ঠিক করলে, পরের দোরে দোরে ঘুরে কোনো লাভ নেই। বন্ধু পায়রাকেও সেই পরামর্শ দিলে। পায়রা বন্ধুর কথা শুনলে না। তারা কইলে—

পোড়ো দালান কোঠায় যে ছাই
আমরা আছি খাসা—
কষ্ট করে কেবা আবার
গড়বে নতুন বাসা॥

কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা পায়রা ঘরে ফিরে দেখে মজুরের দল ভাঙা দালান-কোঠা মেরামত করছে। ওদের ছানাগুলিকে মাটিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ও তখন কাঁদতে লাগলে ঃ

পরের ঘরে থাকতে গিয়ে
এই হল মোর হাল—
হায় রে কেন পর-দালানে
কাটাই চিরকাল॥

ততদিনে বাবুই পাখী কারো ওপর ভরসা না করে—নিজেই উঁচু গাছে বাসা বেঁধে ফেলেছে। কারো দোরে দোরে আর আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়াবে না। নিজের বাসায় নিজে মজা করে বাস করবে।

আপন বাসায় আপনি থাকি
আমরা আছি খাসা।
সমীরণে দোল দিয়ে যায়
মোদের মধুর বাসা॥

দেরিয়াস যখন পারস্য দেশের রাজা ছিলেন, তাঁর তিনজন দেহরক্ষী একদিন ঠিক করলো তাদের মধ্যে কার জ্ঞান বেশী পরীক্ষা করে দেখবে।

আলাদা আলাদা করে কাগজে লিখে রাখল কে কাকে সর্বশক্তিমান মনে করে। কাগজগুলি রাত্রে দেরিয়াসের বালিশের তলায় রাখা হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা পড়ে দেখবেন কার মত ঠিক।

একজন দেহরক্ষী লিখলে—
"মদ সর্বশক্তিমান।"

আর একজন লিখল ঃ
"রাজা সর্বশক্তিমান।"

তৃতীয় দেহরক্ষী লিখল ঃ
"সর্বশক্তি নারীর, তবে চিরশক্তি সত্যের।"

হাততালি পড়ল রাজসভায় যখন রাজা তৃতীয় দেহরক্ষীর মত পড়ে শোনালেন। তিনি সেই দেহরক্ষীকে পুরস্কৃত করলেন।

বিমল দত্ত

ইংলন্ডের একজন নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন ডাক্তর শ্যামুয়েল জনসন। ইনি বিরাট পন্ডিত ও রসিক লোক ছিলেন। প্রথম ইংরাজি অভিধান ইনিই প্রণয়ন করেন। ইঁহার বন্ধু বস ওয়েল ইঁহার জীবনী লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরাজীতে বস ওয়েলের লেখা জনসনের জীবনী একটি চিরায়ত সাহিত্য।

এই জনসন সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে। ইঁহার পিতার একটি বইয়ের দোকান ছিল। পিতা এই বইয়ের উঁচু তাকে বইয়ের পিছনে আপেল রেখে দিতেন। আপেলের লোভে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বই নাড়তে নাড়তে অনেক সময় জনসন আপেল খাওয়া ভুলে সিঁড়ির উপর বসেই বই পড়তেন। এইভাবে ক্রমশঃ জনসন মস্ত পন্ডিত হয়ে উঠলেন।

একদিন তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে দোকানে যেতে পারেন নি। তখন জনসন বালক। তিনি বালক পুত্রকে দোকানে যেতে বলেন। কিন্তু বালক বাজারের মধ্যে দোকানে গিয়ে দোকানদারি করা লজ্জাজনক মনে করে দোকানে যায় নি।

পিতার মৃত্যুর পর এ কথা মনে পড়ায় অনুশোচনায় জনসনের মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি একদিন পরিণত বয়সে নিজের অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে দুপুর রৌদ্রে পিতার দোকান যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে নত মস্তকে টুপি খুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন অনুশোচনায় ঝর ঝর করে জল ঝরতে থাকে।

মাছরাঙার দুঃখ

অমিতাভ চক্রবর্তী

উত্তর পাহাড়ের বুকে বয়ে চলে সেই ছোট্ট হলুদ নদী। অপূর্ব সুন্দর রূপ। দুরন্ত গতিবেগ। দূর দূর পাহাড়ী পথ পেরিয়ে জল নিতে আসে মানুষ। ঘোড়া, ভেড়া, চমরী গরু আর বৌদ্ধ মঠের লামাগণ সকাল হতেই নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়। কবে যে নদী এখানে জন্মেছিল। কোথায় তার বাবা-মা কেউ তার সঠিক খোঁজ জানে না। ঘরে ফেরার পথে শিকারীরা সারা শরীর ভিজিয়ে নেয় গ্রীষ্মের দুপুরে বরফ গলা জলে। একা একা আপন মনেই নদীর সকাল-সন্ধ্যা রাত্রি-দিন কেটে যায়। পাখীদের গান, আকাশের নীল-ছায়া, মেঘের রঙ, হরিণ, ময়ূর, খরগোশের নাচ দেখার সুযোগ ঘটে মাঝে মাঝে বসন্ত হেমন্তের হলুদ দুপুরে। ওরা সবাই নদীকে ভালবাসে। তার সঙ্গে কথাও বলে কিন্তু হলুদ নদীর বন্ধু বলতে শুধু একজ হ্যাঁ, সকাল থেকে সন্ধ্যা একইভাবে বসে থাকতে দেখা যায় সেই বন্ধুটিকে রোজ। সবাই ডাকে মাছরাঙা। লোকে বলে এমন গম্ভীর, সুন্দর আর বিদ্বান পাখী ভগবান কমই তৈরী করেছেন। রামধনুর সাত রঙ মাখা শরীর।

লম্বা ঠোঁটে জল থেকে ছোঁ মেরে ধরে আনে সোনালী আর রূপালী মাছ। ছোট ছোট পাথরের উপর কিংবা পাইন গাছের উঁচু ডালে বসে থাকে একা। নদীর মতন তার আর কোন বন্ধু নেই। একদিন নদী তাকে জিজ্ঞাসা করে, বন্ধু, তোমার বাড়ি কোথায়? কি তোমার পরিচয়? মাছরাঙা একটু হেসে বলে, তোমার মতন আমারো বাড়ি এই পাহাড়ের চূড়োয়। আপনজন বলতে পৃথিবীতে এখন কেউ নেই। শিকারীদের জালে সেই ছেলেবেলায় বাবা ধরা পড়ে। তারপর এক ঝড়ের রাতে মা কোথায় যে হারিয়ে গেলো। সারা বন খুঁজেও তার আর দেখা মেলেনি।

নদীর দুঃখের কথা শোনে পাখী। আর পাখীর মনের কথা শোনে সমবয়সী নদী। একদিন পাখী বলে বন্ধু, আমি মাকে রাতে স্বপ্নে দেখেছি। দক্ষিণের দেশে বেঁচে আছে। আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই গত বছরের ঝড়-বৃষ্টির রাতের কথা সবাই শুনেছে গ্রামের মানুষের কাছে। বৃদ্ধ পাহাড়ের মুখে। সেই রাতেই নদীর জন্ম হয়েছিল, বনের পাখীরাও সেই কথা বলে। পাখী নদীকে ডেকে বলল, বন্ধু, আমি দক্ষিণের শহরে যাব। তুমি সামনের গ্রীষ্মের কটা দিন একটু সাবধানে থেকো।

মাছরাঙার কথা শুনে নদী খুব দুঃখ পেলো। পৃথিবীতে তার বন্ধু বলতে, আত্মীয় বলতে শুধু এই একজন। সেও যদি চলে যায় তবে কথা বলার, খেলার সাথী আর কেউ থাকবে না। তবু মাছরাঙা তার হারানো মাকে খুঁজতে যাবে শুনে আর বাধা দিল না। শুধু বলল, বন্ধু, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। পাখী বলল, ভয় কি বন্ধু, বর্ষা এলে তোমার সেখানে পৌঁছানোর পথ তৈরী হয়ে যাবে। তুমিও দক্ষিণ সমুদ্রে একদিন যেতে পারবে একটু বড় হলেই। শীতের হাওয়া শুরু হতেই অশ্রুসজল চোখে মাছরাঙা বিদায় নিলো।

দিন যায়। মাস যায়। বছর চলে যায়। অথচ মাছরাঙা আর ফিরে আসে না। কোথায় গেলো বন্ধু? হলুদ নদীর কথা কি ভুলে গেলো। পাহাড়ী মানুষদের জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। পাহাড়ী কাক আর লাল-শেয়ালের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল মাছরাঙার খবর। ওরা এত দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় অথচ মাছরাঙার খবর জানে না। কাকটা মুখ বিকৃত করে শুনিয়ে দিল, মাছরাঙা মারা গেছে। শেয়াল বলেই দিল, দক্ষিণের কোন এক গ্রামের পথে নাকি সে মাছরাঙার মরা দেহ দেখে এসেছে। কাঠপিঁপড়া আর বেড়ালে খাচ্ছে। নদীর মনের দুঃখ বেড়ে যায় ওদের কথা শুনে।

অথচ কার কাছে খোঁজ নেবে? সেই প্রানকৌড়িটাও অন্য পাহাড়ে চলে গেছে। আস্তে আস্তে গ্রীষ্মের সূর্য আরো প্রখর হয়ে ওঠে। সেবার চৈত্র-বৈশাখে একফোঁটাও বৃষ্টি হল না। গ্রামের লোকেরাও বলা শুরু করল, এবার মড়ক, দুর্ভিক্ষ লাগবেই। আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই। নদীর জল শুকিয়ে এলো। সত্যি একদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা জল নিতে এসে দেখলো হলুদ নদীটা মারা গেছে, জলের স্রোতের কোথাও আর চিহ্ন নেই।

অনেকদিন পর বহু শহর, গ্রাম, দক্ষিণের দেশ ঘুরে মাছরাঙা ক্লান্ত মনে আবার উত্তর পাহাড়ে ফিরে এলো। কোথায় হলুদ নদী?

মাকে খুঁজে পায়নি কিন্তু কত রকম মাছ, পাখী এবং মানুষ দেখে এসেছে দূর দেশ ঘুরে ঘুরে। বন্ধুকে না দেখে মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠলো। নদী যেখানে বয়ে যেতো সেখানে এখন শুধু কয়েক টুকরো পাথর। আর শুকনো বালি ছড়ানো। পাহাড়ে বোধ হয় ধস নেমেছিল হঠাৎ একদিন।

জলের চিহ্ন নেই চারপাশের কোথাও। লম্বা ঝাউগাছটা বললে, "নদী অনেকদিন হল মারা গেছে।" রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের চূড়ো থেকে মাছরাঙা প্রথম যেখানে নদীর সঙ্গে কথা বলেছিল সেখানে নীরবে উড়ে এলো।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই সব পাখীরা অবাক। তাদের সেই মাছরাঙা পাখী নদীর বালুচড়ায় মরে পড়ে আছে।

বৃদ্ধ পাহাড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাইকে বলল, এই হল বন্ধুত্ব। এর নাম ভালবাসা।

প্রশ্ন কিছু

বীরু চট্টোপাধ্যায়

ওরে ন্যাড়া একটু দাঁড়া আমার কথা শোন
ঢোঁড়া সাপের পা দেখেছিস? বৃক্ষশূন্য বন?
জলশূন্য সাগর কোথায় বল্ দেখিরে দাদা?
কোথায় গেলে হয় না দিতে বারোয়ারীর চাঁদা?
চৈত্র মাসেতে কোথায় ফলে ইয়া বড়ো তাল?
কোন দেশেতে যায়রে পাওয়া কাঁকর ছাড়া চাল?
এরোপ্লেনের পাল দেখেছিস? তিমি মাছের ডানা?
কোন গাছেতে ফোটেনা ফুল? কোন ডিমেতে ছানা?
কোন গাছটির তলায় যতে শতবার তোল মানা?
ওড়ে ন্যাড়া বলে যা তোর কোন জবাবটি জানা।

তুষারমৌলী আল্পসের পাদদেশে আট হাজার ফুট উঁচুতে বরফের রাজত্বের মাঝে রয়েছে সেণ্ট বার্ণাডের সন্ন্যাসীদের মঠ। চারিদিকে বরফের পাহাড়। মানুষের বসতি সেই বললেই হয়, দূরে দূরে দুটো-একটা পাহাড়ী-গ্রাম। বরফের আবরণে ঢাকা বিপদ-সংকুল পাহাড়ী-পথ বেয়ে নীচে থেকে অনেক মানুষ ওপরে উঠে আসে, মঠে বিশ্রাম করে, সেবাযত্ন পায়, আবার আরও ওপরে উঠে যায় দূরের গ্রামের উদ্দেশে। এ রাস্তা বড়ই সংকীর্ণ ও দুর্গম, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও ধসে-ভাঙা রাস্তা কখনও ঠিক থাকে না, তুষার, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত লেগেই আছে, দরিদ্র গ্রাম-বাসীরা প্রাণ হাতে করে এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। মঠের সন্ন্যাসীরা ও এখানকার পালিত শিক্ষিত কুকুর ব্যারী নানাভাবে বিপন্ন পথচারীদের সাহায্য করে, বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়, বিশেষ করে এই ব্যারী কুকুর না থাকলে এই পথে বহু যাত্রী তুষার ঝড়ে পথ-ভ্রান্ত হয়ে পথ হারাত। ব্যারী নানা ছলে বিপন্ন যাত্রীদের সংকট থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে মঠের দিকে, তাদের সাধুদের নজরে এনে দেয়, তারপর যাত্রীরা বিপদ-আপদের মুখে এই রকম একটি সেবাব্রত সাধুদের আস্তানার সন্ধান পেয়ে বেঁচে যায়। বরফের প্রান্তরে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় মঠের অনেক নীচে পর্যন্ত গিয়ে ব্যারী ঘুরে বেড়িয়ে দেখে আসে কোথায় কে আসছে, বরফের রাস্তায় কেউ আটকে পড়ে আছে কিনা ইত্যাদি।

যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় মানুষের পদধ্বনি বা গায়ের গন্ধ শুঁকলেই ব্যারী ছুটে যায় সেই মানুষের কাছে, হাঁক-ডাক করে হাবেভাবে তাকে বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত পথিককে নিজের ঝোলান পানীয় বোতল বা খাদ্যের থলি ধরে দেয়, পথে আটকে থাকা উত্থানশক্তিরহিত ব্যক্তির সংবাদ গিয়ে দেয় মঠের সন্ন্যাসী-দের। তারা ব্যারীর অনুসরণ করে এসে ঐ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে। এইভাবে চলে দিনের পর দিন শিক্ষিত ব্যারীর মানুষের সেবা, ক্রমেই ব্যারী ঐ অঞ্চলে বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়ল।

একবার একটা ছোট মেয়ে তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছিল ঐ পাহাড়ী-পথ দিয়ে, তখন বিকালের শেষে সূর্য ডুবে গিয়েছিল। প্রায় অন্ধকারের মুখে ঘূর্ণিঝড় উঠল। বাবার হাত ছিটকে মেয়েটি বিপথে গিয়ে পড়ে একটা বরফের স্তূপের মধ্যে আটকে পড়ল, তার করুণ আর্তনাদ সেই ঝড়ের শব্দের মধ্যে তার বাবার কাছে পৌঁছাল না। দিশাহারা বাবা মঠের সন্ধান জানত, তাড়াতাড়ি সে মঠের সাধুদের কাছে গিয়ে শরণাপন্ন হল। এর-পর যথারীতি ব্যারী ছুটল মেয়েটির সন্ধানে। অন্ধকার পাহাড়ী ঝড়ের মধ্যে মানুষ ভয় পায়, কিন্তু কুকুর ব্যারীর ভয় নেই, গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে ঠিক সেই মেয়েটিকে বরফের স্তূপের মাঝে খুঁজে বার করল। অন্ধকারে তার চোখের দৃষ্টি যেন আরও জ্বলজ্বল করছে, বরফের আস্তরণের নীচে ঠাণ্ডায় মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়ে আছে, কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হল না।

ব্যারী

মীরা রায়

ব্যারী আঁচড়ে আঁচড়ে যতটা পারল তার গায়ের ওপর থেকে বরফগুলো সরিয়ে দিল, তারপর তার লম্বা জিব দিয়ে তার সমস্ত দেহটা চেটে চেটে তাকে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু মেয়ে-টির জ্ঞান কিছুতেই এল না। তখন নিরুপায়ভাবে ব্যারী মেয়েটির জামার হাতাটা কামড়ে ধরে তাকে টানতে টানতে সেই বরফের রাস্তার ওপর দিয়ে নিয়ে চলল সেই মঠের দিকে। ওদিকে মঠের সন্ন্যাসীরাও মেয়ে-টির বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আলো নিয়ে ব্যারীর খোঁজে বেরিয়েছে, পরিচিত মানুষ ও আলো দেখলে ব্যারী ঠিক ওদের খুঁজে নিতে পারবে।

ভারী একটা মানুষের দেহকে মুখে করে টেনে আনতে আনতে ব্যারী হাঁপিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ পরিচিত আলো ও মানুষের শব্দ পেয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সে ভৌ-ভৌ করে ডেকে নিজের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিল। সন্ন্যাসীর দল কাছে এসে পড়তে সে ছুটে গিয়ে আনন্দে তাদের পায়ের নীচে মাথা ঘষতে লাগল অর্থাৎ তোমরা যেরকম নির্দেশ দিয়েছিলে সেই হারানো মেয়েকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। মেয়েটির বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল মেয়েটির কাছে, মেয়েটির তখনও জ্ঞান আসে নি। সাধুরা মেয়েটিকে মঠে নিয়ে গিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তুলে তাকে তার বাবার হাতে ফিরিয়ে দিল, এইভাবে অব্যর্থ মৃত্যু থেকে একটি প্রাণ বাঁচাল ব্যারী। এইরকমে বিভিন্ন পরিবেশে চল্লিশজন বিপন্ন পথিককে প্রাণে বাঁচাল ব্যারী। ব্যারীর জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হল একচল্লিশজনের জীবন রক্ষার বেলায়।

সেদিন ডিসেম্বরের শীতের বরফ-ঝরা সন্ধ্যায় একদল লুঠেরাটকারী দুর্বৃত্ত চলেছে মঠের উদ্দেশ্যে, মঠে নাকি অনেক গুপ্তধন লুকোন আছে। সেগুলো হস্তগত করতে হবে। দলের চার-পাঁচ-জন এগিয়ে গেছে, সবার পিছনে যে আসছিল সে পড়ল তুষার ফাটলের মাঝে, দেখতে দেখতে তার গলা অবধি পেঁজা-পেঁজা তুষারে ভরে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও, বলে সে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু সহকর্মীরা তার সে ডাকে ভ্রূক্ষেপই করল না, তারা তাড়াতাড়ি তাদের কাজ সেরে পালাতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়, বিশেষ করে ঐ ব্যারী কুকুর একবার জানতে পারলে তারা সকলেই ধরা পড়ে যাবে। ভালই হয়েছে, আপদ কুকুরটা যদি বাঁচাও চিৎকার শুনে ঐ লোকটার দিকে এগিয়ে যায় তাহলে তারা নির্বিবাদে মঠে কাজ হাসিল করে পালাতে পারবে। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র আছে, সাধুরা ভয় পেয়ে স্বেচ্ছায় সব ধনরত্ন ওদের হাতে তুলে দেবে।

ওদিকে মঠের বাইরে ব্যারী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, লোকটার বারংবার চীৎকার শুনে সে ছুটল শব্দ লক্ষ্য করে। পাহাড়ের খাঁজে আটকে থাকা তুষারে প্রায় ঢেকে থাকা মানুষটাকে সে খুঁজে বারও করল। সে ঝাঁপিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা মনে করল ব্যারী বোধহয় তাকে শত্রুপক্ষ মনে করে আক্রমণ করতে আসছে। ব্যারী একটু কাছে এগোতেই সে লোকটা তার হাতে ধরা পিস্তলটা উঁচিয়ে গুলী ছুঁড়ল ব্যারীর মাথা লক্ষ্য করে। অব্যর্থ গুলী গিয়ে লাগল ব্যারীর কপালে, ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটল। বিষম যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে ব্যারী ফিরে ছুট লাগাল মঠের দিকে।

এদিকে সশস্ত্র ডাকাতদলের সঙ্গে

মঠের সন্ন্যাসীদের প্রবল সংঘর্ষ বেধে গিয়েছে। অলীক ধনরত্নের কথা শুনে তারা মঠে ডাকাতি করতে এসে ধনরত্ন না পাওয়ায় অবশেষে নিরীহ সন্ন্যাসীদের ওপরেই মারপিট সুরু করে দিয়েছিল। মঠের যিনি প্রধান বিশপ তিনি উপাসনা বেদী থেকে রূপোর যীশুমূর্তি ও দুটি ফুলদানি নিয়ে এসে তাদের সর্দারমত লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, 'মঠের এই কয়টিই আছে সবচেয়ে দামী জিনিষ, এগুলি তোমরা নিয়ে যাও, শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীদের ওপর আর কোন হামলা কোর না। প্রভু যীশু তোমাদের কাছে গিয়ে তোমাদের শান্ত করুন, তোমাদের মার্জনা করুন।' ডাকাতগুলো মঠের সমস্ত জিনিষপত্র তছনছ করে ফেলে দিয়ে রূপোর যীশুমূর্তি ও ফুলদানি দুটো নিয়ে পালিয়ে গেল। এই গণ্ডগোলের মাঝে রক্তাক্ত মুমূর্ষু ব্যারীর দিকে কারুরই নজর পড়ে নি। ডাকাতরা নিতে রক্তমাখা ব্যারী যখন বিশপের পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়ল তখন তার অবস্থা দেখে সারা মঠে হৈ-হৈ পড়ে গেল।

নিশ্চয় ঐ ডাকাতগুলোরই এই কাজ। কিন্তু ডাকাতগুলোর ধারে-কাছে কোথাও তো ব্যারীকে তখন দেখা যায় নি। তার ডাকও শোনা যায় নি। ব্যারী নিশ্চয় কোন আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য পাহাড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পাপের পৃথিবী ব্যারীকে বাঁচতে দিল না। হিংসা এসে ধ্বংস করল একটি মানবদরদী প্রাণকে। অন্যান্য বিপর্যয়ের কথা ভুলে গিয়ে বিশপ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তখন মৃতপ্রায় ব্যারীকে নিয়ে অধীর হয়ে পড়ল, আপ্রাণ চেষ্টা চলতে লাগল তাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু হায়, তাদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ব্যারী যীশুর প্রতিনিধি বিশপের কোলে শুয়ে তাঁরই অমৃতলোকে চলে গেল, সামান্য কুকুর নিঃস্বার্থ সেবায় অসামান্য হয়ে রইল।

এই অমর প্রাণটিকে 'অমর' করে রাখবার জন্য বিশপ ব্যারীর দেহকে কবর দিতে নিয়ে এলেন প্যারিসের বিখ্যাত Olmetieve Deschiens সমাধিক্ষেত্রে, যেখানে দশ হাজারেরও ওপরে মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু গৃহপালিত জীব-জন্তুকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমাধির ওপর বিভিন্ন স্তম্ভ বা স্মৃতিফলক নিদর্শন গড়ে রাখা হয়েছে। সেই স্মৃতিফলকে মানুষ তার নিজের ভাবাবেগ দিয়ে লিখে রেখে দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেম-স্নিগ্ধ লিপিকা। এই সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশ-মুখে রয়েছে বিরাট একটা স্মৃতিস্তম্ভ। ঠিক কুকুরের আকৃতিতে গড়া হয়েছে স্তম্ভটা। এই সমাধি স্তম্ভের নীচে মানুষের সেবা ও প্রেমের স্মৃতি বুকে নিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে অমরপ্রাণ ব্যারী, তারই অনুকরণে কুকুরের আকৃতিতে স্মৃতিস্তম্ভটা তৈরী করা হয়েছে। সমাধি-ক্ষেত্রে ঢুকতেই আগে নজরে পড়বে উন্নতশির ঐ স্তম্ভটা। অন্যান্য সমাধি-ফলকগুলি ছোট। কারণ তারা বিশেষ কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন স্নেহসিক্ত মূর্ত বিকাশ। ব্যারীর স্মৃতিস্তম্ভ বিশেষ কোন ব্যক্তির ভালবাসার চিহ্ন নয়, আপামর মানবপ্রীতির চূড়ান্ত প্রকাশ। তাই ওটা সবচেয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বকে তথা আগন্তুক দর্শকদের জানিয়ে দিচ্ছে একটি সামান্য প্রাণীর এক অসামান্য কীর্তির কথা।

ডাকাতরা ব্যারীকে যথার্থ মারতে পারে নি। তাকে আরও অমরতর দান করে দিয়ে গেছে। *

* সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে

নতুন দিনের ছড়া ঃ চোরপঞ্চক

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

চোর চোর! কোথায় চোর?
বাক্স খোলা বন্ধ দোর।
সুড়ুং কেটে উধাও চোর॥

চোর চোর! কোথায় চোর?
ছদ্মবেশে মিষ্টি হেসে—
ঘরে বাইরে ঘোরে বেঘোর॥

চোর চোর! কোথায় চোর?
বিমানচারী সাগর পাড়ি।
বহুরূপীর বিদ্যেভারী॥

চোর চোর! কোথায় চোর?
টাকার কালো খেলছে আলো।
ধরবে কি, তার ডায়রা চোর॥

চোরবাজারে কোথায় চোর?
দিনদুপুরে রাত্রি জমাট।
কখন হবে রাত্রি ভোর॥

ভাগ্যে ছিল আকাশখানা।

মনোজিৎ বসু

ভাগ্যে ছিল আকাশখানা!
তা যদি-না থাকতো—
লুব্যি-তারায় শ্রীভগবান
ঝুলিয়ে কোথায় রাখতো?
চাঁদের ফালি রাখতো না হয়
মহাদেবের মাথায়—
কিন্তু গোটা চন্দ্রে কোথায়
রাখতো হুতোয়নাতায়?
রকেটগুলো আকাশ ছাড়া
পারতো কি আর ছুটতে—
উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি সব
ওপর দিকে উঠতে?
আকাশখানা ছিল ব'লেই
এরোপ্লেনের জন্ম—
নইলে তাদের দিয়ে ছ'তো
কোন্ সে মহৎ কর্ম?
সত্যি কথা বলতে কী আর,
নেই আকাশের জুড়ি—
ভাগ্যে ছিল এমন আকাশ,
ওড়াচ্ছি তাই মুড়ি॥

ভীম পালোয়ান

রাগা বসু

পালোয়ান ছিল কুস্তিগির
সাড়ে বাষট্টি ছাতি,
রোজ সকালে লুফতো হাতে
দশ মণ দুই হাতি।

শিলে বেটে পান খেতো সে
শাল দিয়ে দাঁত মাজতো,
বাঘের দুধে চা খেয়ে সে
যোগাসনে বসতো।

চোখের পাতা জড়িয়ে এলে
দিনের আহার সারতো,
পিঁয়াজ রসে ডুবিয়ে রুটি
কী খেতে সে পারতো!

এমন পালোয়ান হাই তুললো
ঢুকলো মুখে মাছি,
মাকের ডগায় বিঁধল সেটা
পড়লো তিনটে হাঁচি
পালোয়ান গেলো বাঁচি॥

(বিদেশী উপকথা)

কয়েকটা বাদাম মাত্র

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দেবী সিরিস ফসলের দেবী। দেশে দেশে ঘুরে ক্ষেতে ক্ষেতে তাঁকে ফসল ফলাতে হয়। বর্ষাকালে ছ'মাস ধরে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান।

দেবীর একটি মাত্র কন্যা, তার নাম প্রসারপিনা। ছোট মেয়ে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরলে মেয়েটির কষ্ট হবে। দেবী বললেন—তুই বাড়ীতেই থাক, আমি ঘুরে আসি।

মেয়েটি বললো, একা একা কেমন করে থাকবো?

মা বললেন—কেন, সাগরতীরে গিয়ে জলপরীদের ডাকবি, তাদের সঙ্গে খেলা করবি, দিন কেটে যাবে। তবে এলোমেলো বনে-বাদাড়ে যাস নি। ক'দিন পরেই তো আমি ফিরে আসবো। ক'টা দিন চালিয়ে নে। আমার সঙ্গে ঘুরলে তোর কষ্ট হবে।

দেবী রথে চড়ে বনে গেলেন।

মেয়েটি একা রইল।

সকালে প্রসারপিনা সাগরতীরে যায়, জলপরীদের ডাকে, সারা দিন তাদের সঙ্গে শামুক ঝিনুক নিয়ে বালুচরে খেলা করে, দিন কেটে যায়।

একদিন প্রসারপিনারের কি খেয়াল হলো, জলপরীদের বললো—তোমরা তো কখনো ফুলের মালা পরনি, আজ আমি তোমাদেরকে ফুলের মালা পরাবো। তোমাদের মাথার চুল সবুজ, গায়ে রুপালী আঁশ, গলায় লাল ফুলের মালা বেশ ভাল দেখাবে।

কাছেই বনের ধারে অনেক লাল ফুল ফুটেছিল, মেয়েটি গেল সেই ফুল তুলতে।

বনের ধারে নানা রঙের ফুল ফুটেছে। মেয়েটি লাল ফুল দেখলেই তোলে আর আঁচল ভর্তি করে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় এক গাছ থেকে আরেক গাছে। সহসা তার চোখে পড়লো, সামনে ঘাসের উপর এক থোকা ঝলমলে লাল ফুল ফুটেছে। সে ছুটে গেল সেই ফুল তুলতে।

ফুলের থোকাটা ধরে সে টানলো, কিন্তু ফুল তো উঠলো না। আবার টানলো। তবুও ওঠে না। এবার যত জোরে পারে টানলো, থোকাটা গোড়াসুদ্ধ উপড়ে এলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিচের মাটিতে একটা গর্ত দেখা দিলো। দেখতে দেখতে সেই গর্ত বড় হয়ে উঠলো। দেখা দিল এক মস্ত ফাটল। সেই ফাটলের নীচে এবার শোনা গেল গুমগুম শব্দ। মনে হলো নীচে যেন একখানা রথ চলছে। পরক্ষণেই দেখা গেল চারটে কালো ঘোড়া একখানা সোনালী রথ নিয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে।

রথ উঠে এলো। রথে বসে আছে এক রাজা। রাজা ডাকলো—খুকী, শোনো—

প্রসারপিনা তখন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—ভয় কি এসো, তোমায় খানিক রথে চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনি—

—মাগো—বলে প্রসারপিনা ভয়ে পিছিয়ে এলো।

রাজা এবার নেমে এসে মেয়েটির হাত ধরে তুলে নিলে রথের উপর, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। মেয়েটি কেঁদে উঠলো—আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—বাড়ী যাবো—

রাজা বললো—কোন ভয় নেই, তুমি চল আমার রাজবাড়ীতে। সোনার বাড়ী, ফটিকের জানালা, হীরের আলো জ্বলে সেখানে। তুমি সেখানে রাণী হয়ে থাকবে।

—না না না, আমি রাণী হতে চাই না।

—কাঁদছ কেন? আমি তোমাকে তো কিছু বলিনি। আমি পাতালের রাজা, চল না আমার বাড়ীতে—

মেয়েটি তবু কাঁদতে থাকে।

এবার আলো হাওয়ার রাজ্য ছেড়ে রথ চলে পাতালে। অন্ধকার পথ। চারপাশে শুধু পাথর। ঘোড়ার ক্ষুরে আর রথের চাকায় পাথর গুম গুম করতে থাকে। মেয়েটি কি করবে ভেবে পায় না।

দেখতে দেখতে আঁধার পার হয়ে মৃদু আলো দেখা দেয়। সেই আলোয় রথ এসে থামে রাজবাড়ীতে। একটা কুকুর ছুটে আসে রথের পাশে। প্রকাণ্ড কুকুর। তার তিনটে মাথা। রাজা তার মাথায় আদর করে চাপড় মারেন। কুকুরটি লেজ নাড়ে। সে লেজটা ড্রাগনের মতো, কাঁটাওলা ভয়ংকর। মেয়েটি বলে উঠে—বাবা, কী ভয়ানক! কী বিশ্রী!

রাজা বললেন—ভয় নেই। তোমায় কিছু বলবে না।

তারপর প্রসারপিনার হাত ধরে হীরে বাঁধানো পথ দিয়ে রাজা এগিয়ে যায় রাজবাড়ীর ভিতরে। সারা বাড়ী হীরে, পান্না, চুনীর সাদা লাল সবুজ আলোয় ঝলমল করছে। তবু সূর্যের কিরণ ও মুক্ত হাওয়া না থাকায় কেমন যেন একটা গুমোট ভাব। রাজা বললে—এইখানে তুমি থাকবে, এই বাড়ী তোমার।

তারপর রাজা দাসদাসীকে ডেকে বললে—সরেশ খানা বানাও, হীরে বসানো সোনার থালায় খেতে দাও।

প্রসারপিনা বললো—তুমি আমাকে এখানে ধরে এনেছ, আমি এখানে কিছুই খাব না, জলস্পর্শ করবো না।

রাজা হেসে বললে, খাবার দেখলে আর খাব না বলতে পারবে না, সেরা খানা বানানো হবে তোমার জন্যে।

পাতাল রাজ্যে একটা বিধান ছিল যে, এখানে কেউ যদি একবার কিছু খেয়েছে, সে আর পাতাল থেকে ফিরতে পারবে না। প্রসারপিনাকে যদি একবার কিছু খাওয়ানো যায় তাহলে তারও ফিরে যাওয়া বন্ধ হবে। পাতালের রাজা তা ভালমতই জানতো। সেই জন্য সে সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরী করতে বলেছিলো, যার সুগন্ধে প্রসারপিনা লোভ সামলাতে পারবে না।

রাজা যাই বলুক, প্রসারপিনা কাঁদতেই রইল।

ওদিকে দেবী সিরিস তো ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলাচ্ছেন। কোন এক সময় তাঁর মনে হলো মেয়েটি যেন তাঁকে ডাকছে। মন উতলা হলো, ফসল ফলানো ছেড়ে তিনি চলে এলেন বাড়ীতে। দেখেন বাড়ী খালি। দেবী গেলেন সাগরতীরে। সেখানেও তো মেয়ে নেই। জলপরীদের ডেকে বললেন—আমার মেয়ে কোথায় গেল?

জলপরীরা বললো—সকালে এসেছিল আমাদের সঙ্গে খেলতে, তারপর ফুল তুলতে গেল বনের ধারে, আর তাকে দেখিনি, আর আসেনি।

দেবী বেরুলেন মেয়েকে খুঁজতে। বনের পথ দিয়ে দেবী গেলেন গ্রামে। একটি জেলে বললো—মাছ ধরে ফেরার পথে আমি বনের ধারে ছোট ছোট পায়ের দাগ দেখেছি।

এক চাষী বললো—আমি দেখেছি মেয়েটি বনের ধারে ফুল তুলছিল।

কয়েকজন বললো—আমরা দেখেছি রথ ছুটে যেতে।

এক বুড়ী বললো—আমি শুনেছি ছোট মেয়ের কান্না। তবে কে যে কাঁদছে তা বুঝিনি।

দেবী আবার মেয়েকে খুঁজতে বেরুলেন, একটা মশাল হাতে নিয়ে চললেন বনের ভিতর।

সারাদিন দেবী বনে বনে ঘুরলেন। তারপর গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে। যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন—দেখেছ আমার মেয়েকে ?

কেউ কিছুই খবর দিতে পারে না। কোন কোন গৃহস্থের দয়া হয়, বলে—অমন করে ঘুরো না। আমার এখানে একদিন থেকে যাও, স্নান কর, খাও, ঘুমোও, তারপর আবার যাবে।

দেবী সে-কথায় কান দেন না। পথ চলেন।

ন'দিন ন'রাত দেবীর পথে পথেই কাটলো, মেয়ের খবর পেলেন না।

দশ দিনের দিন তিনি এলেন এক গুহার মুখে। সেই গুহায় বসেছিল এক বুড়ী। শুকনো পাতার উপর বসে আছে গলায় সাপ জড়ানো। দেবী দেখেই বুঝলেন সে ডাইনীবুড়ী। বললেন—বুড়ী, আমায় বলতে পার আমার মেয়েটা কোথায় গেল ?

বুড়ী বললো—তোমার মেয়ে কোথায় আছে জানি না। তবে অনেক দূরের শব্দ আমি শুনতে পাই। ন'দিন আগে শুনেছি একটা মেয়ের কান্না। তাকে কে যেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সে চিৎকার করছিল—বাঁচাও বাঁচাও বলে। সেই সঙ্গে শুনেছি রথের চাকার আওয়াজ।

—কোন্ দিক থেকে সেই আওয়াজ আসছিল বলতে পার ?

—পুব দিক থেকে।

—তাহলে পুব দিকেই যাই।

—পুব দিকে তুমি কতদূর যাবে ? পায়ে হেঁটে আর কত পথ চলবে ?

—যতদূর পারি।

মায়ের হতাশা দেখে ডাইনীর দয়া হলো। বললো—চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

এবার দুজনে চললো।

কোন এক সময় দেবীর মনে পড়লো একজনের কথা। বললো—বাজে ঘুরি কেন ? ফোবাসের কাছে যাই, সে দুনিয়ার খবর রাখে, সে আমাকে ঠিক খবর দেবে।

ফোবাস পাহাড়ের উপর সূর্যকিরণে বসে বীণা বাজাচ্ছিল। দুজনে সেখানে গেল, দেবী বললো—ফোবাস, বলতে পার আমার মেয়ে প্রসারপিনার কি হলো ?

ফোবাস বাজনা থামিয়ে বললো—প্রসারপিনা, প্রসারপিনা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি। তাকে আমি দেখেছি, তার খবর তো জানি, সে এখন ভালই আছে।

—কোথায় আছে, বল ?

—তাকে পাতালের রাজা প্লটো নিয়ে গেছে। রেখে দিয়েছে পাতালের রাজবাড়ীতে।

—আমি তাহলে সেখানেই যাই। আমার মেয়েকে ফেরত চেয়ে আনি।

—সেখানে সূর্যের আলো যায় না। তাছাড়া সে বাড়ীর দরজায় আছে একটা তেমাথাওয়ালা ভীষণ কুকুর।

—তা থাক, আমার মেয়েকে চাই।

দেবী সিরিস এগিয়ে চললেন।

কিন্তু দেবী যে পাতালে যাবেন, সে পথ খুঁজে পান না। অনেক ঘুরে ঘুরে শেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন মনের দুঃখে তিনি ঘোরাফেরা বন্ধ করে দিলেন। ভাবলেন—তবে থাক দুনিয়ার ফসল ফলানো, আমি আর কিছুই দেখবো না। যবে মেয়েকে পাবো তবে থেকে আবার কাজ করবো।

দুনিয়ার ক্ষেতখামারে ফসল ফলা বন্ধ হলো। বাগান-বাগিচায় আর ফল-ফুল দেখা গেল না। জগতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

ঝিলিকবাবু ছুটে গেলেন পাতাল-রাজের কাছে।

এদিকে প্রসারপিনা সেই যে বলেছিল আমি জলস্পর্শ করবো না, সে কথা সে রেখেছে। এক ফোঁটা জল অবধি সে খায়নি। রাজা তাকে ভাল ভাল সন্দেশ দিয়েছে, লাল টুকটুকে আপেল দিয়েছে, প্রসারপিনা কিছুই মুখে দেয়নি। রাজা বলে—কেন আমার উপর রাগ করছ, কিছু খাও—

মেয়েটি বলে—তুমি আমাকে জোর করে ধরে এনেছ। আমি এখানে জলস্পর্শ করবো না।

মেয়েটি কাঁদতে থাকে।

দিন যায়।

শেষে পাতাল-রাজ একদিন বললে—খুকী, তুমি কিছু খাও, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে রেখে আসবো।

প্রসারপিনা বললো—না, তোমাদের খাবার আমি কিছু খাব না।

রাজা বললেন—বেশ তো, খাবার না খাও, ফল খাও, বাদাম খাও—

রাজার কথামত সোনার থালায় ভৃত্য ফল ও বাদাম এনে সামনে রাখলো।

ছেলেমানুষ ক'দিন থাকবে। এবার আর সামলাতে পারলো না। কয়েকটা বাদাম চিবুতে শুরু করলো।

সেই সময়েই ঝিলিকবাবু গিয়ে পড়লো পাতালপুরীতে। রাজা বললে—আমি কথা দিয়েছি তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব, তুমি বাদাম যখন মুখে তুলেছ, তখন আমার কথা রাখতে হবে। ঝিলিকবাবুর সঙ্গে তুমি যাও।

ঝিলিকবাবু বললো—তাড়াতাড়ি চল—

ঝিলিকবাবু প্রসারপিনাকে নিয়ে এলো দেবী সিরিসের কাছে। মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

খানিক পরে মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—পাতাল রাজার বাড়ীতে কিছু খেয়েছিস নাকি ?

প্রসারপিনা বললো—শেষ দিনে কয়েকটা বাদাম চিবিয়েছি—গোটা ছয়েক দানা মাত্র।

দেবী বললেন—ওই ছ'টা দানা মুখে দেবার জন্যই ছ' মাস তোকে পাতালপুরীতে গিয়ে থাকতে হবে—এই বিধাতার নিয়ম। আর ছ' মাস থাকবি আমার কাছে।

সেই থেকে প্রসারপিনা বছরে ছ' মাস পাতালপুরীতে থাকে। অন্ধকার পাতাল-পুরীর রাজবাড়ী তখন আর গুমোট থম-থমে থাকে না, ছোট মেয়ের হাসিখুশি কথা-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। *

* ন্যাথানিয়েল হথর্ন।

শব্দ শব্দ খেলা

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ টগ্‌
ঘোড়া ছোটে এইভাবে,
ছোটেনাকো ডগ্‌।
টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌
টিক্‌...

ঘড়ি চলে এইভাবে
যদি থাকে ঠিক।
ঝক্‌ঝক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ ঝক্‌...
রেল ছোটে এইভাবে, বাঁধা আছে ছক।
টিংটিং টিংটিং টিংটিং টিং...
গাজনের ময়দানে
ঘোরে রোটেপিং।
গুন্‌গুন্‌ গুন্‌গুন্‌ গুন্‌গুন্‌
গুন্‌...

গান গায় মিস্ত্রী,
হাতে তুরপুন।
ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌ ভন্‌...
খোলা ড্রেনে মাছি ওড়ে
দিনে সারাখন।
খক্‌খক্‌ খক্‌খক্‌ খক্‌খক্‌ খক্‌...
রাত্তিরে খোকা কাশে,
খেয়েছিল টক।
টুংটুং টুংটুং টুংটুং টুং...
রিকশায় যেতে যেতে
চোখে আসে ঘুম॥

নেপালী শব্দ—নাগরদোলা

নির্মল সরকার

সেকালে একবার কাশীরাজ আর কোশলরাজে তুমুল যুদ্ধ হ'ল। কাশীরাজ কিন্তু হেরে গেলেন। কাশীরাজ মহাভক্ত লোক। শিবের নামগান স্তবস্তুতি নিয়েই মেতে থাকতেন। রাজকার্য তাঁর প্রধান-মন্ত্রীই চালাতেন। প্রজারা সুখেই ছিল। অভাব-অভিযোগ বিশেষ কিছু ছিল না তাদের। থাকলেও কাশীরাজ কারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতেন না। অপরপক্ষে কোশল-রাজ বীর, অত্যাচারী আর গর্বিত ছিলেন। অহঙ্কারের তাঁর সীমা ছিল না। তাঁর সমান যোদ্ধা আর কেউ আছে বলে তিনি মনে করতেন না। কাশীরাজের ওপর তাঁর খুব লোভ ছিল। তাই যখন তিনি শুনলেন কাশীরাজ যাগযোগ নিয়ে মেতে আছেন তখন তিনি দেরি না করে কাশী রাজ্য আক্রমণ করলেন। যা হবার তাই হল, অর্থাৎ কাশীরাজ পরাজিত হয়ে তাঁর হাতে বন্দী হলেন। কাশীরাজ বললেন, কোশল-রাজ, আমি বন্দী হয়েছি কিন্তু আমার একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনু-গ্রহ করে তা পূর্ণ করুন। শিবের পূজা আমার শেষ হয়নি। অট্টহাসি হেসে কোশলরাজ বললেন, ওহে কাশীরাজ, আমার বন্দিশালায় প্রচুর স্থান আছে। সেখানে তুমি যত পার ভণ্ডামী কর। কাশীরাজ ও অন্যান্য বন্দীদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে কোশলরাজ মহা আড়ম্বরে নিজের রাজধানী কোশল রাজ্যের দিকে সদম্ভে অগ্রসর হলেন।

বন্দীরা আগেই পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু কোশলরাজ তাঁর রাজ্যে ঢুকে ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, আমার বিজয়-বার্তায় রাজ্যে আনন্দ কই? সত্যই কোথাও তোরণ নেই, সঙ্গীত, নৃত্য এমন কি জনসমাগম পর্যন্ত নেই। কোশলরাজ সসৈন্যে ঘোড়া ছোটালেন প্রাসাদের দিকে। উন্মুক্ত তরোয়াল নিয়ে কোশলরাজ, মন্ত্রী আর অমাত্যদের স্বহস্তে নিধন করতে চাইলেন। এতদূর স্পর্ধা! রাজসভায় ঢুকেই কিন্তু তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে। আশ্চর্য! ঠিক তাঁর মতই দেখতে একজন বসে রয়েছেন তাঁরই সিংহাসনে। ক্রোধে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর সিংহনাদ করে বললেন, তুমি কে আমার সিংহাসনে বসেছ? প্রশ্ন শুনে যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি একটু হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাসদ আর অমাত্যরা হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে। কোশলরাজ আর থাকতে পারলেন না। সিংহাসনে বসা রাজাকে লক্ষ্য করে তরোয়াল তুললেন। তাঁর আগেই রক্ষীরা তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। ক্রোধ, প্রতিবাদ, প্রমাণ দেবার চেষ্টা—সবই বিফল হ'ল কোশলরাজের। নিজের কারাগারে তিনি নিজেই বন্দী হয়ে রইলেন। এতক্ষণে কোশলরাজ ভাবতে শুরু করেছেন শান্ত-ভাবে। এটা কি করে সম্ভব হ'ল? তিনি এর আগে বহুবার রাজত্ব জয় করে ফিরে এসে জয়মাল্য পেয়েছেন প্রজাদের কাছে কিন্তু এবার কি হ'ল? আর অবিকল তাঁরই মত দেখতে তাঁর সিংহাসনে একজন জাল রাজা সেজে বসে রয়েছে এটা সভাসদ বুদ্ধিমান অমাত্য মন্ত্রীরা কেউ ধরতেই পারল না!

কোশলরাজ নতমুখে চিন্তা করছেন এমন সময় ধূপের সুগন্ধ তাঁর নাকে এল। কে যেন পাশের কক্ষে মন্ত্রপাঠ করছে। হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে কে যেন ডাকল, মহারাজ—

—কে?

আমি কাশীরাজ, আপনার পাশের কক্ষেই আছি।

—কাশীরাজ, বলুন আমি তো আপনাকে বন্দী করেছি, কিন্তু আমায় বন্দী করল কে?

—যিনি আপনাকে বন্দী করেছেন তিনি আমার কাছেই রয়েছেন।

—তাহলে তাঁকে প্রশ্ন করুন কাশীরাজ, তিনি কি ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমাকে পরাভূত করেছেন?

একটু পরেই কোশলরাজের বন্দিশালা আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কোশলরাজ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখলেন কাশীরাজ আর দেবাদিদেব মহাদেব সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। কোশলরাজ লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের তলায়।

—০—

দেওঘরের নবদুর্গা

শান্তিকুমার দাস

তোমাদের মধ্যে যারা এবার পূজোর ছুটিতে দেওঘরে বেড়াতে যাচ্ছ, তারা একদিন-না-একদিন বোম্‌পাস টাউন ঘুরে দেখবে। আর সেই সঙ্গে নরদুর্গার মন্দির নিশ্চয়ই দেখবে। টাংগায় চড়ে চড়াই-উৎরাই পথে বোম্‌পাস টাউন ঘুরতে বেশ মজা লাগে। পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই পথ হলেও বিহার সরকারের প্রচেষ্টায় সে পথ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। পিচ্‌ঢালা তো বটেই। পথের দু'ধারে দেবদারু, শাল-সেগুনের লম্বা লম্বা গাছ। দেখতে যেন ছবির মতন মনে হয়, দিনের পর দিন টাংগা করে সে পথে ঘুরে বেড়াই।

নিরিবিলি নির্জন পরিবেশে নব-দুর্গার মন্দির। সকাল-সন্ধ্যে পূজারতির সময় সেই মন্দিরের অভ্যন্তর সত্যই এক অনির্বচনীয় শুদ্ধাবনত মাধুর্যে ভরে ওঠে। মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে দেবী-মূর্তির নানা ছবি। বিশেষ করে দেবীর নয়টি মহারূপ মনে রেখাপাত করে। মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, বগলা, কমলা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, অন্নপূর্ণা ও দুর্গার ছবি তোমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মন্দিরের সম্মুখভাগের ডানদিকে দুর্গা ও নারায়ণের মূর্তিযুগলকে কে বলবে মৃন্ময়ী। মাঝে নবদুর্গা আর বাঁ দিকে অন্নপূর্ণার মূর্তি বিরাজমানা।

শরতে শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন দশভুজা দুর্গার। বসন্তে বাসন্তী দুর্গার পুজো হয় আমাদের দেশে। বলা বাহুল্য, দেওঘরের এই নবদুর্গা অষ্টভুজারূপে বিরাজমানা।

তিনজন পুরোহিত একই ছন্দে ও তালে পূজারতি করতে শুরু করলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মুগ্ধদৃষ্টিতে অপলক চেয়ে থাকেন। না জানি কোন এক সুন্দরের আরাধনায় ছোট-বড় সকলেই অনড় হয়ে যান পার্থিব সব কিছু ভুলে।

দেওঘরে বহু বাঙালীর বাস। তবে বেশির ভাগ বাঙালীই চাকরির পর অবসর জীবনযাপন করছেন এখানে। অনেকেরই বাড়িঘর রয়েছে। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় এই মন্দির পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রবাসী এক শ্রাম্যমাণ বাঙালীদের কাছে, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এই মন্দিরটি একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ, দর্শনীয় স্থান তো বটেই।

বর্ষারাতের ছানা বেড়াল

সারারাত ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ডোবা-পুকুর একাকার। ব্যাঙ ডাকছে গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং,—আর একটানা বিড়ালী-ভাষায় ম্যাও ম্যাও করে কাঁদছে তো কাঁদছে একটি ছানা বেড়াল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ঝুমের। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি আর কোথায় যেন ছানা বেড়ালের কান্না! শব্দ শুনেই বোধহয় ঘুম ভাঙলো।

মা-ও ততক্ষণে উঠে পড়েছেন—জানালা বন্ধ করতে। হঠাৎ ঝুমের প্রশ্ন—'মা, মা, কি মিষ্টি পড়ছে! বাব্বা,—এত মিষ্টি কোথায় থাকে মা?'

চার বছর বয়স হলে কি হবে, ঝুম বৃষ্টিকে মিষ্টি-ই বলে।

মা বললেন,—"ও মা, উঠে পড়েছিস! আকাশে বড় বড় জালা আছে—সেখান থেকেই মিষ্টি পড়ে।"

ঝুম বললো,—"ছানা বিলিটা মাগো মাগো বলে কাঁদছে কেন মা? ওর মা কি হারিয়ে গেছে?"

মা বললেন, "আহারে,—ছানাটি বোধ হয় ভিজে গেছে, তাই কাঁদছে।" তারপর বললেন, "নে ঘুমো, রাত অনেক এখন।"

ঝুমের প্রশ্ন—"কাকা ঘুমিয়েছে? কাকীমা ঘুমিয়েছে? বাবা ঘুমিয়েছে? দিদি ঘুমিয়েছে?"

মা বললেন,—"আচ্ছা বক্‌বক্ করতে পারিস বাছা! —সবাই ঘুমিয়েছে। ঐতো দিদি তোর পাশেই ঘুমিয়ে আছে; তুইও ঘুমো। দেখছিস্ না কেমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে!"

"—রাঁচি-বুড়ো আসবে নাকি?" —ঝুমের আবার প্রশ্ন।

"হ্যাঁ, রাঁচি-বুড়ো আসতে পারে। যে মেয়েরা ঘুমোয় না, তাদের ধরে ঝুলিতে ভরে রাঁচি নিয়ে যায়।"

ঝুম একটু থামলো। রাঁচি-বুড়ো নামক জুজুর ভয় ওর আছে। শেষ পর্যন্ত একটা ছড়া কাটলো। ওর বাবা ওকে শিখিয়ে দিয়েছেন। রাঁচি-বুড়োকে তাড়াবার জন্য বলতে হয়—

রাঁচি-বুড়ো রাঁচি-বুড়ো কুলতলাতে বাসা,—
পরের মেয়ে ধরবে বলে মনে করেছ আশা?
হাত ভাঙবো পা ভাঙবো ভাঙবো তোমার মাথা,
রাঁচি-বুড়ো রাঁচি-বুড়ো ভাঙা তোমর ছাতা।

বাবা বলেছেন,— এই ছড়াটি বললেই রাঁচি-বুড়ো 'খটাস' হয়ে যাবে। ঝুমের ভাষায় 'খটাস' মানে হাওয়া, অর্থাৎ রাঁচি-বুড়ো পালিয়ে যাবে ভয়ে।

ওদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। বিড়াল-ছানার কান্নারও শেষ নেই। এরই মধ্যে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ঝুম।

সকালে, মেঘ তখনও উঁকি-ঝুঁকি মারছে। ঝুমের ঘুম ভাঙেনি। মা কখন উঠে রান্নাঘরে চলে গেছেন।

ঝুম একবার পাশ ফিরলো। ছোট্ট পাশ-বালিশের উপর হাত রাখলো। পাশ-বালিশটা বললো—'ম্যাও'।

ঝুম তো অবাক্! পাশ-বালিশ আবার ম্যাও বলে নাকি!

তারপর ভাবলো, ওর সাবানটা গেল কোথায়? সেই যে বাবা এনে দিয়েছেন—ছোট্ট সবুজ রঙের একটা সাবান!

সুধীর করণ

পাশ-বালিশ আবার বললো—ম্যাও।

ঝুম ভাবলো, সেই যে আমগাছের ডালে চড়ে, লেজ উঁচু করে, পুট্ পুট্ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সেই ছোট্ট কাঠবিড়ালী,—যাকে দেখলেই সে ছড়া কাটে, সেই কাঠবিড়ালীটা কোথায় এখন! বলে ঃ—

কাঠবিড়ালী কাঠবিড়ালী কাপড় কেচে দে,
তোর বিয়েতে নাচ্‌তে যাবো, লজেন্স এনে দে।

ব্যস্,—কাঠবিড়ালী সঙ্গে সঙ্গে তুড়ুক করে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দে ছুট্। তারপর বাবার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয় লজেন্স, টফি, ক্যাডবারি,—যা চাওয়া যায় তাই। ভারী ভালো কাঠবিড়ালী—

'ওমা! এ আবার কে?' ঝুমের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। দেখলো, ওর পাশ-বালিশের উপর দিব্যি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে সেই ছোট্ট ছানা-বেড়াল,—যে সারা রাত ধরে কেঁদেছে। ঝুমকে উঠতে দেখে করুণভাবে ডাকলো 'মিউ'। ঝুম তো ভয়ে কাঠ। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলো। কোনদিন সে ওর এত কাছে কোন বিড়ালছানা দেখেনি।

ছানাটি বললো, মিউ, মিউ। মনে হোল যেন বলছে, ঝুম, ঝুম—।

ঝুম হঠাৎ সাহস পেলো। বললো,—কি বলছিস্ রে! তুই এখানে কি করে এলি। খাবি কিছু? বিস্কুট খাবি? লজেন্স খাবি?

ছানা বেড়াল বললো—হ্যাঁ ও।

ওম্‌মা—, এ আবার হ্যাঁ বলতেও পারে! ঝুম অবাক। বললো—পাঁউরুটি খাবি?

ছানা বেড়াল বললো, ন্যাঁ ও।

ওম্‌মা—, এ যে না-ও বলতে পারে! দুধ খাবি?

ছানা বেড়াল বললো—আঁও। ঝুম শুনলো—দাঁও, অর্থাৎ, দাও।

বিছনা থেকে এক লাফে নেমে মায়ের কাছে ছুটে গেল ঝুম। বললো, মা, মা,—দুধ খাবো।

মা বললেন,—এই তো আমার শোনা-মণি। একটু দাঁড়া; দুধ ঠাণ্ডা করতে দিয়েছি।

এম্‌নিতে ঝুম কিছুতেই দুধ খেতে চায় না। অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে, গল্প বলে খাওয়াতে হয়। আজ ওর সুমতি দেখে মা খুব খুশী।

ঝুম বললো,—ঐ ঘরে খাবো।

মা বললেন,—কেন, ঐ ঘরে কেন? আমার সামনে চক্ চক্ করে খেয়ে ফেল।

"না,—ঐঘরে খাবো।" ঝুম বায়না ধরলো।

"বেশ বাবা, বেশ"—একটা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বললেন, "নিয়ে যেতে পারবি তো? না, দিয়ে আসতে হবে।"

ঝুম মাথা ঝাঁকিয়ে বললো,—"খু-উ-ব পারবো। আমি তো বুড়ো হয়েছি। কাকু—আমাকে বুড়ো বলে ডাকে মা?"

মা হেসে ফেললেন।

দুধের গেলাস নিয়ে গুট্ গুট্ করে শোবার ঘরে ফিরে এলো ঝুম। তারপর

ভুলো না এদের

।। শান্তশীল দাশ ।।

শরৎ এসেছে, পুজো এসে গেছে,
চারিদিক ঝলমল;
দোকানে দোকানে দিনে দিন ভীড়,
কেনাকাটা হৈ চৈ;
এই আনন্দ উৎসব মাঝে
ভুলো না তাদের কথা,
যারা একপাশে দুঃখের মাঝে
পড়ে আছে অনাদরে;
দিও ভালবেসে কিছু তাহাদের,
মুছে দিও কিছু ব্যথা,
তোমাদের সাথে তাদেরও জীবন
আলোকে উঠুক ভরে।

একটা বাটিতে ঢেলে, বিলি-ছানার মুখের কাছে বসিয়ে দিল সেই দুধের বাটি।

"নে মা, চুক্ চুক্ করে খা!—ওমা, এযে দিব্যি চেটে চেটে কেমন সুন্দর করে খাচ্ছে গো!"

ঝুম উৎফুল্ল মুখে ছানা-বিলির সেই দুধ খাওয়ার দৃশ্য দেখতে লাগলো। টেরও পায় নি যে, মা কখন গা টিপে টিপে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

বিলি-ছানা ঝুমের মাকে দেখতে পেয়ে ঝুমকে বললো,—মা—ও'।

"কোথায় তোর মা?"—বলেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে মা দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে ঝুম বেশ ঘাবড়ে গেল। তারপর হঠাৎ ভ্যাঁ-আ-আ করে কেঁদে উঠলো।

"কি হলো রে? কাঁদছিস্ কেন?"—মায়ের প্রশ্ন।

"আমার দুধ—খেয়ে ফেলেছে—; পাজী বেড়াল, দুষ্টু বেড়াল, ছানা বেড়াল—"

মা তো হেসে কুটি কুটি।

মাকে হাসতে দেখে ঝুম চুপ করলো; হাসির কারণটা বোঝার চেষ্টা করলো। তারপর আবার ভ্যাঁ—আ—আ—

মেয়ের পাকা বুদ্ধি দেখে মা আরো হাসতে লাগলেন।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে ছানা-বেড়াল এক লাফে বিছানা থেকে নেমে আলমারির কোণায় গিয়ে গা ঢাকা দিল।

ঝুম তখন হাত-পা ছুঁড়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো—খাবো মা, খাবো মা—দুধ খাবো মা; আমার দুধ খেয়ে ফেলেছে—এ-এ—ঠিক সেই সময় সেই ছানা-বিড়ালটা আলমারির আড়ালে বসে ভাঁজতে বসলো—ঘ্যাও—ঘ্যাও—ঘ্যাও—।

—০—

ঘরে এসো মা-ভবানী

শেখ সদরউদ্দীন

এসো এসো দুর্গামোতা
দুর্গতি সব দূর ক'রে যাও,
দশভুজা দশ হাতেতে,
এই ত' সময়, অস্ত্র নাও।
অন্যায় আজি করছে যারা,
করছে অসৎ আচরণ;
পাপের নীরে লোভের স্রোতে
করছে যারা সন্তরণ—
তাদের মাথায় আঘাত হানো,
প্রবঞ্চনা করছে যারা,
পরের সুধার অন্ন খেয়ে
হচ্ছে যারা আত্মহারা।
জুলুমবাজ আর অত্যাচারীর—
বিরুদ্ধে আজ তোমার রণ,
দশদিকেরই মঙ্গলেতে
তুমটি ধরো প্রহরণ।

ভিন্ন স্বাদে ভিন্ন আঙ্গিকে মরসুমী আকর্ষণ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলানের কাছে ব্রিটিশ সরকারের নতিস্বীকার। এর পরেই ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা। ভারতবর্ষে তখন অত্যাচারী মহাজনদের স্বর্ণযুগ। সে যুগের প্রতিফলন

কচ ও দেবযানি

রচনা : সন্তোষ সেন
পরিচালনা : অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : লক্ষ্মণ দাস

জিঘাংসা

রচনা ও পরিচালনা
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : তরুণ মুখোপাধ্যায়

পুরাণের প্রেম-প্রতিহিংসা, মায়া-মমতা, ব্যথা-বেদনার মর্মন্তুদ কাহিনী। যা আজকের চেতনার আর এক দলিল

সুর্যকুমার সুধাংশু বারিক বীণা ভট্ট
ক্ষমা ভট্টাচার্য অমিয় রায় ও গোকুল দে

মাধবী নাট্য কোম্পানী

৩৩৫বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

[এক'দম' হাসির 'সিনি শিশু-নাটিকা']

রচনা ও নির্দেশনায় : সমর মজুমদার

: চরিত্রে :

মামণি : শ্রাবণী ভট্টাচার্য

দীপু : সুদীপ দাস

দৃশ্য পরিবেশ : একটি ছোট্ট বাড়ির বাইরের দিকে (রাস্তার দিকে) ছোট্ট একটা রোয়াক

[দীপু আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে চিৎ হয়ে শুয়ে। এমনি এক মুহূর্তে প্রবেশ করবে 'ছট্‌ফট্ ময়ে' মামণি হন্তদন্ত হয়ে।]

মামণি। দীপু শোন, খুব মজা হয়েছে আজ।

দীপু। [উঠে বসবে] কী মজা? আমায় দিবি ভাই একটা?

মামণি। তুই একটা ছাগল।

দীপু। মা'ও বলেন। তবে পুরো ছাগল বলেন না। বলেন—'ছাগু'। তাও আদর ক'রে। আমি তো ছাগলের দুধ খেয়ে বড়ো হ'ছি, তাই মা আদর ক'রে, ছোট্ট ক'রে বলেন—'ছাগু'।

মামণি। আহারে! আমার ছাগুরে! তুই একটা আস্তো পাগল।

দীপু। মামণি! জানিস, আমি মা একটুর জন্যে পাগল হলাম না। হতে হতে হলাম না। মা বলেন, আমি জন্মাবার আগেই আমার নাকি এক মাসতুতো বোনের পিসেমশাইয়ের বোনের ছোটভাই পাগল হয়ে গেছেন।

মামণি। তিনি পাগল হলেন তো কী হয়েছে? তোর তাতে কী? তোকে পাগল হতে মানা করেছে কে? তুই যেন সেই পিসতুতো না মাসতুতো কী বললি, কে পাগল হয়েছেন? তিনি যদি আধ কেজি হয়ে থাকেন, তুই দশ কেজি।

দীপু। দশ কেজি কীরে! আধ কেজিতে পড়িনি এখনও! আমি ওয়ান কেজিতে পড়ি। হারে, আধ কেজি হলেই হয়তো পাগল হতে পারতাম! কিন্তু বাবা বলেন, আজকাল কেউ পাগল হচ্ছেন না। শুধু সেয়ানা হচ্ছেন।

মামণি। বুঝেছি! গ্যাছে! তোর মাথাটা একেবারে গ্যাছে! (নিঃশ্বাস ছেড়ে) তুই পাগল হ'য়ে গেছিসরে দীপু!

দীপু। হতে পারিনি। বাবা বলেন, আজকাল কেউ হয় না।

মামণি। হয় না? তুই নিজেই তো পাগল! আরো পাগল আমি দেখেছি, তবে তোর মতো এতোটুকু ছোট কাউকে তো পাগল দেখিনি।

দীপু। মামণি, তুই যাদের দেখেছিস ওরা কেউ পাগল নয়। বাবা বলেন, ওরা MAD।

মামণি। হা—হা—হা...তুই সত্যিই পাগল। পাগলকে ইংরেজীতে MAD বলে। বুঝলি?

দীপু। কিন্তু বাবা বলেন—দেশের জন্য দশের জন্য কেউ MAD হয় না, পাগল হয়। দেশের জন্য পাগল হয়ে ক্ষুদিরাম মরে গেছেন। আমাদের দেশকে বড়ো দেখানোর জন্যে পাগল হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, দশের ভালোর জন্য, দশের সেবার জন্য পাগল হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বাবা বলেন—আগের দিনে আরো বড়ো বড়ো অনেকেই এমনি ধরনের পাগল ছিলেন।

মামণি। আরে, MAD আর পাগল একই কথা। M—A—D. mad মানে পাগল।

দীপু। না, MAD আর পাগল এক নয়রে মামণি! বাবা বলেন—যারা শুধু নিজের কথাই ভাবে, তারা নিজের কথা ভেবেই MAD। তাছাড়া কেউ কেউ অন্য কারণেও MAD হয়! তবে এরা কেউ পাগল নয়।

মামণি। তুই নিজেই তো পাগল!

দীপু। (কেঁদে কেঁদে) মামণি, ওকথা তুই বলিসনে! আমি আর পাগল হবো নারে! সেদিন টুম্পা আমার কাছে গুণের অঙ্কটা শিখতে এসেছিলো, আমি ওকে শেখাইনি।

মামণি। শেখাসনি তো কি হয়েছে?

দীপু। কি হয়েছে? কি হয়নি বল? আমি যে নিজের কথা ভেবেছি, নিজের ভালো ভেবেছি। ভেবেছি, টুম্পা গুণ আমার কাছ থেকে শিখে নিলেই অঙ্ক পরীক্ষায় আমার সমান নম্বর পেয়ে যাবে। তখন ওকেও সবাই ভালো বলবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেবো না। একথা আমি ভেবেছি! (কেঁদে কেঁদে) মামণি, এখন তুই-ই বল শুধু নিজের ভালো ভেবেকি আর পাগল হতে পারবো? আমি হয়তো ভাবতে ভাবতে উট্‌ম্যানই হয়ে যাবো। পাগল হতে আর পারবো না।

মামণি। আচ্ছা বেশ সেটা নয় পরে ভাবা যাবে'খন। এখন শোন, যে মজার কথাটা তোকে বলবো বলে এসেছিলাম। আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি ক্লাশে। আর সেই জন্যে মা তোকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছেন। অনেক খাওয়া-দাওয়া হবে। মাংস হবে। রসগোল্লা, দই আরো-অনেক কিছু হবে। কেমন মজা হবে বলতো?

দীপু। না ভাই আমি কিছু খাবো না। আমি খুব রাগ হয়েছে।

মামণি। হে—হে—হে...আমি খুব রাগ হয়েছে কীরে? বল, আমার খুব রাগ হয়েছে।

দীপু। ঐ একই হলো ভাই। আজ আমার খু-ব দুঃখু। আমি আজ খাবো না। কোথাও যাবো না। শুধু কাঁদবো এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ...।

মামণি। আঃ! কি হয়েছে বলবি তো?

দীপু। বাবা বলেছেন দাদাকে। এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ.....

মামণি। কি বলেছেন, বল? না, শুধু ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করবি?

দীপু। বাবা বলেছেন, আমার বাড়িতে মাস্তামাস্তি চলবে না। হয় সব থেকে ভালো নয় সব থেকে খারাপ। হয় ক্লাশে ফার্স্ট, নয় তো লাস্ট। ফার্স্ট হলে বাড়িতে থাকবে, আদর পাবে। লাস্ট হলে ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেবো, মনে কোন আফ-

শরৎ মেয়ের খেয়াল খুশি

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আকাশি নীলের শাড়ী
ঘুরিয়ে পরে
একরাশ মেঘ নিয়ে
কে করে খেলা?
শারদীয়া আসরের
সোনা রোদ্দুরে
সবুজ ধানের ক্ষেতে
খুশির মেলা!
আগমনী ইমনের
মিষ্টি তানে
নূপুরের ঝুমঝুম
বৃষ্টি ঝরায়
রামধনু রিবনের
আলগা টানে
আবার যে সোনা রোদ
হাসছে ধরায়!

সোস থাকবে না। মাঝামাঝি চলবে না এ বাড়িতে, বলে দিলুম, বুঝলে? দাদাকে বলেছেন।

মামণি। এতে তোর না খাওয়া, না যাওয়ার কি হলো, শুনি? আর ভ্যাঁ—ভ্যাঁ করে কান্নারই বা কি হলো?

দীপু। কাঁদবো না! বলিস কিরে? আমি যে ক্লাশে থার্ড হয়েছি এবার। আমাদের বাড়িতে আর চলবে নারে! হয় ফাস্ট, নয় লাস্ট। ফাস্ট হলে বাড়িতে থাকতে পেতুম আর লাস্ট হলে বাইরে চলে যেতে পারতুম। এখন আমি কোথায় যাই বল? বাবা বাড়িতেও থাকতে দেবেন না, আবার বাইরে তাড়িয়েও দেবেন না। এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ...আমি কাঁদবো নাতো কে কাঁদবে? এ্যাঁ—এ্যাঁ.....

মামণি। এ্যাঁ—এ্যাঁ—গাধা কোথাকার!

দীপু। গাধা! আঃ!

বহুদিন ছিলো আশা
গাধা চড়ে যাবো খাসা
—মামার বাড়িতে...

মামণি, তুই আমার গাধা হবি? তোর পিঠে চেপে মজা করে মামার বাড়ি চলে যাবো বাবা আসার আগেই।

মামণি। তবেরে, দেখাচ্ছি মজা! আমি তোর গাধা?

(দীপুর জামার কলার ধরে টানতে টানতে মামণি দীপুদের বাড়ির ভেতর ঢুকে যাবে)

পক্ষী-বিচিত্রা

মঙ্গলময় দত্ত

বর্তমান পৃথিবীতে কত সংখ্যক পাখি আছে তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা হয়, মোটামুটি প্রায় দশ হাজার কোটি পাখি আছে এবং সেই পাখিরা সংখ্যায় প্রায় ন' হাজার প্রকারের।

প্রকারভেদে পাখিদের আয়ুরও তারতম্য আছে। যেমন উটপাখি, বন্য রাজহংসী, তোতাপাখি, শকুন ও বাজপাখি যথাক্রমে ৪৫, ৮০, ১০০, ১১৫ এবং ১৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

আমেরিকায় এক প্রকার অদ্ভুত পাখি আছে, এরা আকারে খুবই ছোট এবং এদের দেহের আয়তন প্রায় প্রজাপতির মত। রঙ খুবই উজ্জ্বল। ফুলের চারধারে এরা বোঁ-বোঁ করে ঘুরে বেড়ায় এবং তাতে গুনগুন করে শব্দ হয়। সেই জন্য এদের গুনগুনকারী পাখি বা ইংরেজীতে 'হামিং বার্ড' বলা হয়ে থাকে। এদের দেহের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে সজীব পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। যেমন এরা চরকার মত ঘোরে, তেমনি এদের খাওয়ারও বিরাম নেই। নিয়ত খেয়েই চলে এরা। কারণ, এরা তিন-চার মিনিট অন্তরই খিদে বোধ করে।

এবার একটা মজার পাখির কথা বলব। প্রধানতঃ এদের দেখা যায় নিউজিল্যাণ্ডে। এই পাখিদের ডানা নেই। নাম কিউই। এরা জল পান করে না। এরা গান গায় না, এমন কি বসন্তকালেও নয়। এরা যে ডিম পাড়ে তা পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় বস্তু। সে ডিমের ওজনও খুব বেশী। একটি বড় মুরগীর ওজনের চার ভাগের এক ভাগ। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল, এদের ডিমে মেয়েরা কখনও তা দেয় না, তারা ডিম পেড়েই খালাস; ডিমে সকল সময়েই তা দেয় পুরুষ পাখীরা। বছরে একবার মাত্র ডিম পাড়ে এই কিউই পাখিরা। দেখতেও এরা বিচিত্র।

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত; অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন।

ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

দ্বীপের নাম সার্তসে

শৈলেশ ভড়

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর সকালে মাছ ধরার নৌকোটা সমুদ্রের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠলো।

না, ভারত মহাসাগরে নয়। উত্তর আটলান্টিকে আইসল্যাণ্ডের কাছে। মনে হলো নৌকোটা কোন ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে। অনেক দূরে সমুদ্রের উপর দেখা গেলো ঘন কালো ধোঁয়া একটা মোটা থামের মত হয়ে পাক খেতে খেতে উঠে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এ কী কাণ্ড! দূরবীন লাগিয়ে দেখা গেলো—না, কোন জাহাজে আগুন লাগল বোধহয়। হায়, হায়। জাহাজ নয়। সমুদ্রের ভিতর থেকে যে আগ্নেয়গিরিটা উঠেছিল সেটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা। আর তারই ধোঁয়ায় এই ভোরবেলাতেই রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আর সেই সঙ্গে গন্ধকের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

খবর পাওয়া মাত্রই জাহাজ আর বিজ্ঞানীদের নিয়ে যাত্রা সুরু করলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইসল্যাণ্ডবাসী সিগুর্দার।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিগুর্দার দেখলেন প্রচণ্ড বেগে লাভাস্রোত বেরিয়ে এসে সমুদ্রের মধ্যে সশব্দে আছড়ে পড়ছে, যেন একসঙ্গে হাজার হাজার বোমা ফাটানো হচ্ছে।

আর দেখতে দেখতে কয়েক মাসের মধ্যেই একটা জমি দেখা গেলো সমুদ্রের ওপর। হ্যাঁ, সার্তসে দ্বীপ জন্মগ্রহণ করছে।

এক বছর নয়, চার বছর পরে সার্তসে দ্বীপে প্রথম পা রাখলেন সিগুর্দর্বর। কিন্তু থাকতে পারলেন না বেশিক্ষণ, ফিরে এলেন জাহাজে।

একদিন আগ্নেয়গিরি নিবে গেল। দেখা গেল যে দ্বীপটা জন্মালো তার উচ্চতা ১৭৩ মিটার। লম্বায় দু কিলোমিটার। আর আয়তন আড়াই বর্গ কিলোমিটার।

ধীরে ধীরে জমি ঠাণ্ডা হলো। সমুদ্র থেকে ভেসে এলো উভচর প্রাণী, তারা বাসা বাঁধলো। হাওয়ায় কোথা থেকে উড়ে এলো বীজ। চারা থেকে গাছ হলো, তারপর পাখি এসে বাসা বাঁধলো সে গাছে। আর তারপর একদিন সেই দ্বীপে প্রথম ফুল ফুটলো। তার নামকরণ হলো "হোয়াইট সি-রকেট"। শুভ্র সাগরিকা।

অবশেষে এলো মানুষ। ঘর বাঁধলো। তবে তারা বিজ্ঞানী। এখনও অবশ্য মানুষের ভিড় তেমন জমেনি। তবে তোমরা যদি বড় হয়ে এখানে আস, তাহলে দেখবে মেলা বসে গেছে।

কী, আসবে তো?

দাসপ্রথা ও সেই বিখ্যাত বইটি

অকূল বাগচী

তোমরা অনেকেই হয়ত সেই বিখ্যাত টম্ কাকার কুটির' বইটি পড়েছ। কিন্তু মূল বইটি সম্বন্ধে আমরা অনেকেই কোন খোঁজ-খবর রাখি না। সালটা ছিল ১৮৫০। দাসপ্রথা নিয়ে চলেছে চাপা উত্তেজনা। কেউ কেউ ভেবেছিলেন সমস্যাটা আপনা থেকেই মিটে যাবে। কারণ তখনও ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মনে এত গভীর করে দাগ কাটেনি। এর কুফল সম্বন্ধেও মানুষ এত সচেতন হয়ে ওঠেনি। এরপর কাটলো আরও দুটি বছর। এলো ১৮৫২ সাল। প্রকাশিত হলো সেই বিখ্যাত বইটি—'আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন'। রচয়িতা—হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো। বইটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তোলপাড়। সৃষ্টি হলো প্রবল উত্তেজনা। তিন লক্ষেরও বেশী কপি প্রথম বছরেই ফুরিয়ে গেল। বাজারে বইটির ব্যাপক চাহিদা। তাই প্রকাশক আটটি যন্ত্রচালিত মেশিনে দিনরাত ছাপার কাজ চালাতে থাকেন। এরপর এই গ্রন্থের অনুবাদ হয় বিভিন্ন ভাষায়। মূলত এটি একটি বাস্তবধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসে দেখানো হয়, দাসপ্রথার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা কী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। স্বাধীন সমাজ আর দাস সমাজের মধ্যে কি নিদারুণ মৌলিক পার্থক্য।

এই উপন্যাসটির মধ্যে এতই মানবিক আবেদন ছিল যে প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার মনে অন্যায়-অবিচারের প্রতি ক্রোধ এবং নির্মম শোষণপীড়িত অসহায় ক্রীতদাসদের জন্য গভীর সহানুভূতি জাগিয়েছিল। বলতে গেলে সবাই একসঙ্গে দাসপ্রথা বন্ধের জন্যে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এর পরেও প্রায় তের বছর ধরে চললো দাসপ্রথা নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন। প্রসঙ্গক্রমেই দাসত্ব বিলোপের সমর্থকদের আরও অনেকের মধ্যে জন ব্রাউন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৮৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস রাজ্যে যিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে চরম আঘাত হেনেছিলেন। অবশেষে ১৮৫৯ সালে ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও নরহত্যার অপরাধে জন ব্রাউনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আব্রাহাম লিংকন-এর নাম তোমরা সবাই জানো। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে দাসপ্রথার উচ্ছেদ করে যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ধারাটি অনুমোদন করেছিল।

সত্যি কিন্তু তা নয়!

মনীন্দ্রগোপাল চক্রবর্তী

অনেক কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এবং অনেকে সত্যি বলেই সেটাকে মেনে নিয়েছি। আসলে কিন্তু ওগুলি সত্যি নয়।

আমরা শুনে আসছি, আসামীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়ার পরেই যদি দড়িটা ছিঁড়ে যায়, তা হলে আসামী খালাস পায়।

কিন্তু সত্যিই তা পায় না। নতুন দড়ি এনে তাকে আবার ফাঁসি দেওয়া হয়।

আমাদের এই ভুল ধারণার কারণ সম্ভবত এই যে, আইনে আছে, কোনও লোককে একই অপরাধের জন্য দু' বার ক'রে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

কেউ কেউ ভাবেন, মানুষ মরে গেলে তার ওজন বেশি হয়। কিন্তু সে রকম মনে হলেও, আসলে মৃতদেহের ওজন বাড়ে না।

কখনও কখনও উপমাস্থলে বলা হয়, "হংসৈর্যথা ক্ষিরাম্বু মধ্যাৎ" অর্থাৎ হাঁস যেমন দুধ আর জল মিশিয়ে দিলে জলটা পরিত্যাগ করে দুধটা খেয়ে নেয়, তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অসারবস্তু পরিত্যাগ করে সারবস্তুই গ্রহণ করেন।

কিন্তু হাঁসকে জল আর দুধ মিশিয়ে খেতে দিয়ে দেখা গিয়েছে হাঁস তা করতে পারে না। তবে কি উপমাটা ভুল?

পণ্ডিতেরা বলেন, এখানে 'ক্ষীর' মানে দুধ নয়। পদ্মের ডাঁটার গোড়ায় যে অংশটা পাঁকের মধ্যে থাকে তাকেও 'ক্ষীর' বলে।

রাজহাঁস জলে ডুব দিয়ে জলের ভিতর থেকে পদ্মডাঁটার গোড়ার সাদা অংশটা তুলে খায়। ওটা খেতে সুমিষ্ট।

সংস্কৃতে আর একটি শ্লোক আছে—"আগচ্ছতি যদা দেবী নারিকেল ফলাম্বুবৎ/নির্গচ্ছতি যদা দেবী গজভুক্ত কপিত্থবৎ"।

এটাও উপমার ব্যাপার। লক্ষ্মী যখন আসেন, তখন কোন্ পথ দিয়ে আসেন তা জানা যায় না। যেমন, নারকেল ফলে জল কোন্ পথে এল তা বুঝা যায় না। আবার লক্ষ্মী যখন অন্তর্ধান করেন, তখন হাতীকে কপিত্থ অর্থাৎ কদবেল খাওয়ালে তার মল পরিত্যাগ করবার সময় যেমন আস্ত কদবেল পড়ে অথচ তার মধ্যে কিছুই থাকে না।

কিন্তু হাতীকে কদবেল খাইয়ে দেখা গিয়েছে, আস্ত কদবেল মলের সঙ্গে পড়ে না।

পণ্ডিতেরা বলেন, এখানে 'গজ' অর্থে হাতী নয়। এক রকম ক্ষুদ্র কীট। দেখা গেছে, কদবেলের গাছেই এই কীট কদবেলের মধ্যে জন্মে। তারা বেলটার ভিতরটা খেয়ে শূন্য করে দেয়। অথচ বাইরের থেকে বুঝা যায় না কি ক'রে ভিতরটা শূন্য হয়ে গেল।

কবিতা

আমার কলেজ-কথা

অমিয় চক্রবর্তী

কলেজেতে ভাল ছেলে মন দিয়ে পড়ে বই
যত সব গাধা ছেলে করে শুধু হৈ-হৈ।
কেহ কেহ ধীরে ধীরে গাহিতেছে বাজে গান—
কেহ বা হৃষ্ট মনে অবিরত খায় পান।
দু' একটি প্রাণী তারা, অকারণে হেসে খুন—
বর্ণিব কত আর অশেষ তাদের গুণ।
তারি মাঝে গিয়ে বসে অতি গাধা একজন
পড়াতে-শোনাতে তার একেবারে নেই মন।
ঘুমে চোখ ভরা তার বসে বসে তোলে হাই
মাস্টারগুলো বোকা ভাবে শুধু বসে তাই।
কাঠের বেঞ্চেতে আমি সারাদিন বসে রই—
চেয়ারেতে বসে ওরা গেল নিজ গরবেই!
ওরা যদি না বকিয়া বাজে কথা সারাখন,
গম্ভীর ভাবে গিয়ে মাঠে করে বিচরণ।
অথবা সকালে যদি ঢকঢক দুধ খেয়ে
লক্ষ্মী বুড়োর মত বিছানায় পড়ে শুয়ে—
এ হলেই বেশ হত ভাবে শুধু একজন
পড়াতে শোনাতে যার একদম নেই মন।
মন তার সব ছেড়ে কোথায় যে চলে যায়—
জানে না কি কেহ তাহা, কেউ নয় কেউ নয়
যাই হোক এর কথা ভাল করে শুনে নিন,
পরে চিরকাল তরে এর আশা ছেড়ে দিন! *

---

* ডঃ অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ছাত্রাবস্থায় ১৯১৮ সালে হাজারিবাগ কলেজ হস্টেল থেকে তাঁর মেজ মামীমা ডঃ শিশিরকুমার মৈত্রের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা প্রফুল্লময়ী দেবীকে একটি চিঠির মধ্যে এই কবিতাটি লেখেন।

নাকে ও চোখে

(ছায়া অনুসরণে)

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

চশমাটা কার? তোর, না আমার?
ঝগড়া নাকে ও চোখে।
সুবিচার চাই, আদালতে তাই
দুই জনেতেই ঢোকে।
বিচার আসনে বসেন জাঁকিয়ে
কর্ম মহান মতি।
দুই পক্ষেই জিভই দাঁড়ালো
কোরে দিতে ওকালতি।
"ধর্মাবতার, নাকটি নইলে
বসে ওটা কোনখানে?
চশমা নাকের, নাক চশমার—
পৃথিবীর লোকে জানে।"
নাকের পক্ষে সওয়ালটি সেরে
চোখের পক্ষ নিয়ে
বুঝলো না কেউ—কী বললে জিভ
নানান গপ্‌পো দিয়ে।
জজ মহোদয় দিলেন যে রায়
ভাষা তার অতি সোজা—
"যখনি থাকে না চশমাটা নাকে,
থাকবে দু' চোখ বোজা।"

শ্যামবাজারের শশিবাবু

আশুতোষ সান্যাল

শ্যামবাজারের শশিবাবু মানুষ নেহাৎ মন্দ নয়,
এমন পাগল কেউ পাবে না চেষ্টা করে দেশটা ময়!
বাজার থেকে আনেন কিনে বস্তা-ভরা সস্তা মাল,
ট্রামে যেতে চলেন বাঁয়ে—নেইকো মোটেই তাল-বেতাল।
তেঁতুল আচার দুধে মেখে খেয়ে বেরোন সাত সকাল,
উচ্ছে-আলু খেয়ে বলেন, "মাছের ঝোলটা বড্ড ঝাল!
থপথপিয়ে শশিবাবু চলেন—যেন আস্ত ব্যাং,
দেখলে পথে চ্যাংড়া ছেলে আদর করে মারেন ল্যাং।
সাদুস-নুদুস ঢিলে-ঢালা, মুখ-ভরা তাঁর পানের পিক,
উল্টো করে পরেন জামা, কাচা-কোঁচার নেইকো ঠিক।
যা বলো ভাই, শশিবাবু মানুষ নেহাৎ মন্দ নয়,
কখন পড়েন গাড়ি-চাপা—এইটে মনে সন্দ হয়।

গ্রাম্যচিত্র

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তা যখন ঘোরাতে থাকেন লাঠি,—
কোমর বাঁধিয়া গিন্নী ধরেন ঝাঁটা,—
বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়া হয় মাটি;
ছেলে পড়ে সরে; বউ কাঁপে—ভয়ে কাঁটা!
পাড়ার লোকেরা মারে এসে উঁকিঝুঁকি,
কেউ নেয়নাকো জখম হবার ঝুঁকি;
হাসে কেউ কেউ, কেঁদে ওঠে খোকাখুকী;
পিসী পিসী মানে কালীমন্দিরে পাঁঠা।
ততক্ষণ না ভৃত্য রাম টহল
দু'জনেরে ঢেলে বালতি কয়েক জল
ঠাণ্ডা করিতে ভাসায় রণস্থল—
ততক্ষণ এ অভিনয় চলে টানা।
সন্ধ্যায় গেলে দেখা যাবে কর্তারে
সেঁক-তাপ দিতে গিন্নীর পিঠে-ঘাড়ে,
মলম লাগায়ে গিন্নী শুধান তাঁরে,
"বড্ড লেগেছে? আর একটু দেব?" "না, না!"

মহাকাশ অভিযানে লালুখুড়ো

অমিয়কুমার হাটি

চাঁদেতো অনেকে গেছে,
লালখুড়ো যেতে চায় চাঁদ ছুঁয়ে সূর্যে
ঠিক করে বেছে বেছে,
খাবার হিসাবে নেবে খেজুরের গুড় যে!

পথ বড় দূর যে।
কে বলে তা?
মহাকাশযান হবে নারদের ঢেঁকি যেন
আগবিক জ্বালানীতে দেরি খুব হবে কেন?
তিন দিনে ঠিক খুড়ো
পৌঁছাবে তূর্যে।

ফোস্কা পড়তে পারে হাড়ে
তরল বরফ রাখে ঘাড়ে
দিনকয় সূর্যটা ঢাকবে সে বরফে
সে ক'দিন পৃথিবীতে
তোমরা ঘুরতে পার সর্দিতে কফে।

খেঁদুবাবুকে অভিনন্দন

প্রিয়ম্বদা দেবী

খেঁদুবাবু নাসিকাটি তুলে ফেল চট,
মুখখানি হবে তবে খাসা চিত্রপট।
রং আছে, ঢং আছে, আছে কালোচুল,
চোখে তোর গগনের আলো সমতুল।
যখন উঠিবে নাক বাঁকা চেহারায়,
কে আছে এমন মেয়ে মুখরে বাঁকায়,
পায়ে পড়ে কতজনা খাবে লুটোপুটি,
সেদিন দেখিয়া হবে আমাদের ছুটি।
সুখ থাক, রূপ থাক আর হোক ধন
মনেতে মহৎ হয়ে হও মহাজন,
সেদিনের পানে মোরা চেয়ে আছি সবে,
বছরে বছরে তোর জনম উৎসবে.
এমনি আশীষ করি বরষে বরষে.
দেখিব "খেঁদুর" নাক ললাট পরশে।

'সত্যধাম,' মোরাবাদী ১১ই কার্তিক, ১৩০৪

* সেকালের বিখ্যাত কবি স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী এই কবিতাটি লিখেছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীসঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে। কবিতাটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল।

রাম-তাড়া

আশা দেবী

জানলা দিয়ে এলেই দখিন হাওয়া
লোটন ভাবে সর্দি হবে তার—
বৃষ্টি এলেই কি তার চেঁচামেচি
"নিমোনিয়া"—আন ডেকে ডাক্তার।
একটুখানি রোদ লেগেছে গায়ে
অমনি ভাবে নির্ঘাৎ সান্-স্ট্রোক।
টপাৎ টপাৎ গিলছে ওষুধ খালি
হয়রাণ তার বাড়ীর যত লোক।
দিল্লী থেকে স্যান্ডো মামা এলো
তাগড়া জোয়ান, মেজাজ ভারি কড়া
কান ধরে তার হ্যাঁচকা দিয়ে বলে
"লক্ষ্মীছাড়া শরীরটাকে নড়া।"
ঘণ্টা চারেক চুবিয়ে দিলো জলে
দুপুর রোদে রাখলো ছাদে খাড়া—
লম্বা লাঠি বাগিয়ে নিয়ে হাতে
সারা সকাল করলো মাঠে তাড়া।
স্যান্ডো মামার কড়া দাওয়াই খেয়ে
অসুখ-অষুধ কোথায় পগার পার
রৌদ্র-জলে শক্ত শরীরখানা
লোটন এখন মস্ত খেলোয়াড়॥

ছড়া

কালিদাস ভট্টাচার্য

ঢোলক বাজায় রাতের বেলা
রামশঙ্কর রায়,
তার সঙ্গে নেচে নেচে
গোলকবাবু গায়।
রামশঙ্কর দুম্ করে যেই
দেন ফাটিয়ে ঢোল,
গোলকবাবু লম্ফ দিয়ে
বলেন হরিবোল॥

ছড়া

যতীন্দ্রপদ চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল পুরুতমশাই
বেয়াইটি তার মস্ত গোঁসাই;
ফাঁক পেলে সে করতো চুরি
রান্নাঘরে মালপো পুরি।
তার যে ছিল সাধের গিন্নী
কথায় কথায় মানতো সিন্নি;
মানতো কিন্তু দিত না
কারো কিছুই নিত-না॥

তারা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিন বাড়িতে কাজ করে অই
দশ বছরের 'তারা'।
রোজগারে ওর বাপ মা ক' ভাই
দু'মুঠো পায় খেতে
কাকেও দুঃখ জানায় নাকো
নেইকো চোখে ধারা
বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়
মনের আনন্দেতে!
নেইকো কামাই, রোদে জলে
হাজির আছে কাজে
ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে
অনেক বলে ছড়া
সামান্য এক ছিটের ফ্রকেই
মন ভরিয়ে সাজে
অল্প পেয়েই পেয়েছে সে
সবটা বসুন্ধরা॥

আগমনীর চিঠি

গাজী বিশ্বজিৎ

সাদা মেঘের ওড়না ওড়ে
নীল আকাশের গায়
মিষ্টি হাওয়া কাশের আঁচল
দুলিয়ে দিয়ে যায়,
বনানী লাল ফিতের কুসুম
পরলো মাথার চুলে
পানকৌড়ি পাখনা ভাসায়
ভরা নদীর কূলে
শিউলি বনে নূপুর বাজে
মৌমাছিদের পায়—
শালুক ফুলে পুকুর আলো
মন যে ছুঁয়ে যায়।
আগমনীর আনলো চিঠি
শরৎ সবার প্রাণে
বাংলাদেশে মা আসছে
সবার প্রীতির টানে

পুজোর সাজে টুকুন

ভোলানাথ ঘোষ

পুজো বাড়িতে বাজছে ঢাক,
ঢ্যাম কুড়াকুড়-তুকুর তাক্।
টুকুন বলে, মাসী গো মাসী
চলো না ঠাকুর দেখে আসি।
ফেলে তোমার সকল কাজ,
পরিয়ে দাও পুজোর সাজ।
পরে সে সাজ টুকুন চলে,
রাঙা মুখে হাসি খেলে।
যে দেখে সেই নেয় যে কোলে
আনন্দে প্রাণ ভরিয়ে তোলে॥

গুণের কদর

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কে এসেছে, কে এসেছে,
ঘর ক'রেছে আলো।
হ'ক-না কেন দেখতে যতই
অমাবস্যার কালো,
গুণের কদর সবাই করে—
সবাই বাসে ভালো।

সূর্যশিশু জাগলে

প্রবীর দাশ

আমরা শিশু, সূর্যশিশু
জাগলে আঁধার যায় দূরে,—।
ভাঙে যে ঘুম নিঝুম দেশের
প্রাণের সাড়া নিদ্-পুরে।

আমরা শিশু, সূর্যশিশু
জাগলে আঁধার যায় দূরে॥

সারদীয়া দৈনিক বসুমতী : ১৩৮৪

সীমানা

১৪৫ পৃষ্ঠার পর

নিলো, এটা পরে হয়ত কাজে লাগতে পারে। পুলিশের ভাষায় যাকে বলে 'সূত্র।' এই সূত্র ধরে শয়তানটাকে পাকড়াও করা সম্ভব হতে পারে।

মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করে একটা এলোখোঁপা বেঁধে, গোলাপী স্কার্ফটাকে কাঁধে ফেলে শাশ্বতী তার চেনা পথ ধরে জঙ্গলের দিকে নামতে লাগলো,—এদিকে টিলার ওপরে গাছপালার অংশ একটু বেশি, সেজন্য এদিক দিয়ে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়ত সম্ভব নয়। তাছাড়া এদিকেও বা লোকালয় কোথায়? জঙ্গল পার হয়ে বেশ কিছুদূর গেলে তবেই মিলবে সেই কালো পিচ-ঢালা পথের রেখা।

গা ঘিনঘিন-করা একটা অশুচি শরীর নিয়ে শাশ্বতী জঙ্গল পার হতে লাগলো। পার হতে হতে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে একসময় তার মনে হলো, এই ঘড়ির বাক্সটা ফেলে শুধু ঘড়িটা হাতে বেঁধে নিলে কেমন হয়? কারণ ঘরে ঢুকতেই যদি প্রদোষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? সে যদি এই বাক্স দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে? হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে সে সরাসরি কী বলতে পারে, কতটুকু জানাতে পারে? জানাতে পারে সে প্রমীলাকে। প্রমীলার কাছ থেকে প্রদোষ পরে শুনুক, শুনতে ত' ওকে হবেই, কিন্তু সে নিজে থেকে কী করে বলবে মুখ ফুটে? এইরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই সে বাক্সটা খুলে ঘড়িটা বার করলো। তারিখ-বসানো অটোম্যাটিক ঘড়ি, কত দাম কে জানে! ঘড়ির বেড়টা লেডিজ ঘড়ির তুলনায় একটু বড়ো, কিন্তু এইরকম বড়ো ঘড়িই ত' লেডিদের পরার রেওয়াজ হয়েছে আজকাল। সে তার নিজের ঘড়ির পাশে ওটা পরে বাক্সটা ফেলে দিলো। তারপরে স্কার্ফটা টেনে ঢেকে নিলো হাতটা, স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করলো। নতুন ঘড়ির ছোঁয়াটা সে অনুভব করছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, যেন একটা সাপ জড়িয়েছে সে। কিন্তু ফেলে দেওয়ার উপায় ত' নেই, ওটা হচ্ছে 'সূত্র', —ওটা বহন করেই তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

আশ্চর্য, এই পথ দিয়ে সে কালও পাহাড়ে উঠেছে, আজও গেছে বুনো ফুলের সৌরভ-নিবিড় বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে, কিন্তু আজ ফেরার পথে তার ভয় করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, যে-কোনো মুহূর্তে, যে কোনো জানোয়ার তার গায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। চিন্তাটা মনে আসতেই তার সারা শরীর শিউরে উঠলো, আর অদ্ভুত ব্যাপার, তার চোখ ফেটে যেন জল আসতে লাগলো। আঁচল দিয়ে বার বার মুছেও সে যেন তা নিবারণ করতে পারছে না।

সে কলকাতার পথে পথে কত বেড়িয়েছে একা একা, বছর তিন আগেও সে একা কাশী ঘুরে এসেছে, এলাহাবাদ ঘুরে এসেছে,—কখনো তার কোনো বিপদ হয়নি, লোকেরা এসে যত্ন করে ট্রেণে তুলে দিয়ে গেছে, ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছে, ট্রেণের সহযাত্রীরা তার দিকে তাকিয়েছে সম্ভ্রমের চোখে,—সাহিত্য-সভায় তার ভাষণ মুগ্ধ হয়ে শুনেছে লোকে, কাছে এসে বহু লোক অভিনন্দন জানিয়েছে, শ্রদ্ধা আর অভিনন্দনই তার প্রাপ্য ছিল, তার গুণের জন্য যশসৌরভেই সে অভ্যস্ত ছিল,—কিন্তু তার যৌবনের পড়ন্ত বেলায়, এই ছত্রিশ বছর বয়সে তার জীবনে অতর্কিতে যে এই কাণ্ড ঘটতে পারে, এ কে ভাবতে পেরেছিল! তার মনোজগতের পরিচিতি, যা তার লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত—তাই লোককে নাড়া দিয়েছে,—তার শরীর সম্বন্ধে আলাদা করে কবে কে ভাবতে গেছে? অসীমও না, অসীমও যা চেয়েছে তা তার মনোজগত বা আত্মিকজগতের সৌরভ। বস্তুত তার নিজস্ব জগতও এইটেই। এই মনোজগৎ নিয়ে সে নিজেও ব্যাপৃত,—সেখানে প্রকৃতির ঐ রকম অবাধ নির্লজ্জতার মধ্যে তার সত্তা যে অমন করে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে পারে,—তা সত্যিই সে কোনদিন ভাবতে পারেনি। সে কেন, প্রমীলাই কি চট্ করে বিশ্বাস করবে একথা? সব শুনে সে অবাক হয়ে বলবে, —বলছিস্ কী তুই! প্রকাশ্য দিনের আলোয় অমন খোলামেলা জায়গায় —ছি-ছি—তা কি হতে পারে কখনো?

—কিন্তু তা-ই হয়েছে,—নিতান্ত অবিশ্বাস্য কাণ্ডই ঘটে গেছে,—বলতে বলতে চোখের জল মুছে জঙ্গলের শেষ গাছটি পার হয়ে শাশ্বতী পিচের রাস্তার ওপরে এসে পড়লো। কোথায় কতটুকু যে তার নিজের দেশের সীমানা,—সে নতুন মানুষ, —কী করে জানবে? এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে কিছুই বোঝবার জো নেই। "সীমানা" শব্দটা নিজের মনে উচ্চারণ করতে নিজের কানেই যেন অন্য একটি ব্যঞ্জনা নিয়ে নিমেষে উপস্থিত হলো। মনে হলো, প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব এলাকা আছে, তার সীমানা সচরাচর কেউ পার হতে চায় না, কিন্তু যখন চায় বা চাইতে বাধ্য হয়, তখন বোধহয় এমনি করেই বিপর্যয় ঘটে। এমন বিপর্যয় যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। শাশ্বতীর যেতে যেতে মনে হচ্ছিল সে নিজেই যেন অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে। অন্য একটি দেহ আশ্রয় করে তার শাশ্বত সত্তা এগিয়ে চলেছে,—একের সঙ্গে অপরের কোনো মিল নেই, সংগতি নেই।

ঐ যে এতক্ষণ পরে মানুষ দেখা গেল, একটা বুড়ো মতন লোক পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলেছে,—সে মুখ তুলে যাকে দেখলো, সে কি সত্যিই শাশ্বতী? কিছুক্ষণ পরে সেই পাথর ভাঙতে-বসা টুকটুকে তরুণীর দল যাকে দেখে চেনা-মানুষের হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করছে, সে কি সত্যিই সেই মানুষ যে ভোরবেলায় ওই পথ দিয়ে হেঁটে গেছে?

আবার সেই নানীর দোকান। নানীর দোকানে এখন দেখা যাচ্ছে খুব ভীড়। নানীর মুখ তুলবার সময় নেই, তা সে চোখ তুলে তাকে দেখবে কী? লোকগুলো তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে, মানুষটি কে। কিন্তু সেই হিংস্র শ্বাপদের মতো দৃষ্টি এখানে কোথায়? তাকে দেখে কারুর চোখে ত' অমন লালসার দৃষ্টি ফুটে উঠছে না! আসলে শয়তানটা সত্যিই শয়তান, জানোয়ারটা সত্যিই জানোয়ার। তার দেখা ঐ নির্জন বনজঙ্গল আর পাহাড় ছাড়া মিলবেই বা কোথায়? বাড়ির সামনে এসে আবার চোখে জল দেখা দিতে চায়। সেটা মুছে, নিজেকে সামলে সে চট করে ভিতরে ঢুকে গেল। কাণ্ডী কাজ করছিস!—সে ওকে দেখে মাথা নুইয়ে যথারীতি একটু হাসলো। ওকে পার করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় পা দিতেই সে অবাক হয়ে গেল! পাশের ঘরে—বিছানার কিনার আর সোফার ওপর ওরা সব গা এলিয়ে বসে অন্তরঙ্গের মতো গল্প করছে। না, প্রদোষ আর প্রমীলা নয়, আরও দুটি লোক, —অসীম আর ডরোথি।

তাকে দেখতে পেয়ে ওরা হৈ-হৈ করে উঠলো, অরা সে "আসছে" বলে ছুটে অন্য ঘরে ঢুকে গেল, যে ঘরে ওকে শুতে দিয়েছিল প্রমীলা। ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবে, প্রমীলা ছুটে এসে পড়লো দরজার ওপর, —ওদিদি, কারা এসেছে দেখেছিস? শীগগির আয়। দরজা বন্ধ করছিস কেন?

For Rolling shutter,
Collapsible Gate, W. I. Gate,
Grills, Steel Doors & Windows
STEELCO
ENGINEERING WORKS.
36D, Beniapukur Rd.
Cal-14. Phone-44-1581

শাশ্বতী বললে,—তুমি বোস গিয়ে। আমি এখুনি আসছি, কাপড়-চোপড় ছেড়ে।

—বলতে বলতে দরজা বন্ধ করে দিলো সে। প্রমীলা আর পীড়াপীড়ি না করে ফিরে গেল ওদের কাছে।

শাশ্বতী দরজা বন্ধ করে একটু দম নিয়ে নিলো। তারপরে হাতের ঘড়ি দুটি খুলে নিজের সুটকেশে রেখে দিলো যত্ন করে। কিন্তু এরপর? ওরা এলো কোথা থেকে? আর কেনই বা এলো? প্রমীলাকে এখনি সব কথা বলা দরকার, কিন্তু ওদের ওঘরে বসিয়ে রেখে দুই-বোন এ ঘরে বসে গল্প করবে, ভালো ছেখাবে কী সেটা? কী যে করা উচিত, আর কী যে করা উচিত নয়, ভেবে যেন কূল পাওয়া যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। কী আর করা যাবে,—মনে মনে এই কথা বলে শাশ্বতী কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে গেল। অন্ততঃ গা-ঘিনঘিন-করা অশুচি থেকে তো বাঁচা যাক এখন!

ওঘরে তখন প্রমীলা কথা বলছিল। বলছিল,—দিদি এখানে খুব আনন্দেই আছে। খুব ভোরে উঠে বেড়াতে যায়। আমরা একটু লেট-রাইজার। এখানকার বস্তুরও তাই, সবাই একটু বেলাবেলি ওঠে।

অসীম বললে,—আমরা এসে প্রদোষ-বাবুর অসুবিধা করলুম ত? বিশেষ করে আপনার—অফিস।

—প্রদোষ বলল, অফিসে একবার ঘুরে এসেছি। এখন খানিকক্ষণ আপনাদের সঙ্গ লাভ করি।

প্রমীলা বললো,—দাঁড়ান, আর একটু চায়ের কথা বলি। দিদিও খাবে, সেইসঙ্গে আমাদেরও হয়ে যাক।

অসীম ঘড়ি দেখল, বললে,—আধঘণ্টার ওপর হয়ে গেল, সেই যে তোমার দিদির টিকিটি দেখলুম, তারপরে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

—দিদি বোধহয় স্নান করছে।

—এত সকালে? আই মিন, এখানকার পক্ষে রীতিমত সকাল সকাল বই কী!

প্রদোষ হাসলে, বললে,—যা বলেছেন, এখানকার পক্ষে দশ-এগারোটা কিছুই নয়। ডরোথি কী বলছেন?

ডরোথি বাংলা জানে না, সে চুপচাপ ওদের অদ্ভুত বাক্যাবলী শুনছিল, দুটি-একটি কথা হয়ত আন্দাজে আন্দাজে বুঝছিল, এতক্ষণে ইংরাজী শুনে একটু নড়েচড়ে বসলো। সে যা উত্তরে বললে, তার অর্থ হলো,—আমার কাছে এটা অবাক হবার মতো কোনো ব্যাপার নয়। আমি শীতের দেশের মানুষ।

এইভাবে ওদের গল্প চলতে লাগলো। ওদিকে শাশ্বতী প্রমীলার আলমারী ঘেঁটে একটা গোলাপী শাড়ী বার করে পরলো। গায়ে জড়ালো তার নিজের সাদা শালটা। মুখে আলতোভাবে একটু পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিলো। তার ছেড়ে আসা সব পোষাক বাথরুমে একটা বালতিতে জলে চুবিয়ে এসেছে। এমন কি প্রমীলার গোলাপী স্কার্ফটাকেও জলে ভিজিয়ে রেখে এসেছে। স্নান করেছে গরম আর ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে, কিন্তু বেরিয়ে এসেও যেন তার কাঁপুনি যাচ্ছে না, অথচ দুরন্ত শীত এখানে নেই, সামান্য একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মাত্র। কিন্তু এর পর? দরজা খুলে বাইরে আসতেও সে পারছে না যে! কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে, একটা অদ্ভুত সংকোচ আর লজ্জা।

অবশেষে প্রমীলাই এসে উদ্ধার করলো তাকে। সে দরজায় ধাক্কা দিলো,—কী রে দিদি, তোর হলো?

আর কোনো উপায় নেই। মাথার এলানো ভিজে চুল ভালো করে তোয়ালে দিয়ে আর একবার মুছতে মুছতে সে দরজা খুলে দিলো। ওকে দেখে প্রমীলার চোখ-দুটো আরও উজ্জ্বল দেখালো,—বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে তোকে লাল শাড়ী পরে!

—লাল কোথায়? গোলাপী ত'!—বলে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিলো শাশ্বতী, বুঝি-বা একটু লজ্জা পেলো।

—আয়, ও-ঘরে আয়,—বলে হাত ধরে টানলো প্রমীলা,—চা নিয়ে ওরা বসে আছে, তুই না এলে খেতে পারছে না।

এইভাবে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে আগমন। ডরোথি ওকে হাতে ধরে পাশে বসালো। সামনের টেবিলে চা-প্যাস্ট্রি-কেকের একটা স্তূপ। অসীমের চোখে ফুটে উঠলো সেই স্মৃতির স্তিমিত ও স্নিগ্ধ প্রদীপ, আস্তে করে বললে,—অনেকক্ষণ বসে আছি।

—কী করে এলে এখানে?

অসীম বললে,—কেন? কার্শিয়াঙে এসে মিত্র সাহেবকে খুঁজে বার করে প্রদোষ-বাবুর ঠিকানা জেনে নেওয়া কি খুবই কঠিন কাজ? তবে হ্যাঁ, পাংখাবাড়ি রোড দিয়ে আসা কঠিন কাজই বটে।

ডরোথি বললে,—তুমি যে এভাবে ঠকাবে জানতুম না।

শাশ্বতী হাসলো, বললে,—জানো ত', লেখকরা একটু খেয়ালী হয়? খেয়াল হলো কার্শিয়াঙে নেমে পড়লুম, খেয়াল হলো এখানে চলে এলুম।

অসীম বললে,—আর সেই খেয়ালে আমরাও পড়লুম আছা টানাপোড়েনে! কোনো বিপদ-আপদ হলো না কী! ভাবনাও ত' একটা হয়!

শাশ্বতীর মুখখানা হঠাৎ পাংশু হয়ে গেল, অস্ফুটকণ্ঠে সে বললে,—বিপদ আবার কিসের?

অসীম বলে,—কে জানে! পাহাড়ী রাস্তায় বিপদ ত' পদে-পদে! গাড়ি যদি স্পীড করে ত' ব্যস, আর দেখতে হবে না, অতলস্পর্শী খাদ।

প্রদোষ সোজা হয়ে বসলো, একটু হেসে বললে,—তবু লোকে পথ চলে। ভয় করে আর কী হবে? কিন্তু সব যে পড়ে রইলো, খান আপনারা! কী দিদি, মুখে তুলছেন না কেন খাবার?

খাওয়ার পালা চলতে লাগলো। প্রদোষ এক সময় বেরিয়ে গেল, বললে,—চাকরিটা বজায় রেখে আসি।

প্রমীলা বললে,—নিন, আপনারাও রেডি হয়ে নিন। চান-টান করবেন না?

অসীম বললে,—সে হবে'খন। সারা-দিনের জন্য যখন আটকেছেন, তখন সবই হবে। ওদিকে উইন্ডামায়ার হোটেলে বসে আমাদের বন্ধু কী ভাবছে কে জানে।

হেসে উঠলো প্রমীলা,—অতলস্পর্শী খাদে যে পড়েন নি, সেটা তিনি বুঝতে পারবেন।

অসীম শাশ্বতীর দিকে তাকালো, বললে,—এসেই দেখি, তুমি নেই। প্রদোষ-বাবুকে নিয়ে খুঁজতে বেরুলাম, কিন্তু কোথায় তুমি? আচ্ছা, কোন্‌দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে?

শাশ্বতীর মুখে টুকরো হাসির আভাষ, বললে,—একটা পাহাড়ে উঠে-ছিলুম।

প্রমীলা অবাক হয়ে বললে,—সে কী রে দিদি, কোন্ পাহাড়?

শাশ্বতী জায়গাটার বর্ণনা দিলে। পথ ছেড়ে জঙ্গলে নেমে অনেকটা যেতে হয়, তার পরে ছোট্ট পাহাড়, তার মাথায় বড়ো-বড়ো কয়েকটা গাছ, আর বসবার একটু বেঞ্চি। বেঞ্চিতে বহু নাম খোদাই করা। একটা নাম অতি কষ্টে পড়তে পেরে-ছিলুম,—নীললোচনা।

অবাক হয়ে শুনছিল প্রমীলা, এবার চোখ প্রায় কপালে তুলে সে বলে উঠলো,—এই রে! তুই বোধহয় নেপালে চলে গেছ্‌লি! আমরা এই ভয়টাই করছিলুম, ভুল করে কখন তুই সীমানা পার হয়ে যাস্, কে জানে!

—কেন রে! কোনো ভয়-ডর আছে নাকি?

প্রমীলা বললে,—থাকতেও ত' পারে। কী দরকার ওদিকে যাওয়ার?

—জায়গাটা কিন্তু সুন্দর।

অসীম বললে,—তাহলে চলো না, বিকেলে একবার সবাই মিলে ঘুরে আসি।

এ-কথার পর কেন, কে জানে সবারই চোখ ঘুরে এসে তার দিকে পড়লো। শাশ্বতী সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামালো, অনুভব করলো তার কানের কাছটা গরম হয়ে উঠেছে।

ডরোথি বোধহয় একটু চুপচাপ প্রকৃতির মেয়ে, চট করে কথা বলে না, হাসি-হাসি

মুখে সব শুনে যায়। এবার সে-ও বলে উঠলো,—নট্ এ ব্যাড আইডিয়া!

—তাহলে ওটাই ঠিক রইলো!—অসীম উৎসাহিত হয়ে বললে,—ফিরে আসুন প্রদোষবাবু, একসঙ্গে হৈ-হৈ করতে করতে যাওয়া যাবে।

আশ্চর্য, তার পরে একের পর এক প্রহর পার হতে লাগলো, প্রদোষ ফিরে এলো, গল্প-গুজব, হৈ-হৈ,—কিন্তু শাশ্বতী কোনো কথা কাউকে খুলে বলতে পারলো না, বা বলবার অবকাশ খুঁজে পেলো না। প্রমীলা এক সময় তাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—তোর কী হয়েছে রে দিদি? কেমন যেন বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিস! ঠিক এই কথার উত্তরে শাশ্বতী বোনকে বলতে পারতো,—সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হয়েছে আজ। কিন্তু বলতে গিয়েও সে বলতে পারলো না, কথাটা যেন গলায় আটকে গেল। সে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বললে,—একটা গল্পের প্লট মাথায় আসছে।

প্রমীলা কথাটার অন্য অর্থ করলো, কলহাস্যে বলে উঠলো,—আর সে-প্লটের মধ্যে বিদেশিনী একটি মহিলা অবশ্যই আছে! বুঝি রে, সব বুঝি!

শাশ্বতী বলতে পারতো, 'ছাই বুঝিস!'—কিন্তু তা না বলে মুখটা নিচু করলো, কানের কাছটা আপনিই গরম হয়ে উঠলো, অষ্টাদশী মেয়ের মতো সলজ্জ 'ঘাঃ! কী যে বলিস!—বলে তাড়াতাড়ি সরে গেল অন্যদিকে। প্রমীলার হাসি কিন্তু তখনো শোনা যাচ্ছিল।

যাই হোক, অসীমের পীড়াপীড়িতে ওরা সবাই বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে দু'-দুটো জীপ, অসুবিধে হবার কথা নয়। অসীম-ডরোথি তাদের জীপে, আর এরা তিনজনে প্রদোষের জীপে। শাশ্বতীর নির্দেশমতো সেই জঙ্গলের পাশে গাড়ি এসে থামলো। সবাই নামবার পর জঙ্গলের ওপারে সেই ছোট পাহাড়টা আঙুল দিয়ে দেখালো শাশ্বতী। প্রদোষ বললে,—কী সর্বনাশ! ও যে নেপাল! ওখানে চলে গিয়েছিলেন!

ওদের দেখাদেখি পিছনের জীপও এসে থামলো। প্রদোষ অসীমদের কাছে ডাকলো, বললে,—পুলিশকে না জানিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

প্রমীলা বললে,—তাহলে দিদি গিয়েছিল কী করে?

শাশ্বতী বললে,—একদিন নয়, দু' দিন।

প্রদোষ বললে,—আমাদেরই দোষ! আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কেউ দেখে নি তাই, নইলে—

শাশ্বতীর মনে হলো তার গলা শুকিয়ে আসছে, কিন্তু তখনো সে বলতে পারলো না। প্রমীলা কী ভাবলো কে জানে, বললে,—কাজ নেই বাপু ওখানে গিয়ে। বিদেশ-বিভুঁই।

প্রদোষ বললে,—গেলে গলা কাটবে না কেউ। তবে থানার একটা পারমিশন নেওয়া ভালো। বলেন ত' দারোগাসাহেবকে একেবারে জীপে উঠিয়ে নিয়ে আসছি।

অসীমের উৎসাহ অদম্য। সে বললে,—তা মন্দ কী?

—তাহলে আপনারা একটু অপেক্ষা করুন,—প্রদোষ বললে,—আমি যাবো আর আসবো। আপনাদের গাড়িটা একটু নিচ্ছি। ভালো গাড়ি। দারোগাসাহেব খুশি হবে। বলতে বলতে সে অসীমদের ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে তাকে কী নির্দেশ দিলো। অমনি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভার ছুটতে লাগলো বিপরীত দিকে।

ডরোথি একদৃষ্টে তাকিয়েছিল পাহাড়টার দিকে, বললে,—ওখান থেকে দৃশ্য খুব সুন্দর দেখা যায়, তাই না শাশ্বতী?

শাশ্বতী সংক্ষেপে বললে,—হ্যাঁ।

—আমরা জঙ্গলে ত' একটুখানি ঢুকতে পারি।—ডরোথি বললে।

—তা পারি,—অসীমের উত্তর,—কিন্তু একটু অপেক্ষাই করা যাক, প্রদোষবাবু আসুন।

প্রমীলা দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, বললে,—এখান থেকে পাহাড়টা কম দূর নয়! অন্তত ঘণ্টাখানেকের পথ। তুই একা একা কী বলে চলে গিয়েছিলি? ভয়ে বুক কাঁপলো না!

মুখে একটা আরক্ত আভা ছড়িয়ে পড়লো শাশ্বতীর, মৃদু গলায় বললে,—আমার আবার ভয় কী? কী নেবে?

প্রমীলা বললে,—গয়ে গয়না-টয়না নেই বটে, হাতে ঘড়িটা ত' ছিল! সেটিও কেড়ে নিতে পারতো! চোর-ছ্যাঁচোড় না পারে কী!

শাশ্বতী তখনো বলতে পারতো সব কথা খুলে। কিন্তু পারলো না। শুধু বললে,—ওখানে চোর-ছ্যাঁচোড় আছে, তুই জানলি কী করে?

—থাকতেও ত' পারে!—প্রমীলা বললে,—আমাদের সীমা আমাদের না ছাড়ানোই ভালো।

শাশ্বতী বললে,—জানিস ত' লেখক-দের মন? তারা সব সময় সীমারেখা মানতে চায় না; গল্পের প্রয়োজনে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

ততক্ষণে অসীম আর ডরোথি কাছে এসে দাঁড়ালো। ওদিকে জীপের ড্রাইভারও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে যে ওদের কথা শুনতে বা বুঝতে পেরেছে এমন নয়। কিছু বলা উচিত ভেবে সে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো। বললে,—জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটা কাটা রাস্তা আছে, জীপ করে পাহাড়ের উল্টো দিকে নিয়ে যেতে পারি। যাবেন আপনারা? অসীম কথাটায় উৎসুক্যবোধ করলো, বললে,—তুমি ওসব রাস্তা জানো?

ড্রাইভার বললে,—এদিককার লোক আমরা, এদিককার রাস্তাঘাটের খবর জানবো না?

অসীম বললে,—কিন্তু ওদিকটা সব নেপাল না?

ড্রাইভার উত্তর দিলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, বনের মধ্যে খানিকটা গেলে একটা পিলপে গাঁথা আছে, সেটাই বর্ডারের নিশানা।

শাশ্বতীর মনে পড়লো, ঠিক কথা, যেতে-যেতে বনের মধ্যে একটা পিলপে সে দেখেছিল বটে। সেটা যে দু' দেশের সীমারেখা, এটা কে বুঝবে চট্ করে? কিন্তু লেখাও নেই, বিবর্ণ; রাস্তাঘাটে যেমন মাইলস্টোনে চুন-টুন দেওয়া হয়, ওতে তার প্রলেপ পড়েনি বহুদিন।

যাই হোক, ইতিমধ্যে দ্রুত চলে এলো প্রদোষ, সঙ্গে তার পরিচিত থানার দারোগা। স্থানীয় লোক, ইয়ুনিফর্ম পরা, মুখখানি হাসি-হাসি। বললেন,—চলুন, কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

এবার বনের পথে হেঁটে যাওয়া নয়, খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে ঢুকে লাল অপরিসর পথ দিয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে যাওয়া। খানিকটা যাবার পর রেল-ক্রশিং-এর মতো একটা বাঁশ ফেলা আছে। বারকয়েক হাঁকাহাঁকির পর বুড়ো মতন একটা লোক এসে দারোগাকে সেলাম করে ওটা উঠিয়ে দিলো। চলতে লাগলো গাড়িগুলো। পাহাড়টাকে প্রদক্ষিণ করে এসে বিপরীত দিকে লাল রাস্তার ওপর থামলো। পাহাড়ী হাঁটা পথের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়। পাহাড়টাকে বেষ্টন করে উঠে গেছে। সেই পথে সার দিয়ে চলে ওরা ওপরে এলো। ঠিক সামনেই রয়েছে সেই বেঞ্চিটা। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে—কেউ নেই। ডরোথি বললে,—ওয়াণ্ডারফুল!

প্রমীলা গিয়ে বেঞ্চির নীললোচনা লেখাটা খুঁজে বার করলো। যে যার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে, শাশ্বতী দাঁড়িয়ে আছে ঘাসের আস্তরণ-বিছানো একটি বিশেষ জায়গায়। কোনো কথা নেই তার মুখে, কোনো চাঞ্চল্য নেই তার শরীরে, কোনো খুশির বিদ্যুতি নেই চোখে, যেন পাথরের একটি মূর্তি। অসীম এসে কাছে দাঁড়ালো, বললে,—জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু দুর্জয় তোমার সাহস, এতদূর হেঁটে এসে পাহাড়ে উঠেছিলে?

খুব মৃদু গলায়, প্রায় অস্ফুট উচ্চারণে শাশ্বতী বললে,—কেন, আমার আবার ভয়টা কিসের? কথাটার তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করলো না অসীম, সে নিজের কথার ঝোঁকে বলতে লাগলো,—লেখিকা ত', তাই একটু খেয়ালী। হয়ত বা এখানে এসে কোনো প্লট খুঁজে পেয়েছো।

চট্ করে ওর দিকে ফিরে দাঁড়ালো

শাশ্বতী, ঈষৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—হ্যাঁ, তা-ই পেয়েছি। অতি স্থূল একটা প্লট। এখানকার এই অপরূপ নির্জনতার মধ্যে বসে যা ভাবা যায় না, আমার মনে সেই ভাবনাই এসেছিল। অভাবনীয় একটা প্লট।

অসীমের কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক সম্ভ্রম ফুটে উঠলো, বললে,—আমি শুনবো। জানো ত' তোমার লেখক-জীবনের প্রতি আমার কতো শ্রদ্ধা।

শাশ্বতী কী বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তার মুখে ফুটে উঠলো বিচিত্র হাসি, বললে,—ঠিক আছে, বাড়ি গিয়ে সাহিত্যের বৈঠক বসানো যাবে।

দারোগাসাহেব ততক্ষণে কথা বলতে বলতে এদিকে চলে এলেন। প্রদোষ, ডরোথি আর প্রমীলা। ওরা শুনছিল আগ্রহের সঙ্গে, দারোগা বললেন,—আমাদের 'সীমানা' এমনিতে খুব পিসফুল, কিন্তু 'সীমানা', অর্থাৎ বর্ডার তো, মাঝে মাঝে স্মাগলারদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। 'স্মাগলার' কথাটা শাশ্বতীর কানে খট্ করে এসে বাজলো। সে উৎসুক চোখে তাকালো। দারোগাসাহেব দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে লাগলেন,—মা-না, খুন-খারাপী বড় একটা হয় না, ঐ স্মাগলিং। কী কী স্মাগলিং হয় শুনবেন? নানা ধরনের কাপড়ের থান, কলম, ট্রানজিস্টার, টেপ-রেকর্ডার থেকে শুরু করে রিস্টওয়াচ পর্যন্ত।

—কারা করে?

—নানা রকমের লোক। দাগীদের একটা লিস্ট আছে আমাদের কাছে—থানায়।

শাশ্বতী এতক্ষণে কথা বললে। বললে,—আমাকে একবার দেখাতে পারেন?

দারোগাসাহেব একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো।

অসীম তাড়াতাড়ি বললে,—উনি একজন লেখিকা। হয়ত মাথায় কোনো প্লট—

এবার দারোগাসাহেব হেসে উঠলেন, বললেন,—ঠিক আছে, চলুন থানায়।

ফেরার পথে সবার সে উৎসাহ ছিল না, তাই শাশ্বতীর সঙ্গে গেল শুধু অসীম আর প্রদোষ। কিন্তু কতকগুলি নামের তালিকা দেখে কী হবে?

অসীম বললে,—পছন্দসই দু'ই-একটা নাম চাই বোধহয় লেখিকার!

লিস্টটা দারোগাসাহেবকে ফেরত দিয়ে শাশ্বতী বললে,—কোনো বাঙালীর নাম নেই আপনার লিস্টে?

দারোগাসাহেব বললে,—না, সেরকম কোনো নাম নেই।

প্রদোষ একটু হাসলো, বললে,—বাঙালী নাম আপনার দরকার? যে-কোনো একটা বসিয়ে দিন না!

শাশ্বতী বললে,—লেখকদের কাছে নাম বাছাই করাটাই সব থেকে কঠিন। স্মাগলারের চরিত্রের নাম প্রদোষ কিম্বা অসীমকুমার ঠিক মানায় কী?

অসীম বললে,—কেন মানাবে না? আসলে তোমরা বড়ো খুঁৎ-খুঁতে। মনের মতো আর কিছুতেই তোমাদের হতে চায় না।

শাশ্বতী দারোগাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে,—ক্রিমিনালদের ফটো থাকে না আপনাদের কাছে?

—তা থাকে। দেখতে চান?

কিন্তু সে-সব ছবির মধ্যেও শাশ্বতী যা খুঁজছিল, তা পাওয়া গেল না।

বাড়িতে ফেরার পর আবার হৈ-হৈ করে চা-পানের পর্ব। অসীম বললে,—শাশ্বতী কিন্তু আমাদের সঙ্গে দার্জিলিঙ যাচ্ছে।

প্রমীলা বললে,—মানে!

অসীম বললে,—ডরোথিকে জিজ্ঞাসা করো। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে ওকে দেখবার জন্য। তাই জিমখানা ক্লাবে আজ ওর রিসেপসন। তোমরাও চলো না! কী প্রদোষবাবু, রাজী ত'?

প্রদোষ বললে,—এ ব্যাপারে রাজী না হয়ে পারি! কিন্তু দিদিকে আবার ফিরিয়ে আনবো।

প্রমীলাও সায় দিলো কথাটায়,—নিশ্চয়ই। কতো কষ্ট করে দিদিকে কাছে পেয়েছি। অন্তত মাসখানেকের আগে ছাড়ছি না। বাবাকেও চিঠি দিয়েছি সেইভাবে। তাছাড়া দিদিরও একটু বিশ্রাম দরকার।

দিদি কিন্তু উৎসাহিত হলো না, বললে,—এখানেও সভা-সমিতি? ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে।

অসীমের মুখখানা পাংশু হয়ে গেল, বললে,—যাবে না! আমি যে কথা দিয়ে এসেছি!

কিন্তু ওকে রাজী করানো কি অতো সহজ? শেষে প্রমীলাও পীড়াপীড়ি করতে লাগলো,—চল্ না দিদি, এতো করে বলছে। তাছাড়া আমার ছেলেকে তোর অমনি দেখা হয়ে যাবে।

ছেলের কথায় বোধহয় মন ভিজলো। শাশ্বতী বললে,—তাহলে চল্, অনেকদিন ওকে দেখি নি।

সীমানা থেকে দার্জিলিঙের পথ 'পাংথাবাড়ি রোড'-এর মতো ভীতিকর নয়। 'ঘুম' হয়ে দার্জিলিঙ-গামী মূল পথে গিয়ে পড়া যায়। ওরা যখন গাড়ি ছেড়ে উইন্ডামায়ারের দিকে রওনা হলো, তখন গোধূলি-বেলা। বিশ্রামের জন্য অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া গেল। ঘর ঠিক করে রাখা ছিল, অসুবিধা হলো না। কিন্তু ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে প্রমীলাকে একা পেয়েও শাশ্বতী ওর জীবনের অভাবনীয় ঘটনার কথা খুলে বলতে পারলো না।

সন্ধ্যার পর জিমখানা ক্লাবের প্রকাণ্ড হলের একাংশে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন। বাঙালীই বেশি, স্থানীয় সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীও আছেন। অন্য দিকে কিছু লোক দাঁড়িয়ে-বসে ওদের সভা দেখছে। যেমন হয়, সভা সেই রকমই হলো। ফুলের মালা, অভিনন্দন ইত্যাদি। অবশেষে শাশ্বতী উঠে দাঁড়ালো কিছু বলবার জন্য। অটোগ্রাফ আদায়ের পালা ছোটদের দল এর মধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। শাশ্বতী তার মনোজ্ঞ ভাষণের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, এমন সময় তার হঠাৎ চোখ পড়লো হলের অন্যদিককার সেই রবাহূত দর্শকদের ওপর। তারা এসেছিল অন্য কাজে, এদিককার অংশে 'সভা' হতে দেখে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই দলের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল অদ্ভুত সেই লোকটি, সেই দীর্ঘদেহ, মাথায় ফেল্টের টুপি, আর তীক্ষ্ণ বিস্মিত চাউনী। শাশ্বতীর চোখ পড়লো হঠাৎ-ই তার ওপর। হঠাৎ-ই মনে হলো, সে যা দেখছে, ঠিক দেখছে তো? বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠলো, মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল, চোখের আলো যেন নিভে আসছে,—সে স্পষ্ট দেখতে পেলো, লোকটা টুপিটা চোখের ওপর একটু নামিয়ে ভীড় ঠেলে দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!

তার মনে হলো সে বলছে,—ধরো—ধরো—পালাচ্ছে!

কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুটলো না, তার দেহ টলে উঠলো, ডরোথি পাশ দিয়ে ত্বরিত-গতিতে উঠে না ধরলে সে নির্ঘাৎ পড়ে যেতো।

সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, শাশ্বতীকে ধরাধরি করে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো। অভ্যাগতদের মধ্য থেকে একজন ডাক্তার ছুটে এলেন, কিন্তু শাশ্বতী ঠিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে নি, সে একটু পরেই চোখ মেললো। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে দেখে সে ম্লান একটু হেসে বললে,—একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল। মাপ করবেন।

প্রদোষ বললে,—অস্বাভাবিক নয়। যে রকম জার্ণি করে আসা হয়েছে। উনি ত' অভ্যস্ত নন।

প্রমীলা বললে,—কী দিদি, উঠতে পারবি?

—খুব পারবো।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ওদিককার অংশে রবাহূতের দলে ভীড় তখনো রয়েছে, কিন্তু সে শয়তানটা কোথায়? তাকে আর দেখা গেল না।

পরদিনের কথা। প্রদোষ চলে গেছে, প্রমীলা দিদির কাছে রয়ে গেল। ডাক্তারেরও

অভিমত, আজ দিদির পক্ষে একটু বিশ্রাম নেওয়াই উচিত। ওরা সবাই তাই সকালবেলা উঠে একটু ঘুরতে বেরিয়েছে। ম্যাপে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো শাশ্বতী, বললে, —তোরা ঘুরে আয়।

প্রমীলার ছেলে সবচে ছিল। মায়ের সম্মানে আজ সে ছুটি নিয়েছে স্কুল থেকে। মাসীকে না পেয়ে মাকে জড়িয়ে সে ঘোড়ায় উঠেছে। ঘোড়ায় উঠে পাক দিয়ে ফিরবে। দেখাদেখি ডরোথি, অসীম এমন কি প্রমীলাও ঘোড়ায় উঠলো। শুধুমাত্র একটা ছোট্ট খাটো চক্কর দিয়ে আসা নয়, একেবারে জলাপাহাড়। শাশ্বতীকেও ওরা দলে টানতো, নেহাৎ অসুস্থ বলে পীড়াপীড়ি করলো না। শাশ্বতী একটু হেসে অসীমকে বললে,—তোমরা ঘুরে এসো, আমি এইখানে বসে আসি। দারুণ লাগছে আজ সকালের রোদ। এই প্রমীলা, ছেলেটাকে কাছে কাছে রাখিস।

'ছেলে' অমনি ধ্বংকার দিয়ে উঠলো,—আমি কতো চড়েছি—আমার ভয় করবে না—বরং মাকে নিয়েই ভয়।

ওর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। আর তারপরেই ঘোড়াওয়ালাদের হাঁক-ডাকে ওরা যে যার ঘোড়ায় উঠে জলাপাহাড়ের দিকে রওনা দিলো।

শাশ্বতী সেই স্কার্ফটা বুকের ওপর বেশ করে টেনে দিয়ে বেঞ্চিতে বসে রইলো, কবি ভানুভক্তের প্রস্তরমূর্তির কাছেই তার বেঞ্চি। তার পাশে দু'জন (বোধহয় স্বামী-স্ত্রী) বসে ছিল, এই মাত্র উঠে গেল। সকালটা সত্যিই সুন্দর। কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা গেছে আজ পরিষ্কার। দার্জিলিঙে আজ আর কেউ বোধহয় ঘরে বসে নেই, সবাই বেরিয়ে পড়েছে। নানান পোষাক, নানান কলরব,—সবত্র ঐ ভোরবেলাকার রোদ্দুরের মতোই খুশির ঢেউ।

আনমনা হয়ে কী যেন ভেবে চলেছিল শাশ্বতী, হঠাৎ তার মনে হলো, বেঞ্চির ওপাশে আলতোভাবে কে যেন বসলো। চকিতে সেই দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল শাশ্বতী। সেই লোকটি। সেই ফেল্ট হ্যাট, ওভারকোট। নীচে গাঢ় সবুজ বর্ণের সার্টের আভাস। লোকটি মৃদু গলায় বললে,—অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি—কথা বলার—মানে—

প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো শাশ্বতী,—হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ?

লোকটি বললে,—কাল রাত্রেই জেনেছি আপনি কে। কিন্তু—

শাশ্বতীর গলা তখনো কাঁপছে উত্তেজনায়,—হাউ ডেয়ার ইউ স্পিক টু মি!

সে যে কেন ইংরেজী বলতে শুরু করলো, তা বোধহয় নিজেই জানে না। লোকটি বললে,—দয়া করে চেঁচাবেন না, লোক জড়ো হয়ে যাবে।

শাশ্বতী সেকথা কানে না তুলে তখনো গর্জন করছে,—এখানে কী করে এসেছো, এই দার্জিলিঙে ?

লোকটি নির্লজ্জের মতো হাসলো, বললে,—আমাদের গতিবিধি সব জায়গায়। কখন যে কোথায় থাকি! কিন্তু ভাগ্যিস এসেছিলুম! জিমখানায় ঢুকে দেখি—

—থাক—আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না। বলে রাগে, বিরক্তিতে, বিতৃষ্ণায় শাশ্বতী উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে, যে-পথে ঘোড়াগুলো যায়, সেই পথে চলতে লাগলো, উদ্দেশ্য হোটেলে ফিরে যাওয়া। হন হন করে কতক্ষণ যে চলেছে তার ঠিক নেই, হঠাৎ তার লক্ষ্যে পড়লো, হোটেলের দরজা সে অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছে, সামনে পাহাড়ের খাদের ধারে সেই 'সীমানা'র পাহাড়চূড়ায় পেতে-রাখা বেঞ্চির মতো একটা বেঞ্চি, আর সে বেঞ্চিটাতে কেউ নেই, একেবারে খালি। সেদিকে এগিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো, লোকটি নির্লজ্জের মতো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজের মনে বলে উঠলো,—আসুক। ফয়সালা হয়ে যাক।

যা ভেবেছিল সেই, লোকটি পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, সেইরকম ফিস-ফিস করে বললে,—রাগ করুন আর যাই করুন, আমারও ত' কিছু বলার থাকতে পারে!

চাপা গর্জনে যেন ফেটে পড়লো শাশ্বতী, ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো,—কী বলার থাকতে পারে! জঘন্য একটা ক্রিমিনাল!

লোকটি এসব উত্তেজনা যেন গায়েই মাখলো না, শান্ত গলায় বললে,—ক্রিমিনাল ত' বটেই! পুলিশ খুঁজছে অনেক দিন থেকে। ধরতে পারলে বেশ কয়েক বছরের মতো ফাটক করে দেবে।

—যা তুমি করেছো, তার জন্য তোমাকে নিশ্চয় ফাটকে পোরা উচিত।

লোকটি বললে,—আমি কী করেছি আর না করেছি, তার ফিরিস্তি আপনি জানেন ?

শাশ্বতী উত্তেজনায় তখনো কাঁপছে,—চাই না জানতে! একটা অপরাধই আমার কাছে যথেষ্ট!

লোকটি একটি সিগারেট বার করে ধরালো, ধীরে সুস্থে বললে,—আমি নিজে এ নিয়ে মাথা ঘামাতুম না, হয়ত আপনার সামনে এরকম করে আসতামও না কোনদিন, কিন্তু একটা কারণে আসতে হলো।

—শুনতে চাই না কারণ। উইল ইউ প্লিজ লিভ মি এলোন!

লোকটি বললে,—আপনার শরীর আবার খারাপ হবে। দয়া করে বসবেন!

—বিরক্ত করো না। এখখুনি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারি জানো ?

সে বললে,—জানি। এক মিনিটের মধ্যে আপনি আমাকে পুলিশেও ধরিয়ে দিতে পারেন।

শাশ্বতী বলতে লাগলো,—একশোবার

উৎসবের ও উপহারের
সবরকম বেনারসী, পিওর সিল্ক, তাঁতের ও প্রিণ্টেড শাড়ী,
সার্টিং, সুটিং, মিলের যাবতীয় ধুতি ও শাড়ী
তৈয়ারী পোষাক।
শীতের—কাশ্মিরী শাল, সোয়েটার, কম্বল।
বাংলার প্রাচীনতম বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা-৭, ফোনঃ ৩৩-২৩০৩

পারি—এখনো যে কেন ধরিয়ে দেই নি, এটাই আশ্চর্য! আমার কাছে তোমার একটা নিশানা আছে—তা জানো?

লোকটি টুকরো হাসলো; বললে,—জানি। সেই ফরেন-মার্কা ঘড়িটা।

—তবে? হাসতে তোমার লজ্জা করছে না?

লোকটির হাসি আরও বিস্তৃত হলো, ঠোঁটের সিগারেটটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বললে,—দেখুন, জেলের ভয় দেখাবেন না—ও আমার অভ্যাস আছে। আমি সেজন্য আপনার কাছে এখন আসি নি। আমি জিমখানায় কাল আপনাকে দেখেছি। দেখেছি, কতো সুখ্যাতি পাচ্ছেন, গলায় কতো মালা পাচ্ছেন! শুনলাম, আপনি নাম-করা লেখিকা। প্রথমটায় ধাক্কা খেয়েছিলাম। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলাম। নইলে আপনার কথাগুলো সবই শোনার ইচ্ছে ছিল। কাল সারারাত ভালো করে ঘুম হয় নি। জানি, এমন রোদ উঠলে সবাই এখানে ব্যালে চলে আসে; আপনিও আসবেন, তাই—

—ভনিতা ছাড়ো। বলতে চাও কী?

সে বললে,—বলতে চাই, আমিও বাঙালী। আমিও—

—থাক।

লোকটির মুখে একটা অদ্ভুত বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো, বললে,—আপনি গল্প লেখেন শুনলুম। সেজন্যই এসেছিলুম। হয়ত আমার গল্প শুনলে—

—কী আবার তোমার গল্প! একটা বদমাইস—শয়তান!

লোকটি চোখ তুলে তাকালো, বললে,—ঠিক। কিন্তু আমাদের শয়তানীর চেহারা যে ঠিক কী রকম, তা জানেন?

—জানতে কী বাকি আছে?—শাশ্বতীর গলা কেঁপে উঠলো,—একটা মেয়েছেলেকে অসহায় পেয়ে—

লোকটির গলায় এবার উত্তেজনার সুর জাগলো, বললে,—আপনি আমার হাতে কামড়ে দিলেন কেন? রক্ত না দেখলে—

বেরিয়ে যাও! লিভ মি এলোন!

লোকটি তবু দাঁড়িয়ে রইলো, বললে,—আপনাকে দার্জিলিঙে দেখবো সত্যি ভাবতে পারি নি!

আমাকে একটু পরেই চলে যেতে হবে, নইলে আরও দু-একটা দিন থেকে যেতুম!

—কেন!

লোকটি এবার আরও একটু সরে এলো, বললে,—দেখা হতো। কথা হতো। আপনি শুনতে চাইছেন না, কিন্তু আমারও ত' কারুর কাছে কিছু বলার দরকার! এভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন কাটাবো? আপনি লেখিকা, আমার কথা শুনলে আপনার নির্ঘাৎ লিখতে ইচ্ছে করবে।

—জানলে কী করে সে-কথা?

—তাই ত' শুনেছি। লেখকরা—

—থাক।

লোকটি খাদের দিকে মুখ ক'রে তাকালো, যেন কিছুটা আত্মগতভাবেই বলতে লাগলো—একটু পরেই শিলিগুড়ি ফিরবো। শিলিগুড়িতে রাতটা কাটানো যাবে না, আবার সেই সীমানা, সেই নেপালের পাহাড় আর জঙ্গল। বলুন দেখি, সারাজীবন শয়তানী না করে করবোটা কী? যেখানে যাই, টিক্‌টিকি পিছনে লাগবে,—টের পেলে অমনি হাতে হাত-কড়া। অনেকদিন ধরে ওটা ঠেকিয়ে রেখেছি।

শাশ্বতী বললে,—আমি থানায় গিয়েছিলাম, তা জানো?

লোকটি বললে,—কেন? এজাহার দিতে?

শাশ্বতী বললে,—এখানে নয়, সীমানায়। ক্রিমিন্যাল লিস্ট দেখলুম, তাতে কোনো বাঙালীর নাম নেই। দাগীদের ফটো দেখলুম, তাতেও তোমাকে খুঁজে পেলুম না! ব্যাপারটা কী? খুব চালাক তুমি, না? খুব ধূর্ত?

লোকটি বললে,—বাঙালীর নাম নিয়ে এখানে চলি না। আর তাছাড়া, আমার কি একটা নাম? কিন্তু আসল কথাটা কী, এজাহার দিলেন?

—রাবিশ!—শাশ্বতী বললে,—এজাহার-টেজাহার নয়—তোমাকে আমি দরকার হলে নিজের হাতে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো!—মনে করো না কেন, আমি নিজেই পুলিশের একটা স্পাই!

লোকটি ঘুরে দাঁড়ালো, বললে,—তাহলে বলুন, শুনুন আমার সব কথা।

শাশ্বতী ধমক দিয়ে উঠলো,—খবরদার! কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করবে না। তোমাদের মতো জীবদের আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আমার সারা শরীরের ঘিন্‌-ঘিনানি এখনো যায় নি।

লোকটি চোখ তুলে তাকালো, একটা বেদনার ছায়া সেই শয়তানী চোখে যেন মুহূর্তে খেলে গেল, তারপরে সে ধীর গলায় বললে,—ঠিক আছে—আমি যাচ্ছি—কিন্তু দার্জিলিঙ ছেড়ে যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার নামটাও কি আপনি জানতে চাইবেন না?

—না-না-না। ফর গডস সেক!

—অথচ, আপনার নামটা কিন্তু আমার জানা হয়ে গেছে,—শাশ্বতী দেবী!

—ইস্! আপনার নামটা জানা হয়ে গেছে!—শাশ্বতী বললে,—ওটা আমার ছদ্মনাম—লেখিকা হিসাবে ঐ নামটা নিয়েছি—তা জানো? আমার নাম—আমার নাম ধরো 'রুণু',—রুণু লাহিড়ী, পারো ত' এই নামটা জপ করো—যাও!

বলে, নিজেই ওর পাশ দিয়ে হন হন করে চলতে লাগলো। চলতে চলতে সেই ইউক্যালিপ্টাসের।

ঘণ্টা দুই পরে হুড়মুড় করে প্রমীলারা হোটেলে পৌঁছলো। সে-ঘরে ঢুকেই বললে,—ওঃ! যা মজা করে আসা হলো না দিদি! একী! তুই শুয়ে আছিস কেন! শরীর খারাপ?

—দূর—শাশ্বতী উঠে বসলো, বললে,—প্লট্ ভাবছি। হ্যাঁরে, নায়িকার নাম 'রুণু' রাখলে কেমন হয়? রুণু লাহিড়ী?

প্রমীলা বললে,—কী প্লট্ তোর কে জানে! কিন্তু 'রুণু' নাম কি নায়িকাদের মানায়? খেলো নাম। অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো শাশ্বতী, বললে,—এই খেলো নামই ভালো। তবে 'লাহিড়ী' পদবীটা মুখ দিয়ে বেরুলো কেন কে জানে!

—কী বক্‌ছিস তুই আবোল-তাবোল!

শাশ্বতী যেন ভাব-ভঙ্গীতে সেই দশ বছর আগেকার মেয়ে হয়ে গেছে, বললে,—হ্যাঁ রে, ছেলে কেমন আমোদ করলে মায়ের সঙ্গে? খুব খুশি ত' মাকে পেয়ে!

—খুশি মানে!—প্রমীলা বললে,—আরও ঘণ্টা দুই ঘোড়ায় চড়িয়ে রাখলে ভালো হতো! ডরোথি টফি দেবে বলে ভুলিয়ে এনেছে। আসতে কি চায়?

—অসীম কী করছে?

প্রমীলা বললে,—অসীমদাকে ঠিক বুঝতে পারছি না! ডরোথি নতুন বউ, কিন্তু কেমন যেন ছাড়ো-ছাড়ো ভাব! অসীমদাও কেমন যেন উদাসীন! ডরোথি বার বার বলতে লাগলো,—তোমার দিদি এলো না! সব আমোদই মাটি! একী তুই কাঁদছিস?

—দূর!—বলে চট্ করে উঠে দাঁড়ালো শাশ্বতী, উঠে আচমকা এসে-পড়া চোখের জল সামলাতেই বোধহয় জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন রোদ পড়ে গিয়ে আকাশটা মেঘলা হয়ে আসছে। কুয়াশায়-কুয়াশায় সব আবার ঢেকে যাচ্ছে!

প্রমীলা কিন্তু চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে রইলো। ছেলে এসে যতক্ষণ না কলরব করে তার ধ্যান ভাঙ্গালো, ততক্ষণ উঠলো না।

বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই প্রদোষ এসে হাজির। বললে,—কী, ফিরবে ত'?

ডরোথি কাছে ছিল, বললে,—না-ই বা ফিরলো! বেশ হৈ-হৈ করে আরও একটা দিন না হয় কেটে যাবে।

প্রমীলা গম্ভীর গলায় বললে,—না, তা হয় না। ছেলে আরও একটা দিন ছুটি নিতে চাইবে। সেটা ভালো দেখায় না। ওদের মাদার সুপিরিয়র রাগ করবে। আমরা যাই, বরং দিদি থাকুক, কেমন?

শাশ্বতী অদূরে শালঝুড়ি দিয়ে ঘেরা ছিল, বললে,—কী রে, ফেলে পালাচ্ছিস আমাকে?

প্রমীলা কাছে এসে পিছন থেকে দু'টি হাত মেলে ওকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরলো, বললে,—তোকে কি এক মুহূর্তও ছাড়তে মন চায়? তবু কেন যাচ্ছি, সেটা নিজের মনেই বুঝে দেখ্।

অবাক হয়ে শাশ্বতী বললে,—কেন!

কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রমীলা ফিস্-ফিসিয়ে বললে,—তোর চোখের জলের মানে কি আমি বুঝিনি? অসীমদা রইলো, বোঝা-পড়াটা করে নিস।

বলেই ওকে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ছেলেমানুষী ভঙ্গীতে দ্রুতপায়ে দরজার দিকে চলে গেল। ঠিক ছোটবেলায় ও যেমন করতো, ঠিক তেমনি। মুহূর্তে সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে গেল, তাই মুখ ফুটে কিছু বলা গেল না, প্রতিবাদও করা হলো না। স্থানুর মতো সে বসেই রইলো শুধু।

ওরা দু'জনে ছেলেটাকে হোস্টেলে রেখে 'সীমানা'য় ফিরে গেল, আর বিকেলে আবহাওয়া ভালো হতে ওরা তিনজনেও বেরিয়ে পড়লো। ডরোথি বললে,—শপিং করবো, অনেক কিউরিও কেনার আছে। তুমি সঙ্গে এসো।

শাশ্বতী বললে,—চলো।

কিন্তু ম্যালে পৌঁছে ওর মত বদলে গেল। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলো ঘোড়ায় চড়ছে, মায়েরা কী বাপেরা বেঞ্চিতে বসে তাদের দেখছে,—চারদিকে রঙের মেলা,—শাশ্বতী বললে,—তোমরা বরং ঘুরে এসো, আমি বসছি।

—একা একা বসে থাকবে?—ডরোথি বললে,—তার থেকে অসীমও বরং বসুক, আমি একাই শপিং করি।

—দূর—তা কী হয়?—শাশ্বতী প্রায় জোর করেই অসীমকে সঙ্গে পাঠালো, বললে,—কতক্ষণই বা? আমি এইখানে বসছি—একটা খালি বেঞ্চিতে। বেশ লাগছে বাচ্চাদের দেখতে।

ডরোথি কী ভেবে আর পীড়াপীড়ি করলো না, অসীমের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ম্যাল ছাড়িয়ে অদৃশ্য হলো, আর শাশ্বতী বসলো একদিকের একটা খালি বেঞ্চির একটা কোণে। কিন্তু খানিকটা পরেই ও চমকে উঠলো। বিপরীত দিকের মাথায় ছাদওয়ালা গোল-মতো বসবার জায়গা থেকে উঠে আসছে সেই দীর্ঘদেহ মানুষটি। তখন ওর পোষাক অন্য রকম। কালো প্যান্টের ওপরে খয়েরী সোয়েটার হাতের কব্জি পর্যন্ত টানা, মাথায় নেপালী টুপি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গি, তাকানোর ভঙ্গি লোকটি লুকোবে কোথায়? ওকে দেখে শাশ্বতী উঠে চলতে শুরু করবে কি-না ভাবছে, লোকটি তার লম্বা বড় বড় পা ফেলে একেবারে কাছে এসে হাজির। ঠিক তেমনি করে বেঞ্চির অন্য পাশে এসে বসে পড়লো। বললে,—শিলিগুড়ি গেলাম না। আমার কেমন যেন মনে হলো, আপনি 'সীমানা'য় ফিরবেন না, থেকে যাবেন। আমিও তাই রয়ে গেলাম। টিকটিকির ভয়ে ভোল পাল্টাতে হচ্ছে। চিনতে পেরেছেন তো?

শাশ্বতীর মুখখানা কঠোর হয়ে উঠলো, বললে,—আমাকে কেন এমন করে বিরক্ত করছো বলো দেখি?

—কেন করছি?—লোকটি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিলো, তারপর বললে,—কেন করছি তা তো বলেছি আপনাকে। আমার জীবনের কাহিনী আপ-নাকে শুনতে হবে।

মাথাটা সজোরে বাঁকিয়ে শাশ্বতী বললে,—না—আমি শুনবো না। এখন যাও এখান থেকে।

লোকটি চুপ করে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। যেন সম্পূর্ণ অচেনা একটি লোক, তারই মতো বাচ্চাদের হুটোপাটি দেখছে।

শাশ্বতীর অস্বস্তি লাগছিল, বললে,—বসে রইলে যে? শুনতে পেলে না আমার কথা?

লোকটি চাপা স্বরে বললে,—শিলি-গুড়ি না গিয়ে কী ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছি, আপনি তা জানেন? কেন নিয়েছি? আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলেই ত'!

—দেখা ত' হয়েছে। এখন যাও।

লোকটি তবু উঠলো না, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে,—আপনি 'সীমানা'য় কবে ফিরবেন?

অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হয়ে শাশ্বতী বলে উঠলো,—ফিরবো না—ফিরবো না—হলো ত'? এখন উঠে পড়ো। ওরা এখুনি এসে পড়বে।

—ওরা কারা? আপনার বন্ধুরা ত'?—লোকটি বললে,—ওরা এলেও কিছু বুঝতে পারবে না। আমি এমন করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবো, ওরা ভাববে, কে জানি কে বসে আছে! না-না—সেটুকু সেন্স আছে, আপনাকে বিপদে ফেলবো না।

শাশ্বতী যেন ক্ষেপে উঠলো কথাটায়, বললে,—লজ্জা করছে না! বিপদে ফেলতে আর বাকিটা কী রেখেছিলে?

লোকটির মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা প্রকাশ পেলো, বললে,—কী মুশকিল, তখন কি আপনার পরিচয় জানতুম! আমি ভেবে-ছিলুম—

চাপা স্বরে গর্জন করে উঠলো শাশ্বতী —একটা বাজে মেয়েছেলে, না?

—ঠিক উল্টো!—লোকটি যে তামাশা করছে না, সেটা ওর বলার ভঙ্গিতেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। ও বলছিল,—ঐ গাছ-পালার মধ্যে বেঞ্চির ওপর চুপ করে বসে-ছিলেন, গায়ে গোলাপী স্কার্ফ,—কী যে সুন্দর লাগছিল আপনাকে! তাই ত'—

—চুপ করো—ইউ ব্রুট্!

বলে, উঠে দাঁড়ালো শাশ্বতী, চলতে লাগলো ম্যাল ছাড়িয়ে বিপরীত দিকে। লোকটিও যে উঠে পিছন পিছন আসছিল সে-বিষয়ে ভুল নেই। এবং হোটেলের রাস্তার মুখে পড়বার আগেই ও এসে ওর সঙ্গ ধরে ফেললো, বললে,—এগিয়ে চলুন না! সেই জায়গায়! মানে—সকালে যেখানে—

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালো শাশ্বতী, তর্জন করে বললে,—ভাবো কী আমায়, অ্যাঁ? কচি খুকী? আবার পা দেবো তোমার ফাঁদে! যাও এখান থেকে!

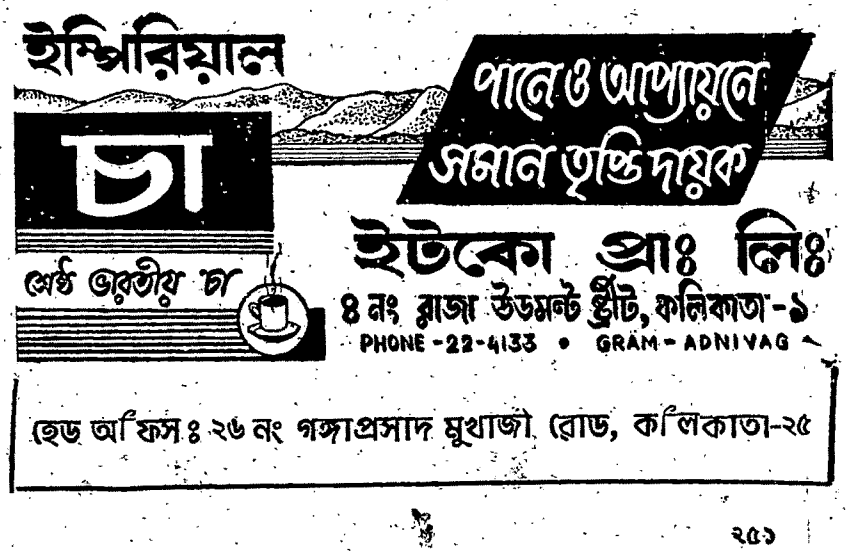

লোকটি কথাটা শুনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। আর শাশ্বতী দ্রুতপায়ে উঠে এলো পথ দিয়ে হোটেলে, একেবারে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা—তিন কোয়ার্টার পরে একরাশ সওদা নিয়ে ফিরলো ডরোথি আর অসীম। ডরোথি বললে,—কোথায় ছিলে? ম্যালে না দেখে ভেবে মরি আর কী! অসীম বললে, হোটেলে চলো, ও বোধহয় ফিরে গেছে, শরীরটা বোধহয় ভালো নেই। সত্যি শাশ্বতী, তোমার শরীর খারাপ?

—দূর!—শাশ্বতী ওদের দেখেই খাটের ওপর উঠে বসেছিল, বললে,—ওসব কিছু নয়।

—যাই বলো, তুমি কিন্তু খুব অন্যমনস্ক,—কথাটা ডরোথিই বললে,—মনে হয় সব সময় কী যেন ভেবে চলেছো।

শাশ্বতী হাসলো, বললে,—ঠিক তাই। দারুণ একটা প্লট্ ভেবে চলেছি।

অসীম আগ্রহের সঙ্গে বললে,—লিখে ফেলো।

শাশ্বতী মন্তব্য করলো,—না, লেখার সময় এখনো আসেনি।

এই কথাটার জের টেনে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ওদের আলাপ-আলোচনা চলছিল। এক সময় ছোট্ট একটা হাই তুলে ডরোথি উঠে দাঁড়ালো, বললে,—আমি শুই গে, ঘুম পেয়েছে। তোমরা গল্প করো।

এবং সত্যিই সে নিজের ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলে। ওরা হোটেলে পার্লারে বসে গল্পগুজব করছিল। ওদের দিকটা শূন্য বললেই চলে, অন্যদিকে কয়েকটি লোক বসে আছে মাত্র।

অসীম বললে,—সত্যি বলছি, তোমার হাত খুব মিষ্টি। যা-ই লেখো, এতো সুন্দর করে লেখো তুমি যে, না পড়ে থাকা যায় না। তোমার এই সৃষ্টিশীল মনটাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। আর জানো, কী প্রচণ্ড আমার প্রত্যাশা তোমার ওপর?

ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে হঠাৎ-ই কেমন যেন আপছাড়াভাবে শাশ্বতী বলে উঠলো,—আচ্ছা, এমন করে আমাকে কলকাতা থেকে টেনে আনলে কেন?

—কোথায় টেনে আনলুম?—অসীম বললে,—মাঝ-পথে ত' নেমেই গেলে।

শাশ্বতী উত্তর দিলো,—না নেমে করি কী? হনিমুনে চলেছো, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি আমি কে?

—এই কথা!—অসীম বললে,—হনিমুন ঠিক নয়, ওটা তুমি ভুল ভেবেছিলে। আসলে কী মনে হয়েছিল জানো? মনে হয়েছিল, আমার জীবনে কোনো উৎসবই তোমাকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। দার্জিলিঙে সদলে বেড়াতে আসা,—এটা আমাদের কাছে উৎসব ছাড়া আর কী!

শাশ্বতী ওর চোখের দিকে তাকালো, বললে,—কলকাতায় তোমাকে দেখে কিন্তু চমকে গিয়েছিলাম। চিঠি নেই, পত্র নেই, হঠাৎ এসে উপস্থিত। বললে,—বিয়ে করেছি, বউ দেখবে এসো। যেন তোমার বউ না দেখা অবধি আমার ঘুম হচ্ছিল না!

অসীম বললে,—না তা নয়—তবে, আমি একটা কিছু পেয়েছি, সেটা তোমাকে যতক্ষণ না দেখাচ্ছি, ততক্ষণ মনটা স্থির হয় কী? পুরোনো দিনের কথা মনে করো না!! প্রাইজ-ট্রাইজ যা পেতাম সবার আগে দেখাতে যেতাম তোমাকে। মনে নেই?

শাশ্বতী মুখ টিপে হাসলো, বললে—খুব মনে আছে!!

অসীম বলতে লাগলো,—আমার বিয়েতে খুব অবাক হয়েছো তোমরা সবাই, তা আমি জানি। কিন্তু ডরোথির সঙ্গে যেভাবে আমার আলাপ হলো, যেভাবে আমরা—

—থামলে কেন, বলো।

অসীম একটু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হেসে ফেললো, তারপর বললে,—সে এক দারুণ কাহিনী। বলতে গেলে সারা রাত কেটে যাবে।

—তা হোক—সারারাত জেগেই না হয় শুনবো।

—হ্যাঁ, তা শোনবার মতো,—অসীম বললে,—তুমি সাংঘাতিক একটা প্লট পেয়ে যাবে—যাকে বলে লেখার খোরাক!

সোজা হয়ে বসলো শাশ্বতী, অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো,—তুমিও প্লট শোনাতে চাও!

নিজের ঝোঁকেই কথা বলছিল অসীম, সে ওর মনের ভাবটা তাই তেমন করে লক্ষ্য করলো না, যদিও কথাটা তার কাণে গিয়েছিল। একটু কাছ ঘেঁষে এসে বললে,—ডরোথি খুব ভালো মেয়ে। আমি যে একটু নিভৃতে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, সেটা বুঝেই ঘুমের অছিলা করে ও ঘরে চলে গেলো।

—নিভৃতে আমার কাছে আর কী তোমার বলার আছে?

অসীম এগিয়ে ওর একটা হাত স্পর্শ করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো সরে বসলো শাশ্বতী। অসীম তাকে ছুঁলে সে যে এরকম অস্বস্তি বোধ করবে, তা সে দু'দিন আগেও জানতো না। নিজের ব্যবহারে নিজেই সে অবাক করে গেল। অসীম কিন্তু আর ওকে ছোঁবার চেষ্টা করলো না, সে ধীর এবং গাঢ় কণ্ঠে বললে,—তুমি আমার যেখানে থাকবার সেখানেই আছো শাশ্বতী। আমি তোমার লেখিকা-মনকে শ্রদ্ধা করি, তাকে সংসারের দৈনন্দিনতার তীরে নামাতে চাই না বলেই দূরে চলে গেছি। এক কথায়, নিজের কাছ থেকে তোমাকে বাঁচাতেই আমি ডরোথিকে—

—থাক—শাশ্বতী উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—এখন কারুর জীবনকাহিনী বা গল্পের প্লট শোনবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। গুড নাইট!

এই বলে, গটগট করে হেঁটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো শাশ্বতী।

পরদিন উঠলো খুব ভোরে। উঠেই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লো। আকাশ মেঘলা-মেঘলা, বাতাসে শীত। লোকজন কেউ বেরিয়ে পড়েনি, যারা না বেরুলে নয়, তারাই বেরিয়েছে। শাশ্বতী ম্যালে না গিয়ে উলটো দিকে চলতে লাগলো। রাজ্যপাল ভবন-টবন পার হয়ে চলছে ত' চলছেই। এমন কি হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পার হয়ে—একটা সুবিধা মতো রাস্তা ধরে সে চলতে লাগলো। কী নির্জন রাস্তা—ঝরা পাতা রাস্তার ওপর পড়ে আছে—একজন বুড়ো ঝাড়ুদার সেগুলো পরিষ্কার করছে। কী ভেবে লোকটা তাকে সেলাম জানালো। তাকে পার হয়ে বনপথ দিয়ে সে বন বন করে চলছে। কেন চলছে, কাকে এড়াবার জন্য ম্যালের বিপরীত দিকে তার এই ছুটোছুটি, তার হদিশ কে দেবে? এ বাঁক সে বাঁক পেরিয়ে সে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। অদূরে রোপওয়ের লোহার দড়ি দেখা যায়, এতো সকালে চালু হয়নি, চালু হলে বাকেটে লোক বসিয়ে দূর পাহাড়ে গিয়ে থামবে। সে যদি বাকেটে বসে সবার নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে কেমন হয়? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে, নিজের মনেই বললে,—বারে, এ পলায়নের চেষ্টাই বা কেন?

বলতে বলতে সে ফিরে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে, চলতে লাগলো হোটেলের দিকে। কিন্তু একটা বাঁক ঘুরতেই—নির্জন পথের ওপর—সেই লোকটার সঙ্গে দেখা। মাথায় টুপি নেই, একরাশ কালো চুল মাথার ওপর এলেমেলো হয়ে আছে, চোখেও নেই চশমা, গায়ে ডোরাকাটা একটা কম্বলের মতো আলোয়ান জড়ানো। তাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে লোকটি বললে,—হোটেলে গিয়েছিলাম। দারোয়ান বললে, দিদিমণি ভোরেই বেরিয়েছেন। তবে, এই দিকেই এসেছেন। আমি তাই হনহন করে—

গম্ভীর গলায় শাশ্বতী বললে,—কিন্তু কেন? এরকম দুঃসাহস কেন যে একেবারে হোটেলে গিয়ে হানা দিচ্ছ?

লোকটি বললে,—না—নিজের কথা

আর বলবো না। যখন শুনতে চান না, তখন বলে আর লাভ কী! আসলে, আজ আমাকে দার্জিলিঙ্ ছাড়তে হবেই। টিকটিকিরা টের পেয়েছে। আর এখানে থাকা ঠিক নয়। শিলিগুড়িই যাচ্ছি, তবে যাবার আগে ভাবলাম, দেখাটা করে যাই। না—দেখাও ঠিক নয়—একটা কথা বলে যাই।

শাশ্বতী চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনো কথা বলছে না। চারদিকে কোনো লোক নেই, সেই ঝাড়ুদারটাকেও কাছে-পিঠে দেখা যাচ্ছে না।

লোকটি বললে,—না জেনে আপনার ক্ষতি করেছি। কিন্তু এর পরে যে কী করা উচিত জানি না। কী করলে আপনার ভালো হয়—উপকার হয়—তা-ও বুঝতে পারছি না। আর আমরাও এমন মুখ্যু-সুখ্যু লোক যে, সব সময় সবকিছু ভেবে কূল পাই না। তার ওপরে পাহাড়ে-জঙ্গলে ক্রমাগত লুকিয়ে থাকতে থাকতে স্রেফ বুনো হয়ে গেছি। অথচ, কিছু ত একটা করা উচিত? আমার কাছে একটা দার্জিলিঙের মালা আছে, নেবেন?

লোকটির কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা ফুটে উঠছিল। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি দুটি হাত এগিয়ে এসে অঞ্জলি পাতলো। নীরব অঞ্জলি। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিলো। সত্যিই এক ছড়া মালা,—ধবধবে সাদা,—মুক্তোর মতো। তার হাতের ওপর ওটা ফেলে দিয়েই লোকটি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রোপওয়ের পথের দিকে। বললে,—এইদিক দিয়ে-বড়ো রাস্তায় নামবো, সেখান থেকে বাজার। বাজার থেকে সোজা শিলিগুড়ি।

হাত উঠিয়ে বিদায়ের ভঙ্গিতে লোকটি সত্যিই চলে গেল। বাঁকের মুখে তার দীর্ঘ শরীরটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

মুক্তোর মতো সাদা মালাটা অসীম ডরোথিকে দেখালো না, তাড়াতাড়ি এসে ব্যাগে লুকিয়ে ফেললো। অসীম চায়ের টেবিলে বললে,—তোমার বেড়াবার নেশা বুঝি দারুণ?

শাশ্বতী সে কথার জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো। বললে,—অসীম, আমি 'সীমানা'য় যাবো, আজই। বাস যায় আমি জানি, আমার কোন কষ্ট হবে না। অনুমতি করো, আমি যাই, কেমন?

ডরোথি বললে,—সে কী! আমাদের সঙ্গে থাকবে, কথা হলো না? আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরবে, কথা হলো না?

—না ভাই, সে কথা রাখতে পারছি না আমাকে যেতেই হবে,—বলতে বলতে অসীমের দিকে ফিরে তাকালো শাশ্বতী, বললে,—ওকে একটু বুঝিয়ে বলো না? আমার প্লট মাথায় এসেছে, আমি লিখবো।

অসীম কোমল কণ্ঠে বললে,—এখানেও ত লিখতে পারো শাশ্বতী, কেউ তোমায় ডিস্টার্ব করবে না।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো শাশ্বতী,—না-না, তা হয় না,—আমাকে যেতেই হবে।

এবং সত্যিই ওকে রাখা গেল না। অসীম বললে,—চলো, আমরাই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

'আমরা' বলতে অসীম যা বোঝাতে চাইছিল, কার্যক্ষেত্রে তা হলো না। ডরোথি গেল না, সে শুধু মুখ ভার করে বললে,—কতো ঘোরাঘুরির প্ল্যান নিয়েছিলুম তোমাকে নিয়ে! কালিম্পঙ যাবো, মংপু যাবো,—কিছুই হলো না।

—তোমরা যাও, ঘুরে এস।

অসীমের সেই বন্ধুটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন,—তা কি হয়? আপনি গেলে কতো ভালো লাগতো!

কিন্তু তা-ও হলো না। কে যেন শাশ্বতীকে তাড়া করে ফিরছিল, তাকে প্রমীলাদের কাছে ফিরতেই হবে। রওনা হবার সময় ডরোথি দুটি পাথরের মালা দিলো, বললে,—লাভলি, তাই না! একটি তুমি নেবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ নীলটা—ওটা তোমার! আর সবুজ-মেরুনে মেশানো যেটা, সেটা দেবে তোমার বোনকে। আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার!

ভাড়া করা জীপ। শুধু অসীম আর শাশ্বতী। ঘেঁষাঘেঁষি করে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসা। 'ঘুম' ছাড়িয়ে রওনা হবার পর অসীম কথা বললো। বললে,—আমার ইচ্ছে, একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই ফিরবো। ক'দিন অপেক্ষা করবো দার্জিলিঙে, বলো?

—আগে কালিম্পঙ-মংপু-এসব ঘুরিয়ে এসো।

—তা না হয় এলাম—তারপর?

—তারপর জানি না। ফিরে ত এসো, তখন দেখা যাবে।

অসীম ওর হাত ধরবার চেষ্টা করলো না, শুধু বললে,—তোমার জায়গা আমার জীবনে যেখানে থাকবার, সেখানেই আছে।

কথাটা শুনে হাসি পেলো শাশ্বতীর। সে সেটা গোপন করে বলে উঠলো,—আমারও সেই কথা। নাও, হলো ত?

অসীম কিছু বললো, ওর হাতখানা শাশ্বতীর হাতের ওপর এসে পড়লো। হাতটা টেনে নিলো না শাশ্বতী, কিন্তু তার মনে হতে লাগলো, হাতটা যেন বরফ হয়ে গেছে, ওতে কোনো আর সাড় নেই।

আবার 'সীমানা'। 'লাঞ্চ' দার্জিলিঙেই সারা হয়ে গিয়েছিল। অসীম তাই একটু চা পান করে বিদায় নিলো। প্রমীলা ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বললে,—কেমন কাটালি, অসীমদার সঙ্গে, বল?

কথাটার সরাসরি উত্তর না দিয়ে ব্যাগ থেকে মালা দুটো বার করলো। বললে,—ডরোথি দিয়েছে। এটা তোর, নীলটা আমার।

—হাউ লাভলি!—বলে মালাটা গলায় পরে ফেললো প্রমীলা। বললে,—তোরটাও পর না? দেখি?

পরে হবে'খন,—বলে নীল মালাটা রেখে দিয়ে সাদা মালাটা বার করলো শাশ্বতী, বললে,—এই দেখ—আরও একটা।

—দেখি-দেখি—অসীমদা দিয়েছে বুঝি!—প্রমীলা তাড়াতাড়ি ওটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেখতে লাগলো। 'অসীমদা' কথাটা কানে যেতেই শাশ্বতীর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছিল, বললে,—যাই হোক, তুমি আবার পাঁচ কান করতে যেও না, প্রদোষকেও বলো না। বুঝলে?

অবাক হয়ে মালাটা দেখছিল প্রমীলা। শাশ্বতী বললে,—মালাটা কী রকম দেখেছিস! ঠিক যেন মুক্তো! পাথর, অথচ

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

অভিজাত মশারি বিক্রেতা

পান্না মশারি ষ্টোর্স

২৩৫, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৭

পাথরের মতো ভারী নয়?

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রমীলা বললে,—কী বলছিস তুই! এ পাথরই নয়! এ মুক্তোর মালা—না-না, নয়—মুক্তো আমি চিনি—এ আসল মুক্তো। কম করে পাঁচ হাজার টাকার কম নয়। করেছিস কী? দারুণ জিনিস হাতিয়েছিস ত'।

অস্ফুট গলায় শাশ্বতী বলে উঠলো,—হাতিয়েছি!

—ঐ হলো,—প্রমীলা বললে,—আমি খুব খুশি হয়েছি। দেখ, অসীমদার জীবন থেকে তোর মূল্য কমে যায়নি। কেন যে হট্ করে বিয়ে করতে গেল জানি না, পুরুষের মন এমনিতেই চঞ্চল,—কিন্তু তোকে সে কতখানি ভালবাসে বল্ দেখি? না-না—দার্জিলিঙের জিনিস এ নয়—কলকাতা থেকে এনেছে—এখানে এসে দার্জিলিঙ পাহাড়ে বসে তোর গলায় দুলিয়ে দেবে বলে। সত্যি দিদি অসীমদা চিরকালই দারুণ রোমান্টিক।

—আরও একটা জিনিস আছে, দেখবি?

বলে উঠে বাক্স খুলে সেই ঘড়িটা নিয়ে এলো, বললে,—এই দ্যাখ্!

ঘড়িটা দেখে যেন লাফিয়ে উঠলো প্রমীলা,—ওরে ব্বাস! ফরেন ঘড়ি—অটোম্যাটিক—এরও সাংঘাতিক দাম! আর কী চাই দিদি? তোর প্রেমের মূল্য ত' বলতে গেলে একভাবে পেয়েই গেছিস!

শাশ্বতী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো, চাপা গলায় কোন্ রকমে উচ্চারণ করলো,—প্রেমের মূল্য!

—নয় ত' কী?—প্রমীলা বললে,—উপহারগুলো ত' প্রতীক! ভালো না বাসলে কেউ কি এমন সব দামী জিনিস এক কথায় উপহার দিতে পারে! একদিক থেকে দেখতে গেলে, তুই ভাগ্যবতী! নাই বা পেলি কাছে, সারা জীবন ত' এইভাবে পূজো পেয়ে যাবি!

পূজোই বটে!—পরদিন ভোরবেলায় পথ হাঁটতে হাঁটতে বোনের মুখের কথাটাই ভাবছিল শাশ্বতী। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরেই চলে গেল। সেই জঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়ালো। পাহাড়ের চূড়োটা দেখা যায়,—কিন্তু ওদিকে যেতে আজ মন চাইলো না, ধীরে ধীরে ফিরে এলো বাড়িতে। ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে ডায়েরী লেখবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সাদা পৃষ্ঠা সাদাই রয়ে গেল, কালির একটা আঁচড়ও পড়লো না।

প্রমীলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একটু চমকে উঠলো শাশ্বতী, তারপরে বললে,—সত্যি, দারুণ জায়গাতেই তোরা থাকিস! ভারী সুন্দর—প্রশান্ত জায়গা—দার্জিলিঙের হৈ-হট্টগোল নেই!

প্রমীলা বললে,—কিন্তু দিদি, দিনের পর দিন হৈ-হট্টগোল ছাড়া বাঁচতে পারে মানুষ? হাঁপ ধরে যায় না?

শাশ্বতী বললে,—কে জানে! আমার মনে হচ্ছে এখানে আমি অনন্তকাল থাকতে পারি।

প্রমীলার গলার স্বরে আন্তরিকতার সুর ঝরে পড়ছিল, বললে,—তাই থাক না দিদি—অনন্তকাল না হোক—যতদিন ইচ্ছে তুই থাক।

শাশ্বতী হাসলো, বললে,—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আরও দিন-সাত-আট থাকা যেতে পারে। ওরা কালিম্পঙ-সংপু এসব ঘুরে বেড়াক ততদিন।

—একসঙ্গেই ফিরবে?

—সেটা ভালো না?

প্রমীলা এক মুহূর্ত থেমে কী যেন চট্ করে ভেবে নিলো, বললে,—সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার ত' মন চায় তোকে ধরে রাখতে।

শাশ্বতী একটু হাসলো এবার, কিছু বললে না। পরদিন ভোরবেলা অনির্দিষ্টভাবে হাঁটছিল শাশ্বতী, পিছন থেকে একটা জীপের আওয়াজ শুনে পথের পাশে সরে দাঁড়ালো। জীপটা পাশে এসে ব্যাচ করে থামলো, আর তার পরেই ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে প্রায় লাফ দিয়েই নেমে দাঁড়ালো দীর্ঘদেহী সেই লোকটি, গায়ে ওভারকোট, মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট। নেমেই ইঙ্গিত করলো ড্রাইভারকে, ড্রাইভার হুস্ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন নয়, অদূরে সেই তরুণী মেয়েগুলি পাথর ভাঙছে।

লোকটি বললে,—এইমাত্র শিলিগুড়ি থেকে ফিরছি।

শাশ্বতী মুহূর্তকালের জন্য ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলো। লোকটিও হাঁটা শুরু করলো ওর পাশাপাশি। বললে,—দেখা হবে আশা করিনি। নানীর হোটেলে আজ থাকবো, বুক্ করেছি। কাল পাআবো আবার জঙ্গলে—পাহাড়ে। পুলিশের সঙ্গে এই রকম লুকোচুরি খেলে কাটাতে হবে সারাজীবন।

শাশ্বতী চুপ করে হাঁটছিল। লোকটি পাশাপাশি চলতে চলতে বক্‌বক্ করছিল,—নানীর হোটেলের সামনে নামতে গিয়ে হঠাৎ দূরে আপনাকে দেখতে পেলাম। চলার ভঙ্গিতে মনে হলো, এ আপনি ছাড়া কেউ নন। সেই গোলাপী স্কার্ফটাই আজ গায়ে রয়েছে।

শাশ্বতী এই সময় আচমকা প্রশ্ন করলো,—ঐ মুক্তোর মালাটা কোথায় পেয়েছিলে?

—মুক্তোর মালা!—লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ে একটু অবাক হয়েই কথাটা উচ্চারণ করলো, তারপরে বললে,—ও হ্যাঁ, ওটা আমার কাছে ছিল।

—আর সেই ঘড়িটা?

লোকটি মাথার টুপি খুলে হাতে নিলো, বললে,—হ্যাঁ, ওটাও ছিল।

—এ সবই বুঝি স্টকে থাকে?

টুপিটা মাথায় পরতে পরতে লোকটি বললে,—হ্যাঁ—তা থাকে।

—এখন কোথায় যাবে?

—এখন?—লোকটি বললে,—নানীর দোকানে চা খাবো। গলা শুকিয়ে কাঠ।

—যাও, চা খাও গিয়ে। লিভ মি এলোন—প্লিজ!

লোকটি থমকে দাঁড়ালো, বললে,—কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায়? ঐ পাহাড়ে গিয়ে উঠবেন নাকি?

মুখখানা গম্ভীর করে শাশ্বতী দৃঢ়-কণ্ঠে বললে,—হ্যাঁ।

বলেই চলতে লাগলো। পাহাড়ে ওঠার তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঝোঁকের মাথায় সে ঐ মন্তব্য করে ফেলেছে। এখন এমন অবস্থা, যেন সত্যি সত্যি পাহাড়ে না উঠলে আর মান থাকে না।

লোকটি কী ভেবে 'সুনুন' বলে আবার পিছন থেকে ছুটে এলো। যেন হাঁপাচ্ছে। চাপা গলায় বললে,—যাবেন না ওখানে। আসলে ওটা অজে জায়গা। কোনো ভদ্র মেয়ে ওখানে—

—স্যাট-আপ! ভদ্র-অভদ্র তোমাকে শেখাতে হবে না। আমি যাবোই।

লোকটি তবু নাছোড়বান্দা,—এইখানেই ত' আপনারা ভুল করেন। ভুল করে আমাদেরও ভুলের মধ্যে ফেলে দেন। দোহাই আপনার, যাবেন না ওখানে!

—কেন, তোমার মতো শয়তান আরও আছে নাকি!

লোকটি এ-কথায় হাসলো, বললে,—পৃথিবীতে শয়তানের অভাব!

শাশ্বতীর মুখের ভাবটা শক্ত, যেন একটা জেদ চেপে গেছে তার। বললে,—তা হোক, তবু যাবো। দেখি, শয়তানদের শয়তানি কতদূর যেতে পারে।

বলে চলতে আরম্ভ করতেই, লোকটি হঠাৎ খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরলো,—না রুণা দেবী—

হাতটা সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে শাশ্বতী ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো, চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে,—আমার হাত ধরো তুমি কোন্ সাহসে, অ্যাঁ?

লোকটি মাথা নিচু করলো, বললে,—কী করবো? এমন নাছোড়বান্দা লোক আপনি। আপনাকে বলছি না ওটা বাজে জায়গা! বাজে মেয়েছেলেরা ওখানে যায়! ওখানে মেয়ে দেখলেই লোকে মনে করবে—

—বেশ তো।—শাশ্বতর যেন রোখ চেপে গেছে,—ব্যাজই মনে করুক মা।—তোমার তাতে কী?

লোকটি বললে,—তাহলে আপনি যাবেনই?

—হ্যাঁ।

—আমাকেও তাহলে সঙ্গে যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলো শাশ্বতী,—না—যেতে হবে না তোমাকে—শয়তান কোথাকার।

লোকটি তবু রাগ করলো না, বললে,—শয়তানকে শয়তান বললে তার গায়ে লাগে না, জানেন তো! কিন্তু দোহাই আপনার, ফিরে চলুন। আমাকে আর পাহাড়ে ওঠাবেন না, আমার এক কাপ চা এখন না খেলেই নয়।

শাশ্বতী দাঁড়িয়ে পড়লো, বললে,—যাও, চা খাও গিয়ে। আমাকে পাহারা দিতে হবে না। আমি তোমার কে যে, পাহারা দেবে?

—কেউ না, কিন্তু খামোকা বিপদে পড়েন, এটাও আমি চাই না।

দাঁতে দাঁত চেপে শাশ্বতী বললে,—ঠিক আছে। পাহাড়ে যাবো না। যাও এখন এখান থেকে। তোমার ছায়া মাড়ানোও পাপ!

লোকটি এসব কথা গায়েও মাখলো না, আবছা একটু হাসলো, যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, তারপরে বললে,—যাক বাবা, বাঁচলুম! মেয়েছেলের এরকম গোঁ জন্মে দেখিনি।

বলে পিছন ফিরে পা বাড়াতেই শাশ্বতী বলে উঠলো,—শোনো!

লোকটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শাশ্বতী বললে,—নানীর হোটেলে এখন থাকবে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—যাও ওখানে, আমি আসছি।

লোকটি এতো অবাক হলো যে, কী করবে ঠিক করতে না পেরে মাথার টুপিটাই হট্ করে খুলে ফেললো। যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, বললে,—কী বললেন?

শাশ্বতীর মুখ তেমনি গম্ভীর, বললে,—যা বলেছি নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছো। দু-বার করে কথাটা বলতে চাই না। যাও। শীগ্‌গির পালাও এখান থেকে।

লোকটি হতভম্বের মতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো, তার পরে মাথায় টুপি পরতে পরতে বললে,—আপনি কোন্ পাড়ীতে, কার বাড়ীতে উঠেছেন আমি শুনেছি—ঐ নানীর কাছ থেকেই শুনেছি।

—নানী! নানী বুঝি তোমার চেনা?

—নানী এ অঞ্চলে সবার চেনা।

—নানী তোমাকে চেনে? তোমার পরিচয় জানে?

নিউ প্রভাস অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ ফোন ৫৫-৫৭৮৭

স্বত্বাধিকারী · দীনবন্ধু গুছাইত

পৃষ্ঠপোষক · গৌরমোহন ও নিত্যানন্দ গুছাইত

উপদেষ্টা · কমল চ্যাটার্জী ও তিনকড়ি গুছাইত

১৩৮৪'র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

রচনা ও পরিচালনা
শৈলেশ গুহনিয়োগী

সুর
রঘুনাথ দাস

গীত
সমরেন্দু ঘোষ

কুণাল মুখার্জী রচিত ও পরিচালিত

গীত অজাতশত্রু সুর পশুপতি ভট্টাচার্য

রূপায়ণে

আলিবাবা · সমীর লাহিড়ী (হো-চি-মিন খ্যাত)
আবদাল্লা · শ্যামসুন্দর গোস্বামী
তপনকুমার · প্রশান্তকুমার
নন্দদুলাল চ্যাটার্জী · তারক প্রামাণিক
সন্তোষ হালদার · শৈলেন ঘোষ · গোপাল ব্যানার্জী
খোকন ব্যানার্জী · জ্যোতি বর্মণ · চঞ্চল ভট্টাচার্য
শুকদেব চক্রবর্তী · রিক্তা ঘোষ · কুমারী রিঙ্কু
নমিতা বিশ্বাস · সুতপা সেনগুপ্ত · কানন মুখার্জী
মর্জিনা · কনকলতা

যন্ত্রী সংঘ

হরিদাস নট্ট · বীরেন বেরা · হিরণ নন্দী · সুধীর আডিড
পার্থসারথী · অনিল পাল · জীবন নন্দী · অমর গাঙ্গুলী

নৃত্য পরিকল্পনা কেনেথকুমার · ম্যানেজার বিশ্বনাথ চৌধুরী
সহঃ ম্যানেজার শম্ভু দে · ভীম প্রামাণিক সুপারভাইজার শিবনাথ পাল
আলোক সম্পাতে সাবী পাল · নিতাই দাস আলোক নির্দেশক আজাতশত্রু ও
সেরক প্রসাদ কার্যাধ্যক্ষ ভৈরবচন্দ্র জেঃ ম্যানেজার রমেন বসু মল্লিক

লোকটি হাসলে,—এতো নীচ কাজ ও শমা করে না। নানী জানে আমি একজন মাইনর, ছোট-খাটো ব্যবসা-ট্যবসা করি, ব্যবসার জন্যেই মাঝে মাঝে হঠাৎ চলে আসি। কিন্তু সে যাক, আপনি হোটেলে আসবেন কেন? আমি বরং চা খেয়ে আপনার বাড়িতে আসছি—

—না!—শাশ্বতীর কণ্ঠে আবার ধমকের সুর,—আর কথা বাড়িয়ো না। যা বললাম তাই করো গিয়ে। যাও! আমি হোটেলেই যাবো।

লোকটি চলে গেল।

শাশ্বতী রাস্তা ধরে আরও খানিকক্ষণ বেড়ালো, তারপরে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরলো। বাড়িতে প্রদোষের সঙ্গেই আগে দেখা। সে কারখানায় বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সে হেসে বললে,—দিদি, আজ লেট, এক সঙ্গে চা খাওয়াটা হলো না।

শাশ্বতীও হাসলো, বললে,—বিকেল-বেলা দু-কাপ খেয়ে পুষিয়ে নিয়ো।

—তাই নেবো,—বলে প্রদোষও হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ওপরে উঠে প্রথমেই যে প্রমীলার সঙ্গে দেখা হলো না, তাতে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। প্রমীলা বোধহয় বাথরুমে। শাশ্বতী ঘরে ঢুকে তার ব্যাগের মধ্যে সেই অটোম্যাটিক ঘড়ি আর মুক্তোর মালাটা চট্ করে পুরে নিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল। নিচে নামতেই কাশি বললে,—চা খাবেন না?

—খাবো। আমি আসছি এখুনি।

ওখান থেকে নানীর হোটেল কাছেই। কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে। দু-তিনটি নেপালী মেয়েও আছে। ওকে দেখে তারা একটু অবাকই হলো। নানীর মুখে সেই পরিচিত স্মিত হাসি। একটু এগিয়ে যেতেই পর্দা ফেলা একটা কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো সেই লোকটি, বললে,—আসুন, একটু চা খাবেন তো।

—না। তোমার কামরাটা কোথায়?

—ওপরে।

—চলো।

—তার মানে।

—তার মানে কিছু নয়—তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে—শাশ্বতী বললে, চাপা উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছিল, —একটা ফয়সালা হয়ে যাক—নইলে, দুনিয়ার যেখানে পালাই, তুমি যে আমার আর পিছু ছাড়বে না তা জানি।

লোকটির মুখখানি এবার অভাবিত গম্ভীর দেখালো, বললে,—কিন্তু তা বলে এই বাজে হোটেলে আমার সঙ্গে একটা কামরায় আপনাকে ঢুকতে হবে না। আসুন —এই কেবিনের মধ্যে—কী বলার আছে শুনি।

লোকগুলোর কৌতূহলী চোখ এড়াবার জন্যই রাজী হলো শাশ্বতী। ওরা একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকলো, লোকটি পর্দা টেনে দিলো। ওর সামনে কিছু বিস্কুট, কেক আর খালি চায়ের কাপ। মুখোমুখি বসে লোকটি বললে,—খাচ্ছিলুম আর চোখ রাখ-ছিলুম রাস্তার দিকে। বিশ্বাস করবেন? এটি পাঁচ নম্বর কাপ।

—ভনিতা থাক—শাশ্বতী ব্যাগ থেকে ঘড়ি আর মুক্তোর মালাটা বার করলো, ওর সামনে রেখে বললে,—এইগুলো পকেটে পোরো।

—ফেরত দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ফেরত দেবো না তো কী করবো? ওগুলোতে যে আমার কত বড় অপমান, তা জানো না?

লোকটির মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়লো, তারপরে ও-গুলো ধীরে ধীরে পকেটে পুরে নেবার পর বললে,—জানি না মান-অপমান আপনাদের কীসে, কিন্তু ওগুলো কাছে যদি রাখতেন ত' ভালো হতো।

—কেন?

লোকটি বললে,—মনে একটু—যাকে বলে—সুখ পেতাম।

—মন?—তাচ্ছিল্যের হাসির একটা রেখা ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে শাশ্বতী বললে,—মন তোমাদের আছে নাকি?

লোকটি যেন কথাটা শুনে ছট্‌ফট্ করে উঠলো ভিতরে-ভিতরে, অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গিতে বলে উঠলো,—কী যে আমাদের আছে—আর কী যে নেই—তা কি আমরাই জানি? সেজন্য ত' বলছিলুম, আমার কথাগুলো আপনি শুনুন—জন্তুর মতো এরকম তাড়া খেয়ে খেয়ে আর বেড়াতে পারছি না।

শাশ্বতী বললে,—সারেন্ডার করছো না কেন?

যেন চাবুক খেলো লোকটি, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো,—মানে!

থানায় গিয়ে সারেন্ডার করাই উচিত।

—কিন্তু কেন করবো?—লোকটি টেবিল চাপড়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, —ক' বছরের জন্যে ফাটকে পচতে হবে তা জানেন?

অমন করে তাড়া খেয়ে বেড়ানোর থেকে সে অনেক ভালো।

খুব বললেন! লোকটা ঠোঁট উল্টে একটা বিসদৃশ ভঙ্গি করলো,—জেল যে কী জায়গা তা ত' জানেন না!

—কিন্তু যা তুমি করেছো, জেলে যাওয়াই তোমার উচিত!—শাশ্বতী চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—আমি যে জ্বালায় জ্বলছি তা তোমায় কী বলবো! এই ইত্রিশ বছর বয়সের জীবনে এমন অশুচিতা, এমন গ্লানি আমি কখনো অনুভব করি নি। আমার সারা গায়ের ঘিন্‌ঘিনানি আজও গেলো না—মনে হয় সারা দেহটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে পারলে শুদ্ধ হতাম! তুমি আমার যে কী সর্বনাশ করেছো শয়তান, তা তুমি নিজেও জানো না! তার উপর ঐ ঘড়ি আর ঐ মালা! ও-গুলো যে চরম অপ-মানের চাবুক, তাও তোমার বুঝবার ক্ষমতা নেই।

ধীর, ঠাণ্ডা গলায় লোকটি বললে,—কী করলে আপনি শান্তি পেতে পারেন, আমায় বলবেন কী?

শাশ্বতী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো, বললে,—আমার শান্তির জন্য যদি সত্যিই মাথাব্যথা তোমার এক মুহূর্তের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে থানায় গিয়ে তুমি সারেন্ডার করবে। তোমার অনেক-অনেক বছরের জন্য জেল হয়েছে শুনলে আমার আত্মা বোধহয় তৃপ্তি পাবে। শয়তান, তুমি জানো না, তুমি আমাকে স্বপনে-জাগরণে দিনরাত জ্বালিয়ে মারছো! এতো ঘৃণা! এত ঘৃণা যে মানুষ মানুষকে করতে পারে তা আমি নিজেও কখনো জানতুম না।

লোকটি যেন সারা মন-প্রাণ দিয়ে ওর কণ্ঠস্বর শুনছিলো। ওর কথার পর ধীর ঠাণ্ডা গলায় সে বললে,—আর ধরুন যদি আমার ফাঁসি হয়?

—হওয়াটাই ত' উচিত!—শাশ্বতী প্রায় চিৎকার করে উঠলো,—তোমার না হলে আমার হবে। আমাকে আত্মহত্যা করে শরীর জুড়োতে হবে।

লোকটির গলার স্বর তখনো আশ্চর্য-রকম ঠাণ্ডা। বললে,—বসুন-বসুন— খামোকা চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছেন কেন? যে-সব কথা বললেন, ওতে আমরা শয়তান, আমাদের মন টলে না। আপনার কথায় আমরা জেলেও যাবো না—ফাঁসিতেও লটকাবো না। তবে আপনি দারুণ জেদী লোক, জেদ করে যেন সত্যিই—ঐ যে কী বললেন—'আত্মহত্যা' না কী,—ওটা করতে যাবেন না,—ভীষণ ছেলেমানুষী হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে—তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না,—শাশ্বতী ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললে,—আমি চললুম।

লোকটি উঠে দাঁড়ালো,—বললে, যান, কিন্তু আমার মনে হয়, একেবারে কলকাতা আপনার চলে যাওয়া ভালো। অবশ্যি লুকিয়ে-চুরিয়ে আমিও কলকাতা গিয়ে হাজির হতে পারি! এ-রকম রিকস্ নিয়ে আমি দু-একবার গেছি, তা কেউ টের পায়নি।

শাশ্বতী ওর চোখের দিকে তাকালো, —কলকাতায় আমার সামনে আসবার তোমার সাহস হবে না। তোমাদের জারিজুরি এই নির্জন পাহাড়-পর্বতেই। কাপুরুষ কোথা-কার!

শেষের কথা চাপা স্বরে বলেই শাশ্বতী গটগট করে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কে তাকে দেখছে, কে তাকে কী ভাবছে,—সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করলো না। ঐ মালা-টালাগুলো যে লোকটিকে সে দিতে পেরেছে,—এতেই তার বুকের বোঝা হালকা হয়ে গেছে। এখন বোধহয় সে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে,—কালিম্পঙ-মংপু—সব সে মুক্ত মনে অসীমদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

বাড়ি ফিরে বাস্তবিকই শাশ্বতী যেন মুক্তবিহঙ্গিনী হয়ে গেল। প্রমীলাও অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে। সেই ছোটবেলায় দিদি যেমন হাসিখুশি ছিল, কাছে ডেকে বানিয়ে বানিয়ে মজার মজার গল্প করতো, ঠিক তেমনি মনে হতে লাগলো ওকে। আর সেই খুশির ছোঁয়াচ ছোট বোনকে যে সহজেই স্পর্শ করবে, এতে আর আশ্চর্য কী!

প্রমীলা ওকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো,—আজ তোকে দারুণ ভালো লাগছে রে দিদি!

শাশ্বতী বললে,—আসল কথা তোদের এই জায়গাটি! এর আকাশে-বাতাসে যেন যাদু আছে! সত্যিকার ছুটির বাঁশি বুঝি এখানেই বাজে!

প্রমীলা বললে,—কিন্তু প্রথম থেকেই দিদি তুই খুব গম্ভীর ছিলি! কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া তোকে ঘিরে রেখেছিল! কেমন যেন মনমরা। এমন কি, তোকে বলিনি, তুই ভগ্নীপতি পর্যন্ত এটা লক্ষ্য করেছিল, বলেছিল,—দিদি যেন মূর্তিমতী বিষাদ!

হেসে উঠলো শাশ্বতী, মুখখানা হাসতে হাসতে আরক্ত হয়ে উঠলো, বললে,—দূর! কী যে বলিস তোরা!

প্রমীলা গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললে,—অসীমদার সঙ্গে তোর যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে, এতেই আমরা খুশি। তবে অসীমদা হুট করে ঐ বিয়েটা না করলেই পারতো।

শাশ্বতীর মুখে বিষাদের কোনো চিহ্ন নেই, সে বললে,—উল্টো বলবো, ভালোই করেছে, ডরোথির মতো মেয়ে হয় না।

—দুপুরে প্রদোষ খেতে এলো। হাসি-ঠাট্টায়, গল্প-গুজবে চমৎকার সময়টা কাটতে লাগলো। প্রদোষ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বললে,—দিদি যেন অন্য মানুষ, তাই না?

প্রমীলার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে,—এইটাই দিদির আসল রূপ। আমি ত' ওকে চিনি!

কিন্তু বিকেলে প্রদোষ একটু আগে-আগেই বাড়ি ফিরলো, গম্ভীর তার মুখ। দুই বোনে তখন একান্তে বসে গল্প করছিল, তার মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে,—থানায় একটি ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে। লোকটি কী করেছে জানো? থানার অফিসার মিঃ প্রধান আমাকে জানালেন, লোকটি আমাদের বাড়ির নাম করেছে। বলেছে,—এই বাড়ীতে এক মহিলা এসেছেন, রুণু লাহিড়ী তাঁর নাম। মুখের সব রক্ত যেন শুষে নিয়েছে শাশ্বতীর, সে প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারলো না। আর প্রমীলার মনে খক্ করে উঠলো নামটা। দার্জিলিঙে তার দিদিই বলেছিল এই নামটা। বলেছিল গল্পের প্লট। গল্পের প্লট যদি হবে, তাহলে সে-নামটা তৃতীয় ব্যক্তি জানলো কী করে? প্রমীলা দিদির দিকে তাকালো। শাশ্বতী উঠে দাঁড়ালো, বললে,—থানায় একবার যেতে পারি?

প্রদোষ বললে,—আপনি যাবেন? না-না—আমার মনে হয় কোনো একটি ভুল হয়েছে—এ-বাড়িতে রুণু লাহিড়ী বলে কোনো মহিলা নেই। কিন্তু এই নামের বাঙালী মহিলা অন্য বাড়িতেই বা কোথায়? যাই হোক, প্রধান খবর পাঠিয়েছেন, আমি একবার থানায় যাচ্ছি। লোকটিকে চাক্ষুষ দেখে আসি। শাশ্বতীর মুখের বর্ণ তখনো স্বাভাবিক হয়নি, তখনো সারাটা দেহ যেন থরথর করে কাঁপছে, কোনক্রমে বললে,—থানায় এজাহার দিয়েছে লোকটি!

—তা দিয়েছে বৈ কী?

শাশ্বতী চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললে,—কী বলেছে!

—সেটা ওখানে গেলেই জানতে পারা যাবে। কিন্তু দিদি, আপনি—

শাশ্বতী বললে,—লেখকের কৌতূহল! চলো যাই।

বলা বাহুল্য, প্রমীলাও ওদের সঙ্গী হলো। বেশি দূরে নয়, কয়েক মিনিটের মধ্যেই জীপ্ গিয়ে পৌঁছে গেল। শাশ্বতী মনে মনে জানে, লোকটি কী এজাহার দিয়েছে! এখুনি বোনের কাছে, ভগ্নীপতির কাছে—তার সমস্ত সঙ্কোচ আর সম্ভ্রমের আবরণ খসে পড়বে! সেই পর্বত-চূড়ার চূড়ান্ত কাহিনী এর পর লোকের মুখে মুখে ফিরবে,—হয়ত কাগজে-কাগজেও ছাপা হবে ফলাও করে। লোকসমাজে দুঘট হবে তার মুখ দেখানো। কিন্তু ঐ শয়তান লোকটির আচরণও অদ্ভুত! তার কথায় সত্যিই সে থানায় এসে সারেণ্ডার করেছে নাকি?

থানায় মিঃ প্রধান ওদের সমাদর করে বসালেন, বললেন,—হ্যাঁ, লোকটি নিজে এসেই সারেণ্ডার করেছে!

—কী নাম?

—বাহাদুর সিং।

প্রদোষ প্রশ্ন করলো,—বাঙালী নয়?

প্রধান বললেন,—চেহারা বাঙালীর মতো, কিন্তু বাংলা জানে না, নেপালী। ক্রিমিনাল-লিস্টে ওর নাম রয়েছে,—বাহাদুর সিং। পয়লা নম্বরের স্মাগলার। পুলিশ খুঁজে খুঁজে হন্যে হচ্ছিল।

প্রদোষ অবাক হয়ে বললে,—সেই লোক এসে নিজে থেকে সারেণ্ডার করলো? কোথায় রেখেছেন তাকে?

—যেখানে কয়েদীদের রাখা হয়—লক্-আপে।

শাশ্বতী সোজা হয়ে বসলো, বললে,—কী এজাহার সে দিয়েছে শুনতে পারি?

মিঃ প্রধান বললেন,—চুরি।

বলে, প্রদোষের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন,—আপনার বাড়ির ঠিকানা বললে। বললে,—ওবাড়ির রুণু লাহিড়ীর জিনিস চুরি করেছে সে।

—কী জিনিস!

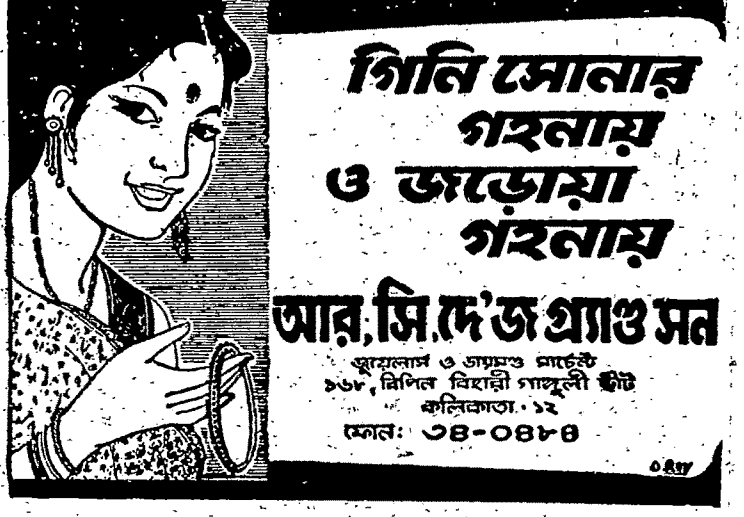

মিঃ প্রধান আয়রণ-সেফ খুলে জিনিসটা বার করে আনলেন। সেই মূল্যবান মুক্তোর মালাটা।

প্রমীলা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো,—এ যে সেই মালা। দিদিকে দিয়েছিল অসীমদা। দিদি, দেখেছিস?

চুরি গেল কখন?

শাশ্বতীর মুখখানা চাপা উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। বললে,—আর কী-কী বলেছে লোকটি?

প্রধান একটু অবাক হয়েই তাকালেন। বললেন,—আর কী বলবে। আর ত' কিছু বলে নি?

উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃতের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল শাশ্বতী,—বললে, বলেনি একটি মেয়ের কী সর্বনাশ ও করেছে? বলেনি—!

বলতে-বলতে মাথা ঘুরে গেল, প্রমীলা না ধরলে দেহটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়তো। ধীরে ধীরে বসে পড়লো শাশ্বতী। মিঃ প্রধান প্রদোষের মতোই হতচকিত। বললেন,—একটু জল খাবেন? জল খেলে—

—থাক,—শাশ্বতী নিজেকে সামলাতে লাগলো। কেমন যেন অবসন্ন লাগছে নিজেকে, সব চেতনা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে, দেহটা যেন শূন্যে মিলিয়ে যেতে চাইছে। তবু কোনক্রমে নিজেকে খাড়া করে রেখে মাথা তুললো শাশ্বতী, বললে,—ওর বিরুদ্ধে আপনাদের চার্জ কী?

—চার্জ অনেক,—প্রধান বললেন,—শ্মাগলিংয়ের বহু চার্জ। তার ওপরে আপনাদের বাড়ী থেকে এই চুরি।

প্রমীলা বললে,—কিন্তু চুরিটা করলো কখন?

শাশ্বতী দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গর্জনে বললে,—আপনি চোরটাকে আমাদের সামনে একটু আনতে পারেন?

—তা পারি।

একটুক্ষণ হাঁকডাক। তারপরেই কালো প্যান্ট, লাল জামা আর কালো কোট, মাথার বড় বড় চুল এলোমেলো,—সেই লোকটা এসে দাঁড়ালো। অলস চোখ ওদের ওপর বুলিয়ে নিয়ে মুখটা ফিরিয়ে দাঁড়ালো, উদ্ধত একটা ভঙ্গি।

শাশ্বতীই প্রথম প্রশ্ন করলো। ধারালো গলায় জিজ্ঞাসা করলো,—এই মালাটা তুমি চুরি করলে কখন?

লোকটা মুখ ফেরালো, শাশ্বতীকে চিনতে পেরেছে এমন মনে হলো না, তার কথাও যে পরিষ্কার বুঝেছে তা-ও তার ভাব-ভঙ্গিতে বোঝা গেল না। সে মিঃ প্রধানের দিকে ফিরে নেপালী ভাষায় ধীর গলায় বলে উঠলো,—ইনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ প্রধান বললেন শাশ্বতীকে,—ও বাংলা জানে না।

তারপরে ওর দিকে ফিরে,—শাশ্বতীর প্রশ্নটাকে নেপালী ভাষায় বুঝিয়ে দিলো। লোকটি একটু হেসে প্রধানকে নেপালীতেই কী যেন বললে। শাশ্বতী না বুঝলেও প্রমীলা-প্রদোষ বুঝতে পারলো। সে বললে, চোরের স্বভাবই এই, সুযোগ পেলেই সে চুরি করে। যাই হোক, ও মালা যখন ওর, তখন ওকেই দিয়ে দিন। আমি যাই।

বলে লোকটি নিজেই ধীরে ধীরে অন্তরালে তার লক্-আপে চলে গেল। যাবার আগে একবার ফিরেও তাকালো না। প্রধান বললেন,—মালাটা আপনাদের দিয়ে গেল। নিতে পারেন। চুরির চার্জে ওকে আর জড়াচ্ছি না। যে চার্জে ও জড়িয়েছে, তাতেই যথেষ্ট শাস্তি হবে।

শাশ্বতী নয়, মালাটা হাত বাড়িয়ে নিলো প্রমীলা, প্রধানকে বললে,—থ্যাঙ্কস্।

জিনিসটা যে ফিরে পাওয়া গেল এই-ই ঢের।

প্রমীলা উঠে দাঁড়ালো,—চল-দিদি, চল্।

শাশ্বতী মাথা নিচু করে তবুও খানিকক্ষণ বসে রইলো। যখন মুখ তুললো, তখন চোখে জল। প্রমীলা বিস্মিত।

চাপা গলায় বললে,—একী! চোখে জল কেন? মুছে ফেল্।

শাশ্বতী মুছে ফেলার চেষ্টা করলো না, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—মালাটা রেখে যা—ওটা আমাকে অসীমদা দেয়নি, ওটা আমি—ওটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

বলতে-বলতে গলা ধরে এলো, শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পায়ে এসে জীপে উঠলো। মিঃ প্রধান হয়ত সব কথা বুঝতে পারেননি, কিন্তু তাহলেও শাশ্বতীর চোখের জল তাঁর চোখ এড়ায়নি। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। প্রমীলা তাঁর দিকে মালাটা এগিয়ে দিলো, তারপরে বিস্মিত বিহ্বল প্রদোষকে একটু ঠেলা দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। প্রদোষ গেল সবার শেষে।

বাড়ি ফিরে প্রদোষ স্ত্রীকে একটা কথাই শুধু জিজ্ঞাসা করলো,—রুণু লাহিড়ী কে?

—দিদি যে বই লিখছে, তার নায়িকার নাম।

—কিন্তু—?

—থাক,—প্রমীলা বললে,—আর কিছু জানতে চেয়ো না। আমরা ত' কেউ বই লিখি না, যেটুকু জেনেছি, তার বেশি জানতে চাওয়ার দরকারই বা আমাদের কী?

প্রদোষ চুপ করে গেল, আর কোনো কথা তুললো না। প্রমীলা গেল অন্য ঘরে। এখন দিদিকে যে একটু একা থাকতে দেওয়া উচিত, এটা সে তার চিরন্তনী নারী মন দিয়েই বুঝতে পারছিল।

নিস্তেজ কলকাতা জ্বলছে

বৃহস্পতিবার: ৬-৩০টায়
শনি, রবিবার ও
ছুটির দিন: ৩ ও ৬-৩০টায়

অক্লেয়ার প্রথম অভিনব মঞ্চ

সারকারিনা

ফোন: ৫৪২৫৯৭

সিনিওকোনিক সিস্টেম

এরিনাস্কোপ

একটি অনির্বাণ উদ্যোগ

অগ্নিবন্যা

রচনা ও নির্দেশনা: সমর মুখার্জী

সহঃ নির্দেশনা: সুভাষ সরকার

রূপায়ণে:

বসন্ত চৌধুরী, অজিত ব্যানার্জী, শৈলেন মুখার্জী, সমর মুখার্জী, সুভাষ সরকার শ্রীরূপ, গৌতম সমরেশ, মানস, সতীকান্ত, পাহাড়ী, দেবদাস বিমলেন্দু, রবীন, প্রবীর, অলক, প্রশান্ত, বিশ্বনাথ ছন্দা দেবী, নন্দিনী মালিয়া (মঞ্চে প্রথম) তৃপ্তি গাঙ্গুলী সীমন্তিনী দাস, পার্বতী ব্যানার্জী এবং সুলতা চৌধুরী ও অসীমকুমার

আলো: ভানু বিশ্বাস মঞ্চ: শৈলেন দে এলসজ্জা: শক্তি সেন
ধ্বনি: অমর নন্দী শব্দগ্রহণ: হিমাদ্রি ভট্টাচার্য

ক্যানক্যান নৃত্যে:
মিস চৈতালী

মায়াবিনী মাতাহারি

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

একখানা লাক্সারি এক্সপ্রেস বিপুল বেগে ছুটে চলেছে বার্লিন অভিমুখে। তার একটা কামরায় একমাত্র যাত্রী সুদর্শন রুশীয় তরুণ নভোভ মেলিকোফ্—চেহারায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ। কামরাটায় নিজেকে সম্পূর্ণ একা পাওয়ায় তরুণ খুব খুশী এবং নিশ্চিন্তও। নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে করছে সে, কারণ তার পোর্টফোলিওতে রয়েছে কতকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, রাশিয়া থেকে নিয়ে চলেছে ফ্রান্স—সেখানকার রুশীয় রাষ্ট্রদূতকে পৌঁছে দিতে হবে।

জারের রাজকীয় রক্ষী-বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন ছিল ঐ যুবক। কোনো ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হলে নিজেকে এবং মূল্যবান কাগজপত্রপূর্ণ পোর্টফোলিওটাকে সামলাতে সে পারবে—এ আত্মপ্রত্যয় তার আছে, যেহেত বিপদ-আপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেবার নয়।

সময়টাই তখন যে হয়ে উঠেছিল সারা ইউরোপে আতঙ্কময়। ভাবী অমঙ্গলের ছায়া আকাশে, অস্পষ্ট ধ্বনি বাতাসে এবং ভীতির লক্ষণ ইউরোপবাসীর চেহারা ও চলন-বলনে। বিরাট এবং ব্যাপক একটা বিষাদের চাপা হুংকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতবেগে। সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কাল—উনিশ-শ তের বা চোদ্দ হবে। কাজেই রুশীয় যুবকটির আতঙ্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়।

পোর্টফোলিওটা নিরাপদ করবার জন্যে বিছানার মধ্যে রেখে মেলিকোফ্ ট্রেনের বাইরে দ্রুত বিপরীতগামী দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটা ষ্টেশনে ট্রেনটা থামতেই যুবকের একটু রাগ হলো, যেন কি এক সুখের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে গেল। ব্যাপারটা তাই-ই। কামরায় একজন সহযাত্রীর আবির্ভাব, বার্লিন পর্যন্ত তার সঙ্গে যেতে হবে—কারণ এর পর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ট্রেন বার্লিনে থামবে।

বাইরের করিডর থেকে খালি কামরার ভিতর দিকে উঁকি মারতেই মেলিকোফের নজরে পড়লো সহযাত্রীটি একটি মহিলা। কামরার দরজা খুলে ভিতরে পা বাড়াতে যাবে মহিলাটি, এমন সময় ট্রেণ কনডাক্টারের উর্দি পরা একটি লোক এসে তাকে বাধা দিয়ে কাঠ-খোট্টার মতো প্রশ্ন করলো। মহিলা খুব শান্ত বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিলেন। লোকটা আরো রূঢ়ভাবে কর্কশ স্বরে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলো তাঁকে।

কনডাকটারের রূঢ় ব্যবহারে রুশীয় যুবকের সন্দেহ হলো, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়ে থাকবে; হয়তো বা মহিলার টিকিটে কিছু গলদ আছে। যুবকের একথাও মনে হলো মহিলাটির ঝন্‌ঝাটে তার মাথা ঘামানো বা নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু বেচারার দুর্ভোগে সে দুঃখিত না হয়ে পারলো না। ইতিমধ্যে তাদের দু'জনের বিতর্কের উত্তাপ বেড়েই চলেছে। কনডাকটারের গলার স্বর সপ্তমে, কড়া ভাষায় শাসাতে শুরু করেছে সে। মেলিকোফ্ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মহিলাটিকে যথোচিত সম্মান দেখিয়ে বললো, "মাদাম, আপনাদের ব্যাপারে উপযাচক হয়ে এগিয়ে আসার জন্যে মাফ করবেন। আপনাকে সাহায্য করতে পারি এমন যদি কিছু থাকে----।" ফরাসী ভাষায় যুবক কথাগুলো বললে। তার বাচনভঙ্গী উচ্চারণের মধ্যে যেমন নিখুঁত ফরাসী চঙ—মহিলাকে মন্ত হয়ে সম্মান দেখানোর মধ্যে তেমনি নির্ভেজাল ফরাসী কায়দা ভার। সে যে ফরাসী নয়, খাঁটি ফরাসীরাও তা ধরতে পারবে না।

তার দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মহিলাটি বললেন, "মঁসিয়ো, আপনার অশেষ দয়া। ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ, কিন্তু আমি কনডাকটারকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, আমার এই টিকিটখানায় কোনো গলদ নেই----।" বলে মহিলা দৃঢ় বিশ্বাসের ভঙ্গীতে তার দিকে টিকিটের আকারের এক টুকরো পিচবোর্ড তুলে ধরলেন।

মেলিকোফ্ সে-দিকে দৃষ্টিপাত না করেই ইম্পিরিয়াল গার্ড থাকাকালীন শেখা গম্ভীর আদেশব্যঞ্জক ঝাঁজালো গলায় তাকে তাড়িয়ে দিলে। জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেটার অবস্থা যেমন হয়, তেমনি কুঁচকে গিয়ে তার ঔদ্ধত্যকে পকেটে পুরে কনডাকটার, যাকে বলে, ল্যাজ গুটিয়ে পালালো সেখান থেকে—পালাতে পালাতেই অপরাধজনিত ক্ষোভ প্রকাশও করে গেল সে।

মহিলা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললেন, "আপনাকে কেমন করে ধন্যবাদ জানাবো জানি না।"

"ও কিছু না, মাদাম, আপনি ওর জন্যে কিন্তু বোধ করবেন না।" এই বলে মেলিকোফ্ ততক্ষণে সামনের আসনে-বসা মহিলাটিকে ভালো করে দেখে নিলে। রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো দীর্ঘ দেহ কমনীয়, লাবণ্য-ভরা, মুখশ্রী নয়নতৃপ্তিকর, হীরের চুড়ি নেকলেস এবং লোমের স্কার্ফ রীতিমতো দামীই মনে হলো তার—রিয়ল দুটি বড়ো বড়ো কালো হরিণ-চোখ থেকে চোখ ফেরানো যায় না—এতো সুন্দর। দেহের সর্বত্র একটা চিত্তাকর্ষক আভিজাত্যের ছাপ। মেলিকোফ্ তার আগের কথার জের টেনে বললে, "সেই মুহূর্তে আমি যে এখানে ছিলাম সে জন্যে আমি আনন্দিত। লোকটা অত্যন্ত উদ্ধত। রেল কর্তৃপক্ষের বরখাস্ত করা উচিত ও-সব লোককে।"

মহিলার চোখ জোড়া তখন যেন হাসছে, তিনি বললেন, "সত্যিই লোকটা বেজায় উদ্ধত। কিন্তু আমি আপনার ঐ কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না—ঐ যে বললেন, 'আপনি কিন্তু বোধ করবেন না।' আপনি সেই মুহূর্তে যা করলেন তার প্রতিদান দিতে পারবো না। লোকটা আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার মতলব করেছিল। আমি আজ বার্লিনে পৌঁছতে না পারলে আমার স্বামী ভয়ানক চিন্তায় পড়তেন।"

তারপর মেলিকোফের দিকে ঝুঁকে তিনি বললেন, "মঁসিয়ো, আপনিও যদি বার্লিনেই যান তাহলে আমাকে আপনার ঐ সাহায্যের দরুন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আপনাকে অনুরোধ করবো আমাদের বাড়িতে আজ অতিথি হবার জন্যে। আপনি কি রাত্রে আমাদের সঙ্গে ভোজন করে বাধিত করবেন না? আমার স্বামী কাউণ্ট লিন্‌ডেন আপনাকে পেয়ে আপনার সাহসিকতার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কৃতার্থ বোধ করবেন।"

মেলিকোফ বললো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত,

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী, ১৩৮৪

মাদাম, আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না বলে। আমি প্যারিসে যাবো, কেবল ট্রেন বদলের জন্যে যে সময়টুকু দরকার আমি বালিনে সেইটুকুই থাকবো।"

মহিলা বিষণ্ণমুখে বললেন, "কি দুঃখের বিষয়। আপনার যথারীতি আপ্যায়ন করবার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হলুম কিন্তু।"

তারপর বাকি পথটা দু'জনে নানা কথায় ডুবে রইলো। সময় যে কোথা দিয়ে কাটলো যুবকটি বুঝতেও পারলো না—ট্রেন যখন শহরে এসে থামলো, তখন হঠাৎ যেন ছেদ পড়লো তাদের ঘনিষ্ঠ আলাপনে। মহিলা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলে পর যুবকের মনটা হু হু করতে লাগলো মহিলার নিমন্ত্রণ না-নেওয়ার অনুশোচনায়। এমন সুন্দর মোহিনী নারী সে এর আগে কখনো দেখেনি—তার রূপ তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে—তার কথাবার্তা তাকে জরো-জরো করেছে একটা অব্যক্ত কামনায়। তার কেবলি মনে হতে লাগলো—সন্ধ্যাটা তাঁর সঙ্গে কাটালেই ভালো হতো। তা না হয়ে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে সে ষ্টেশনে বসে রইলো প্যারিসগামী ট্রনের অপেক্ষায়।

মনটা ছটফট করছে মেলিকোফের সেই মোহিনীর সান্নিধ্যের জন্যে। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় সে জানতে পারলো যে প্যারিসগামী ট্রনের অনেক বিলম্ব আছে—অন্য দিনের চেয়ে নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা পরে সে ট্রেন এসে পৌঁছবে। চট্ করে উঠে গেল মেলিকোফ্ টেলিফোন করবার জায়গায়—পরস্পরের ঠিকানা বিনিময় ট্রেনেই হয়ে গিয়েছিল। কাউণ্টেসের বাড়িতে ফোন করলো প্যারিসের ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়বে, কাজেই তাকে সন্ধ্যারাতটা বালিনেই কাটাতে হবে।

ওপার থেকে খুশীতে উত্তপ্ত ডগমগ স্বর ভেসে এলো, "কী আনন্দের কথা। তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে পারবেন নিশ্চয়।"

মেলিকোফ্ একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাউণ্টেসের ঠিকানায় উপস্থিত হলো। ট্যাক্সিটা ফটকের সামনে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লো প্রাসাদোপম অট্টালিকা—খুব বিলাসী ও মেজাজী লোকের বাসস্থান যে সেটা তা বাইরে থেকেই বোঝা যায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজায় বেল টিপতেই এক খানসামা দরজা খুলে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

বুক ভিতরে ঢোকামাত্র কাউণ্টেস একটা টেলিগ্রাম হাতে এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে, কিন্তু মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া। বললেন, "ভয়ানক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে মঁসিয়ো, কয়েক মিনিট আগে। এই টেলিগ্রামটা পাবামাত্র আমার স্বামী যে অবস্থায় ছিলেন তেমনিভাবেই বেরিয়ে গেছেন। শহরের বাইরের তাঁর এক আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। তিনি আপনাকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জানাবার জন্যে উপস্থিত থাকতে না পেরে দুঃখিত—আমরা দু'জনেই দুঃখিত।"

মেলিকোফ্ও কপাল কুঁচকে গভীর দুঃখিত ভাবের ভান করলেও মনে মনে সে খুব খুশী—যাক্ সুন্দরী কাউণ্টেসের সঙ্গে সন্ধ্যা-রাতটা সে মনোরমভাবে কাটাতে পারবে।

কাউণ্টেস তাকে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি একাই আমাদের দু'জনের আন্তরিকতা দিয়ে আপনাকে নিশ্চয় আনন্দ দিতে পারবো। আসুন, বৈঠকখানায় শীতল পানীয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে—একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। আমার স্বামীর পক্ষে অপরিহার্য এই অনুপস্থিতির জন্যে আপনি আশা করি তাঁকে ক্ষমা করবেন। আমার সঙ্গেই দয়া করে পান করুন।"

আর এক আলোড়ন

অগ্রগামী

নিবেদিত

প্যাট্রিস লুমুম্বার জীবনবেদ

সূর্য সারথী
রচিত-পরিচালিত
কালো তলোয়ার

কানাই নাথ
রচিত
নতুন মিনার
নির্দেশনা জ্ঞানেশ মুখার্জী

সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)

সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

রূপায়ণে

শেখর গাঙ্গুলী

স্বপনকুমার, তাপসকুমার, গোপাল হালদার,
রাজেন সাহা, অনিল ভট্টাচার্য, গোপাল দে

ছবি চ্যাটার্জী

এবং

আনন্দময়

৩৩৩ বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-০৫৭১/৫৪-১৬৩৭

সে যেমনটি কল্পনা করেছিল তার চেয়েও অন্যভাবেই কাটলো সময়টা। কাউণ্টেস খুবই চিত্তাকর্ষক, প্রিয়ংবদা ও আলাপচারিণী।

খাবারদাবার অতি চমৎকার, তার চেয়ে চমৎকার ছিল তাঁর সুরার সংগ্রহ। রাশিয়া থেকে আমদানী-করা ভডকাও তিনি এনে রেখেছিলেন তাঁর অতিথির জন্যে। তাঁর খানসামা মেলিকোফের পানপাত্র কানায় কানায় ভরে দিচ্ছে তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে।

প্রচুর ভডকা পান করে ফেললে মেলিকোফ্—মেশায় বেহেড্ মাতাল হবার আশঙ্কা তার ছিল না। রক্ষী-বাহিনীর ক্যাপটেন হিসাবে পান-প্রতিযোগিতায় সব সময়েই উন্নতশির ছিল তার—গেলাসের পর গেলাস চুমক দিয়ে অন্য প্রতিযোগীদের হারিয়েও সে কখনো বে-এক্তিয়ার বেসামাল হয়নি। পান করতে করতে মেলিকোফ্ কাউণ্টেসের সুন্দর ঘন কালো চোখ দুটোর দীর্ঘায়ু কামনা করে তার শেষ পাত্র নিঃশেষ করলো।

এরপর কি ঘটেছিল তার কিছুই মনে নেই। যখন চোখ খুললো দেখে একটা ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে—সবই অপরিচিত। সে যে কোথায় ভাবতে পারছে না। কাউণ্টেসের খানসামাকে অনেকক্ষণ দেখবার পর তবে চিনলো, সে তার মাথার কাছে ঝুঁকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করছে তাকে—"মঁসিয়ো কি একটু ভালো বোধ করছেন এখন?"

মেলিকোফের মাথা তখনও দপ্‌দপ্ করছে, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সে উঠে বসবার চেষ্টা করলো, বললে—"মনে হচ্ছে ভালোই আছি। কিন্তু আমার হয়েছিলটা কি?"

খানসামা মুখটা কাঁচুমাচু করে বললে, "মঁসিয়ো টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অবিশ্যি সেটা আমারই দোষ, আমায় মাফ করবেন। আমার বোঝা উচিত ছিল, বেশী ভডকা মঁসিয়োর সহ্য হয় না। কাজেই মঁসিয়োর ঐ রকম অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী।"

আত্মসম্মানে ঘা লাগলো যুবকের, সে তেড়েফুঁড়ে বলে উঠলো, "বেশি ভডকা সহ্য হয় না! কি বাজে কথা বলছো, হে? তোমার দোষ নিশ্চয় নয়—ওটা আমারই দোষ, আমার আন্দাজ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তবু, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না! এতো বেহিসেবী হয়ে খেলুম যে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম! এমন অবস্থা এর আগে তো আমার কখনো হয়নি।" সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে মেলিকোফের মাথার ভিতরে। তার খুব লজ্জাও হয়েছে—অস্বস্তিও ভোগ করছে মনে মনে।

জোর করে আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে বললে, "আমার আচরণ অমার্জনীয়। কাউণ্টেস আর কখনো আমার মুখদর্শন করতে চাইবেন না। তিনি কখনোই আমার এমন বর্বরতা মার্জনা করতে পারবেন না।"

এই সময় হঠাৎ যুবক চমকে উঠলো—হঠাৎ তড়িৎ স্পর্শে যেমন হয় তেমনি চমক—একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ—তার মনে পড়ে গেল পোর্টফোলিওর ভিতরকার দরকারী কাগজ-পত্রের কথা। সেগুলো ঠিক আছে তো! রুশিয়া ত্যাগ করবার সময়কার প্রতিজ্ঞার কথা-গুলোও মনে পড়লো—'প্যারিসে পৌঁছে যথাস্থানে কাগজপত্রগুলো বিলি না করা পর্যন্ত পোর্টফোলিওটা চোখের আড়াল করবো না।' আর এখন—কয়েক ঘণ্টা সেগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিল। হাত কাঁপছে তার, পোর্ট-ফোলিওটা খুলতে গিয়ে বুক দুরুদুরু। নাঃ, কাগজপত্রগুলো যেমনটি যথাস্থানেই আছে! যাক্, বাঁচা গেল! আর ফাউনটেন পেনটা! গোপন প্রকোষ্ঠওয়ালা কলমটা! নাঃ, সেটাও ঠিক আছে, পোর্টফোলিওর যে-পকেটে সেটা রেখেছিল—সেইখানেই রয়েছে সেটা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো মেলিকোফ্।

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলেও নিজের উপর খুব রাগ হলো মেলিকোফের। তার ধারণা—কাউণ্টেসের সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়া তার উচিত হয়নি—এতে সে তাঁকে অপমান করেছে। তার আরও লজ্জা হলো ভেবে যে, তাঁর ঘরের কেউ তার ঘুমের সুযোগ নিয়ে কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে থাকবে—তাঁর উপর এই পরোক্ষ সন্দেহ করেও সে তাঁকে অপমান করেছে। যদিও এ-কথাটা কাউণ্টেসের কোনোদিন জানবার কোনো সুযোগ নেই, তাহলেও তার মনটায় খচ্‌খচ করতে লাগলো ঐ চিন্তার কাঁটাটা। তখন শীতের উষা—সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে—বেরিয়ে পড়লো মেলিকোফ্ কাউণ্টেসের বাড়ি থেকে—খান-সামাকেও বলতে ভুলে গেল যে, 'কাউণ্টেসকে ধন্যবাদ দিও।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ষ্টেশনে পৌঁছে প্যারিসগামী প্রথম ট্রেনেই রওনা হয়ে গেল মেলিকোফ্। পরে আর কখনো কাউ-ণ্টেসের সঙ্গে দেখা করেনি সে। প্যারিসে কাজ সেরে রাশিয়ায় ফেরা মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অভি

হাটে-বাজারে — বিশ্বনাথ পোদ্দার

গোপন তথ্য জানাজানি হয়ে গিয়েছিল—আর ঐ গোপনীয় খবরটার উল্লেখ ছিল মেলিকোফ্ যে-সকল কাগজপত্র প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিল তাতেই। কিন্তু মেলিকোফ্‌কে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী করা হয়নি, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অসতর্কতার—ঐ পরিপ্রেক্ষিতে অনবধানতা বা অসাবধানতা বিশ্বাসঘাতকতার সমগোত্রীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য।

কাউণ্টেস লিনডেন নাম্নী বা ঐ নামে পরিচিতা কুহকী নারীটির খপ্পরে তরুণ রুশীয় মেলিকোফের আগে এবং পরেও অনেক তরুণ ও প্রৌঢ়ও পড়েছিল। মহিলা কোনো কালেই কাউণ্টেস নন এবং তাঁর স্বামীও ছিল না। বার্লিন এক্সপ্রেসে সেই রেল কন্‌ডাকটারের উর্দি-পরা লোকটির সঙ্গে মহিলার যে ঝগড়া—সেটা আগাগোড়া সাজানো—আগে থাকতে রীতিমতো রিহার্সাল দেওয়া ছিল। যে লোকটা কন্‌ডাকটারের অংশ নিয়েছিল সেও এক গুপ্তচর। ওদের দু'জনের মধ্যে যে কর্কশ বাদানুবাদ সবই পূর্বপরিকল্পিত—নিস্পৃহ মেলিকোফের ভিতরকার পৌরুষকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে মহিলার প্রতি তার গভীর সহানুভূতি জাগানোই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। প্যারিসগামী ট্রেনকে বিলম্বিত করাও হয়েছিল বিশেষ আদেশবলে, যাতে রুশীয় তরুণ মহিলার নিমন্ত্রণ রাখতে পারে। চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল ঐ মোহিনী নারীর, তাই তাদের পরিকল্পনা মতোই মেলিকোফ্ জালে পড়েছিল। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মেলিকোফ্ নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েনি—মদের যে মাদকতা হজম করবার ক্ষমতার জন্যে সে গর্ব করতো, সে-ক্ষমতা যে তার সত্যিই ছিল—এটা প্রতীয়মান হবার পর খানসামা তার শেষ গেলাসে আফিমের নির্যাস মিশিয়ে দিয়েছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে সে নিঃসাড় মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাউণ্টেসের খানসামাটিও আসলে একজন গুপ্তচর—খানসামা বা 'বাটলার' নয়।

কাউণ্টেস আর ঐ খানসামাটি ছাড়া আরও কয়েকজন ওস্তাদ গুপ্তচর সহকারী তখন বাড়িতে অপেক্ষা করছিল যার যাঁর কাজ করবার জন্যে। মেলিকোফ্ যখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল বিছানায় তখন একজন, যে-কোনো চাবি খোলায় পাকা, তার পোর্টফোলিও খুলে ফেললে, অন্যান্য লোকেরা অর্থাৎ গুপ্তচরেরা পোর্টফোলিওর কাগজপত্র যা ছিল সবগুলোর ফোটোগ্রাফ নিয়ে নিলে, তারপর সেগুলো যথাস্থানে ঠিক যেমন পর পর রাখা ছিল ঠিক তেমনি রেখে দিলে। ফাউন্টেনের ভিতরকার গুপ্ত কোকরে শক্ত করে পাকিয়ে রাখা পাতলা কাগজটাও দেখে নিতে বাকি রাখেনি। তারপর পোর্টফোলিওটার চাবি আটকে দিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলে তারা। সেটা দেখে বিন্দুমাত্র বোঝা যাবে না যে, তার অন্দরমহলের সব কিছু দেখা, ছবি নেওয়া প্রভৃতি হয়ে গেছে।

মেলিকোফের প্যারিস যাত্রার পথে কাউণ্টেসের কবলে তার এই অবস্থা বাস্তবিক ঘটেছিল কিনা—নিশ্চয় করে বলা যায় না। কাউণ্টেস বলে যে মহিলাটি নিজের ঐ রুশীয় যুবককে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে ঘিরে রূপকথার মতো যে-সব কাহিনী গজিয়ে উঠেছিল—এই ঘটনার কাহিনীও সেই রূপকথারই একটা বলে অনেকে মনে করেন।

মহিলাটিকে নায়িকা করে রূপকথার মতো যে-সব কাহিনী প্রচলিত ছিল, তার প্রত্যেকটি তাঁকে সর্বকালের সকল দেশের কৃতী গুপ্তচরদের অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে মহিলার নাম ছিল মার্গারিডা গারটুড জিলি ম্যাকলিয়ড। তবে সবচেয়ে তিনি বিখ্যাত ছিলেন 'মাতাহারি' নামে। এটা মবদ্বীপে ব্যবহৃত নাম—এর অর্থ 'উষার আখি'।

মেলিকোফের দুরবস্থার কাহিনী, অর্থাৎ প্যারিসের পথে বার্লিনে মাতাহারির কবলে পড়া যদি সত্যিই হয়, তা'হলে মেলিকোফ্‌কে সৌভাগ্যবানই বলতে হবে, কারণ সে কিছুদিনের জন্যে স্বাধীনতাই হারিয়েছিল কারারুদ্ধ হয়ে; মহিলা তার ধনসম্পদ যেটুকু ছিল তা আত্মসাৎ করে তাকে নিঃস্ব করে দেন নি—যে অবস্থা থেকে তাঁর কোনো শিকারই রেহাই পায়নি।

মাতাহারির ছিল প্রবল অর্থলালসা। তাঁর রূপমুগ্ধ ও সান্নিধ্য-লাভেচ্ছুদের কাছ থেকে তাঁর রূপ ও বিশ্রম্ভালাপ উপভোগ করবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিতে প্ররোচিত করতেন। যদি কেউ তাঁর নির্দেশ বা দাবি মতো অর্থ বা উপঢৌকন দিতে না পারতো, তা'হলে তাঁর গৃহে তাদের প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। মাতাহারি কখনো কোনো গুপ্তচর বা গোপন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজ যদি সত্যিই করে থাকেন, তাহলে তিনি সেটা করেছিলেন বিপুল অর্থসম্পদ উপার্জন করবার জন্যে। তাঁর ধারণা ছিল ঐ কাজে সবচেয়ে বেশি অর্থাগম হয়।

অবশ্য মাতাহারি গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা কারো জানা নাই, এবং তিনি কি পরিমাণ গোয়েন্দার কাজ করেছিলেন সেটাও যথার্থ কেউই অবগত নয়। সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে যেটুকু জানা সম্ভব হয়েছে, তাতে এইটুকু জানা গেছে যে, ঐ কাজের উপযুক্ত চাতুর্য তাঁর ছিল না। তা না হলেও, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একজন কীর্তিময়ী গুপ্তচরের খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এখন আমরা শত শত অদক্ষ গুপ্তচরের আত্মকথা অথবা কীর্তিকাহিনী গুপ্তচরবৃত্তির ইতিবৃত্তে পেলেও, মহিলাটিকে আজও তাদের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতমা হিসাবে গণ্য করা হয়।

মহিলাটিকে নিয়ে বহু অবাক-লাগা উপকথা রচিত হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে যেমন ছিল চমক আর জাদু, তেমনি ছিল তাঁর সম্বন্ধে জানা—তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি, অর্থাৎ যে-সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে জানা গেছে তাঁর এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

হল্যাণ্ডের এক দিনেমার দম্পতির মেয়ে মার্গারিডা—জন্ম ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। সাধারণ অন্যান্য বালিকাদের মতোই স্বচ্ছন্দ হাসিখুশিতে কেটেছিল তার বাল্যকাল। তের-চোদ্দ বছর বয়সে তাকে একটা কনভেণ্ট ইস্কুলে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বছর ৪-৫ পড়াশোনা শেষ করে যখন বেরিয়ে এলো তখন সে অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী—চোখে মায়া-হরিণীর মন-গলানো দৃষ্টি। এই সময় তার চোখে প্রথম

৩২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মডার্ণ ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবে
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
৬৫/১, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৬
ফোন-৫৫-২৫৪৯:৫৫-৬৫৬৫

আগের সেই আকাশ সেই রোদ্দুর সেই বাতাস আবার ফিরে এসেছে।

এসেছে দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে।

কিন্তু আগের সেই আমি কি সত্যি সত্যি ফিরে এসেছি আবার? একা ঘরে বসে বসে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল নূপুর। এটা ঠিক আত্মচিন্তা নয়, এক ধরনের স্বগতোক্তি। ছোটবেলা থেকে বরাবরই নিরালায় থাকলেই এই রকম কথা কয়েছে, প্রশ্ন করেছে, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাধানও করেছে যে কোন বিষয়ে নিজেই। তাকে নিয়ে কত জনের কতই না কৌতূহল! কেউ বলেছে, এও এক রকমের ন্যাকামো। একঘেয়ে সুখে যেমন অরুচি—অকারণ জোর করে কেঁদে নিজের দুঃখবিলাস চরিতার্থ করে মানুষ। নূপুরও সেই জাতেরই মেয়ে। বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে চলতে হয়নি তো কখনো। কল্পনার রাজ্যে মেঘের ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো স্রেফ।

কেউ আবার বলেছে, আহাম্মক লোকও তো রয়েছে এখনো এই দুনিয়ায়। ওর কথার নাকি চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছে তারা ঘড়ি ঘড়ি। অবিশ্বাসীদের ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বর নেই নেই বলতে বলতেও নাকি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায় তারা। নূপুরের মর্ম বুঝবে কেমন করে? মা-বাপের জ্ঞাতি শত্রুরা আবার হেসে কুটিকুটি। হাসি-তামাসা করে বিদ্রূপবাণ ছুঁড়ে মারে শূন্যে।—কত রঙ্গ দেখালি মা রঙ্গময়ী! ছলনা আর করবি কত! অনেকে বলে আবার, মেয়েটার আর দোষ কি বল! আদর দিয়ে দিয়ে মা-বাবাই তো এই দশা করেছে। বুড়ি-থুবড়ী হয়ে গেল মেয়ে, বিয়ে দেবার নাম নেই। মনোমতো পাত্র নাকি ত্রিভুবনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ে নাকি স্বয়ং দুর্গা এসেছে মর্ত্যে। স্বর্গ থেকে শিব না এলে কার সঙ্গে আর বিয়ে হবে বল!

অন্য জনে মুখ টিপে হেসে মাথার ঘোমটা টেনে দিতে চেপে ধরে বলেছে, বলতে লজ্জা কইতে লজ্জা। শুনেছিলুম মুকুল নাকি সাক্ষাৎ শিব। কত ঘন ঘন নূপুরদের বাড়ি আসা-যাওয়া। সকলেই আঁচ করে নিয়েছিল বিয়ে হবে। তাতেও বাদ সেধেছে ওই নূপুরই। দিন নেই রাত নেই ছেলেটাকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে নিজের বাড়িতে। মাগো মা, মেয়ের নাকি দয়ামায়া হৃদয়ে ভরপুর। ছ্যা ছ্যা, এতটুকু লেশমাত্র নেই। পাষাণ পাষাণ। শেষে বলে কিনা—আমি দেখছি, তোমার বউ অন্য মেয়ে। আমি নই। আমি আমি-ই। তুমি তুমি-ই। ছোঁড়াটাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। কি সাধ্যি সাধনা, হাকিস টলল তো হুকুম টলল না।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে কুচকুচে কালো রেশমী নরম চুলে সিঁথিতে ফিকে হয়ে উঠছে। দখিনের ফুরফুরে হাওয়া অগোছাল এলোমেলো চুলে ছোট ছোট ঢেউ তুলে চলেছে। নূপুর বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে কপালের কুচো চুল আস্তে আস্তে সরাচ্ছে মাঝে মাঝে। দু' চোখ বোজা, হাত না নাড়লে মনে হত ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে খোলা জানলার ধারে আকাশের দিকে মুখ করে বসে আছে একটি নিথর-পাথরের ধ্যানতন্ময় মূর্তি।

কত কথা কত দৃশ্য এসে থরে থরে ভিড় করছে আজ। অন্যদিন হলে অন্য সময় হলে মন থেকে এসব সরিয়ে ফেলত নূপুর। এক্ষমতা আছে তার। কতবার তো করেছে। নিজের সঙ্গে নিজেই জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যেমন, তেমনি ক্ষত-স্থানে প্রলেপ লাগিয়েছে আবার নিজেই। এমন অনেক কথা আছে যা কাউকে বলার নয়, বললেও মন দিয়ে কান পেতে শুনবে না কেউ। শুনলেও, সে কথার উত্তর জানে না। উত্তর দিতে পারবেও না।

নূপুরের ভালো লাগছে ভাবতে। নিজের হেনস্থার কথা নিজের প্রশংসার কথা। তাই নিজেই শোনাচ্ছে নিজেকে নতুন করে আবার। হঠাৎ যদি কেউ নীল পরদা সরিয়ে এসময় ওর ঘরে এসে পড়ে, বা পরদার আড়ালে নিজেকে আড়াল রেখে বাইরে কান পেতে রাখে, সে ভেবে বসতে বাধ্য নূপুরের কাছে নিশ্চয়ই কোন লোক আছেই। তাকে শোনাচ্ছে ওসব কিছু।

নূপুর বলছে।

—আমার কাছ থেকে মুকুলকে সরিয়ে দিয়েছি আমি নির্মমভাবে। লোকে বলুক আমার পাষাণ হৃদয়, আমার দুঃখু নেই তাতে। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। লোকের নিন্দে সমালোচনা করা নিয়ে মাতামাতি না করলে অনেকের ঘুম হয় না। এ একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে অবুঝদের কাছে। কেউ কি এসে সাহস করে আমায় জিজ্ঞেস করেছে একবার? এত হৃদ্যতা এত মাখামাখি যেখানে, কেন সেখানে আমি তফাৎ করে রাখতে চেয়েছি তাকে? আমার চেয়ে কি মুকুলের ওপর তাদের দরদ বেশি।

আমার চেয়ে কে বেশি জানে—কেন ওকে আমি বিয়ে করিনি? সমস্ত জেনে-শুনে মুকুলকে স্বামীর আসনে বসানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। চোখের ঘুম গেছে, পেটের খিদে গেছে, চিন্তা-ভাবনায় আমি পাগল হয়ে উঠেছি। রাত-জাগা প্রহরীর মতো নিজেকে নিজে পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি অহর্নিশি। সে যে কি যন্ত্রণা, বোঝান যাবে না; আমার বিচারের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে অবধি অবিরাম যুদ্ধ করেছি নিজের সঙ্গে নিজে।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের কথা, যে ব্যাপার আমি প্রকাশ করতে পারিনি কাউকে—এটা

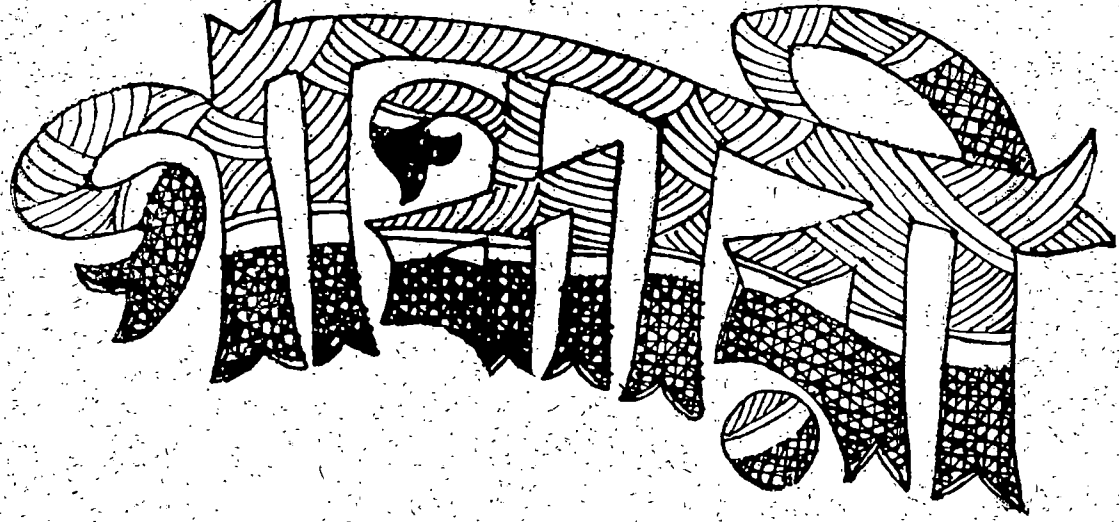

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

নূপুরের ব্যক্তিগত, নূপুরের ভবিষ্যৎ ! প্রকাশ হয়ে পড়লে হয়ত নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হত ওকে, পড়তে হত আমাকেও। সবচেয়ে আমার কাছে বেশি অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল সমস্ত জিনিসটা। আমার ভেতরের গোপন-কুঠুরীর কয়েদখানায় গোপনে বন্দী করে রেখে দিয়ে।

ইজিচেয়ার ছেড়ে এবার নূপুর উঠে দাঁড়ালো। আর বসতে পারছে না। মনে হচ্ছে খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আর আসছে না। আকাশের বাতাস নেবার জন্যে ছটফট করে উঠছে। ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। নিচের উঠোন থেকে বারান্দার রেলিং বেয়ে হাস্নুহানা উঠে এসেছে। হাস্নুহানার একটা ডাল ধরে টেনে নিল নাকের কাছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

না, মন ভরছে না। সুবাস নেই। থাকবেই বা কেমন করে, যার যা সময় সেই সময়েই তাকে চিনতে পারা যায়। বিকেলে আশা করা ভুল, আসবে সন্ধ্যে আসবে রাত্তির আসবে ঘুম পাড়ানো, প্রাণমাতানো মিষ্টি মধুর বাতাস হাস্নুহানার প্রাণের পরশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সব ফুলের চেয়ে দুটো ফুলের গন্ধ বড় ভালো লাগে নূপুরের। হাস্নুহানা আর লিলি। আজো হাস্নুহানার উত্তর প্রদেশের সুন্দর নামটি ভুলতে পারেনি নূপুর।

বেনারসে বেড়াতে গেছে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ভরা-জোছনার আলো ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। ভিক্টোরিয়া বাগে বাবার হাত ধরে প্রবেশ করতেই সমস্ত শরীরে একটা অচিন দেশের আনন্দ বয়ে গেছে থির থির করে। গেটের সামনের জায়গাটা গোল করে সুন্দর বাগান সাজানো। নানা রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার শ্বেতপাথরের আবক্ষ-মূর্তি মধ্যিখানের একটা স্তম্ভের ওপর। সামনের বেঞ্চে রাজপুত সেপাই বসে। পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট সার্ট। মাথায় লাল পাগড়ি। পায়ে পট্টি আর বুটজুতো। বাবাকে আমাকে দেখেই এক গাল হেসে এগিয়ে এলো। আমার চতুর্দিকে চনমনে চাউনি আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানা দেখেই ও বুঝেছিল ফুলের গন্ধ আমার খুব ভালো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে ক'টা ডাল ভেঙে এক গোছা সবুজ ফুলের গুচ্ছ তৈরী করে আমার হাতে দিল। এক গাল হেসে আমার চিবুক ধরে বলল, এর নাম রাত কি রাণী। সত্যিই হাস্নুহানা রাতের যাদুকরী সম্রাজ্ঞী।

বেশ খানিকক্ষণ লতানে গাছটাকে ধরে নূপুর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। জোরে বুক-ভরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে পায়ে পায়ে আবার ফিরে এলো ঘরে। আবার ইজিচেয়ারে বসল। নিজেকে নিজের কথা শোনাচ্ছে আবার।

—মুকুলের অসহায় মুখ দেখে আমার কষ্ট হত খুব। কেমন করে সুখী করতে পারা যায়, সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে আমি পথ খুঁজেছি। মনে হল আমার হতাশার গহন অন্ধকারের ভেতর থেকে জোনাকীর আলোর মতো একটা আলো বেরিয়ে আসছে। নিভছে, জ্বলছে—জ্বলছে, নিভছে। স্থির বিশ্বাসে এ আলো ভবিষ্যৎ পথের দিশারী, আমি ঠিকমতো মেনে নিতে পারিনি। তবুও আর তো অন্য কোন আলোর নিশানা আমি খুঁজে পাইনি। বারে বারে ওই জোনাকীর আলো আমার চোখকে টেনেছে, মনকে টেনেছে, বুদ্ধিকে টেনেছে। একটা মস্ত অভয় মস্ত অবলম্বনের আশ্রয় করে দিতে গিয়ে আমি জানা-না-জানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের নির্মম চক্রে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি পরে। আমি যে কাজ করে ফেলেছি মুকুলকে নিয়ে, সেটা আমার—কি বলব ? নির্বুদ্ধিতার চেয়েও আরো যদি কিছু অবন্যতর বিশেষণ থাকে, সেই কথাই আমি নিজের পক্ষে মেনে নিতুম।

একটা বিশ্বাসী মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলল। এখেলার—সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আমার ওপর নিয়তির নির্দয় পরিহাস—আমিই প্রধান আমিই হোতা।

অনেকে বলেছে, আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অনুশোচনার আগুনে দগ্ধে পুড়ে মরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য—তুমি কোন দোষী নও। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবার কারুর সাধ্যি নেই। স্বয়ং ভগবানেরও না। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ সহায় থেকেও পঞ্চপাণ্ডবের অত দুর্গতি ভোগ হত না। ব্যাধের তীর খেয়ে শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুও ঘটত না তাহলে।

এসব তো দূরের লোকের কথা। অতি কাছের লোক অতি আপনজন—দুশ্চিন্তার কালো ছায়া দেখেছে তারা আমার চোখের কোলে, আমার চোখের তারায় আমার মুখের জেল্লায়। স্নেহঝরা সুরে বলেছে তারা, মন থেকে সব কথা সরিয়ে দাও। তুমি দোষী নও, পুরোহিতের কাজ করেছ মাত্র। পুরোহিত কি দোষী হতে পারে ? তুমি পুরোহিত পুরোহিত পুরোহিত।

এ নির্দেশ আমার মন ফেরাতে পারেনি মন ঘোরাতে পারেনি। আমার বিবেকের কৌটোর ঢাকনি চাপা দিয়ে বন্ধ করতে পারেনি। এক বিবেক শত সহস্র হয়ে উঠে আমাকে দংশন করেছে। আমি পাগলের মতো একা ঘরে পায়চারী করেছি ঘন ঘন। জীবনে স্বপ্নেও তো কারো অনিষ্ট চিন্তা করিনি। মুকুলের মতো হৃদয়ের বন্ধুকে নিয়ে একি ভুল করে বসলুম ! এ ভুল সংশোধন না করা পর্যন্ত এ দুষ্টগ্রহের চক্র থেকে মুকুলকে বের করে নিয়ে না আসা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই শান্তি নেই—মৃত্যুতেও না।

॥ দুই ॥

আমার সই কদমের পাড়ার অনিমারা এসে উঠেছে। অনিমাকে নিয়ে এসে কদম যখন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, একটা নিদারুণ ব্যথা টনটন করে উঠেছে আমার ভেতর। অনিমার সারা মুখে দারিদ্র্যের ছাপ। মা-বাপ নেই, দাদা-বৌদির সংসারে কোনরকমে দিন গুজরাণ করে চলেছে। বাড়ি বাড়ি সেলাই ফোঁড়াই-এর কাজ শিখিয়ে যা কিছু উপার্জন ভাইয়ের সংসারেই ঢালতে হয়। এতেও বৌদি সন্তুষ্ট নয়। আরো চাই আরো চাই। শেষ পর্যন্ত নানা অজুহাত দেখিয়ে মিছিমিছি বাড়ি থেকে বের করে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি বৌদি। কথা বলার সময় চোখের জলে বুক ভেসেছে অনিমার। চোখের কোণে জলের কণা টলমল করে উঠেছে কদমের। আমারও দু' চোখ জ্বালা করে উঠেছে। আমার ভাইপো-ভাইঝিদের জামা করার অর্ডার দিয়েছি। জ্ঞাতি বৌদিদের শেখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পাড়ায় পাড়ায় অনিমার কাজের কথাও বলে দিয়েছি। যাতে বেচারী মান-মর্যাদা রেখে পেটের অন্ন আর পরনের শাড়ি যোগাড় করতে পারে। এমন মিশুকে মেয়ে মিষ্টি কথায় সবারই সহানুভূতি কেড়ে নেয়, কেড়ে নেয় অন্তরের স্নেহ-মমতা। বাড়িতে এলেই আমার সঙ্গে দেখা না করে, এমন কোন দিন যায়নি যে ও চলে গেছে।

আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। মুকুলের সঙ্গে আলাপে, ও-ও অনিমার অনেক কাজ যোগাড় করে দিয়েছে। মেয়েটিকে দেখে দেখে আমার মনে একটা প্রশ্নই জেগেছে মাঝে মাঝে—মুকুল-অনিমার জুটি কেমন মানায়। নিজের মনেই নিজে প্রশ্ন করেছি, মন থেকেই উত্তর চেয়েছি আবার।

মন্দ কি ! দু'জনের ব্যথার ধারা যদিও আলাদা কিন্তু শেষ অবধি তো একটা জায়গায় একমুখী হয়ে গেছে। অনিমাকে বৌদি তাড়িয়েছে, তাই বেরোতে হয়েছে বাড়ি থেকে। আর মুকুল ?

যদিও মুকুলকে বাড়ি থেকে কেউ তাড়ায় নি, কিন্তু বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছে তাকে। অভিমানে। যাকে-তাকে দান খয়রাতে শাসন করেছিল বাবা। পাত্র অপাত্র না বুঝে এখন থেকে যদি এই মতিগতি নিয়ে চলতে থাক,

আমি মরে যাওয়ার পর 'দিনেই যে বিষয় কু হয়ে যাবে—কর্পূরের মতো উবে যাবে একদম। মনে ভাববে ভবিষ্যতে এবিষয়ের কোন অধিকারী নও তুমি। তবেই পয়সা কামাতে মন বসবে তোমার। পয়সার মর্ম বুঝবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলার কষ্ট কতখানি নিজেকেই জানতে হয়। সে চেষ্টাটা কর আগে। তারপর নিজের পয়সায় দানছত্রের ব্রত নিও। এ নবাবী করার নেশা তখন কতখানি থাকে তোমার দেখা যাবে।

ফরসা মুখ অভিমানে ক্ষোভে সিঁদুরে হয়ে উঠেছে। বলেছে মুকুল, আপনার কথামতো শিক্ষা না নিয়ে বাড়িতে ফিরব না আর।

সেই থেকে বাড়ি ফেরেনি আর। মেসে মেসেই কাটিয়েছে। শিক্ষকের চাকরিতে নিজের চলাই দায়। অন্যকে সাহায্য করবে কেমন করে? বাড়তি ট্যুইশানি করতে হয়েছে। তবু জিদ বাড়ি যাব না। বাবা লোক দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছে, তাতেও না।

এ অভিমানী ছেলের দরকার এমন একজন, স্নেহমমতা দিয়ে যে এর দুঃখের ভার নিতে পারে খানিকটা, অন্তত সঙ্গিনী হিসেবে। অনিমা আর মুকুল দু'জনের দাঁড়িপাল্লায় ব্যথার ভারে, অভিমানের ভারে দু'জনেই সমান ওজনের। আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠেছে একটি সুখী পরিবারের শান্তির নীড়। দুঃখী-ই দুঃখীর মনোবেদনা বোঝে, বুঝবে।

আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠেছে তরুণ আর আমার সহপাঠিনী নীতার পিসতুতো বোন নীপার কথা। জ্যাঠতুতো দাদা তরুণের ঘরণী হয়ে নববধূর সাজে যেদিন আমাদের ঘরে এসেছে নীপা, সেদিন প্রথম আশীর্বাদে মুখের বেনারসী ওড়না তুলে ধরে নীপার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে বুড়ো ঠাকুরমা, নাতবৌ, আমরা সেকেলে মানুষ ভাই। সেকেলে কথাই শুনিয়ে যাই তোমায় একটা। মনে ধরবে কিনা জানি না, মনে রাখবে কিনা তাও জানি না। তবু বলার সাধে বলি। কথাটা তো ভালো। আমাদের শ্বশুরবাড়িতেও বিয়ের কনেকে গুরুজনরা এই উপদেশই কানে মন্ত্র দিয়েছে।

বুড়ো ঠাকুরমা বলেছে, ঠিক ফিস ফিস করে নয়, বেশ জোরে কাঁপা কাঁপা গলায় আমাদের সকলকে শুনিয়ে—স্বামীর কাছে স্ত্রীকে হতে হবে মা, যখন হয়ে পড়বে স্বামী অসুস্থ। হতে হবে বোন, স্বামীর মন যখন চাইছে আদর-আপ্যায়ন। হতে হবে মেয়ে, স্বামীর নরম মনে স্নেহ ঢেলে দেবার সময়। হতে হবে সহধর্মিণী, স্বামী সুখ-দুঃখের ভাগী, ধর্মে কর্মে ভালো কাজে প্রেরণা যুগিয়ে যেতে হবে।

একথা আমার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ' এই ভাব এনে দিয়েছিল। কথা নয়তো, যেন সুর যেন গান। আমার হৃদয়ের পরতে পরতে এ গান এ সুর ঝংকার তুলেছে, নেচে নেচে বেড়িয়েছে। আজো বেড়ায়।

সত্যি সত্যি দেখেছি আমি নীপাকে অপরূপা। বুড়ো ঠাকুরমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হতে গিয়ে দুনিয়ার মায়া ভুলে যখন চলে গেছে নীপা, সে যে তরুণদার কাছে কত বড় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ হয়ে গেছে তখুনি। বন্ধু-বান্ধব জ্যাঠাইমা জ্যাঠামণি আমার মা বাবা তরুণদার জন্যে সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পায়নি কেউ।

কেঁদে কেঁদে পাগলের মতো হয়ে উঠেছে তরুণদা। বলেছে, আমি নীপাকে হারিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছি—মা বোন মেয়ে স্ত্রী। তোমরা কেউ জান না তাকে মামণি বলেও ডেকেছি আমি সময়ে সময়ে।

অনিমার মধ্যে আমি ভুল করে সেই নীপাকেই দেখেছি। সবাই যে এক নয়, অত খতিয়ে দেখিনি। যেটা দেখা উচিত ছিল আমার।

জানি, ঘটনা ঘটে যাবার পর উচিত-অনুচিত ভাবা বৃথা। বেনারসে যে বাড়িতে ছিলুম আমরা বেড়াতে গিয়ে, তার সামনের বাড়িতে রামরতিয়া বলে এক হিন্দুস্থানী বউ থাকত। রোজ বিকেলে বেড়াতে এসেছে আমাদের বাড়িতে। বড় হাসি-খুশি বউ। মোটা রূপোর মলের ওপর সরু সরু চার গাছা রূপোর পাকানো মল দু' পায়ে। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আমাদের ওপরে উঠত যখন ঘর থেকেই বুঝে-শুনে আমি রামরতিয়া আসছে। মলের ঝম ঝম আওয়াজ। পরনে সবুজ শাড়ি, হাতে লাল কাঁচের চুড়ি, নাকে পাকা সোনায় নাকছাবি। চোখ মুখ ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে গৌরাঙ্গী কতই না রসের গল্প শোনাত আমাদের। বিকেলটা মন্দ কাটত না।

ও একদিন একটা গল্প বলেছিল বেশ। —নেমন্তন্ন খেতে এসেছে অনেকে বাড়িতে, খাওয়ার পদ মাংস আর রুটি, মাংস রান্না করেছে বাড়ির বউ, অতিথিরা পাত পেতে খেতে বসেছে সার বেঁধে। বউটি রুটি দিয়েছে, পেতলের ডেকচি থেকে হাতায় করে পাতের পাশে রাখা থালি বাটিতে লাল টকটকে মাংসের ঝোল আর গরম গরম মাংস ভরে দিচ্ছে। নাকের জল টানছে, চোখের জল টানছে লোকেরা খেতে খেতে।

বউটি তো আনন্দে ডগমগ। মাথার ঘোমটা মুখে টেনে, শাড়ির ফাঁকে চোখ রেখে মিহি স্বরে জিজ্ঞেস করল সকলকে, ভাই সাব, গোস্ত ক্যায়সা ছয়া?

অনেকে উত্তর দিল, অনেকে উত্তর দিল না। চোখের জল নাকের জল টানা দেখে বউটি বুঝল স্বাদ ভালো হয়েছে বলে এ অবস্থা। দু' চার জনের মুখে তার প্রশ্নের একই উত্তর—গোস্ত আচ্ছা নহী। বউটি চুপ করে রইল একটু। তারপর উত্তর না দিয়ে আর পারল না। মুখের ঘোমটা কপালে তুলে নাকের নথ নেড়ে মুক্তো চুনী দুলিয়ে—বকরা'কো তো জান চলা গিয়া, আভী আচ্ছা লাগত নহী।—ছাগলের প্রাণটা তো চলে গেল, এখন ভালো লাগছে না মুখে।

ওই রামরতিয়ার জবাবই আমার উচিত-অনুচিতের আঙিনায় ঘোরাফেরা করছে কেবলি। যা হবার হয়ে গেছে, জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে মুকুলের যেখানে, সেই মর্মস্থানের ক্ষত না সারিয়ে এসব ভাবা আমার বিকারের ঘোরে প্রলাপের সমান।

অনেক সময় উন্মাদের মতো ছুটে এসেছে আমার কাছে মুকুল—অনিমা ভীষণ ক্রোধী। রাগলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। বঁটি কাটারী হাতের কাছে থাকলে রক্ষে নেই। তাকে খুন করে ফেলার জন্য এগিয়ে আসে। আঘাতের চিহ্ন দেহের অনেক জায়গাতেই রয়েছে, আমি দেখেছি স্বচক্ষে। কেন এমন হয়? কি দোষে?

মুকুল বলেছে, জানি না, কারণ কিছু বুঝি না। তোমার কথামতো বহুবার খাপ খাইয়ে থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি দিন দিন। ইস্কুল ট্যুইশানির সমস্ত টাকা এনে তার শ্রীপদপদ্মে ঢালছি, তবু তার মন পাচ্ছি না। চাই চাই, টাকা চাই, টাকা চাই, আরো আরো।

আমি জিজ্ঞেস করেছি এত টাকার প্রয়োজন কিসে হয়ে পড়ছে তার?

ভাইকে ভাইপোকে ভাইঝিকে দিতে হবে। খরচ চালাতে হবে তাদের।

আমি অবাক। এমন কথা তো বলেনি অনিমা আগে। যে ভাই তাড়িয়ে দিয়েছে, যে বৌদি তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের জন্য নির্যাতন মুকুলের। মানুষটাকে মানুষ জ্ঞান করে না। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে খেটে সুন্দর চেহারায় কালির ছোপ ধরেছে। মেয়েদের তো মমতা থাকা স্বাভাবিক। অনিমার কি সে সব কিছু নেই। কেমনতরো মেয়ে অনিমা!

অনিমাকে ডেকে অনেক বুঝিয়েছে আমি। দেখেছি অন্য মূর্তি, আগের অনিমা নয়। সেই নম্র স্বভাব মিষ্টি কথা অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর প্রকৃতি থেকে। মেজাজ উগ্র, কথাবার্তার ধরন আত্ম অহংকারের চড়াসুরে বাঁধা। ওর কাছে আমি যেন একটা অতি তুচ্ছ হেয় বস্তুর

সামগ্রী। কোন কথাই গ্রাহ্য করল না। উল্টে বলল, বিয়ে করে স্ত্রীকে পোষার ক্ষমতা যার নেই, যে খরচ চালাতে পারে না সে পুরুষের জীবনে ধিক। পুরুষ-জন্মে ধিক।

ঝগড়াটে পাড়া-কুঁদুলে মেয়ের মতো সপ্তমে গলা তুলে তারস্বরে বলে উঠলো, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ দেখেছি এ যে। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির নাক-গলানোর কি অধিকার আছে?

আমি চুপ করে থাকতে পারিনি। ভেবেছিলুম মানুষের এমনও পরিবর্তন হয়? কোন্‌টা ঠিক। অনিমার কি এইটাই আসল রূপ; না আগেরটা? মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার, তবু শান্ত গলায় বলেছি, এভাবে ভদ্রপাড়ায় তোমার মতো ভদ্রমেয়ের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পাব, এরকম কথা শুনব আমি আশা করিনি।

এবারে পাড়া ফাটিয়ে চিৎকার করেছে অনিমা।—ভারী ভদ্র হয়েছেন উনি। জানতে আর বাকি নেই আমার। পরের স্বামীকে লাগিয়ে-ভাঙিয়ে নিজের করে নেওয়া ভদ্রমেয়ের কাজ নাকি? দেব পাড়ায় পাড়ায় সকলের সামনে মুখোশ খুলে। দু'কানে হাত চাপা দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেছি আমি। দরজার খিল বন্ধ করে দিয়েছি সজোরে। খাটের বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি আর মনে মনে বলেছি, মুকুলকে অনিমার কাছ থেকে কেড়ে আমি নিজের করে নিয়েছি! এত বড় কথা বলে গেল আমাকে অনিমা। বলতে পারলো। মানুষের মন কোথা থেকে কোথায় তলিয়ে যায়। আশ্চর্য মানুষ প্রকৃতি।

মুকুলকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেও অনিমা আটকাতে পারেনি। সে এসেছে আমার কাছে। ওর কথা আমাকে মনে করতে মনে রাখতে অনেক অনুনয় বিনয় করে বারণ করেছে।

আমি মুকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি একদৃষ্টে, দেখেছি সজল-চোখ। বুকটা ফেটে গেছে আমার। নিজের অপমানের জন্য নয়, ওর অপমানের জন্য ওর ব্যথার জন্য। ওর এ দুর্ভোগের একমাত্র কারণ তো আমি-ই। একটা দেবদূতকে একটা অসুরের গুহার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি সজোরে।

মুকুল বলেছে, আমি তো আপত্তি করেছিলুম। বলেছিলুম, আরো কিছুদিন অপেক্ষা কর। তুমি শুনলে না। যাক, তোমার দোষ কি। আমাকে শাস্তি দেবার জন্য ভালো সঙ্গিনী দিতে চেয়েছিলে। এমন হবে তুমিই বা জানবে কেমন করে।

আমার বুকের এক একটা পাঁজরা মট মট করে ভেঙেছে কে যেন শত টুকরো করে। বুকেতে বালিশ চেপে শুয়ে পড়েছি আমি। অসহ্য যন্ত্রণা। বলেছি, আমি দোষী নয়, একথা বোলি না আর। এতে আমার কষ্ট বাড়ে বই কমে না। বরং তুমি বল, তোমার জীবনযাত্রার পথে আমি তোমার রাহু, তোমার শনি—তোমার সর্বনাশ।

বলেছে মুকুল, তা বলতে পারব না আমি কখনো। ও চায় টাকাকড়ি বাড়ি, ও আমাকে চায় না। ও ভেবেছিল, আমি বোধহয় বাবার কাছে ফিরে যাবো আবার। বাড়ি ঘর সব কিছুই পাব, সেই আশায় বিয়ে করেছে। এখন তো স্পষ্টই বলছে এসব। তোমার কাছে বিয়ের আগে যা বলেছে, আমি ছাড়া ও বাঁচতে পারবে না। আমাকে ও ভালোবেসেছে। আমি ওর জীবনের প্রথম পুরুষ, ভালোবাসার মানুষ, আমাকে না পেলে ও আত্মঘাতী হতে পারে। বলো, তুমি-ই তো এসব বলেছিলে বিয়ের আগে, তোমাকে বলেছে।

আমি বুক চেপে শুয়ে থাকতে পারিনি আর। উঠে বসে পড়েছি। আমার নিজের স্বর নিজের কানেই আর্তকান্না মনে হয়েছে। আমি বলেছি, না, না, না। সে কিচ্ছু বলেনি এসব। এসব আমার তাকে দেখে কথাবার্তা শুনে ধারণা হয়েছিল স্রেফ। আমার ধারণা ভুল, আমার চিন্তা ভুল, আমার সিদ্ধান্ত ভুল।

মনের কথা স্বীকার করে তবুও এতটুকু স্বস্তি পাইনি। কেবলই মনে হয়েছে, আমার এসব স্বীকারে এখন লাভটা কি? এ তো অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষটাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই তো খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

বলেছি, মুকুল, এখানে আসা নিয়ে তোমার আরো অশান্তি। না এলে যদি ও খানিকটা অশান্তি কমায় সেটা তো মন্দেরও ভালো।

কথার কোন উত্তর দেয়নি, চুপ করে তাকিয়ে থেকেছে খানিক মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনের অভ্যেসমতো বলেছে, আজ আসি তাহলে।

আমারও নিত্যকার অভ্যেস মুখ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে অজান্তেই। আমি বলেছি, এসো আবার। সময় পেলেই আসবে।

চলে যাবার পর আবার যন্ত্রণায় দাপাদাপি করেছে বুকের ভেতর। নিজেকে নিজেই গালাগালি করেছি। আমার ওপর কি কোন শয়তানী ভর করেছে? মানুষটাকে আমিই তো দোটানায় ফেলে দিয়েছি। ঠেলে দিচ্ছি, আবার টানছি, আবার ঠেলে দিচ্ছি। ঠিক নয় ঠিক নয়। যেমন করেই হক, জীবন-মরণ পণ করে আমাকেই পথ খুঁজে বের করতে হবে, শতজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও। নিশ্চয় পারবো নিশ্চয় পারবো। মনোবল ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছি—একথা বারবার বলে।

কাউকে না বলে কয়ে নিজেই চলে গেছি একদিন দুপুরে অনিমার বাড়ি। তার আগে শুনেছিলুম মুকুলের মুখে, পুরনো পর্বের চরম শান্তি—টাকা চাওয়া-চাওয়ি ব্যাপার নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি করে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে—আনাজ কাটছিলো তখন অনিমা—ধারালো বঁটি নিয়ে তেড়ে এলো মুকুলের দিকে। ঘাড় লক্ষ্য করে বঁটি তুলতেই, আটকাতে গিয়ে মুকুলের তিনটে আঙুল কেটে রক্তারক্তি।

মুকুলের বন্ধুরা রাগে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল। অবিশ্যি তাদের যুক্তির ধার এতটুকু ভোঁতা নয়। অকাট্য। খণ্ডন করতে আমাকে যে কি বেগ পেতে হয়েছে, সে আর কহতব্য নয়। বন্ধুরা বলেছে, স্বামীকে খুন করতে চায় যে স্ত্রী, তার মুখদর্শন করা উচিত নয় আর মুকুলের। স্ত্রীর মোহ ত্যাগ করতে হবে ওকে চিরজীবনের মতো।

খুন করার চেষ্টার অজুহাতে আদালতে মামলা রুজু করতে হবে। হোক জেল, হোক বিচ্ছেদ, কয়েদখানায় পচে মরুক অনিমা। এরপর একসঙ্গে থাকলে, কোন্ দিন রাত্তিরে ঘুমন্ত অবস্থায় গলায় কোপ মেরে না বসে শেষে। ও-মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব। আহাম্মকরাই আর বিশ্বাস করবে ওকে।

মুকুলও রাগে অগ্নিশর্মা। ওর যত ক্ষোভ আমার ওপর, যত অভিমান যত দুঃখ। আমাকে বলেছে, উত্তেজনায় গলা তখন কাঁপছে ওর—যত নষ্টের গোড়া তুমি, তুমি এই সর্বনাশ করেছ। তুমি চেয়েছ আমায় মেরে ফেলতে। শত অন্যায় সয়েছি আমি অনিমার তোমার জন্যে। খালি কানে মন্ত্র দিয়েছ—মানষের ভুল হয় ক্ষমা কর। শুধরে যাবে। শোধরাল কোথায়? শেষে তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কোন ক্ষমা-ঘেন্না নয় আর। এবারে এসপার নয় ওসপার।

মুকুলের বন্ধুদের—জনায় জনায় হাতে ধরে অনুরোধ করেছি আমি, এই শেষ বার—তোমাদের মত পরিবর্তন কর।

মুকুলের চোখে চোখ রেখে বলেছি, আমি সত্যি সত্যিই তোমার এ দুর্ভোগের কারণ।

দু' চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়েছিল আমার। মুকুল সইতে পারেনি, ওরও গলা ভিজে উঠেছে। কান্নাভেজা গলায় বলেছে, না, না। তুমি কেন কারণ হবে, আমার অদৃষ্টে ছিল, হয়েছে।

আমি বলেছি, অদৃষ্ট তো যাকে দেখা যায় না। সে তো দশ হাত আর বিশ পা নিয়ে এগিয়ে আসে না মানষের সামনে। মানষই

মানুষের অদৃষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। তোমার দুর্ভাগ্য হয়ে আমি যে দাঁড়ালুম, এটা তুমি অস্বীকার করলেও আমার নিজের কাছে নিজেকে অস্বীকার করতে পারি না কোনরকমে। আমার মন ভরানোর জন্যে কুল সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি, আমার বন্ধুরাও মেনে নিচ্ছে। অনিমার নামে আমরা কিচ্ছু করব না, ওকে ক্ষমা করছি।

এ ব্যাপারে অনিমা ভয় পেয়েই হক, কি ভবিষ্যতের আরো জোরদার সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্ব চালাক, অত বুঝতে পারিনি, মাস তিনেক নিরীহ মাটির মানুষ হয়ে কাটিয়েছে। এর পরে হয়ে উঠেছে আরো ভয়ঙ্করী।

পাড়ায় পাড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে বলেছে, আমি খুন করতে যাবো কেন? ওই তো বঁটি নিয়ে খুন করতে এসেছিল আমাকে। বঁটির উল্টোপিঠে লেগে হাত কেটেছে। শিখিয়ে দিয়েছিল ওই শয়তানী নূপুর। ওই তো যত নষ্টের গোড়া। আমার স্বামী আমার নয়, ওর কথায় উঠবে বসবে এ সহ্য করা যায় কেমন করে? মেয়েরা স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিয়ে বুক বেঁধে বাঁচতে পারে, কিন্তু অন্য মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে সহ্য করতে পারে কি কেউ, তোমরাই বল না?

মুকুল এসে বলেছে অনিময়, হয়েছে তো, ক্ষমা করার ফল হাতে-নাতে পেয়েছ তো?

আমি নীরব। মৌন মুখে মাথা নিচু করে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিলো? আমার সকল জবাব যুক্তি অনিমার নিন্দের তোড়ে কোথায় ভেসে হারিয়ে গেল। মনে মনে বলেছি, পুরনো কথা ফ্যালনা নয়। বেদবাক্যের সমান। বুড়ো ঠাকুরমা বলে, ডাঙায় উঠে মাঝিকে দাঁত খিঁচোন। এ হল সেই ব্যাপার। দুঃখের ওপর হাসি এসেছে আমার। খুনের প্রমাণ তো এখন আর নেই। তাই শ্রীমতীর রণমূর্তি ধারণ আবার।

ঠোঁটের ফাঁকের হাসি দেখে মুকুল বলেছে, তুমি কি বল ত! তোমাকে আজো বুঝতে পারিনি আমি।

মুকুলের ওপর অনিমার অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো আবার। মুকুল অতিষ্ঠ, বাড়িতে টেকা দায়। মাথার মধ্যে একটা দৃশ্যই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে আমার। নীপার জীবন।

নীপাও মেয়ে ছিলো। তরুণদা তাকে আজো ভুলতে পারেনি। তরুণদার কথা ভাবলে আমার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ জাগে। কি দিনই না গেছে! তরুণদার মত ঘোরাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। বলেছি, দাদা, ওপথ তোমার পথ নয়। অজানা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না অত তুমি।

তরুণদা বলেছে, আমার ভেতরটা তুই যদি দেখতিস, আমার যদি দেখাবার উপায় থাকত, তাহলে বুঝতে পারতিস কি যন্ত্রণা সেখানে, কথায় বোঝান যাবে না।

আত্মা আছে কিনা জানি না, পরলোক বলে কোন জায়গা আছে কিনা শুনেছি স্রেফ, হদিস পাইনি কোন। শোনা কথা বলেই সান্ত্বনা দিয়েছি তরুণদাকে—আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা অমর। তুমি যদি প্রকৃত ভালোবেসে থাক নীপাকে, সে এখন পরলোকে, কেন তার জন্য শোক করে করে তাকে ডাকছ? ডাকাডাকিতে নীপার কষ্ট হচ্ছে খুব। সূক্ষ্ম শরীর আমাদের স্থূল শরীরের নিঃশ্বাসের কাছে আসতে খুব অস্বস্তি বোধ করে। তরুণদার চোখে জল টলমল করছে। ঘন ঘন সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমাকে যেতেই হবে।

আমি শিউরে উঠেছি। তার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলেছি, কোথায় যাবে?

ধরা গলায় বলেছে তরুণদা, নীপার কাছে। সেখানে গিয়ে কে কেমন অবস্থায় থাকে আমি যোগাযোগ করব পৃথিবীর লোকের সঙ্গে। আমার সূক্ষ্ম শরীর না হলে, এদেহ না গেলে নীপাকে আর পাব না। নীপা যদি জন্ম নিয়ে ফেলে, তাহলে হয়ত বা জাতিস্মর না হতেও পারে। চিরদিনের জন্য আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, আমাকে ভুলে যাবে। বিশ্বের মানুষজনের অকূল সমুদ্রে নীপা হারিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। আমিও হারিয়ে যাব তার কাছ থেকে। এ হতে দেব না আমি কিছুতেই। ওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হবেই যে কোন উপায়ে।

আমি মহামুশকিলে পড়ে গেলুম। আত্মার অস্তিত্ব থেকে তরুণদার মন না ঘোরালে, তরুণদার কথায় যা বুঝতে পারছি, যে রকম গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে ও—আত্মঘাতী না হয়ে বসে।

বুকের মধ্যে আমার ঢিব ঢিব করছে। কেমন করে তরুণদাকে তার অচল-অটল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনি। বেশি চিন্তা করলে হবে না, সময় অল্প। যুক্তিবাদী ছেলেকে এখুনি যুক্তি দিয়ে না বোঝাতে পারলে জিদের বশে মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যেতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

আমি বলেছিলুম যা, তার বিপরীত বলা শুরু করলুম তরুণদাকে বোঝানোর জন্য।

বুদ্ধি বুদ্ধি কেমন করে যে আমার মাথায় এসে যায় ক্ষেত্র বিশেষে, আমি নিজেও বুঝি না। বললুম, সবই তো শোনা কথা। আর সবই মানুষের কল্পনা। পরলোক বলে সত্যি কিছু আছে কিনা, তারও তো কোন প্রমাণ নেই। মানুষ প্রিয়জনকে হারাতে চায়না বলেই হয়ত একটা মনগড়া জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে তার প্রিয়জন বেঁচে রয়েছে, শেষ হয়ে যায়নি। এ সান্ত্বনা যারা বুঝি, দুর্বল মনের লোকের জন্য। যাদের আবেগ বেশি উচ্ছ্বাস বেশি, তোমার জন্য নয়। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে কোথাও লাভ নেই। পরলোক বলে আছে কিনা, তোমার আত্মা যেতে পারবে কিনা, গেলেও এখনকার মনোভাব সেখানে বজায় থাকবে কিনা, থাকলেও নীপার সঙ্গে সত্যি সত্যি দেখা হবে কিনা—সবই ধারণার ওপর নির্ভর করে একটা জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

মৃদু হেসে তরুণদা বলেছে, বোন, জীবন-মরণ বলে কিছু আছে নাকি রে? বেঁচে থাকাও যা মরাও তাই। মরণে অত ভয় পাচ্ছিস কেন?

আমি বলেছি, তোমার একথা আমি মেনে নিতে পারব না কিছুতেই। আমি তোমার সামনে জ্যান্ত মানুষ একটা বসে আছি। আমি মরে গেলে এইভাবে কি তুমি কথাবার্তা শুনতে পাবে, না দেখতে পাবে?

তরুণদা আর্তস্বরে বলে উঠেছে, না, না। তুই মরবি কেন? ও কথা বলিস নে আর।

আমি বলেছি, তরুণদা, তাহলেই বোঝ জীবন আর মরণ এক নয়। তুমি আমার সামনে বসে আছ। তুমি চলে গেলে তোমাকে এমন-ভাবে পাব না। তোমার মত ঘোরাও, নিজেকে ফেরাও। যতদিন আছ, আমাদের মাঝে থাক। এই আমার অনুরোধ। তার অসম্পূর্ণ ইচ্ছে পূর্ণ করা তোমার মহাদায়িত্ব, মহাকর্তব্য।

আমার হাত ধরে শপথ করেছে তরুণদা, বলেছে, নীপার নামে লেদ মেশিনের যে ফ্যাক্টরীটা করেছি আরো বাড়াতে হবে। ওর অনেক ইচ্ছে ছিলো ওখানে অনেক লোকের অন্নের সংস্থান করে দেওয়ার। তার অসম্পূর্ণ ইচ্ছে আমি পূরণ করব, তোকে কথা দিচ্ছি। ঠিকই বলেছিস তুই।

নীপা যখন বেঁচে ছিল, আমি যা বলেছি, শুনেছে মেনে নিয়েছে। তরুণদাও শুনেছে, এবারেও শুনলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি আমি।

এরকম স্বস্তির নিঃশ্বাস অনিমার বেলায় কবে ফেলতে পারব? ও কি আমার কোন কথাই শুনবে না কোন দিন? নিজের তৈরী করা অভাব নিয়ে স্বার্থের খাতিরে আমাকে ভুল বুঝেই যাবে বরাবর। মনে মনে চিন্তা করেছি, তা হতে পারে না। ও একদিন আমাকে বুঝবে, আমার কথা শুনবে। এক রকম বুদ্ধি একই বয়েস একই রকম চেহারা চিরদিনই কারো থাকে না। ওরও থাকা সম্ভব নয়। ওর ভুল ভাঙবে, আমাকে চিনবে জানবে, মুকুলকেও নিজের করে টেনে নেবে। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়।

মনের জোর করে গেছি আমি অনিমাদের বাড়িতে।

॥ তিন ॥

অনিমাদের বাড়িতে আমি এসেছি। আমাকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। টাইম পিস-এর ডায়ালে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলো একবার। ও ভেবেছে আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি। ছোট কাঁটাটা পাঁচটার ঘরে। বাড়িতে আসবার সময় হয়েছে মুকুলের। বিকেলের দিকে এই সময়ে আসে।

আচমকা অনিমা একটা কাণ্ড করে বসলো। আমাকে বসতে তো বললই না। সামান্য ভদ্রতাটুকুর রেশও ওর জিভের আগায় নেই। পশ্চিমের দেয়ালে একটা গ্রুপ ফটো টাঙানো রয়েছে। টেনে হেঁচড়ে উপড়ে ফটোটাকে নামিয়ে নিলো নিচে। এরকম উগ্রচণ্ডা মূর্তি আমি এর আগে স্বচক্ষে দেখিনি। সজোরে ছুঁড়ে মারলো মেঝেয়। ফটোর কাঁচ ভেঙে খান খান। ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে বার করলো ফটোটাকে। বিয়ের ফটো—মুকুল, অনিমা আর আমি—তিন জনে।

নিজের দিকটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললো। বাকি মুকুল আর আমার দিকটা ছুঁড়ে আমার বুকে মারলো। —তোমার নাগরের সঙ্গে তোলা ছবি নিয়ে বিদেয় হও এখুনি। কেন, বাড়িতে যায় নি বুঝি ক'দিন? সময়-ক্ষণ গুণে এসেছ তো ঠিক। এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েছেলেও দেখিনি আমি। তোমার সাধ্যি নেই যে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাও ওকে। সরে পড়ো। সরে পড়ো।

আমি হতভম্ব—হতবাক।

এমন কথা লোকের বাড়িতে এলে লোকে যে বলতে পারে কাউকে, ভাবিনি কখনো। যে কাজের জন্য এসেছি আমি অভিমানে অপমানে ক্ষোভে বেরিয়ে যদি যাই, আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। যত বাধাই আসুক, চেষ্টা করা উচিত। আমি যে পরিবেশে পড়েছি যে পরিস্থিতির ঘূর্ণিঝড়ে দিবারাত্র ঘুরপাক খাচ্ছি, অনিমার কথা গায়ে মাখলে চলবে না।

ভাবতে কতটুকুই বা সময় গেছে আমার। চোখের পলক পড়েছে দু' তিনবার হয়তো। শুনলুম, গড়িয়ে গড়িয়ে মেঘের গর্জন এসে সজোরে ধাক্কা মারলো আমার কানে। এবারেও আমি অবাক। নারীকণ্ঠের বজ্রগম্ভীর স্বর—চিৎকার করে বলছে অনিমা, বলি ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করলে কি যাবে না নাকি? ভেবেছটা কি? এটাও কি তোমার পৈতৃক ভিটে ভাবছ?

আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। বলেছি, তোমার সঙ্গে একান্তে আমার কিছু কথা আছে। অনিমার গলা দিয়ে আবার সেই পুরুষের স্বর—চিৎকার করলে ওর এরকমই স্বর বেরোয়, আশ্চর্য। একান্তে ফ্যাকান্তে জানি না, যা বলবার এখানেই বলো।

আমি জেলখানায় বন্দীর মতো কথা বলার মাপা সময় মেনে তাড়াতাড়ি বলতে লাগলুম। বললুম নীপার কথা। নীপার মৃত্যুর পর তরুণ-দা'র মনের অবস্থা। ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিয়ে এমন মুগ্ধ করে গেছে নীপা তরুণদাকে, সে নেই, তরুণদা ভাবতেও পারে না। নীপা চলে গেছে তাতে যত না দুঃখ পেয়েছি আমরা, আরেকটা মানুষ যে তার ভালোবাসার স্বাদে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে দিনরাত, এতে কিন্তু বেশি আনন্দই পেয়েছি। শুনলে লোকের অস্বাভাবিক লাগবে আমাকে। কিন্তু বোন, আমার মনে হয় মেয়েছেলে হতে গেলে এই-রকমই হওয়া উচিত। এমন কাজ করে যেতে হবে যেন চলে যাওয়ার পরেও চলে না যায় কারো মন থেকে।

থুথামটা দিয়ে উঠলো অনিমা। ওরে, আমার গুরুমা এসেছে দেখছি। এমন কুঁদুলে ঝগড়াটে তো তোমার মতো দ্বিতীয় আর দেখিনি। বাড়ি বয়ে এসে মরণ কামনা। আমি তো জানিই, আমি মলে তোমার গলা থেকে কাঁটা নামে। সেটি হবে না, জেনে রাখো।

মনে মনে ভেবেছি, আমি কি বললুম, অনিমা কি বুঝলো। তবুও বলেছি, জানি গালমন্দ খাব—তোমার প্রয়োজনে আমি তোমাকে বোন হিসেবে কিছু কিছু দিয়ে যাবো, তুমি দ্বিধা-সংকোচ কোর না। ওকে যন্ত্রণা দিও না।

সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলেছে অনিমা, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে যায়। এতখানি স্পর্ধা তোমার হলো কোত্থেকে? ভিখিরী ঠাওরালে। আমার মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠছে। চোখের সামনে থেকে এখুনি চলে যাও। নিশ্চয় আমার ঘরের মানুষের সঙ্গে যুক্তি করে এসেছ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারবে না জেনো। বাড়িতে আসুক একবার, ওর একদিন কি আমার একদিন।

আমার ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো। কি করতে এসে কি করে বসলুম। মুকুলের অদৃষ্টে

অধিক ফলন ও লাভের জন্য

লক্ষ্মী মার্কা

সুপার ফসফেট ও সুষম দানা সার

এ্যলাম

ফেরিক ও আয়রন ফ্রি

সালফিউরিক এসিড

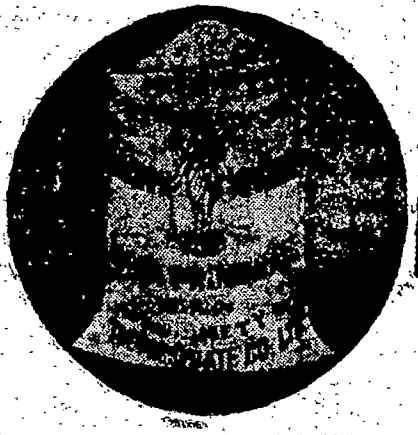

কৃষি ও কৃষকের নিবেদনে প্রতিক

দি ফসফেট কোং লিঃ

১৪ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলি: ১

ফোন: ২২-০৭৭১/৩

কি আছে কে জানে। তার ভালো করতে এসে খারাপই করে ফেললুম। অনুতাপ ভয় আমার গলা চেপে ধরছে। আমি চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললুম, মুকুলের কোন দোষ নেই ভাই। ও কিছু জানে না। ওকে কিছু বোল না। আমার অনুরোধ, আমাকে তুমি যা খুশি বলো, আমি মাথা পেতে নেব।

আমি একদণ্ড দেরী না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে।

বাড়িতে ফিরে এসে কি অস্বস্তি। এতক্ষণে না জানি মুকুলের কি হেনস্থাই না হচ্ছে।

খানিক বাদে মুকুল এসে দাঁড়ালো সামনে, অভিমানী গলায় ব্যথা ঝড়ে পড়ছে। বললো, এমন গাল বাড়িয়েও চড় খায় মানুষ, খাবার জন্যে যায়? তুমি কি বল তো নূপুর, আমি ঘরে ঢুকতেই কি যাচ্ছেতাই কথাবার্তা তোমার আমে। বিশ্বাস বলছি, আমার দুর্গতির চিন্তা মন থেকে বার করে দাও। তুমি শুনবে না, শুধু শুধু নিজে যন্ত্রণা পাবে। বলো, তোমার যন্ত্রণায় আমি শান্তি পেতে পারি কি? আমার ভাগ্যের স্রোতে আমাকে গা ভাসাতে দাও। দেখই না, কোন পথে ভেসে যাই কি কোন কিনারে ঠেকি কিনা। আমাকে যদি তোমার মন থেকে বার কোরে ফেলতে পারো সত্যি নূপুর, তুমি সুখী হবে, হব আমিও।

খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছি আমি। আমার দৃষ্টি আটকে পড়েছে ওর দুটি আয়ত চোখের তারায়। মুকুলের বলা থেমেছে। ঘরখানায় সন্ধ্যে আসছে—মাঘের সন্ধ্যে। জানলা দিয়ে দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আনাগোনা করছে গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। রঘু চাকর এসে নীল আলোটা জেলে দিয়ে গেলো। এ আলোই আমি পছন্দ করি বেশি।

সামনের চেয়ারটায় ধপ কোরে বসে পড়লো মুকুল।

এতক্ষণ আমি তাকে বসতে বলিনি। কেন বলিনি, আমার কাছে এও একটা বিস্ময়। কোনদিন এমন করিনি। যে কেউ এসেছে, অনিমা কথা শোনাতে এসেছে—তাকেও হাসিমুখে বলেছি, দাঁড়িয়ে কেন? বোস না ভাই। সভ্যতার এই ধারায়ই ছোটবেলা থেকে মন গড়ে উঠেছে আমার। হঠাৎ আজ সে মনের বিস্মরণ।

মুকুল বলেছে, তুমি আমাকে অনেক নির্দেশ দিয়েছ অনেক সময়। এইভাবে চলতে হবে, এই কাজ কোরতে হবে—আমি শুনেছি। আজ তোমার শোনার পালা। ওয়ানস্ ইট গেটস আউট ইট উইল নেভার কাম ব্যাক ইন ইয়োর লাইফ টাইম।

আমি জোরে মাথা নেড়ে বোলে উঠেছি, নো, নো। তোমার এ সাজেশান সর্বক্ষেত্রে খাটে না মুকুল। মন থেকে অনেক কিছু বার করা যায় না। বার কোরে দিলেও স্মৃতির নেগেটিভে আটকে থাকে সে। সময়ের আলোয় সে ছবি ফুটে উঠবেই, মনের পরদায় পড়বেই। পড়েও। এসত্যিটা অস্বীকার করা যায় না যুক্তি দিয়ে। কারো কোন কথা তুলে, বোলো।

বুকভাঙা নিঃশ্বাস ফেললো মুকুল। আমার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে মাথা নিচু কোরে বিড়বিড় কোরে বললো, ঠিক বলেছ তুমি, ঠিক বলেছ। আমার যেন আজকাল কি রকম ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। সব জিনিস যে মন থেকে বার করা যায় না, তার প্রমাণ জলজ্যান্ত তুমি রয়েছ।

মাথা তুললো। আবার আমার চোখে চোখ রেখেছে। বলছে, আজো সেকথা আমি ভুলবো না। তুমি একদিন বলেছিলে, মানুষ বাঁচার জন্যে ভালোবাসে। কিন্তু যখন সে ভালোবাসায় ডুবে যায় একেবারে, তখন ভালোবাসার জন্যেই বাঁচতে চায়।

বলেছিলে, মানুষ ভালোবাসে না নিজে থেকে, ভালোবাসতে বাধ্য করে। কেন না তার অজান্তেই কোন এক সময়ে তার হৃদয় চুরি হয়ে যায় অন্যের হৃদয়ে। অন্যের হৃদয়ের মধ্যে নিজের হারানো হৃদয়কে খুঁজে পেতে চায় বোলেই এত ছুটোছুটি, এত চাওয়া-চাওয়ি।

বলেছিলে, বন্ধনের মধ্যে মুক্তি, সে বন্ধন ভালোবাসার। এত শক্ত যে তাকে কোনদিন কেউ অন্য বস্তুর মতো ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। ভালোবাসা ছেঁড়া যায় না। নানান রকম চাওয়ার বন্ধনে নানান রকম যন্ত্রণার। বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাই—একটু শান্তি, একটু আনন্দ। কিন্তু শান্তি আনন্দের সেও তো বন্ধন। তবে এ বন্ধন আসক্তিহীন। এ বন্ধনের মধ্যেই প্রকৃত মুক্তি। প্রেম অনন্ত আকাশ। এ আকাশে নেই কোন যন্ত্রণার মেঘ। এখানে মানুষ আনন্দে আত্মহারা—নিজের অস্তিত্ব ভুলে শান্তির মুক্ত বিহঙ্গ।

পাশে রাখা মেহগিনি কাঠের পাথরের গোলটেবিলটার ওপর আমার ছবি রাখা আছে, রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো। হাত বাড়িয়ে ছবিটা তুলে নিলো মুকুল। একদৃষ্টে দেখলো খানিক।

আমি সামনে সশরীরে বোসে আছি। অবাক কাণ্ড! মানুষটাকে ছেড়ে দিয়ে ছবি দেখার অত কি আছে! আমি ওকে লক্ষ্য কোরে যাচ্ছি। ওর চোখের পাতায় ধ্যানের ছবি, তারায় আর একটি মুকুল, তন্ময় হয়ে বোসে ভাবে বিভোর।

এ-ধ্যান এ-ভাব ভাঙাতে চাইনি আমি। অশান্ত মনে পলকের শান্তিও তো—নিজেকে ভুলে যাওয়াটাও মস্ত উপশম। পাছে আমার জোরে নিঃশ্বাস পড়লে ওর শান্তি ভঙ্গ হয়ে যায়, যতটা সম্ভব নিঃশ্বাসকে চেপে রাখতে চেষ্টা করছি আমি, আস্তে ফেলতে চেষ্টা করছি।

ঘরখানা বড্ড বেশি নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে কেউ এসে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলে ভাববে, জনপ্রাণী নেই ঘরে। মুকুল যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো ছবিটা। মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। আমার ঠোঁটের কোণে হাসি, ওর নজর এড়ায় নি। বললো, আমাকে চিরকালই তুমি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কোরে আসছ। ভেতরটা তো কোনদিন বুঝলে না, দেখলে নাও। শুধু বাঁধা ছকের কথা শিখেছ কটা। —দেখেছি বুঝেছি।

মুখখানা গম্ভীর কোরে বলেছে, কিচ্ছু দেখনি, কিচ্ছু বোঝনি। তুমি আমার কাছে একটা ছবি হয়ে গেছ। ছবিতো কোন কিছু বোঝায় না আমায়। আমি যা বোঝাই সে নীরবে শোনে।

ছেলেমানুষের মতো মুখ কোরে বোসে আছে মুকুল। এমুখ আমার খুব ভালো লাগে। আমি দেখে আনন্দ পাই। তা বলে ও অশান্তি পাক আমার জন্যে, এটা কিন্তু আমি চাই না। চুপচাপ বোসে আছে মুকুল। আমার ভেতরে হাসির তুফান উঠছে। হাসি চেপে রাখতে পারছি না আমি। একটু জোরেই হেসে উঠেছি। নিজের কানে নিজেরই কি বিচ্ছিরিই না লেগেছে। মুকুল না কিছু ভেবে বসে আবার। যা ভেবেছি তাই।

মুকুল বললো, আমি জানি, আমার ব্যথা তোমাকে খুব আনন্দ দেয়। আচ্ছা নূপুর, তুমি বলতে পারো —জলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি আমি, তার প্রতিকারতো কিছু করছ না।

আমি অপ্রস্তুত, আমি বিব্রত।

বললুম, ঝকমারি হয়েছে হেসে ফেলে। ওই জন্যেই তোমায় বারে বারে বলি, আমার দিক থেকে ঘরসংসারের দিকে একটু বেশি কোরে মন দিলেই তো হয়। অনিমা খুশি হবে, ওর উগ্র মেজাজটাও কমবে একটু। আমার এখানে আসা-যাওয়া নিয়েইতো যতো অনাসৃষ্টি। এটা আমি তোমাকে বোলে বোলেও বোঝাতে পারছি না।

মুকুল ফোঁভে ফেটে পড়লো। এখানে না এলে আমার বাঁচা দুষ্কর। তোমার কাছে এলে নিজেকে ভুলি, অনিমার নির্যাতন ভুলি। তুমি অনেকবার বলেছ, এটাও আমার একটা বন্ধন। তোমার কথাতেই বলি এ বন্ধনে আমার মুক্তি, আমার শান্তি, আমার আনন্দ। এখানেও যদি তুমি নির্দয় হও, তোমার কাছে আসতে বারণ করো, আমার বলার কিছু নেই।

আমার ভেতরে একটা ফোঁপানো কান্না মাথা কুটতে শুরু কোরে দিয়েছে। করুণ কান্নার সুরে শুনছি আমি কে যেন বলছে, কে যেন নয়—আমি-ই আমাকে বলছি, কথার মোড় ঘুরোতে গিয়ে মুকুলকে সহজ-স্বচ্ছন্দ কোরে তুলতে গিয়ে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হানছ কেন? তুমি তার আশ্রয়, তুমি তার অভয়।

নিজের দু-কানে হাত চাপা দিয়েছি। বলে উঠেছি, তুমি নিশ্চয়ই আসবে। যখন ইচ্ছে হবে, যখন সুযোগ পাবে তখুনি। আমি তোমায় ধারণ কোরতে পারি একথা ভাবলে কেমন কোরে, ভাবছ কেমন কোরে?

কোন উত্তর দেয়নি মুকুল। হাসির ঢল নেমেছে ওর মুখ জুড়ে।

আমার মনের আকাশে পরম তৃপ্তিভরা জোছনা-ঝরা পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আবার। সেই চাঁদের মধ্যিখানে একবার দেখেছি আমি মুকুলের হাসিমাখা মুখ। শোকের ছায়া মুছে যাওয়া শান্ত সুন্দর আর একখানা মুখ। সে মুখ তরুণদার।

নীপা বিহনে তরুণদা'র বাঁচা বৃথা। তরুণদা এই স্থূল দেহ ছেড়ে দিয়ে পরলোকে নীপার কাছে যাবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছিলো। কারো কোন কথা শুনবে না, যাবেই। স্বাভাবিক মৃত্যু না হয় না হবে। তাতে কি এসে যায়। মৃত্যু তো নিজের হাতের মুঠোয়।

আমি শিউরে উঠে বলেছি, অপঘাতে মরলে শুনেছি তো প্রেতাত্মা হয়। তার আরো যন্ত্রণা, তার মুক্তি নেই। কি কোরে পৌঁছুবে তুমি নীপার কাছে? প্রেত পরলোক আত্মা এ বিষয়ে বরাবরই আমার ভেতরে একটা খটকা রয়ে গেছে। কেবলি মনে হয় এসব সান্ত্বনা। সাময়িক পাগলামোয় মানুষ অনেক কিছু কোরে বোসতে পারে, জীবন বিসর্জনও দিতে পারে। এই মারাত্মক বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যেই এ সমস্ত সৃষ্টি।

তরুণদার মুখ দেখে মনে হল মনঃপূত হয়নি আমার যুক্তি। সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি যে তরুণদা ঘোর নাস্তিক বোলে অনেক আস্তিকের কাছে এক সময় হেয়'র পাত্র ছিলো —না মানতো পরলোক না মানতো ধর্মজগত, কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। সেই তরুণদা নীপার মৃত্যুর পরে আত্মা ঈশ্বর মরলোক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর আমি তার যুক্তি খণ্ডন কোরতে গিয়ে নাকাল হয়ে পড়ছি। উপনিষদ পুরাণ বেদ — নানা বই থেকে নানা শ্লোক এনে আমার যুক্তি খণ্ডন করবার কি প্রাণপণ চেষ্টা।

একটা ভয়ানক ত্রাস আমার মনে জেঁকে বসছে —কখন কি কোরে বসে তরুণদা। ওর ইহলোক ত্যাগের চিন্তা থেকে কিছুতেই আমি নিরস্ত কোরতে পারছি না। কার কাছে প্রার্থনা করব ওকে বাঁচানোর জন্য, ওর এই ভ্রম ঘোচানোর জন্য —ভেবে কূল কিনারা পাইনি আমি।

আমার মনে হয়েছে নিজের ভাবাটাই মঙ্গল কামনাটাই হয়ত বাতাসে ভেসে ওর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার কোরবে। ওর মন সুস্থ-সবল হয়ে উঠবে। ওর সিদ্ধান্ত থেকে ও ফিরে আসবে নিশ্চয়।

ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে দুর্গাপুজোয় ম্যাজিক দেখতে গেছি শোভাবাজারের রাজবাড়ির রাস্তায়। কি না এসেছে পুজোয়! সারি সারি দোকান সার্কাস নাগরদোলা ঘোড়দৌড় ম্যাজিক।

বোধহয় বাংলাদেশের গ্রাম গ্রামের খেলা শহরের খেলা একটি জায়গায় উঠে এসে পাশা-পাশি বোসেছে। পর পর তিন বাড়ি পুজো। রাস্তায় চলা দায়, পুজোর আঙিনায় ঢোকা দায়।

লোক আর লোক।

বাঘঅলা বাড়ি, গোপীনাথের বাড়ি আর বৌরাণীর বাড়ি—তিনটি প্রতিমাতেই যেন সত্যি সত্যি দেবী দুর্গা নেমে এসেছে। লোকেদের মুখে মুখে ঠাকুরের প্রশংসা, হেঁটে বেড়াচ্ছে বাঘঅলা বাড়ির সাদা সিংহ। গোপীনাথ আর বৌরাণীর বাড়ির সিংহ রূপোর তবকে মোড়া —যেন রূপোর সিংহ। মাথার কেশর কি, যেন সাদা চামরের চুলে ভরা। ঘামতেল মাখা মুখে টস টস কোরে সত্যি সত্যি ঘাম ঝরে পড়ছে।

পুজোর মেলাতেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে ম্যাজিক দেখেছি। সম্মোহন করার ম্যাজিক। একজনের চিন্তাভাবনা সম্মোহনে ঘুমিয়ে পড়া লোকটা গড়গড়িয়ে বোলে যাচ্ছে।

তরুণদার বেলায় এই কথাই মনে হয়েছে আমার। আমার মনের ইচ্ছে, একান্ত ইচ্ছে তরুণদাকে ঘোরাবেই ঘোরাবে। জানি না এ চিন্তার ফল, না তরুণদার বরাত —নিজের মুখেই এসে বললো একদিন, জানিস নূপুর, উপনিষদ বোলেছেন, মরার পর পরলোকে আত্মা বিশ্রাম করে, ঘুমোয়। তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, তাকে বিব্রত করা উচিত নয়। জানিস, সে না ওঠা পর্যন্ত আমার কিছু করা ঠিক হবে না মনে হচ্ছে। আমি গেলে আমাকে চিনবে কে?

আমি নিজের মনকেই বোলেছি, এই চিন্তাটাই যেন তরুণদা'র মাথায় ঢুকে অমর হয়ে বোসে থাকে। আর যেন না আমাদের ছেড়ে ওর চলে যাবার ইচ্ছে জেগে ওঠে কখনো, কোনদিন। কেন না তরুণদা এর আগেও যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমার অনুরোধে শপথ কোরে এগোতে গিয়েও পেছিয়ে এসেছে। কিন্তু আবার আগের ভাবই ওকে পাগল কোরে তুলেছিল নীপার কাছে যাবার জন্য, অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

চাঁদের মধ্যিখানে এবারে দুটি মুখের প্রশান্তি দেখেছি। তরুণদা আর মুকুলের।

॥ চার ॥

ম্যারাপের তলায় লাল সাদা পদ্ম আঁকা সামিয়ানা টাঙানো। ভেতর মহলের বাড়ির ছাদে গানের আসর বোসেছে। এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। এটা সম্পূর্ণ মেয়ে মহলের এক্তিয়ারে। গরাণহাটা থেকে পাঁচালী গানের বিখ্যাত দল এসেছে। মেয়ে বাজিয়ে মেয়ে নাচিয়ে মেয়ে গাইয়ে। কেউ বেহালা বাজাচ্ছে কেউ তবলা কেউ খঞ্জনী কেউ বা আবার হারমোনিয়াম।

একটি তরুণীকে ঘিরে এক তানে এক লয়ে সমবেত বাজনার ঢেউ দুলে দুলে উঠছে। তরুণীটি দাঁড়িয়ে। শুধু ওর কণ্ঠস্বর কথা কইছে না, কথা কইছে ওর পায়ের আঙুল হাতের আঙুল —সমস্ত দেহ —নাচের ভঙ্গিমায়।

তরুণীর ঠোঁটে মৃদু হাসি মাখানো। গাইছে—

প্রেমে যদি হবে সুখী,
বোঝো আগে প্রেমটা কি—।

সকলেই সমঝদারের ভূমিকা নিয়েছে। মা মাসিমা দিদিমা ঠাকুরমা কেউ আর বাকি নেই। সকলেই ঘাড় দোলাচ্ছে। এমন সুযোগ বড় একটা সব সময় আসে না। বিয়ে-থা পুজো-পার্বণে এই জলসার আয়োজন মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে।

বাড়ির মধ্যে চিক ঘেরা বারান্দার মধ্যে দিনরাত বেড়ানো। বায়স্কোপ থিয়েটারে নেটের পরদা ঘেরা। সে সব থেকে এসব জলসায় বেশ খোলামেলা। আনন্দ নেচে নেচে বেড়াচ্ছে সবার মনে সবার প্রাণে। গানের-নাচের তালে তালে।

আমিও শুনছি। গানে তন্ময় দিদিমা। দিদিমা রাঙাদির বিয়ের নেমন্তন্নে এবাড়িতে এসেছে। রাঙাদি আমার জ্যাঠতুতো বোন—মেজো জ্যাঠার মেয়ে। গানের মাঝখানে দিদিমা বোলে উঠলো হঠাৎ—দূর ছাই, কি গান গাইছে! প্রেমটা কি প্রেমটা কি! টাকি টাকি আর শুনতে ভালো লাগছে না। সেদিন স্টারে গিয়ে গহরজান বাঈয়ের কি গানই না শুনে এলুম।

দিদিমার দিকে সকলের দৃষ্টি আটকে পড়েছে। দিদিমা বেশ বৈঠকি লোক। আসর জমাতে মস্ত ওস্তাদ। কথা বলার ঢংঢাং এমন, লোকে না হেসে পারবে না। গান থামিয়ে দু কান পেতে দেবে কথা শোনার জন্যে।

তরুণীটি বোসে পড়েছে। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। শিল্পীর মনে আঘাত, মুখের ওপর ভালো না বলা যে শেল বেঁধানো কি ব্যথা, শিল্পী ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। ওর দলের মেয়েরাও চুপচাপ বোসে আছে। ধনীর বাড়ি পরসা দিয়ে এনেছে। ভালো হলে পুরস্কার, খারাপ হলে তিরস্কার--এটা তো তাদের জীবনের প্রধান পাওনাই।

গহরজানের গান আর চিত্তরঞ্জনের লোক হাসানো কমিক এত মুখে মুখে ছড়িয়েই রয়েছে, ওদের প্রশংসায় তো ছেলে-বুড়ো পঞ্চমুখ। দিদিমা তার চোখে দেখা কানে শোনা কাহিনী বলতে শুরু কোরলো।

--স্টার থিয়েটারের একতলা দোতলা তেতলা সব লোকে ভর্তি। আরম্ভ হবার মুখে শোনা গেলো গহরজানের আসতে একটু দেরী হবে। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর ট্রাম লাইনে আটকে চিৎপটাং। গাড়ী অচল।

দর্শকরা হৈ-হুল্লোড় কোরতে লাগলো, টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হোক। ফেরত দেওয়া হোক।

দিদিমা নিজের বুকের বাঁদিকটা চেপে ধরে বললো, উঃ, সেদিনের কথা মনে পড়লে আজো বুকের ভেতর ধড়ফড় কোরে ওঠে আমার। নারায়ণকে মনে মনে গালাগালি দিলুম আমি, দু' চোখের মাথা খেয়ে আছো তুমি। কানেরও মাথা খেয়েছো। বেরুনোর নামে কর্তা তো খড়গহস্ত। হারেমের বেগম কোরে রেখেছে। কর্তাকে বলি, হ্যাঁগা, বয়েস তো হয়েছে আমার। সে রূপ আর আমার নেই। একটু থিয়েটার বায়স্কোপ দেখলে ক্ষতি কি?

কর্তা রেগে গরগর কোরতে কোরতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তিন চার দিন ধরে কথা বন্ধ, ঘরে আসা বন্ধ। শেষে ক্ষমা চেয়ে তবে নিস্তার। আর কোনদিন কোথাও যাবার কথা বলব না। যদি বলি কোনদিন, এমুখে যেন কুষ্ঠব্যাধি হয়, খসে যায়। আমার মুখে কুষ্ঠব্যাধির কথা শুনে কর্তার মুখে হাসি ফুটলো, আমার মনে হোল আকাশের ঘন কালো মেঘ সরে গিয়ে সুয্যিমামা উঁকি মারলো।

কর্তার দৌলতেই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো একদিন আমার। কি জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, কর্তারই হবে বা। একে তো মানুষটা বছরে একদিন হাসে কিনা সন্দেহ। সেদিন একগাল হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার মনে হয়েছে হাসির পেছনে ঘকুনির রাশি লুকিয়ে নেই তো। এতদিন ঘর কোরে ওর মন তো বুঝেছি আমি। এ-মানুষ যেন সেই মানুষ। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে হাতে চাঁদ।

কর্তা বললো, অমন হাবাগোবার মতো চেয়ে চেয়ে দেখছ কি? আরে তোমার টিকিট কেটে এনেছি। গহরজানের গান, চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কমিক--স্টারে।

আমি হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছি। লোকটার আমার ওপর টান আছে তাহলে, মমতাও দেখছি। একেবারে পুরোপুরি নিষ্ঠুর নির্দয় নয়।

আসরের সকলে হো হো কোরে হেসে উঠলো। ঠাকুরমার বোনও এসেছে। খুব সুরসিকা। আমরা ছোট-ঠাকুরমা বোলে ডাকি। ছোট-ঠাকুরমা হাসতে হাসতে বোললে, তারপর দিদি, বলি, ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে কনে-বৌকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে গেলো নাকি থিয়েটার দেখতে?

ঠাকুরমা বললো, তুমি দিদি জ্যোতিষী দেখছি। কেমন কোরে জানলে বলো দেখিনি? সত্যি সত্যি উনি একটু এগিয়ে এসে খাটের বাজু ধরে চাপা গলায় বলেছেন, বাসরঘরের সেই লাল বেনারসীটা আজ একটু পরো। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে ফেলেছি আমি। জোরে হাসবার উপায় নেই। মানুষটা যদি আবার রেগে ওঠে। ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট তো। মেজাজের চাকা কখন কোন্‌দিকে ঘুরছে, বিধাতাও জানেন না বোধহয়। আমি তো কোন্ ছার।

বোলতে যাচ্ছিলুম, এই বয়েসে—

জিভের লাগাম কে যেন টেনে ধরে বোললে, আদেশের বিরুদ্ধে গেলে যাওয়া পণ্ড।

অগত্যা সেজেছি। সোনার জরির ফুল তোলা শাড়িতে নিজেকে সাজিয়েছি। নিয়ে যাবার সময় কর্তা বলেছে, এখনো তুমি সেই কনেবৌ-ই রয়ে গেছো। বয়েসটা আমারই বেড়ে গেছে দেখছি।

আমি আর কি বলি--আড়চোখে দেখে বললুম, তোমাকেও তো সেই আগের মতোই মনে হচ্ছে। কই বয়েস বেশিতো দেখাচ্ছে না। কর্তার মুখে হাসি না ফুটলেও, দু' চোখে খুশির ঝিলিক মেরে গেছে।

স্টারে বোসে বোসে ভেবেছি, এত আশায় এত আনন্দে বুক ভরে নিয়ে এখানে এসে শেষে কিনা গহরজানের আসতে দেরী। ওঃ ভাগ্য বটে আমার।

ড্রপসীন উঠলো।

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী পেশোয়াজ পরে ওড়নায় মুখ ঢেকে স্টেজে এসে হাজির হলো। ড্যাররা ড্যাররা বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে সেকি গান। গহরজানের ঢঙে কি হাতমুখ ঘোরানো---নাড়া।

নিমেষের দেখা যদি পাই তোমার-ই
আঁখিতে মুছাই যত বলাই তোমার-ই---।

গহরজানের বিখ্যাত গান নানা ঢঙে গেয়ে শোনালো চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। গোটা থিয়েটারটা তো হেসে খুন। ফেটে পড়ছে হাসিতে হাততালিতে। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেলো, কতক্ষণ গহরজান আসেনি তা কেউ বুঝতেও পারেনি। হাসানোর কি যাদু! কি মোহ, মনকে ভুলিয়ে রাখার কি দারুণ ক্ষমতা!

শেষে চিত্তরঞ্জন গোস্বামী বাঈজীর ঢঙে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আদাব জানিয়ে বললো, নকল গহরের গান শুনলেন আপনারা।

ড্রপসীন পড়ে গেলো।

দিদিমা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে যেন খানিকটা নতুন কোরে দম নিলো। মাথার পাকা চুলের সিঁথিতে লাল টকটকে সিঁদুর। ঝাড়লণ্ঠনের বাতির আলোয় গোলাপের পাপড়ি হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, কেমন হোয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে গোলাপের মিষ্টি সুবাস আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে সত্যি সত্যি প্রবেশ কোরছে। একটা সুন্দর অনুভূতি।

দিদিমা বোলতে শুরু কোরলো আবার, এখনকার লোকেদের গুণী জ্ঞানীর ওপর কি হিংসে কি হিংসে। অত বড় গুণী জ্ঞানী গহরজান, রূপসী গহরজান। এতটুকু দেমাক নেই। এখানকার মেয়েদের ভুঁয়ে পা পড়ে না। না আছে রূপের ছিরি, গুণে নুন দিতে নেই।

আমার সই কদমও এসেছে, হেসে কুটি-কুটি। মিহি গলায় আধো-আধো কথায় বোললো, বলি, দিদিমা, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে এসব কথা কেন বোলছ বলো তো সেই থেকে। বলি, তোমার কি ষাট থেকে ষোলোয় নামবার উপায় নেই বোলে আমার ওপর এত কুনজর পড়লো? দেমাকটা দেখলে কোথায় আমার?

দিদিমা মুচকি হেসে বোললো, পড়লো কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। আমি কি কারো নাম ধরে বলেছি? তোর রূপ জাহির করার অত কি দরকার ছিলো একটা ছুতোয়নাতায়। ওই দ্যাখ, দরজার ওপাশে ছোঁড়াগুলো ভিড় কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে তো ঢোকবার উপায় নেই। তোকেই তো একদৃষ্টে দেখছে সেই থেকে দেখছি।

কানের কাছে মুখ এনে বোললো, তোমারও নাগর নির্মলও রয়েছে ওর মধ্যে। দু'দিন বাদে যেতে হবে তো ওর ঘরে। তরুণদার ছোটভাই নির্মলদা।

মুখে হাত চেপে ধরা যাকে বলে সেই অবস্থা কদমের। লজ্জায় রাঙা হোয়ে উঠলো মুখ চোখ। মাথা নিচু কোরে বোসে রইলো কদম।

ঠাকুরমা বোলছে, চুপসীন উঠলো। গহরজান ষ্টেজে এসে দাঁড়ালো। আ-হা-হা-হা। স্বর্গ থেকে কোন অপ্সরী এসে দাঁড়ালো যেন। কথা কইছে না তো, যেন গান গাইছে। সেও শোনবার মতো। মনে মনে কর্তার সুখ্যাতি করছি। কর্তা বেঁচে থাকুক, আমাকে এইরকম কোরে নিয়ে আসুক বারে বারে। না নিয়ে এলে তো এইসব দেখা ঘটত না ভাগ্যে।

গহরজান সবাইকে আদাব জানিয়ে বোললো, আপনারা চিত্তবাবুর মুখে যা শুনলেন অপূর্ব। আমি ষ্টেজে কেমন করে গাই।—নিজেকে তো দেখি না, জানি না। আজ নিজেকে দেখলুম জানলুম। চিত্তবাবুকে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমি যে গান গাইবো, আমার গাওয়া যে গান চিত্তবাবুর মুখে শুনলেন সে গান নয়। সে গান আর জমবে না, ওঁর মতো গাইতেও পারবো না। অন্য গান গাইলো গহরজান।

দিদিমা উঠে দাঁড়ালো। বাঈজীদের কায়দায় দু'হাত বাড়িয়ে বোললো, আমিও কিছু কিছু গান জানি। গহরের মতো না গাইতে পারলেও মন্দ গাইবো না বোধহয়।

আমার বুক দুরু দুরু, দিদিমা না অপদস্থ হয় শেষে। ভীমরতি আর কাকে বলে। কদম ঠিকই বোলছে, ঘাটে পড়ে ষোলোয় নামতে ইচ্ছে হোয়েছে দিদিমার। পাঁচজন জ্ঞাতি-সজ্জন বোসে রয়েছে। এরা যদি হাসাহাসি করে, বিদ্রূপ করে, আমার তো লাগবেই। যাই হোক করারও তো কিছু উপায় নেই। আসরের ব্যাপার। বোসে আছি এক কোপে। উঠে যাওয়াটাও মোটেই শোভন নয়। অন্তত আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেটা অসম্মানের। বনেদী পরিবারের চরম মর্যাদাহানি। আমার হোয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা।

দিদিমা চিৎকার কোরে বোলে উঠলো বাজিয়েদের, বলি তোমাদের গান বন্ধ কোরে দিলুম বোলে ভেব না কিছু। বেশ-ই বাজিয়েছ সব, বেশ-ই গেয়েছ। মন খারাপ কোর না, আমার গানের সঙ্গে একটু বাজাও। পরে আবার গাইবে, আবার মাচবে—পুরস্কারও পাবে, ভয় নেই। আমার একটা গান গাইবার ইচ্ছে বোলে এত গৌরচন্দ্রিকা করলুম।

এগান অমৃতলাল বসুর 'খাসদখলে'র গিরি-বালার গান।

ওই ষ্টারেই কর্তা নিয়ে গেছল, নীহার-বালার গান—কি গলা। সে গলা আমার নেই। কর্তার সঙ্গে গিয়ে দেখেছি শুনেছি—গান সুর কথা আমার মাথায় বোসে গেছে। এমন গায় নীহারবালা, যারা দেখছি তারা—আমরা যেন ওর অন্তরের ব্যথা শুনছি। ও আমাদের তার নিজের বুকের জমা কষ্ট উজাড় কোরে ঢেলে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজছে। গাইছি। গানের কথায় ওলোট পালোট হোলে আর সুরে ভুলচুক হোয়ে গেলে তোমরা আবার কেউ কিছু মনে কোর না।

দিদিমা গান গাইছে না তে, সবার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে প্রশ্ন কোরছে।

'ওগো, তোমরা কেউ বলো না গো
ভাতার কেমন মিষ্টি?
আমার শুধু হয়েছিলো যে গো
ছেলেবেলায় ছেলেখেলা কোরে শুভদৃষ্টি।
মিষ্টি গুড় মিষ্টি চিনি আর মিষ্টি মধু
কিসের মতোন মিষ্টি হ্যাঁগা,
দাতটি পাকের মধু?
সে যে তেষ্টার জল
চেষ্টার ফল
জষ্টিমাসের দুপুর বেলার বৃষ্টি।
মিষ্টি ছিল বাপের আদর
আর মায়ের কোল।
ফাল্গুন মাসের ফাগের খেলায়
কচি আমের ঝোল।
তার চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার
নারীর ধর্ম কর্ম ইষ্ট।
মিষ্টি বড় সেই বিধাতা
যার মিষ্টি ভাতার সৃষ্টি।
ভাতার কেমন মিষ্টি?

গান শেষে দিদিমা জোড়হাত কোরে বারকতে নমস্কার কোরে বোসে পড়লো। সকলের কি হাততালি। দিদিমার এমন মিষ্টি গলা। গান আমি আগে শুনিনি। আমিও হাততালি না দিয়ে পারলুম না।

কদম আর আমি ছাদের দরজার দিকে তাকাতেই দেখি মুকুল নির্মল দু'জনে দু'জনের ঘাড়ে হাত দিয়ে হাসছে। হাত নামিয়েই ওরা জোরে হাততালি দিয়ে বোলে উঠলো, এনকোর এনকোর দিদিমা, আর একখানা।

দিদিমা জিভ বার কোরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বোললো, ওমা একি কেলেঙ্কারী গো। লজ্জায় মরি, ঘেন্নায় মরি। জোয়ান-মরদগুলো ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্তা যদি আমাকে দেখে এখানে তা'লে কি আর রাখবে? এখুনি নিয়ে যাবে। কি অন্যায় কি অন্যায়।

মুকুলটা বরাবরই ফাজিল। ও বোলে উঠলো, দাদুর বলার কি ধার ধারি। তার আগেই তোমাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব। দাদুর বলার কি ধার ধারি, তুমি কি দাদুর একার? তোমায় নিয়ে বাধুক যুদ্ধ, আমরাও প্রস্তুত।

দিদিমা ছদ্মকোপে বোললো, কি বেহায়া ছোঁড়ারা। নিয়ে যাবার মাকে তাকে নিয়ে যা না এসে। যত সব ওস্তাদি। মেয়েছেলেদের মাঝে কথা কইতে আসে এমন ছেলে তো দেখিনি। বাবা, আমাদের বিয়ের সময় তো একটা পুরুষ টিকটিকির অবধি চোকার হুকুম ছিলো না।

আমার দিকে চেয়ে ফিক কোরে হেসে ফেলেছে। বোলেছে, নূপুর, তোর বুঝি রাগ হোল? মুখে মেঘ নামলো দেখছি। সব বুঝি সব বুঝি। একি আর আমার গান শুনতে এসেছে ওরা। কদম রয়েছে, তুই রয়েছিস, নির্মল মুকুল আসবেই তো।

লজ্জায় ওরা দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে পড়িমরি কোরে পালালো। তিনতলা দোতলা একতলা একেবারে বাইরের রকে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা বাজনা শুনতে পাচ্ছি, বর আসছে চতুর্দোলায়। গ্যাসের আলো দিয়ে সমস্ত দোলাটি সাজানো, কিন্তু সব আলো যেন ম্যাড়ম্যাড়ে দেখাচ্ছে। আমরা—মেয়েরা ছাদ থেকে নেমে এসে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছি।

মেজো জ্যাঠার ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছে। কেনই বা শ্রাবণ মাসে বিয়েটা দিতে গেলো। সারাদিন কি বৃষ্টি কি বৃষ্টি! বাড়ির মধ্যে সব ঘিরে রেখে, বৃষ্টির দাপটকে জব্দ করা হয়েছে কিছু। কিন্তু রাস্তায়। সেখানে তো কারুর হাত নেই, এক আকাশদেবতা ছাড়া। এক তো রাস্তায় এক হাঁটু জল। তার ওপর আরো মুষলধারে নামলো বৃষ্টি, ক্ষণ বুঝে। বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।

বরের জরির পাড় বসানো ধুতি পাঞ্জাবি ভিজে সপসপে হোয়ে গেছে। বর বৃষ্টিতে নেয়ে বাড়িতে ঢুকলো।

বরণ করার আগে মা তরতর করে নিচে নেমে এসে বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে কানে কানে বললো, জামাকাপড় ছাড়িয়ে গা-হাত-পা মুছিয়ে তবে ওকে সিংহাসনে বসাবে। নাহলে সর্দি লেগে যাবে।

আমিও মায়ের সঙ্গে নিচে নেমে এসেছি। মাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। সবুজ বেনারসীতে মানিয়েছে ভালো। করসা মানুষের রঙ আরো খুলেছে। সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। কপালে সিঁদুরের বড় টিপ। একেবারে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ।

দু'পায়ে আলতার নুটির টান। নিখুঁত—একটুও আঁকাবাঁকা হয়নি। নাপিতবউয়ের হাতযশ আছে খুব। সকালে এসে ঝামা দিয়ে খুব কোরে পা ঘষে, ছোট চৌকির ওপর পা তুলে কি যত্ন কোরে আলতা পরানো। আলতা-পাতা জলে ডুবিয়ে রঙ বার কোরে বারে বারে ছোপ ধরিয়েছে পায়ে। আমাকেও পরিয়ে দিয়েছে। মায়ের কপালের দিকে, মাথার দিকে চেয়েছি আমি।

মা চিবুক ধরে একগাল হেসে বোলেছে, তুই-ও পরবি। আর খুব বেশী দেরী নেই। যা আমি কদম উপরে উঠছি। বাবা তো বরকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেছে। কাপড় ছাড়ানো, গা মোছানোয় ব্যস্ত।

দোতলার সিঁড়ির চাতালে দেখা হোয়ে গেলো মুকুল আর নির্মলের সঙ্গে। ওরা নাবছে। কদমকে উদ্দেশ কোরে মুকুল বোললো, বাবারে বাবা, যা দেখছি। কোন্ আহাম্মক শ্রাবণ মাসে চতুর্দোলায় চড়ে? আমার শ্রাবণ মাসটাকে বাদ দিতেই হবে।

কদম বোললো, কেন, তুমি কি বাদুলে ছেলে নাকি? এত ভয়। আমি মাসিমাকে বোলেকয়ে শ্রাবণ মাসেই ব্যবস্থা কোরছি।

মুকুল বোললো, নির্মলের কোন ভয় নেই, ও শ্রাবণ মাসেই রাজী। কিরে নির্মল, বল না তুই।

নির্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার ভান কোরে বোললো, আমার আবার শ্রাবণ-ভাদ্র। অরক্ষণীয়াদের উদ্ধার কোরতে গেলে ভাদ্র মাসেও হয় শুনেছি। পাঁজিতেও নাকি তাই লিখেছে।

কদমের আবার কোন কথায় ভয় সয়না। কদমকে আমরা সময় সময় ঠাট্টা কোরে ফুলটুসি বলে ডাকি। ও অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলে, তোরা ধানের তুষ—তুষি। ফুলটুসি তবু তো ভালো।

কদমের উত্তর শোনার জন্য নির্মল উসখুস কোরছে।

কদম আশ্চর্যময়ীর গানের কলিটা গেয়ে কথার জবাব দিলো। 'সে যে আমার কত আপন আগে জানিনি, এলো কাছে আরো কাছে, কেন ডাকিনি।'

মিটিমিটি হাসছে মুকুল আর নির্মল। একতিল না দাঁড়িয়ে আর কদম আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ওপরে চললো।

॥ পাঁচ ॥

রাঙাদির বিয়ের পর থেকে মুকুলের কেমন পরিবর্তন লক্ষ্য কোরেছি আমি। যে মুকুল আমার ধ্যানের দেবতা, সে মুকুলকে শত চেষ্টা করেও কিছুতেই ফিরে পাচ্ছিলুম না। কি অস্বস্তি, কি অশান্তি বোলে জানাতে পারবো না। বারে বারে বোলেছি মুকুলকে, মুকুল, তুমি আগেকার মনে ফিরে এসো।

মুকুল বোলেছে, কেমন কোরে হয়? তুমি কি দশে ফিরে যেতে পারো, আমি বারোয় ফিরে যেতে পারি? সবুপুরে চুয়ান্ন বিঘের কাছাকাছি সেই বাগানে কানামাছি খেলতে পারি কি দু'জনে?

আমি বোলেছি, তোমার সেই দুষ্টুমিমাখা মুখ আমি যে এখনো দেখি। সে মুখ সে খেলার দৃশ্য মনে পড়ে যায় তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে।

গম্ভীর মুখে মুকুল বোলেছে, নূপুর, তোমার এ ন্যাকামো আমার ভালো লাগে না। যত বয়েস বাড়ছে, দিন দিন তুমি ছেলেমানুষ হোয়ে যাচ্ছো। যতো সব কল্পনাবিলাস। আঠারো-উনিশ বয়েস হোয়ে গেলো যে সে খেয়াল তোমার নেই। আমারও তো একুশ-বাইশ। আমি ভেবে বসে থাকবো তুমি দশ আর আমি বারো। কি অবান্তর কথাবার্তা। এসব শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। আমায় ভালো না লাগে, স্পষ্ট বোলে দাও। তোমার ত্রিসীমানা মাড়াবো না।

আমার বুকের বাঁদিকে কে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে—এমন যন্ত্রণা। সব চেয়ে বেশি দুঃখু আমার—ও আমার ভেতর দেখতে পাচ্ছে না। আমার মন বুঝতে পারছে না। এমন কথা ওর মুখ দিয়ে শুনতে চাই না আমি। তবু শুনতে হয়, শুনতে হচ্ছে। নিজের কষ্ট চাপবার জন্য কোন কথা না কোয়ে তাড়াতাড়ি আমি চলে গেছি পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে একা ঘরে কেঁদেছি বোসে বোসে।

সত্যি কথা বলতে কি, ও না আসুক—এটা আমিও মনে প্রাণে চাই না। বরং ও এলে আনন্দে ভরে ওঠে আমার ভেতর। আমি যেন পুনর্জন্ম লাভ করি। ও না এলে আমি নিষ্ক্রিয়, আমি মৃত। আমার চারিধারে সব ফাঁকা, সব শূন্য।

আমার ওপর রাগ কোরে, আসব না বোলেও ও এসেছে। নিয়মমাফিক যথাসময়েই এসেছে। সন্ধ্যের মুখোমুখি। আমি ওই সময়টায় অর্গান বাজিয়ে গান গাই। কেন জানি না সন্ধ্যে আমার ভালো লাগে। মনে হয় মন্দিরে প্রদীপ জলে উঠছে, বীণার তার বেজে উঠছে, সকল দরজা আপনা হতেই খুলে যাচ্ছে।

ধ্যানেতে আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখতুম। যেন তাঁর শ্রীচরণের তলায় বোসে আছি। তিনি গাইছেন—মন্দিরে মম কে-----।

আমিও গাইতুম। আমার পিছনে চুপিসারে এসে কখন দাঁড়িয়েছে মুকুল, আমি জানতে পারিনি। কিন্তু এ গানের পর আমার আর কোন গান গাইতেও ভালো লাগে না। শুনতেও ভালো লাগে না।

মনের কথা জানাতে কিছু বাকি রাখিনি আমি মুকুলকে। শোনে কই। আমাকে জানিয়ে যে ওর কি সুখ, তা বুঝিনি, কোত্থেকে কি একটা গান শিখেছে, শোনানো চাই-ই, চাই।

ও গাইবে।

'আঁখির আলিঙ্গনে, তোমার আঙিনায়।
নিতি আসি প্রিয়া তাই,
দিয়েছি হিয়ায়।'

এ ধরনের গান এধরনের ভাষা মুকুলের মুখ দিয়ে বেরোক—এটা আমি চাই না। এ গান যখন শুনি আমি আমার কানে তালা ধরে যায়। সমস্ত স্নায়ু শিথিল হোয়ে যায়। আমি

কোথায় কোন্ অন্ধকার রাজ্যের হিমঘরে গিয়ে মন উপস্থিত হই।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাই, মুকুলের চেহারাটা—আমার দৃষ্টিভ্রমে হয়ত বা সে জায়গায় দেখতে পাই না আর। ও হারিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। আমি শিউরে উঠি, সচেতন হোয়ে উঠি। মনে মনে মঙ্গল কামনা করি। একি অলুক্ষুণে দৃষ্টি আমার! ভালো কোরে তাকিয়ে দেখি, ও দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেইখানেই। বোলছে, কি হয় তোমার বলো তো, ও রকম চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড় কেন?

আমার বুকের ভাষা ঠোঁটের ডগায় কাঁপন ধরিয়েছে কিন্তু আমি বোলতে পারিনি। বলা ঠিক হবে না—অজানা আশঙ্কা। আমার দেখা সম্বন্ধে ওর একটা ধারণা আছে। সেই ধারণার বশে ও না আবার ভেবে নেয় ওর অশুভ কিছু আসছে হয়ত।

আমি ওকে বোলেছি, আচ্ছা মুকুল, যতই তর্কাতর্কি করো না কেন, দেহেতে না ফিরে গেলেও দু'জনের মন কি ছোটবেলার মনে ফিরে যেতে পারে না? ও হেসে বোলেছে, সবার কাছে সেটা সম্ভব নয়। তোমার মতো মাথা-পাগলদের কাছেই এসব অসম্ভব রকমের কথাবার্তা শুনতে হয়।

হ্যাঁ, আমাকে ছোটবেলায় আমার কথা শুনে অনেকে পাগল বোলেছে বৈকি। ছাদের পাঁচিল ধরে দাঁড়িয়ে আছি আষাঢ়ের মেঘলা দিনের বিকেলে। মেঘের দল সার বেঁধে চলেছে। সাদা কালো, কালো সাদা। আমার কেমন মনে হোত সাদা সাদা কত গরু ছুটে চলেছে। শিখীপাখা মাথায় কৃষ্ণ চলেছে গরুদের পেছনে পেছনে। আমি গেয়ে উঠেছি পূরবী সুরে।

'বাজে শ্যামের মোহন বেণু/বাঁশী শুনে সব চলিছে ধেনু।'

রাঙাদি পেছনে এসে চুলের বিনুনিটা নেড়ে দিয়ে বোলেছে, এখানে দাঁড়িয়ে একা একা গাইছিস কেন রে? আমি রাঙাদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বোলেছি, দ্যাখো।

রাঙাদি বাড়িময় হৈচৈ কোরেছে মেঘে শ্রীকৃষ্ণ দেখা নিয়ে। তরুণদা এসে বুঝিয়েছে ওসব কিছু নয়। তুই ওরকম মনে করিস, সব ভুল। মেঘে গরু কোথা, শ্রীকৃষ্ণ কোথা?

মন আমার মেনে নেয় নি। ভুল হোলেও ঠিক বোলে ভাবতে ভালো লেগেছে। কেউ যদি হাসিমস্করা কোরেও 'ঠিক' বোলেছে, তাকেও আমার ভালো লেগে গেছে। আমার মতে যারা মত না দেয়, তাদের কিন্তু ভালো লাগে না। বাবা-মায়ের আদুরে মেয়ে আমি। আমার বিষয় নিয়ে তারাও কিছু বোলতে এলে অসন্তুষ্ট না হোয়ে পারি না।

আমার অখুশির জন্যে শেষে বাড়ির কেউ আমার কোন ব্যাপারে কিছু মন্তব্য কোরতে এগিয়ে আসত না।

দেখা জিনিসটা বেশি কোরে চাউর হোয়েছে মধুপুরে আসতে।

চুয়ান্ন বিঘের কাছাকাছি বাগানবাড়ি পিসিমাদের। শীতের মরশুমে পিসিমারা এসেছে—পিসিমা পিসেমশাই পিসিমার দেওর তার ছেলে মুকুল—বোলতে গেলে ওদের বাড়ির সবাই। আর আমাদের বাড়ির আমি বাবা মা রাঙাদি তরুণদা নির্মলদা আর রাঙাদির ছোট বোন ইন্দ্রাণী।

বাগানে ছোট ঝিল কাটা রোয়েছে। তার ওপর সেতু, কাঠের। আমরা সেতু পেরিয়ে ফুলবাগানে যাওয়া-আসা করি। ঝাউগাছ দেবদারু গাছ, তার পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোই আমরা কানামাছি খেলার সময়।

—কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

চোখ বাঁধা অবস্থায় যে যাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারছে, সেই কানামাছি হচ্ছে আবার। অন্ধের মতো দু'চোখ বন্ধ হচ্ছে তার রুমালের বাঁধনে। মুকুল আমি নির্মলদা ইন্দ্রাণী রাঙাদি এই ক'জনে মিলে আমরা বিকেলের দিকে এই খেলা করি। সবাই প্রায় সমবয়েসী—দু'এক বছরের ছোট বড় এই যা।

মুকুল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। আমি দশ, মুকুল বারো। দুরন্তের একশেষ। গাছ ভাঙবে, ফুল ছিঁড়বে, পেঁপে ছিঁড়ে কাঁচা পেঁপেই চিবিয়ে খাবে, পাকা পেঁপে তো কথাই নেই। কলার কাঁদি রাখারও উপায় নেই। মেজ জ্যাঠাইমা তো ওকে এর মধ্যেই 'হনুমান' বোলে ডাকতে শুরু কোরেছে।

খেলাতে মারপিট তো লেগেই আছে। দস্যির ক্ষমতাও কম নয়। কার চুল ধরে টানছে, কার নাক ধরে টানছে। কার মাথায় ঘুষি, কার বুকে ঘুষি। মেজ জ্যাঠাইমা বলে, এমন দস্যি ছেলে তো দেখিনি। এর জ্বালায় দেখছি মধুপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে। বেড়ানো, শরীর সারানো মাথায় থাক।

পিসিমা এসে বলে, মেজবৌদি, ছেলের কুষ্ঠিতে আছে খুব ভালো। শ্রীকৃষ্ণও তো ছেলেবেলায় দুষ্টু ছিলো খুব। দুষ্টু ছেলেরা বড় হলে শান্ত হয়। আর শান্তরা হয় দুষ্টু। আমাদের জ্যোতিষীঠাকুর ওর কুষ্ঠি দেখে বোলেছেন।

মেজো জ্যাঠাইমা বোলেছে, ওভাবে আস্কারা দিও না হেমা ছেলের সামনে। এ কেমন কথা। জ্যোতিষী যদি শুণতো ঠিক, দোরে দোরে মাগতো না ভিখ। আমার বাবার অসুখে সব জ্যোতিষীই বোলেছিলো, দীর্ঘ পরমায়ু। দোরে যম এলে নিজেই হোঁচট খেয়ে পড়ে মরবে। বাবা বাঁচলো কই? বাবা মরে যেতে সকলে হায় হায়, কালসর্প যোগটাতো দেখা হয়নি। এই তো সব বিচারের নমুনা।

মুকুলকে কেউ-ই কব্জায় আনতে পারে না, শাসনে রাখতে পারে না। আমার সঙ্গে কিন্তু ও পেরে ওঠেনি কোন রকমে। আমায় একটা ঢিল মারলে আমিও দুটো ঢিল মারতে ছাড়ি না। আমার চুলের বিনুনী ধরে টানলে আমিও ওর চুল ধরে ঝাঁকানি দি। মারপিট হাঙ্গামা লেগেই রয়েছে, তবুও ও আমার কাছে আছে। ওকে দেখলে আমার কানে একটা কথাই বাজে—'শ্রীকৃষ্ণ'। পিসিমার মুখে শোনা, ছোটবেলাতে শ্রীকৃষ্ণও তো দুষ্টু ছিলো।

ছবির গোপাল-কৃষ্ণের মুখখানা ভেসে উঠেছে কতবার ওর মুখে—আমার কাছে এলেই।

চোখ বোজা অবস্থায়, ওই কিন্তু আবিষ্কার করে, আমার দেখা সত্যি। কানামাছি খেলার সময় আমি কানামাছি হোয়েছি। চোখ বোজা চোখ বাঁধা, তবু আমি ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হোয়েছি—গাছের আড়ালে যে জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে মুকুল নির্মলদা রাঙাদি।

চোখ বাঁধা অবস্থায় আমি দেখতে পেয়েছি স্পষ্ট কে কোথায়। আমি নাম ধরে ধরে বোলে দিয়েছি মুকুল তুমি ওখানে। নির্মলদা তুমি ওখানে।

বাড়ির লোকে কত জিজ্ঞেস কোরেছে আমায়—কেমন কোরে দেখি, দেখতে পাই?

আমি বোলেছি, আমার চেয়ে থাকার চেয়ে চোখ বোজা অবস্থায় স্পষ্ট হোয়ে ওঠে দূরের জিনিস। মনে হয় না চোখ বুজে আছি। যেন আমি সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছি।

আমাকে নিয়ে কত না গবেষণা হোয়েছে। জ্যোতিষীর কাছে মনের ডাক্তারের কাছে সাধুদের কাছে—কিছু রাখেনি বাকি বাবা-মা। কেন দেখি—তার কারণ খুঁজে বার কোরতে পারেনি কেউ। মনে হয় বোলেই বোলেছে সবাই। কেউ বোলেছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র দর্শন। কেউ বোলেছে তৃতীয় নয়ন আছে। কেউ বোলেছে, স্বপ্ন দেখার যাদুমন্ত্র ওর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। সত্যি স্বপ্ন দেখে। কেউ বোলেছে, জন্মান্তরের সাধনার ফল এটা। যোগ—দুরদৃষ্টি—শাপভ্রষ্টা যোগিনী ও।

যাক, আমার খাতির কিন্তু ক্রমে বেড়ে গেলো সবার কাছে। জ্ঞাতিদের বন্ধুদের আর পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে। বয়েস যতো বেড়েছে, ততো আমার দেখাটাও বেড়েছে। দেখার আগে কেমন অন্যমনস্ক হোয়ে গেছি। তারপর দু'চোখের পাতায় একটা ঘুমের আমেজ নেমে এসেছে। আমি যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। দেখেছি, কোন্ জায়গায় কে মৃত্যুপথের যাত্রী,

কোন্ মন্দিরে কে পুজোপাঠে মগ্ন—নানারকম দৃশ্য। এ দৃশ্য আমার চেনা লোকের, আমার অচেনা লোকের।

আমার দেখা কিন্তু যাচাই বাছাই হোয়েছে অনেক। প্রমাণ হোয়েছে সত্যি।

সত্যি প্রমাণ হওয়াটাই কাল হোয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। দেহের আনাচে-কানাচে আমি ভেঙে ভেঙে বড় হোয়ে উঠেছি। হোয়ে উঠেছি আমি তরুণী—নারী সত্তায় ভরপুর। কিন্তু মুকুলের কাছে আমি শিশু আমি ছোট্ট মেয়ে। তাকেও দেখেছি যুবক হিসেবে নয়, গোপাল-কৃষ্ণ হিসেবে। ও যেন আমার কাছে গোপাল হোয়েই আসে।

মনকে অনেক বুঝিয়েছি—আমি মানুষ, ও-ও মানুষ। আমার ভেতর থেকে আর একটা মন বোলে উঠেছে, মানুষ হোলেও তুমি অন্য মানুষ। ও অন্য মানুষ। তোমার ভেতরে আর একটা 'তুমি' রয়েছে। তুমি-ই সেই তুমি। মুকুলের ভেতর আর একটা মুকুল রয়েছে। কুল—সেই মুকুল।

আমি এসব কথার অর্থ বুঝি না। তবে একটা কেবল মনে হোয়েছে, আমি আর ও স্বামী-স্ত্রী।

মধুপুরের আলাপ কলকাতার বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলো। সে পৌঁছুনো দু'বাড়িরই ছুটুম হবার বাসনা জাগিয়ে তুলেছে। এক-দিনের ছোটছেলে বাপ-মা'র হাত ধরে আমার পিসিমার হাত ধরে এসেছে কতবার। তারপর একা। এখন তো একাই আসা-যাওয়া করে।

বিয়ে পাকাপাকি, কোন নড়চড় নেই। লোকে বলে এই নাকি ভবিতব্য। রূপে-গুণে কুলজি-কুলজিতে—সবেতেই মিল। দু'তরফেই দাম করা ঘর, বনেদী রক্ত। এ যেন জন্ম-জন্মান্তরের—দু'জনে দু'জনের।

সকলের শুভেচ্ছা সকলের আশীর্বাদ দু'জনকে কাছে আনতে দিলো না কিছুতে। ছোট-ঠাকুরমা কম কি মিল করাতে চেষ্টা কোরেছে। আমি যখন গান ধরেছি, অগানের সুরে সুর মিলিয়ে, মুকুল এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। আমি গাইছি রজনী সেনের 'পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়/তবে পাপী তাপী এত আশা কোরে রয়- - -?

মুকুলের মুখখানা বড্ড বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। আমি গানের সুরে কথায় কোন্ দেশে যেন ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছি। কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে না আছে, কে শুনছে না শুনছে, কে ঘরে আসছে না আসছে—কোন দিকে কোন খেয়াল নেই আমার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি আমার মনের আকাশে আনন্দের সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। চতুর্দিকে ছড়ানো অফুরন্ত আনন্দ, অসংখ্য আনন্দ।

ছোট-ঠাকুরমার চিৎকার আনন্দের রাজ্য থেকে নামিয়ে নিয়ে এলো আমায় মর্ত্যে, পাতালের ঠাণ্ডা ঘরে। আমি চমকে উঠে সম্বিত ফিরে পেলুম। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস কোরছে। সামনে কারা দাঁড়িয়ে ঘুম ঘুম চোখে চিনতে পারছি না। চেনা লোককেও কেমন অচেনা অচেনা ঠেকছে।

ছোট-ঠাকুরমার আবার চিৎকার।—আ ম'লো যা। এ আবার কি নতুন চঙ শিখেছিস? বলি, আমাদের কি কখনো দেখিস নি নাকি। হোয়েছে ভালো থিয়েটার দেখে দেখে। মোটে যাবিনি কল থেকে কোথাও। এইসব শিক্ষা হোয়েছে থিয়েটার দেখে দেখে। বাবা-মা'র যেমন প্রশ্রয়। তেমনি তো মেয়ে হবে। বলি শোন, ওসব না চেনার ভান এখন রাখ। সেই থেকে মুকুল দাঁড়িয়ে আছে, ওকি বলে শোন। নে, ওকে একটা গানা শোনা দিকিনি, নে, অর্গান বাজা। মজিনার গান ধর। এই বয়েসে 'পাতকী বলিয়া পাতুকী বলিয়া'---। ছেলেটা আসছে আর আমার কাছে ধরনা দিচ্ছে। —ঠাকুরমা, নূপুর যেন কেমন হোয়ে যাচ্ছে। ওকে একটু বোঝাও। যত দায় পড়েছে আমার।

আমি অর্গানের রীডে আঙুল ছুঁইয়ে সুর তুলছি। পিঠে একটা আলতো কোরে মুখি মেরে বোললো ছোট-ঠাকুরমা, থাম, আগে শোন। তবে যদি মগজে কিছু ঢোকে। যে বয়েসের যা; না হোলে মানায় না, ভালো লাগে না। সংসারধর্ম। আগে—এটুকু মনে রাখবি। দুর্গাকেও তপস্যা করতে হোয়েছিলো মহাদেবকে পাবার জন্য। আর তুই কিনা মহাদেবকে পেয়েও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য—আমরা বেঁচে থাকতে। সৃষ্টিছাড়া মেয়ে কোথাকার, রোজ আমি লক্ষ্য করছি দূর থেকে।

আমি বোললুম, ছোট-ঠাকুরমা, এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। তুমি গাইবে তো গাও নইলে আমি উঠে যাচ্ছি।

ঠাকুরমা ঝাঁঝিয়ে উঠলো, চলে যাওয়াচ্ছি তোর। আমার গাল দুটো ধরে এমন টিপে দিয়েছে—রাগ কোরেই হবে, লেগেছে খুব। লাল হোয়ে গেছে। অর্গানের পেছনের ছায়না ত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। অভিমানে বিশেষ কোরে মুকুলের সামনে বোলে দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে আমার। দোষটা কি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এরকম ক্ষ্যাপা মূর্তি তো ঠাকুরমার দেখিনি, বিশেষ কোরে আমার ওপর। অবাকও কম হইনি আমি এ-ব্যবহারে। সমস্ত রাগ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুকুলের ওপর। যত নষ্টের গোড়া এই মুকুল। নিশ্চয় এমন কিছু বোলেছে যাতে ছোট-ঠাকুরমার এই রণমূর্তি। আমার অভিমানী মুখ আর চোখের জল নজর এড়ায়নি মুকুলের, বোলেছে, নূপুরের বড্ড লাগলো ছোট-ঠাকুরমা।

আহা, বলি, তোর লাগেনি তো ছোঁড়া। মরে যাই। তবে আমার ঘরে গিয়ে বলিস কেন—নূপুরের মন নেই আমার ওপর, নূপুরের মন নেই আমার ওপর। কাণ্ডকারখানা, মাগো, মা।

গালে হাত দিয়ে কপালে চোখ তুলে ঠাকুরমা চেয়ারে বোসে পড়লো। বোললো, তুমি তো কম ছেলে নও বাছা। আমাকে গিয়ে বোললে, নূপুরের যদি আমাকে পছন্দ না হয়, পষ্টাপষ্টি বোলছে না কেন? আমি আজ সেই জানতেই এসেছি। আমি দাঁড়িয়ে থেকে দিয়ে দেব। কোন দুঃখ নেই আমার। ওর ব্যবহারে আমি অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছি ঠাকুরমা। এত হেনস্থা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমাকে দেখলেই যেন ভূত দেখছে। আগে তো এমন ছিলো না।

ছোট-ঠাকুরমার ঘন ঘন হাই উঠছে। ডান হাতে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে টুস্‌কি বাজাচ্ছে, হাইয়ের সামনে ধরে। দু' চোখের কোণে জল ভরে উঠেছে।

ছোট-ঠাকুরমা বোললো, যতো মরণ হোয়েছে আমার। আফিং খেয়ে দুধমারা ক্ষীর-টুকু খেয়েছি সবে, নেশা ধরেছে ঘুমের আমেজ আসছে। কোথায় গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমুবো, তা নয়, ছোঁড়া গিয়ে টানাটানি। নেশাটাকে ছুটিয়ে ছাড়লে। আবার এখানে ওখানে কথা শোন। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। ওরই যেন দু'টো গাল টিপে দিয়েছি। মরে যাই।

ঘর নিস্তব্ধ। অর্গানের রীডে আমার হাত ছোঁয়ানো রয়েছে। আমি চুপচাপ, মৌনমুখে দাঁড়িয়ে মুকুল।

ঠাকুরমা আমার দিকে তাকিয়ে বোললে, বলি হ্যাঁলা, তুই বাজাচ্ছিস না কেন? নে, বাজা, জানবি ঠাকুরমা কারো মন্দ করে না, ভালো কোরেই যায়। ভালোমানুষদের যতো যাই ভাবিস, তারা ভালো কোরবেই কোরবে। এ তাদের প্রকৃতি। আমি সেই জাতের মেয়ে বুঝলি? আমাকে চিনতে পারলিনে তোরা। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এনেছি মুকুলকে। নূপুর না ভালোবাসলে তোমায় তুমি কিসের টানে আস ভাই? তোমার মন চলে আসে। ভালো-বাসো বোলেই না ভালোবাসতে আসে।

ছোট-ঠাকুরমা ভাঙা-ধরা গলায় গাইছে। 'ভালোবাসে তাই ভালোবাসিতে আসে/আমি

যে বেসেছি ভালো, সে ভালো সে ভালোবাসে।

হাসি চাপতে পারেনি মুকুল। ঘরের ভারী হাওয়াটা নিমেষে হালকা হোয়ে গেছে। আমিও চাপতে পারিনি। নিজের ঠোঁট জোরে কামড়ে ধরেছি। সারা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে হাসির ধমকে।

মুকুলের হাসিতে ছোট-ঠাকুরমা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। —দূর ছাই। এর চেয়ে ঘুমোলে কাজ দেখত। আমায় নিয়ে হাসি মস্করা। কি ভালোই না বাসতেন উনি আমার এই গান। আমারও যেমন হোয়েছে মাথা খারাপ —শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা।

রাগে গরগর কোরতে কোরতে বেরিয়ে গেছে ঠাকুরমা।

গানের বাকি কলি শেষ কোরেছে গেয়ে কুল নিজেই। আমার আগের অবস্থায় আবার পৌঁছে গেছি। আমার ভালো লাগেনি। আমি ওকে এসব গানের মধ্যে দিয়ে চাই না যে। আবার সেই দৃশ্য ভেসে উঠেছে চোখের সামনে —আমার সামনে থেকেও মুকুল সামনে নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি না।

অনেকে বুঝিয়েছে আমায়, এরকম কর তুমি কেন? ধারণাটা ভুলে যাও। মাথা থেকে মন থেকে বার কোরে দাও।

আমি ভাবি, এরা আমাকে কেন বুঝতে চায়না। কতবার বোলেছি, কোন কিছুই আমি ধারণা করি না। ছবির মতো আমার সামনে এক এক কোরে এসে হাজির হয়। আমি তাড়াতে চেষ্টা কোরেও তাড়াতে পারি না। এখানে আমি বরাবরই পরাজয় বরণ কোরেছি। আমার শক্তির চেয়ে এদের শক্তি প্রবল।

আমার মন বোলেছে, কুলকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই মঙ্গল। আমার জন্যে একটা সবুজ-তাজা তরুণ নীরবে-নিরালায় শুকিয়ে ঝরে পড়বে বুঝেও এটা হোতে দিতে পারি না আমি কিছুতেই না, না।

॥ ছয় ॥

আমার দেখার কথা, মনোভাব রেখে ঢেকে বলিনি আমি মুকুলকে। ও বাচ্চা ছেলের মতো দুষ্টু-দুষ্টু মুখ কোরে হেসেছে। মাথা নেড়ে বোলেছে, উঁ হুঁ, সেটি হবে না। এখন আর ফেরা যায় না আমার। তুমি যতো রকমের অজুহাত দেখাও না কেন। অতিরিক্ত ভালো-বাসা মমতা যেখানে, সেখানেই মানুষের হারাই হারাই ভাবটা জেগে ওঠে ভেতরে। তাই তুমি ওইসব দেখো, তুমি-ই তো আমাকে বোলেছ, প্রবল ইচ্ছেশক্তি মানুষের ঈশ্বর, মানুষের অবলম্বন সহায়। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু—বিপদে-আপদে সব সময়।

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মুকুল। ওর দু'চোখে জিজ্ঞাসা। আমি যা বোলেছি ঠিক কিনা উত্তর দাও।

কি উত্তর দোব আমি! আমার বলা কথার জালে আমি আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি। এক্ষেত্রে মৌন থাকাই প্রধান কর্তব্য আমার। মৌন থাকলে কি হবে, ওতো নাছোড়বান্দা। হয় ছোড় দিয়া, লেকিন কমলী তো মুঝে ছোড়তা নহী।

এবারে চোখে নয়, মুখ থেকেই প্রশ্ন ঠিকরে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। মনে কোরেছ, চুপ কোরে থাকলেই পার পেয়ে যাবে বুঝি। অপরের বেলায় মৌখিক উপদেশ দেওয়া যায় খুব। নিজের বেলা খাটিয়ে একবার দেখ না—ইচ্ছেশক্তি টিচ্ছেশক্তি।

আমি চেয়ে আছি। খুব ভালো লাগছে ওর এই ছেলেমানুষী ঝগড়া, এই তর্কাতর্কি। নারকোল নাড়ু খেতে ও খুব ভালোবাসে। আমি নিজে হাতে তৈরী কোরেছি।

খাগড়াই কাঁসার রেকাবিতে—তাতে আবার আমার নাম খোদাই করা—চারটে বড় সাইজের নারকোল নাড়ু নিয়ে এসে ওর সামনে ধরলম। —নাও খাও। খেয়ে আমায় কৃতার্থ করো।

—না, তোমার হাতে আমি কিছুতেই খাবো না। খাই যদি, আমার নিজের দিব্যি রইলো।

হাসি পাচ্ছে আমার। হাসি চেপে আমি ও ঘরে চলে গেলুম। ওর ব্যাত আমি জানি। জালের ঢাকা চাপা দিয়ে টেবিলের ওপর রাখলুম, যাতে ও দেখতে পায়।

দেয়াল ঘেঁষে ওর নজর এড়িয়ে দেখলুম, ও একদৃষ্টে এ ঘরের দিকেই চেয়ে। আমি জানি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হোয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে গেছি। কতক্ষণই বা। তিনটে নাড়ু শেষ কোরেছে মুকুল, একটা মুখে দিতে যাচ্ছে। আমি গিয়ে খিল খিল কোরে হেসে উঠেছি।—ছোটকেলার চুরি কোরে খাবার অভ্যেসটা যায়নি দেখছি।

ধরা পড়ে গেলে ওর বরাবরেরই অভ্যেস, আত্মরক্ষার তাগিদে আমার ওপর দোষারোপ করা। বোলেছে, কেন, যাকে তোমার অত ভালো লাগে সেই গোপাল-কৃষ্ণ চোর নয়? মাখন চুরি করে ছানা চুরি করে দুধ চুরি করে—আমায় তুমি চোর বদনাম দিতে এসেছ?

বিষম লেগে কাশছে কুল। চোখ মুখ লাল।

আমি তাড়াতাড়ি জলের গেলাস মুখে ধরে বোলেছি, ষাট ষাট, তোমার পরমায় বদ্ধি হোক। তুমি চিরকাল আমার এই গোপাল হয়েই থাকো। আমি তো এইটেই চাই।

কুলকে আমি গোপাল-কৃষ্ণর মতো দেখেছি, চেয়েছিও সেইভাবে। আমার হৃদয়-বল্লভ হিসেবে কোনদিন আমি কল্পনা কোরতেও পারিনি। চাইনি। ওকে নিয়ে শিশুকাল থেকে যে মন গড়ে উঠেছে আমার, বড় হোয়েও সেই মন সেই ভাবনা ছাড়েনি আমাকে। সদা-সর্বদা—শয়নে স্বপনে জাগরণে আমায় নিয়ে খেলা কোরে যাচ্ছে।

ওকে উদ্দেশ কোরে এ খেলা খেলতে আমার ভালো লাগে—সারাক্ষণ। আমার জীবন থেকে এ খেলার যবনিকা পড়ুক কখনো, আমি চাইনি। আমি চাইবোও না। কিন্তু এই কঠিন —বাস্তব জগতে সব সময় যে নিজের ইচ্ছে নিয়ে চলা যায় তা নয়। আমারও জীবনে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হাজারো বার বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার মতে ওকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। বেশ বুঝতে পেরেছি, সবই আমার পণ্ডশ্রমের খরচের খাতায় লেখা হোয়ে যাচ্ছে। আমি আমি-ই, মুকুল মুকুল-ই।

মুকুল ক্রমে বেপরোয়া হোয়ে উঠছে। আমার কাছে এলেই নানান কবিতা আউড়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ কোরছে।—নিরজনে যখন থাকি/তোমায় তখনি দেখি নয়নে আমার। দুটি হৃদয় দু'জনের যুগ যুগান্তের অভিন্ন আত্মার/ যুগ যুগ ধরে তাই তুমি আমার।

এরপর ও আরো এগিয়েছে। আমায় বোলেছে, তোমায় কাছে পেয়েও না পাওয়ার যন্ত্রণা। তুমি কি এতটুকু বোঝ না। আমার হাত ধরে বোলেছে, কত কষ্ট নিয়ে তোমার সম্মতি না পেয়ে দিন দিন ফিরে যাচ্ছি, তোমার মনে কি একটুও দাগ কাটে না?

কি বোলব আমি? ও আমার মনে দাগ কাটে। কিন্তু জানালে তো আরো পেয়ে বোসবে। ওর চোখে কামনার আগুন ধিকি ধিকি জলতে জলতে বড় হোয়ে উঠছে ক্রমে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না। পারবে না ও আর বেশিদিন। অসম্ভব হোয়ে উঠছে নিজেকে ধরে রাখা, যে কোন মুহূর্তে অসংযত হোয়ে পড়া কিছু অসম্ভব নয়।

এর ওপর বাড়ির অভিমান। বাড়ির স্নেহ-বঞ্চিত, বাবার ভর্ৎসনা সব মিলিয়ে ওকে পাগলের মতো কোরে তুলেছে। বাড়িছাড়া, বাড়ির স্নেহবঞ্চিত। কোন্ আকর্ষণে বাঁধা পড়ে স্থির হোয়ে থাকবে ওই মন?

ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে অনিমা। সুযোগ এসেছে। আমি অনুনয় কোরেছি—আমি শান্তি পাই, আমায় যদি ভালোবেসে থাকো, কথা রাখো। আমি যেভাবে, সেইভাবে চাই চিরদিন বেঁচে থাকো আমার মনে, আমিও তোমার মনে বেঁচে থাকবো তাহলে।

ও খানিক চুপ কোরে থেকেছে বিষণ্ণ মুখে। তারপর কি জানি কি ভেবে করুণ স্বরে বোললে ও, বিয়ে না কোরে কি এমনি থাকা যায় না?

আমি বোলেছি, এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। একজনের হাতে তোমাকে দিয়ে আমি শান্তি পেতে চাই নিশ্চিন্ত হতে চাই। না হলে আমি আরো অসুস্থ হোয়ে পড়বো চিন্তায় চিন্তায়। তুমি কি চাও আমি অসুস্থ হোয়ে বিছানায় পড়ে থাকি? আমার এ রূপও তো চলে যাবে, আমিও তো চলে যেতে পারি। তোমাকে আমি খোলাখুলিই বোলছি, তুমি যদি আমার কথা না শোন, সেই জিনিসই তোমায় দেখতে হবে।

মুকুল শিউরে উঠেছে। বোলেছে, না, তা হতে আমি দেবো না। তোমার ইচ্ছেটাই আমি মেনে নেবো।

আমাকে একেবারে হারাবার ব্যথা ও সহ্য কোরতে পারছে না। মুখময় ভয়ানক ত্রাস। ওজানে, অনেক প্রমাণই তো পেয়েছে। স্বপ্নের মতো আমার জাগা অবস্থায় ছোটবেলা থেকে কত স্বপ্নই এসে ঘোরাফেরা কোরেছে—জানা-অজানা, সে সব দেখা আমার সত্যি হোয়েই ফলেছে। তাই আমার দেখার কথা শুনে—আগেও শুনেছিল যদিও, কিন্তু এবারে আমার চলে যাবার কথা শুনে বিয়েতে মত দিয়েছে।

আমি অনিমার দুর্ভাগ্যের কথা বোলে, মুকুল আর অনিমার দু'জনের জীবনে একই ব্যথার স্রোত বয়ে যাচ্ছে বোলে, দু'জনের মনকে কাছ কাছি টেনে এনেছি। বিয়ে হোতে অসুবিধে হয়নি আর।

ফলাফল ভালো হয়নি।

নিজেকে বিশ্লেষণ কোরে দেখেছি তা হোলে এ দেখাটা কি আমার ভুল। আমার ওপর কন্যাকুমারীর ছায়া পড়ে আমাকে কি বিভ্রান্তির পথে ঠেলে নিয়ে গেছে, যাচ্ছে?

আগের দেখা মিলে মিলে সেলার অহং-কারের আবরণ পেয়ে বোসেছে কি? একটা হৃদয়হীন অবুঝ মেয়ের হাতে ছেড়ে দিলুম কেমন কোরে আমার হৃদয়ের বস্তুকে?

অনুশোচনা অনুশোচনা অনুশোচনা। দগ্ধে দগ্ধে মরছি আমি।

থেকে থেকে মনের চোখে ভেসে ওঠে আমার কন্যাকুমারীর মূর্তি। সেখানকার দৃশ্য।

বেলাভূমি পেরিয়ে নীল সমুদ্রের ঢেউ দুলে দুলে উঠছে। বাতাসে শোঁ শোঁ আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে লোহার শেকলে ধরে ঘাটে নেমেছি। মাথা ডুবিয়েছি, আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছি।

বাবা মা আর আমি উত্তর গোপুরমের দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরেছি মন্দিরে। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবী কন্যাকুমারী। আহা, দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন শ্যামবর্ণা একটি আটন' বছরের কুমারী মেয়ে দাঁড়িয়ে। একেবারে জীবন্ত। পরনে রঙিন সিল্কের শাড়ি, গয়নায় গয়নায় সারা গা মোড়া। মাথায় সোনার মুকুট, কপালে হীরে, ডান হাতে মালা, পায়ে নুপুর। হীরের আলো ঠিকরে পড়ছে সবার চোখে। কুমারী অপরূপা হোয়ে উঠছে।

কুড়ি ফুট উঁচু ঘেরা দেওয়ালের ভেতর মন্দির। দেওয়ালের নিচে সমুদ্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য, মন্দিরের ভেতর সমুদ্রের গর্জন এতটুকু যাচ্ছে না। আরব সাগর ভারত মহাসাগর বঙ্গোপসাগর—তিন সাগরের সঙ্গমে কুমারিকা অন্তরীপ। ত্রিবাঙ্কুরের ছোট রাজ্য, দেবী কুমারী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

তিন সাগরের মিলনের গর্জন যেমন মন্দিরের ভেতর প্রবেশ কোরছে না, তেমনি এমন ভাবে তৈরী মন্দির যে, দিনের কোন সময়—উদয় থেকে অস্তের মধ্যে, সূর্যকিরণের একটুকু প্রবেশ করে না ভেতরে।

জায়গাটা যেন অলৌকিক। দেবীও অলৌকিক জগতের।

দেবী কেন কুমারী?

মালাবার দেশের পুরাণ বোলেছেন, বকাসুর আর বনাসুর দুর্দান্ত দৈত্য। দেবতাদের ত্রাস। ব্রহ্মার বরে এরা অমর। অত্যাচারে দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হোয়েছেন। শিব চিন্তায় মগ্ন। এদের তো মৃত্যু নেই। উপায় কি?

পার্বতী হেসে বোলেছেন, চিন্তার কি কারণ আছে মহেশ? ব্রহ্মা তো কুমারীর হাতে মৃত্যুর বর দিয়েই রেখেছেন, অমর হবার বর দিলেও।

কুমারীর রূপ ধরে আঠারো দিন যুদ্ধ কোরেছেন দেবী বনাসুর আর বকাসুরের সঙ্গে। যুদ্ধে মৃত্যু বরণ কোরেছে ওরা।

দেবীর কুমারী রূপ দেখে মুগ্ধ হোয়েছে শিব। এইভাবেই থাকতে বোলেছেন।

নতুন কোরে আমি কন্যাকুমারীকে দেখি আমার ভাবনার আয়নায়। আর ভাবি, ওই মূর্তি আর আমি একই হয়ে যাচ্ছি। আমার—লোকের মুখে শোনা অবিশ্যি—চাঁপা ফুলের রঙ কুমারীর কষ্টিপাথরের রঙ হোয়ে গেছে। আমি মূর্তির আড়াই ফুট মাপের আটন' বছরের মেয়ে হোয়ে গেছি।

মূর্তির দু'গালে আর কপালে ঝকঝকে সোনার টিপের মতো আমারও গালে-কপালে সোনার টিপ। আমি আর কন্যাকুমারী অভিন্ন।

আমার ভেতরে সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত রিপু এক সুরে কথা কয়ে উঠেছে তাদের প্রকৃতি বদলে ফেলে। তারা বোলেছে, তুমি কুমারী আমরা কুমারী। তুমি আমাদের, আমরা তোমার।

আমি এক এক দিন সব সময়ই সমুদ্রের গর্জন শুনি। আর সেই গর্জনে একটি মাত্র বাণী—কুমারী কুমারী কুমারী----।

মনের এই ছাপই কি কুমারী থাকার বাসনা হোয়ে আমার আর একটা মনে খোঁদাই হোয়ে বোসে গেছে?

এ প্রশ্নে আমার দু' চোখ বুজে আসে। আমি দেখি, কুল আমার চিন্তার রাজ্যে একদম অনুপস্থিত।

যে সব ঘটনা ঘটেছে আগে সে সব ঘটনাও আমি বারবার একই রকম দেখেছি। তফাৎ কিছু দেখিনি, এখানেও তাই, একই জিনিস ঘুরে ফিরে। নিজের ওপর নিঃসন্দেহ হোয়েছি। আমি ভুল করিনি। এর পেছনে আরো কিছু আছে, এখন দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পাচ্ছি

৩১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শালিনী বিক্রম-কথা

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

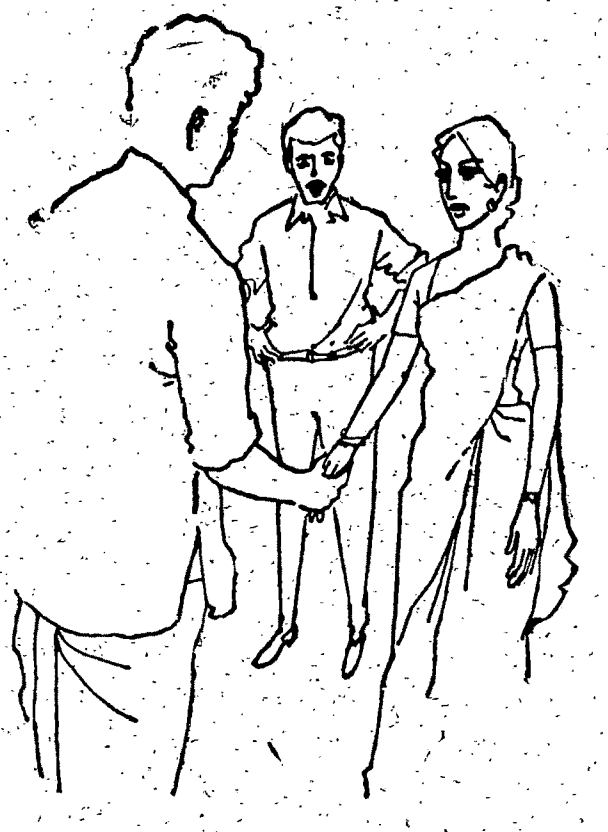

বিক্রমকে সামনে রেখে—চোখে-মুখে বিশ্বকে অগ্রাহ্য করার ভাব নিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে শালিনী নেচে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চলে আসছে নিজেদের পরিত্যক্ত টেবিলে।

আলো নিতান্ত কম। সাদা চাদর বিছানো টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। হলের মাঝখানে ডান্স-ফ্লোর। সেখানে চমকপ্রদ পরিচ্ছদাবৃত মানুষগুলো উদ্দাম নৃত্য করছে। মাথার ওপরে লাল, নীল, হলদে, বেগুনী, সবুজ আলো ঝিকঝিক করে জ্বলছে আর নিবছে। একটা সুরেলা গোলমাল প্রচণ্ড তেজে রেকর্ড থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, তারই তালে তালে আলোর রশ্মি নৃত্যরত মানুষগুলোকে ধাক্কা মারছে।

শালিনীকে খুব চিনি।

এই টেবিলে আমরা চারজন, ক্লাবের ডিসকো নাইট উপভোগ করছি; সকলেই ওর সম্বন্ধে বলছি।

শালিনী যেখানে থাকবে সেখানে ওর দিকে চোখ না দিয়ে—ওর সম্বন্ধে আলোচনা না করে কেউ থাকতে পারবে না।

বিক্রমকে আরো চিনি। বিখ্যাত ইন-ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট বি, এন, চৌধুরীর ছেলে; দু' বছর আগেও যার রঞ্জাবতী নামে একটি সুন্দরী স্ত্রী আর চার বছরের সন্তান ছিল। দু' বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে—শালিনীর জন্যেই।

বিক্রম একটা চমৎকার ছেলে। বর্তমানে ওর সাঁইত্রিশ বছর বয়স। শালিনী আটচল্লিশ। ওদের জন্মকালের এতখানি দূরত্ব আমাদের পরচর্চার অনেকখানি অবকাশ দিয়েছে। বিক্রমের মতো একটা টাটকা তাজা ছেলেকে আটচল্লিশ বছরের এক মহিলা ডিভোর্স করতে বাধ্য করেছে—এটা কি কম ক্ষমতার কথা?

শালিনীর অনেক ক্ষমতা। শালিনী আমাদের পরচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। ওকে আমরা দেখতে পারি না। মুখে ভদ্রতা করি, ভালোবাসা দেখাই; কিন্তু অহরহ হিংসে করি।

শালিনী চমৎকার নাচে। যদিও আজকাল ফ্লোরে দাঁড়িয়ে তালে তালে যেভাবে মুখে-চোখে দেহে-মনে তুরীয় ভাব আনা হয় তাকে নাচ বলা যায় না—আর সে নাচ ভালো কি মন্দ তার ব্যাকরণ বুঝেসুঝে বিশ্লেষণ করা সোজা কথা নয়। তবে শালিনী যখন ঐ দশ দশ টিন এজারদের ভিড়ের মধ্যে তার ঝকমকে যুবক স্বামীটিকে নিয়ে উন্মত্ত অঙ্গ সঞ্চালন করে, মিথ্যে বলবো না দেখতে খুবই ভালো লাগে। মন্দ লোকে বলে ওখানে শালিনী না থেকে রঞ্জাবতী থাকলেই মানায়।

শালিনী এসে বসলো ওদের টেবিলে। অপেক্ষমাণ হুইস্কিটা এক চুমুকে মেরে দিল। বিক্রম সিগারেট এগিয়ে দিল—লাইটার জেলে ধরিয়েও দিলো। আমরা একটু দূরে চারজন বসেছি। সেদিকে চেয়ে বলাবলি করলুম (মেয়েরাই বেশী বলছি—আমাদের মুখ বন্ধ করা সহজ নয় সেকথা সবাই জানে)—

—একটা ছেলের বয়সী ছেলেকে বিয়ে করতে লজ্জাও করল না। ছিঃ।

এই কসমোপোলিটান ক্লাবে যে সমাজকে দেখতে পাই সেখানে হামেশাই এ ধরণের ঘটনা দেখা যায়। যে ক্লাব বিদেশীদের জন্যে বুক-পেতে দিয়েছে—বিদেশী আলোয়, বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পরিচালিত হয়—যেখানে কন্টি-নেণ্টাল চালচলন মহাসাগরের বুকের উত্তাপ নিয়ে বিজাতীয় সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে—সেখানে বসেই আমরা ওদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি বিদেশী রীতি অনুযায়ী একেবারেই নির্লিপ্ত বা নিরাসক্ত হলুম না। বলাবলি করলুম কি হওয়া উচিত আর কি উচিত নয়।

—ওর কি উচিত হয়েছে এই আটচল্লিশ বছর বয়সে সাঁইত্রিশ বছরের একটা খোকাকে বিয়ে করা?

—বিক্রমটা একটা গর্দভ। বাংলাদেশে মেয়ে নেই? শেষকালে একটা মারাঠি মেয়ে?

—মেয়ে নয় মহিলা।

—বাঙালী ছেলেগুলো ভেড়া।

—বিলেত আমেরিকায় হরদম বিয়ে হচ্ছে—ডিভোর্স হচ্ছে আমরা কি অনবদ্যভাবে বিলিতি হয়ে উঠেছি। ওদের কাছ থেকে চলা-বলা-খাওয়া-পরা কত কি শিখেছি—এটাই বা বাদ যাবে কেন?

—তাহলেও বিক্রমটা ভালোমানুষ-বোকা। তা নইলে ঐ ভদ্রমহিলা এই বয়সে বিক্রমের মতো স্মার্ট-ব্রাইট একটা ছেলেকে ঘাড় ধরে প্রেম সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে এলো।

—বিক্রমও অতি পাজি। অল্পবয়সী বৌ-ছেলেকে কেউ বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে?

স্ন্যাকস চিবোচ্ছে সবাই; জিন, হুইস্কি, কোকাকোলা আর লাইমজুসে চুমুক দিচ্ছে আর বলছে: এক একটা সময় আসে যখন কোন একটা বিশেষ নাম মুখে মুখে বদ্ধ হতে থাকে।

—কি ফিগার! এই বয়সে আর একটা বার করে দেখি। এইতো এতোগুলো মেয়ে রয়েছে? ইয়ং মেয়েগুলো ওর কাছে নিবে গেছে। —দাঁত চেপে বলল বিজন।

লম্বা, ধারালো চেহারা; মুখটা যেন পটে আঁকা—তার ওপরে সফিস্টিকেশনের প্রলেপ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চকচক করছে। নীল শাড়ীর সঙ্গে গলার রূপোর হাঁসুলী অপরূপ দেখাচ্ছে। ওর চেয়ে বয়সে ছোট আমরা, ওর মতো নই কেন? শালিনীর সাজানো দাঁত আমাদের লজ্জা দেয়। হাতে-পায়ে-শরীরের কোন ঠিকানাতেই বয়সের চিহ্ন নেই। আমরা মানবো না।

—ওতো হেয়ার ডাই করে।—আরতি বললো।

—তাই বলো। তাই অতো কালো চুল।

—তাছাড়া দাঁত নিশ্চয় বাঁধানো; নয়তো অমন সাজানো কি করে হয়? কিছু ক্ষয়ের চিহ্ন থাকবে না?

—আর ফিগার? (আমরা পরস্পরের দিকে তাকালুম—রোগা, মোটা, বেঁটে, সরু, কালো)

—ওসব টেলারিং-এর গুণ!

শরীরের অনাবৃত অংশগুলো যে টেলারিং ছুঁতে পারে না নিরিচারে তা উড়িয়ে দিলুম। মোট কথা ও কেন বিক্রমের বৌ?

—আহা! রঞ্জাবতী! নরম-সরম অল্পবয়সী মেয়েটা। ছেলেটাকে নিয়ে দুঃখের দিন কাটাচ্ছে। খুব লেখাপড়া জানা নিতান্ত বাঙালী মেয়ে। গুণী মেয়ে—অতিশয় ভদ্র তা নইলে কেউ ছেড়ে দেয় স্বামীকে এমনিভাবে? বাঙালী বলেই ছেড়ে দিয়েছে—নইলে কি আর সহজে নিষ্কৃতি পেতো? এখনও শ্বশুর-শাশুড়ীর মোহে চৌধুরী বাড়ীতেই পড়ে আছে। ছেড়ে যেতে পারছে না।

একটা জোর বাজনা বেজে উঠলো। বিক্রম আর শালিনী উঠলো। ফ্লোরে যাবার সময় একবার আমাদের দিকে 'হ্যাই' বলে হাত নেড়ে মিশে গেলো টিন-এজারদের গ্রুপে, যেখানে আরো কয়েকজন বয়স্ক জুটি ভিড় করেছে।

ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা আমরা জানি।

ভোরবেলায় গলফ খেলতে যায়; সপ্তায় একদিন রাইডিং করে। সন্ধ্যাবেলায় বিলিয়ার্ড খেলে আর ড্রিঙ্ক করে।

রাত্রে যখন বাড়ী ফেরে তখন দু'জনেই নিজেদের টেনে হিঁচড়ে গাড়ীতে তোলে।

—নিশ্চয় এসকেপ করতে চায়।

—আট মাস হলো বিয়ে করেছে, এরই মধ্যে কিসের এসকেপ?

—এসকেপিষ্ট না হলে কেউ এতো ড্রিঙ্ক করে? আরে বাবা ভাত-খাওয়া বাঙালী ছেলের ধাতে কি এমন উট্‌কো আধুনিকতা সয়? সমাজ, সংসার—এই হঠাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে জড়িয়ে পড়া জীবন—সবকিছু থেকেই এসকেপ করার চিন্তা। এই আর কি?

শালিনীর অনেক কিছু আছে নিশ্চয়—নাহলে আমরা ওর দিকে না তাকিয়ে পারি না কেন? যুবক স্বামীর জন্যেই হোক বা ওর চেহারার জন্যেই হোক—অথবা---। অথবা কি আমরা তা স্পষ্ট বুঝতে পারি না।

শালিনী উভোগি।

আধাপ্রৌঢ় মারাঠি স্বামী ছেড়ে সন্তান সহ বিয়ে করেছে বিক্রম চৌধুরীকে। কি নির্লজ্জ!

ছেলেটা নাকি বিক্রমকে 'ড্যাড' বলে ডাকে। পড়ে দার্জিলিংয়ে। ছুটিতে মায়ের কাছে আসে। সে কি তার গুজরাটি বাপের কাছে যায় না—যায় হয়তো? ছেলেটা বড়ো হয়েছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার সময় হয়েছে।

সেদিন ডিস্কো নাইটে লাল-নীল ঝিকমিকে আলোর নীচে আরো চুটিয়ে শ্রাদ্ধ করলুম ওদের।

পরদিন সন্ধ্যায় শুনি বিক্রম নেই।

এর মুখে ওরমুখে আর ষ্টেটসম্যানের ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে খবরটা পেলুম।

সেদিন নাকি ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরে একটা চিঠি পেয়েছে। চিঠিখানা লিখেছে তার আগের পক্ষের স্ত্রী রঞ্জাবতী। ছেলের জন্মদিনের কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে। ছেলেও দু'ছত্র বাঁকা বাঁকা অক্ষর লিখে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে বাবাকে।

নিজের ছেলের জন্মদিনটাও মনে করিয়ে দিতে হয়। চৌধুরীবাড়ীর বেয়ারা এসে পৌঁছে দিয়ে গেছে সে চিঠি। তারপর কি হলো শালিনী নাকি বলতে পারে নি। একটা পুরো বোতল হুইস্কি খেয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়েছে বিক্রম। ভোরবেলা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে শালিনী ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকেছে। ডাক্তার কিছু করার আগেই সব শেষ।

আমাদের আলোচনার পাত্রটাও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

আমরা দেখা করতে গেলুম। প্রথমে চৌধুরীবাড়ীতেই। বিক্রম তো ওদের বাড়ীরই ছেলে। রঞ্জাবতী এখনও চিঠি লিখতো; এখনও বুকের ভেতর বিক্রমের ছবি এঁকে রেখেছে।

চৌধুরীবাড়ীর সামনে সারি সারি গাড়ী। নীচে গাড়ী-বারান্দার তলা থেকে তিনতলার রঞ্জাবতীর ঘর পর্যন্ত লোকজন গিজগিজ করছে। দোতলায় প্রায় মূর্চ্ছিতা বিক্রমের মাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ঘরে ঘরে বিভিন্ন কথাবার্তা হচ্ছে। তারই ফাঁকে ওপর থেকে নেমে এলো বিক্রমের ছেলে এক ভদ্রমহিলার হাত ধরে। তিনি আমাদের তিনতলায় যেতে বললেন। ছেলেটা বোধহয় কিছুই বুঝছে না। ওর জন্মদিনে সাংঘাতিক একটা অঘটন ঘটে গেছে। ওর বাবা জন্মদিনে উপহার না পাঠিয়ে একটা দুঃসংবাদ পাঠিয়েছে।

আমরা চারজন একসঙ্গে থমকে গেলুম সিঁড়ির মুখে।

আহা! বেচারী! কিছু ধরতে পারছে না—ও কি হারিয়েছে? যে বাবাকে ভালো করে চেনে না—যে বাবা ওকে ফেলে সম্পর্ক কাটিয়ে চলে গেছে—কতো আর জন্মদিনের সুতো ধরে আত্মার কাছাকাছি রাখা যায়?

ওকে আমরা দেখছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তার মুখে-চোখে চলার ভঙ্গীতে কোন শোকের বিকৃতি দেখা যায় কি না।

—কোন্ মুখে যাবো রঞ্জাবতীর সামনে?—আরতি বলল।

—হি ওয়াজ এ ওয়াণ্ডারফল চ্যাপ—নিঃশ্বাস ফেলে বলল অলক।

—এক্স হাজব্যাণ্ডকে কি খুব মনে থাকে?—প্রশ্ন করলুম।

—খুব মনে থাকে। মনে নেই রঞ্জাবতী এই এক মাস আগেও বলেছে—আমার এক্স হাজব্যাণ্ড আমার ছেলেকে একটা বাইসিকল পাঠিয়েছেন। কিংবা—

'আমার সম্মানিত এক্স হাজব্যাণ্ডের নতুন স্ত্রীটি রীতিমতো সুন্দরী।'

বলেছিলুম—'তুমিই বা কম কিসে?'—

হেসে হেসেই রঞ্জাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঐসব টকরো কথাগুলো বারবার মনে পড়ল।

রঞ্জাবতী কাঁদছে। কেন কাঁদছে? এক্স হাজব্যাণ্ড এমন করে কাঁদাতেও পারে? কেঁদে কেঁদে চোখগুলো ছোট হয়ে গেছে—আলুথালু চেহারা। আশেপাশে মা-বোন—আত্মীয়স্বজন। সবাই ঘিরে রেখেছে ওকে। ডিভোর্স হয়ে গেছে তাতে কি হয়েছে? বিধবা হলো যে! কতরকম কথা হচ্ছে।

—ছাড়ো বাপু ওসব ডিভোর্স-টিভোর্স। এই-বয়সে বিধবা হওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

—লোহাটা হাত থেকে সেদিন খুলেছে।

—তাই নাকি? ডিভোর্সের পরও লোহা পরেছিল?

—তা পরবে না? হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে তো!

—সিঁদুরটাই ইদানীং যা পরতো না। তা এখন একখানা সাদা কাপড় অঙ্গে রাখতে হবে বৈকি।

আমাদের কাছে রঞ্জাবতীর সে কি আকুল কান্না। কে বলবে দু'বছর আগেই ও প্রকৃত স্বামীহারা হয়েছিল?

—কচি ছেলেটা পিতৃহারা হল।—চোখে আঁচল চেপে বলল এ-জন।

ছেলেটা দু'বছর আগেই পিতৃহারা হয়েছিল, কারুর সেকথা মনে নেই।

—আহা তাইতো বটে। স্বামী বলে কথা—বাপ বলে কথা—সে কি আইনের ভাষায় ছেঁড়া যায় গো?

সত্যিই তো। এই তিরিশ বছরের রজনী-গন্ধার ছড়ার মতো মনোরমা মেয়েটি যে সব হারালো—তার ভবিষ্যৎ কি?

অনেক চিন্তা, অনেক সমস্যা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এলুম অগণিত লোকজন আত্মীয়স্বজনে ভরা মস্ত বাড়ীটা থেকে। বড়ো সমাজ, বড়ো মানুষ—শোকের আড়ম্বরও মস্ত।

শালিনীর কাছেও যেতে হয়। গত আট মাস যাবৎ বিক্রমের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে ওকেই চিনেছি। যতই নিন্দে করি, হাজার হোক আমাদের প্রিয় বিক্রমের বৌ।

থিয়েটার রোডে থাকে ওরা। লিফটে চড়ে সোঁ করে উঠে ডানদিকে ঘুরলেই ওদের দরজা। পালিশ করা দরজার সামনে একটা আলো জ্বলত। আজ জ্বলছে না।

কলিংবেল টিপলুম। ভেতর থেকে কুকুরের গম্ভীর ডাক শোনা গেল।

একটি সুদর্শন কিশোর দরজা খুলে দিল। এই ছেলেটিকেই দেখেছি গরমের ছুটিতে ওর মায়ের সঙ্গে ক্লাবে সাঁতার কাটতে যেতো। ছেলেটি মৃদুস্বরে আমাদের আহ্বান করল—'প্লিজ কাম ইন'—। ওকে অনুসরণ করলুম। একেবারে শোবার ঘরে।

হালকা আলো জ্বলছে। একটা হেলানো

চেয়ারে শালিনী পড়ে রয়েছে, হাতে একটা ইংরিজি শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। পাশে টিপয়ে একটা গ্লাসে কিছু পানীয়—ব্র্যাণ্ডির বোতল; এ্যাশট্রেতে রাখা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে।

আমাদের পদশব্দে বই বন্ধ করে চশমা খুলে মুড়ে রাখলো। হাত ধরে একটা সোফায় বসালো।

শালিনীর চুল খোলা—ছবির মতো মুখটা ফুলো; ভুরু দুটো ক্লান্ত পাখীর অবসন্ন ডানার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ লাল। সাদা প্যাণ্টস আর লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ-করা কোর্তা পরে রয়েছে।

অপ্রস্তুতের মতো হাসলো একটু। যেন এসবের জন্যে ওই দায়ী। ও চুপ করে জানলার বাইরে চেয়ে রইল।

কেউ কথা বললুম না। আরতি আর বিজন দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করল, তারপর চুপ করে গেলো। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু টেবিলের ওপর রক্ষিত বিক্রমের ফোটো-গ্রাফের সামনে গোলাপের সুরভির সঙ্গে ধূপের ধোঁয়া মিলে অতীন্দ্রিয় পরিবেশ রচনা করেছে। এখানে কথা চলে না। সহানুভূতি

সান্ত্বনা সবই অকিঞ্চিৎকর। প্রয়োজন নেই।

এ্যাসেসিয়ানটা আমাদের শুঁকে শুঁকে বসে পড়লো শালিনীর পায়ের কাছে।

এই মুহূর্তেও শালিনী অপরূপা। একটু ম্লান চোহারা—একটু বিপর্যস্ত; সাজানো নিদাগ দাঁত—আভরণহীন দেহ—যোগিনীর মতো। ডিসকো-নাইটে উদ্দাম নৃত্যের সময় মুখে যে বিশ্বকে অগ্রাহ্য করার অভিব্যক্তি দেখেছি—এখনও তাই।

ফেরবার সময় দেখলুম শালিনীর ছেলে বসবার ঘরে ওরই সমবয়সী কার সঙ্গে যেন কথা বলছে খুব চাপা স্বরে। খালি পা, রুক্ষ এলোমেলো চুল—বোধহয় অশৌচের জন্যেই।

আর একটিও মানুষ নেই। লোকজন আত্মীয়-স্বজন শোকের সমব্যথী কেউ নেই। বিক্রম ওদের ছেড়ে গেছে—সমাজও ওদের ছেড়েছে। শুধু কুকুরটা বশম্বদের মতো পড়ে রয়েছে পায়ের কাছে।

নিঃশব্দে নীচে নেমে এলুম। আরতি, বিজন, অলক আর আমি আবার আলোচনার ভাঙা টুকরোটা কুড়িয়ে নিলুম।

—ছেলেটা অশৌচ নিয়েছে কেন? হ্যাঁ। ওদের আবার অশৌচ। ওরা অবাঙালী এসব জানে না। ভাছা নেবে তো?

—ওর মা বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে—ও কাছা নিতে যাবে কেন? সব বাড়াবাড়ি তোমাদের।

—ব্র্যাণ্ডি খেতে খেতে গীতা পড়ছে। কতোই দেখবো, ওর জন্যে বিক্রমটা গেল অকালে।

—রত্নাবতীর বয়স কম—আর একটা না হয় বিয়ে করবে। ছেলেটা না হয় ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে রইল। মাথার ওপর অগাধ সম্পত্তি, জোরালো মামার বাড়ী—ভবিষ্যতের ভাবনা নেই।

কিন্তু শালিনী? এক স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে। আর এক স্বামীও ভাসিয়ে দিয়ে গেলো। সামনে কি আছে? ভবিষ্যৎ? আর একটা বিয়ে করবে নাকি? ওদের মতো মহিলা সব পারে।

—তবে এই বয়সে?

—বয়সটা তো কম নয়। ছেলেটা বেঘোরে প্রাণ দিলো। একটা ডাক্তার ডাকতে পারে নি সময়মতো? কচি খুকি নয় তো। শালিনী যে কিছুই বললো না।

বয়সটা কুটিল চোখে চেয়ে রয়েছে। এইবার আমাদের আলোচনা হোঁচট খেলো। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম ডিসকো-নাইটের লাল, নীল, হলদে, সবুজ আলোর কণাগুলো ভবিষ্যৎ-অন্ধকারের বুকে ঝিলিক মারছে মাথার শিরায় শিরায় ইলেকট্রিক শকের মতো। শালিনী অবসন্ন।

ওকে আর হিংসে করতে পারলুম না। আমরা সকলেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেলুম।

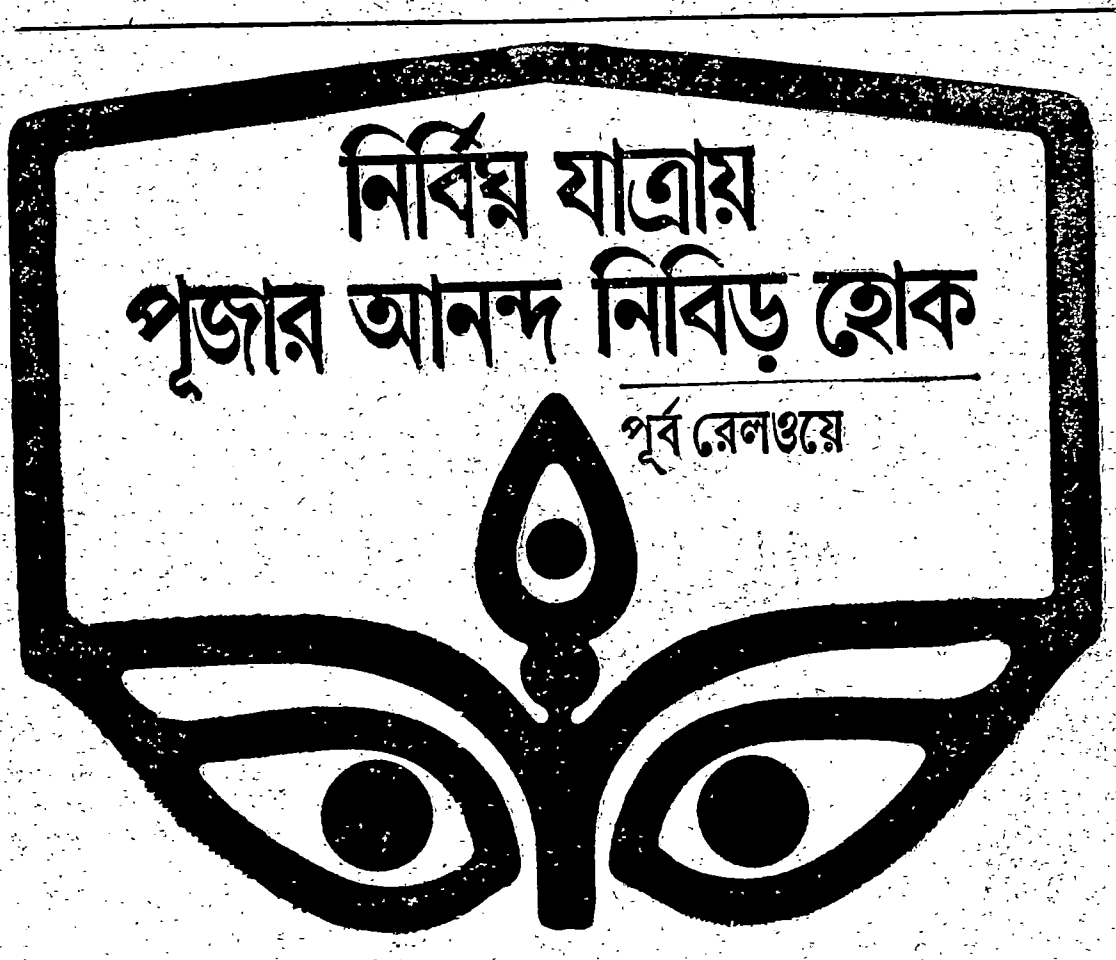

অসমাপ্ত সিনেমা

অসিত গুপ্ত

পার্থ রায় একচল্লিশে পড়েছে। এই তো গত বাইশে শ্রাবণ নিঃশব্দে চলে গেল। ওই দিনটায় রাত দুটো বত্রিশ মিনিটে জন্মেছিল সে। রবি ঠাকুরের শেষ, পার্থ রায়ের আরম্ভ। কিন্তু কেউ মনে রাখেনি। কেউ বলতে রিণা। তাদের দু'কামরার চকচকে ফ্ল্যাটে আর কাউকে ধরে না।

রিণা তখন ঘুমোচ্ছিল। এই আজকের মতোই। পার্থর জন্মদিনের কথা তার মনে ছিল না। পার্থ কিন্তু জেগেছিল। জেগে ছিল, খালি পায়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এই আজকের মতোই।

রাতে আজকাল তার ঘুম হয় না। কী যে হয়! মাথার ভেতরটা অন্ধকার হয়ে যায়। জমাট অন্ধকার। পার্থ ঘরের আলো, বাথরুমের আলো জেলে রাখে। শোবার ঘরের দরজা অবশ্য টেনে দেয়। রিণার ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে। পার্থ পায়চারি করে। টেবিলে বসে। দশ লাইন কাজ করতে না করতে দু'বার বাথরুমে যায়। টেবিলে বেটন লাইট জ্বলে। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবির পিছনে একটা টিকটিকি থাকে। মাঝে মাঝে সেটা বেরিয়ে এসে টিক্ টিক্ করে। পার্থ ইদানীং রোজই রাত দুটো বত্রিশের সময় নিজেকে জন্মাতে দেখে।

পেটে চড়া পড়ছে। পাঞ্জাবীর ওপর থেকেই দেখা যায়। চোখের কোলে ছোট ছোট বালিশ। কপালের তট সরছে। ফ্রীজিডেয়ার মুখ। বলতে গেলে রোজই, সে নতুন করে নিজেকে দেখতে পায়। জন্মের সময় মা ছিল। আজ টিকটিকি আছে, টি ভি আছে, ফ্রীজ, সোফাসেট, চেস্ট-অফ ড্রয়ার্স, গোদরেজের আলমারি আছে। এই সবের মাঝখানে ভীষণ হকচকিয়ে সে হাত-পা ছুঁড়ছে। এইরকম একটা দুপোর কথা প্রায় রোজই রাত দুটো বত্রিশের সময় তার মনে হয়।

বাইশে শ্রাবণ পার্থ কসবায় গিয়েছিল। কি আশ্চর্য, মা'রও মনে ছিল না, শুধু রিণাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মানুষ বড় স্মৃতিবিভ্রমের মধ্যে নিজে-নিজে বেঁচে আছে। পার্থ কতবার উশখুশ করল। ভুরু কুঁচকে ক্যালেণ্ডারের দিকে

তাকিয়ে রইল। তবু মা কিংবা বাবার—কারুরই কিছু মনে পড়ল না। মা ছোট বোনের বিয়ের জন্য তাগাদা দিল, বাবার প্রস্টেটের কথা, নিজের 'মাথা টিপটিপ' আর বুক ধড়ফড়ে'র কথা বলল। কোথাও কোন জোয়ার নেই—আবেগে ভাটা, ভালবাসার ভাটা। স্নেহ, মায়া, স্মৃতি সবই টুকরো টুকরো। অথচ এই কসবার বাড়িতেই সবাই যখন একসঙ্গে থাকত, মা'র তখন সবদিকে খেয়াল ছিল। নজর ছিল। বড়মামা মা-কে ঠাট্টা করে বলত, 'তুই যে দেখছি দশবাই চণ্ডী।'

যেন গুহার মধ্যে বিছানা পাতা। রিণা ঘুমোচ্ছিল। ঘুমুলে তার সুর করে নাক ডাকে। অথচ পার্থ জেগে বসে আছে, পড়ার টেবিলে। বেটন লাইট জ্বলছে। সামনে খোলা লেখার ফাইল। একটা ছবির আধখানা চিত্রনাট্য। বাকিটা কিছুতে বাগ করা যাচ্ছে না। কোথায় কি সব ফসকে যাচ্ছে। মারজিনে ফাইবার কলমে শান্তনুর মতামত দেওয়া। আগের ছবিটা তার লোকে মোটে নেয়নি। প্রযোজক বেচারা আবার গুঁড়ো দুধের কারবারে ফিরে গেছে। এবার চিত্রনাট্য তাই সে নিজে করছে না। পার্থকে দিয়েছে।

পার্থ বেশ খেলিয়ে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আর যেন জমছে না। মোক্ষম আটকেছে। এর জন্যে দায়ী রিণা। সবটা না হলেও অনেকটা। ক'দিন ধরে রিণা তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে। আজকেও একচোট হয়েছে। খাওয়ার টেবিলে। তারপর গড়িয়ে শোবার ঘরে। রিণা শেষে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। পার্থ বাইরে দাঁড়িয়েও তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিল। ক'দিন ধরেই করেছে।

কিন্তু রিণা তাকে অবাক করল। তার কাছের এবং দূরের সবরকম যন্ত্রণার কারণ হয়েও রিণা অক্লেশে ঘুমিয়ে পড়ল। পার্থ তার মনের বিশ্রী সন্দেহ দূর করতে পারল না। এই তো সে এখন দিব্যি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। সুর করে নাকও ডাকছে তার। অথচ রিণা দেখতে তো খারাপ নয়। বেশ মানসসুন্দরীর মতো চেহারা। চেহারা দেখেই পার্থ তাকে বিয়ে করেছিল। আর কোন বিবেচনা করেনি। কে জানত---অমন সুন্দর চেহারার মেয়ে এমন বিকৃত হতে পারে। মানুষকে যন্ত্রণার মধ্যে রেখে যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়, সুর করে নাক ডাকায়, সে বিকৃত নয়? রাতে রিণা নাকে খুব স্প্রে করে। পার্থর ঘোর সন্দেহ, ওর পলিফাস আছে।

কিন্তু এই আধখানা চিত্রনাট্যর কী হবে? পার্থর কাছে এটাই আশু সমস্যা। এই ছবি মার খেলে শুধু শান্তনু বোসই ডুববে না লেখক-চিত্রনাট্যকার পার্থ রায়েরও, সজ্ঞান-সমাধি হবে। বেছে-বেছে রিণা এই সময়ে ঝঞ্ঝাট পাকাল? আর, ঝঞ্ঝাট মানে কী। যার একফোঁটা ভিত্তি নেই। সবটাই আকাশকুসুম চয়ন। যত সব কুড়িয়ে এনে জড় করা।

পার্থ বলেছিল, 'তুমি বাবু ওই ফ্যাশান ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিনগুলো বাদ দাও।' রিণা এক ফ্যাশান ম্যাগাজিনে কী-সব আঁকাআঁকির কাজ করে। নিজের হাতখরচটা চালিয়ে নেয়।

পার্থ বাধা দেয়নি। দুপুরে ঘুমিয়ে মেদ বৃদ্ধি করার চেয়ে ছিমছাম কাজ একটা খারাপ কী? বিয়ের আগে পার্থ সংসারের কত স্বপ্ন দেখেছিল, স্বপ্নের মধ্যে কত সব সঙ্গীত, সুগন্ধ জড়িয়ে থাকত। দু' বছরেই সে বুঝতে পারছে, সংসার এক আধুনিক সরাইখানা। রিণার কাজে কোনদিক থেকেই সংসারের সাহায্য হয় না। কিন্তু তার ঘরের শ্রী, লালিত্য যেন চলে যাচ্ছে। পার্থর কথা শুনে রিণা রেঁগে উঠেছিল, 'কেন? ফ্যাশান ম্যাগাজিনের সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

পার্থ কোনরকম উত্তেজিত না হয়েই বলেছিল, 'আছে। ওখান থেকেই তুমি কিছু শুনে এসেছ। আর তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি করছ।'

'যদি তাই হয়', রিণা দমে নি, তর্কের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। 'লোকে তোমার নামে বলে কেন?'

পার্থ বলে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। 'লোকের স্বভাব।' কথাগুলোকে সে দাবার ঘুঁটির মতো নিপুণ করে সাজিয়ে দিতে লাগল। 'লোকে পরের কথা বলতে ভালবাসে। আর কে লোকই, তোমার ফ্যাশান ম্যাগাজিনের কতকগুলো ফ্রক। দোষ তো তাদের নয়। তুমি নিশ্চয়ই তাদের আশকারা দিয়েছ। তাই তারা বলতে সাহস পায়। কই, তোমার কথা তো আমাকে কেউ কিছু বলে না। আমি কাউকে সে-সুযোগ দিই নি। দ্যাখ রিণা, পার্থ তার পুরু ফ্রেমের এক্সিকিউটিভ চশমা ঠকাস্ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখেছিল। প্রত্যক্ষভাবে এইটুকুই তার রাগ দেখানো হয়েছিল সেদিন; তাছাড়া সে আগাগোড়া সংযতই ছিল। বাজার আর ঘর এক নয়। ও-দুটোকে গুলিয়ে ফেলো না। ঘরের জিনিস বাজারে দিয়ে আসা আর বাজারকে ঘরে এনে তোলা আমি পছন্দ করি না।'

অশান্তি পর্বের এই সূচনা। কিন্তু পার্থ রায় ভুল করেছিল। এর পর আর কিছু না বললেও চলত। এইখানেই থেমে গেলে হ'ত। কিন্তু ঘর থেকে বেরুবার আগে, দরজার মুখ থেকে সে ফিরে এল। বলল, 'আরেকটা কথা। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। ছিল না, ক্রমশ গজাচ্ছে। মেয়েদের শুধু বাইরে বেরুবার স্বাধীনতা থাকলেই হয় না, তার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হয়। বাইরের তাত আজকাল অনেক মেয়ের সহ্য হয় না। সান স্ট্রোক হয়ে যায়।'

এই শেষ ক'টি কথা থেকেই অশান্তি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছিল। রিণা সারা অঙ্গে তুহিনা মেখে নাইটি চাপিয়ে খাটে আধশোয়া হয়ে ছিল। কোলের কাছে তার বালিশ ছিল। বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে বসেছিল। 'আমার বাইরে বেরুবার শিক্ষা নেই?'

'জানি মা', পার্থ বলেছিল। অন্তত সে প্রমাণ তুমি দিতে পারছ না।'

রিণা একটুখানির জন্যে তাকিয়েছিল স্তম্ভিত হয়ে। তার অমন সুন্দর মুখ চাপা রাগে, অহংকারে বুথোশ হয়ে উঠছিল।

'জান, আমার কত কানেকশান—'

'জানি,' পার্থ স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল

কিন্তু বলার ধরনে অন্য রকম ছিল। 'তাতে আমি বিশেষ মুগ্ধ নই। ওগুলো হচ্ছে আর্থ উপনিবেশিকতার অভিশাপ।'

'তার মানে?' রিণার আহত চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে চাইছিল। 'মানে কী একথার?'

'ও তুমি বুঝবে না। তোমার ফ্যাশান ম্যাগাজিনের লোকেরাও নয়। আর—' পার্থ একটু থেমে বলেছিল: 'কানেকশান হাজি মস্তানেরও আছে। নাম শুনেছ? যদি না শুনে থাক, তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে নিও। ইদানীং তার নাম খবরের কাগজে খুব বেরুচ্ছে।'

এই বলে পার্থ বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে বলা, বেরিয়ে আসা খুবই নাটকীয় হয়েছিল। যদিও পার্থ নাটক করতে চায়নি। ঘরে, বাইরে নাটক করা তার স্বভাব নয়। কিন্তু ওই কথাগুলো তাকে বলতেই হ'ত। ইদানীং সে বুঝতে পারছিল, তার কাজের প্রতি, তার মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতি রিণার ঢাকা-চাপা এক অবজ্ঞা আছে। সেটা কখনো-কখনো সুস্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে।

বেশ কিছুদিন আগে, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার, অশান্তির মেঘ কোথাও ছিল না—পার্থরা এক ইতালিয়ান ছবি দেখতে গিয়েছিল। ছোট ছবি, রাত্তিরের শো, তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল। ওরা যাদুঘরের ফুটপাথ ধরে আস্তে আস্তে পার্ক স্ট্রীটের দিকে আসছিল। গোটা আকাশটাই চাঁদের মরুভূমি। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। পথে পথে বেলফুলের গন্ধ দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। আবার, ট্রাফিকে আটকানো গাড়ির দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। আর্ট স্কুলের সামনে দু'একটি মেয়ে ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের আশায়।

পার্থ হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বেশ রাতটা যা?'

তার উত্তরে রিণা বলে বসল, 'আচ্ছা, তোমরা কী-সব হাই-পাঁশ ছবি কর? যেমন গল্প লেখ, তেমনি।—'

পার্থ হেসে বলল, 'কী এত খারাপ দেখলে?'

রিণা বলল, 'রাবিশ। এসব দেখে শিখতে পার না।'

পার্থ একটু চুপ করে রইল। তখনও ঠোঁটে তার হাসি লেগেছিল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই। শেখার কি শেষ আছে? তবে, শুধু অনুকরণ জিনিসটা ঠিক নয়। নিজস্ব একটা কিছু—'

'নিজস্ব আবার কি।' রিণা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল। তার গলায় বিরক্তি ফুটে বেরুচ্ছিল। 'ওটা এক ধরনের অক্ষমতার অজুহাত।'

পার্থ জোরে হেসে উঠল। তার পায়ের সামনে কিসের একটা খোসা পড়েছিল। সে জুতোসুদ্ধ লাথি চালাল। বলল, 'বেশ তো, তাই না হয় হ'ল। কিন্তু তুমি চাইছ কী? ফালচারের সিন্থেটিক ফ্লাইবার। আলাউদ্দিন খাঁ-র তুলো আর ম্যালকম সারজেন্ট-এর আঁশ? টম জোন্স-এর মুণ্ডু আর বড়ে গোলাম আলির ল্যাজ?'

রিণা এরপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না। শুধু একবার পার্থর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে ওরা ট্যাক্সি নিল। ট্যাক্সিতে বসেই রিণা বলল, 'তোমার বাবা এক সময় চায়ের ব্যবসা করতেন না?'

পার্থ খুব অবাক হ'ল, বলল, 'হ্যাঁ, কেন?'

রিণা জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তোমারও তাই করা উচিত।' পার্থ আত্মরক্ষা করার সময় পায়নি। কথাটা তার বুকে আমূল বসে গিয়েছিল। আজও তীব্র ক্ষত হয়ে আছে। পার্থ পরে ভেবে দেখেছিল, এ এক ধরনের রোগ। রিণাদের বাড়িতেই আছে। প্রত্যেকটা ইটের সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে। রিণার বাবা শেয়ালদা কোর্টের এক নম্বর উকিল ছিলেন। কিন্তু ভাব দেখাতেন যেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি ইংরেজীতে সনেট লিখে লাইব্রেরী ঘরের বড় ঘড়ির তলায় টাঙিয়ে রাখতেন। পছন্দসই মক্কেল এলে আগে বলতেন পড়তে। তাঁর ধারণা ছিল, শ্রীঅর-

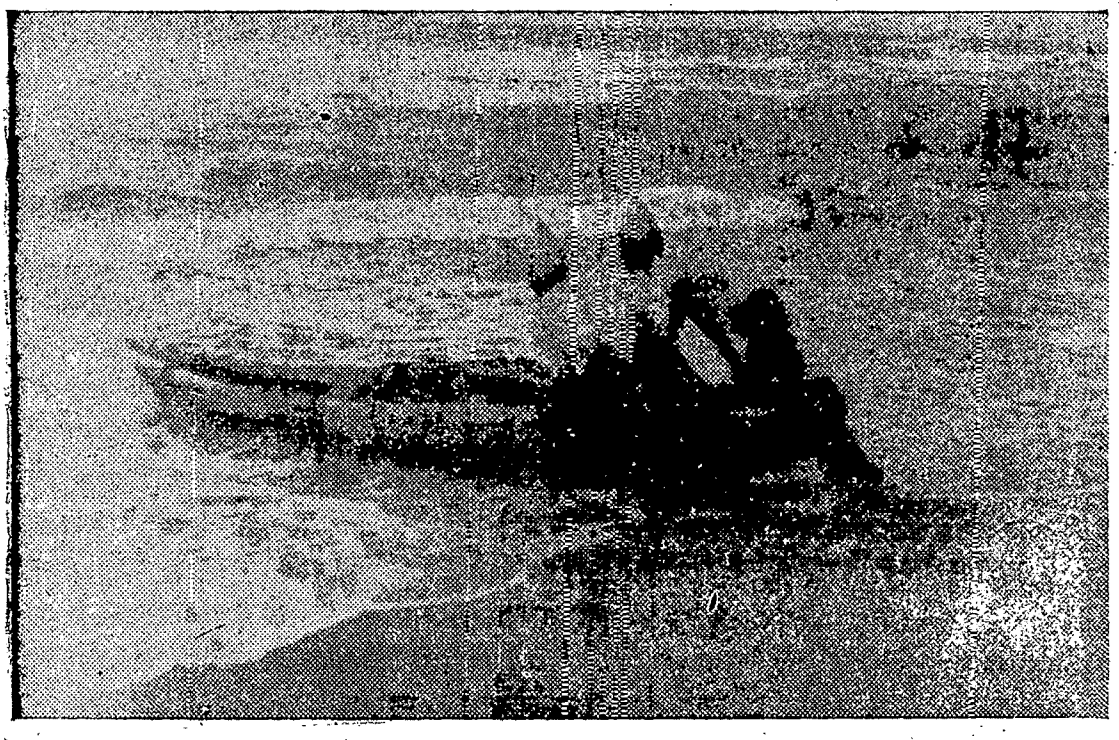

—রণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিন্দের চেয়ে তাঁর ইংরেজী অনেক ভাল। 'সাবিত্রী' কাব্যকে লোকে অকারণ প্রশংসা করে। তিনি বিশাল এক কাব্যগ্রন্থের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি। রিণার বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে তিনি মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে গ্যেটের মতো 'আলো, আলো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এ দৃশ্য পার্থর স্বচক্ষে দেখা।

তাঁরই উপযুক্ত ছেলে, রিণার ভাই জয়দ্রথ। সংক্ষেপে জয়। মাঝপথে হৈ-হৈ করে লেখাপড়া থামিয়ে চলে গিয়েছিল দিল্লী। তার ধারণা গতানুগতিক লেখাপড়ায় মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। দিল্লী গিয়ে সে বড় জোর মাস ছয়েক আল-কেজীর থিয়েটারে ঘোরাফেরা করেছিল। কলকাতায় ফিরে সে অস্ফুট প্রতিভা হয়ে সকলকে তাচ্ছিল্য করে বেড়াতে লাগল। তার প্রতিভা থিয়েটারে তেমন কিছু পরিস্ফুট হতে পারল না, কিন্তু ঢের বেশি হল মদের নেশায়। প্রথম প্রথম পার্থই তাকে কয়েকবার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে। আনতে হয়েছে রিণার কথায়। তার প্রতি রিণার খুব বিশ্বাস। রোগের এ-ও আরেক দিক। সকলে সকলের সঙ্গে রহস্য-জনকভাবে জড়িত। ভাই, বোন, বাপ, মা, কাছের আত্মীয়-স্বজন ভুলেও কেউ কারুর নিন্দে করে না, সমালোচনা করে না। সকলে সকলের সম্পর্কে শুধু ভাল কথা বলে। স্বাভাবিক ভাবেই অন্যায়ে সায় দেয়, অপরাধে সাহায্য করে।

খবর ঠিক চলে গিয়েছিল। রিণার সেই অস্ফুট প্রতিভার ভাই এর মাঝখানে একবার ঘুরে গিয়েছে। পার্থ একদিন ষ্টুডিও থেকে ফিরে দেখল, বাইরের ঘরে ধোঁয়া। জয় তারই নির্দিষ্ট সোফাটায় বসে, তারই পেয়ালায় কফি কিংবা চা খাচ্ছে। হাতে পাইপ। পার্থ দুটো কারণে খুব বিরক্ত হ'ল। প্রথমত, ঘরে ঢুকবার আগে জয়ের একটা ছেঁড়া কথা তার কানে গিয়েছিল। ধোঁয়ার আড়াল থেকে জয় রিণাকে বলছিল, 'আরে বাদ দে না। এরা হচ্ছে সব প্রতিক্রিয়াশীল।' দ্বিতীয়ত, সোফা এবং পেয়ালা। ছেঁড়া হোক, ভাঙা হোক—এক টুকরো নিজস্বতা পার্থ ভীষণভাবে চায়। বেঁচে থাকার জন্যে এটুকু তার দরকার। এই সব নিজস্বতা ধারাবাহিক অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। মায়া, মমতা জন্মায়, ভালবাসা জন্মায়। একে কি সম্পত্তি বাড়ানো বলে? রিণাকে জয় বোধহয় সেইভাবেই পেতে চেয়েছিল। যেমন আকাশের সঙ্গে থাকতে থাকতে আকাশটা একদিন নিজস্ব হয়ে যায়। যেমন করে জানলার বাইরে গাব গাছটাকে দেখতে দেখতে মনের মধ্যে সেই গাছের ঘনিষ্ঠ ছায়া পড়ে। অগোচরে কুঁড়ি ফোটে, পাতা ঝরে। মানুষের জীবনে ছেঁড়া সোফা কিংবা ভাঙা পেয়ালা, একটা গাব গাছ কিংবা একমুঠো আকাশেরও মস্ত ভূমিকা। মোহ রোজ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ভালবাসা অবশেষে সব কিছুর মোট যোগফল।

পার্থ সেদিন রিণাকে জিজ্ঞেস করেছিল। রাতে খাওয়া সেরে রিণা তখন প্রসাধন সারছিল। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে উজ্জ্বল আলো। ঘরে লিলি-অফ-দ্য ভ্যালির গন্ধ। ড্রেসিং টেবিলের তিন ভাঁজ আয়না। তিন ভাঁজেই রিণা প্রতি-ফলিত। মুখ বাড়িয়ে সে ভুরু আঁকছিল। অত দুঃখেও পার্থর মনে হয়েছিল যেন হরিণী জল খাচ্ছে।

'আজ জয় এসেছিল যে হঠাৎ?' সে এই-ভাবেই আরম্ভ করেছিল। ভুরু কেঁপে গেল, তারপর কপাল কুঁচকে উঠল। রিণা ঘাড় ঘোরাল। কেন, জয় কি আসে না?'

'আসে। কিন্তু আজ তুমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলে?'

রিণা চুপ করে রইল। হাতের তুলি নামিয়ে রাখল। তারপর পার্থর দিকে মুখ করে ঘুরে বসল। পিঠে চুল ছড়ানো। চোখের পাতায় পেন্সিল, ভুরুতে পেন্সিল, তুহিনায় মুখ চক চক করছে, পার্থর মনে হল, মুখে গর্জন তেল মাখা সদ্যসমাপ্ত প্রতিমা।

রিণা বলল, 'যদি ডেকে পাঠিয়েই থাকি—'

'কেন? আমার সম্বন্ধে আলোচনা করবে বলে? আমি কি বাইরের লোকের সঙ্গে আলো-চনার বস্তু?'

'যদি তেমন কাজ করে থাকি।'

'কতবার তোমায় বলব, তোমার ধারণা ভুল, মিথ্যে, স্টুডিওর মেয়েদের সঙ্গে আমি মাখামাখি করি না।'

রিণা বলল, 'আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।'

'কী?' পার্থর সব গোলমাল হয়ে গেল। সে নিজেকে সময় মতো সামলাতে পারল না।

'আমাকে বিশ্বাস কর না! বিশ্বাস কর ইও একটা ড্রাংকেন ডিবচকে? তুমি আমার স্ত্রী। তোমার সামনে সে আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে! আর তুমি তাই শোন। উপভোগ কর। তুমি একদিন আমায় বলেছিলে, আমার বাবার মতো আমার চায়ের কারবার করা উচিত। এত তোমার স্পর্ধা। কিন্তু আমার বাপ, মা, ভাইবোন তোমাকে নিয়ে তোমার আড়ালে আমার সঙ্গে কোনদিন আলোচনা করতে বসবে না। সে শিক্ষা তারা পায়নি। আর তুমি একটা জাল পরিবারের মেয়ে বলে—'

'কী বললে?' রিণা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু পার্থ তখনও থামতে পারল না। সে থুথুর মতো ক'টা কথা ছিটিয়ে দিল, 'জালি, ভুয়ো। ফোনি—অ্যাবসোলুটলি ফোনি।'

রিণার শরীর কাঁপলো, সে টলে উঠল কয়েকবার। তার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, গর্জন তেলের মুখ আরও চকচকে দেখাতে লাগল, নাকের দু'পাশ স্ফুরিত হ'ল। পার্থর চোখের সামনে রিণা দশবাই চণ্ডী হয়ে উঠছিল। পার্থর মনে পড়ল বড়মামা যাকে বলত, দশবাই চণ্ডী। কিন্তু সেটা আরেক চেহারা, অন্য রূপ। তাতে সৃষ্টি, স্থিতি, আর, রিণার এখনকার চেহারা ধ্বংসের, বিনাশের।

রিণা প্রথমে মাথার ব্রাশ ছুঁড়ল, তারপর পাউডারের কৌটো। এক-এক করে সে প্রসা-ধনের সব জিনিস ছুঁড়ে ফেলতে লাগল, হাতের কাছে যা পেল। ড্রেসিং টেবিলের তিন ভাঁজ আয়নায় তখন তার অনেকগুলো হাত।

পার্থ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বেটন লাইট জ্বলছে। সামনে খোলা ফাইল। ওপাশে জানলা দিয়ে মাঝরাতের হাওয়া আসছিল। অসমাপ্ত চিত্রনাট্যের পাতা উড়ছে। পেলমেটে ঘুঙুর বাজছে, ঝুম-ঝুম। বাইরে সারা রাতের উৎসব। ঘরেও এসে পৌঁছচ্ছিল।

আরও খানিকটা পরে ঘড়িতে দু'টো ঘত্রিশ হবে। এই সময়টায় লেখক-চিত্রনাট্যকার পার্থ রায় জন্মেছিল। চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু তার সামনে এখন অনেক সমস্যা। প্রথমত, সে কিছুতে বুঝে উঠতে পারছিল না, এই চিত্র-নাট্যটা কীভাবে শেষ করবে?

সৃষ্টিতে, না ধ্বংসে? প্রেমে, না প্রতিহিংসায়?

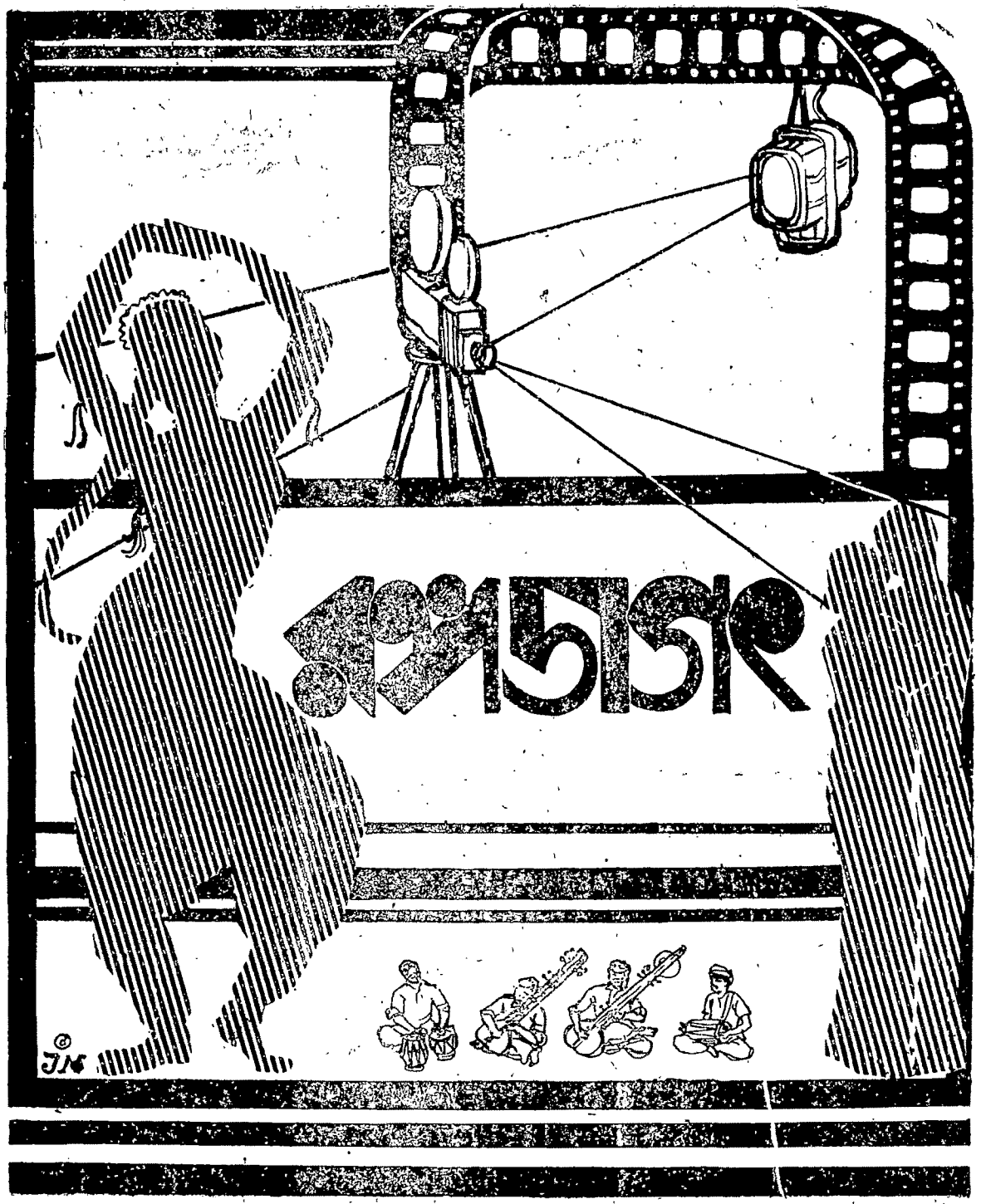
চলচ্চিত্র

সে যুগের কিন্নরকণ্ঠীরা/ মধুসূদন মজুমদার

প্রায় গিরিশবাবুর আমল থেকেই দেখছি, থিয়েটারের মধ্যে দুটি জিনিষ প্রধান ছিল। এক হল অভিনয়, দুই হল 'গান'। বোধহয় ঠিক এই কারণেই তখনকার দিনে শিক্ষার্থী-রূপে যে সমস্ত অভিনেত্রী যোগ দিতেন, তাঁদের নাচ-গান শেখান হত। শেখান হত এই কারণে, কোন্ অভিনেত্রীর মুখে কখন যে গান দরকার হয়, তা কেউ বলতে পারে না।

বিনোদিনী

এই দুটো জিনিষ শেখা থাকত বলে তাঁরা যে-কোন পার্টে নামতে পারতেন। আর যাঁর যে বিষয়ে টেষ্ট, মানে রুচি থাকত, তিনি সেই বিষয়েই নাম করতেন।

যেমন—গঙ্গামণি বলে একজন অভিনেত্রী ছিলেন, যাঁর অভিনয়ের কথা বিশেষ জানা যায় না। তিনি বিখ্যাত ছিলেন তাঁর গানের জন্য। এই গঙ্গামণির কথা বলতে গিয়ে নটী বিনোদিনী এক জায়গায় লিখেছেন, পরবর্তীকালে তিনি ষ্টারের বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন।

এর থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে, গানের একটা বিশিষ্ট স্থান মঞ্চে ছিল। দর্শকেরা গান শুনতেন এবং পাগলও হতেন, তার প্রমাণ হিসেবে বলতে পারি, গঙ্গামণির ঘরে ভিড় জমানো।

বিনোদিনীকেও দেখেছি, তিনি গানও গাইতে পারতেন, আবার অভিনয়ও করতে পারতেন। তবে বোধহয়, তাঁর গানের চেয়েও অভিনয় ভাল হত, তাই অভিনয়েতেই তিনি নাম করেছিলেন।

তেমনি তিনকড়িও গান গাইতে পারতেন। কিন্তু তিনিও অভিনয়ে খুব নাম করেছিলেন।

এঁদের পরে একমাত্র নাম পাওয়া যায়

তারাসুন্দরী

তারাসুন্দরীর। তাঁর গানের গলা থাকলেও তিনিও অভিনয়ে সকলকে ছাপিয়ে গেছলেন।

প্রায় তাঁরই সঙ্গে আর একজন অভিনেত্রী আসেন, যিনি মঞ্চকে ভরিয়ে তুলেছিলেন গান এবং নাচে। তাঁর নাম হল শ্রীমতী কুসুমকুমারী। কুসুমকুমারী বড় বড় এবং ভাল ভাল পার্ট করেছেন।

কিন্তু সব ছাপিয়ে তাঁর নাম রয়েছে গানের পার্টের জন্য। অমর দত্তের সঙ্গে মজিনা সেজে তিনিএক সময় বাঙালী দর্শককে পাগল করে তুলেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে তিনি বহু বড় পার্ট করেছিলেন, এমন কি অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে 'সাজাহানে' জাহানারাও সেজেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আজকের মঞ্চে যেমন কেবল অভিনয় শেখান হয়, তাও শেখান হয় আগামী নাটকের জন্য, তখনকার মঞ্চ ঠিক তেমনটি ছিল না। সেটা ছিল একটা বিদ্যালয়ের মত। সেখানে অভিনয়ও যেমন শেখান হত, তেমনি শেখান হত গান আর নাচ। অপরেশবাবুর সময়ও এই নিয়ম যে মেনে চলা হত, সে কাহিনী আমি নিরুপমা দেবীর মুখ থেকে শুনেছি।

নিরুপমা দেবী এই ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন ৮-৯ বছর বয়সে। তখন তাঁর নাম ছিল ভুঁদি। থিয়েটার, না খেলার জায়গা।

কুসুমকুমারী

ওই ৮-৯ বছরের মেয়েকে তখন নাচের মাষ্টারকে দিয়ে এক, দুই, তিন করে নাচ শেখান হত। বাকি সময়টা তিনি ষ্টেজ থেকে ম্যানেজারের ঘর অবধি ছোটাছুটি করে বেড়াতেন।

এইভাবেই একদিন চোখে পড়ে গেলেন রসরাজ অমৃতলাল বসুর। তিনি প্রশ্ন করেন "তুই কে রে?"

তিনি জবাবে বলেন, "আমার নাম ভুঁদি।"

—তুই এখানে কেন?

—তুই এখানে কেন?

—থিয়েটার করব।

—থিয়েটার করবি, অত বিচ্ছিরি নাম নিয়ে? যা, আজ থেকে তোর নাম নিরুপমা।

সেই থেকে ভুঁদি হয়ে গেলেন নিরুপমা। পরবর্তীকালে তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন, তিনি একজন নামকরা মার্জিনা

হয়েছিলেন। তেমনিই 'সিরাজদ্দৌলায়' ঘসেটি বেগম এবং 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকে ক্ষমার অভিনয় করে নাম করেছিলেন।

যদিও একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবুও বলছি, ছবিতে বা মঞ্চে যাঁকে আমরা কমিক অভিনেতা বলে জানি, সেই তুলসী চক্রবর্তী এবং কুমার মিত্র মঞ্চে এসেছিলেন নাচ-গানের জন্য। কুমার মিত্রের আবদাল্লা যেমন বিখ্যাত, তেমনি 'মানময়ী গার্লস স্কুলে' মানস মাষ্টারের চাকর হারানিধির পার্টও বিখ্যাত।

তুলসী চক্রবর্তীর মুখে একটা গল্প শুনেছিলাম। মঞ্চে যোগ দিয়েছেন, নাচ-গান করেন। কিন্তু দর্শকদের সামনে আসবার হুকুম হয়নি। হঠাৎ একদিন কি একটা ছোট পার্টে দরকার হওয়াতে আদেশ হল তাঁকে মঞ্চে বেরোতে। মেকআপ নিয়েছেন, ড্রেসার পোশাক পরিয়েছে কিন্তু জুতো আর মোজা দেয় না। বলতে গেলে পায়ে খানিকটা লাল রং পরে আর জুতোর মত নীল বর্ডার টেনে মেকআপম্যান বলল, "ওই নিয়েই এখন থিয়েটার কর, আগে আড় ভাঙো।"

যাঁরা তুলসীবাবুর অভিনয় দেখেছেন তাঁরাই জানেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হতে না পারলেও উঁচুদরের অভিনেতা ছিলেনই। কুমারবাবুর তুলনায় তাঁর হারানিধির অভিনয় কোন অংশে খারাপ হয়নি।

এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, তখনকার মঞ্চের সঙ্গে এখনকার মঞ্চের অনেক ফারাক।

শোনা যায়, বরদাবাবু নাকি 'মিশরকুমারী' লেখার পর আশ্চর্যময়ীর জন্য বুলার চরিত্রটি লিখেছিলেন। তাঁর মুখে 'কালো পাখীটা কেন করে এত জ্বালাতন" গান যাঁরা না শুনেছেন, তাঁদের ঠিক বোঝান যাবে না। প্রমাণ হিসেবে একটা কথা বলতে পারি, গানটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, গ্রামোফোন কোম্পানী আশ্চর্যময়ীকে দিয়ে গানটি রেকর্ড করিয়েছিলেন। একবার ভেবে দেখুন, প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে যখন সবে গ্রামোফোন চালু হচ্ছে, তখন এই গান রেকর্ড করান। অতএব কোম্পানী কত নিশ্চিত ছিলেন এই রেকর্ড বিক্রির জন্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্তে' তিনিই প্রথম ছায়া। এবং তাঁর মুখে 'আয়রে বসন্ত, ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে' গান যিনি না শুনেছেন তাঁকে বলে বোঝান যাবে না। তিনি বহুবার পিয়ারা সেজেছেন দেখেছি। তিনি কত বড় গাইয়ে ছিলেন? তার জবাবে আমি বলব, তাঁর এই রেকর্ডগুলো বিক্রী দেখে এইচ এম ভি কোম্পানী তাঁকে দিয়ে 'ব্রজসুন্দর কালো পাখী' প্রভৃতি বহু গান রেকর্ড করিয়েছেন।

আবার ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন যখন খোলা

নরীসুন্দরী

হল, তখন নীহারবালা নিয়তির এমন গান গাইলেন, 'সেই কালপ্রবাহ চলে ধীরে ধীরে', সে গান রেকর্ড করা হল। অপর দিকে ছিল 'আমি কখন ভাঙি কখন গড়ি।' দুটিই কর্ণার্জুনের গান।

তিনকড়ি

এখন রেকর্ডে সে গান আর শোনা যায় না। তিনি কত বড় গাইয়ে ছিলেন, এ প্রশ্ন যদি আমাকে আপনারা করেন, তাহলে বলব, গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর 'চিরকুমার সভায়' নীরবালা দেখে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। গান ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাণ। তাঁর গান এতটুকু খারাপ গাইলে তিনি সেটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর গানের প্রশংসা করে গেছেন, সেখানে আর কিছু বলার নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি, মিনার্ভা থিয়েটার যখন খুব চালু অবস্থায়, তখন তিনজন গায়িকা সেখানে স্থান পেয়েছিলেন। এক হচ্ছেন সুবাসিনী, দুই আশ্চর্যময়ী, তিন আঙ্গুরবালা, যিনি আজও বেঁচে আছেন, যাঁর বয়স প্রায় ৭৮ বছর। আজ বয়স হয়েছে, গলা কিছু ধরে গেছে, কিন্তু এখনও রেডিওর শ্রোতারা জানেন তিনি কেমন গাইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, ১৯২৫-২৬ সালে তাঁর প্রথম রেকর্ড বেরোয় 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি'। অপর পিঠে ছিল 'বাঁধ না তরীখানি আমারই নদীকূলে'।

গানটি কার লেখা, একদিন তাঁকেই জিগ্যেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, এক বৈরাগীর কাছ থেকে তিনি গানটি শিখেছিলেন। তাঁর গান রেকর্ড হল, অদ্ভুত বিক্রীও হল। তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্যই মঞ্চে ডাক পড়ল।

এই সময় তাঁর গান রেকর্ড হয় "আমার জীবন নদীর ওপারে", অপর দিকে ছিল "যদি চিরসুন্দর নাহি হবে গো"।

আঙ্গুরবালা মঞ্চে গেলেন। তাঁর 'সত্যের সন্ধানে' পিয়ারীর পার্ট, 'আত্মদর্শনে' বিবেকের পার্ট, আজকের দর্শককে বলে বোঝান যাবে না সেদিন তার মধ্যে কি মোহ ছিল।

একটা ঘটনা বলি, '৫২-৫৩ সালে ওই মিনার্ভায় তখন আবার 'আত্মদর্শন' খোলা হয়েছিল। তাতে শিবকালী চট্টোপাধ্যায় বলে একজন অভিনেতা বুদ্ধির পার্ট করেছিলেন। অভিনয়ের পর তিনি আমায় জিগ্যেস করলেন, "কেমন অভিনয় হল?"

আমি বললাম, হল ভাল, নাচ-গান-অভিনয় কিছুই বাদ যায়নি, কিন্তু মন ভরলো না।

তিনি জবাবে বললেন, "তখনকার দিনের আঙ্গুরবালার গান আর রেণুবালার (সুখ) নাচ এই দুটোতেই তো মন ভরিয়ে দিত। আজ তা পাবেন কোথায়?"

আঙ্গুরবালাকে আমি বহু আসরে গজল-ঠুংরী গাইতে শুনেছি। ওঁরই সঙ্গে মঞ্চে আসেন ইন্দুবালা। তিনিও খুব বড় দরের গাইয়ে ছিলেন। তিনিও ভাল গজল-ঠুংরী গাইতেন। মনোমোহন থিয়েটারে 'রক্তকমলে' কাজীর গান 'কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে" তিনি অদ্ভুত গেয়েছিলেন। গিরিশবাবুর 'প্রফুল্ল'তে মাতালনীর গান নিয়ে আমাদের মত দর্শকরা তর্ক করত, আঙ্গুরবালা ভাল গান, না ইন্দুবালা ভাল গান।

ইন্দুবালা ছিলেন সারেঙ্গীওলা গৌরীশঙ্করের ছাত্রী। কাজী নজরুলের গান যে আজ এত বিখ্যাত, তার পেছনে আঙ্গুরবালা ও ইন্দুবালার দান কম নয়। এঁরা মাসের পর মাস রেকর্ড করে তাঁকে বিখ্যাত করেছেন। 'রক্তকমলে' কাজীর বিখ্যাত গান "কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে" ইন্দুবালাই প্রথম রেকর্ড করেছিলেন। অপর দিকে ছিল "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর" গান দুটি কি ধরনের বিখ্যাত হয়েছিল, তা সেদিনকার শ্রোতা ছাড়া আর কেউই জানে না।

আঙ্গুরবালা অবশ্য তাড়াতাড়ি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দুবালা বহুদিন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বাউলনী', 'উদাসী' এই ধরনের চরিত্রে তিনি নামতেন। তিনি নিয়মিত রেডিওর গায়িকা ছিলেন এবং রেকর্ডেও নিয়মিত গাইতেন। আজও জীবিত আছেন, তবে উত্থানশক্তিরহিত। তাই তাঁর সতেজ কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। বেঁচে থেকেও আজ তিনি জীবন্মৃত। জীবনে এর থেকে আর বড় দুঃখ কিছু হতে পারে না।

কানে গান শোনেন, মনেও ধ্বনিত হয়, কিন্তু মুখ ফুটে তা বেরোয় না। শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় ব্যথা আর কি হতে পারে!

আর একজনের নাম করা দরকার, যিনি আজীবন মিনার্ভায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর নাম হল নরীসুন্দরী। গানের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তবে আঙ্গুরবালা ও ইন্দুবালার মত অত বড় দরের গাইয়ে তিনি ছিলেন না।

এবারে বলব তাঁদেরই কথা, যাঁরা অভিনয়েতে এবং গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম হল চারুশীলা, যিনি সখীর দলে জীবন সুরু করেছিলেন। অপূর্ব গানও তিনি গাইতেন। ষোড়শীর ভূমিকায় তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। মঞ্চে তাঁর সময় অতবড় অভিনেত্রী খুব কম ছিল।

এই সঙ্গে আর একজনের নাম করি। তাঁর নাম হল শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী। যদিও তিনি 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণীর পার্টে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি 'কৃষ্ণলীলা'য় রাধার গানও অপূর্ব গাইতেন। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের গান গাইতেন শ্রীমতী প্রভা। পরবর্তীকালে যাঁর অভিনয়ের তুলনা ছিল না। যাঁর জীবনের শেষ পার্ট হল মঞ্চে 'দুই পুরুষে' বিমলার চরিত্র। শিশিরবাবুর সঙ্গে তিনি প্রথম নাম করেন সীতা অভিনয়ে। জীবনে বহু ভূমিকায় তিনি অভিনয় করে গেছেন, যার আজও তুলনা হয় না।

শ্রীমতী কঙ্কাবতী অভিনয়ও যেমন করতেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানও গাইতে পারতেন।

কৃষ্ণভামিনী

তাঁর পিয়ারার গানও অদ্ভুত ছিল। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হল 'রীতিমত নাটকে' স্বাগতা এবং 'বিজয়া'য় বিজয়া। এমন রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভরপুর করে তুলতেন, যার তুলনা হয় না। এই স্বাগতা এবং বিজয়া আমি অনেককে অভিনয় করতে দেখেছি, কিন্তু তাঁর মত অভিনয় আর দেখিনি।

শেষে একজনকার নাম করব, যিনি আজ প্রায় কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন। ১৫-২০ বছর তাঁর মঞ্চের সঙ্গে যোগ ছিল। তাঁর নাম হল শ্রীমতী রাণীবালা। শিশিরবাবুর মঞ্চে তিনি আসেন সখীর দলে, পরে অভিনেত্রী হন। 'বিজয়া'তে তিনি প্রথম দর্শকের চোখে পড়েন। নলিনীর পার্ট করে। পরে 'রীতিমত নাটকে' নায়িকা বুলবুল বা শান্তা মজুমদারের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি বিখ্যাত হন। রামকৃষ্ণ মিশ্রের শিষ্যা ছিলেন তিনি। অপূর্ব গান গাইতেন। 'রীতিমত নাটকে' "যদি না দেখা মেলে, দূরে গেলে এ জীবনে" আমরা আজও ভুলিনি।

এরপর তিনি 'স্বামী-স্ত্রী'তে লিলির পার্টে জহর গাঙ্গুলীর সঙ্গে গান "মুদিত যে ফুল আঁখি" আমরা আজও ভুলিনি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পার্ট 'তটিনীর বিচারে' তটিনী যাঁরা না দেখেছেন, তাঁদের বলে বোঝান যাবে না। উনি যখন 'চন্দ্রমুখী' সাজেন, তখন তাতে তিনটি গান দেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রমুখীর পার্টে অন্য অভিনেত্রীদের মুখে কোন গান থাকত না। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গাইয়ে অভিনেত্রী পেলে কর্তৃপক্ষ গান জুড়ে দিতেন।

সর্বশেষ বলি, শ্রীমতী মলিনার কথা। যিনি মিনার্ভায় এসেছিলেন সখীর দলে, পরে ষ্টার থিয়েটারে এসে 'স্বয়ম্বরা' নাটকে জহর-বাবুর সঙ্গে নাচেন। পরে মঞ্চে এবং ফিল্মে তিনি যে কতবড় অভিনেত্রী হয়েছিলেন, তা আজকের পাঠককে আর বলে বোঝাতে হবে না।

উপসংহারে বলি ১৯৩০-৩২ সাল অবধি যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চে এসেছেন, তাঁরা যে ভাল গানও গেয়েছেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। হঠাৎ কি হল, মঞ্চ থেকে গান বিদায় নিল, তার জায়গায় স্থান নিল টেপ রেকর্ডিং মেশিন। সেদিন এক জায়গায় 'কর্ণার্জুন' দেখতে গিয়েছিলাম। নিয়তির ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন তিনি হয়ত গান জানেন না। 'কাল প্রবাহ চলে' ও 'আমি কখন ভাঙ্গি কখন গড়ি' গান দুটি রেকর্ড করে এফেক্ট আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে এফেক্ট তো এলই না, নিয়তি এবং কর্ণ যতটুকু করলেন, তাও যেন জমলো না।

তাই আমার অনুরোধ, মঞ্চের ভাগ্য-বিধাতারা এতদিন তো অনেক আর্ট দেখালেন, কোনরকমে আর পুরানো দিনগুলোকে কি ফিরিয়ে আনতে পারেন না?

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত "প্রণয়পাশা"র একটি বাৎসল্যমধুর দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও বাপ্পা। ছবিটিতে সুরারোপ করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'শুভ-সংবাদ'-এর একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে দীপঙ্কর দে ও রাজশ্রী বসু। পরিচালনা—জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

নন্দনবাসিনী উর্বশী—নীহারবালা

কুঞ্জবন থেকে তপোবনেঃ একই জীবনে

কালীশ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে ক'জন অভিনেত্রী উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তির পরিচয় দিয়ে নন্দনবাসিনী উর্বশীর সমপর্যায়ভুক্তা বলে অভিনন্দিতা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নাট্য-সম্রাজ্ঞী নীহারবালা ছিলেন অনন্যা। উর্বশীর দেহসৌষ্ঠব ছিল না নীহারবালার, কিন্তু রূপসজ্জা নিয়ে যখন পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতেন কোন রূপসীর চরিত্রে---দর্শকাসনে উপবিষ্ট পুরুষবাদের চোখে বিভ্রম সৃষ্টি করতেন অতি সহজেই।

কর্ণার্জুনের সেই রহস্যময়ী নারীর কথা মনে করে দেখুন, তার সব কথাই রহস্যের আবরণে ঢাকা। সব কথাই যেন হেঁয়ালী। "মায়া--মায়া। তুমি মায়া—আমি মায়া---এ-সংসার মায়ার তারে গাঁথা বিচিত্র হার।" --তার কথা শুনে কেউ ভাবে অনাথিনী, কেউ ভাবে উন্মাদিনী। পরিচয় জানতে চাইলে গানের মধ্য দিয়ে, উত্তর দেয়---

"আমি আঁধারে বেঁধেছি ঘর
আলোর দেশের পারে।
ছায়া দিয়ে ঘেরা সে যে মরণ নদীর ধারে।।"

পরনে লালপেড়ে শাড়ী--এলায়িত কেশদাম --কপালে বালার্ক সিন্দূরবিন্দু---চোখের তারায় ভবিষ্যতের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আজও চোখের সামনে ভাসছে নিয়তির চরিত্রাভিনেত্রী নীহারবালা। অভিনয়, অভিব্যক্তি আর সুমিষ্ট কণ্ঠের অপূর্ব সুর-ঝংকার--আজও ভুলিনি। ভুলতে পারিনি। আর্ট থিয়েটার সেদিন যে শিল্পীসম্ভার নিয়ে পর্দা উন্মোচন করেছিলেন—তাঁরাই পরবর্তী যুগে দেখা দেন নাট্যশালার এক একজন দিক্‌পালরূপে। নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, কৃষ্ণভামিনী--নিভাননী--আঙ্গুরবালা-নীহারবালা আরো অনেকে ছিলেন। নীহারবালার নিয়তি সর্বসাধারণের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। একদিকে আর্ট থিয়েটার তার শিল্পীসম্ভার নিয়ে, অপরদিকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেদিন পরম গৌরবের ধ্বজা যাঁরা উড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নীহারবালার নাম চিরভাস্বতী হয়ে আছে।

দু' বছর বাদে। ১৯২৫। হাতিবাগানের স্টার রঙ্গমঞ্চে তখন আর্ট থিয়েটারের বিজয়-বৈজয়ন্তী। অভিনয় দেখতে উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ং নাট্যকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। 'চিরকুমার সভা'র বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন অপরেশ চন্দ্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, রাধিকানন্দ, ইন্দু মুখার্জি, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, হরিমোহন বসু, সুশীলাসুন্দরী, বাণীসুন্দরী, নিভাননী; ফিরোজাবালা--এমনি আরো অনেকে। নীরবালার চরিত্রে নিয়তির নীহারবালা। অভিভূত কবি। 'রসিকবাবু' বলে আখ্যা দিলেন অপরেশচন্দ্রকে। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী সকলের প্রশংসায় কবি মুখরিত। কিন্তু নীরবালা। নীরবালা পেল সৃষ্টির সার্থকতায় আনন্দোদ্বেলিত স্রষ্টার অন্তরভরা আশীর্বাদ।

এই বছরেই এলো কবিগুরুর গৃহপ্রবেশ। কবি আবার এলেন নাটক দেখতে।

নীহারবালা ঃ 'কর্ণার্জুন'-এ নিয়তি

"ঐ মরণের সাগর পারে চুপে চুপে আসে"--গানটি কবিকেও উন্মনা করে তোলে। নীহারবালার কণ্ঠে গানটি এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে অনেকের মুখেই তখন শোনা যেত। নীহারবালা অভিনয় করেছিলেন তিমির চরিত্রে। ১৯৩০। বিডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটার মনোমোহন থিয়েটার নামে তখন নামান্বিত। চিত্তরঞ্জন এভেনিউর গর্ভে নিমজ্জিত হবার জন্য দিন গুণছে। ২৪শে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো মন্মথ রায়ের কারাগার। নাট্যাচার্য দানী ঘোষ, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরয়, সুশীলাসুন্দরী, রাজলক্ষ্মী, ভূমেন রায় আছেন বিভিন্নাংশে। নীহারবালা আত্মপ্রকাশ করলেন চন্দনা চরিত্রে।

দেবতার পায়ে সমর্পিতা পবিত্র যাদববালা। কংসের কামনার দৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না সমাজের কোন লোক। কংসের অনুচরেরা তাকে ধরে নিয়ে হাজির করলো কংসের সামনে। নির্ভয় চন্দনা আত্মশক্তিতে যখন মুক্ত হয়ে ফিরে এলো নিজের গ্রামে---সমাজের লোকেরাই দূর দূর করে তাকে পতিতা বলে লৌষ্ট্র নিক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল। বসুদেবও পারলেন না যাদবদের শান্ত করতে। কংস নিজেই তাকে ধরে নিয়ে গেল তার প্রাসাদে। অত্যাচারী অমানুষ কংসের অভ্যন্তরে স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল শিশুটি চন্দনাকে দেখে জেগে ওঠে—চন্দনার স্নেহশীল মন হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল। মনে হয় কংসের --যেন সে জয় করতে পেরেছে চন্দনাকে। নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন কামনা বাসনা নিয়ে কংস হাত বাড়ায়। দূরে সরে যায় চন্দনা।

চতুর্দিকের অসহায়তার মধ্যে নানান ছলনায় আত্মরক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে পায় মুক্তি। চন্দনাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার কংসের ভিন্ন একটি যে রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, নীহারবালার অভিনয়ে তা চরম সার্থকতা লাভ করেছিল। সমগ্র নাটকের একটি দিকের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে চন্দনা। নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের ত্রিবেণীধারায় উৎসারিত চন্দনা চরিত্রে নীহারবালার নৈপুণ্যে মুগ্ধ না হয়েছেন এমন দর্শক খুব কমই ছিলেন।

নীহারবালার কণ্ঠে চন্দনার সেই গান---
"অগ্নি-রাগের গান ধরে কে বলছে প্রাণের দ্বারে--
জাগোরে মন, ঘুমিও না আর আঁধার-কারাগারে।"

অথবা ভিন্ন রাগের---
"নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।

অশান্ত-ধারে জল ঝর ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি-মগন ॥
ঝঝ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝননননন,
দীর্ঘশ্বসা কাঁদে অরণ্য শনশন,
প্রলয়-বিষাণ বাজে বজ্রে ঘন ঘন,
মূর্চ্ছিত মহাকাল চরণে মরণ ॥
শুধিবে না কেহ কিগো, এই পীড়নের ঋণ?
দুঃখ নিশির শেষে আসিবে না শুভদিন?"

একদিকে এই সুর ঝংকার অপরদিকে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের ভয়াবহ পরিবেশ। দর্শকমন নিরঙ্কুশ-প্রতীক্ষায় পরিণতির জন্য মুহূর্ত গুণতেন।

২৬ রজনী অভিনীত হবার পর রাজরোষে বন্ধ হয়ে যায় কারাগারের অভিনয়। ধূলিসাৎ হয়ে যায় মনোমোহন থিয়েটার অর্থাৎ বিডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটার। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শে যেখানে ধন্য হয়েছিল বাংলার নট-নটীকুল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাংলার নাট্যশালার বিসমার্ক প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতা রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটে গড়ে তুললেন নাট্য-নিকেতন নবনাট্য দেউল। আজ যেখানে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ।

নব নব নাট্য-কীর্তিতে নাট্য-নিকেতন হয়ে উঠলো রঙ্গশালাগুলির মধ্যমণি। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, সতু সেন প্রভৃতি দিক্‌পাল প্রতিভা। শিল্পী সমাবেশে--প্রয়োগ নৈপুণ্যে----নব নব নিরীক্ষা-পরীক্ষায় নাট্য-নিকেতন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলো। একদিকে নব নব সৃষ্ট সৌকর্যের আকর্ষণ--আর একদিকে জ্ঞানী-গুণীদের আড্ডা ও মজলিস। খানা-পিনার অঢেল ব্যবস্থার মধ্যে নাট্যচিন্তায় বিভোর নাট্য-পাগলের দল : কাজী নজরুল ইসলাম, শচীন সেনগুপ্ত, সতু সেন, জিতেন গাঙ্গুলী, বিজয় মুখার্জি, কবি শৈলেন রায়, মন্মথ রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অধ্যাপক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ আরো কতজনের না সমাবেশ। অতিথি-আপ্যায়নে নীহারবালার বিচিত্র এক ঘরোয়া রূপ। আবার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাদপ্রদীপের আলোকমালার সামনে মঞ্চমায়ার ওড়না জড়িয়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন মায়াবিনীরূপে নীহারবালার আবির্ভাব বিস্ময়াভিভূত করে তুলতো।

১৯৩৮। ২৯শে জুন। মঞ্চস্থ হলো শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা। সুর দিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। অভিনয়ে রইলেন বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, ভূপেন চক্রবর্তী, জিতেন গাঙ্গুলী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, নিরুপমা, রাধারাণী প্রভৃতি। আলেয়ার সুকঠিন চরিত্রে দেখা দিলেন নীহারবালা। কারাগারের চন্দনার মতই নাচ-গান-অভিনয় পাখনা মেলে জড়িয়ে আছে আলেয়াকে। বর্গী-

দুর্গাদাস-নীহারবালা : এক সাড়া জাগানো নাটকের রূপসজ্জায়

ধর্ষিতা মোহনলাল-ভগ্নী আলেয়াকে বাইজীর পসরা মাথায় দিয়ে সমাজ ঠেলে দিলেও নারীত্ব আর দেশপ্রেমের অগ্নিতে সে হয়ে উঠেছিল অগ্নিশুদ্ধা। মাতাহারীর চাতুর্যে মীরজাফরী চক্রান্তের গুপ্ত সংবাদ বহন করে এনে দিত সিরাজকে। একটি চরিত্রে বিচিত্র ভাবের সমাবেশ। নাচ-গান-অভিনয়ের সমান নৈপুণ্য না থাকলে আলেয়ার রূপারোপ কোন শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সিরাজদ্দৌলা নতুন জয়মুকুটে ভূষিত করে দিল নাট্য-নিকেতনকে।

সুভাষচন্দ্র তখন নেতাজী হন নি। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘনীভূত। সুভাষচন্দ্রকে প্রবোধদা আনালেন নাটক দেখাতে। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম পার্শ্বচর হিসেবে সেদিন তাঁর পাশে পাশে থেকেই আমি নাটক দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আমাদের উপস্থিত হতে বিলম্ব হওয়াতে নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে যায়। বন্দেমাতরম ধ্বনি আর সুভাষচন্দ্রের জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আমরা যখন নাট্যগৃহে পৌঁছলাম, প্রথম থেকেই অভিনয় শুরু হলো আবার। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। অভিভূত উদ্বেলিত সুভাষচন্দ্রকে আমি লক্ষ্য করছি প্রতি মুহূর্তে, আর নাটক দেখছি। কখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

কাশিমবাজারের ইংরেজের কুঠীতে নাচ-গানের আসরের অন্তরালে চলছে ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র। "ম্যায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী" গানের এক একটি কলির সঙ্গে নাচতে নাচতে এক একজনের কাছে গিয়ে ওদের শলাপরামর্শ

গুলি অত্যন্ত চাতুর্য ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জেনে নিতে লাগলো আলেয়া। সুভাষচন্দ্রের উদ্‌গ্রীব মনোভাব আর মাঝে মাঝে 'বাঃ বাঃ' বাহবা আমার মত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

নাটকের এমন দৃশ্য ছিল না যা দেখে অভিভূত সুভাষচন্দ্র সাধারণ দর্শকের মত স্বগতোক্তি না করেছিলেন।

পলাশী। লাখো লাখো পলাশ ফুলের অগ্নিবরণে কোনদিন হয়ত পলাশী প্রান্তর রাঙা হয়ে থাকতো--তার বুকে জেগেছিল রক্তের তৃষ্ণা। সিরাজের দেশপ্রেমিক সেনা ও সেনানী-দের রক্ত দিয়ে রাক্ষসী পলাশী তার রক্তপিপাসা মিটিয়েছিল।

সিরাজের পালাবার ব্যবস্থা করে দেবার পরই গোলাম হোসেন ও আলেয়াকে কারারুদ্ধ করে নির্মম অত্যাচার চালানো হয় সিরাজের সংবাদ পাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত ধৃত সিরাজকে অন্ধকার কারাকক্ষে এনে রুদ্ধ করে দিয়ে গেল মীরণ। এই কারাকক্ষে যন্ত্রণাকাতর গোলাম হোসেন আর আলেয়া মৃত্যুর জন্য মুহূর্ত গুণ-ছিল। বাঙ্গালীর আত্মকলহই ডেকে নিয়ে এসেছে পলাশীর শোচনীয়তা। আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জাতিকে ভবিষ্যতের জন্য সচেতন করতে চেয়েছেন নাট্যকার। পলাশী সমগ্র জাতির ললাটে লেপে দিয়ে গেল কলঙ্কের মসী। পলাশীর কলঙ্ক ভবিষ্যৎ জাতিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক। স্তব্ধ সিরাজ। মৌন গোলাম হোসেন। আলেয়ার কণ্ঠে সুরলহরীর মধ্য দিয়ে সমগ্র নাট্যগৃহে ঝরে পড়তে লাগলো জাতির অন্তরমথিত বেদনা।

পলাশী। হায় পলাশী।
এঁকে দিলি তুই জননীর মুখে,
কলঙ্ক কালিমা রাশী।
আত্মঘাতী স্বজাতির মাখিয়া রুধির-কুমকুম
তোর প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ-কুসুম
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ সূর্য
ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি॥

পলাশী। পলাশীর বেদনা আত্মস্থ করে সুভাষচন্দ্রের রুদ্ধ আবেগ ঝরে পড়ছিল অশ্রু-ধারায়। সমগ্র নাট্যগৃহই ভেঙ্গে পড়েছিল চরম বেদনায়। নাটকের স্বাভাবিক অভিনয় ও প্রযোজনায় সুভাষচন্দ্রের মুগ্ধ-মৌন অভিমত নাট্যকার থেকে প্রবোধদা সবাই উপলব্ধি করেছিলেন। শচীন্দ্র-নাথকে বলেছিলেন, "আলেয়ার চরিত্র অপূর্ব সৃষ্টি আপনার। এই মহিলাও প্রাণঢালা অভিনয় করেছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে যদি আলেয়ার মত মেয়ে পেতাম।" আলেয়ার মত সক্রিয়তা নিয়ে ক'জন মেয়ে পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ভারতে থাকতে জানি না। তবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

নন্দনবাসিনী উর্বশী নন। মর্ত্যবাসিনী উর্বশী নীহারবালা তাঁর অভিনীত প্রায় প্রতিটি চরিত্রেই সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ে নন্দনবাসিনীর চরমোৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে মঞ্চ লোকের উর্বশীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে আছেন।

আনুমানিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন নীহারবালা। পিতা কিশোরী-মোহন সরকার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের বড়বাবু ছিলেন। মাতা নীরদা সরকার ১৪ বছর বয়সের সময় মারা যান। পিতার মৃত্যু হয় ২৯ বছর বয়সে।

বালিকা বয়স থেকেই সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উৎসাহও দিতে থাকেন বাবা-মা।

নীহারবালা
এক সামাজিক নাটকের রূপসজ্জায়

৯ বছর বয়সে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কল্যাণী নাটকে নীলু চরিত্রে ন্যাশনালে (বেঙ্গল থিয়েটারে) নীহারবালার প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর কল্যাণী মঞ্চস্থ হয়।

মিনার্ভা মঞ্চে যোগদান করে নীহারবালা যে ক'টি নাটকে অভিনয় করেন তার মধ্যে নরমেধযজ্ঞে--কুশধ্বজ, সংসারে--জীবন, হরিশ্চন্দ্রে-রোহিতাশ্ব, ধ্রুবতে--ধ্রুব, সরলায় গোপাল, প্রফুল্লে-যাদব আর জয়দেবে--কৃষ্ণ উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্টার রঙ্গমঞ্চে অমর দত্ত পরিচালিত সৎসঙ্গ নাটকে চন্দ্রকুমারীর ভূমিকায় নীহার-বালা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নীহারবালার সঙ্গীত ও নৃত্য সাধনা চলছিল নিয়মিতভাবে। মঞ্চলোকের প্রথমসারির শিল্পীরূপে নিজেকে গড়ে তোলার সাধনায় নিয়োজিত রাখার জন্যই সম্ভবতঃ বেশ কয়েক বছর মঞ্চলোক থেকে দূরে সরে ছিলেন। ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর ছিলেন নীহারবালার সঙ্গীতগুরু। নিয়মিত রেওয়াজের বাইরে গল্পচ্ছলে জেনে নিতেন বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিস্তার।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে যোগদান করে অপরেশচন্দ্রের অযোধ্যার বেগম-এ জিন্নৎ চরিত্রে অভিবাদন জানান। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২০ বছর নীহার-বালার মঞ্চজীবন ছিল পরম গৌরবের। অসংখ্য চরিত্রে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। নাচে-গানে-অভিনয়ে প্রতিটি চরিত্র তার বাহ্যিক ও আত্মিক মাধুর্য নিয়ে ফুলের মত ফুটে উঠেছে। নীহার-বালার ব্যক্তি-জীবনে ছিল না কোন মালিন্য। কামনা-বাসনার আগুন নিয়ে তাঁকে খেলা করতে দেখিনি। স্নিগ্ধ-শান্ত-মধুর জীবনধারায় আত্মীয়-স্বজন, সমধর্মী শিল্পিনী ও কর্মী সকলকেই জয় করতে পেরেছিলেন। অথচ মঞ্চলোকের বাইরেও ছিল তাঁর এক ব্যক্তিজীবন। ব্যক্তি-জীবনে যে পুরুষ সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনিও ছিলেন মঞ্চ জগতের এক দিক্‌পাল পুরুষ।

নীহারবালা অভিনীত উল্লেখযোগ্য মঞ্চ নাটক ও চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অযোধ্যার বেগম--জিন্নৎ। সুদামা--রুক্মিণী ও লক্ষ্মী। নবাবী আমল। জীবন প্রভাত। কর্ণার্জুন--নিয়তি। চন্দ্রগুপ্ত--ছায়া। ইরাণের রাণী--নর্তকী ও গুলরুখ রূপকুমারী--কলাবতী। বন্দিনী--নাহেরীন। জনা-মদনমঞ্জরী। চিরকুমার সভা--নীরবালা। ঋষির মেয়ে--সুদত্তা। গৃহপ্রবেশ--হিমি। শ্রীকৃষ্ণ-অস্তি। লাখ টাকা--ভুজঙ্গিনী। শোধবোধ--নলিনী। চণ্ডীদাস--রামী। মগের মুল্লুক--গুলবাণু। দেবাসুর-উষা। রমা--রমা। কুলরা-কুলরা। রজনী--লবঙ্গলতা। মুক্তির উপায়--হৈমবতী। গৈরিকপতাকা--বীরাবাই। কারাগার--চন্দনা।

উপরোক্ত নাটকগুলির মধ্যে মুক্তির উপায়, গৈরিক পতাকা আর কারাগার মনোমোহন থিয়েটারে, অন্যান্যগুলি মঞ্চস্থ হয় স্টার থিয়েটারে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রবোধ গুহ ঠাকুরতা প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যনিকেতন। নীহারবালাও এখানে যোগদান করেন। নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ধ্রুবতারা-চারুলতা। মুক্তির উপায়--হৈমবতী। ঝড়ের রাতে--বিজলী। সাবিত্রী--সাবিত্রী। সতীতীর্থ--সাবিত্রী। আঁধারে আলো--সুলতা মহাপ্রস্থান--লক্ষ্মণা। জননী--পান্নারাণা। মা--ব্রজ-রাণী। পূর্ণিমা নিরন--চতুরিকা। স্বর্ণলঙ্কা--সীতা। চক্রব্যূহ--অভিমন্যু। ব্রতচারিণী--সীতা। বিদ্যা--

সুন্দর--হীরা। জনতিথি--উর্মিলা। নরদেবতা--শাশ্বতী। বহুবাহন--চিত্রাঙ্গদা। সিরাজদ্দৌল্লা--আলেয়া। মীরকাশেম--ফতেমা বেগম। মহামায়ার চর-সুবর্ণলতা। বিদ্রোহী বাঙ্গালী--মেহেরা। কালিন্দী--সুনীতি। পরিণীতা--সারদেশ্বরী প্রভৃতি। চিরকুমার সভা নাটকের সময় দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন নীহারবালা। এই সময় থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

নৃত্যশিল্পী হিসেবেই নীহারবালা খ্যাতি অর্জন করেন না---নৃত্য পরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। নৃত্য সম্পর্কে তাঁর অনুশীলন ও অধ্যয়নও ছিল যথেষ্ট।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অনেকেই সহর ছেড়ে মফস্বলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নীহারবালা তাঁর বান্ধবী সুগায়িকা রাধারাণীর মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করতে থাকেন। এখানে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হন তিনি। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়ের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থ হয়ে ষ্টার থিয়েটারে যোগ দেন। তবে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন না। টিপু সুলতান ও মহারাজা নন্দকুমার নাটকের নৃত্য পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্রের প্রতি নীহারবালার বেশী আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। নির্বাকযুগে মিশররাণী, দেবদাস (বাইজী) ও কেলোর কীর্তি (বাইজী) ছবিতেই তাঁকে দেখা গেছে। সবাক ছবির মধ্যে নামকরা যায় প্রহ্লাদ (আরতিনৃত্য), চাঁদসদাগর--নেতা। বিদ্যাসুন্দর--মালিনী প্রভৃতির। বেতারাভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেছেন। রেখা নাট্যের মধ্যে নাম করা যেতে পারে---বেহুলা--বেহুলা। চণ্ডীদাস--রামী। দক্ষযজ্ঞ---সতী। খনা--খনা। শকুন্তলা-শকুন্তলা। সিরাজদ্দৌল্লা--আলেয়া প্রভৃতির। শিল্পীজীবনের বাইরে আধ্যাত্মিক স্রোতধারা নীহারবালাকে ঘিরে রেখেছিল আশ্চর্যভাবে। বালিকা বয়স থেকেই ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল প্রবল। ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে সমবয়সীদের নিয়ে পুজো-পুজো খেলতেন। একবার লক্ষ্মী পুজোর সময় এমনি খেলতে দেখে তাঁর পিতার জনৈক ব্রাহ্মণবন্ধু তাঁদের খেলার লক্ষ্মীরপুজো করে দেন আনুষ্ঠানিকভাবে। যেখানে আসন পাতা হয়েছিল, সেই আসন সেখানে রেখেই আজীবন পুজো করে যান। পণ্ডিচেরী যাবার সময় ভ্রাতৃবধূকে ভার দিয়ে যান ঐ লক্ষ্মী-পুজোর।

মগ্ন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ছিলেন ভক্তিমতী। ধীরে ধীরে এই ভক্তির ধারা ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে।

সাহানা যাত্রা ইউনিটের 'সমুদ্রমন্থন'-এর দুই শিল্পী শক্তি ভট্টাচার্য ও সাহানা বসু

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত রাজনৈতিক জীবনে শ্রীশ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন। অরবিন্দ দর্শন সম্পর্কে তাঁর শুধু আগ্রহই ছিল না ----ছিল গভীর জ্ঞান। পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত গুহ ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ ও লোক মারফত খবরাখবরের আদান-প্রদান হতো। নাট্যনিকেতনে জ্ঞানীগুণীদের আলোচনার আসর বসতো। নীহারবালার গোয়াবাগানের চণ্ডীবাড়ী ষ্ট্রীটের বাড়ীতেও। বেতার কেন্দ্রের নলিনীকান্ত সরকার তখন পর্যন্ত পণ্ডিচেরীর স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও যাতায়াত করতেন। যোগ স্থাপিত হয়েছে। নীহারবালার সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা। এঁদের আলোচনা নীহারবালার মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে নীহারবালা মাদ্রাজ আসেন। মাদ্রাজের বাড়ীতে পণ্ডিচেরীর দিলীপ রায় আর সঙ্গীত-শিল্পী শুভলক্ষ্মী নীহারবালার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ১৫ই আগষ্ট শ্রীশ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভে নীহারবালা পণ্ডিচেরী যাবার জন্য মনস্থির করেন। নলিনীকান্ত সরকারও কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে নীহারবালাকে পত্র দেন একসঙ্গে পণ্ডিচেরী যাবেন বলে।

পণ্ডিচেরী এলেন নীহারবালা। মহাপুরুষের দর্শনলাভ হলো। আরো বেশী কিছু লাভ হয়েছিল সম্ভবত সাত দিন আশ্রমে থেকে ভিন্ন মন নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। মন পড়ে রইল পণ্ডিচেরী শ্রীশ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের পাদপদ্মে। বছর চারেক যাতায়াত করতে করতে আশ্রমে স্থায়ী ভাবে বসবাসের আকূতি জানালেন মায়ের কাছে। নীহারবালার আকূতি পূর্ণ করলেন শ্রীমা।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার সমস্ত মায়া ছিন্ন করে স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবুকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে পণ্ডিচেরী যাত্রা করলেন নীহারবালা। ছোটবেলার সেই লক্ষ্মী ঠাকুরের দায়িত্ব দিয়ে যান ভ্রাতৃবধূর ওপর।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বাবু ম্যাট্রিক পাশ করলে স্থায়ী-ভাবেই আশ্রমে বসবাস করতে থাকেন। প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিক্ষেত্রটি সুসজ্জিত ও পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব পান অন্যান্য সাধিকাদের সঙ্গে। পরে আশ্রমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বলাভ করেন। ছোট ছোট বালকবালিকাদের নাচ, গান ও অভিনয় শিখিয়ে উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠান করতেন। এদের নিয়ে পৃথক একটি দল গঠন করেছিলেন নীহারবালা। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অসুস্থ হন। শ্রীমায়ের আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে পথ্যও গ্রহণ করেন। হঠাৎ ৬ই মার্চ আবার জ্বরাক্রান্ত হন। ৭ই মার্চ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সকাল ১০-২৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের পাদপদ্মে আশ্রিতা নীহারবালা পরলোকগমন করেন।

বিকেল ৫টায় তাঁকে দাহ করা হয়। মুখাগ্নি করে ভ্রাতুষ্পুত্র। ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ সরকার ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পূর্বেই আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতা থেকে।

নন্দনবাসিনী উর্বশী মর্ত্যলোকের প্রয়োজনে এসেছিলেন মর্ত্যে---কাজ শেষে আবার ফিরে গেছেন নন্দনপুরীতে। উর্বশীর সত্তা নিয়ে আবার সেখানে নাচে-গানে-অভিনয়ে মেতে ওঠবেন---না লীন হয়ে যাবেন পুরুষোত্তমের বুকে---বলতে পারি না।

গায়িকা হৈমন্তী শুক্লার জন্মদিনে অগ্রজ-শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ অভিনন্দন।

বিশ্বজিৎ ও মালা সিনহা : একটি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায়।

উত্তমকুমার চিরকালের "উত্তম" ও "কুমার"

আরতি ভট্টাচার্য

আজকের দিনে বাংলা ছবির জগতে আরতি ভট্টাচার্য একটি চাঞ্চল্য জাগানো নাম। একালের মহানায়ক উত্তমকুমার সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : উত্তমকুমারের অভিনয় কি চিরকালের উত্তম ?

উত্তর : প্রথম দিককার অভিনয় মোটেই উত্তম নয়। শিল্পীর সাবলীল ও সহজ ভঙ্গিমার মাধ্যমে চরিত্রের যে বিকাশ তার অভাব উত্তম-কুমারের প্রথম দিককার ছবিগুলির মধ্যে যথেষ্ট এবং সুস্পষ্ট। এক কথায় কাঁচা অভিনয় বলা যেতে পারে। যেমন ত্রিযামা/হারানো সুর ইত্যাদি।

কিন্তু ধীরে ধীরে সে অভিনয়গত জড়তা কেটে যায়। পরবর্তীকালের ছবিগুলি, যেমন সপ্তপদী থেকে তাঁর অভিনয় মনের মধ্যে রেখাপাত করতে থাকে। তারও পরবর্তীকালের ছবি সত্যজিৎ রায়ের নায়ক এবং চিড়িয়াখানায় দেখতে পাই উত্তমকুমারের এক অন্য অভিনয় যা এক কথায় অনবদ্য--সুপার। যে অভিনয় শিল্পী উত্তমকুমারকে উত্তম হতে সাহায্য করেছে তার পূর্ণ বিকাশ, যা পরবর্তীকালে আরও উচ্চশিখরে যাবার ছাড়পত্র বহন করে। আর বর্তমানের উত্তমকুমার সত্যিই উত্তম-অভিনয়ে যার জুড়ি মেলা ভার। ইদানীংকালে বাংলা চিত্রজগতে বহু নায়কের আনাগোনা হচ্ছে। হয়তো আস-ছেনও অনেকে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে, কিন্তু দর্শক মনের খোরাক যোগাতে পারছেন না। বিগত দুই দশক ধরে সমান তালে যে ব্যক্তিটি বাংলা চিত্রজগতে দর্শক মনের আশা, আকাঙ্ক্ষা দখল করে চলেছেন তা কেবল উত্তমকুমারের পক্ষেই সম্ভব ; কারণ তিনি জাত অভিনেতা বলে।

প্রশ্ন : ইদানীং উত্তম কাস্টিং ছবির ফ্লপ হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর : ফ্লপ-এর কারণ হচ্ছে প্রধান গল্প, অর্থাৎ "লিটারারী ব্যাকবোন" যদি না থাকে তবে ছবি ফ্লপ হওয়াই স্বাভাবিক। শিল্পী তাঁর অভিনয়ের দাবী পূরণ করতে পারেন আর গল্পের মূল চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন শুধু গল্পের মাধ্যমে, তবে গল্প যদি দুর্বল হয় তবে শিল্পী সেখানে অসহায়। বর্তমানের দর্শক মনের ছবির চাহিদা মেটানোর মধ্যে গল্পের একটা বড় ভূমিকা আছে। আজকের দর্শক ভীষণ বাস্তবমুখী এবং ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, সেখানে আমরা দর্শক মনের চাহিদা যোগানে পিছিয়ে পড়ছি। উত্তমকুমার যখন যে চরিত্রে রূপদান করেন তখন সেই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলেন। তাঁর সেই চরিত্র রূপায়ণ দেখলে মনে হয় না শিল্পী উত্তমকুমার ছাড়া মানুষ উত্তমকুমারের আর একটি ভিন্ন সত্তা আছে। চরিত্রের সঙ্গে তিনি এরকমভাবে মিশে যান কিন্তু তবুও তাঁর কিছু ছবি ফ্লপ হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আমার মনে হয় গল্প ছাড়া আরও একটি কারণ হচ্ছে--যেসব ছবি ফ্লপ হয়েছে সেইসব ছবিতে তাঁর বিপরীত চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হয়তো অভিনয়ের দাবী সম্পূর্ণ রূপে মেটাতে পারেননি। এছাড়াও অনেক সময় টেকনিক্যাল দিক থেকেও ছবি অনেক কারণে ফ্লপ হওয়ার কারণ। যেমন মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড় হয় তার একটিমাত্র কারণ--দুই পক্ষই সমান বলবান। সেজন্যেই বোধ হয় খেলা এত জনে ওঠে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

প্রশ্ন : প্রত্যেক নায়িকার সঙ্গে অভিনয় সত্ত্বেও সুচিত্রা-উত্তম জুটি এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর : অন্যান্য নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করা সত্ত্বেও উত্তম-সুচিত্রা জুটির প্রচণ্ড জন-প্রিয়তার একটি মাত্রই কারণ বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া। এই সুন্দর বোঝাপড়াই জুটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ। আরও একটা কারণ হলো তখন বছরে এই জুটির প্রায় ৬ থেকে ৭ খানা ছবি মুক্তি পেত। এটাও জন-প্রিয়তার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। এছাড়াও এই জুটিটি ছিল সত্যিকারের রোম্যা-ন্টিক, যে জুটির অভিনয়ের উৎকর্ষ দর্শকমনকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, তবে যেটা সবার মনের কথা সেটা হচ্ছে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

প্রশ্ন : উত্তমের ক্রমশঃ হিন্দী ছবিতে যাওয়ার ফলে বাঙলা ছবির উপর কি কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে ?

উত্তর : নিশ্চয়ই হতে পারে। বর্তমান বাংলা চিত্র জগতের যা কিছু তার বেশীর ভাগটাই উত্তমকুমারকে ঘিরে। সুতরাং এই রকম একটি ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি বাঙলা চিত্রজগৎকে পঙ্গু করে দিতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়া খুব সুদূরপ্রসারী ; যেমন যে প্রযোজকরা উত্তম-কুমারকে নিয়ে বাংলা ছবি করতে আসছেন বা করবার জন্যে উৎসাহিত হচ্ছেন, উত্তমকুমার যদি ক্রমশঃ হিন্দী ছবির জন্যে বেশী সময় দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে এই সমস্ত প্রযোজক নিরুৎসাহিত হবেন এবং তার ফলে ষ্টুডিও গুলিতে কাজের অভাব হবে, যার ফলে কলা-কুশলীরা এবং আরও অনেকে যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই শিল্পের উপর নির্ভর-শীল তাঁরা জীবিকাহীন হয়ে পড়বেন। এক কথায় উত্তমকুমার বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের "নিউক্লিয়াস"।

প্রশ্ন : উত্তমের সঙ্গে আপনার কতগুলি ছবি হয়েছে বা হবে ?

উত্তর : উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম ছবি স্ত্রী। তারপর "আমি ও সখা", "আনন্দমেলা", "রাজবংশ", "অসাধারণ", এবং জাল সন্ন্যাসী।

প্রশ্ন : উত্তমকুমারকে পরিচালক হিসাবে কেমন লাগে ?

উত্তর : দক্ষতার দাবী রাখেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের একটি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী আছে। ছবির টেকনিক্যাল দিকগুলির প্রতি ছবি পরি-চালনার সময় বেশী নজর রাখেন। যার ফলে তাঁর পরিচালিত ছবিগুলি টেকনিক সংক্রান্ত দিকে যথাযথভাবেই সম্পূর্ণ হয়। এ ছাড়াও পরিচালক হিসাবে আমার মনে হয় আর যে দুটি গুণ থাকা উচিত সেটা হল দেখা এবং লক্ষ্য করা---তা উত্তমকুমারের খুব প্রখর। এই দুটি গুণেরও প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি শুধু একটি বছর এবং বনপলাশীর পদাবলী ছবিতে।

হয়তো উত্তমকুমার পরিচালক হিসেবে সত্য-জিৎ রায় প্রমুখ অন্যান্য প্রথম সারির পরিচাল-কের আসনে নাও বসতে পারেন, তবে তিনি যে ভাল ছবি তৈরী করতে পারেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রশ্ন : উত্তমকুমারের অভিনয়ের কোন্ দিকটা আপনার মনে রোখাপাত করে ?

উত্তর : জলকে যখন যে পাত্রে রাখা যায় তখন সেই পাত্রেই তা পাত্রস্থ হয়ে যায়। উত্তম-

আরতি ভট্টাচার্য : এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে

কুমারের অভিনয়টা ঠিক একই ধরনের। তাঁকে যখন যে চরিত্রই দেওয়া হোক না কেন, সেই চরিত্রটিতে তাঁর অভিনয় মনে গেঁথে যায়। কি রোম্যাণ্টিক চরিত্রে, কি টাইপ চরিত্রে---সবেতেই সমান পারদর্শিতার ছাপ। তবে আজকের উত্তমকুমার একদিনে তৈরী হননি, পিছনে রয়েছে বিগত দু'দশকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। এ এক ইতিহাস, যার ফলস্বরূপ আজকের বাঙলা চিত্র জগতে উত্তম এক অন্য রকম নাম---এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এইটেই আমার মনে সব থেকে রেখাপাত করে।

প্রশ্ন: উত্তমকুমারকে মানুষ হিসাবে কেমন লাগে?

উত্তর: প্রথমে মানুষ হিসেবে খুব দাম্ভিক মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝলাম সেটা আমারই ভুল। আমি যাকে দাম্ভিকতা বলে মনে করেছিলাম আসলে তা হলো তাঁর কাজের মধ্যে অর্থাৎ যখন যে চরিত্রে অভিনয় করেন তখন সেই চরিত্র সম্বন্ধে এত বেশী চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান যে, তাঁর সেই চিন্তিত রূপটাকে আমার দাম্ভিকতা বলে মনে হয়েছিল। ওঁকে আমি স্ত্রী ছবিতে অভিনয়ের সময় প্রথম দেখি। আসলে মানুষটা খুব সহজ সরল। মনটা একেবারেই ছেলেমানুষের মত। খুব সহজেই বন্ধুসুলভ হয়ে যান। মানুষ হিসেবে আর একটা বড় গুণ হলো খুব উপকারী। নতুনদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। কাজের জন্য তাঁর কাছে সহযোগিতা পাওয়া যায়। সেটা সব সময় সবার কাছে পাওয়া কি সম্ভব?

প্রশ্ন: আজ যে উত্তম ক্রেজ এটা আপনার মতে ক'দিনের? যেমন দুর্গাদাস, প্রমথেশ জীবদ্দশায় যা ছিলেন আজ সেটা শুধু ইতিহাস আর স্মৃতি, উত্তমেরও কি সেই পরিণতি হবে? যদি হয় কতদিন পরে?

উত্তর: তাঁর প্রথম জীবনটা ছিল ইতিহাস। আজকের উত্তমকুমার সেই ইতিহাসের পাতা থেকেই উঠে এসেছেন মহানায়করূপে। দর্শকদের মনে উত্তম-ক্রেজ সর্বকালের সব নায়ককে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে গেছে। চাহিদা কখনও ইতিহাস হয় না, তাই উত্তমকুমার চিরকালের "উত্তম" ও "কুমার"। চাহিদার টানে উত্তমকুমার বয়ে চলবেন এবং একের পর এক বছর কেটে যাবে, ভাবতে দেবে না জীবন কিভাবে কেটে যায়। তাঁর অভিনয়ের সৃষ্টি দিয়ে যা মনুষ্যচরিত্রকে ভাবতে সময় নেবে। আশা করা যায় তাঁর অভিনয়ের প্রদীপশিখা দিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখবেন যতদিন তিনি এ জগতে থাকবেন।

প্রশ্ন: উত্তমকে সহশিল্পীরূপে পাওয়াকে শিল্পী জীবনে আপনি বিশেষ সম্পদরূপ মনে করেন কি?

উত্তর: উত্তমকুমারকে সহশিল্পী হিসেবে পাওয়া যে কোন নায়িকার পক্ষে এক বিশেষ সম্পদস্বরূপ। এ কথাটা উত্তমকুমার সম্পর্কে যতখানি প্রযোজ্য অন্য কোন নায়ক সম্বন্ধে ততখানি প্রযোজ্য কি না তা যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ রাখে। আমি সেদিক থেকে নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে করি, তার কারণ আমি চিত্রজগতে আসার খুব অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা চিত্রজগতের মধ্যমণি উত্তমকুমারকে সহশিল্পী হিসেবে পেয়েছি। যে উত্তমকুমার বাংলা চরিত্র জগতের এক উজ্জ্বল জীবন্ত অধ্যায় তাঁর বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় আমার শিল্পী-জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়।

শিল্পীর কোন জাত নেই-রঙ নেই

।। রঞ্জিত মল্লিক ।।

একালের বাংলা ছবির প্রথম শ্রেণীর নায়কদের মধ্যে যে কটি নাম সবার আগে উল্লেখ করার মত সেই তালিকায় রঞ্জিত মল্লিক একটি বিশেষ নাম। অল্প সময়ে প্রতিভা এবং নিষ্ঠার মূলধনে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছেন এবং দর্শক সমাজে একটি বিশেষ আসন অধিকারে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর কিছু বক্তব্য এবং ধারণা এখানে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন: আপনি আপনার ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে নায়িকাদের সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেন? যদি করেন তো কিভাবে?

উত্তর: নিশ্চয়ই আশা করি। এই সহযোগিতা না থাকলে অভিনয় করে আনন্দ পাওয়া যায় না বা সে অভিনয় মনের মত হয় না। অভিনয়টা অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার। একটা চরিত্রকে রূপদান করতে গেলে সেই চরিত্রকে ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে। চরিত্রকে উপলব্ধি না করলে তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। বিপরীত চরিত্রে নায়িকার সহযোগিতা এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নায়িকা যদি তাঁর চরিত্রের সব দাবী অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে না মেটাতে পারেন তবে তাঁর বিপরীতে যিনি নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি তাঁর চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। অর্থাৎ ভাল অভিনয় নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকলে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: সব থেকে প্রতিভাময়ী নায়িকা আপনার কাকে মনে হয় এবং কেন?

উত্তর: শিল্পীর প্রতিভার বিকাশ তার শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। তার বিকাশের পথ সে নিজেই খুঁজে নেয়। তবে অনেক সময় দেখা যায় অনেক প্রতিভাবান শিল্পীরও অনেক অভিনয় ততখানি প্রাণোচ্ছল হয় না। এক্ষেত্রে ছবির গল্প এক বড় সমস্যা। গল্পের একটা গতি আছে, তবে কোন গল্পে সেই গতি যদি না থাকে তবে সেই গল্পের মুখ্য চরিত্রে যিনি যত বড় প্রতিভাবান বা প্রতিভাময়ী শিল্পী অভিনয় করুন না কেন তা অনেক সময় মনে দাগ কাটে না। এক্ষেত্রে শিল্পী কতকটা অসহায়। বাংলা চলচ্চিত্রে ছায়াদেবী নিঃসন্দেহে এক প্রতিভাময়ী শিল্পী। বিগত তিন দশক ধরে তিনি এপর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বহু চরিত্রে রূপদান করেছেন এবং তার প্রত্যেকটিই এক

কণিকা মজুমদার
ছায়াছবির বিশিষ্ট শিল্পী : রঙ্গমঞ্চের প্রিয় নায়িকা

বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমান নায়িকাদের যতটা আলোকচিত্রগত সচেতনতা আছে, ছায়াদেবীর কোন কালেই তা নেই, এ ব্যাপারে তিনি এক ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন: পুণা ইনষ্টিটিউট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন নায়িকার সঙ্গে কি আপনি অভিনয় করেছেন? যদি করে থাকেন তবে অভিনয়ের দিক থেকে কি কোন পার্থক্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: রীতা ভাদুড়ী। অভিনয় জিনিসটা এ নয় যা কেবল কতকগুলো ধরাবাঁধা নিয়ম শিখলেই আয়ত্ত করা যায়। যদি না তার মধ্যে অভিনয় ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাটাই আসল, তার সঙ্গে যদি প্রথানুগ শিক্ষা পাওয়া যায় তা অবশ্যই এই ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে। এই জন্যেই পুণার ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের মত কতকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে নানা ধরনের ছবি দেখার সুযোগ থাকে, তা থেকে অনেক বড় বড় শিল্পীর অভিনয়ের টেকনিক এখানকার শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে। ছবির একটা বড় দিক যন্ত্রগত দিক অর্থাৎ আলোকচিত্র সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ইত্যাদি। এখানে যারা শিক্ষা নেয় তাদের ছবির এই কলাকুশলগত দিকে যথেষ্ট জ্ঞান হয় একথা ঠিক। তবে আসল কথা হলো অভিনয় একটা নিজস্ব ক্ষমতার ব্যাপার, এই ক্ষমতা যার আছে তার উপর যদি প্রথানুগ শিক্ষা পায় তবে তা নিশ্চয়ই খুব সাহায্যকারী।

মাধবী চক্রবর্তী : সুপর্ণা

প্রশ্ন: আপনার সেরা জুটি হিসাবে কাকে মনে হয় এবং কেন?

উত্তর: জুটির ব্যাপারটা অনেকখানি দর্শকেরই সৃষ্টি। দর্শকরা যে জুটিকে যখন গ্রহণ করেন সেই জুটিই তখন খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়। তাছাড়া আর একটা দিক আছে, অন্য জুটির অবর্তমানে যদি একই জুটির অনেক ছবি আসতে থাকে তবে স্বভাবতই সেই জুটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন উত্তম - সুচিত্রা। এই জুটির খুবই জনপ্রিয়তার এক কারণ দর্শক এই জুটিকে ভীষণভাবে গ্রহণ করেছিল এবং অন্য কারণ তখন অন্য জুটির অভাব ছিল। এখন যেমন দর্শক বলে আমি এবং অপর্ণা সেন নাকি এক জনপ্রিয় জুটি। আসল কথা সব ব্যাপারটাই দর্শকদের উপর নির্ভর করে। জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি যে ওঁদেরই হাতে।

প্রশ্ন: নতুন এবং পুরোন নায়িকাদের মধ্যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ তফাত খুঁজে পান কি?

উত্তর: নতুন এবং পুরোন নায়িকাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের কোন তফাত না থাকলেও কতকগুলো ব্যাপারে অবশ্যই তফাত লক্ষ্য করা যায়। যেমন নতুন নায়িকারা তাঁদের পরিচ্ছদের ব্যাপারে অনেক বেশী সচেতন পরিচ্ছদ অবশ্যই অভিনয়ের একটা অঙ্গ তবে আমার মনে হয় নতুনরা এ ব্যাপারে পুরোনোদের থেকে একটু বেশী সজাগ। তবে সেটা অনেকটা যে যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে বলে মনে হয়। একটা যুগের পরিবর্তন ঘটলে তার সঙ্গে সঙ্গে মনের দিক থেকেও অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে এবং সেই ঘটার মূলে একটা কারণ থাকে। সেই কারণই একটা সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়। যুগের সঙ্গে সময়ের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে চললেও নতুন এবং পুরোন এ চিরকালের এক পৃথক পথিক।

প্রশ্ন: যে কোন নায়িকার বিপরীতে কাজ করবার সময় আপনি কি সব প্রস্তাব গ্রহণ করেন? যদি করেন, তবে তার সমস্যার সমাধান করেন কি উপায়ে?

উত্তর: যে-কোন নায়িকার বিপরীতে আমি অভিনয় করতে রাজী। কিন্তু আমি যখন কোন ছবিতে আমার নিজের চরিত্র গ্রহণ করি—তার আগে আমি ছবির গল্প এবং কোন্ চরিত্রে আমি অভিনয় করবো তা ভাল করে দেখে নিই। কারণ গল্প যদি ভাল না হয় এবং যে চরিত্রে রূপদান করবো তা যদি মনের মত না হয় তবে সেখানে অভিনয় করতে মন থেকে

সাড়া পাই না। অভিনয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতির একটা ব্যাপার আছে। কোন চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে সাময়িকভাবে সেই চরিত্রের দাবী পূরণের জন্যে কতকগুলো অনুভূতি জাগাতে হয়, কিন্তু সে অনুভূতি কখনই আসবে না, যদি না আমি সেই চরিত্রটা করার জন্য মন থেকে সাড়া না পাই অর্থাৎ চরিত্রটা যদি না আমার পছন্দসই হয়। আমার চরিত্র পছন্দতে গল্পেরও একটা বড় ভূমিকা থাকে। আমার মনে হয় গল্পের যদি না একটা গতি থাকে তাহলে সেই গল্পের চরিত্র প্রাণবন্ত হওয়া বড় শক্ত।

প্রশ্ন: যে-কোন চরিত্র অভিনয়ে আপনি কি কোন বিশেষ ধরন পছন্দ করেন? না কি চরিত্রটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেন? এপর্যন্ত যতগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে কোন্ চরিত্রটি অভিনয় করে ভাল লেগেছে?

উত্তর: আমি যখন যে ভূমিকা নিই তা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়ে থাকি, কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কতদূর কৃতকার্য হই তার বিচার দর্শকরাই করেন। কারণ আমি মনে করি দর্শকরাই আমার নিজের সাফল্যের প্রতিবিম্ব। এ পর্যন্ত আমি প্রায় ষোলটি ছবিতে কাজ করেছি। যেমন ইণ্টারভিউ/ক্যালকাটা—৭১/পিকনিক/মৌচাক/স্বয়ংসিদ্ধা/নানা রঙের দিনগুলি/স্বীকারোক্তি/রাগ অনুরাগ/অপরাজিতা/বহ্নিশিখা/দম্পতি/অজস্র ধন্যবাদ/দিন আমাদের/কবিতা/ছেঁড়া-তমসুক প্রতিশ্রুতি আর আগামী ছবিগুলি লালকুঠী/প্রক্সি রজনী দেবিকা ময়না রবিবার এবং নয়নশ্যামা, তবে যে ছবিতে অভিনয় করে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি সেগুলি ইণ্টারভিউ/স্বয়ংসিদ্ধা/প্রতিশ্রুতি

প্রশ্ন: চিত্রশিল্পীদের আজকাল প্রায়ই নাটক করতে দেখা যাচ্ছে, যদি সেরকম কোন সুযোগ আসে তো আপনি কিভাবে তার সদ্ব্যবহার করবেন?

উত্তর: আজকাল বহু চিত্রশিল্পী নিয়মিতভাবে মঞ্চে অভিনয় করছেন আমার ব্যক্তিগতভাবে মঞ্চে অভিনয় ভাল লাগে না, তার একটাই কারণ দিনের পর দিন এক সংলাপ বলা আমার কাছে খুব একঘেয়ে বলে মনে হয়। তবে তার মানে এই নয় যে আমি নাটক ভালবাসি না। নাটকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। ভাল নাটক দেখতেও ভালবাসি।

প্রশ্ন: অভিনয়কে কি আপনি শুধু অভিনয় মনে করেন, যদি সাধনা মনে করে থাকেন তবে তার প্রস্তুতি কিভাবে করে?

উত্তর: অভিনয় আমার কাছে নিছক অভিনয় নয়। এ এক সাধনা। সব সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে প্রস্তুতির দরকার। আমি সে প্রস্তুতি করি চরিত্রটিকে উপলব্ধি করে। আমি যখন যে ছবিতে কাজ করি তখন সেই ছবির গল্প ভালভাবে পড়ি। এবং যে চরিত্রকে আমি রূপ দিতে চলেছি সেই চরিত্রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি, কারণ আমি জানি আমি যদি চরিত্রকে ভালভাবে উপলব্ধি না করি তাহলে সেই চরিত্রকে পর্দায় ফোটানো অসম্ভব। আমি আমার এই প্রচেষ্টায় কতটা কৃতকার্য হয়েছি তা কেবল সমালোচকরা এবং আমার প্রিয় দর্শকরাই বলতে পারবেন। তবে আমি চেষ্টা করি আমার যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে অভিনয় করে সবাইকে খুশী করতে। সেই খুশীই আমার সাধনার বড় সম্পদ।

প্রশ্ন: কলকাতা এবং বোম্বাই-এর অনেক নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে সুচিত্রা/অপর্ণা/মালা ও ওয়াহিদার সঙ্গে অভিনয় করবার পর সেই অভিনয় সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর: সুচিত্রা সেন, মালা সিনহা' ওয়াহিদা রেহমান সকলেই আমার থেকে বয়সে অনেক বড় এবং নামকরা চিত্রাভিনেত্রী। ছবিতে কাজ করার সময়ে এঁদের সংস্পর্শে এসে আমার অভিজ্ঞতা কিছু নিশ্চয় হয়েছে। এক একজনের সম্বন্ধে এক একরকম ধারণা হয়েছে। যেমন সুচিত্রা সেন সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম। উনি বড় শিল্পী, হয়তো সে সম্বন্ধে ওঁর নিজের একটা কমপ্লেক্সও আছে। তবে দেবী চৌধুরাণী ছবিতে ওঁর সঙ্গে অভিনয় করার আগে আমি ওঁর বিপরীতে চতুরঙ্গ বলে একটি ছবিতে কয়েকদিন কাজ করেছিলাম যদিও সে ছবি সম্পূর্ণ হয়নি কতকগুলো কারণে। সেই ছবির একদিনের একটি স্যুটিং-এর ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। একটি দৃশ্য ছিল সুচিত্রা সেন কাঁদতে কাঁদতে আমার পায়ে পড়বেন। আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম উনি একজন প্রথম সারির নায়িকা, এই পায়ে পড়ার দৃশ্যটি উনি কিরকমভাবে করবেন। কিন্তু দৃশ্যগ্রহণ যখন হয়ে গেল তখন আমি ভাবলাম, আমার মনে যে ধারণা ছিল সেটা যে কত ভুল এবং ভিত্তিহীন তাঁর সঙ্গে যদি অভিনয় না করতাম তাহলে তা বোধ হয় আজও আমার অজানা হয়ে থাকতো। এতেই প্রমাণ হয় শিল্পীর কোন জাত নেই, কোন রঙ নেই। মালা সিনহা খুব হাসিখুশী প্রাণোচ্ছল। পারস্পরিক বোঝাপড়ায় ওঁর সঙ্গে অভিনয়ে আনন্দ আছে। ওয়াহিদা রেহমান খুব বড় শিল্পী তবে একটু রিজার্ভড। অপর্ণা সেনের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ভাল হওয়াতে ওঁর সঙ্গে অভিনয় করে আনন্দ আছে।

নিউ গণেশ অপেরার "রূপসী গঙ্গা"-র দুই তারকা: তপনকুমার ও গীতিকা মিত্র

প্রথম লগনে—সোনালী গুপ্ত ঃ রূপালী ছবিতে সোনালী মেয়ে

সোনালী গুপ্ত। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই সত্যবতী। চিত্রজগতে যার আবির্ভাব ছিল খুবই আকস্মিক। আজ বাংলা চলচ্চিত্রের নায়িকা তালিকায় যার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকারী।

একজন শিল্পীর সঙ্গে সাংবাদিকের যে সাক্ষাৎকার, এই সাক্ষাৎকারও ছিল ওইরকম। তবে আমার মূল প্রশ্ন ছিল রূপোলী পর্দায় প্রথম অভিনয়ে তার অনুভূতি।

সোনালী জানাল : প্রথম প্রতিশ্রুতিতে যখন অভিনয় করি, তখন বয়স মাত্র বার। সিনেমায় নামব এ ধারণা ছিল না। আর প্রথম দিন যে শট নেওয়া হয়েছিল, তাতে কোন ডায়লগ ছিল না। আর ডায়লগ না থাকাতেই সুবিধা হয়েছিল। শুধুমাত্র ছিল এক্সপ্রেসান। এক্সপ্রেসানটা ভালভাবেই ফুটিয়ে তুলেছিলাম বলে মনে হয়। কারণ একবারেই পাশ করে গিয়েছিলাম দ্বিতীয়বার শট নিতে হয়নি।

ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানর সময় ছিল একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। অবশ্য তখন যে বয়স, তাতে প্রকাশ করার মত মন ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা ছিল, পরিচালক ছিলেন আমার বাবা দীনেন গুপ্ত। আর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কাজল গুপ্ত। ষ্টুডিওতেও বাড়ীর মতই পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। যার জন্য অভিনয় করতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। প্রথম সিনটা ছিল এইরকম--মা বাবার (বসন্ত চৌধুরী) কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন, জান তোমার মেয়ে লিখতে শিখেছে। বাবা বললেন, কই লেখত' দেখি। আমি লিখে দেখালাম।

অবশ্য পরের ডায়লগটা ছিল একটু শক্ত ধরনের -- ডায়লগটা হ'ল, "পেতল কাঁসার ঘটিটা বাটিটা একত্রে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে; আর এত জলজ্যান্ত মানুষ।" ডায়লগটা যদিও না বুঝে বলেছিলাম। বাবার দেখান মত কথাগুলি হুবহু বলেছিলাম। বাবা খুব খুশী হয়েছিলেন।

সোনালী এক সময় প্রশ্ন করল, আচ্ছা, আমার সম্পর্কে লেখার এখনই কি যথেষ্ট সময় এসেছে? সরাসরি এর উত্তর দিই নি। বললাম : প্রথম প্রতিশ্রুতির সত্যবতীকে অনেকেই ভুলতে পারেনি। খুঁজে পেয়েছিল তার মধ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। আর তাই সেদিনের সত্যবতী আজকের সোনালী গুপ্ত।

পাশেই এসে বসেছেন মা কাজল গুপ্ত। প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। প্রথম আবির্ভাব অন্তরীক্ষ। কাঁচের স্বর্গ এনে দিয়েছিল খ্যাতির স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে।

সোনালী গুপ্ত

সোনালীর বাবা পরিচালক দীনেন গুপ্ত গেছেন বাইরে। আউটডোর স্যুটিং তুলতে।

কাজল গুপ্তই বললেন, মেয়ের ডাকনাম বাবুই। বাবুই যে সিনেমায় নামবে একথা আমরা ভাবতেও পারিনি। সত্যবতীর অভিনয়ের জন্য মেয়ে খোঁজা হচ্ছিল। প্রায় দশ। বারোজন মেয়েকে আমরা দেখেছিলাম, কিন্তু কাউকে পছন্দ হয়নি।

একদিন কি খেয়াল হল—ভাবলাম সোনালীকে নামিয়ে দেখি না কেন? বাবুইকে নিজেই সাজাতে বসলাম। এরপর তার কিছু ষ্টীল ছবি তোলা হ'ল। দেখে সকলের পছন্দ হল। তখন বাবুই-এর বয়স বার। আর প্রথম বই-এ ওর মায়ের ভূমিকায় আমি নিজেই অভিনয় করেছিলাম।

কাজল গুপ্ত জানালেন, তিনি প্রথম অভিনয় করেন ঋত্বিকবাবুর বই অযান্ত্রিকে। তাই ঋত্বিকবাবুর ইচ্ছে ছিল সোনালীও তাঁর বইয়ে অভিনয় করবে।

সোনালী গুপ্ত ঃ একটি সোনালী ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

মানিকদা'র বইয়ে অভিনয় করতে সোনালীর খুব ইচ্ছে। বলতে গেলে এটা তার স্বপ্ন।

প্রথম প্রতিশ্রুতির পর সোনালীকে রূপালী পর্দায় অনেকেই আবার দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু এরপর ছিল দীর্ঘ বিরতি। সে সময় পড়াশুনার কাজে ব্যস্ত ছিল। দীনেনবাবুও চেয়েছিলেন সিনেমায় আর অভিনয় না, এখন পড়াশুনা করুক। বেশ কিছু ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অফারও এসেছিল।

এরপর হারমোনিয়াম। তপন সিংহের ছবি। আবার সোনালী গুপ্ত প্রমাণ করল তার অভিনয় প্রতিভা।

এশিয়া ২২তম চলচ্চিত্র উৎসবে হারমোনিয়ামকে পুরস্কৃত করা হল।

হারমোনিয়ামে অভিনয়ের জন্যে সোনালী সেপ্টেম্বরে মস্কো যাচ্ছে। সেখান থেকে ফিরে যাবে বার্লিন।

তপন সিংহের ছবি 'এক যে ছিল দেশ'-এ সোনালীর অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে।

সোনালীর হাতে এখন বেশ কয়েকটা ছবি। রজনী, সানাই, চুপি চুপি, বন্ধন। এছাড়া ওর বাবা দীনেন গুপ্ত'র ছবির ব্যস্ত নায়িকাদের মধ্যে একজনের স্থান করে নিয়েছে। তবে সব ছবিতে অভিনয় করতে রাজী নয়। চরিত্র ভাল লাগলে নিশ্চয় অভিনয় করবে।

শুধু অভিনয় নয়, সোনালী গুপ্ত নাচও শিখছে। ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি আগ্রহ। বিশেষ করে ভারতনাট্যম। ভারতনাট্যমে সে একদিন বিখ্যাত হবে এটা তার ছেলেবেলা থেকেই স্বপ্ন। অনুশীলনও করে চলেছে একনিষ্ঠভাবে।

নাচ শিখছে মিসেস কুটির কাছে।

যাত্রাজগতের জনপ্রিয় জুটি অশোককুমার ও মীনাক্ষী দে—এক বিশেষ ভঙ্গিমায়

মহেন্দ্র গুপ্ত—এ কালের মঞ্চসম্রাট অভিনয় জগতের দু'টি বিভিন্ন যুগের এক বিশিষ্ট যোগসূত্র

কানন দেবী : এ বছর ফালকে পুরস্কারে সম্মানিতা

বঙ্গ সংস্কৃতির সেবায় অবাঙালীর ভূমিকা প্রসঙ্গে

রণজিতমল কাঁকারিয়া

সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখার আগে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল--সংস্কৃতি তাকেই বলা চলে যার মধ্যে শাশ্বত এবং সুন্দরের ছোঁয়া লাগা থাকে। আবার যার মধ্যে শাশ্বত এবং সুন্দরের অধিষ্ঠান তাকে কখনই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরিধিভুক্ত করা যায় না। কারণ তার প্রভাব সর্বব্যাপী। দেশ-কাল-সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে চলে যায়। সেইজন্যেই তাতে বিশ্বজনীনতার ছাপ।

তবু, গোটা ব্যাপারটাকে সহজ পরিসরে আনার জন্য একটা সর্বজনগ্রাহ্য সূত্রে আসতে হয়। ব্যাপক উপলব্ধির পথ প্রশস্ত করার জন্য উৎস বা উদ্ভবস্থল ধরে রাষ্ট্রের, রাজ্যের, সমাজের, সম্প্রদায়ের নামে তাকে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু তা হলেও তার পরিচর্যা ও সেবার ব্যাপারে দেশ-কাল-সম্প্রদায়ের প্রশ্ন কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারে না। তাই এক রাজ্যের অধিবাসী আর এক রাজ্যের সংস্কৃতির সেবায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে।

সংস্কৃতির শাখা অনেক। ভিন্ন ভিন্ন তাদের প্রকাশ চেহারাও আলাদা আলাদা। কিন্তু একটা ব্যাপারে এর মধ্যেই এক ঐক্যবোধ এবং সমধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর সেইটেই এই যোগাযোগ বা মিলনের পথ প্রশস্ত

গন্তব্যের গতি ব্যক্তিগত দিকে প্রবাহিত করতে হচ্ছে। শহর কলকাতার সঙ্গে আমার কয়েক পুরুষের যোগ আর তাছাড়া আমি নিজে যখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ি--কলকাতা তখন থেকেই আমারও স্থায়ী ঠিকানা। সেই থেকে বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ থাকার ফলে সে কবে কোন্ নিমেষ প্রত্যুষে অথবা উজ্জ্বল সন্ধ্যায়--এখন আর তা মনে নেই--বাঙালী জীবনস্রোতের ধারায় ধারায় এরাজ্যের সংস্কৃতিও আমার চেতনার মর্মমূলে একদিন একটি স্থায়ী আসন করে নিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গসন্তানের কাছে শুধু বাঙালীরাই নয়--সমগ্র রাজস্থানবাসীও চিরঋণী হয়ে থাকবে। তাঁদের বিভিন্ন রচনায় রাজস্থানের শৌর্য, বীর্য, যশোগাথা, বীরত্ব, মহিমা যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এক উজ্জ্বল মহিমায় চিত্রিত হয়েছে তার ফলে সমগ্র রাজস্থান বাঙালী সমাজে শুধু যে তার সম্বন্ধে এক ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি করেছে তাই নয়--বাঙালীর অত্যন্ত কাছের গণ্ডীতে এসে গিয়ে নিবিড়ভাবে একাত্মীভূত হয়ে গেছে বললেও অতিরঞ্জন হয় না।

অতীতের এই দৃষ্টান্তটিকে আশ্রয় করে বলা চলে--এই একই কাজ পাল্টাভাবেও স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙলার যা নিজস্ব সম্পদ তার পরিচর্যার ক্ষেত্রে অবাঙালী নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে।

রণজিতমল কাঁকারিয়া
বাংলা নাটক ও ছবির পরিচালক-সুরকার

বিপুল পটভূমির মধ্যে না গিয়ে আমার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেই বক্তব্য কেন্দ্রীভূত রেখে বলি--সিনেমা-থিয়েটার প্রচারের যে একটা বিরাট মাধ্যম--এসম্বন্ধে কোনরকম দ্বিমত বা সংশয়ের তিলমাত্র অবকাশ নেই।

সমকালীন জীবন এবং সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি এবং চিন্তাধারাকে চিত্র বা মঞ্চের মাধ্যমে তুলে ধরা যেমন এক অবশ্য কর্তব্য তেমনই আজকের দিনে বিস্মৃত অথচ এককালে সাড়া জাগানো কাহিনী চিত্র-মঞ্চের মাধ্যমে তুলে ধরাও এক অভিনন্দনীয় প্রয়াস। এর ফলে, বাঙলার আজকের প্রজন্মের সামনে তার মাতৃভূমির অতীত ঐতিহ্য এবং কীর্তির এক-একটি দিকের এক-একটি উজ্জ্বল আলেখ্য প্রচারের এই বিরাট মাধ্যমে তুলে ধরে এক মহৎ কর্তব্যই সম্পন্ন করা হবে একালের প্রজন্মকে তার পূর্বসূরীদের অবদান এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে।

নতুনের উদ্দেশে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি--যা পুরোনো তার মধ্যে এমন অনেক কিছুরই সন্ধান মেলে যা নতুনের থেকেও নতুন। দেশ-কাল-সমাজের স্বাভাবিক এবং দ্রুতলয়ে পরিবর্তনের মধ্যেও যে অতীত বর্তমানেরই ছবি বহন করে চলে তার থেকে নতুন আর কে থাকতে পারে? কথাটির স্বপক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ এক-এক করে তুলে ধরা যায়। বহুর সমাবেশে না গিয়ে একটিকেই আশ্রয় করি। বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল"। সাল তারিখ হিসাবে এক শ' বছর আগের কাহিনী। এর মধ্যে কত বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল কিন্তু এই উপন্যাসে যে কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তাতে কি বর্তমানের ছবি পাওয়া যায় না? এবং তাকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে দর্শকও তাকে সাদরেই গ্রহণ করবে। তার প্রমাণ--একেবারে হাল আমলেই এই উপন্যাসের নাট্যরূপ কলকাতার বুকেই টানা দু'টি বছর ধরে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে।

একদিন যাঁরা দেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন--অথচ যে কোন কারণেই হোক আজ লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেছেন তাঁদের আবার কর্মমঞ্চে ফিরিয়ে আনার সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার দ্বারও রুদ্ধ নয়।

গিরিশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর, সঙ্গীবচন্দ্র থেকে সুরু করে প্রভাতকুমার--চারুচন্দ্র পর্যন্ত বহু মহারথীর এমন অনেক মূল্যবান রচনা "হঠাৎ উদ্ধৃতি"র সীমানা থেকে বহু দূরে আছে যেগুলি আজ আবার নতুন করে তুলে ধরলে সাংস্কৃতিক জগতে নিঃসন্দেহে তা এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হতে পারে। শুধু গদ্য রচনা কেন? --মধুসূদন, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের মহাসমুদ্রে এমন বহু রত্ন ছড়িয়ে আছে যা নতুন কালের আঙ্গিনাকেও যথেষ্ট পরিমাণে আলোকিত করে তুলতে পারে।

বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমার যত টুকু সামান্য পরিচয় তারই ভিত্তিতে আমার এই ধারণা। এবং এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্দ্বিধায় বলা যায়--এইভাবে বঙ্গ সংস্কৃতির সেবায় বাঙালীর সঙ্গে অবাঙালীরাও নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

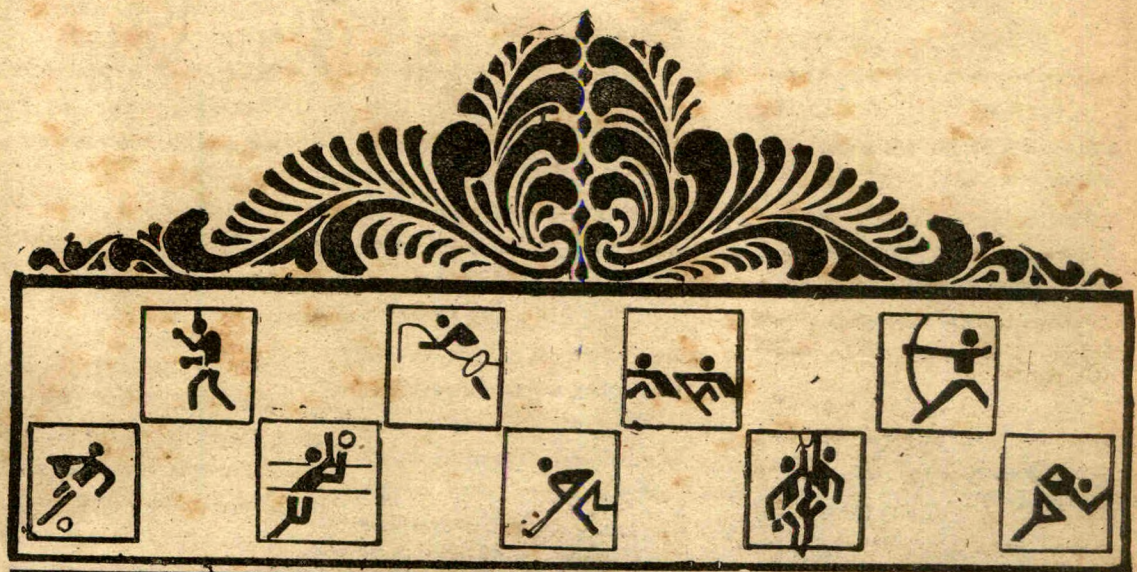

খেলাধুলা

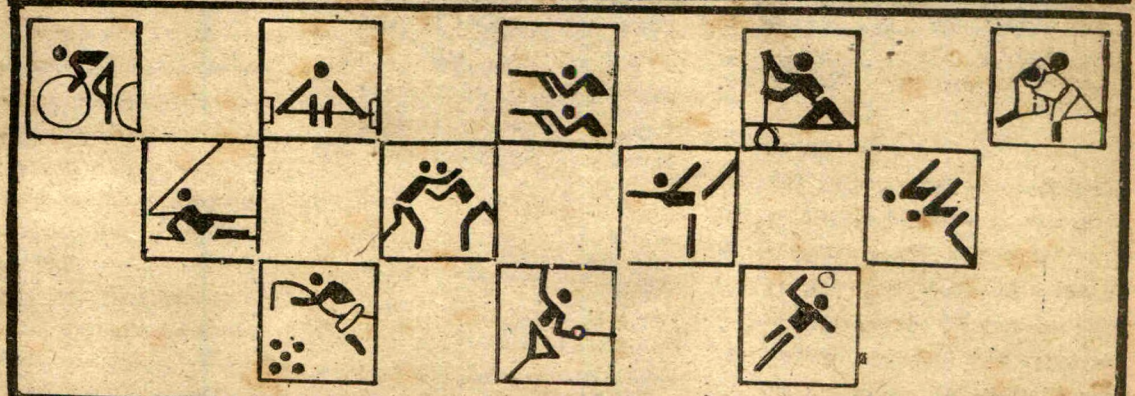

বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম জয়

।। উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায় ।।

১৫ আগষ্ট---ভারতের ইতিহাসের স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা উৎসবের ঢেউ চলছে সারা দেশ জুড়ে। এমন একদিন গেছে যখন খেলার মাঠেও স্বাধীনতার জোর লড়াই চলতো। সে বহু যুগ আগের কথা। তখন সাদা-কালোর মধ্যে লড়াই হয়েছিল। ওই প্রসঙ্গেই একটি স্মরণীয় খেলার কথাই আমি বলছি।

সালটা ছিল ১৯৫৫। সে বছর বেহালার ফায়ার ব্রিগেড মাঠে একটি ছোট্ট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাটির উদ্দেশ্য যতদূর মনে পড়ছে, তা ছিল স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পালন নিয়ে। তখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। বন্ধুদের মুখে শুনলাম যে, ওই সভায় মোহনবাগান ক্লাবের ১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী দলের খেলোয়াড় সুধীর চ্যাটার্জী আসবেন।

সভা সুরু হয়েছে---। সুধীর চ্যাটার্জীকে ওই সভারই এক সভা ১৯১১ সালের ফাইনাল-খেলা নিয়ে বক্তব্য রাখতে বললেন। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পুরানো স্মৃতিকে হাতড়িয়ে বলে চল্লেন------

১৯১১ সাল। মোহনবাগান শীল্ড ফাইনাল খেলছে ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে। সে যুগের সেরা মর্যাদার লড়াই। বাঙালী বনাম ইংরেজদের লড়াই। সারা কলকাতা মেতে উঠেছে। প্রায় আশী হাজার দর্শক মাঠের চারপাশে হাজির হয়েছিলেন। তখনকার দিনে কাঠের গ্যালারী ছিল না। শুধু ভি, আই, পি'দের জন্য কয়েকশ' চেয়ার রাখা ছিল। গোরারা বাঙালীদের অপমান করার জন্যে কেল্লা থেকে কাগজের শীল্ড আর মোহনবাগানের কুশপুত্তলিকা নিয়ে এসেছে।

মোহনবাগান মাঠে নামলো। মাঝে মাঝে দু-একটা আক্রমণও শানাতে লাগলো। ইয়র্কশায়ার দলও মরিয়া হয়ে কামড় দিচ্ছে কিন্তু মোহনবাগানের ব্যাক ও গোলরক্ষক হীরালাল মুখার্জীর কাছে তারা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। চলতি খেলার মাঠে হঠাৎ মোহনবাগানের রাজেন সেনগুপ্ত ছ'ফুট লম্বা জ্যাকসনের কাঁধে চড়ে হেড দিতে উঠলেন--- পাশেই সজাগ ছিলেন রেফারী পুলার। পেনাল্টি ছকের একটু বাইরে ফাউলের নির্দেশ দিলেন। গোলরক্ষক হীরালাল মুখার্জী সবাইকে সরে যেতে বললেন। গার্ডের দরকার নেই। হীরালালের কথায় মনে ভরসা পেলেন না ভূতি স্কুল। একটু গার্ড করে দাঁড়িয়ে হীরালালকে সাহায্য করতে লাগলেন। জ্যাকসন দৌড়ে এসে সট করলেন--- বলটি সোজা গিয়ে স্কুলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গোলে চলে গেল। মাঠের চেহারা বদলে গেল। গোরাদের চিটকারীতে বাঙালীরা মূক হয়ে গেল। তারা সকলে বোবাকান্না কাঁদতে লাগলো। মাঠের চারদিকে ঘুড়ি উড়িয়ে ইংরেজরা তাদের বিজয়বার্তা ছড়াতে লাগলো।

গোল খেয়ে মোহনবাগান আবার খেলা সুরু করলো --- মনে মনে তারা ঠিক করেছিল যে করেই হোক বাংলা তথা বাঙালীদের মান তারা রাখবেই। শিবদাস ও বিজয়দাস ভাদুড়ী টুক করে গোরাদের অজান্তে জায়গা বদলে নিয়ে খেলছে। খেলা শেষ হতে আর মিনিট দশেক সময় রয়েছে। এমন সময় শিবদাস ভাদুড়ী একটা বল নিয়ে সোজা ছুট দিলেন ইয়র্কশায়ারের গোলের দিকে --- গোলের মুখে গিয়ে 'দুম' করে একটা সট করলেন--- ছুটন্ত বলটি গোলরক্ষক ক্রেসীকে বোকা বানিয়ে কালো জালে গিয়ে আছড়ে পড়লো ---- গোমড়া মুখে ক্রেসী মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে গোলের ভেতর থেকে বলটি কুড়িয়ে আনতে গেলেন --- সারা মাঠ 'গোল' 'গোল' চীৎকারে কেঁপে উঠলো।

সেদিনের সকালের সেই পূর্বদিকের নতুন সূর্য ঝিমিয়ে পড়ে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আশাবাদী বাঙালীরা ও খেলোয়াড়েরা সেই বুড়িয়ে পড়া সূর্যের দিকে এক ঝলক চেয়ে চোখের পলক ফেললো। সেন্টারের পর আবার মোহনবাগান ইয়র্কশায়ার দলের পায়ের তলার মাটি আলগা করে দিল। রেফারী পুলার ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন---দিনের শেষ বাঁশীটি বাজাবার জন্যে। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী --- এমন সময় শিবদাস ভাদুড়ী একটা থ্রু পাশ দিলেন অভিলাষ ঘোষকে। অভিলাষ ঘোষও যেন বাকী কাজটুকু করার জন্যে তৈরী হয়ে ছিলেন --- শিবদাসের ঠেলা বলটিকে নিয়ে সোজা গোলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন --- আবার 'গোল' 'গোল' চীৎকার, তবে এবারের চীৎকার যেন আগেরবারের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশী। ইংরেজদের মাঠ-ছাড়া করে বাঙালীরা সেদিন প্রাণখুলে আনন্দে মেতেছিল। ভেতো বাঙালীদের কাছে হেরে গিয়ে গোরারা ফাঁক খুঁজে পালাতে লাগলো----

ক্লান্ত বিজয়ী মোহনবাগানের সৈনিকেরা গুটি গুটি করে নিজেদের তাঁবুর দিকে চলেছেন। এমন সময় একজন খালি গায়ে, খালি পায়ে, একখানি মোটা পৈতে পরা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুধীর চ্যাটার্জীকে সামনে পেয়ে ধরা গলায় ধোঁয়াটে চোখে বললেন--'বাবা, তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছি। আর আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'বাবা ওটি নামবে কবে ?'' তখন ফোর্ট উইলিয়ামের মাথার ওপর ইংরেজদের পতাকা হাওয়ায় উড়ছিল।

ঘটি বাঙ্গালের প্রথম লড়াই

হারাণ সাহা ঃ উমাপতি কুমার

পরাধীন দেশে কলকাতা ফুটবলের স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিকের মহান ভূমিকা ছিল মোহনবাগানের। আর স্বাধীনতা-উত্তরকালে দিগ্বিজয়ীর গৌরবদীপ্ত ভূমিকা হচ্ছে ইষ্টবেঙ্গলের। মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল যেন একই বৃন্তে দুটি ফোটা ফুল। ঘরোয়া ফুটবলে ঘটি-বাঙ্গালের মানে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের আসল লড়াই শুরু হয় ২৮ মে বৃহস্পতিবার, ১৯২৫ সালে।

ঐ বছর ইষ্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পায়। আমি, পূর্ণ দাস, সূর্য চক্রবর্তী এরিয়ান থেকে ইষ্টবেঙ্গলে যাই। পূর্ণ আবার খাঁটি ঘটি। ও কালাপাহাড়। ক্যালকাটা মাঠে আমাদের প্রথম খেলা। রেফারী ক্লেটন সাহেব।

আমাদের ক্যাপ্টেন মোনা দত্ত—ওদের গোষ্ঠ পাল। গোষ্ঠ আবার খাঁটি বাঙ্গাল। ওরা ভাল টিম। উমাপতি কুমার, পল্টু দাশগুপ্ত তখন দারুণ খেলছে। ওদের আটকাতে পারলেই মোহনবাগান কানা। গোষ্ঠ পালকে ব্যস্ত রাখতে হেমাঙ্গ বসু ও মনা মল্লিককে কানে-কানে বলে দেওয়া হল। জোর খেলা চলছে। আমাদের মধ্যে দু'দলে রেষারেষি ছিল। তবে তা খেলার মধ্যেই। হঠাৎ একটা বল পেয়ে আমি গলিয়ে দিতেই সূর্য চক্রবর্তী বল ধরেই মোনা দত্তকে দিলে মোনা সট নেয়। নৃপেন ভাদুড়ী ওদের গোলকিপার। ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বল পোষ্টে লাগল, সেই ফাঁকে নেপাল চক্রবর্তী ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরে এল—গো-ও-ল, মাঠে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। স্যার দুঃখীরাম মজুমদার খেলা দেখছিলেন। বললেন, হারাণ, তোরা যদি কুমারকে আটকাতে পারিস তাহলে ছিচবি। ওকে বল ধরতে দিবি না। সত্যিই ওরা গোল খেয়ে চিতা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমাদের পূর্ণ দাস গোলে দাঁড়িয়ে অসম্ভব রকম ভাল খেলেছিল। আমরা জিতেছিলাম সেদিন। তবে ঘটি-বাঙ্গালের লড়াই-এর সেদিন আর এদিনের মধ্যে অনেক তফাৎ। আমরা খেলার পর মনে কোন রেষারেষি রাখতাম না। তখন বন্ধু—প্রাণের বন্ধু। কারণ আমরা বাঙ্গালী।

হ্যাঁ, হারাণ সাহা ঠিকই বলেছে। মোহন বাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার টেনশন সেদিনও ছিল। আজ হারাণ নেই। আছি আমি, রবি গাঙ্গুলী ও আশু দত্ত। আশু শান্তিনিকেতনে আছে। ঐ খেলার তারিখ, দিন, ক্ষণ সম্ভবত রাজযোগ ছিল। তা-না-হলে আজও কি মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে এত উত্তেজনা থাকত? তবে সেদিন আর এদিনে অনেক তফাৎ। আমরা খেলাতেই রেষারেষি করতাম। তারপর যেমন বন্ধু ঠিক তেমনই সবার সঙ্গে মেলামেশা করতাম। কোন খাদ ছিল না।

এখন খেলা নিয়ে যত না উত্তেজনা—তার থেকে বেশী উত্তেজনা দেখি অন্য ব্যাপারে। আগে ছিল, হেরেছি তো কি আছে। কুছ পরোয়া নেহি, বেটার লাক নেক্সট টাইম। খেলায় তো হার-জিত আছেই।

কিন্তু এখন দলকে জিততেই হবে। না জিতলেই সব ঝুট হ্যায়—তুলকালাম কাণ্ড চলে মাঠে।

এই তো আমি ১৯১৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত মোহনবাগানে খেলেছি। আমার সময় গোষ্ঠরাও ছিল। কিন্তু আমরা একটাও বড় ট্রফি জিততে পারিনি। তাই বলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে-ছিল?

১৯২৩ ডুরাণ্ডে শেরউড ফরেষ্টার আর রোভার্স-এ ডারহামের সঙ্গে দুটো ফাইনালেই আমরা দারুণ খেলেও জিততে পারিনি। রোভার্সে তো আমরা ৪৫ মিনিট ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও জিততে পারিনি।

ইষ্টবেঙ্গলও কতবার হেরেছে দুর্ভাগ্য-বশত। তাতে দুঃখ আমাদের প্রত্যেকেরই হয়েছে; কিন্তু কোন ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু আজ এই মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলকে নিয়ে যে রকম

কাণ্ডকারখানা চলছে তাতে আমি লজ্জা পাই। একজন খেলোয়াড় হিসেবেই আমি এই কথা বলছি। ঘটি-বাঙ্গাল-এর লড়াই ছিল ঠিকই, তবে তার সীমানা ছিল মাঠের মধ্যেই।

সেদিন যাঁরা খেলেছিলেন ঃ—

ইস্টবেঙ্গল : পূর্ণ দাস ; প্রফুল্ল চ্যাটার্জী ও সন্তোষ গাঙ্গুলী ; হারাণ সাহা, ননী গোঁসাই ও বিজয়হরি সেন ; সূর্য চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বসু, মোনা দত্ত, নেপাল চক্রবর্তী ও মোনা মল্লিক।

মোহনবাগান : এ ভাদুড়ী, গোষ্ঠ পাল ও ডাঃ আর দাশ, মতি সেন, বলাই চ্যাটার্জী ও সুধাংশু বসু, এস ঘোষ, রবি গাঙ্গুলী, এস দাশগুপ্ত, উমাপতি কুমার ও ক্ষেত্র বসু।

রেফারী : সি আর ক্লেটন।

অনুলেখক—তাপস বসু

কসমস ক্লাবের আটাশজন

বেকেনবাওয়ার
(মিডফিল্ডার)

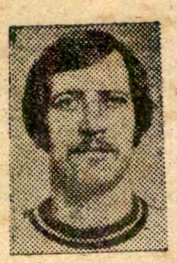

কীথ এডি
(ডিফেন্ডার)

জর্জি চিনাগলিয়া
(ফরোয়ার্ড)

জাদরেজকো টনিক
(ফরোয়ার্ড)

এরল ইয়াসীন
(গোলকিপার)

গর্ডন ব্রাডলি
(হেড কোচ)

ডেভক্লিমেন্টন
(মিডফিল্ডার)

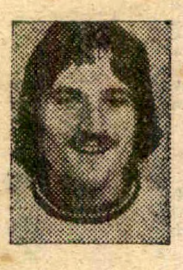

টোনি ডনলিক
(ফরোয়ার্ড)

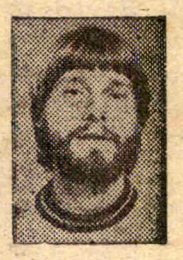

পল হাফটার
(ডিফেন্ডার)

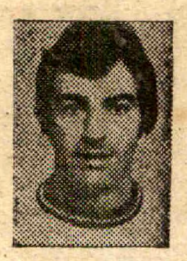

চার্লি আইটকেন
(ডিফেন্ডার)

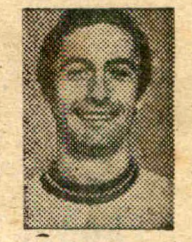

ডিমিট্রিজেভিক
(মিডফিল্ডার)

ক্লাইভটোরি
(প্রেসিডেন্ট)

স্কট ওয়াসবার্ন
(ফরোয়ার্ড)

পেলোস মোরেস
(মিডফিল্ডার)

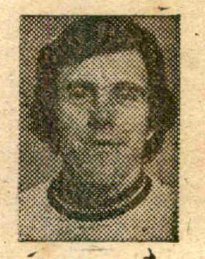

টেরি গার্বেট
(মিডফিল্ডার)

মাইক মার্টিন
(জেনারেল ম্যানেজার)

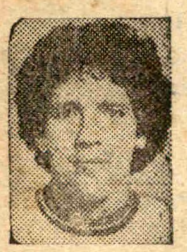

র‍্যামন সিফলিন
(মিডফিল্ডার)

পেলে
(ফরোয়ার্ড)

জুলিও মাজজি
(সহকারী কোচ)

ওয়েলার রথ
(ডিফেন্ডার)

টোনি ফীল্ড
(ফরোয়ার্ড)

শেফ মেসিং
(গোলকিপার)

বব বয়বাচ

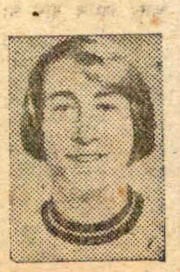

গ্যারি এথারিংটন

জো ম্যালেট

ব্রুস টমলি

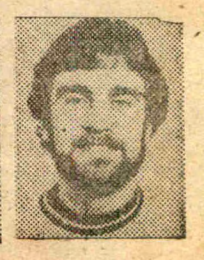

মাইক ডিলন

বব স্মিথ

ফুটবলের অতীত অ্যালবাম

।। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ।।

১৯৪৬ সালে ইষ্টবেঙ্গলের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড নায়ার লীগে ৩৫টি গোল করে রেকর্ড করেছেন। এর পেছনে একটি ছোট্ট ঘটনা রয়েছে। প্রথম ৭টি ম্যাচ হবার পর একদিন কর্মকর্তারা লেফট-আউট নায়ারকে জিগ্যেস করলেন, তিনি সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে খেলতে পারবেন কি না। কারণ সে বছর পাগসলীর বদলি ভালো সেণ্টার-ফরোয়ার্ড পাওয়া যাচ্ছিল না। জবাবে নায়ার বল্লেন: 'আমাকে যে কোন পজিশানেই খেলাতে পারেন।' নায়ার প্রথম সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে খেলতে নেমে ১৭টি ম্যাচে ৩টি হ্যাট্‌ট্রিক সমেত ৩৫টি গোল করে রেকর্ড তৈরী করলেন।

* * *

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। ভবানীপুরের এক ডানপিটে ছেলে বল নিয়ে খেলছিল আপনমনে। হঠাৎ বলটি নিশানা ভুল করে গিয়ে ধাক্কা খায় এক ভদ্রমহিলার পিঠে। পাড়ার মাথারা ছেলেটিকে কিছু শিক্ষা দিলেন।

ওদিকে ভদ্রমহিলাটি একগাল হেসে ছেলেটিকে 'মাফ' করে দিলেন। ছেলেটি সেই-মুহূর্তে 'গুম' খেয়ে কি যেন ভেবেছিল। এর কয়েক বছর বাদে ছেলেটি পাড়ার সেইসব মাথাদের উচিত জবাব দিয়েছিল ১৯৪৮ সালে ভারতের হয়ে অলিম্পিক খেলতে গিয়ে। সেদিনের ওই ছেলেটির নাম ছিল---রবি দাস.

* * *

১৯৩৭ সাল। ক্যালকাটা মাঠের মেন গেট দিয়ে গেঁয়ো-পোষাক পরা একটি ছেলে হাতে পুঁটলি নিয়ে মাঠে ঢুকতে গিয়ে গেট-কীপারের কাছে বাধা পেলো। ছেলেটি বল্লো---'আমাকে ঢুকতে দেবেন না? আমি যে ম্যাচ খেলবো'। অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলেটিকে ইংরেজ গেটকীপার মাঠে ঢুকতে দিলো না। পুঁটলি নিয়ে ছেলেটি গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিক বাদে ক্লাবের সেক্রেটারী ছেলেটিকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলেন---'একি ব্যাপার! তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছো? খেলা যে সুরু হতে চল্লো'। ছেলেটি বল্লো---কি করবো গেটকীপার যে আমাকে---। গেটকীপার লজ্জায় পড়ে যায়। ছেলেটি কে জানেন? অতীতের নামকরা ফুটবলার সন্তোষ মন্ডী। গেটকীপার অবশ্য চিনতে না পারার জন্যে পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল।

* * *

১৯৪৫ সালের কথা। জিপে করে স্কালিপ্‌সং-এ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছিলেন কুনু গুহঠাকুরতা। চলতি পথের জমাট আবর্জনায় জিপকে চালু রাখতে মাঝে মাঝে খেলোয়াড়দের ঠেলতে হচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর খিদে-তেষ্টা খেলোয়াড়দের কাবু করে ফেল্লো। রাস্তার ওপর একটি ছোট্ট ঘর দেখে সকলে তেষ্টা মেটাবার জন্যে দৌড়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন সে ঘরে একফোঁটা জল নেই। সেটি একটি বিড়ির কারখানা। চট করে খেলো-য়াড়দের মগজ খুলে গেলা। বিড়ি খেলে তো খিদে-তেষ্টা কমে। তখন সকলে মিলে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে ফাঁকা মাঠের ওপর শুয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকতে থাকে--- কুনু গুহঠাকুরতার জীবনে সেই প্রথম ধূমপানের হাতেখড়ি।

* * *

১৯২২ সালের আই এফ, এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা। খেলছে দুটি সাহেবী দল---ডালহৌসী ও ক্যালকাটা। খেলা জমে উঠেছে। হঠাৎ ক্যালকাটার নাইট ফাউল করে বসলেন ডালহৌসীর ডানকানকে। কিন্তু রেফারী ভুল করে রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তিনি ডানকানেরই ফাউল দিয়ে বসলেন। মাঠে ঝাঁঝালো কথা উড়তে লাগলো রেফারীর বিরুদ্ধে।

নাইট ফাউল-কিক করতে যাচ্ছেন এমন-সময় ক্যালকাটার অধিনায়ক কালভিন ছুটে গিয়ে নাইটের কানে কি যেন ফুসফুস করে বলে গেলেন---। দেখা গেল নাইট যখন ফ্রিকিক সট করলেন তখন বলটা গোলপোষ্টের অনেক দূর দিয়ে উড়ে গেল। রেফারী যে ভুল করেছে সেটি খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে শুধরে দিলেন কালভিন।

* * *

১৯০৫ সালে গ্ল্যাডস্টোন কাপের প্রথম খেলা পড়লো মোহনবাগানের সঙ্গে ডালহৌসীর। ওই বছর ডালহৌসী ৪-৩ গোলে ক্যালকাটাকে হারিয়ে আই, এফ, এ শীল্ড নিয়েছে। প্রাইকের মত সেণ্টার-ফরোয়ার্ড, হোলীর মত রাইট-আউট। মোট কথা ডালহৌসী বেশ জোরদার টিম।

একই ট্রেণে চুঁচুড়ায় দু'টি দলই খেলতে যাচ্ছে। ডালহৌসী দল মাত্র ৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে যাচ্ছে খেলতে। মোহনবাগানের একজন ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন---'বাকী খেলো-য়াড়েরা কই?' ডালহৌসীর একজন বাঁকা-গলায় জবাব দিলেন---'সেভেন ইজ গুড এনাফ ফর মোহনবাগান'। মানে মোহনবাগানের জন্যে সাতজনই যথেষ্ট। সে খেলায় ডালহৌসী ১০ জনকে মাঠে নামিয়েও পায়ের তলার জমি ঠিক রাখতে পারে নি। মোহনবাগান ৬-১ গোলে জিতে যোগ্য জবাব দিয়েছিল ডাল-হৌসীকে সেদিন।

১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ডের সেমি-ফাইনালে খেলছে মোহনবাগান ও মিডলসেক্স দল। খেলা বেশ খানিকক্ষণ চলার পর মোহনবাগানের একজন তরুণ খেলোয়াড় বল নিয়ে দৌড় দিলেন মিডলসেক্সের গোলের-দিকে--- তারপর বলটিকে থামিয়ে বেশ জোরালো সট করলেন গোলে--- কিন্তু উড়ন্ত বলটি প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ধাক্কা খেলো গোলপোষ্টে।

তারপর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। গোলপোষ্টটি মড়মড় করে ভেঙ্গে মিডলসেক্সের গোলরক্ষককে চাপা দিয়ে বসলো। মাঠসুদ্ধ লোক হৈ চৈ করে উঠলো। সকলে মিলে উদ্ধার করলো গোলরক্ষককে। তখন গোল-রক্ষকের মাথা দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে। মিডলসেক্সের সাদা চামড়ার খেলোয়াড়েরা এক-নজরে তাকিয়ে রয়েছে জোরালো সট করা ছেলেটির পানে। ওই ছেলেটিই ওই বছর শীল্ড-ফাইনালে মোহনবাগানের শীল্ড জেতার গোলটি করেছিল, নাম তাঁর অভিলাষ ঘোষ।

* * *

১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড-ফাইনাল। ইস্টবেঙ্গলের সকলে জার্সি গায়ে দিয়ে তৈরী হচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ পাগসলী বার্ণপুর থেকে চলে এসেছেন শীল্ড-ফাইনাল দেখতে। সোমানা পাগসলীকে দেখেই আনন্দে মেতে উঠে নিজের ৯ নম্বরের জার্সি গা থেকে খুলে বল্লেন---'পাগসলী, আজ তুমি আমার জয়গায় খেল'। পাগসলী বল্লেন---'এ কি করে সম্ভব! তুমি যখন জার্সি পরে ফেলেছো তখন তুমিই খেলো। আজ আমি যদি না আসতাম তবে তুমিই তো খেলতে'। সোমানা আবার অনুরোধ করলেন, বল্লেন---'আমি তো দু'বার শীল্ড-ফাইনাল খেলেছি। আজ না হয় নাই [illegible]নাম'। বলেই পাগসলীর হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন---

বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না পাগসলী। সেদিন পার্গসলী মাঠে নেমে দিনের একটিমাত্র গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে শীল্ড পাইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সোমানা সেদিন যে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব রাখলেন, তা আজও ইতিহাসের কোণে জায়গা বেছে নিয়েছে।

* * *

১৯৫৪ সালের কোন এক হারিয়ে যাওয়া বিকেলের কথা। আমি দলের একটি সাধারণ খেলায় তাদের গোলরক্ষক হঠাৎ মাঠে গর-হাজির হলেন। কর্ণেল রাজরত্নম খুব বিপদে পড়ে গেলেন। গোলরক্ষক ছাড়া টিম কি করে মাঠে নামবে? নানান চিন্তার মাঝে রাজরত্নম তাদের নিয়মিত সেণ্টার-ফরোয়ার্ড লম্বা ছিপ-ছিপে ছেলেটিকে বল্লেন---'আজ তুমি সেণ্টার-ফরোয়ার্ডের জায়গা ছেড়ে গোলে খেল।'

নির্ভয়ে ছেলেটি সেদিন এক নম্বরের জার্সি গায়ে দিয়ে দারুণ খেললো। তারপর ছেলেটি প্রায় ১৫ বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলের এক নম্বরের জার্সিটিকে নিজের দখলে রেখেছিল। সেদিনের ওই ছেলেটি কে জানেন? আয়রণ ওয়াল অফ ইণ্ডিয়া---পিটার থঙ্গরাজ।

* * *

১৯৫৮ সালে মহমেডান-বি এন আরের লীগ খেলার সময় বি এন আরের বি মিত্র মেওয়ালালের দিকে একটি থুতু বাড়ালেন। হঠাৎ মেওয়ালালের মাথায় এক ফন্দি ঢুকে গেল। গড়ানে বলটি মুস্তাক আমেদ ধরতে যাচ্ছেন এমন সময় মেওয়ালাল মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলেন---'লিভ ইট'! গোলরক্ষক আমেদ আখতার 'লিভ-ইট' বলেছেন ভেবে মুস্তাক বলটি ছেড়ে-দিলেন। মুস্তাককে বোকা বানিয়ে মেওয়ালাল সে বলটি ধরে গোল করলেন--- ব্যাপারটি যখন কানাকানি থেকে জানাজানি হয়ে গেল তখন মুস্তাক মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

* * *

১৯৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার আগে মোহনবাগানের ব্যাক দেবনাথ বাথরুমে লুকিয়ে বুকে খানিকটা সিঁদুর বুলিয়ে নিচ্ছেন। ব্যাপারটা খানিক বাদে ওঁর মুখে শুনলাম 'এক জ্যোতিষী নাকি বলেছেন ইডেনে দেবনাথই প্রথম গোল দেবে---তাই বিশ্বাসে ওই কাজটি করেছেন দেবনাথ। কিন্তু হ্যাঁ, সেদিন ইডেনে ফ্রিকিক থেকে আলতাফের আগ বাড়িয়ে দেওয়া বলে দেবনাথ থঙ্গরাজকে হার মানিয়ে ইডেনের প্রথম গোলদাতা হিসেবে নিজেকে দাঁড় করান এবং জ্যোতিষীর কথাকে ফলিয়ে দেন'---

* * *

মোহনবাগানের শৈলেন মান্না ভবানীপুরের বিখ্যাত গোলরক্ষক মহম্মদ ইসমাইলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিক করতে যাচ্ছেন। মান্নার ফ্রিকিকে তখন দারুণ নাম। তার ওপর আবার পেনাল্টি। ইসমাইলও ভড়া মনোভাব নিয়েছেন, যেমন করেই হোক মান্নাকে গোল পেতে দেবেন না। তারপর মান্নার বুলেটের মত সট ইসমাইলের হাত ছুঁয়ে গোলে ঢুকে গেল। গোলের পর দেখা গেল ইসমাইল হাতে হাত চেপে ছটফট করছেন। পরে জানা গেল ইসমাইলের একটি আঙুল ভেঙেছে---

* * *

ইস্টবেঙ্গল দলের পয়মন্ত খেলোয়াড় পিণ্টু চৌধুরী এক অনন্য রেকর্ড করে রাখলেন এ বছর। তিনি ১৯৭০ থেকে '৭৫' সাল ইষ্টবেঙ্গল '৭৬' সাল মোহনবাগান, আর এ বছর আবার ইস্টবেঙ্গল দলের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলেছেন। সবচেয়ে মজার এবং অবাক হবার কথা কি জানেন? পিণ্টুর দল ওই আট বছরই প্রথম ডিভিসন---এর লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাও আবার পর পর। লীগ ফুটবলের খাতায় এ নজীর এর আগে কেউ কখনও রাখতে পারেন নি।

* * *

ইস্টার্ণ রেলের জামা গায়ে মেওয়ালাল একবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার সময় শৈলেন মান্নার সামনেই হেড দিতে গিয়ে হাত দিয়ে গোল পেলেন। মান্না মেওয়ালালকে জিগ্যেস করলেন---এটা কি হল মেওয়া? মেওয়ালাল রেফারীর দিকে আঙুল তুলে বল্লেন---আমি কি করবো?

* * *

আর একবার মোহনবাগানের জামা গায়ে মেওয়ালাল ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অনিল দের সেণ্টার থেকে হাত চালিয়ে গোল পেয়ে গেলেন ---গোল নিয়ে মাঠে কিছু গুঞ্জন উঠেছিল। রেফারী মেজর হালওয়াই খেলার পর মেওয়া-লালের মুখে ঘটনাটি শোনার পর আর কোনদিন বাঁশি মুখে মাঠে নামেননি---

রেণী রিচার্ডস রাণী হলেন রূপ থেকে রূপান্তরে

জানকী বসু

বিস্ময়ে আর অঘটনে ভরা বিংশ শতাব্দীর নবম আশ্চর্য রেণী রিচার্ডস। ছিলেন নর হয়েছেন নারী। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের পর মার্কিণ দেশের এই প্রাণোচ্ছল যুবক শিক্ষা-দীক্ষায় খেলাধূলায় ও রমণী সম্ভোগে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করে হেসে খেলে স্বচ্ছল-ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমনি করে চল্লিশটা বসন্ত বেশ আনন্দের সঙ্গে কাটানোর পর শরীরে আসে হঠাৎ এক পরিবর্তন। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে রেণীর দেহে নারীত্বের লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। সেই সঙ্গে মনেও আসে পরিবর্তন। চিকিৎসকদের গবে-ষণার বস্তু হয়ে পড়েন রেণী। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেও বিশেষজ্ঞরা কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা ও অপারেশনের পর রেণী পুরোদস্তর নারীতে রূপান্তরিত হলেন। সৃষ্টিকর্তার কি বিচিত্র লীলা! পুরুষালি ভাবের বদলে রেণীর দেহে মনে রমণীসুলভ কোমলতা ও হাবভাবের পুরোপুরি লক্ষণ ফুটে উঠল।

আত্মীয়স্বজন, পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধবের কাছে রেণী হয়ে উঠলেন এক কৌতূহলের বস্তু।

যৌবনে টেনিস ছিল রিচার্ডের প্রিয় খেলা। এই খেলায় তিনি বেশ সুনামও করেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাঁকে অংশ নিতেও দেখা যেত। রূপান্তরজনিত বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাওয়ার পর রেণীর মনে সেই পুরানো সখ জেগে উঠল। তিনি আবার র‍্যাকেট হাতে টেনিস কোর্টে নামতে চান। খেলবেন কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে --- পুরুষদের সঙ্গে নয়। আহ্বান জানালেন মহিলা টেনিস তারকাদের। কিন্তু অপর পক্ষ রেণীর ডাকে সাড়া দিতে গররাজী। হারজিতের জন্য নয়, রেণীকে তাঁরা মহিলা হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন। রেণীর শারীরিক যোগ্যতার সঙ্গে অন্যান্য মেয়েদের পার্থক্য আছে এই অজুহাতে ক্রিশ ইভার্ট একবার রেণীর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। বেচারা রেণী! ক্ষোভে দুঃখে তিনি সাময়িক-ভাবে মুষড়ে পড়েন। এ অপমান তাঁর মনে বেশী করে বাজল। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। আদালতের শরণাপন্ন হলেন। মামলা সুরু হলো। দু'পক্ষের কৌসিলীদের রসাল জবাব আর সওয়াল শুনতে আদালত ভীড়ে উপচে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে চিকিৎসকদের অকাট্য যুক্তি মেনে বিচারের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হলো গত আগষ্ট মাসের শেষাশেষি। রায় গেল রেণীর দিকে, রেণী স্ত্রীলোক বলে প্রমাণিত হলো। নর থেকে নারী, পুরুষ থেকে প্রকৃতি। বিজয়িনীর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রেণীর মুখখানি। এবার ত আর মেয়েদের সঙ্গে টেনিস খেলায় কোন বাধা নেই! নাম দিলেন এবারের ফরেষ্ট হিলস টেনিসে মহিলা সিঙ্গলস-এ। ক্রীড়াসূচীতে তাঁর নাম উঠল। প্রথম খেলা এবারের উইম্বল-ডন জয়ী ভার্জিনিয়া ওয়েডের বিরুদ্ধে। পয়লা সেপ্টেম্বর ঐ খেলা দেখতে টেনিস কোর্টে ভীড় উপচে পড়লো। অবশ্য খেলার চেয়ে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন শ্রীমতী রেণী। ওয়েডের কাছে রেণী হেরে গেলেন কিন্তু তাঁর সাধ হলো পূর্ণ---নারীরূপে স্বীকৃতি লাভের পর এটাই তাঁর বড় প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে ১৭ বছর আগে এই কোর্টে আজকের রূপান্তরিতা রেণী পুরুষ রেণী হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন।

রেণীর আর একটি ইচ্ছে আছে---সেটি বিবাহ। বয়স এখন ৪৩। যৌবনে চেয়েছিলেন নারী, তা তিনি পেয়েও ছিলেন। উপভোগ করেছেন পরিপূর্ণভাবে। এবার হতে চান ভোগ্যা। যাঁর অঙ্কশায়িনী হতে চান তাঁর নাম মাইকেল বাকুস---একজন নামকরা মার্কিণ চিত্রাভিনেতা। বাগদত্তা হয়েছেন বহু দিন আগেই। দু'জনে একসঙ্গে ইতিমধ্যে বেড়িয়ে-ছেন শৈলশিখরে, সমুদ্রের তীরে। বয়সের বাধা ওদের কাছে কোন বাধাই নয়। সকলে এখন উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে শুভদিনটির জন্য।

রেস কোর্সের পক্ষিরাজের পিঠে কোটাল পুত্র

কাম অন বাজীরাও---কাম অন। বাজীরাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইল---এমন আদর করে কে তাকে ডাকছে? বহুদিন এমনি করে কেউ তাকে ডাকেনি।

আশ্চর্য--বাজীরাও দুদিকেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। সে আজ অনেক দিনের কথা। যখন হাজার-হাজার লোক তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতো---বাজীরাও আর একটু জোরে পা চালাও, তোমার পিছনে জেটপ্লেন ও কনকর্ড

আসছে। বাজীরাও তখন তার ঋজু দেহটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে ছিলে ছাড়া তীরের গতিতে, সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত। ফিনিশিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে মুখের পাশের ফেনাটা মুছে নেবার সময় পর্যন্ত পেত না বাজীরাও। ততক্ষণে ট্রেণার ও ওনার দুহাতে তার গলাটা জড়িয়ে চুমু খেয়ে ফেনায়-ফেনাময় করে দিত তার সমস্ত মুখটাকে। কত আদর, কত যত্ন ছিল। সেদিন আর আসবে না ফিরে, স্বপ্নের দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আজ বাজীরাও কলকাতা মাউন্টেড পুলিশের একজন বিশ্বস্ত কর্মী। মনে হ'ল বাজীরাও-এর দু' চোখের কোণে জল। যে ভদ্রলোক তাকে এই অবস্থায় দেখেও চিনতে পেরেছেন, তারজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে বাজীরাও তার ডান পাটা দু'বার মাটিতে ঠুকে প্রত্যুত্তর জানাল। পিঠে এখন তার কোন জকি নেই। এটাও বোঝাবার চেষ্টা করল। এখন একজন সার্জেন্টকে পিঠে নিয়ে সে ফুটবল মাঠে এসেছে।

র‍্যামপার্টের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে মহমেডান-পোর্ট ট্রাষ্টের খেলা দেখছে। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে গ্রীয়ার মাঠের উপর দিয়ে এষ্ট্রোনাট তীরের বেগে ছুটে আসছে। সে আজ বিদ্রোহী। তার পিঠের সওয়ারকে ফেলে দেবেই। সওয়ারও নাছোড়বান্দা---লাগাম কষে ধরে এষ্ট্রোনাটকে বাগে আনবার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত এষ্ট্রোনাট বুঝল মনে হল। কারণ দূরে বাজী-রাওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজাজটা একটু নরম করে, সে একেবারে বাজীরাও-এর পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এসপ্লিয়ন ও জেটপ্লেন মোহনবাগান মাঠের দিক থেকে এষ্ট্রোনাটকে ফলো করে আসছিল। ওরাও এসে জড় হল বাজীরাওদের পাশে। জীবন ও ম্যাচাডো আগে থেকেই বাজীরাও-এর সঙ্গে খেলা দেখছিল। কিন্তু এত বন্ধু একসঙ্গে জড় হওয়া সত্ত্বেও এষ্ট্রোনাট মাঝে মাঝে ছিটকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। নাজেহাল সওয়ার শেষ পর্যন্ত তার পিঠ থেকে নেমে তাকে আদর করবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিল এষ্ট্রোনাটের দু' গালের দিকে। এই রকম আদর তার পছন্দ নয়। তাই সে ঝটকা মেরে মুখটা সরিয়ে নিল। বড় অভিমানী এই এষ্ট্রোনাট।

প্রিয় দল হারলে বা পয়েন্ট নষ্ট করলে অভিমানী দর্শক-সমর্থকরা যেমন রাগে উত্তাল হয়ে ওঠেন---এষ্ট্রোনাটেরও ঠিক ঐ রকমটি হয়। যখন তার মনে পড়ে, সেও একদিন দৌড়বীর ছিল; ছুটতো রেসের মাঠে, জিতলে কত লোক তাকে আদর করত। পারলে মাথায় তুলে নাচতো কিন্তু আজ তার প্রতি কারুর নজর নেই। সে ফিরে পেতে চায় তার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে। তাই মাঝে-মধ্যে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঐ ভাবে নিজের মনের ভাষাকে ব্যক্ত করতে চায়। কলকাতার ফুটবল আর কলকাতার মাউন্টেড পুলিশ---এই দুটো নামের সঙ্গে যেন রক্তের সম্পর্ক। মাউন্টেড পুলিশ মাঠে নেই, আর ফুটবল খেলা হচ্ছে, একথা ভাবাই যায় না। ওদের থাকতেই হবে। ওরা না থাকলে ফুটবল খেলা হবেই না।

শুধু মাঠের মধ্যে ইট-পাটকেল বা চকলেট বোমা পড়লে চলবে না। দু'চারটে মাউন্টেড পুলিশের সামনে পড়া চাই। গায়ে ইট তো হামেশাই লাগছে। রেফারী, লাইন্সম্যান, খেলোয়াড়দের পটকা বা ইট মেরে কিছু ফুটবল - পাগল দর্শক ক্ষান্ত হয় না। ওরা বাজীরাওদের লক্ষ্য করে ইট-পটকা ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাউন্টেড পুলিশকে ফুটবল মাঠে আসতেই হবে। যেমন হরতালের দিনে কলকাতা যতই উত্তাল হোক না কেন---সেই সময় ট্রামহীন কলকাতাকে যেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে মনে হয় ঠিক তেমনি মাউন্টেড পুলিশবিহীন কলকাতার ফুটবলকেও ঠিক যেন মানায় না। ট্রাম যেমন কলকাতার শোভা---তেমনি ময়দানী-ফুটবলে মাউন্টেড পুলিশও। স্বাধীনতার আগে এই মাউন্টেড পুলিশের নাম ছিল প্রেসিডেন্ট বডিগার্ড---কেউ কেউ বলেন প্রভিন্সিয়াল

৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কেরী প্যাকার যে বার্তা নিয়ে এলেন—

॥ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ॥

বিশ্ব ক্রিকেটের আঙ্গিনায় কেরী প্যাকারের আবির্ভাব ও সেই সঙ্গে সদম্ভ ঘোষণা একদিকে যেমন সুদীর্ঘকালের পরিচিত ও প্রচলিত টেস্ট ইতিহাসের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে পরম অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মধ্যে ফেলেছে, অপরদিকে তা তেমনই প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চাভিলাষী পেশাদার ক্রিকেটারদের কাছে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এক স্বপ্ন - বাস্তবায়নের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। জাত - ক্রিকেটার মাত্রই নাকি এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন স্বীয় ক্রীড়াপ্রতিভার স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের এক আদর্শ ও প্রকৃষ্ট পন্থার। সত্য বলতে কী সুপার টেস্ট --এ নামের মধ্যেই প্রকাশ যে, খেলা হিসাবে টেস্টেরও উপরে এর স্থান। বিশ্ব ক্রিকেটের নানা আঙ্গিনায় ছড়িয়ে থাকা সেরা সেরা রত্নগুলিকে অচিন্ত্যনীয় মুদ্রার বিনিময়ে সযতনে সংগ্রহ করে তবেই গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ্ব-একাদশ। আর এই বাছাই একাদশ অস্ট্রেলিয়া - ইংলণ্ড - ওয়েস্ট - ইণ্ডিজ প্রমুখ বাঘা ক্রিকেট শক্তি বাঘা দেশগুলির বিরুদ্ধে কোমর কষে ব্যাট--বলের লড়াই-এ খেলতে নামবে। দেশের পক্ষ ত্যাগ করে এহেন পেশাদারী একাদশের পক্ষে খেলোয়াড়দের সমর্থন মিলবে কিনা এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ওঁরা সম্ভবত নিশ্চিত ছিলেন যে দেশের ইজ্জত ও স্বার্থের কথা মনে রেখে কোন খেলোয়াড়ই কেরী প্যাকারের এ ডাকে সাড়া দেবেন না। কিন্তু ওঁরা বোধহয় তখনও জানতেন না যে, সেই সমস্ত নামী দামী ক্রিকেটারদের মতামত যাচাই অন্তে ও সমর্থন লাভের পরিপ্রেক্ষিতেই কেরী প্যাকারের এবম্বিধ প্রস্তাব ও ঘোষণা। তাছাড়া কেরী প্যাকার তো আর খালি হাতে অগ্রসর হন নি ওঁর এই অভিনব ক্রিকেট-যুদ্ধের প্রস্তাবনায়। এইসব পেশাদার ক্রিকেটাররা এযাবৎ দেশীয় ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে চুক্তিমত যে আর্থিক পারিশ্রমিক বা অনুদান পাচ্ছিলেন তার চেয়েও কল্পনাতীত অনেক--অনেক মোটা অঙ্কেরই পাওনার চুক্তিপত্র-সহ হাজির হয়েছেন প্যাকার ওঁদের সমক্ষে। সত্য কথা বলতে কী ওঁদের কাছে তো আর খেলা শুধু খেলা নয়। সকলের না হলেও অনেকেরই কাছে তো অর্থ আগমনের একমাত্র হাতিয়ার এই ক্রিকেট। তাইতো তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনে সেরা উপার্জনের এ হেন সুবর্ণ সুযোগকে দেশের সামান্য ক্রিকেট-স্বার্থের খাতিরে জলাঞ্জলি দিতে রাজী নন --স্বদেশীয় ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষকে এ-তথ্য জানাতে ভুল অথবা সমীহ করেন নি। আর তারই ফলস্বরূপ প্যাকারের বিশ্ব--একাদশের সম্ভাব্য পঁয়ত্রিশজন ক্রিকেটারের নাম যখন প্রকাশ পেলো তখন দেখা গেলো ইংলণ্ড - অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ--পাকিস্তানের ক্রিকেট শক্তি অপহৃতপ্রায়। ওঁদের সেরা পর্যায়ের কোন খেলোয়াড়ই প্যাকারের ছুঁড়ে দেওয়া অর্থ প্রলোভন সম্বরণ করতে পারেন নি।

আঁচকে উঠলেন নানা দেশের তাবড় তাবড় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। অবস্থা সামলানোর তাগিদে ওঁরা হুঙ্কার ছাড়লেন কেরীর উদ্দেশে। একই সঙ্গে সতর্কবাণী বর্ষিত হলো সেই সব ক্রিকেটারদের প্রতি। কিন্তু, একী হ'লো? প্যাকার নির্বিকার। আর ক্রিকেটাররাই বা টললেন কই! তবুও বৈঠক বসলো প্যাকারের সঙ্গে। আলোচনা চললো। কিন্তু ফায়দা হলো না কিছু। সুপারটেস্ট বসবেই। আর লক্ষ লক্ষ টাকা হাতছাড়া করতে খেলোয়াড়রাও গররাজী। প্রমাদ গুণলেন বিশ্ব ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। তাই ওঁরা গর্জে উঠলেন --"তোমরা যদি আমাদের কথা না শোন তাহলে তোমাদের খেলার জন্য আমরা মাঠ দিতে নারাজ।" ওঁরা ভেবেছিলেন এবার হয়তো প্যাকার ও তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকারকৃত খেলোয়াড়রা হোঁচট খাবেন --পিছপা হবেন। কিন্তু কই--তা হলো না তো। বরং ওঁরা উত্তরে জানালেন --নাই বা মিললো স্বীকৃত সেই নামীদামী ক্রিকেট আয়তগুলি। সেখানে যদি ক্রীড়ামেলা নাই বসতে পারে সেক্ষেত্রে অন্যত্র কোথাও বসবে। আর খেলা যখন সুপারটেস্ট তখন যেখানেই বসুক না কেন বাঁধ-না-মানা দর্শকস্রোত আছড়ে পড়বে সেই নাম-না-জানা ক্রীড়াঙ্গনে। টেলিভিসন ব্যবসায়ী প্যাকারও জানতেন যে বাধা-বিপত্তি যতই আসুক না কেন সুপারটেস্টের মাধ্যমে অর্থ আমদানীর এই নয়া নজীর সফল হবেই হবে।

মোদ্দা কথা, সুপারটেস্ট বসছেই। আর তা যখন অবশ্যম্ভাবী তখন খতিয়ে দেখতে বাধা কোথায় যে সুপারটেস্টের ধাক্কা ও তরঙ্গ বিশ্ব-ক্রিকেটের কোন কূলে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই যে, নয়া এ ক্রীড়া-মেলার আবির্ভাবে শতাব্দীর টেস্ট-ক্রিকেট হারাবে তার কৌলীন্য ও আভিজাত্য। দীর্ঘদিনের অবিসম্বাদিত টেস্ট-ক্রিকেটের ধারা এ আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন বা ছত্রখান না হয়ে পড়ে। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে শতবার্ষিকী টেস্ট উৎসব ঘিরে বিশ্বব্যাপী যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উত্তেজনার জোয়ার বয়ে গেল সেকথা ত এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ক্রিকেট-সাম্রাজ্যের এতদিনের নিরিবাদী সম্রাট বলে চিহ্নিত ছিল এই টেস্ট-অধ্যায়। আর ঠিক সেকারণেই ক্রিকেটারদের অর্জিত সাফল্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হতো (এখন হচ্ছে) ক্রিকেটে স্থান করে নেওয়া। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবেই তো টেস্টে জায়গা পাওয়ার সৌভাগ্য কল্পনা করা যেতো। কিন্তু সুপারটেস্টের যেদিন উদ্বোধনী আসর পাতা হবে তখন থেকে জানতে হবে আর টেস্ট নয়--সুপারটেস্টই বিশ্ব ক্রিকেটের মুকুটহীন সম্রাট। শতাব্দীব্যাপী টেস্টের ইতিহাসের চাকা তখন থমকে দাঁড়াবে। দীর্ঘদিনের ধরে রাখা মর্যাদা, স্বীকৃতি ও গুরুত্বের সিংহাসন টলে যাবে। ভেবে দেখুন, গদীচ্যুত টেস্ট-সম্রাট করুণ নয়নে, পরাজিতের দৃষ্টিতে, হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানি-মাখা ভঙ্গিমায় তাকিয়ে থাকবে বিজয়গর্বে গর্বিত চলমান সুপারটেস্টের দিকে। তবে--তবে কী ধিক্কার ও লজ্জাবনত টেস্ট আজ ব্যাধি-গ্রস্ত নিরাশার শিকার কোন মৃত্যুমুখী ক্রীড়া-আসর?

অথবা এখন থেকে জীবন-মৃত্যুর লড়াই-এর বনিয়াদে টেস্ট-আসর গড়ে তুলবে প্রতিভাবান প্রকৃত ক্রিকেটার--পৌঁছে দেবে সুপার-টেস্টের দরজায়। আরো জানি, হলোই বা

সে ক্রিকেটারের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা—টেস্টের অগ্নিপরীক্ষায় বিশ্বসেরার স্বীকৃতিতো সেই জোটাবে সুপারটেস্টের হাত ধরে! সহজ এ তথ্য ভাবতেও যেন কেমন লাগে। এতদিন যাঁরা বিশ্বসেরার স্বীকৃতি আদায় করতেন টেস্ট কষ্টিপাথরে তাঁরাই আজ আবার কৌলীন্য খুঁজে ফিরবেন সুপারটেস্টের মাপকাঠিতে। অর্থাৎ এতদিন বিশ্বক্রিকেট আঙিনায় যে টেস্ট ছিল অনন্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয় আজ সে স্থান সুপারটেস্টের করতলগত। টেস্ট আজ আর সবার সেরা কোন আকর্ষণবিন্দু নয়। বরং বলা উচিত সুপারটেস্টের গরিমাময় পরিবেশে পৌঁছানোর পথে একটি পরীক্ষাগার ও গবেষণাকেন্দ্র হিসাবেই বিবেচিত হবে টেস্টের আসরগুলি।

জানি না হয়তো শতবর্ষব্যাপী সেরা ক্রিকেট আসর ছিলো টেস্ট —এ সংজ্ঞার মধ্য দিয়েই ভাবীকালের ক্রিকেট অভিধানে টেস্ট পরিচয় মিলবে। আর দেশ-বিদেশের টেস্ট নিয়ামক সংস্থাও হয়তো সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন এরই মধ্যে যে এক শতকব্যাপী ওঁরা টিকেছিলেন সারা-বিশ্বের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংগ্রাম পরিচালনার কৃতিত্ব ও দায়িত্বের বোঝা নিয়ে। নতুনের কাছে পুরাতনের অবনতি ও অবলুপ্তির মধ্যেই যখন কালের অগ্রগতির সঙ্কেত ও নিশানা তখন হয়তো দেখা যাবে আজকের সদ্য দেখা পাওয়া সুপারটেস্টকে একদিন স্থান করে দিতে হবে আরো বেশ কিছুকাল পরের নতুন কোন কিছুকে। সেদিন হয়তো আবার থাকবে না সুপারটেস্টের হাতছানির কোন আকর্ষণ, মোহ, মদিরতা। সেদিনের তারকারা হয়তো আনুগত্য প্রকাশ করবেন নয়া সেই প্রস্তাবনার প্রতি। এমনই হয়ে চলেছে দিনের পর দিন। আজ যা ঘটে গেলো ভবিষ্যতে তা ঘটতে পারে না—এ-কথাই বা বলি কোন মুখে? দেখাই যাক। শেষের সে কথার যে কোন দিনই শেষ নেই।

রেস কোর্সের পক্ষিরাজের পিঠে কোটাল পুত্র

৩১৪ পৃষ্ঠার পর

বডিগার্ড। ডায়মণ্ড হারবার রোডের বডিগার্ড লাইনে এবং রাজভবনে ঘোড়াগুলো থাকত। ফুটবল মাঠ ছাড়াও মহরম, পরেশনাথের মিছিলের পিছনে মাউন্টেড পুলিশ শান্তিরক্ষী-বাহিনী হিসেবে থাকত। এ ছাড়াও কলকাতার রাজপথে, যেমন ক্যানিং ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, কলুটোলা, হ্যারিসন রোডে টহল দিতে হত মাউন্টেড পুলিশ বাহিনীকে। একে বলা হতো ষ্ট্রীট ডিউটি।

ভারত স্বাধীন হবার পর রাজাগোপাল আচারী ১৯৪৮ সালে বাংলার বড়লাট হয়ে যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি প্রেসিডেন্ট বডিগার্ড বা প্রভিন্সিয়াল বডিগার্ড নাম বদলে ক্যালকাটা মাউন্টেড পুলিশ নামকরণ করেন। তারপরই ওরা রাজভবনের আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে চলে আসে এখনকার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের আস্তানায়। এইখানে আগে কলকাতার মোটর ভেহিকলস-এর অফিস ছিল। মাউন্টেড পুলিশের আস্তানা এখানে হওয়ায় ওরা চলে যায় বেলতলায়। সে আজ অনেক-দিনের কথা।

কলকাতার মাউন্টেড পুলিশ এখন পুরো-দস্তুর স্বদেশী নিয়ম-কানুন মেনে চলছে। আস্তানাটা এখনও অবশ্য দু জায়গাতেই আছে। একটা হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে। আর একটা আছে বডিগার্ড লাইনে। ৫৪টা ঘোড়া আছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের আস্তানায়। বাকী ২৯টা ঘোড়া আছে বডিগার্ড লাইনে। বড় খেলায় বডিগার্ড থেকে ওদের আনা হয়। কারণ তখন ডিউটিটা হয় খুব ঘোরদার। আগে অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ঘোড়া আমদানী করা হ'ত। এখন নীরাট থেকে আসে। সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কেনা হয়। কলকাতায় মাউন্টেড পুলিশের আস্তানায় এপর্যন্ত চারটে বাচ্চা হয়েছে। নতুন ঘোড়া এলে তাদের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ট্রেনিং দেওয়া হয়। বাজনা বাজিয়ে, বাজী ফাটিয়ে প্রথমে ওদের ভয় ভাঙ্গানো হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষিত করে তোলা হয় ঘোড়াগুলোকে।

রেস থেকেও অনেক শিক্ষিত ঘোড়া আসে। একটু বয়েস হলেই ওনাররা ওদের গুলী করে না মেরে কলকাতার মাউন্টেড পুলিশের হাতে ঘোড়াগুলোকে তুলে দিয়ে যান। কারণ ওরা এখানে আদর যত্ন পাবে, সেই সঙ্গে কাজও করবে। বাজীরাও, এষ্ট্রোনাট, এলসিয়ন, জেটপ্লেন, কনকর্ড, জীবন ও ম্যাচাডো রেসের জীবন শেষ করেই মাউন্টেড পুলিশে এসেছে ঐভাবে। এতদিন রেসের মাঠে ওরা দৌড়াতো। এখন আর পারে না। তাই মাউন্টেড পুলিশে সওয়ার বইতে এসেছে। ডিউটি না থাকলে ওদের মাঠে নিয়ে গিয়ে 'রোলিং' করানো হয়। কারণ পরিশ্রম করতে ওরা ভালবাসে—কিছু কাজ করতে চায়। ফুটবল মাঠে যাওয়াতো একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোদ, জল, ঝড় কোন কিছুই ওরা তোয়াক্কা করে না। ফুটবল মাঠের দর্শকরা যেমন হাজারো রকমের কষ্ট সহ্য করে তাদের প্রিয় দলের খেলা দেখবার জন্যে। ঠিক তেমনি মাউন্টেড পুলিশের সঙ্গে ঘোড়াগুলোও সমস্ত কষ্টকে উপেক্ষা করে খেলার মাঠে যাবার জন্যে। শুধুতো মাঠে যাওয়া নয়। মাঝে মধ্যে ইট-পাটকেল খেতে হয়। চোট লাগে, কেটে যায়, তবু মাঠে যাওয়া চাই-ই চাই। বাজীরাও আবার রেসের মাঠে ডিউটি করতে বেশী পছন্দ করে। মেটাল রোডে হাঁটতে অসুবিধে হয়। কারণ এখানে 'রবারের ছুপ' লাগানোর কোন বন্দোবস্ত নেই। ইংরেজ আমলে বিলেত থেকে 'রবারের ছুপ' আসত। এখন আসে না। সেইজন্যে এখন যখন সবই দিশী পদ্ধতিতে চলছে তখন আর কিছু বলার নেই।

কলকাতার মাউন্টেড পুলিশের প্রথম ভারতীয় সার্জেন্ট মানবাহাদুর ছেত্রী এবং সীতেশচন্দ্র সান্যাল প্রথম ভারতীয় ইন্‌স্পেক্টর। বর্তমানে কলকাতার মাউন্টেড পুলিশে আছেন একজন ইন্‌স্পেক্টর, বারজন সার্জেন্ট, বাহাত্তর জন সওয়ার (সিপাই) এবং পঁচানব্বুই জন সহিস। বাজীরাওদের নিয়ে মোট ঘোড়া আছে তিরাশীটা। ফুটবল সিজনে ময়দানে এরা পালা করে ডিউটি দেয়। এছাড়া ময়দান এলাকায় ডিউটি করে সার্জেন্ট ও সওয়ার (সিপাই)-দের পিঠে নিয়ে এরা ময়দানের শান্তি বজায় রাখে। ফুটবল মাঠে গণ্ডগোল হলে এরাই তখন ছোটাছুটি করে সামাল দেয়। কোন বিপদকেই এরা গ্রাহ্য করে না। কারণ শান্তিরক্ষা করাই এদের কাজ। আপদে-বিপদে এরাই কাণ্ডারী। সুতরাং ফুটবল মরশুমে এদের প্রয়োজনই সব থেকে বেশী। এবং এদের বাদ দিয়ে কলকাতার ময়দানী ফুটবলের কথা চিন্তা করা যায় না। ফুটবল, ক্লাব, দর্শক, খেলোয়াড় ও ঘোড়সওয়ার পুলিশদের নিয়েই কলকাতার ফুটবলের ঘর-সংসার।

দ পোলীকুমার দোষ

গান্ধারী

২৮০ পৃষ্ঠার পর

ভাবী। ভালো কোরেছি আমার কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে দিয়ে। মনে হচ্ছে, ওর মঙ্গলই হবে, ও মঙ্গলময় হোয়ে উঠবে। যদিও এখনো তেমন কোন দৃশ্য দেখিনি।

অনিমার বাক্যযন্ত্রণায় ব্যবহারে নিদারুণ ব্যথা নিয়ে ছুটে ছুটে এসেছে মুকুল আমার কাছে। আগে বোলত অদৃষ্টের দোষ। এখন সে কথা আর বলে না, শুধু বলে, বিয়ে দিয়েও তো নূপুর, চিন্তায় চিন্তায় তুমি অসুস্থ হোয়ে পড়ছে, পড়ছো। চিন্তায় চিন্তায় বর্ণ কালি। এখন দেখছি না হওয়াই ভালো ছিলো। যাক্, উপায় খুঁজে পাচ্ছি না তুমি কেমন কোরে সুস্থ হোয়ে উঠবে, কেমন কোরে আমার চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে। এ-ভাবনাই আমাকে পাগল কোরে দিয়েছে। এখন আমাদের দু'জনেরই অনিমাকে মাথা থেকে একেবারে বার কোরে দেওয়া উচিত।

ও যা বোলেছে, অকাট্য যুক্তি। পথ তো আমিই খুঁজে পাচ্ছি না কোন সমাধানের। দিন দিন আমারও ভেতর বড় দুর্বল হোয়ে আসছে। যদি আমি চলে যাই, মুকুলের এ শান্তির নীড়ও ভেঙে চুরমার হোয়ে যাবে। চতুর্দিক শূন্য দেখবে ও। একদম অসহায়।

এটা ভাবতেও আমার মাথা ঝিম ঝিম কোরে ওঠে। দিনে দিনে আমি খুব দুর্বল হোয়ে পড়ছি, বড্ড তাড়াতাড়ি। যে দেখছে সেই বোলছে, চেহারার জেল্লা গেছে, মোখের গড়নে নীল-শিরার আঁচড় পড়ছে। সম্মোহনী চোখের তারার সে জ্যোতি আর নেই, সে আকর্ষণ আর নেই—ম্লান হোয়ে আসছে।

যে যা বলুক, আমি তো বুঝতে পারছি। আমি যেন সকলের কাছ থেকে দূরে—বহু দূরে চলে যাচ্ছি। এ আমি নিজেই নিজের নয়। মানুষ যেমন এক বাড়ী থেকে বেড়াতে আসে আবার চলে যায়। আমি তেমন দেহে আসছি, আবার চলে যাচ্ছি, আবার আসছি।

কোন চিকিৎসারই ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে না। উন্নতির আশার আলোর রেখাটুকু পর্যন্ত কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বাড়িতে একটা হতাশার আবহাওয়া। বাতাস গুমোট কোরে রাখছে দিনরাত। এ আবহাওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছি না আমিও, পাচ্ছে না মুকুলও।

বিষাদের সমুদ্রে সারাদেহ- - - কণ্ঠ ঠোঁট নাক চোখ মাথা অবধি ডুবে যাচ্ছে। কেউ তো বাঁচাতে আসছে না, চুলের মুঠি ধরে আমাদের কেউ তো তুলছে না। বেঁচে থাকাও দুঃসহ হোয়ে উঠেছে আমার। মুকুলের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। মনে মনে বোলেছি, আমার বাইরের দৃষ্টি চলে যাক, দু'চোখ অন্ধ হোয়ে যাক। আমি আর দেখতে পারছি না।

সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মনেরও কতো পরিবর্তন হয়। এত দুঃখের ওপরও নিজে হেসেছি। যখন একলা ঘরে শুয়ে থেকেছি। আগে চাইতুম চোখ দুটো অন্ধ হোলেই ভালো হয়। বোজা অবস্থায়ই আমি অনেক কিছু দেখি। বাইরের চোখ থাকার আর আমার প্রয়োজন কি? সেটা আমার একটা খেলার নেশা পূরণের ইচ্ছে হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এখন অন্ধ হোতে চাইছি কারো করুণ মুখ না দেখতে চেয়ে।

কন্যাকুমারিকায় থাকার সময় কুমারী দেবীর মন্দির পরিক্রমা কোরতে দেখেছিলুম একটি মহিলাকে। কি মিষ্টি সুরেলা গলা। ত্রিবাংকুরের এককালের সাধক-রাজা কুলশেখরের গান গেয়ে গেয়ে মহিলা পরিক্রমা কোরছে। ---এষরওর --- রাকক্ কক্কতিলন্ ---। সব জিনিসের মধ্যেই চোখ থাকলে দেখতে পাওয়া যায় শুভ আছে। অশুভকে যে বরণ করে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সাধক-রাজা ঠিকই বোলেছে। অশুভ চিন্তার সঙ্গে আমারও কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। মনে মনে জপ করি, উচিত নয় উচিত নয়।

ঘটনাচক্রের গতি কখন কোন্ দিকে বাঁক নেয় কে বোলতে পারে। আজ যেটা ভালো কালকের সেটা খারাপ। আজ যেটা খারাপ কালকের সেটা ভালো। আমার এ অবস্থায় মুকুল যে আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার সুযোগ পেয়ে যাবে এটা আমিও দেখিনি। চোখ চেয়েও না, চোখ বুজেও না।

আমায় সারিয়ে তোলার ব্যাপারে চিকিৎসকরা যখন হার মেনেছে, তখন ও কাউকে না বোলেকয়ে সাধুসন্তদের আশীর্বাদ ওর নিজের সংগ্রহের থলিতে ভরে নিয়ে এসে আমার মাথায় দিয়ে নিরোগ কোরে তোলার জন্য উষাও হোয়ে গেছে। বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে।

॥ সাত ॥

বিপদের নানা গতি নানা ভয়।

যখন সর্বনাশের রূপ ধরে তখন কতো ভয়ঙ্কর হোয়ে ওঠে। মানুষের জীবনকে এতটুকু সময় না দিয়ে, হাতের মুঠোয় না পুরে নিশ্চিন্ত হোতে পারে না মোটে। তাই হলো মুকুলের বেলায়। সর্বনেশে পরিবেশে সর্বনেশে লোকের হাতে গিয়ে পড়লো আচমকা।

যে লোক আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, আমার মন ঘোরানোর জন্যে 'অদৃষ্ট' কথাটা বোলেছে সে মুখে। অদৃষ্টের ফেরে যে অনিমাকে নিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে থাকতে হোয়েছে—একথা তার মুখের কথা ছাড়া অন্তরের কথা নয়। আমার চেয়ে এটা আর ভালো কোরে জানবে কে?

অসুস্থ অবস্থায় আমি শুয়ে শুয়েই ভেবেছি খালি, যে মানুষ মনপ্রাণ দিয়ে ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না তার হঠাৎ এমন পরিবর্তন হলো কেন? মানুষের কতোখানি অন্তরাত্মা হোয়ে উঠলে তার প্রকৃতি বদলে যায়। তরুণদার স্বভাবও কিন্তু পালেটছিলো নীপাকে পেয়ে—নীপার মৃত্যুর পর আরো বেশি কোরে। সেও তো ঈশ্বর আত্মা-পরমাত্মা কিছুই বিশ্বাস কোরত না।

আমাদের বাড়িতে তো ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোরে ওদের দু'জনকে ক্ষেপানো হোত—এরা দু'জনে একেবারে চার্বাক—বড় চার্বাক ছোট চার্বাক। তরুণদা বড় চার্বাক আর মুকুল ছোট চার্বাক। —খাও দাও আনন্দ করো। শরীর যাবার সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হোয়ে যায়। ঈশ্বর নেই ধর্ম নেই। নিজেকে মানা ছাড়া, নিজের সুবিধে ভোগ করা ছাড়া জগতের মন নিয়ে অপরের ভালো করার জন্য যারা ব্যতিব্যস্ত হোয়ে ওঠে তারা আস্ত পাগল। তাদের মতো নিরোধ পৃথিবীতে না জন্মানোই ভালো। না থাকাই ভালো।

আমি তো নিজের মনকে নিজেই বোলেছি, আচ্ছা, নীপা মরে যেতে তার জন্য পাগল হয়ে ধর্মরাজ্যের আশ্রয় নিয়েছিলো তরুণদা। আমি মরিনি, বেঁচে আছি। এখুনি ওর এ পাগলামো পেয়ে বসলো কেন?

কেবল চিন্তা কোরেছি, ও বিপন্মুক্ত হোক বিপন্মুক্ত হোক বিপন্মুক্ত হোক। পাগলের খেয়ালে বেরিয়ে পড়েছে, সে কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই। মানুষের খোলসে একটা নররাক্ষসের খপ্পরে পড়ে গেছে। কেমন কোরে মুক্তি পাবে?

কার মুখে শুনেছে মুকুল চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অনেক সাধুসন্ত আসে শিব চতুর্দশীর দিনে। বড় বড় সাধু—কেউ কাঁটার ওপর শুয়ে কেউ অজগর জড়িয়ে কেউ উর্ধ্বে পা তুলে, কেউ চতুর্দিকে আগুন জেলে মাঝখানে বোসে। বছরের এই একটি দিনেই সাধু সমাগম, নানান দেশের জন সমাগম।

সীতাকুণ্ডের জলে আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে নিভছেও। লোকে বলে পুণ্যাত্মারা জল স্পর্শ কোরলে আগুন নেভে না, রাত্রাদের বেলাই নিভে যায়। মুকুল স্পর্শ কোরেছে, আগুন নেভেনি। দ্বিগুণ উৎসাহে পাহাড় বেয়ে বেয়ে উঠেছে। পেরিয়েছে শম্ভুনাথের মন্দির। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে। তারপর উনকোটিতে চতুর্দিকে শিবলিঙ্গ। তারপর বিরূপাক্ষের

মন্দির। আহা, এখান থেকে সমুদ্রের নীল মাটির সবুজ হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাকিয়ে থাকলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিরূপাক্ষর মন্দির পেছনে রেখে আরো, আরো এগুচ্ছে মুকুল। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়োয় এসে পৌঁচেছে। মন্দিরের শিব দর্শন কোরে গিয়ে বাইরের টিনের ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো লাল কাপড় পরা এক অদ্ভুত দর্শন মানুষ। মিশমিশে কালো রঙের দেহের ওপর জায়গায় জায়গায় মেটে সিঁদুরের ডোরার দাগ। জ্যান্ত সাপের তাগা বালা হার। মাথার রুখু চুলে রাজ্যের ধুলো উড়ছে। নীরস চোখের তারায় মরা মানুষের তারার ছবি। লম্বা লম্বা দাঁত নিচের পুরু ঠোঁটের ওপর আটকে রয়েছে। কান দু'টো অতিরিক্ত ছোট। বেঁটেখাটো মানুষ।

মুকুলের সামনে এসে খপ কোরে ওর ডান হাতটা চেপে ধরলো। বোঝা গেল মানুষটার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। ঠিক শক্তির জোরে মুকুলের সারা দেহ অবশ হয়নি। ওর স্পর্শে পাতালপুরীর মৃত্যু-হিম ছোঁয়া লেগে মুকুল যেন কেমন হোয়ে গেছল। ওকে হাত ধরে পাহাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে গেছে ওই লোক। তারপর ওর কপালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর মনের কথা উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছে কেমন কোরে কে জানে। সে কথা শুনিয়েছে মুকুলকে, প্রতিকারের আশ্বাসও হোয়েছে। আমাকে সুস্থ কোরে তোলার, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার একমাত্র চাবিকাঠি নাকি তারই হাতে রয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে কাঠের ঘরে নিয়ে এসে ওকে বোলেছে, এখানেই কিছুদিন থেকে সব ব্যবস্থা কোরে দেবার পর বাড়ি পাঠিয়ে দেবে সে নিজেই। দিনের পর দিন এমন ত্রাস সৃষ্টি কোরেছে ওই মানুষ, মুকুলের অস্তিত্ব হারিয়ে গেছল শেষে। ওই লোকের ফাঁদ থেকে বেরোবার কোন চেষ্টাই কোন সময়ে আসেনি তার দিক থেকে। আফিঙের নেশায় বিভোর জানোয়ারটা পাখির মতো একই ঘরে উঠেছে বসেছে, দাঁড়িয়েছে, ঘুরেফিরে বেড়িয়েছে। দরজা হাট কোরে খোলা। বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়েও নীল আকাশ দেখতে ইচ্ছে করেনি।

প্রথম দু' তিন দিন বাক্‌শক্তিও রহিত হোয়ে গেছল। ও যেন অন্য জগতের মানুষ, এ জগতের কোন মানুষের কথাই ওর মনে ছিলো না। এরপর সবই মনে পড়েছে আবার, স্বাভাবিকও হোয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক কোরে তুলেছে, মনে পড়িয়েছে ওই লোকই। কিন্তু রোজই প্রদীপ জ্বালার সময় মন্ত্রের মতো শুনিয়েছে একই কথা।—চতুর্দিকে তুমি দেখতে পাবে কত সাপ, বিষাক্ত সাপ। কাঠের দেয়ালে মোরাকেরা কোরে বেড়াবে প্রদীপের আলোয়। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হোয়েছে, অনেক সাধনা—নিজের দেহের রক্তও দিতে হোয়েছে।

ঘরের মধ্যিখানে দশটা মরার মাথা পর পর সাজানো, চৌকো করে—যেন একটা চারকোণা আসন। মড়ার মাথার ওপর মোষের চামড়া বিছানো। তার ওপর বোসেছে ওই মানুষ।—করোটিবাবা। এ নাম মুকুল করোটিবাবার একমাত্র অন্তরঙ্গ চ্যালার মুখ থেকে শুনেছে।

করোটিবাবা কি পুজো করে কে জানে। প্রতিদিন নিশুতি রাতে সাপের মুণ্ডু কেটে বাদ দিয়ে কাঁচা সাপ কচমচ কোরে চিবিয়ে খায়। আর হুংকার দিয়ে বলে, খাচ্ছে রাক্ষসী, খাচ্ছে ডাইনী। রাক্ষসী-ডাইনীর ভোগ আমার মধ্যে দিয়ে পৌঁছুচ্ছে ওদের পেটে।

চ্যালা বলে, এসব গুরুদত্ত নিজস্ব ঘরানা, রাক্ষসী বিদ্যার গুপ্তসাধনা।

প্রদীপের সলতেতে দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে বোলেছে করোটিবাবা, কাপাস তুলোর এই সলতে তৈরীর পেছনেও সাধনা। কাপাস তুলোর বিচি মঙ্গলবারে সাপের মুখে পুরে সেই সাপকে মেরে মাটিতে পুঁতে রাখা। সেই বিচি থেকে যে গাছ জন্মেছে, সেই গাছের তুলোয় তৈরী এই সলতে। অবিশ্যি এই সলতে জ্বালার অনেক মন্ত্রও আছে।

জ্বালার সময় বিড়বিড় কোরে এমন সব কথা বোলেছে করোটিবাবা—মুকুল তার এক-বর্ণও বুঝতে পারেনি। কোন্ দেশী ভাষা কে জানে? কে জানে ওর মন্ত্রের গুণে, না কাপাস তুলোর সলতের গুণে, না 'সাপ দেখবে সাপ দেখবে' বোলে মুকুলের মন দুর্বল কোরে দেবার গুণে—মুকুল প্রদীপের আলোয় কাঠের দেয়ালে অসংখ্য জ্যান্ত সাপ দেখেছে। ভয়ে বুকের রক্ত হিম, গলা শুকিয়ে কাঠ।

বেপরোয়া সাহসী মানুষটা নিস্তেজ-দুর্বল ভীতু হোয়ে পড়েছে। করোটিবাবা বোলেছে, এসব সাপ আমার মন্ত্রের শক্তি। এরাই তোর নূপুরের রোগের বিষ তুলে নিয়ে আসবে অদৃশ্যভাবে গিয়ে। নূপুর বেঁচে উঠবে। নূপুর তোরই হবে।

যা বোলেছে করোটিবাবা সমস্ত মুকুলকে আটকে রাখার ফাঁদ, মিথ্যে কারণ দেখিয়ে। মুকুল বুঝেছে পরে। তখন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সে। প্রথমে সরল প্রাণে বিশ্বাস কোরে নিয়েছিল, করোটিবাবা আমায় সুস্থ কোরে তুলবে। যা বোলছে একটাও মিথ্যে নয়, সত্যি।

প্রতিরাতে একজন ধনী এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরে। করোটিবাবা উঠে গেছে, ফিসফিস কোরে তাকে কি বোলেছে, আশ্বাস দিয়েছে। মুকুল শোনেনি, শুনতে চায়ও নি। তার মনের কোণে সন্দেহের কণা পর্যন্ত জমে ওঠে নি। উঠেছে অমাবস্যার রাতে।

নিস্তব্ধ-নিঝুম নিশীথে করোটিবাবার ফিসফিস আওয়াজ শতগুণ জোরে তার কানে বেজেছে। বুকের ধুকধুকুনিটা মনে হলো স্তব্ধ হোয়ে গেলো।

করোটিবাবা বোলছে, বেঁচে উঠবে তোর ছেলে। মুকুলের প্রাণ তোর ছেলের দেহে যাবে, কোন ভয় নেই। ওর পরমায়ু তোর ছেলেই পাবে। ছেলের মৃত্যুযোগ কেটে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি। এসবে অনেক খাটুনি, ক্রিয়াকলাপে বহু খরচা, তুই তো সব জানিস।

লোকটি উত্তর দিয়েছে, সারা জীবন ধরে আপনাকে মাথায় কোরে রাখবো। খরচের কোন প্রশ্নই তুলবেন না। যা লাগে যতো লাগুক—কাজে বাধা যেন না আসে। চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়।

এরপর, যেটা কোন সময়েই লক্ষ্য করেনি মুকুল—লক্ষ্য কোরেছে। মড়ার মাথার ওপরের আসনে বোসে পরপর দশটা মাটির প্রদীপ প্রতি রাতে জ্বালায় করোটিবাবা। আসন থেকে নেমে বসে তারপর। মোষের চামড়াটা টেনে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রত্যেক মাথার ওপর এক একটি প্রদীপ বসিয়ে দিয়ে মুকুলের দিকে কটমট কোরে তাকায়। আর মাঝে মাঝে 'হুম' বোলে একটা বুক কাঁপানো শব্দ করে।

মুকুল কেমন হোয়ে যায়। ধীরে ধীরে দু'চোখে ঘুম নামে, ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম যখন ভাঙে, তখন দ্যাখে সে—নিজের বাঁদিকের বুকের ওপর দ্যাখে কঙ্কালের পায়ের পাঁচটা আঙুল। বুকে খুব ব্যথা। অনুভব করে—ওই জায়গাটাতেই। মনে হয় ও দিকের পাঁজরটা ঢিলে হোয়ে গেছে। আর একটা চাপ দিলেই মট মট কোরে ভেঙে যাবে।

মুকুল সচেতন হোয়ে উঠলে করোটিবাবা বলে, এসব ক্রিয়া তোর নূপুরের জন্যে, বুঝলি? মুকুল দেখেছে, দেয়ালের সাপ এগিয়ে আসছে তার চারধারে। দম বন্ধ হোয়ে আসছে।

করোটিবাবা বোলেছে, ভয় কিরে, যে জায়গায় এসেছিস সব ফিরে পাবি। আমিই তোর অজয়। তোর জীবন, নূপুরের জীবন।

করোটিবাবার অট্টহাসিতে পুরো ঘরখানা ত্রাসে থর থর কোরে উঠেছে।

মুকুল ভেবেছে, কেমন কোরে এই নর-রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার হবে সে। আর যে পাল্লায় এসে পড়েছে, নূপুরের সঙ্গে কখনো দেখা হবে না। কোনদিন কেউ জানতেও

পারবে না মুকুল বোলে একটা তরুণ কোথায় নিঃশেষ হোয়ে গেছে, কোথায় গুম হোয়ে গেছে---কেমন কোরে হোয়েছে!

এক এক সময় আচমকা এমন ঘটনা ঘটে যায়, অতি বড় অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস এসে পড়ে---কেউ বুঝি নেপথ্যে থেকে এর বিচার কোরেছে একে রক্ষে কোরেছে---এর আকুল আকূতি শুনে।

মানুষের জীবন বিচিত্র, ঘটনা বিচিত্র। বেঁচে থাকা আর না থাকাও বড় বিচিত্র। অনেক সময় কেউ কারণ খুঁজে পায় না কেন এমন হলো---না হোতেও তো পারতো। হোয়ে গেলো, হোয়েছে। এটাই অদ্ভুত ব্যাপার।

মুকুলের জীবনেও আকস্মিকভাবে জীবন রক্ষে হোয়ে গেছে। সে রাতে প্রদীপের বি ঢালা আর জ্বালা, এই কোরতে কোরতে কেমন কোরে যে সকলের অলক্ষ্যে কাঠের ঘরে কোন্‌দিক দিয়ে ছিটকে গিয়ে আগুন ধরেছে তা কেউ জানে না। অথচ আগুনে যে কাঠের ঘর জ্বলতে শুরু কোরে দিয়েছে, এটা অতি সত্য।

প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে করোটিব্যবা আর তার চ্যালা পালিয়েছে। একটু আগে মুকুলের আচ্ছন্নভাবটা এসেছিলো। হাত বেয়ে পা বেয়ে চোখ বেয়ে মাথা বেয়ে সাপ ওঠানামা কোরছে। সাপের বরফ-ঠাণ্ডা স্পর্শ মুকুলের সর্বশরীরে। হঠাৎ আগুনের তাপে কাটলো আচ্ছন্নভাব, কাটলো এই অনুভূতি।

স্বাভাবিক হোয়ে উঠেছে মুকুল। মনে পড়েনি নূপুরকে, মনে পড়েনি নিজের বাড়ির কাউকে। লকলকে আগুনের লাল শিখা আর ধোঁয়ায় অন্ধকার দেখেছে দু'চোখে। ওই আগুনের গ্রাসের মুখ থেকে নিজেকে যে কিভাবে ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে পেরেছে, তা সে নিজেও জানে না।

মনে পড়ে সে ছুটেছে। কোথা থেকে অত শক্তি পেলো জানে না। ছুটেছে ছুটেছে ছুটেছে---। কখন পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হোয়েছে সেটাও খেয়াল নেই।

॥ আট ॥

জ্ঞান হোতে দু'চোখ খুলে দেখেছে মুকুল জঙ্গলে নয় মাঠে নয় ঘাটে নয় সে রয়েছে একটি সাদা চাদর বিছানো চৌকির ওপর। একজনের কোলে মাথা। মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। মুখে মৃদু হাসি, দু'চোখে স্নিগ্ধ-স্নেহ টইটম্বুর। অভয়বাণী ওঁর শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো।---এখানে কোন ভয় নেই তোমার। ঝড় না উঠলে মেঘ কাটে না। তোমার জীবনেও যতো কাল মেঘ কেটে গেছে। এবার জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু। পথ থেকে তুলে এনেছি আমি তোমায়। ওখান দিয়ে যাবার কথা নয়, তবু মনে হোয়েছে আজ ওখান দিয়েই যাই।

ইনিই প্রভানন্দ।

হ্যাঁ, সত্যিই প্রভা বটে। সপ্তস্বর্গের সবটুকু জ্যোতি ছেঁচে জ্যোতির সারটাই ওঁর মুখেচোখে এসে জমা হোয়েছে। শ্যামবর্ণের মানুষ, অথচ মুখের লাবণ্য থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। চোখের তারায় শান্তির আশ্রয়।

মুকুলের মনে হোয়েছে এত দিনে একজন অতি আপনজনের কাছে আসতে পেরেছে সে। ওর ভালো লেগেছে প্রভানন্দের আশ্রম, প্রভানন্দের সাধনা। ধ্যানযোগে মানুষের মন কত উঁচুতে ওঠে, নিজের শুভ-ইচ্ছে দূরের মানুষের ওপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেই শিক্ষাই দেন প্রভানন্দ। কত লোক আসে বিষাদের ভারবোঝা মাথায় নিয়ে বুকে নিয়ে নিত্য আশ্রমে প্রভানন্দের উপদেশ নিয়ে ফিরে যায় হাসিমুখে। এই আসা-যাওয়ার ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে বেড়াতে ভালো লাগে মুকুলের। প্রাণের ব্যথা উজাড় কোরে শুনিয়েছে মুকুল, এলোককে শোনানও সার্থক। করোটিবাবার মত প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার লোক এ নয়। প্রথম থেকে মুখচোখ দেখে মনে হোয়েছে তাই। একজনের কাছে বিপদের অন্ধকার গহ্বরে পথ হারিয়ে ফেললেও, এখানে মুক্তির মুক্ত নীল আকাশের নিচে এসে পড়েছে সে।

এখানকার পাখির গানে গেয়ে ওঠে কে যেন---ভয় নেই, ভয় নেই। আমার কথা শুনে মুকুলকে বোলেছেন প্রভানন্দ, সুস্থ হোয়ে

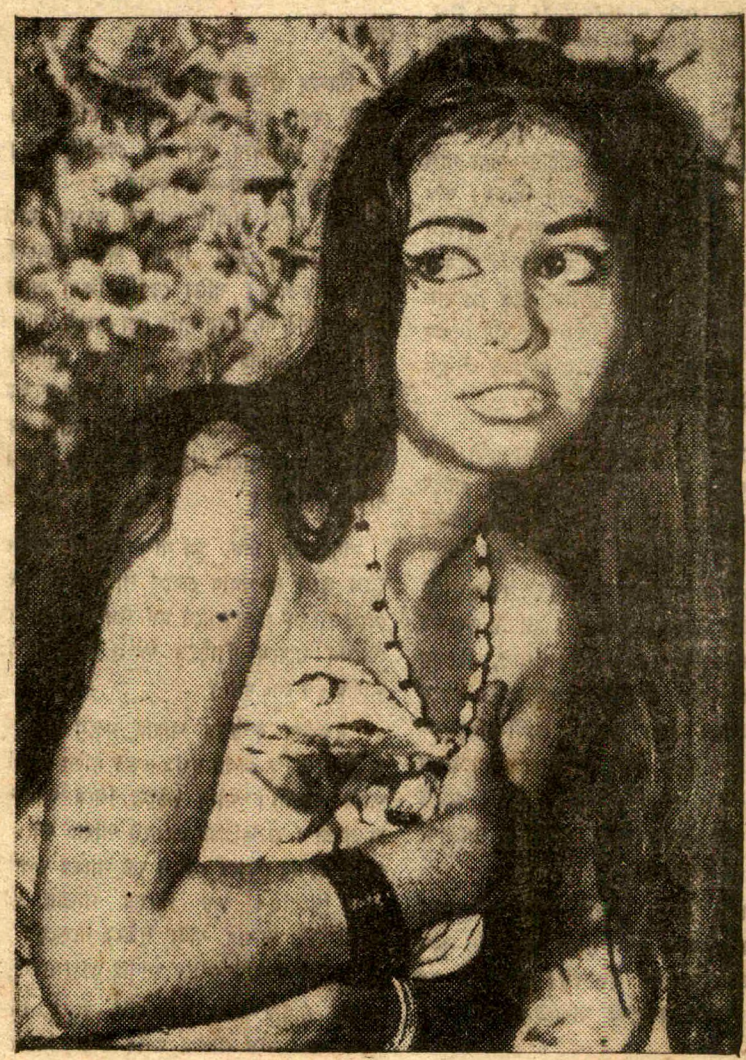

সচকিতা

ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঁৎ নূপুর, বেঁচে থাকবে নূপুর। দেখা হবে তোমার সঙ্গে, চিন্তার কোন কারণ নেই। একজন নূপুরের মঙ্গল কামনা শুধু নয়, শত শত নূপুরের মঙ্গল কামনা তোমায় কোরতে হবে। তোমার মতো শত শত মুকুলকে জাগিয়ে তুলতে হবে। শান্তির আলোয়, আনন্দের আলোয় অন্ধকার থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নিজেকে তৈরী করার জন্যে ধ্যানও দিয়েছেন প্রভানন্দ। বোলেছেন, সকাল-সন্ধ্যে আসনে বোসে ভাববে সূর্যে চন্দ্রে নক্ষত্রে তোমার হাসিমুখ জলজল কোরে ভাসছে। আবার সেই মুখের পাশে নানারকমের দুঃখ এসে ভিড় কোরে রয়েছে। তোমার মুখ ভিড়ের প্রতিটি মানুষের মুখ হোয়ে উঠছে। অদৃশ্য হোয়ে যাচ্ছে সমস্ত। আবার তোমার একারই মুখ ভাসছে। এই একা আর বহু, আর বহু আর একার ধ্যানে মনে মনে জপ কোরবে, 'অহং ব্রহ্ম, অহং জীবঃ সোঽহং।' আমি ব্রহ্ম আমি জীব আমি-ই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি —তিনি।

মুকুল বুঝেছে তার জীবনে এত বিপর্যয় এত অশান্তি এত বাধা এত আঘাত—অন্য পথে যাবার জন্যেই বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। তার জীবনে এসব 'শাপে বর'। মানুষের জীবনে যা কিছু আসে অভিজ্ঞ কোরে তোলার জন্যে। লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে ইস্পাত গড়ে তোলার জন্যে। সোনা পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁদ বাদ দেবার জন্যে। প্রয়োজন ছাড়া কোন মানুষের জীবনে কোনটাই আসে না।

বিবেকবুদ্ধিকে সচেতন রাখলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রভানন্দ পঞ্চবটির তলায় বোসে বোসে বলেছেন, মুকুল, ওই যে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়োয় শিবমন্দির, চিন্তা কোরবে তুমি শিবের মতো হোতে, সবার কাছে শুভ হোয়ে উঠতে। কেউ যেন তোমায় ভয়ংকর অশুভ না ভেবে বসে। নিজের ওপরে, নিজের কোন ব্যাপারের ওপরে মোহগ্রস্ত হোয়ে উঠবে না কখনো। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী—নিজেকে জানতে পেরেছেন, সবাইকে জানতে পেরেছেন আমি সবাই, সবাই-ই আমি, তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত মোহমুক্ত। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

সন্ন্যাস দীক্ষা দেবার সময় পরিব্রাজক হিসেবে মুকুলকে দেশে দেশে ঘুরে জ্ঞান সঞ্চয় কোরতে বোলেছেন প্রভানন্দ। চট্টগ্রামের পর প্রথমে আমার এখানেই আসতে বোলেছেন।

মুকুল সন্ন্যাসীর বেশে এসেছে আমার কাছে। ওর দিব্যকান্তি চেয়ে থাকার মতো, পায়ে মাথা ঠেকাবার মতো চেহারা। আমি একদৃষ্টে চেয়ে আছি। ও চলে যাবার পর ওর জীবনের বিভীষিকার প্রতিটি দিন আমাকে এসে নাড়া দিয়েছে মাঝে মাঝে। কখনো জাগা অবস্থায়, কখনো স্বপ্নে। আমি শিউরে উঠেছি, আমি চিৎকার কোরে উঠেছি, আমি দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি, একি দেখছি আমি? এ দেখা আমার ভুল হোক। প্রিয় বস্তুর ওপর সকলেরই একটা দুর্বলতা থাকে। সেই দুর্বলতাই স্বপ্নে নানান ছবি তুলে ধরে—ভয়ের ছবি তুলে ধরে, হারানোর ছবি তুলে ধরে। জেগে থাকলেও সেই দুঃস্বপ্ন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে।

আমার মনকে এই দুঃস্বপ্ন থেকে ঘোরাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা কোরেছি, পারিনি। মনে মনে নিরুপায়ের মঙ্গল কামনা ছাড়া উপায় কি? মনে মনে প্রার্থনা করেছি, আমার স্বপ্ন আমার চিন্তা—মিথ্যে হোক মিথ্যে হোক মিথ্যে হোক।

নিজের জীবনকথা শুনিয়েছে যখন মুকুল, আমার দেখার সঙ্গে হুবহু মিল পেয়েছি আমি। তার এই সন্ন্যাসীর বেশ এও দেখেছি পরে। একবার দু'বার নয়—অনেকবার।

ওকে দেখে আমার আনন্দে ভরপুর হোয়ে উঠেছে ভেতর, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে টস টস কোরে। সত্যি দেখছি কিনা আমি বুঝতে পারছি না, চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি।

মুকুল আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। সেই হাসি আমার গোপাল-কৃষ্ণের হাসি। যে হাসি দেখতে চেয়েছিলুম আমি ওর মুখে। সব সাধ আমার পূর্ণ হোয়ে উঠছে আজ। সত্যি যত্যি কি?

মানুষ যা চায়, তা না পাওয়ার ব্যথায় ভুগে ভুগে কল্পনার চোখে পাওয়ার বস্তুকেও দেখে অনেক সময়। মনে হয় তখন সব সত্যি, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাও সত্যি, আমার কি সেই দশা?

মুকুলের কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছে। ও বোলছে, কি দেখছ নূপুর এত? সত্যি সত্যিই আমি এসেছি। আমি উঠতে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা। ও এগিয়ে এসেছে আমার কাছে। আমি থর থর কোরে কেঁপে ওর পায়ের ওপরই পড়ে গিয়েছি। ওর পায়ের পাতায় ওর অগোচরেই আমার মাথা লুটিয়ে পড়েছে।

মুকুল শশব্যস্ত হোয়ে আমায় তুলে ধরেছে। আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে, পিঠে হাত বুলিয়েছে। ধরে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়েছে আবার। বোলেছে, নূপুর, তোমার লাগেনি তো কোথাও?

আনন্দের কান্না তখনো আমাকে থামতে দিচ্ছে না, আমি ফোঁপাচ্ছি। আমি কি বোলব? আমার এ গোপাল-কৃষ্ণের স্পর্শে সারা শরীরে প্রশান্তির প্রবাহ বয়ে চলেছে। আমি দেখছি ওকে দু' চোখ ভরে, মন ভরে প্রাণ ভরে।

মুকুল বললো, আমায় এখুনি চলে যেতে হবে। আমার অনেক জায়গায় যাওয়া বাকি। আবার আসব আমি। কবে, এখন ঠিক বোলতে পারছি না।

যেভাবে এসেছিলো, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেছে মুকুল ঘর ছেড়ে। আমি কোন কথা কইতে পারিনি আর। কোন আফসোস নেই তাতে আমার। নিশ্বাসে নিশ্বাসে বোলেছি, এসেছ মঙ্গলময়, আবার এসো, সকল দেশে এসো, সবার ঘরে এসো। আমার ঘরে এসো।

॥ নয় ॥

যে আসছে আজ দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে সে কি আজ আগের কথা কিছু মনে রেখেছে? আগের মতো মন কি তার এখনো আছে? আমারও কি সেই মন আছে?

জানলার দিকে মুখ কোরে দু' চোখ বুজে ইজিচেয়ারে বোসে আছে নূপুর। আর এই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ভেবে চলেছে। দু' চোখ বুজে বুজেই নিজেকে নিজে শোনাচ্ছে। নিজের বাইরের কানকেই কথা কয়ে কয়ে শোনাচ্ছে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ মনে কোরবে, নূপুর ঘরের ভেতর কারুর সঙ্গে কথা বোলছে।

নূপুর বোলছে, একদিন এই বাড়ির কাছাকাছি 'মনমোহন থিয়েটার' ছিল। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কবলে পড়ে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এ বাড়িরও আধখানা চলে গেছে। ছিলো ঝাড়লণ্ঠন, লাল ভেলভেটের কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি।

দোতলায় বড় বড় হল ঘর। পঙেথন কাজ করা দেয়াল। চতুর্দিকের দেয়ালে নীল ভেলভেটের ফ্রেমে গোল আয়না। আয়নার ব্র্যাকেটে বেলোয়ারী কাঁচের ঝিলিমিলির ঝালর। প্রতিটি ব্র্যাকেটে রূপোর বাতিদানী। দেয়ালে দেয়ালে বড় অয়েল পেণ্টিং-এর ছবি ঝোলানো, বংশের এক এক পুরুষের। কোন ঘরে পিয়ানো, কোন ঘরে অর্গান।

মেঝেয় কোথাও লাল কোথাও নীল কোথাও হলুদ কার্পেট। কি নরম, পায়ের পাতা ডুবে যায়।

কতদিন অর্গান বাজিয়ে গেয়েছি গান। মুকুল এসেছে, সে আমার মস্ত বড় শ্রোতা। সে কথা, সে দৃশ্য কি তার আজো মনে আছে?

কথা দিয়ে গেছে দেশ ভ্রমণের পরিব্রাজকব্রত শেষ কোরে আবার আমার সঙ্গে দেখা

কোরবে। গত তিনদিন ধরে আমি দেখছি ওকে ---ও আসছে। আজ তার আসার দিন, ও আসবে।

আসার খবর জানায় নি আমায়, আমি জানি, হয়ত তার মন জানিয়ে দিয়েছে আমার মনকে। আমার মনের চোখে তাকে আমি দেখেছি।

পরাধীন দেশকে দেখে গেছে, এবারে এসে দেখবে স্বাধীন। দেখবে অনেক পরিবর্তন মানুষের মনের। আকাশ-পাতাল।

দেখবে কি বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে চলেছে। যুদ্ধ কোরে চলেছে অভাব-অনটনের সঙ্গে। শান্তির স্বভাব আনন্দের স্বভাব ঢেকেছে অন্ধকারে।

জেগে উঠে চতুর্দিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্ছে সর্বনেশে রাগ হিংসে সর্বগ্রাসী লোভ। হারিয়ে গেছে ভালোবাসা হারিয়ে গেছে হৃদয় হারিয়েছে মমতা। এসব কি সহ্য কোরতে পারবে মুকুল? তার করুণাভরা বুকের ভেতর এ উত্তাপের আঁচ-স্পর্শ কোরে না তার শান্তি আনন্দকে শুকিয়ে ফেলে। তার মানুষ-মঙ্গলের ব্রতের ওপর যেন না কোন সংশয়ের ছায়া ফেলে দেয়। সেই ভয় নূপুরের।

নূপুর দু'হাত জোড় কোরে প্রার্থনা কোরছে ---তার এসব ধারণা যেন মুকুলের মনে কোন প্রভাব বিস্তার না করে। মুকুল সকলের মঙ্গল কামনায় নিশ্চয়ই সহজভাবে এগিয়ে যাবে। কোন বাধাবিঘ্ন তাকে পেছিয়ে দিতে পারবে না একদম। সবার হৃদয় জেগে উঠবে, জেগে উঠবে ভালোবাসা মমতা। শান্তির রাজ্য গড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে আনন্দের। মানুষের হিংসে-দ্বেষ আর অভাব-অনটন নিশ্চিহ্ন হোয়ে মুছে যাবে ওর সৎ ইচ্ছেয়। সজ্জনের সৎ ইচ্ছের সঙ্গে মিলেমিশে।

ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো নূপুর। মুকুল আসছে---সন্ন্যাসী আনন্দজ্যোতি।

আনন্দজ্যোতি ধীরে ধীরে প্রবেশ কোরলো ঘরে।

নূপুর এগিয়ে আসছে। বোলছে, আমি জানি তুমি আজ আসবে।

চোখ বোজা অবস্থাতেই পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে নূপুর। অবাক হোয়ে দেখছে আনন্দজ্যোতি। নূপুর যা ভেবেছিলো, যা চেয়েছিলো---তা হোয়েছে।

নিজের মনের রঙে যেভাবে যে সাজে সাজাতে চেয়েছিলো যে মানুষকে, সে তো আজ সেই রঙে সেই সাজে সেইভাবে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তবুও কেন দু'চোখ বোজা? তাকিয়ে দেখতে ওর ক্ষতি কি?

নূপুরের দৃষ্টিতে আনন্দজ্যোতির ভালো ছাড়া খারাপ হবার কোন ভয় নেই। বরং আরো শুভ হবে। তবে নূপুরের মনে কেন মিথ্যে আশঙ্কা?

নূপুর বোলছে, আমি তোমাকে দেখছি আনন্দজ্যোতি। তুমি আরো সুন্দর হোয়ে উঠেছ, আরো কল্যাণময় হোয়ে উঠেছ। নিজের মধ্যে নিজে পরিপূর্ণ হোয়ে উঠেছ। আরো হোয়ে উঠবে।

জানে আনন্দজ্যোতি চোখ বুজে দেখতে পায় নূপুর বরাবরই। তবু তার আশা, চেয়ে দেখুক একবারের জন্যে।

বোলতে যাচ্ছে, চোখ খুলে তুমি দেখ একবার। পাশে এসে হাত চেপে ধরলো কদম। নির্মলদার বউ---নূপুরের ছেলেবেলার সই।

ইশারায় জানিয়ে দিলে, দু' চোখ অন্ধ হয়ে গেছে দীর্ঘ দিন। তারপর বারান্দায় ডেকে ফিস ফিস কোরে বোলেছে, প্রথম সন্ন্যাসী হোয়ে এসেছিলে যখন, তারপরেই দু' চোখ অন্ধ হোয়েছে মারাত্মক বসন্তে। ও চাইত, বাইরের দৃষ্টি ওর চলে যাক, ভেতরের দৃষ্টি বেঁচে থাকুক, আরো জলজ্বলে হোয়ে উঠুক। বাইরের দৃষ্টি যাবার আগে এই চাওয়াটাই দিবারাত্রির জপ-মালা হোয়ে উঠেছিলো ওর কাছে।

কয়েক মুহূর্ত। ঘরের ভেতরে এসেছে আবার আনন্দজ্যোতি। ওর মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না। নূপুরের সবই রয়েছে, সেই মুখ সেই শরীর সেই গড়ন, কোন জায়গায় এতটুকুও টসকায়নি। শুধু দু' চোখ---।

মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না আনন্দজ্যোতি। ভাবতেও আর পারছে না কিছু। বললো, আজ আসি নূপুর, আমায় চলে যেতে হবে আবার।

নূপুরের দু' চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। ও মনে মনে বোলছে এবারেও---এসেছ মঙ্গলময়, আবার এসো, সকল দেশে এসো, সবার ঘরে এসো---আমার ঘরে এসো।

পিছুটান মানি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমেই আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার মুখখানি দেখে। লোকটির বয়েস পঞ্চাশও হতে পারে, সত্তরও হতে পারে। দারিদ্র্য অনেক সময় বয়েস বাড়িয়ে দেয়। নিছক নিরামিষ খাবারও অকালে বুড়োই করে দেয় চেহারা।

লোকটি মাটিতে উবু হয়ে বসে ঘাস কাটছিল আর হাসছিল আপনমনে। কেউ একলা একলা বসে হাসলে আমরা তাকে পাগল মনে করি। কিন্তু হঠাৎ কোনো মজার কথা মনে পড়ে গেলে আমরা সবাই কখনো না কখনো এরকমভাবে হাসি।

লোকটাকে তবু আমারও প্রথমে পাগলই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার মুখখানা ভারী সুন্দর। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মাথার চুল ধপধপে সাদা। চোখ দুটি বেশ বড় বড়, খাঁড়া নাক, কপালে পরিষ্কার তিনটি ভাঁজ। তার গোল থুতনিটি দেখলেই মনে হয়, সে বেশ ভালোমানুষ। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছিলেন একজন বৃদ্ধের 'প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠের' কথা। এই লোকটিকে দেখলেও সেই কথাই মনে হয়। সঞ্জীবচন্দ্রও এই অঞ্চলের কোনো মানুষ দেখেই ঐ কথা লিখেছিলেন।

পালামৌ জেলায় বেতলা জঙ্গল। তখন আমি ওখানকার রেঞ্জার সাহেবের অতিথি। আমার সঙ্গে রয়েছে আমার এক বন্ধু হেমকান্তি আর তার স্ত্রী ও শ্যালিকা। মহিলা দু'জনই খুব সুন্দরী।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখানকার জঙ্গলে, সরকারী হিসেব অনুযায়ী বেশ কয়েকটি বাঘ, হাতির পাল, বুনো শুয়োর, বাইসন এসব আছে বটে। কিন্তু দু' রাত্তির জিপে করে ঘুরেও আমরা বিশেষ কিছুই দেখতে পাই নি। অবশ্য কিছু হরিণ আর সম্বর ছাড়া। শুনেছি শীতকালে অনেকেই

হাতি দেখতে পায়। আর বাঘেরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে, কেউ জানে না।

মোট কথা, এই জঙ্গলে ঘুরতে ভয় লাগে না একটুও। আমরা তাই পায়ে হেঁটেই বেড়িয়েছিলাম। এই জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে একটা পুরোনোকালের ভাঙা দুর্গ, আরও কিছু কিছু ঐতিহাসিক চিহ্ন। কিছু আদিবাসীদের বাড়ি-ঘরও রয়েছে। অন্তত, তখন ছিল, যখন আমি গিয়েছিলাম, বেশ কিছু বছর আগেকার কথা।

লোকটির পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আমাদের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালো। সুন্দর হাসি হাসি। আমাদের সঙ্গে রেঞ্জার সাহেবকে দেখে সে হাত তুলে নমস্কার করে বললো, নমস্তে হুজৌর।

আমরা কাছেই একটা জলাশয়ের পাশে হেলে পড়া গাছের ওপর বসলাম। জায়গাটা অসম্ভব নিস্তব্ধ। হেমকান্তি ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলছে। তার সুন্দরী শ্যালিকা শান্তা দৌড়ে দৌড়ে ধরবার চেষ্টা করছে একটা খুব বড় প্রজাপতি। রঙীন ছাপা শাড়ী পরা শান্তাকেও দেখাচ্ছে একটা প্রজাপতির মতন। হেমকান্তির ক্যামেরায় উঠে যাচ্ছে দুই প্রজাপতির ছবি।

হঠাৎ একটা ঢোলের শব্দ শোনা গেল খানিকটা দূরে। বেতালা-বেসুরোভাবে ঢোল বাজিয়ে কে যেন চিৎকার করে কী যেন বলছে। আমি কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলাম।

একটুক্ষণ শুনে মনে হলো, দূরে কে যেন সেই ঢোলের আওয়াজ করে করে বলছে, লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী মর গ্যয়া। লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী মর গ্যয়া। ভারতকা নয়া প্রধানমন্ত্রী---

আমি রেঞ্জার সাহেবের দিকে তাকালাম। এও আর একটি পাগল নাকি? বনের মধ্যে এরকম অদ্ভুত কথা বলে চ্যাঁচাচ্ছে?

রেঞ্জার সাহেব বললেন, বুঝতে পারছেন না? ও হচ্ছে ঘোষক। গ্রামে গ্রামে খবর দিয়ে যাচ্ছে। খুব বড় কোনো ঘটনা ঘটলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে এই রকমভাবে সব জায়গায় খবর পাঠাবার নিয়ম রয়েছে এখনো।

ব্যাপারটা শুনে আমার খুব মজা লাগলো। গল্পে পড়েছি বটে, আগেকার দিনে রাজার লোক চ্যাঁড়া পিটিয়ে দেশময় রাজার হুকুম জারি করতো। সেই রকম ব্যাপার এখনো চলে?

শান্তা প্রজাপতির পেছনে ছোটা থামিয়ে আমাদের কাছে এসে বসেছিল। সে বললো, কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রী তো মারা গেছেন দেড় মাস আগে। এতদিনে সেই খবর---

রেঞ্জার সাহেব বললেন, এসব জায়গায় খবর আসতে একটু দেরিই হয়। তাছাড়া ঐ ঘোষক ব্যাটা হয়তো ছুটিতে ছিল। সবটাই নিয়ম রক্ষা। এসব খবরে এখানে কার কী আসে-যায়।

এই সময় সেই বৃদ্ধ লোকটি আমাদের পাশ দিয়ে নেমে গিয়ে ডোবাটার কাছে গিয়ে আঁজলা করে জল তুলে খেতে লাগলো।

শান্তা তাই দেখে শিউরে উঠে বললো, ওমা, ওরা এই জল খায়? একেবারে কালো জল, ভীষণ নোংরা।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, তাছাড়া আর জল পাবে কোথায়? একটা ছোট নদী আছে, তাতেও সব সময় জল থাকে না। গরমের সময় এখানে জলের খুব কষ্ট। কুয়োগুলোও শুকিয়ে যায়।

লোকটি উঠে আসবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই তোমার নাম কী?

লোকটির বয়েস আমার চেয়ে অনেক বেশী। আপনি বলে সম্বোধন করা উচিত। কিন্তু গরীব লোকদের আমরা আপনি বলি না।

লোকটি বিড়বিড় করে কী যেন বললো, বুঝলাম না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ওর নাম।

ও যা বললো, তাতে মনে হলো, ওর নাম পিছারু মাঝি। পিছারু? এরকম অদ্ভুত কারুর নাম হয়?

রেঞ্জার সাহেব আমার সমস্যা বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ, সবাই ওকে পিছারু বলেই ডাকে। মানুষটা বেশ ভালো। কক্ষণো কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না।

শান্তা জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোকটা জঙ্গলে এসে ঘাস কাটছে কেন? গরু-ছাগলগুলো এনে এখানে ছেড়ে দিলেই তো হয়!

রেঞ্জার সাহেব বললেন, ওর গরুও নেই, ছাগলও নেই। ঐ ঘাস কেটে কালকের হাটে-হারের হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাবে। ঐটাই ওর জীবিকা। জঙ্গলে গাছ কাটা নিষেধ কিন্তু ঘাস কাটা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট আইন নেই। তাছাড়া শুনেছি, এই ঘাসের এক ধরনের বীজ হয়, ওরা সেগুলো খায়। এই লোকটা বড়ডই গরীব।

এত গরীব হয়েও লোকটির মুখে একটা সুখের হাসি মাখানো থাকে কী করে? আমি ভাবলাম। লোকটির মুখে কোনো ব্যর্থতা বা অভিযোগের চিহ্ন নেই।

হঠাৎ একটা কৌতূহল জাগলো, তাই আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি জানো, লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী মারা গেছেন?

লোকটি অবুঝের মতন রেঞ্জার সাহেবের দিকে তাকালো।

রেঞ্জার সাহেব তাকে স্থানীয় ঠেঁট হিন্দীতে প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিলেন। লোকটি তখন সেই-রকম ভাষাতেই কিছু একটা উত্তর দিল।

রেঞ্জার সাহেব হেসে ফেলে আমাকে বললেন, পিছারু মাঝি বলছে যে লালবাহাদুর শাস্ত্রী কে? অর্থাৎ ও লালবাহাদুরের নামই শোনে নি।

শান্তা বিস্ময়ের শব্দ করলো। আমি অবশ্য তেমন চমকালাম না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নেহরুজীর নাম শুনেছ? পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু?

লোকটি কাচুমাচুভাবে বললো, না সাহেব। আমরা গরীব লোক, আমরা বড় বড় লোকের কথা কিছু জানি না।

—তুমি গান্ধী মহারাজের নাম শুনেছ? মহাত্মা গান্ধী কিংবা গান্ধীজী।

সে বললো, হ্যাঁ, ডালটনগঞ্জে এক সাধু-মহাত্মা থাকেন, সেকথা সে শুনেছে। শনিচরি নামে তার এক প্রতিবেশী গত মাসে সেই মহাত্মাকে দেখেও এসেছে।

আমি বললাম, সেই সা_ মহাত্মা নয়। মহাত্মা গান্ধী। যিনি এই দেশের স্বরাজ এনেছেন?

লোকটি অবাক হয়ে চুপ করে রইলো।

শান্তা বললো, লোকটি কি হাবা নাকি? গান্ধীজীর নাম শোনে নি, এমন লোকও ভারতবর্ষে আছে!

রেঞ্জার সাহেব বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ও হাবা নয়। ওর মতন আরও অনেকেই আছে, যারা দু'বেলা দুটি খাবার যোগাড় করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। খুড়ি, দু'বেলা নয়, একবেলা!

আমি রেঞ্জার সাহেবকে বললাম, ওকে জিজ্ঞেস করুন তো, ও জানে কি না যে দেশটা এখন স্বাধীন?

রেঞ্জার সাহেব দু-তিনবার প্রশ্ন করে যে উত্তর আদায় করলেন, তার মর্ম এই যে, পিছারু মাঝি শুনেছে বটে, লালমুখো সাহেবরা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। এখন আর সেরকম সাহেবরা এখানে শিকার করতে আসে না। তবে সাহেবরা কেন যে আসে না, সেকথা জানে না তো।

আর কিছুই প্রশ্ন করার নেই দেখে লোকটি আমাদের নমস্কার জানিয়ে চলে গেল আস্তে আস্তে।

লোকটিকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা। দেশের অবস্থা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তারপর আমাদের সামনেই একটা ঝোপ থেকে একটা বুনো খরগোশকে বেরিয়ে আসতে দেখে সবাই মিলে তাড়া করলাম সেটাকে। আবার আনন্দ ফিরে এলো। আরও খানিকক্ষণ হৈ চৈ করে কাটলো।

হেমকান্তির স্ত্রী রত্না খুব সুগৃহিণী। জঙ্গলের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করে ক্লান্ত হয়ে হেমকান্তি যেই বললো, বুদ্ধি করে ফ্লাস্কে ভরে একটু চা আনলে হতো, অমনি রত্না বললে, এনেছি!

আমরা রত্নার নামে জয়ধ্বনি দিলাম। শুধু চা নয়, রত্না এনেছে পাঁউরুটি, জ্যাম আর ডিমসেদ্ধ। আমাদের বেশ খাঁটি অর্থে বনভোজন হলো। পাঁউরুটি অনেকটা বেশী ছিল। এক জায়গায় এক ঝাঁক খুব বড় আকারের মিশমিশে কালো রঙের দাঁড়কাক দেখে শান্তা সেই পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগলো তাদের দিকে।

রত্না বললো, ইস, পাঁউরুটিটা নষ্ট না করে ঐ লোকটাকে দিয়ে দিলে হতো।

শান্তা বললো, সেকথা আগে বলিস নি কেন?

রোদ পড়ে এসেছে। জঙ্গলের মধ্যে ঝুপ করে হঠাৎ রাত নেমে আসে। তাই আর দেরি করা উচিত নয়। এবার ফেরা।

সেই পথ ধরে এসে দেখলাম, পিছারু মাঝি তখনও একমনে ঘাস কেটে চলেছে।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, এই মাঝি, এবার বাড়ি যা। রাত হয়ে আসছে, এসময় আর থাকার নিয়ম নেই। এবার ওঠ।

সে সেই রকম হাসিমাখা মুখ তুলে বললো, হাঁ সাব।

আমার হঠাৎ আবার মনে পড়লো, পিছারু কথাটার মানে কী? পিছিয়ে পড়া?

যে-লোকের মুখখানি এরকম প্রসন্ন সুন্দর হাসিতে মাখানো, তাকে কি আমি পিছিয়ে পড়া মানুষ বলতে পারি?

মায়াবিনী মাতাহারি

(২৬৩ পৃষ্ঠার পর)

পুরুষ যে ধরা পড়লো, তার নাম ক্যামবেল ম্যাকলিয়ড।

লোকটার যৌবন অতিক্রান্ত---মাঝ-বয়সী বলা চলে; দিনেমার সেনাবিভাগে সে ক্যাপ্টেনের পদে কাজ করে। তরুণীর সঙ্গে যখন তার দেখা হলো, তখন হল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলোতে সে কর্তব্যরত। প্রচণ্ড মদ্যপ সে, চেহারা দেখলে মনে হবে লোকটা কেবল অকর্মণ্য নয়, নিষ্ঠুরও। কিন্তু কী যে নেশা লেগে গেল তরুণীর চোখে, সে ম্যাকলিয়ডকে বিয়ে ক'রে তার কর্মস্থল জাভায় চলে গেল তার সঙ্গে।

দীর্ঘ ছ'বছর সেখানে কাটিয়ে শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড হল্যাণ্ডে ফিরে এলেন তাঁর শিশু-কন্যাকে নিয়ে। স্বামীর প্রহার ও নানান অসৎ-ব্যবহারে বিরক্ত; বিবাহিত জীবনের এই ক'টা বছর দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেছে তাঁর অত্যাচার ও উৎপীড়নে। তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে এসেছেন--বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে ডাইভোর্স করতে দৃঢ়সংকল্প তিনি। তাঁর ডাইভোর্সের সংকল্পে বিচলিত হলেন তাঁর সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজনেরা। তাঁরা তাঁকে তাঁর স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার জন্যে নানা ধরনের অনুরোধ, উপরোধ ও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড থাকতে চান না কিছুতেই; শেষ পর্যন্ত তিনি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন হলেন। তারপর বাইরের সঙ্গে মেলামেশা কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখলেন।

ডাইভোর্স পাবার চার বছর পর মাগারিডা জনসমক্ষে অবতীর্ণা হলেন 'মাতাহারি' নাম নিয়ে---জাভার নৃত্যে পারদর্শিনী হয়ে। এই সময় থেকে তাঁর জাতীয়তা, পিতামাতা, শিশু-সন্তান ও স্বামীর কথা বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিলেন তিনি। মাতাহারি নিজেকে আধা-জাভাদেশীয়া প্রাচ্য নৃত্যশিল্পী বলে পরিচয় দিতেন। জাভার গোপন মন্দির-নৃত্যে পটীয়সী ছিলেন তিনি। প্রথম দিন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েই তিনি ঐ আত্মপরিচয় ঘোষণা করলেন দর্শকদের সামনে এবং আরও বললেন---ইউরোপীয় দর্শকমণ্ডলীর সামনে তিনিই প্রথম এই পবিত্র নৃত্যকলা প্রদর্শন করছেন।

ইউরোপীয় দর্শকবৃন্দ এর আগে এমন চিত্তাকর্ষক অভিনব নাচ সত্যিই দেখেনি। তাঁর ঐ রকম অদ্ভুত নাচ, মঞ্চের পটভূমিতে একটা বিচিত্র রহস্যময়তা (যা নর্তকীর নিজস্ব পরিকল্পনা মতো সৃষ্টি করা হয়েছিল), তাঁর জাদুকরী চোখ ও তাঁর দৃষ্টি নৃত্যের তালে তালে দর্শকচিত্তকে উদ্বেল করে তুলছিল---প্রথম দিনেই বিরাট সাফল্য ঘটেছিল। রাতারাতি মাতাহারির নাম মুখে মুখে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল---অসামান্যা নর্তকী, কুহকিনী নর্তকী ও রূপসী নর্তকী হিসাবে! অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর গুণগ্রাহীদের তালিকায় দেখা গেল সম্ভ্রান্ত ধনী এবং সমাজের প্রভাবশালী ও গণ্যমান্যরা ছাড়া রয়েছেন একজন ক্রাউন প্রিন্স, একজন ডিউক এবং এক প্রধানমন্ত্রী। মূল্যবান অলঙ্কার, পোশাক, আসাবাবপত্র প্রভৃতি উপঢৌকন এবং টাকার তোড়া উপহার তাঁদের কাছ থেকে আসছে তো আসছেই--খুশী ও তৃপ্তির সীমা নেই মাতাহারির। তাঁর প্রতি মুগ্ধ এইসব প্রিয়-পাত্ররা রূপের মোহে এবং সরাবের নেশার ঝোঁকে তাঁর কানে দিয়ে যেতেন দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক অতি গোপন তথ্যও অধিকন্তু উপহার হিসাবে। এইভাবে অযাচিত গুপ্ত-বার্তায় সম্পন্ন হতে হতে তাঁর চোখের সামনে অধিকতর অর্থ উপার্জনের আর একটা নতন

আর এক বিস্ময়

শিল্পীতীর্থ

প্রযোজিত

শক্তিপদ রাজগুরু রচিত

মেঘে ঢাকা তারা

নাটক ও নির্দেশনা
জ্ঞানেশ মুখার্জী
সুর : শ্রীঅভিজিৎ

—ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ—

জ্যোৎস্না দত্ত গুরুদাস ধাড়া

অসীমকুমার, রঞ্জিত সরকার, তারক দাস, প্রসেনজিৎ

মধুছন্দা

রিন্তা সরকার সীমা বোস

শান্তনু ঘোষ

৩৩৩বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-০৫৭১/৫৪১৬৩৭

পথ খুলে গেল---গোপন তথ্য উচ্চমূল্যে বিক্রি করার পথ।

জার্মানীর গুপ্তচর বিভাগ যখন তাঁকে আবিষ্কার করলো এবং তাঁর সম্বন্ধে সব কথা জানতে পারলো তখন তাঁকে কাজে লাগাবার ঠিক করলো---তাঁর সাহায্যে তাঁর পরিচিতদের কাছ থেকে গুপ্ত খবর উদ্ধার করা। মাতাহারি অবশ্য নিজে কখনো কোথাও একথা স্বীকার করেন নি যে তিনি জার্মানীর গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ফ্রান্স ও বৃটেনের গুপ্তবার্তা সংগ্রহ ও সরবরাহ বিভাগের বিশারদরা তাঁকে সন্দেহ করেছিলেন এবং তাঁর পিছনে তাঁদের বিশ্বস্ত চরদের লাগিয়েছিলেন।

তারপর থেকে মাতাহারি যেখানেই নৃত্যের প্রদর্শনী করতেন দলবল নিয়ে, সেখানেই রঙ্গালয়ের দর্শকদের মধ্যে থাকতো গুপ্তচর। লটবহর, পরিচারক-পরিচারিকা, সহকারী নর্তক-নর্তকী এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা গুণমুগ্ধদের নিয়ে তিনি যখনই এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতেন, তাঁর ট্রেনে যেতো গোয়েন্দারা। তারা সব সময় লক্ষ্য রাখতো তাদের জানা কোনো জার্মান গুপ্তচর মাতাহারির সঙ্গে দেখা করলেন কি না, বা কোনো জার্মান সেনাপতি বা পদস্থ অন্য সামরিক কর্মচারী তাঁর কাছে এসেছিলেন কি না। সাধারণত মাতাহারি জার্মান গুপ্তচর ও সেনাপতি বা অন্য সামরিক অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতেন নিরপেক্ষ দেশে। শেষ পর্যন্ত একদিন ফরাসী ও ইংরেজ উভয় অফিসারই মাতাহারিকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, "আপনি গুপ্তচর---জার্মানীর গোয়েন্দাগিরি করছেন আপনি?"

অকস্মাৎ এ রকম প্রশ্নে বিচলিত না হয়ে উল্টে সতেজে মাতাহারি বললেন, "মোটেই নয়, এই যুদ্ধের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই--কি বলছেন আপনারা? আমি নিরপেক্ষ। অবিশ্যি এটা সত্যি যে জার্মানীর গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মীরা আমার কাছে আসেন, আমায় উপহার দেন, টাকাও দেন প্রচুর---তাঁদের চরের কাজ করবার জন্য নয়--আমার সঙ্গ, সাহচর্য ও আলাপনের দর্শনী হিসাবেই তাঁরা দেন। তাঁরা আমার গুণমুগ্ধ---তাই।"

প্রশ্নকর্তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন না, আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি নিজেকে নিরপেক্ষ বলছেন তো। কিন্তু আপনি তো জার্মানীতে বাস করেছেন, আপনি কি চান না জার্মানী যুদ্ধে জয়লাভ করুক?"

তাঁদের প্রশ্ন শুনে তাঁর জাদুকরী আঁখি দুটির চিত্তহরা দৃষ্টি তাঁদের উপর বুলিয়ে দিয়ে বললেন মাতাহারি, "মোটেই না, মোটেই না, মোটেই না। আমার সহানুভূতি আপনাদের প্রতি, মিত্রপক্ষের প্রতি, যাঁরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আমি জার্মানীর বিপক্ষে, আপনাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে আমার কথা প্রমাণ করে দেবো।"

মিত্রপক্ষের অফিসাররা তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন বা রাজী হবার ভান করলেন। তাঁরা মাতাহারিকে তাঁদের পক্ষীয় কয়েকজন গুপ্তচরের নাম দিলেন--জার্মানীতে তারা কাজ করে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সরবরাহ করবার জন্যে। কয়েকদিন পরেই সেই গুপ্তচরদের একজন জার্মান পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। এতে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে মাতাহারি সেই লোকটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাঁর নিজের দলের চরদের জানিয়ে দেওয়ার ফলেই বেচারা ধরা পড়লো।

শেষ পর্যন্ত মাতাহারির বন্ধু গুপ্তচররাও তাঁকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। স্পষ্টতঃ তাদের প্রত্যেকের ধারণা হয়েছিল যে, মাতাহারি যখনই কোনো গোপন তথ্য আবিষ্কার করেন তখুনি সেটা তিনি বিক্রি করেন---যার কাছ থেকে সর্বোচ্চ মূল্য পেতেন তাকে---নীলামে তোলার মতো একটা ব্যাপার করেন তিনি। তাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হলেও তাঁর গুণমুগ্ধদের মধ্যে এতো প্রভাবশালী সব লোক ছিলেন যে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করতো না। তারা বেশ ভালো রকম জানতো যে তিনি নিজেকে বাঁচাবার বা উদ্ধার করবার জন্যে দরকার হলে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের, এমন কি, রাজাকেও টেনে আনতে পারেন। কিন্তু তারাও তাঁকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তাঁকে ধরবার ফাঁদ পাতলো।

এক জার্মান সামরিক অফিসার স্পেন থেকে বেতারে ইঙ্গিতবার্তা পাঠালেন মাতাহারিকে। সেই বার্তার পাঠ উদ্ধার করে তিনি জানতে পারলেন--স্পেনে তিনি যে-সকল দৌত্য সম্পন্ন করেছেন, কয়েকদিন আগে তার পারিশ্রমিক নেবার জন্যে তাঁকে প্যারিসে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে--সেখানে তাঁকে টাকা দেওয়া হবে। টাকার প্রতি লালসা তাঁর ভয়ানক। বার্তা পাঠমাত্রই যাত্রা করলেন মাতাহারি।

প্যারিসের নির্দিষ্ট জায়গায় মাতাহারির সঙ্গে দেখা হবি তো হ' ফরাসী অফিসারদের। এ ব্যাপারেও ছিল জার্মানীর চক্রান্ত। জার্মানীর সন্দেহপরায়ণ অফিসাররা সরাসরি তাঁকে গ্রেপ্তার করবার সূত্র খুঁজে না পেয়ে, ফরাসী অফিসারদের হাতে তাঁকে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বেতারে ইঙ্গিতবার্তা এমনভাবে পাঠানো হয়েছিল যেটা ফরাসী কর্তৃপক্ষ আগেই পেয়ে গিয়ে তৈরি থাকেন। হয়েছিলও তাই---ইঙ্গিত ভাষায় বেতারবার্তা পাবামাত্র ফ্রান্সের গুপ্তচর বিভাগ দ্রুত তার পাঠ উদ্ধার করে নর্তকীর আগমনের অপেক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা উপস্থিত। তাঁরা মাতাহারিকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করলেন --সামরিক আদালতে বিচারের জন্যে।

তাঁর বিচারও হয়ে গেল তড়িক-ঘড়িক। ফরাসী সামরিক আদালত মাতাহারির পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে একজন উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। উকিল ভদ্রলোকের স্পষ্টত বিশ্বাস হয়েছিল তাঁকে নির্দোষ বলে---কিন্তু কেউই তাঁর যুক্তি সমর্থন করলেন না। আদালত মাতাহারিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁকে গুলী ক'রে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

এই আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের সময়েও তাঁর সম্পর্কে একটা রূপকথার মতো জনশ্রুতি প্রচলিত। তাঁর এক গুণমুগ্ধ তরুণ প্রণয়ী চেষ্টা করেছিল ফায়ারিং স্কোয়াডের পুরো দলটাকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে বশীভূত করতে। প্রণয়ীটি দলের সকলকে তার সংকল্প মতো দিয়েছিল এবং তাদের কথাবার্তায় তার বিশ্বাস হলো যে তারা তার অনুরোধমতোই কাজ করবে। জেলে গিয়ে মাতাহারির সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে বললে, যে রাইফেলগুলো নিয়ে তাঁর দিকে টিপ করবে সেগুলোতে থাকবে ফাঁকা কার্টিজ। তারপর তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে---সে সব তৈরী।

কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরের সেই ভয়ঙ্কর প্রভাতে যারা মাতাহারিকে দেখেছিল তাদের কেউ ঐ কাহিনী বিশ্বাস করেনি। মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে-থাকা মাতাহারিকে দেখে মনেই হয়নি যে তিনি শেষ মুহূর্তে উদ্ধারের আশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর মুখে গভীর প্রশান্ত ভাব, তার অন্তরালে যেন রয়েছে দৃঢ় সাহসিকতার দীপ্তি---কোনো বিষয়ে আশা বা আসক্তির বিন্দুমাত্র আভাস নেই তাঁর চোখে। তাঁর সেই স্থির অবিচল নির্বিকার মূর্তি দেখলে মনে হয় তিনি নিশ্চিত যে তাঁর অসাধারণ চমকপ্রদ কর্মজীবন শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর কোনো প্রভাবশালী বন্ধুই তাঁকে বাঁচাতে পারবে না।

মৃত্যুবরণ করবার পূর্বে মাতাহারি তাঁর দীর্ঘকাল আগে ছেড়ে-আসা কন্যাকে একটা চিঠি লিখেছেন। মেয়ের বয়স তখন সতের, বাটাভিয়ায় তার আত্মীয়দের কাছে থাকে সে।

একটা ছোট্ট চিঠি:

আদরিণী কন্যা আমার,

তোকে অনেক কিছু লেখবার ছিল, কিন্তু অতি অল্পই লিখতে পারছি। আমার দিন

৮৪-র অবিস্মরণীয় তিন চমক

পৃষ্ঠপোষক
বিশ্বনাথ অধিকারী

সুর
তরুণ মুখোপাধ্যায়

সুর
প্রশান্ত ভট্টাচার্য

সুর
বৈদ্যনাথ সরকার

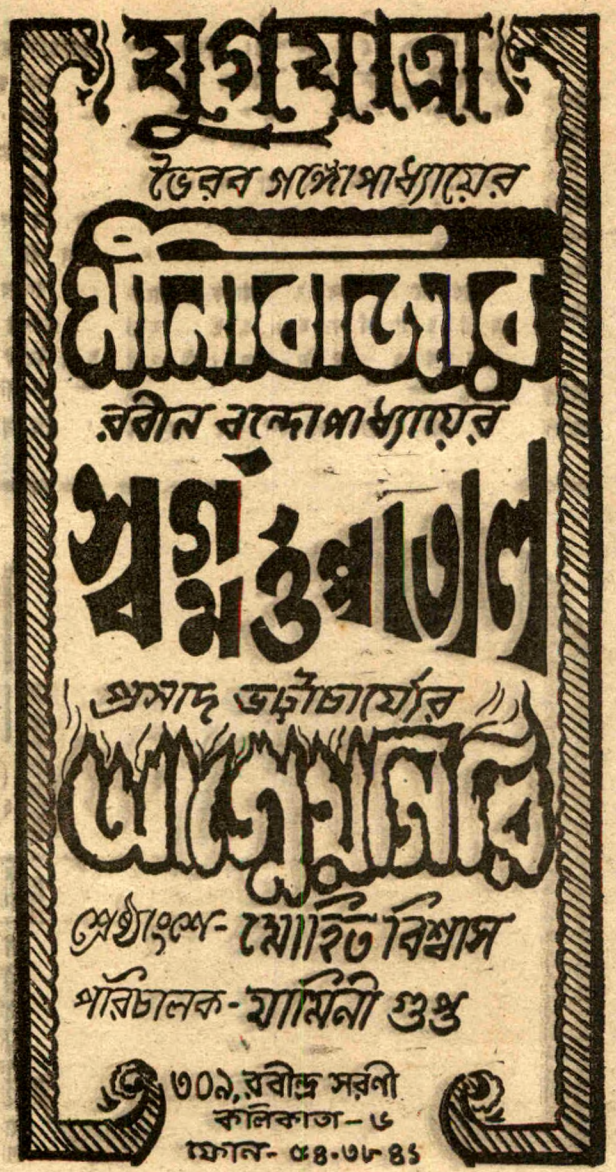

---: সঙ্গে থাকছেন :---

সুনীলেশ ভট্টাচার্য
যুগল সরকার
অবনী চন্দ
গোপাল দে
অমর রায়চৌধুরী
রঞ্জিত ব্যানার্জী
সত্যেন দে
রঞ্জিত চক্রবর্তী
ধীরেন ঘোষ
শ্যামল মুখার্জী
কাজল দাস
সোমা দেবনাথ
যশোদা চক্রবর্তী
অরুণা গোস্বামী
বেলা ব্যানার্জী
কুমারী শেফালী
মঞ্জুশ্রী সেন
মঞ্জুশ্রী বোস

সঙ্গীতে
গোষ্ঠদাস বাউল

নৃত্য পরিচালনায়
চিত্র শঙ্কর

ম্যানেজার
কালী ব্যানার্জী

সহঃ ম্যানেজার
বিশ্বনাথ মুখার্জী ও লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী

অফিস ইনচার্জ
সঞ্জয় সামন্ত

ফুরিয়ে এসেছে---দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসছে শেষ মুহূর্ত। এখন ভোর চারটে, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমি মৃতের তালিকায় চলে যাবো--কখনো তোকে দেখবার সুযোগ আর হবে না। তোকে যখন ছেড়ে আসি তখন তুই ছিলি শিশু। আমায় বিশ্বাস করিস---আমি অন্যায় কিছু করিনি, কিন্তু নিরপরাধ হলেও যুদ্ধের সময় নিষ্ঠুর অন্ধ সামরিক আইন এড়ানো যায় না। আমার জন্যে কারো করুণা আছে বা আমার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধুরা এখন আমায় সাহায্য করতে পারেন---এ বিশ্বাস আমার নেই। ইত্যাদি - - - -

আরো কিছু লেখবার পর চিঠিখানা শেষ করেছেন এইভাবে---"কন্যা আমার, বিদায়। জীবনে তোমার সুখ খুঁজে নিও, আমাকে ঘৃণা না করেও তুমি সুখ খুঁজে পাবে।" চিঠিটাতে স্বাক্ষর করেছেন--ইতি তোমার মা, মার্গারিডা গারটুড জিলি ম্যাকলিয়ড।

তাঁর কুমারী নাম ছিল----মার্গারিডা গারটুড জিলি।

চিঠি লেখা শেষ করবার কয়েক মিনিট পরেই প্রহরী তাঁর কক্ষের সামনে হাজির তাঁকে বধ্যভূমি অর্থাৎ পাঁচিল-ঘেরা কারাপ্রাঙ্গণে নিয়ে যাবার জন্যে। সে সময় তাঁর সঙ্গে যে নান্ ছিলেন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। শ্রীমতী ম্যাকলিয়ডই তাঁকে শান্ত করলেন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, কথা কয়ে।

ইউরোপ মহাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই নারী--যারা কোনদিন এঁকে সশরীরে দেখেনি, তারাও পানের আসরে মিলিতভাবে স্বাস্থ্য কামনা না করে সুরা পান করতো না। তিনি যে বাস্তবিক এক অদ্ভুত নাটকীয় চরিত্রের বীর রমণী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও। ঘাতক-দলের সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মাতাহারি, চোখে কাপড় বাঁধতে দিলেন না। ঘাতক-দল যখন সারিবদ্ধভাবে রাইফেল তাঁর দিকে টিপ করে দাঁড়ালো তিনি তখন নাচের এক ভঙ্গিমায় স্থির, মর্মরমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন।

মাতাহারি যে সুদক্ষ গুপ্তচর ছিলেন এ-সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ করে থাকেন। তাঁকে দেখবার সুযোগ যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের মতে তিনি সুন্দরীও বিশেষ ছিলেন না। কেউ কেউ বলেন, মাতাহারির নৃত্যকলাও আদৌ প্রাচ্য নয়, প্রাচ্য নৃত্যের কষ্টকল্প ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের ছিটেফোঁটাও ছিল না। ছিল না কোনো দেশের প্রতি আনুগত্য। তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও অর্থলালসা দেখে এ-ধারণাও অনেকের হয়েছিল তিনি যে-কোনো মূল্যে নিজেকে বিক্রি করতে প্রস্তুত। তাঁর চারিদিকে এত রকমের সন্দেহের কুহেলী থাকলেও তাঁর শেষ মুহূর্তের সাহসিকতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। এখানে সকলে একমত, একবাক্যে সকলেই সে-কথা স্বীকার করেন।

তখনও চারিদিকে ভোরের নিস্তব্ধতা। বধ্যভূমি কঠিন বরফের মত স্তব্ধ শীতল।

সেই স্তব্ধতা ভেদ করে আওয়াজ হলো ---"ফায়ার।"

বারোটা রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠলো।

মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো মাতাহারির প্রাণহীন দেহ। বহু ষড়যন্ত্র ও গোয়েন্দাগিরির রহস্যময়ী নায়িকা---আজও রূপকথায় ঘেরা সেই মাতাহারি।

এখনও বহুলোকের কল্পলোকে উদ্ভাসিত করে বিরাজ করছেন মাতাহারি---'উষার আঁখি'। যতদিন পৃথিবীতে কাহিনীর প্রচলন থাকবে---ততদিন মাতাহারি অমর।

নির্মল, সুশীল, বসন্ত, মণীন্দ্রনাথ, শংকর, কার্তিক, কানু, বীরেন, মুক্তি, শৈলেন, হরেকৃষ্ণ (বাউল), রামকৃষ্ণ, কেষ্ট, ধীরেন, সুভাষ, সুপ্রিয়, অনল, রূপক, রবীন, দিলীপ হালদার, সুষমা, মেনকা 'চন্দ্রলেখা, মীনা, গীতা।

দু' নৌকোয় পরাশর বর্মা

(৩৯ পৃষ্ঠার পর)

এবার হেসেই বলেছে,—পরোপকার না করতে পারলে যাদের ভাত হজম হয় না তারা ছাড়বে কেন আপনাকে। আপনি অতি আদেশবাদী ছেলে, সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রমের রোজগার ছাড়া পৈতৃক বা কোন রকম উত্তরাধিকারের এক কপর্দক নিয়ে জীবিকা নির্বাহ অন্যায় মনে করেন। মাকে নিয়ে আপনি পুরীতে এসেছেন, তার জন্যে একটু ভালো হোটেলে আপনাকে উঠতেও হয়েছে, কিন্তু আপনি আপনার সাধারণ রোজগারের টাকাতেই এখানে নিজের খরচ চালান। আপনার নিজের নামে মাঝে মাঝে সামান্য টাকার মানি অর্ডারই তাই পাঠানোর ব্যবস্থা আপনার করা আছে।

আপনার এই অটল আদর্শবাদে আপনার মা পড়েছেন দারুণ সমস্যায়। আপনি সত্যিই খুব অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। আপনি নিজের পৈতৃক সম্পত্তির কিছুই ছোবেন না। বিয়ে-থাও এখনো করতে চান না। আপনাকে অনেক বোঝাবার-সোঝাবার চেষ্টা করে আপনার মা শেষকালে হতাশ হয়ে সোনাদানা ইত্যাদি সব কিছু অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর গুরুর আশ্রমে দান করবেন ঠিক করে এখানে এসেছেন।

এতেও কিন্তু আপনার আপত্তি। আশ্রমে-টাশ্রমে ধর্মের নামে এ রকম দানের আপনি একেবারে বিরোধী। আপনি মাকে এসব টাকা অনাথাশ্রম বা কোনো শিক্ষায়তনে দান করতে চান। এখানে এসেও তাই আপনি আপনার মাকে ইচ্ছে করে মা-দর-টান্দরে নিয়ে যান না। মা'র সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আপনার মাঝে মাঝে খুব তর্কাতর্কি হয়। বুবু তাই শুনেই আপনি মাকে বকাবকি করেন বলে ধরে নিয়েছে।

মিঃ রাহার মত ধান্দাবাজদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আপনাদের মত শিকারের খোঁজ সব সময়ে রাখতে হয়। আপনার পরিবারের এই একটু অদ্ভুত রকমের সমস্যা নিয়ে কলকাতার বনেদী মহলে কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। মিঃ রাহাও তাই থেকে হদিস পেয়ে এখানে এসে ফাঁদ পেতে বসেছেন। সঙ্গে যাকে এনেছেন সেই মনোরমা দেবী তাঁর আসল নয়, ভাড়াটে স্ত্রী। তাঁকে দিয়ে প্রথমে আপনাকে কাবু করবার মতলব সিদ্ধ না হলেও আসল উদ্দেশ্য ঠিকই থেকেছে। সেটা হ'ল মনোরমা দেবীকে দিয়ে আপনার মা'র সঙ্গে ভাব জমিয়ে কোনো এক সময়ে আপনাদের খাবারে মিঃ রাহার স্পেশাল বিষ মিশিয়ে দেওয়া। এ বিষের স্বাদ-গন্ধ কিছু নেই কিন্তু প্রথমে কেঁশ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নিকেশ করে দেয়।

মনোরমা দেবীর এর আগে ছোট-খাটো অপরাধ-টপরাধে হাতেখড়ি হয়ে থাকলেও মোটা টাকার প্রলোভনেও শেষ পর্যন্ত এ কাজের জন্যে নিজেকে তৈরী করতে পারেন নি। বুবুকে ছ' নম্বর স্টোর রুমে বন্দী করার পরই মিঃ রাহার প্রতিশোধ কি ভয়ঙ্কর তা জেনেও আমাকে একটি চিঠিতে সব জানিয়ে আর স্টোর রুমের নতুন তালার চাবিটা তার সঙ্গে দিয়ে তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন এখান থেকে। এখানকার পুলিশের চোখ তিনি অবশ্য এড়াতে পারেন নি। তবে শ্রীযুক্ত মহাপাত্র আর আমার পরামর্শে তাঁর গন্তব্যটা শুধু জেনে রেখে তাঁকে কোথাও বাধা দেওয়া হয়নি।

বুবুর অদম্য ছেলেমানুষী কৌতূহলই তার মিঃ রাহার কোপে পড়ার কারণ। মিঃ রাহা যে ওপরের লেটার বক্সের চিঠি সুবিধে পেলেই লুকিয়ে দেখেন বুবু তা আগে লক্ষ্য করেছে। মিঃ রাহার এ অভ্যাসের কথা জেনেই অবশ্য আমি আমার বন্ধু কৃত্তিবাসকে পোস্টকার্ডে একটা বেয়াড়া অদ্ভুত চিঠি লিখেছিলাম। মিঃ রাহা সেটা যথারীতি দেখে একটু বেশী অস্থির হবেন এই উদ্দেশ্যেই আমার ছিল। সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে।

মিঃ রাহাকে বুবু শুধু লুকিয়ে পোস্ট-বক্সের চিঠি হাটকাতেই দেখেনি, তাঁদের কামরায় উঁকি দিয়ে মিঃ রাহাকে সাদা গোঁফ মুখে লাগাতেও দেখে ফেলেছে। সেই দেখার পরই আরো মজার ব্যাপার দেখাবার লোভ দেখিয়ে মিঃ রাহা তাকে পাশের স্টোর রুমে নিয়ে যান। ওই বুবু এসে পড়েছে, স্টোর রুমে মিঃ রাহা কি করেন ওর মুখেই শুনুন।

হোটেলের ম্যানেজার তখন বুবুকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছেন। সেই দুপুর থেকে এত রাত পর্যন্ত স্টোর রুমে বন্ধ থাকার জন্যে বুবুর প্রাণের স্ফূর্তির কিছু ইতর বিশেষ হয়েছে বলে বোঝা গেল না। ম্যানেজারবাবুর কাছেই শোনা গেল বুবুর সামনে বেশ কিছু খাবার-দাবারের পাত্র সেখানে সাজানো দেখা গেছে। ছেলেটাকে তখনই মুক্ত করতে সাহস না করলেও মনোরমা দেবীই তার জন্যে এ ব্যবস্থা যে করে গেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বুবু আমাদের কাছে এসে মিঃ রাহাকে দেখেই তখন কিন্তু উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠেছে,—ওই বুড়োটা খুব খারাপ—খুব খারাপ লোক! আমায় নতুন মজা দেখাব বলে পাশের বন্ধ ঘরটায় নিয়ে গিয়ে আচমকা মুখের ওপর কিসের গন্ধওয়ালা একটা রুমাল চেপে ধরেছে। তারপর কতক্ষণ আমার আর কোনো জ্ঞানই ছিল না।

মশারি

ফোন ঃ ৩৩ ০৩৫৩

রাজলক্ষ্মী ষ্টোর

২২৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭

(মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির পাশে)

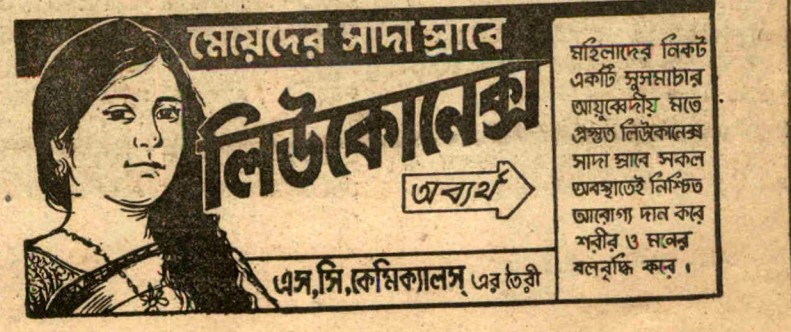

হ্যাঁ—পরাশর এবার বলেছে, বুবুকে ঐ ভাবে অজ্ঞান করে ফেলে দরজায় তালা দিয়ে রাখবার পর মনোরমা দেবীর ওপর মিঃ রাহার আদেশ ছিল সুযোগ বুঝে খানিক বাদেই তালা খুলে ও ঘরে গিয়ে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে বুবুকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার। মনোরমা দেবী কিন্তু তখনই কি করবেন ঠিক করে ফেলেছেন। ছোট একটি চিঠিতে আমায় সব জানিয়ে স্টোর রুমের নতুন চাবির সঙ্গে একটি খামে ভরে আমার নাম আর কামরার নম্বর দিয়ে তিনি ওপরের লেটার বক্সে ফেলে চলে গেছেন।

হোটেলের সমস্ত গোলমালের মধ্যে মনোরমা দেবীর ওপরে আমার নজর ছিল বলে তিনি ফেলে যাবার পরই চিঠিটা উদ্ধার করে আমি মিঃ রাহার জন্যে এই অভ্যর্থনার ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত মহাপাত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলেছি।

আচ্ছা! মিঃ রাহার ভার এখন শ্রীমহাপাত্রই নিয়েছেন। এ হোটেলের আর এক রহস্যভেদের জন্যে আমার এখুনি একটু বেরুন দরকার। মিঃ রাহার ডাকা সাইকেল রিক্সাটা তার জন্যে আমি ধরেই রেখেছি। এসো কৃত্তিবাস! আটটা বেজে গেছে।

* * *

বেশ একটু বিমূঢ়ভাবে পরাশরের সঙ্গে সাইকেল রিক্সায় চড়ে যেতে যেতে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?

কোথায় আবার, স্টেশনে।

স্টেশনে?—আমার বিস্ময় মিশানো জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পরাশর না দেওয়ায় এখন স্টেশনে হঠাৎ কেন, কি বৃত্তান্ত তাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা বুঝে নিজের অন্য প্রশ্নটাই তাকে জানালাম।

বললাম,—আচ্ছা, তুমি ত' হোটেলে আমাদের হাতায় সব কামরার বোর্ডারদের সম্বন্ধেই সন্দেহের ব্যাপার অনেক কিছু বার করে আমায় শুনিয়েছ। আমাদের এক নম্বরের ওই তিন ছোকরার আসল রহস্যটা কি এবার বলো ত'? ওরাও কি হোটেলের এসব ব্যাপারে জড়িত?

জড়িত!—পরাশর হেসে বললে,—তুমি কিংবা এই রিক্সাওয়ালা যতটা জড়িত ওরাও তাই।

তার মানে?—কিছুই না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—কে ওরা? ওদের রহস্যটা তা হলে কি?

বিলাসম শব্দটা কোথাও শুনেছ বলে মনে পড়ছে?—পরাশর ধাঁধাটা সম্পূর্ণ না ভেঙে বললে,—ওরা হ'ল সেই বিলাসম। ওদের রহস্যটাও তাই। তবে বিলাসম এখন বিলাপম হয়েই দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াও! দাঁড়াও!—আমার মাথায় বিদ্যুতের চমকের মত রহস্যটা তখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠায় বললাম,—বিলাসম ত' সেই ছোট পর্বত অভিযাত্রী দলের নাম। দু-চারটে দুর্গম হিমালয় অভিযানে গিয়ে যারা নাম করেছে।

হ্যাঁ,—পরাশর এবার বিস্মিত হ'ল। প্রত্যেকের পদবীর আদ্যাক্ষর নিয়ে ওদের এই বিলাসম দল। বিশ্বাসের বি, লাহিড়ীর লা, সরকারের স আর মজুমদারের ম। দুঃখের কথা এই যে ওদের মধ্যে সরকার হঠাৎ নিজেদের পণ না রাখতে পেরে বড় মানুষের মেয়ে বিয়ে করে দল ছাড়া হয়ে গেছে। লাহিড়ী, বিশ্বাস আর মজুমদার তাই একটু মজা করে সরকারকে জব্দ আর সেই সঙ্গে তার ঘাড় ভেঙে পুরী বেড়ানটা সারবার জন্যে ধারধোর করে ব্যবস্থা করে এই বড় হোটেলে এসে উঠেছে। সরকার বৌকে নিয়ে হনিমুন করতে এই হোটেলেই আসবে বলে ওরা জেনেছিল। সরকার কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসে নি। এদিকে এদের পকেট এখন ফাঁক। কোন রকমে বাইরের যেখানে-সেখানে সস্তায় খাওয়া-দাওয়া সেরেও হোটেলের সব বিল মেটাবার ক্ষমতা আর নেই। ওরা তাই ব্যাকুল হয়ে অন্য সব বড় হোটেলে সরকার সস্ত্রীক এসেছে কি না খোঁজ করে বেড়িয়েছে ক'দিন।

বেচারাদের অবস্থা দেখে আজ তাদের কিছু তাদের পরের পার্বত্য অভিযানের সাহায্য হিসেবে দিয়েছি। স্বীকার করলে পরাশর। তারা হোটেলের বিল-টিল চুকিয়ে বিকেলেই দেশে ফেরবার জন্যে রওনা হয়ে গিয়েছে স্টেশনে।

তাহলে এখন আমরা স্টেশনে যাচ্ছি কেন?—জিজ্ঞাসা করলাম।

বাঃ আমাদের হোটেলের অত বড় একটা দুর্ঘটনার রহস্য ভেদ করার দরকার নেই—পরাশর আমার নির্লিপ্ততায় যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে,—মল্লিক পরিবারের ছবি মেয়েটির আত্মহত্যার ব্যাপারের একটা মীমাংসা ত' করতে হবে!

সে মীমাংসার জন্যে স্টেশনে যাচ্ছি আমরা!—হতভম্ব হয়ে পরাশরের দিকে চাইলাম।

দেখাই যাক না। পরাশর গম্ভীরভাবে বললে,—কোথাকার মীমাংসা কোথায় হয় কে বলতে পারে!

মীমাংসাই হ'ল বটে, কিন্তু অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত, একেবারে সৃষ্টিছাড়া মীমাংসা বলা যেতে পারে।

স্টেশনে যখন গিয়ে পৌঁছোলাম তখন সেখানকার প্ল্যাটফর্মে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে।

পরাশর আমায় টানতে টানতে সেখানে নিয়ে যাবার সময় দু-একবার বাধা দিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম,—আরে কেন মিছে ছুটে মরছ', ওটা কলকাতার ট্রেন নয়, সাড়ে আটটার একটা অন্য প্যাসেঞ্জার, আসানসোল যায় মধুপুর হয়ে।

তাই নাকি? পরাশর থেমে গিয়ে বললে,—আর গিয়েও লাভ নেই। ট্রেন ছেড়েও দিয়েছে।

সেই ধীরে ধীরে বেগ বাড়ানো চলন্ত ট্রেনেই পরাশরকে হঠাৎ হাত নেড়ে কাকে শুভ বিদায় জানাতে দেখে সেদিকে লক্ষ্য করে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

আরে, কাদের তুমি হাত নাড়াচ্ছ! অস্থির উত্তেজনার সঙ্গে বললাম,—ওরা ত' সমর আর ছবি এই ট্রেনের একটা কামরায় উঠে পালাচ্ছে।

তাই নাকি!—পরাশর যেন আকাশ থেকে পড়ল,—ঠিক দেখতে পাইনি তাহলে।

দেখতে খুবই পেয়েছ,—বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললাম,—কিন্তু ওদের অত খুশি হয়ে শুভযাত্রা জানাবার মানেটা কি বলতে পারো!

খুশি হয়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাব না ত' কি ওদের ধরে রেখে মল্লিক পরিবারে সত্যিকার একটা সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লাগাব?—পরাশর হেসে বললে,—এমনিতেই দু-ভাইয়ের ত' প্রায় খুনোখুনির সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামরতন মল্লিক মশাই ছবি মেয়েটিকে খুব ছোটবেলায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজের মেয়ের মত পালন করেছেন। কিন্তু ছবি ত' সত্যি তার নিজের মেয়ে নয়! একটু বড় হবার পর থেকে সমর আর সমীর দুজনেই তার প্রেমে হাবুডুবু। ছবি তার মনটা অবশ্য সমীরকেই দিয়েছে। মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছে অতি গোপনে। বাইরে কাউকে জানাবার উপায় নেই। সেদিন মন্দিরে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও ওদের সাজানো, একটু দুজনে মিলে একসঙ্গে থাকার সুযোগের জন্যে। সেই সময়েই পালিয়ে যাওয়ার এই প্ল্যানটি ওরা পেতেছে। ছবি নিজের হাতে আত্মহত্যার স্বীকার পত্র লিখে আর তার একটা শাড়ি সমুদ্রের ঢেউ-এ এক সময়ে গোপনে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করে বুদ্ধিটা তার খাটিয়েছে ভালোই। এত কাণ্ডের পর ওদের এমন করে চলে যাওয়ার সাহসে শুভ কামনা জানানোই উচিত নয় কি?

অবাক হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললাম,—তার মানে তুমি একসঙ্গে দু-নৌকোতেই থাকো। অপরাধীদের শত্রু হয়েও যেমন তেমনি তাদের বন্ধু হয়েও।

পরাশর যেন না শোনার ভান করে অন্য দিকে স্টেশনের একটা বিজ্ঞাপনের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

বাসী রামায়ণ : ১০-০০ টাকা
সীদাসের রামায়ণ : ৩-০০ "
নিষদ গ্রন্থাবলী : ৪-০০ "
শষিক দর্শন : ৩-০০ ,,
নির্বাণতন্ত্রম্ : ১৫-০০ ,,
বেদ : ২-০০ ,,
তসার : ২-০০ ,,
নসোল্লাস : ২-০০ ,,
রণ-প্রমেয়-সংগ্রহ : ৪-০০ ,,
ন্দোগ্য - উপনিষদ : ১০-০০ ,,
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ : ২-৫০ পঃ
ক্রিয়াকাণ্ড - বারিধি : ১০-০০ টাঃ
কবচমালা : ১০-০০ ,,
শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ : ৩-০০ ,,
হিন্দুধর্ম পরিচয় : ৩-০০ ,,
জ্ঞানুসন্ধান : ২-৫০ পঃ
কৃষ্ণ : ২০-০০ টাঃ
যোগ প্রদীপিকা : ৩-০০ ,,
রশচরণ রসোল্লাস : ৩-০০ ,,
াগী যাজ্ঞবল্কাম্ : ২-০০ ,,
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ : ৬-০০ ,,
শ্রীচৈতন্য ভাগবত : ৬-০০ ,,
ব গ্রন্থাবলী : ৬-৫০ পঃ
ধ্বমাধব : ৪-০০ টাঃ
স-দূতম্ : ২-০০ ,,
াবলী : ৩-০০ ,,
তগোবিন্দম্ : ৪-০০ ,,
ন্দ্রর উপন্যাস
লী : ৩-০০ ,,
ভন্ডার : ১৫-০০ ,,
নচন্দ্রর সাহিত্য গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
াকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের
বলী : ৩-০০ ,,
াদর গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,
ন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
ন্দ্রর গ্রন্থাবলী : ৬-০০ ,,
ন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী : ৬-০০ ,,
দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লী : ৪-০০ ,,
ম্ : ৩-০০ ,,

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের
গ্রন্থাবলী : ১০-০০ টাঃ
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী : ৬-৫০ পঃ
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৮-০০ টাঃ
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,
যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,
গৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
মতিলাল দাসের গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৩-৫০ পঃ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ্রন্থাবলী : ৪-০০ টাঃ
প্রেমেন্দ্র মিত্রের গ্রন্থাবলী : ৩-৫০ ,,
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
মাইকেল গ্রন্থাবলী : ৪-৫০ পঃ
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী : ৫-০০ টাঃ
কালিদাসের গ্রন্থাবলী : ৯-০০ ,,
অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী : ৩-০০ ,,
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী : ৪-৫০ পঃ
স্কটের গ্রন্থাবলী : ৩-০০ টাঃ
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী : ৩-৫০ পঃ
দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী : ৪-০০ টাঃ
হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী : ৬-০০ ,,
কথাসরিৎ সাগর : ৪-০০ ,,
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী : ৪-০০ ,,

ঈশ্বরগুপ্ত গ্রন্থাবলী : ৭-০০ ,,
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী : ৮-০০ ,,

মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী : ৩-০০ টাঃ
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী : ৩-৫০ পঃ
রস গ্রন্থাবলী : ৩-০০ টাঃ
নাট্যকার মন্মথ রায়ের
গ্রন্থাবলী : ৫-০০ ,,
কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ৫-০০ ,,
জ্যোতিষ রত্নাকর : ৪-০০ ,,
পরলোক : ৪-০০ ,,
পরলোক রহস্য : ২-২৫ পঃ
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব : ৩-০০ টাঃ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ২-০০ ,,
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ২-০০ ,,
দৃশ্যকাব্য পরিচয় : ১০-০০ ,,
বিলাতি গুপ্তকথা : (২য় খণ্ড) ৫-০০ ,,
রাজসিংহ (নাটক) : ২-০০ ,,
সরলা (নাটক) ২-০০ ,,
দেবী চৌধুরাণী (নাটক) ২-০০ ,,
সীতারাম ,, ২-০০ ,,
কপালকুণ্ডলা ,, ২-০০ ,,
অমরনাথ দত্তের :
ভ্রমর (বঙ্কিমচন্দ্র) ২-০০ ,,
তারাপদ রায়ের : ভদ্রার্জুন : ২-০০ ,,
ডঃ প্রঞ্চানন ঘোষালের আমার
দেখা মেয়েরা (বোর্ড বাঁধাই) ৪-০০ ,,
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন : ৩-০০ ,,
রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবন-
প্রভাত : ৩-০০ ,,
মাধবী কঙ্কণ : ২-০০ ,,
রাজভাষা : ইংরেজী ভাষা
শিক্ষার অপূর্ব গ্রন্থ : ৫-০০ ,,
ভারত প্রতিভা : ৫-০০ ,,
প্রতাপাদিত্য : ৩-০০ ,,
মহারাজ নন্দকুমার : ৩-০০ ,,
জালিয়াৎ ক্রাইভ : ৩-০০ ,,
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর
আত্মজীবনী : ৩-০০ ,,
আনন্দমঠ : (শ্রীঅরবিন্দ) ৪-০০ ,,
নানার মা : ৩-০০ ,,
আলান কোয়াটার মেন : ৩-০০ ,,
যৌন-মনোদর্শন : (৫ম ভাগ) ৪-৫০ পঃ
হাজার জিনিষ : প্রতি ভাগ ৩-০০ টাঃ

বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

সুনীতিকুমার ও শিশিরকুমার

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি ডঃ সুনীতিকুমার পরলোকগমন করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, অগাধ জ্ঞান, ভাষা-বিদ হিসাবে তাঁর বিষয় অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরা আলোচনা করবেন এবং করছেন। আমি এখানে শুধু তাঁর নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং রঙ্গমঞ্চ নিয়ে একটু বলব, কারণ এই দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল।

ভাষাবিদ সুনীতিকুমার

সকলেই জানেন যে, নাট্যাচার্য শিশির-কুমার ও ডঃ সুনীতিকুমার দু'জনে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে স্কুল-কলেজ থেকে নিয়ে নাট্যাচার্যের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডঃ সুনীতিকুমার তাঁর পাশে ছিলেন। সুখ-দুঃখে, শলাপরামর্শ, পারিবারিক বিষয়ে উপদেশ, রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি শিশিরকুমার সব সময়েই ডঃ সুনীতিকুমারের সঙ্গে করতেন।

স্কুল-কলেজে পাঠ্য অবস্থায় শিশির-কুমারের নাট্যপ্রতিভা বিকশিত হয়। ডঃ সুনীতিকুমার এক প্রবন্ধে নিজে বলেছেন—"শিশিরের ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তিতে অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-নাথের কবিতাগুলি এমন চমৎকার সুরে ছন্দে লালিত্যে আবৃত্তি করত যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হতেন, আমরা তো কোন্ ছার।" আরও বলেছেন, "ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ছিল। কথা, আলোচনা বৈঠকী কথাবার্তা জমাতে পারতো ভাল। আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে আলাপে ও জ্ঞানে সব সময়েই নিজেকে বড় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত।"

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে ছাত্র-জীবন থেকেই ডঃ সুনীতিকুমার ও শিশির-কুমার যুক্ত ছিলেন এবং এইখানেই শিশির-কুমারকে কেন্দ্র করে সূচিত হয় ইনষ্টিটিউটের এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯০৮ সালে শিশির-কুমার ও ডঃ সুনীতিকুমার স্কটিশ চার্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তখনকার দিনে চৌরঙ্গী অঞ্চলে কলেজে কলেজে ইংরাজী নাটক অভিনয় হ'ত। তার মধ্যে সেক্সপীয়র নাটকই প্রাধান্য পেত। স্কটিশ চার্চ কলেজে শিশিরকুমারের পরিচালনায় "জুলিয়াস সিজর" নাটক অভিনয় হবে স্থির হয়। শিশিরকুমার করবেন "ব্রুটাস"। শিশিরকমার চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়ে নাটকের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জানতে গেলেন। কিন্তু তাদের আলাপ-আলোচনায় পোষাক সম্বন্ধে বিশেষ জানতে পারলেন না। সুনীতিকুমারকে ধরলেন। সুনীতিকুমার তখন থেকেই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ন করে চলেছেন। শিশির-কুমার বল্লেন—"সুনীতি, তুই পোষাক-পরিচ্ছদ-সাজসজ্জা সম্বন্ধে আমাকে পরামর্শ দে ও সমস্ত ভার নে।" সুনীতিকুমার পড়াশুনা করে গ্রীক দেশীয় পোষাক সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শিশিরকুমারকে ব্রুটাস সাজে নিজে হাতে সাজিয়ে দেন। শিশিরকুমারের 'ব্রুটাস" সকলকে বিস্মিত করে। এরপর থেকে যখনই কোন নাটক "ইনষ্টিটিউটে" অভিনীত হ'ত ডঃ সুনীতিকুমার পোষাক, সাজসজ্জা সম্বন্ধে শিশিরকুমারকে পরামর্শ দিতেন।

যখন নাট্যমন্দিরে "ষোড়শী" অভিনীত হয় তখন শিশিরকুমার তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুধাংশু মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে "দেনা-পাওনার" রূপ দেওয়ান। সুনীতিকুমারের অনেক গ্রহণ করেছিলেন শিশিরকুমার। তার "our Sweetest songs are th that tell of saddest thought শেলীর এই উক্তিকে কেন্দ্র করেই জীবনা

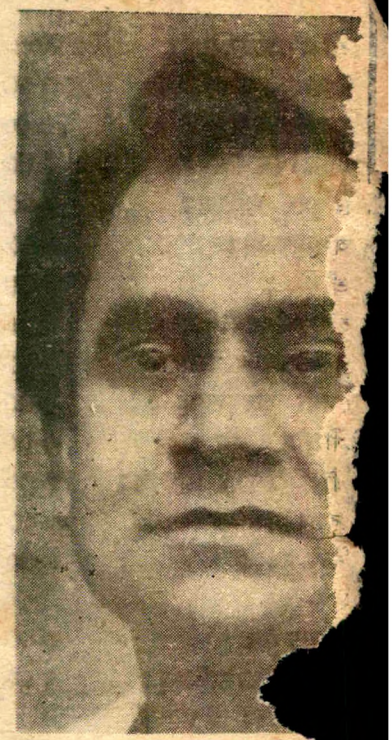

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

মারা হয়। শোনা যায় সুনীতিকু মৃত্যুকে সম্মখন করেছিলেন। তারপর বিরাজ বৌ, গৃহদাহ প্রভৃতির অভিনয় কুমারকে এতই মুগ্ধ করে যে, একটি সুনীতিকুমার লিখলেন—

"নাট্যকার হিসাবে শরৎচন্দ্রকে পেশাদারী মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী ষোড়শী, রমা, প্রভাত মঞ্চস্থ করে। শরৎ জনপ্রিয়তার দাবী অনেকখানি শিশি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

বিরাজ বৌ দেখে সুনীতিকুমার

শারদীয়ায় সবারে জানাই আমন্ত্রণ

৮৪-তে তিনটি ভিন্নস্বাদের পালা যাত্রায় এই প্রথম তিনটি পালার

নায়ভূমিকা ও নির্দেশনায় : **কেতকী দত্ত**

বিপ্লবের বহ্নিশিখা | পৌরাণিক | সামাজিক অশ্রুধারা

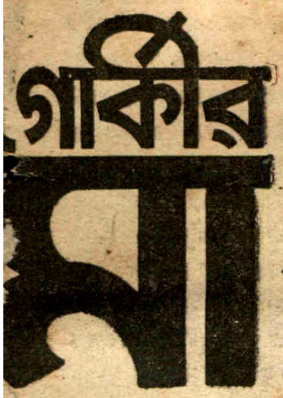

ও সুরসঞ্চয়নে : কেতকী দত্ত | রচনা : সুশ্যামল শর্মা, সুর : দুর্গা সেন | রচনা : নারায়ণ দত্ত, সুর : লক্ষ্মণ দাস

শ্রেষ্ঠাংশে **বিদ্যুৎ গোস্বামী**

মার, প্রশান্ত মুখার্জী, কল্যাণ চক্রবর্তী, চঞ্চল দত্ত, রবীন মালাকার, তাপসকুমার, তাপস পালুই, বুলকুমার, নীলাঞ্জন চৌধুরী, মেঘেন্দ্র মৈত্র, অজিত দত্ত, মধুসূদন ঘোষ, অশোককুমার

ইরা চক্রবর্তী | **বুলবুল দে**

মিস্ পিয়ালী, চৈতালী, পাপিয়া মুখার্জী

পিসী চরিত্রে **সুন্দর রায়চৌধুরী** সংগীতে **রাজিব ভট্টাচার্য্য ও দুধকুমার**

লাস্যময়ী **সুপর্ণা দেবী** এবং নৃত্যে পাঞ্জাব-দুহিতা **হেমা মালিনী**

স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী পাপিয়া মাইতি তপন গোস্বামী

নায়িকা : কেতকী দত্ত প্রধান উপদেষ্টা : তিনকড়ি গুছাইত যুগ্ম ম্যানেজার : দেবু গাঙ্গুলী

শ মিত্র, সহ : দিলীপ দত্ত প্রধান কর্মসচিব : রাধারমণ দাস পরিচালক : জয় মাইতি

পরিবেশনায়

নিউ **ইন্দ্রলোক অপেরা**

১৭/১এ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ ৫৫-৯৯৯৯, ৫৫-২৬১২

"বিরাজ-বৌ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে"—এর পর রিলিফ হিসাবে শিশিরকুমার শিবের নৃত্য দিলেন—"শিব হে ভোলা মহেশ্বর"—এই ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।"

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন শিশিরকুমার তাঁর শ্রীরঙ্গমের গৃহে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন তখন তিনি নিজেকে বাদ দিয়ে "বিপ্রদাস" নাটক করবেন স্থির করলেন। সকলের মধ্যে সুনীতিকুমার আপত্তি করলেন এ নাটক চলবে না বলে। শিশিরকুমার বিপ্রদাস উপন্যাসের উপর পেনসিলে লিখলেন —"এ বই আমি প্লে করব এবং চলবে।"

এই নাটক বিপুল জনসমাদর লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্ল্যাক আউটের যুগে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও মলিনার অভিনয় সকলকে অভিভূত করে এবং তিনি এই নাটকে একাধিক গট-নটী সৃষ্টি করেন।

তারপর যখন শিশিরকুমার "বিন্দুর ছেলে" নাটকাভিনয় করবেন স্থির করলেন তখন ডঃ সুনীতিকুমার ছুটে এলেন, বল্লেন—"এবার তুই প্যাটিগণিত নিয়ে ষ্টেজে নাম।" শিশিরকুমার হেসে জবাব দিলেন—"তোকে নেমন্তন্ন করলাম, অভিনয় এসে দেখে যাস।" এ নাটকের অভিনয় শুধু অনবদ্যই হয়নি, বিপ্রদাসের মত অনেক দিন ধরে চলেছিল এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। ডঃ সুনীতিকুমার দেখে বল্লেন—"সত্যিই কি আত্মবিশ্বাস শিশিরকুমারের নিজের ওপর। এমন নাটক অনেক কাল দেখিনি। আবার এই বয়সে কি শেখাতেও পারে। কে জানতো বিন্দুর ভূমিকায় সাবিত্রী এমন অভিনয় করবেন?"

যখন "মাইকেল মধুসূদন" অভিনীত হয় তখন শিশিরকুমার অনেক পরামর্শ করেছিলেন ডঃ সুনীতিকুমারের সঙ্গে। বরানগরে নিজের বাসায় বসে মাইকেল মধুসূদনের আবৃত্তি করে শোনাতেন ডঃ সুনীতিকুমারকে। বলতেন—"শোন আর বলবি চলবে কি না।" সুনীতিকুমার বলতেন শুনতে শুনতে—"কি আর বলব? এমন সুন্দর আবৃত্তি আর ভাবভঙ্গী আর কোথায় পাব? শুনে শুনেও মন ভরে না।" শুনেছি টুসকান ভাষা দিয়ে আবৃত্তি করতে চেয়েছিলেন শিশিরকুমার। কারণ মাইকেল মধুসূদন টুসকান ভাষা জানতেন। কিন্তু সুনীতিকুমারের পছন্দ না হওয়ায় বাদ দিয়েছিলেন।

প্রথম রজনী অভিনয়ের দিন উপস্থিত ছিলেন অনেক নামকরা অধ্যাপক গুণী-জ্ঞানীর দল, তাঁর মধ্যে ছিলেন সামনের সারিতে ডঃ সুনীতিকুমার, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অশোক শাস্ত্রী, ডঃ কালিদাস নাগ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন দেব, প্রেমাংকুর আতর্থী প্রমুখ। কি মন দিয়ে সব নাটক শুনছিলেন। অভিনয়ের শেষে শ্রীরঙ্গমের দোতলায় শিশিরকুমারকে জড়িয়ে ধরলেন ডঃ সুনীতিকুমার। কি তারিফ আর প্রশংসাই না করলেন। সেখানে শচীন সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, আনন্দবাজার পত্রিকার সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন অভিনয়ের পর সকলে শিশিরকুমারকে প্রথম অংকটি বাদ দিতে বলেন, কারণ ওটা নাকি মেলোড্রামাটিক। এর মধ্যে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তই বেশী আপত্তি করেছিলেন। শিশিরকমার নিজে ডঃ সুনীতিকুমারের পরামর্শ

সংগীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ

নিলেন। ডঃ সুনীতিকুমার বাধা দিলেন, বল্লেন—প্রথম অংক প্রণয়ের দৃশ্য এবং পিতাপুত্র সংঘাত অত্যন্ত ড্রামাটিক এবং নাটকের ক্লাইম্যাক্স। বাদ দিলে নাটকের অংগহানি হবে। তাছাড়া শিশিরকুমারের অভিনয় প্রথম অংকে এতই উচ্চাঙ্গের যে দর্শকরা নতুন করে পরিণত বয়সে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেলেন। শিশিরকুমার এরপর আর প্রথম অংক বাদ দেন নি। দেখেছি দিনের পর দিন ডঃ সুনীতিকুমার মাইকেল মধুসূদন মন দিয়ে দেখেছেন।

শিশিরকুমারের "সীতা" নাটকটি দেখে রবীন্দ্রনাথও উচ্চপ্রশংসা করেন। সুনীতিকুমার বলেছিলেন যে, শিশিরকুমারই "সীতা" নাটকের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক যুগের সাজসজ্জা ও পোষাকের প্রচলন করেন। এর পূর্বে মুসলমানী পোষাকের প্রচলন ছিল। শিশিরকুমার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন।"

"বিজয়া" নাটকে রাসবিহারীর ভূমিকায় শিশিরকুমার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রূপসজ্জা নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। বলতেন—রামানন্দবাবুর সঙ্গে ভাল ছিল না। তিনি বি ছিলেন। শরৎচন্দ্র রামানন্দকে রাসবিহারী চরিত্র লেখেন। বি কুমারের পরামর্শে ঐ রূপসজ্জা

শুধু যে অন্তরংগ বন্ধু ডঃ সুনীতিকুমার শিশিরকুমা জীবনে ও আপদ-বিপদে করেছেন। কোনদিন এই দুই মতে অমিল বা মনোমালিন্য হ কুমার কতখানি শ্রদ্ধা করতে তা একটা কথা থেকেই প্রমা দেব একবার এক আড্ডায় বৈঠকে উচ্ছৃঙ্খলতা, সংযমের অভাব কটাক্ষপাত করেছিলেন। শুনে বলেছিলেন, "মানুষ ভালমন্দ প্রত্যেক মানুষের ভেতরই ভা আছে। শিশিরের অতবড় প্রতিভ স্নেহশীল মানুষের মধ্যে যা দে গ্রহণীয় নয়"—এ যে কত বড় অন্তরংগ বন্ধুকে তা কল্পনা ক

যেবার পুডভ্‌কিন্ ও চের শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা কর অভিনয় দেখতে সেদিন ডঃ উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাপা এল তখন শিশিরকুমার বল্লেন— কুমার, এঁদের আমি ষোড়শী সুনীতিবাবুর বোধহয় পছন্দ বল্লেন—"এ নাটকটি কি ওঁদের শিশিরকুমার বল্লেন—"দেখে নিস্ চন্দ্রের নাটকটির ঠিক মর্মার্থ পারবেন। প্রজা জেগে উঠেছে এব তার কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য শরৎচন্দ্রের নাটকের এটাই প্রতিপা অভিনয় দেখে ওঁরা বলে গেলেন স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, 'ফিউড্যা শেষ হয়ে আসছে এবং প্রজারা দাঁড়িয়েছে।" সুনীতিবাবুকে ওঁরা বলে "হি ইজ এ গ্রেট এ্যাক্টর"।

সুনীতিবাবু একবার বলেছিলেন কথা বলতে কি শিশিরবাবুর মঞ্চে যে সব রচনা মঞ্চস্থ হয়েছে নাট্যকার ষোড়শী, রমা, বিরাজ-বৌ, বি বিপ্রদাস, বিন্দুর ছেলে তাদের কখনও নিকৃষ্টরূপে প হয় নি। এ বিষয়ে শিশির সব সময় থাকত।"

একবার শিশিরকুমার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনি

অপেক্ষা করছেন। সন্ধ্যা প্রায়
। এমন সময় উত্তরায়ণ থেকে
সছেন কোমর ভেংগে দুটি হাত
অবস্থায় চারিদিক তাকাতে
। বনমালী একটি সুদৃশ্য কাঁচের
আলো নিয়ে পথ দেখাতে
সছে। শিশিরকুমার বল্লেন—
যে কত বড় অভিনেতা তা তাঁর
ধ্যেই প্রকাশ পায়।" প্রণাম করার
অনুযোগ করলেন: কেন শিশির-
না তাঁর কাছে। "যাদের চাই
না, যাদের না চাই তারা আসে।"
লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে

বল্লেন—"আজ্ঞে দিনুর বন্ধু কি না তাই ঠিক আসতে পারি না।" দিনু অর্থাৎ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিনুবাবু কিছুটা রাশছাড়া ছিলেন। শিশিরকুমার সেই ইংগিত দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—"ওঃ তুমি দিনুর বন্ধু, বটে, তা আমি ভুলে গেছলুম"। সুনীতিকুমার বল্লেন—"আমি অভিভূত হয়ে এই দুই মহানটের অভিনয় দেখতে লাগলাম।" আবৃত্তির উল্লেখ করতেই কিছুমাত্র সংকোচ না করে শিশিরকুমার আরম্ভ করলেন—

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইংগিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া
.....তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কর না পাখা"

সুনীতিকুমার বল্লেন—পাচ-ছয় মিনিট ধরে আবৃত্তি চলল। রবীন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে শুনছেন। যখন শেষ হল বল্লেন একটি কথা—"অপূর্ব।"

আজ আমাদের মধ্যে দু'জনেই নেই। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব, অন্তরংগতা, আন্তরিকতা এবং শিশিরকুমারের উদাত্ত কণ্ঠে সুনীতিবাবুর বাড়ী গিয়ে সেই ডাক—"সুনীতিকুমার বাড়ী আছ?"—চিরদিনই আমাদের মানসপটে বিরাজ করবে।

শুভো

সিদ্ধ শয্যাদ্রব্য শিল্প প্রতিষ্ঠান

১৮৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

নে মশারী, বেডকভার, বোম্বে ডাইং
সিট, পর্দার কাপড়, লেপ, তোষক ও
র কাপড় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

পালস-এর গুল মেসিন কিনুন

পালস ইঞ্জিনীয়ারিং
এণ্টারপ্রাইজ

অফিস: ৩/৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-৫৬৫২

ওয়ার্কসপ: ৫৮/১/২/১, নটবর পাল
রোড, কদমতলা, হাওড়া
ফোন: ৬৯-২৭৪৬

REGD NO. WB/CC—114 DAILY BASUMATI PUJA ISS

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ঃ ১৩৮৪
মূল্য ঃ আট টাকা। বিমানে আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সবিনয় নিবেদন

তিন বৎসর পরে দৈনিক বসুমতী'র ১৩৮৪ সালের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশে বসুমতী পরিচালক পর্ষদের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশের অকুণ্ঠ প্রেরণা ও সহযোগিতা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এই সংখ্যাটির সুষ্ঠু সম্পাদনে মুখ্য সহায়কের দায়িত্বে ছিলেন কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গজগৎ বিভাগের প্রকাশিত কয়েকটি ছবি আলোকচিত্রী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ গোস্বামী ও প্রদীপ দাসের তোলা।

এঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দৈনিক বসুমতীর সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীদের, বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং শুভানুধ্যায়ীদের যাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া যথাসময়ে এই শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

গোপাল ভৌমিক
প্রধান সম্পাদক, দৈনিক বসুমতী

প্রধান সম্পাদক—গোপাল ভৌমিক
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে শ্রীনারায়ণ বসু কর্তৃক ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
বসুমতী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

AT

IMCO

WE BELIEVE

THE SYMBOL OF PROGRESS IS MACHINE MADE

t was with this belief
hat INDIA MACHIN-
ERY CO. LTD.
was established in
1933. Today, 38 years
later, our belief
remains the same—
machinery is the key to
he country's progress. As
the pioneer machine building
company in India, IMCO's
progressive outlook and vast
chnical experience has built up
d record of achievements. What
ICO's machines so dependable
mentation of strict quality
sures, use of the best materials,
chnical know-how and the awareness
nds and expectation of the Customers.

IMCO produces a range of famous ATLAS
ng machines with a capacity of 1 kg to
nnes, BHARATI Printing Machinery, INDIA
hine Tools and Textiles Machinery and a variety of
Products all according to Customers Specifications.

INDIA MACHINERY COMPANY LTD.

A. of India Management.
NAGAR, HOWRAH-711 106. Phone 66-3121 (4 lines)
m : ATLAWARRIZ, Howrah.
OFFICE : Flat 1D, 4, Shakespeare Sarani,
a-700 071. Phone : 43 1024. Gram : ATLASIMCO.